ছেলেমেয়েদের সর্বপুরাতন সচিত্র মাসিকপত্র

৪৬শ বর্ষ, ১৩৭২

ইং ১৯৬৫-৬৬

●

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

সম্পাদিত

★

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্‌ প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট :: কলিকাতা-১২

"ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল"

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *
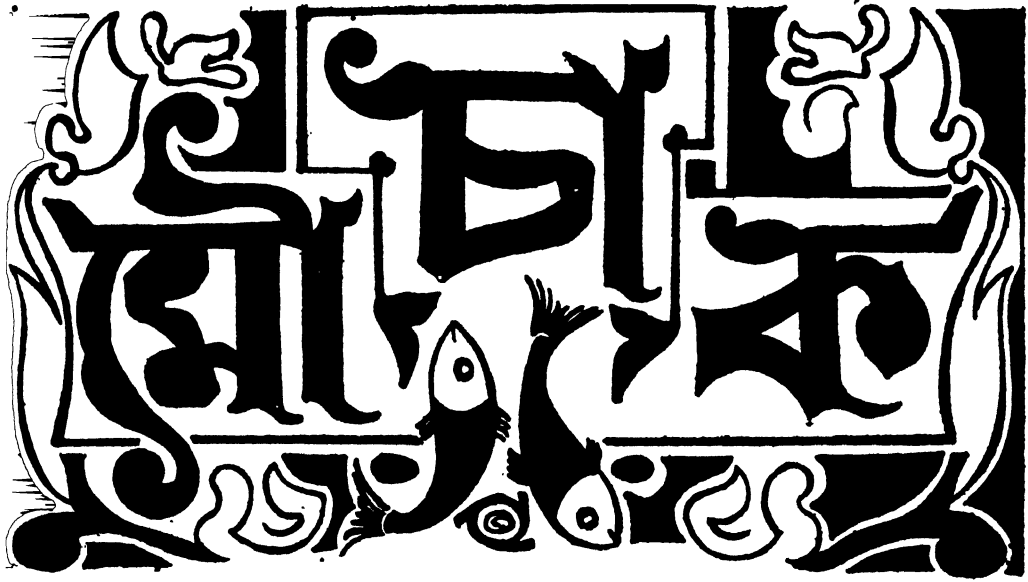
৬শ বর্ষ] বৈশাখ ঃ ১৩৭২ [১ম সংখ্যা

গাইয়ে আর গাই-এ !

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

গোরু চরায় আলি,
গান গায় কাওআলি
গরুর পিঠেতে চেপে
ভাই হে !
মিলে যায় গাই-এ আর
গাইয়ে !

আমাদের আলি ভাই
কাওআলি গান গায়,
কান পেতে শোনে তাই
গাই রে !
Cow-আলি গায় আলি
তাই রে !

প্রাণ করে আইঢাই
গাইরাও গাই গাই
করে যে ;
তাক্ তেরে কেটে তাক্—
তাল নাহি যায় ফাঁক,
গায় আলি গাঁক গাঁক
স্বরে যে !

আলি যেন গায় গীতি
জুতিয়ে !
গোরুরা পালায় ইতি—
উতি হে !

আলি ক'সে করে Sing,
গরুদের নড়ে শিং !
গানে বুঝি ওঠে খুঁৎ—
খুঁতিয়ে !

গাই-য়েরা ভাবে কী যে
করবে !
তারাও কি ক্ষেপে গিয়ে
ধরবে···?

ধরতে যে গান থেকে
ধরে গিয়ে গাইয়েকে—
আলিকেই দেয় শেষে
গুঁতিয়ে ॥

———

সরস্বতী পূজা

শ্রীপরিমল গোস্বামী

যদু হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো মধুর কাছে। হাঁফাতে হাঁফাতে জিজ্ঞাসা করল শুনেছিস?

শুনেছি।

কি করা যায় এখন?

তাই তো ভাবছি।

কেষ্ট এলো ছুটে। বলল, চাঁদা ওরা আগেই আদায় করে নিয়ে গেছে।

শঙ্কর এসে বলল, একই স্কুলের ছাত্র হয়ে দুটো দল হয়ে গেল—বিশ্রী, বিশ্রী! নাম ডুববে, রে।

মধু গম্ভীর ভাবে বলল, এ বুদ্ধি ওদের কে দিল?

কি জানি। অমিত ভাল ছেলে বলে অহঙ্কার হয়েছে, তাই সে আলাদা দল পাকিয়েছে। তাই তো মনে হয়।

ক্ষিতীশ, গজেন, কালু ওরাই ভিড়েছে ওর দলে। অথচ এতদিন আমাদের দলে ছিল।

মধু এতক্ষণ বেশ সুখস্বপ্ন দেখছিল। কত টাকার প্রতিমা কিনবে, কত টাকার স্টেজ বাঁধবে, লাউডস্পীকার আনাবে। চকচকে কাগজের বই ছাপাবে, আর সরস্বতীর ছবির নিচেই থাকবে তার নাম—মধুসূদন মিত্র কর্মাধ্যক্ষ।—কিন্তু চাঁদার রিপোর্ট শুনে সব মাটি হয়ে গেল।

গত বছর পূজা মনের মতন হয়নি। সব পাড়ায় কত ধূমধাম, আর তারা মাত্র পঞ্চাশ টাকা চাঁদা তুলে পূজা সেরেছে। তার ফেল করার কারণও তাই। লজ্জা, লজ্জা, ছি ছি ছি! সবাই পূজার বই ছাপিয়েছে, নিজেদের নাম ছাপিয়েছে, কত সম্মান তাদের। আর এই পাড়াটাই ছোটলোক। চাঁদা দিতে চায় না কেউ। দরজায় ধাক্কা মারলে বেরোয় না। পথে বোমা মারব ভয় দেখিয়ে তবে কিছু কিছু আদায় হয়েছে এবারে। কিন্তু এবারে দু শ টাকার উপরে চাই। অথচ সমস্ত দিন ঘুরে ওরা প্রতিদিন দু টাকা তিন টাকা আনছে, এতে কি করে সব হবে?

সে জিজ্ঞাসা করল পূজার আর ক দিন বাকি মনে আছে?

আছে বৈ কি। আর মাত্তর দশ দিন।

কত চাঁদা উঠেছে জানিস?

প্রায় এক শ টাকা।

মধু গম্ভীর ভাবে বলল, প্রতিমা আর পুরুত বাদ যাবে। বই ছাপা হবে না। বাজনা বাদ যাবে। লাউডস্পীকার হবে না। এ ছাড়া আর সব হবে।

কথাটার মধ্যে খোঁচা আছে যদু তা বুঝতে পারল। কিন্তু তাদের সাধ্য কি এত টাকা চাঁদা তোলে। সবাই তো চেষ্টা করছে। অমিতের দল না থাকলে কবে দু শ টাকা তুলে ফেলা যেত। বাকি টাকাটা আমরা নিজেরা দিতাম।

সত্য একখানা খাতা আর কলম নিয়ে এসে বলল, আমাদের নামের একটা তালিকা করা দরকার। এখন ছাপতে না দিলে সময়ে পাওয়া যাবে না।

মধু বিরক্ত হয়ে বলল, তা আমার কাছে কেন? তোমরা করতে পার না?

তা পারি, কিন্তু কয়েকটা বানান নিয়ে মুশকিলে পড়েছি। আচ্ছা সরস্বতী লিখতে দুটো দন্ত্যসতেই তো ব-ফলা?

কি মুশকিল! ক'টা হবে তা আমি এখন বলতে পারব না, এখন আমার মাথার ঠিক নেই। পূজা হবে কিনা তাই আগে দেখ।

পূজা না হলে চলবে কেন? বানানগুলো আগে ঠিক না হলে কিছুই হবে না। তুমিই বল না, যদুদা'?

জানতাম রে, তুই জিজ্ঞাসা করে সব গুলিয়ে দিলি। সরস্বতী না লিখে বীণপাণি লেখ।

সেই চেষ্টাই তো করছিলাম, ওর বানানটাও তো জানি না।

যা ইচ্ছে লিখে দে। বস্তী পাড়ায় তিন শ টাকার পূজা হয়ে গেল গতবারে একটা বানানও না জেনে। ওতে কিছু এসে যায় না। বানানটা বড় একটা কিছু নয়। কিন্তু অমিত এত বড় শত্রুতা করল!

চল না সবাই মিলে গিয়ে ওকে ধরি। ও যদি মোড়ল হতে চায় তাই হোক, সবাই মিলে পূজা করি, অনেক টাকা হবে অনেক নাম করা যাবে।

না রে। ও তেমন ছেলে নয়। ও নিজে যা করবে তাই হবে, অন্যের কথা শুনবে না।

ভোলা এসে খবর দিল অমিতের দল দু শ টাকা চাঁদা তুলেছে।

মধু এ কথায় ক্ষেপে গেল। বলল, লজ্জা হ'ল না বলতে? নিজেরা কি করছিস? তোরা সব অপদার্থের দল। দেখিস এবারে সবাই কি রকম হাসাহাসি করে।

শেষে ওরা যুক্তি করতে বসল অমিতদের দলের সব পণ্ড করা যায় কি করে। কিন্তু তারা যে কোথায় প্রতিমা বসাবে তা এরা কিছুতে ভেবে পায় না। কোনো আয়োজনই তো দেখা যাচ্ছে না। টাকাটা সবই ওরা মেরে দেবে বোধ হচ্ছে যে!

একজন বলল, স্কুলে হেডমাস্টারকে জানিয়ে দিতে হবে সব। সব খাতির অমিত একা পায়, এবারে জব্দ হবে।

ওরা কয়েকজন গেল হেডমাস্টারের কাছে। তিনি চুপ করে সব শুনলেন। বুড়ো মানুষ। সরল শাদাসিদে। বোধ হয় খুবই দুঃখ পেলেন শুনে। শেষে বললেন, এ সব তোমাদের নিজেদের ব্যাপার। এ কথা আমাকে বলতে আসা তোমাদের অন্যায় হয়েছে। আর কখনো ক'রো না।

ওরা হতাশ হয়ে ফিরে চলে গেল।

পুজোর আর মাত্র একদিন দেরি। শহরের সমস্ত ছাত্র মেতে উঠেছে। বেশি খরচ করে হৈ চৈ করলে পরীক্ষা পাস ঠেকায় কে? বিদ্বান হওয়া ঠেকায় কে?

হঠাৎ যদু-মধুর দলের পীযূষের সঙ্গে অমিতের দেখা। পীযূষ অমিতের সহপাঠী, দুজনেই ক্লাস-টেনে পড়ে। সে অমিতকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কতদূর?

কতদূর মানে? কালই তো পূজা।

আমি বলছি কত চাঁদা আদায় হ'ল?

হিসাব করিনি।

কোথায় স্টেজ বাঁধছ?

জায়গা এখনও ঠিক করিনি।

পীযূষ বুঝতে পারল, গোপন করে যাচ্ছে। সে একটু বিদ্রূপের সুরে বলল, বল কি হে? আজও জায়গা ঠিক করনি?

মোটামুটি একটা ঠিক আছে।

কিন্তু পীযূষ ওর ধাঁধার মতন গোলমেলে জবাবে মনে মনে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তা ছাড়া পাড়ার ছেলে, যারা চাঁদা দিয়েছে তারা ভাববে অমিতদের টাকাও একই জায়গায় খরচ হচ্ছে। এ আরও অসহ্য। আগে জানলে ওদের দলেই যোগ দিতাম, টাকার একটা ভাগ পাওয়া যেত। কিন্তু এখন আর উপায় নেই।

যদু-মধুর দল শেষ পর্যন্ত চাঁদা তুলেছিল ভালই। বানান অনেক ভুল হলেও সুন্দর কাগজে ওরা প্রায় পঞ্চাশজন কর্মীর নাম ছেপেছে। বইখানা দেখতে খুব ভাল হয়েছে। ওদের সবার খুশির মধ্যে কেবল অমিতের ধাঁধার মতন কথাগুলো কাঁটার মতন বিঁধে রইল।

পূজার আগের দিন থেকেই জোর লাউডস্পীকারে শস্তা সুরের হিন্দি গান বাজানো চলছে খুব হৈ-চৈ ছেলেমেয়েদের। স্টেজ বাঁধা হয়েছে। গান হবে, আবৃত্তি হবে, অভিনয় হবে এমন জাঁকের পূজা এ পাড়ায় আর হয়নি।

পূজার দিন সন্ধ্যায় যদু-মধুদের স্টেজের আবৃত্তি একটুখানি শুনে হেডমাস্টার অমিতদে

বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি বাড়ির দোতলায় একটা ফ্ল্যাটে সে থাকে। একবার তাঁর মনে হ'ল অমিত সত্যিই বাড়িতে আছে, অথবা সে অন্য কোথাও তাদের দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমোদ করতে গেছে দেখে যাওয়া যাক। যদু-মধুদের আয়োজনের মধ্যে সে যে নেই, তা তিনি নিজ চোখে দেখে এসেছেন। অমিত তাঁর বড়ই স্নেহের পাত্র। এমন ভাল ছেলে স্কুলে তিনি কমই পেয়েছেন এর আগে। অমিতের বাড়িতে আগেও তিনি অনেকবার এসেছেন, তাকে ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহ দিতে, স্নেহ দিতে। বিনীত যারা, পড়াশোনায় যাদের মনোযোগ, তাদের সবার কাছেই তিনি মাঝে মাঝে এভাবে গিয়ে থাকেন।

কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়ে তাঁর আজ আর পা সরল না। তাঁর মনে হ'ল, আমি কি তবে অমিতকে সন্দেহ করছি? তাকে তো আমি চিনি। সে চাঁদা আদায় করে টাকা চুরি করবে এমন ছেলে তো নয়। তবে কেন সে কি করছে পরীক্ষা করতে যাব? অন্য দিন হলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু তার বিরুদ্ধে নালিশের পরে আমার আজকের দিন আর তাকে দেখতে যাওয়া ঠিক হবে না।

তিনি এই সব ভেবে ফিরে গেলেন দরজা থেকে।

কিন্তু উপরে গেলে তিনি দেখতে পেতেন অমিত পাণ্টা পূজা করতে কোথাও যায়নি। তার পূজা ঘরের মধ্যেই। তার পূজায় এক পয়সা খরচ নেই। সে সকাল থেকে এক মনে শুধু বই পড়ে চলেছে। হৈ-চৈ করে সময় নষ্ট করবার মতন অবস্থা তার নয়। বীণাপাণি তার পাঠের মধ্যেই আবির্ভূতা। প্রতিমা গড়ে পূজার নামে শক্তিক্ষয় করা সে পছন্দ করেনি। "বিদ্যা দাও" বলে বাইরে থেকে ভিক্ষা করতে সে চায়নি। সে সমস্ত অন্তর দিয়ে আজ বিদ্যার দেবীকে এই ভাবে তুষ্ট করেছে। সে জানে পড়ায় সে যত এগিয়ে যাবে, তত তার সরস্বতী পূজা সার্থক হবে। এ পূজা অত্যন্ত কঠিন, এর মধ্যে ভিক্ষার লোভ নেই, এর মধ্যে অন্য লোকের ঘাড় ভেঙে টাকা আদায় করে সরস্বতীকে ঘুস দিয়ে পাস করার লোভ নেই। সে জানে বিদ্যার দেবীকে পূজা করতে হলে বিদ্যালাভের কঠিন পথেই তাকে যেতে হবে, এর বাইরে আর কোনো পূজায় তার বিশ্বাস নেই।

আহা! হেডমাস্টারের এমন মহিমময় দৃশ্যটি দেখা হ'ল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা অমিতের পড়ার বিরাম ছিল না। খাওয়া ভুলে পড়েছে। সমস্ত মন তার পাঠের মধ্যে এনে জড়ো করেছে। ছেলেরা দুষ্টুমি করে তার বাড়ির নিচে পটকা ফাটিয়েছে, কিন্তু সে আওয়াজ তার কানে ঢোকেনি। এমন দৃশ্যটি কেউ দেখল না!

কিন্তু হেডমাস্টার এ দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হলেও একটি বড় বিস্ময় তাঁর জন্য অপেক্ষা করে ছিল।

পরদিন ভোরবেলা অমিত তার দলের চারজন ছেলের সঙ্গে হেডমাস্টারের বাড়িতে গিয়ে হাজির। চারজনেই তাঁকে একে একে প্রণাম করে দাঁড়াল।

হেডমাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, এত সকালে? কি ব্যাপার? কোনো গণ্ডগোল হয়নি তা?—সকালে এভাবে আসা দেখে তাঁর মনে প্রথমেই ভয় জেগেছিল। তাই এই প্রশ্ন।

অমিত বলল, স্যার, আমরা এবারে পূজাটা একটু অন্যরকম করেছি।

কি রকম?

আমরা অনেকদিন ধরে এর আয়োজন করেছিলাম। প্রায় দু মাস ধরে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে নানা জায়গা থেকে চাঁদা তুলেছি।

হেডমাস্টার ওদের সবাইকে এক সঙ্গে দুটি দীর্ঘ বাহুর বন্ধনে বেঁধে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর?—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হেডমাস্টার।

তারপর তা আজ আপনারই কাছে নিয়ে এসেছি। আমি দেখেছি স্কুলের অনেক ছেলে সব বই কিনতে পারেনি, কোনো কোনো ছেলে বই ধার করে পড়ে। এই টাকা থেকে আপনি তাদের বই পাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। তারা বই পেয়ে খুশি হবে।

অমিত পকেট থেকে একটি খাম বার করে হেডমাস্টারের হাতে দিয়ে বলল, এর মধ্যে পৌনে দু শ টাকা আছে। আমার সঙ্গে এই যে এরা এসেছে, ক্লাস টেনের সুমন্ত্র, ক্লাস নাইনের প্রবীর আর সন্তোষ, ক্লাস এইটের হেমন্ত, এদের জন্যই এ টাকাটা তোলা গেছে। এবারে আমরা সরস্বতী বন্দনার এই প্ল্যানটাই করেছিলাম। এখন এতে আপনার সমর্থন এবং আশীর্বাদ পেলে আমরা খুশি হব।

হেডমাস্টার স্তম্ভিত। আনন্দে-বিস্ময়ে তাঁর হৃৎপিণ্ড অস্থির হয়ে উঠেছে। এ যেন তাঁর এক নতুন শিক্ষা। তাঁরই ছেলেদের হাতে তাঁর এই সরস্বতী পূজার নতুন পাঠ। সরস্বতী পূজাকে যে এত বড় করে তোলা যায় এ রকম তিনি আগে কখনো ভাবেন নি।

তিনি ওদের সবাইকে এক সঙ্গে দুটি দীর্ঘ বাহুর বন্ধনে বেঁধে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর সমস্ত অন্তরের আশীর্বাদ যেন তাঁর দু'খানা হাতের ভিতর দিয়ে ওদের মনে সঞ্চারিত হতে লাগল। তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা। পুরু চশমার নিচে দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে—মুখে একটি কথা নেই। বলবার ক্ষমতাও নেই।

কিন্তু এই মহিমময় দৃশ্যটি যদু-মধুর দলের কেউ দেখতে পেল না।

হিতবাণী

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ কেবলি ভাবে
পশুরে ছাড়ায়ে যাবে,
মহতের লাগি তার তৃষ্ণা।

জ্ঞানের প্রবাহ ধায়,
ওরে তোরা ছুটে আয়—
তাহারে বিফল হতে দিস্‌না।

জীবনেরে বড়ো কর্‌,—
মরণে মহত্তর,
জয়রোল তোল্‌ যুগশঙ্খে।

এককোলে টেনে আনে
অতীতে বর্তমানে
যে জননী—আয় তার অঙ্কে।

দেশে দেশে অফুরাণ
ঋষি মনীষীর দান
করিতেছে তোদেরি প্রতীক্ষা।

দেবালয়, পশুশালা,—
কোথায় খুলিবি তালা
ভেবে দ্যাখ্‌, কোথা নিবি দীক্ষা।

বিপদে না করি ভয়
সব বাধা কর্‌ জয়,
রত্ন লভিতে হয় যত্নেই।

বড়ো আশা, খোলা মন,
সাধনায় প্রাণপণ,—
জেনে রাখ—ইহা ছাড়া পথ নেই।
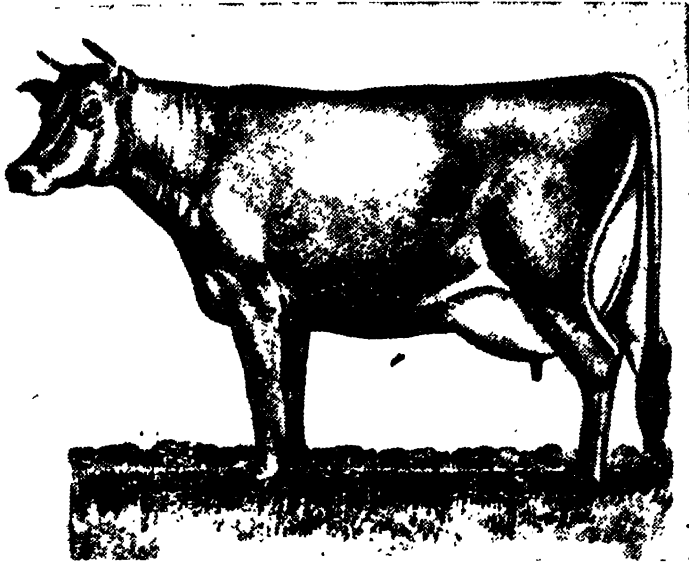
এক বাটি দুধ

'অমরদা'

গল্প আছে, পুরাকালে মিশরের রূপসী রাণী ক্লিওপেট্রা স্নান করতেন দুধে। অপরূপ সুন্দরী ছিলেন ক্লিওপেট্রা। সম্ভবতঃ তিনি মনে করতেন দুধ দিয়ে স্নান করলে গাত্র কোমল থাকবে, বর্ণ উজ্জ্বল হবে—আরো বেশি করে রূপ ফুটে উঠবে। দুধে স্নান করে কী ফল তিনি পেয়েছিলেন তা অবশ্য আমাদের জানা নেই।

সেকালের চেয়ে একালে দুধ অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি এখন দুধ দিয়ে স্নান করার কথা কেউ ভাবে না, স্নান করেও না। সাধারণতঃ দুধের অপব্যবহারও কেউ করে না। ক্লিওপেট্রার সময়ে হয়ত লোকে দুধের সঠিক ব্যবহার জানত না। এখনকার লোক তা জানে, দুধের মূল্য বোঝে,—এখন লোকে দুধ খায়। তোমরাও অনেকেই নিশ্চয় দুধ খাও।

সাধারণতঃ গরু দুধ দেয়। তাছাড়া আছে মোষের দুধ। আবার ছাগলের দুধও আমরা ব্যবহার করি। শিশু ও রোগীর পক্ষে ছাগলের দুধ উপকারী।

কোনো কোনো দেশে আবার গোচারণ ভূমির অভাব আছে; তাই সেখানে গরু নেই। সে সব দেশে অন্যান্য প্রাণীর—যেমন উট, ঘোড়া, বলগা হরিণ, ইয়ক্ বা চামরী গাভী প্রভৃতির দুধ লোকে খায়।

কিন্তু দুধটা বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় গরু থেকে।

তবে, দুধ গরুই দিক কিংবা ছাগল ভেড়াই দিক, আসলে ও বস্তুটা ওদের নিজ নিজ বাছুর বা বাচ্চাদেরই খাওয়ার কথা, মানুষের খাবার জন্যে নয়। কিন্তু আশ্চর্য, ওটা কার্যতঃ ভোগে লাগছে মানুষের। মানুষ বুদ্ধির জোরে অন্যান্য প্রাণীর দুধ নিজের শিশু-সন্তানের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করছে।

যেসকল প্রাণী তাদের বাচ্চাদের জন্যে দুধ দেয়, তাদের বলা হয় স্তন্যপায়ী জীব। এদের রক্ত গরম। ছোট বড় হরেক কিসিমের জীব—ছোট্ট ছুঁচা ইঁদুর থেকে বিরাটাকায় হাতি। কতক প্রাণী আবার বাস করে সমুদ্রে, যেমন, তিমি, শুশুক। আবার স্তন্যপায়ী এমন জীবও আছে যা উড়তে পারে, যেমন বাদুড়।

মানুষও স্তন্যপায়ী জীব।

দুধের মতো উপকারী ও পুষ্টিকর খাদ্য আর নেই বললেই হয়। অবিশ্বাসের কথা নয়। ছোট ছোট বিড়ালছানাগুলো দেখ। জন্মের পর থেকে ওরা দুধ খেয়েই বেঁচে থাকে,—আর সাত-আট দিনের মধ্যেই ওদের ওজন দ্বিগুণ হয়ে যায়। গরুর দুধের চেয়ে বিড়ালের দুধ নাকি বেশি বলকারক।

তা বলে পুষ্টির দিক থেকে গরুর দুধও কম যায় না। এই ধর, এক গ্লাস দুধ,—এতে প্রোটিন আছে এক আউন্সের এক তৃতীয়াংশ, চিনি ও চর্বি জাতীয় বস্তু আছে এক আউন্স; আর আছে শরীর গঠনের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়ম ও ডি ভিটামিন। এত বেশি পরিমাণ খাদ্যগুণ আর কোনো জিনিসে নেই।

মানুষের মতো গরুরও নানা ব্যারাম পীড়া হয়ে থাকে। তাই স্বভাবতই তার দুধের মধ্যে নানা রোগের জীবাণু থাকা সম্ভব। এবং আমরা যেহেতু দুধ খাই আমাদের শরীরে ঐ সকল রোগের জীবাণু প্রবেশ করাটা কিছু অসম্ভব নয়। অবশ্য গরু যারা পালে তারা নজর রাখে, তাছাড়া আছে পশুচিকিৎসক। তা সত্ত্বেও অনেক দেশে বিক্রি করার আগেই সমস্ত দুধ গরম করা হয়ে থাকে ১৪৩° থেকে ১৬০° ফারেনহিট টেম্পারেচার বা তাপে। এই ভাবে গরম করাহে

বলে পাস্তুরাইজেসন। বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের নাম থেকে এই কথাটা এসেছে। এই পাস্তুরাইজেসন করা হয় এক ধরণের মেসিনে। এতে করে সমস্ত জীবাণু ধ্বংস হয়, কোনো রোগের আশঙ্কা থাকে না। আজকাল কলকাতায় যে-বোতল ভরতি দুধ আমরা পাই তাও ঐ ধরণে পাস্তুরাইজ করা। অবশ্য পাড়াগাঁয়ে যে দুধ বিক্রি হয় তা পাস্তুরাইজ করা থাকে না; কিন্তু তা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বেশ করে উনুনে ফুটিয়ে ব্যবহার করা হয়।

দুধ পছন্দ করে না এমন লোকের সংখ্যা কম। বাটি বা গ্লাসে করে দুধ না খেলেও কোন না কোন আকারে কিছুটা তারা খায়-ই। ঐ-যে দুধের তৈরি নানা খাবার সন্দেশ রসগোল্লা, দই ক্ষীর, পুডিং ঘি মাখন, পিঠে পায়স ইত্যাদি? এ সব জিনিস কেউ একেবারে খায় না, এমন নয়। আর চকোলেট? ওটা তৈরি করতেও দুধ লাগে।

তবে কী জানো আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই দুধ খেতে পায় না। উপায় নেই। দেশটা গরিব। ভাতই জোটে না, দুধ খাবে কী করে? তা ছাড়া এত প্রচুর দুধও পাওয়া যায় না যে দেশের প্রতিটি লোক খেতে পাবে।

য়ুরোপ, আমেরিকার লোক প্রচুর দুধ খায়। ইংলণ্ডে তো প্রত্যহ প্রতিটি লোকের জন্যে এক পাইণ্ট হিসাবে গরুর দুধ যোগানো হয়। আমাদের দেশে তা সম্ভব হবে কবে?

॥ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যার মৌচাকে যাঁরা লিখছেন ॥

বহু খ্যাতনামা লেখক-লেখিকার লেখা বর্তমান বৈশাখ-সংখ্যায় আমরা ছাপতে পারিনি, আগামী জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশিত হবে। এই লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আছেন—

বনফুল, স্বপনবুড়ো, পুষ্প বসু, ধীরেন্দ্রলাল ধর, অশোক গুহ, ভবানী মুখোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল চক্রবর্তী প্রভৃতি।

গাঁয়ের ডাক

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ইঁটের শহর এই ক'ল্‌কাতা,—
হেথা স্নেহ-মায়া নাই ;—
শুধু গাড়ি-বাড়ি, মানুষের সারি ;—
ভালো লাগে কিরে ভাই ?
ভুলে গেছি সেই খালে-বিলে নাওয়া,
কোথা প্রাণ খুলে মেঠো গান গাওয়া !
নেই ঘাটে-বাটে অকারণ ধাওয়া,—
এ কি বেঁচে থাকা—ছাই !

নোংরা বিশ্রী সরু এঁদো গলি
যাই ছেড়ে যাই চল্‌—
কাঁচা রোদে যেথা আকাশের মুখ
করে সদা ঝলমল্‌ !
চাঁপা-চামেলির আতর মাখিয়া
বাতাস যেথায় যায় ডাক দিয়া ;
নোনাগাছে সোনা, আতাগাছে তোতা
যেইখানে গেলে পাই ।

ভালো লাগে না এ 'ট্রাম' আর 'বাস',
ঘরঘর, বন্‌বন্‌ ;—
খড়ের কুঁড়েটি—তারি লেগে ভাই,
সারা বেলা কাঁদে মন !
মাটির আঙিনা, খেজুরের পাটি,
পুঁইলতা-ছাওয়া বাঁশের মাচাটি,
ফণীমনসায় ঢাকা পথখানি
ডাকে যেন একজাই !

চল্‌ যাই গাঁয় যেথা সন্ধ্যায়
শোলোক শোনার ধুম,
স্বপন-পরীর পাখার হাওয়ায়
চোখ যেথা ঘুম্‌-ঘুম্‌ ;—
লুটি চল্‌ সেই গাঁয়ের ধুলায়,
জুটি চল্‌ সেই অশথের ছায় ;
শহর—নাকি এ সাহারায় আছি
ভাবি মনে আমি তাই !

ছানি কাটা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

'শুধোই ব্যাপার কি—আবার হাটে চলেছেন যে?'

মৃত্যুঞ্জয় বাবু নাম সার্থক করেছেন। বিরাশি বৎসর পূর্বে তাঁর পিতামাতা যখন মহাদেবকে স্মরণ করে পুত্রের নাম মৃত্যুঞ্জয় রেখেছিলেন, তখন বাঙালীর গড় পরমায়ু ছিল বাইশ বৎসর।

ইনি আমাদের পড়শী, তাই নিত্য দেখা হয়। ধুতি মালকোচা মারা, গায়ে খাকি কাপড়ের শার্ট, মাথায় শোলার টুপি। সকালে, দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় সাইকেল চড়ে চলেছেন এ-বাড়ি সে-বাড়ি—সবার খোঁজ-খবর নিয়ে বেড়ান। হাটে ও বাজারে যেতে তাঁর ক্লান্তি নেই। শাকসব্জী তরিতরকারি কিনে দিয়েই ছুটলেন আবার। শুধোই, ব্যাপার কি—আবার হাটে চলেছেন যে? বলেন, 'দেখে এলাম বিরাট বোয়াল মাছ এসেছে তখনও কাটা হয়নি। কয়ে এসেছি—একটা ভাগ রাখবার লাগি। তাই চলচি।' দশটার সময় চলেছেন, দুধের টিন ঝুলিয়ে। শুধোই, 'দুধ নিয়ে কোথায় চললেন এই রোদ্দুরে।' উত্তরে বললেন, 'রোদ্দুর! এখন তো আমার সকাল! দুধটা দিতে এলুলাম সুধে-খুদের বাড়িতে,—শুনলাম তাদের গোয়ালাটা দুধ নিয়ে আসেনি। দিয়ে আসি সট্ করে।'

ইদানীং দুঃখ করে বলেন, 'একটু চোখে কম দেখছি। সন্ধ্যার পর পড়তে পারিনে।' একটু না—বেশ কম দেখেন। সেদিন মমতা বলছে, 'জ্যেঠামশায় আজকাল খুব কম দেখেন—

পাঁচ হাত তফাতে আমাকে দেখে চিনতে পারেন না। তবে আমার খাড়াই ও বহরটা দেখছেন বহুকাল থেকে তাই আন্দাজেই হঁকে কথা বলেন।'

রাস্তায় আজকাল বেশ ভিড়—গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে। তাছাড়া পথের মাঝে তিন-চারজন সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করেন, সাইকেলে বেল দিলে নড়েন না—এ অভ্যাসটা বেড়েই চলেছে। পাছে ধাক্কা খান, তাই মেয়েরা বাবাকে বলে, 'বাবা, সাইকেল চড়াটা ছাড়ো, কবে কি বিপদ হবে।' সাইকেল ছাড়ার কথা প্রায়ই শোনেন; তাই ক্ষেপে উঠে বলেন, 'ত'রা আমারে মারতে চাস্। মোটর চাপা যদি কপালে লেখা থাকে, তো ঘরে বইসা থাকলেও মোটর চাপা পড়ুম। কাগজে দেখ নি—বেচারারা ফুটপাথে চট্ পেতে ঘুমুচ্ছে—হুড়মুড়িয়ে মোটর ট্রাক্ পথ ছেড়ে ফুটপাথে উঠে মানুষ কভারে চাপা দিল! অদৃষ্ট না হইলে অমনটা ঘটতে পারে?…আমি এই ঘুইরা বেড়াই বইলাই না এখনো টিকে আছি।' মেয়েরা বলে, 'বাবা চোখটা একবার ডাক্তার মণ্ডলকে দেখাও না, ওঁর তো বেশ নামযশ হয়েছে। সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে এখানে ক্লিনিক খুলেছেন। প্রফুল্ল কাকা তো লাঠি নিয়ে হাঁটতেন চোখ কাটাবার পর কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছেন।' মৃত্যুঞ্জয় বাবুর এ সব কথা সহ্য হয় না; রেগে গিয়ে বলেন, 'হ—ডাক্তারদের হাতে শেষকালে প্রাণটা দিই আর কি?' গিন্নী ঘর থেকে বলে ওঠেন, তোমার কপালে গো-বৈদ্যির চিকিৎসা আছে—রাতদিন তো গরু আর গরু কইরাই দেহটা পাত করছো? ছেলেমেয়েদের কথা শুনবা না—আমার কথা বাদই দিলাম।' মৃত্যুঞ্জয় বাবু কোন কথা না-বলেই সে-স্থান ত্যাগ করলেন, অবশ্য সাইকেল চড়েই।

ছেলে এসেছে ছুটি নিয়ে অনেক দিন পরে। বাপের খবর সবই রাখে—বোনেরা প্রত্যেকটি কথা জানায় দাদা-বৌদিদিকে। ছেলে এসেই বুঝলো বাপের চোখ বেশ খারাপ হয়েছে গত এক বৎসরের মধ্যে। অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ডাক্তার মণ্ডলের বাড়ি নিয়ে চললেন। মণ্ডলের বাসা ও ক্লিনিক দোতলায়—নিচে ডিস্পেন্সারি। সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে—চোখ যে খারাপ হয়েছে তা ধরা পড়তে সময় লাগলো না। আলোর তলায় বসিয়েই ডাক্তার মণ্ডল বললেন, 'সামনের শীতে বাঁ চোখটার ছানি কাটিয়ে ফেলুন। আজকাল ছানি কাটা ফোড়া কাটার মত সহজ ব্যাপার। কয়দিন যা চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে। কয়টা দিন সাইকেল চড়া হবে না—তারপর নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবেন।' মৃত্যুঞ্জয় বাবু কোন কথা না বলে বেরিয়ে এসেই ছেলেকে বললেন, 'তুই আইসাই তো যত গণ্ডগোলটা পাকাইয়া তুললি! ছানি কাটাও, ছানি কাটাও—আরে মাগনা করবে? এক রাস টাকা চাইবা না? সে খেয়াল রাখস্?' ছেলে হেসে বলে, 'বাবা, সে ভাবনা তোমার কেন? আমরাও বেকার নই; তুমিও অনাথ নও। তোমারও তো পেনশন আছে।' মৃত্যুঞ্জয় বাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'হইছে।

ছয়খানা রিক্‌শ কিনছি দেখস্‌ না।··ভাবলাম টাকাটা উইঠা আসবে। কিন্তু বেটারা দিন দিন তো ভাড়া মেটাবে না; চাইলে বলে কাজ বড় মন্দা। মেলার সময় সব শোধ করবো।··· তিন বেটা তো নিখোঁজ—একটা তো রিক্‌শ নিয়েই ভেগেছিল—ধরা পড়ে জেল খাটছে।'

ছেলে বলে, 'বাবা, ও ব্যবসাটা না করলেও সংসার চলবে। মিনু বলছিল, তিন মাসে গাড়িগুলোর মেরামতিতে তিন শ' টাকা খরচ হয়েছে—লাভের কথা তো দূরের কথা। তাই বলছি, ওটা বাদ দাও।'

মৃত্যুঞ্জয় বাবু বললেন, 'ত'রা বুঝবি না। সারাদিন করুম কি? দৈনিক কাগজের মায় বিজ্ঞাপন পর্যন্ত মুখস্থ হয়ে যায়—তারপর? এই রিক্‌শগুলো আছে তাই বকাঝকা করে দিনটা কাটে এক রকম। আর ঐ গরু কয়টা আছে—তাতে সবারই আপত্তি! কেন রে বাপু, কোনদিন ছানি কাটতে বলেছি, জেউলি সিজুতে ডেকেছি? কৈলাস না আসলে আমিই তো সব করি—গোবর কাড়ি, বিচালি কাটি সব। তাতে অ'দের আপত্তি কেন? অমন দুধ পাবা! কলকাতায় বলে কিনা 'টোন্‌ মিল্ক' খাও। গাঁয়ে জল মেশানো দুধ খাইলাই দোষ! বলে কিনা খাঁটি দুধ হজম হয় না—তাই তাকে 'টোন্‌' করে! তোমরা খাও গে 'টোন্‌ মিল্ক'। এই খাটি বলেই না, খাঁটি দুধটা পাই—আর তাই তো বিরাশী বৎসর বয়সেও সাইকেলে ঘুরি। আর ত'রা বলিস্‌ কিনা সাইকেলে চাইপো না, গরু ঘুচায়ে দাও, রিক্‌শ বিকায়ে দাও! ছানি কাইট্টা অন্ধ হয়ে ঘরে বসুম! এই না চাও? সারাদিন করুম কি কও তো?'

মৃত্যুঞ্জয় বাবুর মেজাজটা ভাল আছে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চা খেতে খেতে গল্পে গল্পে বলছেন, "বর্মার কথা ত'দের মনে আছে কিছু? সে দেশে পঁয়ত্রিশ বৎসর ছিলাম। উত্তর বর্মা, দক্ষিণ বর্মার এমন শহর নেই যেখানে মৃত্যুঞ্জয় সরকার ওভারশিয়ারী না করছে। হাচিনসন সাহেব ছিল আমাদের ইঞ্জিনীয়ার—তখন আমি মান্দালয়ে। হাচিনসন খাস ইংরেজ— ডালকুত্তার মতো চেহারা—স্বভাবটাও তেমনি; সবাই ডরাতো—কারও সঙ্গে হেসে কথা বলতো না। সবার কাজেই খুঁত ধইরা অপদস্থ করতো। আমার কাজে খুঁত পাইতো না। আরে, আমি তো বরিশালের বাঙাল—আমি মনে মনে কইতাম—'তুমি বাঙালকে জব্দ করবা' তাই আমি কাজ ঘুরে ঘুরে দেখতাম—সাইকেলের উপরই থাকতাম। কণ্ট্রাকটাররা যমের মতো ডরাতো।···আরে ঘুইরে-ঘুইরে কাজ দেখবার জন্যই তো টাকা দিচ্ছে! আর আমি আপিসে বইসা বড়বাবুর তোয়াজ করুম?' হাচিন্‌সন সাহেবের মেজাজটা সেদিন ভাল ছিল, আমায় বলে, 'সরকার, তোমার সাইকেলে একটা মিটার লাগিয়ে নাও, দেখবো কত মাইল রোজ তুমি টহল দাও।' আমি বললাম, 'কী সাহেব—টি, এ বিল দেখে ভাবছ, না ঘুইরাই বিল্‌ করছি।

বরিশালের লোক আমি—ভগবান সরকারের ছেলে, ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র, ও পথে আমরা কখন যাই না।'

সুকুমার বললো, 'বাবা একদিনের কথা একটু মনে আছে। আমরা তখন ইনানজঙে—পেট্রোলিয়ামের 'ডেরিক' বসছে। একদিন সকালে তুমি বের হয়ে গেলে, ফিরলে রাতে। আমাদের কী উদ্বেগ—মা ঘর-বার করছেন।'

মৃত্যুঞ্জয় বাবু বললেন, 'হ, মনে পড়ছে। ইনানজঙ থেকে চৌ-এর দিকে একটা সাঁকো হচ্ছে। হঠাৎ যে আমি অত ভোরে হাজির হবো তা সিন্ধী কণ্ট্রাকটার ভাবতে পারেনি। ড্রয়িং, স্পেসিফিকেশনের সঙ্গে কাজ মিলাইয়ে দেখি—তারা পুকুর-চুরির ব্যবস্থা করছে। দাঁড়িয়ে সব ভাঙলাম—ফিরে সব গাঁথালাম—তারপর বাড়ি ফিরি অনেক রাতে। হাচিন্‌সন সাহেবকে জানালাম—সাহেব তো খুব খুশি।...কিন্তু এতো তো খাটলাম—পাইলাম কি? দেশে আইসা ঘর বানালাম, সোনার বাংলায়; তারপর সে ঘর দু'বার ছাইড়া বের হলাম!'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর হঠাৎ শুধোন, 'হাঁ রে সুকু, ডাক্তার মণ্ডল ত'রে কি কইলো পরে? নিশ্চয়ই ছানি কাটার কথা জোর দিয়ে বলছে?

অতগুলো টাকা খামকা নষ্ট করুম না—। জানস্ না রিকশর হুড্ বানাতে হবে, আর কৈলাস কইছিলো গরুর খড় নেই। শুনচিস্ এবার খড়ের দামটা কি?' সুকু হেসে বললে, 'আমি থাকি ভিলাই ইস্পাত কারখানায়। লোহার দর বলতে পারি। আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর কি রাখে? তোমার খড়ের খবর আমার জানা সম্ভব নয়, আর জেনেই বা কি হবে? তুমি তো আমাদের কথা শুনবে না!'

মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'রাখ তোমার ইস্পাত, সিমেণ্টের কথা। কী খোশামোদীটাই করছি কন্‌ট্রোলে লোহা সিমেণ্ট পাবার জন্য। উত্যক্ত হয়েই না খড়ের ঘর বানালাম। তিন মাসের মধ্যে ঘর বানিয়ে উইঠে এলাম। খড় তো আমার ইজ্জত রক্ষা করেছে—তা না হলে বাড়িওয়ালার হাঙ্গরের হা আমাদের গিলে খেতো না। প্রতি মাসে বলে, ভাড়া বাড়ান—নয় ঘর ছাড়ুন। ভাবছিলো সামনে বর্ষাকাল আমায় জব্দ করবে। অরে বাড়িওয়ালা ভুলে গিয়েছিল বরিশালের বাঙাল আমি। বর্ষার মুখে এ বাড়ি এলাম সকলে হৈ হৈ করলো! কারও কথা শুনচি? অর আজ ত'রা বলছিস রিকশা বিক্রি কইরা দাও, গরু ঘুচাও। অর তার পরে সাইকেলটা ছাড়ো। বলতো করুম কি তখন?'

মাস তিন চার কেটে গেছে। মৃত্যুঞ্জয় বাবু ক্রমেই ঝাপসা দেখছেন চোখে—কিন্তু কবুলও করেন না, সাইকেলও ছাড়েন না। ছেলেমেয়েরা এবার একযোগে বাবাকে আলটিমেটাম্ দিয়ে

লিখলো—'তোমার ছানি কাটার টাকা পাঠালাম। এই শীতে নিশ্চয়ই ছানি কাটার ব্যবস্থা করবে। খবর পেলেই আমরা যাব।'

টাকা পেয়ে মৃত্যুঞ্জয় বাবু ডাকলেন কৈলাসকে। 'অ কৈলাস, অ কৈলাস—শুনছ, পোলারা টাকা পাঠাইছে। তুই না সেদিন কইছিলি খড় ফুরাইছে। যা এই টাকা লইয়া খোরসেদদের ঘর হইত্যা এক কাহন খড় কিইনা আন—গাড়ি করে পাঠাইয়া যেন দেয়।...

'খড় আইনাই ছানিকাট—গরুগুলো দু'দিন ছানি-পানি মুখে করেনি। আমি লিখে দিচ্ছি পোলাদের 'ছানি কাটা' সুরু হয়েছে—ব্যস্ত হয়ো না।' কৈলাস পুরানো চাকর, হেসে কয়, 'কর্তা, সুকুবাবু টাকা পাঠালে আপনার ছানি কাটার জন্য, আর আপনি কিনা সেই টাকা দিয়ে গরুর জন্য ছানি কাটার ব্যবস্থা করলেন! ছেলে বাবুরা গোসা করবে না?'

'আরে পোলাপনদের কথা রাইখা দে। অরা যেন সব বোঝে? কৈলাস, গরুর জন্ত ছানি কাটা হয় বইলাই তো ভালো দুধটা পাই, আর ভাল দুধটা খাই বইলাই তো এই বিরাশি বৎসর বয়সে সাইকেল চড়ে প্রতিদিন দশ-পনেরো মাইল ঘুরি।...রাখ অ'দের কথা। ছানি কাটাতে বলছে—আমি লিখবো, 'হ ছানি কাটাচ্ছি কৈলাসকে দিয়ে, ত'মার মণ্ডলকে দিয়ে নয়!'

বৈশাখ

শ্রীআশীষকুমার গুপ্ত

বৈশাখ দিলো ডাক চিত্তে আজি
দিলো তার উপহার বিত্তরাজি।
প্রচণ্ড খরতায় দগ্ধ মরু
নিষ্ঠুর রৌদ্রে যে শুষ্ক তরু।
ওরে তোরা জল আন্ ঢাল্ রে বারি
একবার দেখা যাক জিতি কি হারি।

জীবন শুকায়ে যদি হয় রে মরু
আমরা ফোটাবো ফুল বাঁচাবো তরু।
মেঘের আড়ালে যদি রৌদ্র হাসে,
আমরা দাঁড়াবো গিয়ে তাহার পাশে।
বৈশাখ দেয় ডাক চিত্তে আজি,
লব তার উপহার বিত্তরাজি।

খাজুরাহো

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

খাজুরাহো—জৈন-মন্দির

জায়গাটা কলকাতা থেকে এমন বেশি দূর নয়—এলাহাবাদ থেকে একশো মাইলের সামান্য কিছু বেশি,—বোম্বাই মেলে মাত্র উনিশ-কুড়ি ঘণ্টার পথ। অবশ্য এটা রেললাইনের হিসাব, তারপরে আরও একাত্তর মাইল যেতে হবে বাস-এ—অর্থাৎ আরও পাঁচ ঘণ্টা। অহোরাত্রি নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা। পথ পীচ-বাঁধানো মসৃণ—যদিও মাঝখানে দুটো পাহাড় আর একটা নদী পড়বে। বাসের কোলে বসে দোলা খেতে খেতে একবারও মনে হবে না—দুরারোহ, দুরতিক্রম্য, দুর্গম কোন স্থানে চলেছি। বৈচিত্র্য হিসাবে চমৎকার লাগবে পথযাত্রা! আর জায়গাটা? শহর নয় মোটেই—বেশ শান্ত নিরিবিলি; মাঠ বন এবং খুব দূরে ধোঁয়ার মত পাহাড়ের বেড়া ঘেরা মনোরম একটি স্থান। আধুনিক বিজ্ঞানের সামান্য ছোঁয়া আছে—কিন্তু তার চেয়ে বেশি করে জমে আছে মধ্যযুগের কুয়াশা। রাত নামলে সেই কুয়াশা আরও কম হয়—ইতিহাসের পাতা থেকে বার হয়েআসে গল্পগুলি—ভারতবর্ষের হাজার বছর আগেকার একটি চেহারা আবছা ফুঠে ওঠে।

জায়গাটার নামও অদ্ভুত, খাজুরাহো। মনে হবে খেজুর বনের মধ্যে একটি জায়গা। এটি অনুমান নয়—সত্যিই এক সময় খেজুর গাছে ভরা ছিল জায়গাটা। এখনও পথের আশেপাশে অনেক খেজুর গাছ চোখে পড়বে। জায়গাটা কিন্তু গাছের জন্যই বিখ্যাত নয়—বিখ্যাত মন্দিরের জন্য। একটি-দুটি মন্দির নয়—হাতের আঙুলে গোনা যায় না—এত মন্দির ছিল এক সময়—এখনও যা আছ—তার সংখ্যাও মন্দ নয়। এই সব মন্দির আবার যেমন-তেমন

করে তৈরী নয়—আগাগোড়া শিল্প-কাজে ভরা! ওই অদ্ভুত শিল্প-কাজের ভিতর দিয়েই ভারতবর্ষের ইতিহাসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হাজার বছর আগেকার ইতিহাস। সেই প্রাচীন কালের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চেহারা তারই মধ্যে জ্বল জ্বল করছে। দেশ-দেশান্তর থেকে যাত্রীরা আসে সেই সব লেখা পড়তে—সেই সৌন্দর্য উপভোগ করতে।

মধ্য ভারতের চান্দেল্ল রাজাদের আমলে তৈরী হয়েছিল মন্দিরগুলো। এক বছর বা দু'দশ বছর ধরে নয়—শতাব্দীর হিসাব রয়েছে নির্মাণকালের মধ্যে। রাজারা ছিলেন হিন্দু। উদার মতাবলম্বী। হিন্দুধর্মের কোন একটি শাখায় নিজেদের ধর্ম-চরিত্রকে সংকীর্ণ করে রাখেন নি। শিব দুর্গা সূর্য বিষ্ণু গণেশ সব দেবদেবীই স্থান পেয়েছেন মন্দিরের গায়ে—মন্দিরের ভিতরে। আবার জৈনরাও তাঁদের তীর্থংকরদের মূর্তিগুলিকে বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আলাদা আলাদা মন্দিরে। খাজুরাহোর দুই ভাগে (পূর্ব ও পশ্চিম) ভাগ করা মন্দিরগুলি এর দৃষ্টান্ত।

এত সুন্দর সুন্দর মন্দির যেখানে—সে জায়গাটা নিশ্চয় অখ্যাত একটি গ্রাম ছিল না। এক সময়ে ধনজনসমৃদ্ধ নগরীই ছিল। আর সেই খ্যাতি-বৈভবই টেনে এনেছিল বিধর্মী মূর্তি-দ্বেষীদের—যারা তরবারির আগায় ধর্ম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতো। তাদের অত্যাচারে জনপদ ধ্বংস হয়েছিল—মন্দিরগুলি ভগ্ন ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল—দেবদেবীরা স্থানচ্যুত, মহিমাচ্যুত হয়েছিল। কিন্তু রাজাদের কীর্তিকলাপ নিশ্চিহ্ন হয়নি। হয়নি, কারণ মন্দির ছিল অসংখ্য আর শক্ত পাথর দিয়ে মজবুত করে গাঁথা। তৈরী করতে যেমন দীর্ঘকাল লেগেছিল—ভাঙতেও তেমনি শ্রম, শক্তি ও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল। তত সময় ধর্মদ্বেষীদের হাতে ছিল না বলেই আজও কিছু মন্দির অভগ্ন শিল্প-মহিমায় সমুজ্জ্বল রয়েছে। সরকার এগুলির রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন—ভাল করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছেন জায়গাটাকে। দুটো প্রাসাদ-তুল্য বিশ্রামালয় করে দিয়েছেন যাত্রীদের জন্যে। দেশ-বিদেশ থেকে যাত্রীও আসছে হাজার হাজার। সেই প্রয়োজনে আরও কয়েকটি হোটেল জন্মলাভ করেছে—কিছু খাবার দোকান, চায়ের দোকান—টুকিটাকি জিনিসপত্রের দোকান দেখা যাচ্ছে। চা, দুধ, পুরি, মিটাই—মোট কথা দু'একটি দিনের খাদ্য পানীয়ের জন্য ভাবনা বিশেষ নাই। মাথা গুঁজবার ঠাঁই মিলবে—ছত্তরপুরের রাজাদের ঠাকুর-বাড়িতে—সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে। সরকারী অতিথিশালা, হোটেল এগুলি তো আছেই।

হাওড়া থেকে বোম্বাই মেলে চেপে ভায়া এলাহাবাদ হয়ে নামতে হবে সাতনা ষ্টেশনে। জায়গাটা বেশ বড়। ইস্কুল কলেজ হাসপাতাল ধর্মশালা ও দোকান-পসারে ভারী জমজমাট শহর।

ষ্টেশনে নেমে অসুবিধা হলে এখানে একট দিন থাকা চলে। বাধ্য হয়ে থাকতেও হয়—যেহেতু সারাদিনে এখান থেকে একখানি মাত্র বাস সরাসরি যায় খাজুরাহোয়। আবার সে বাসখানা ছাড়ে ভোর বেলায়—ছ'টা সাড়ে ছ'টায়। আরও কয়েকখানি বাস অবশ্য পাওয়া যায়। সেগুলো বদল করতে হয় পান্না বলে একটা বড় শহরে এসে। তারপরে খাজুরাহোর সাত মাইল আগে আরও একবার বাস বদলের ব্যাপার আছে। এতে সময়ও লাগে বেশ খানিকটা। অতএব তেমন-তেমন হলে সাতনায় একটা দিন কাটিয়ে গেলে মন্দ কি! তাতে আরও একটা সুবিধা, ভোর বেলার বাসে গিয়ে বিকেল বেলায় ওই ফিরতি বাসেই ফিরে আসা চলে। তিন চার ঘণ্টার মধ্যে ওখানকার দ্রষ্টব্য মন্দিরগুলি দেখে নেওয়া যায়।

মূল মন্দিরগুলি তো বাস স্ট্যাণ্ডের গায়েই। সেইখানে গোটা সাতেক মন্দিরকে ঘিরে নিয়ে একটি সুন্দর ফুলের বাগান তৈরী করেছেন সরকার। প্রবেশ মূল্য দশ পয়সা। এগুলিকে বলা হয় পশ্চিম দিকের মন্দির। হিন্দু দেবদেবীর মন্দির। এরই কাছে-পিঠে হোটেল, রেস্তোরাঁ, সরকারী বিশ্রামালয়, দোকান-পসার ইত্যাদি। মাত্র দু'ফার্লঙের সীমানায় ঘণ্টা দুই ঘুরলে মোটা-মুটি মন্দির দর্শন হয়ে যাবে।

আরও কয়েকটি মন্দির আছে পূর্ব ধারে—পাঁচ ফার্লং দূরে। সেগুলি জৈন মন্দির। আদিনাথ, মহাবীর প্রভৃতি জৈন তীর্থংকররা সেই মন্দিরের দেবতা। মন্দিরের গায়ে কারুকার্য আছে বটে, তবে হিন্দু মন্দিরের মত অমন উৎকৃষ্ট আর অজস্র নয়। কাজেই এগুলি দেখতে খুব বেশি সময় লাগে না। দু'দিকের মন্দির দেখে সামান্যক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে অনায়াসে ফিরে আসা যায় সাতনায়।

সাতনা থেকে পান্না পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ মাইল পথটায় তেমন বৈচিত্র্য নেই,—তারপর সুরু হয়েছে পাহাড়। দুটো পাহাড় ভেদ করে একটা চওড়া নদীর পুল পার হয়ে, খানিকটা বনের মধ্যে দিয়ে চলে—পথটা রমণীয় বলে মনে হয়। তারপর খাজুরাহোর বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে একটা মস্তবড় সরোবরকেও দেখতে ভাল লাগে। তারপর ফুলবাগানের মধ্যে দেব-মন্দির।

যত বিস্ময় এই মন্দির সীমানায় জমা হয়ে আছে। ডান দিক থেকে পরিক্রমা সুরু করলে প্রথমেই পড়বে পার্বতী আর বিশ্বনাথের মন্দির। একতলা সমান উঁচু চাতালের উপর মন্দির। পাথর দিয়ে বাঁধানো—আর সেই পাথরে নানান শিল্প-কর্ম। নক্সার কাজগুলো কত মোলায়েম—আর মূর্তিগুলোর কত না ভাব-ভঙ্গি! শোয়া বসা দাঁড়ানো—নৃত্যরত নানা ভঙ্গির মূর্তি। পরিপাটি করে চুল বেঁধে—অষ্ট অঙ্গে অলংকার চাপিয়ে, চমৎকার ভঙ্গিতে বেশ-বিন্যাস করে শ্রীমতী মেয়েরা রয়েছে দেওয়াল জুড়ে। পুরুষদের কেয়ূর কুণ্ডল অঙ্গদ প্রভৃতি অলংকারে

খাজুরাহো—কাণ্ডারীয় মন্দির

শোভিত বীর্যবন্ত মূর্তিও তার পাশেপাশে। কত পুরাণের গল্প-কথা—যুদ্ধ যাত্রার ছবি, গজ বাজী রথ পতাকা শোভিত চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীর মিছিল, ক্রোধোন্মত্ত তক্ষ, সংগীত-নিপুণ গন্ধর্ব, নৃত্যরতা বরাঙ্গনা··· অসংখ্য অসংখ্য ছবি। এই মন্দির তৈরী হয়েছিল খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে।

বিশ্বনাথ মন্দিরের পশ্চিম কোণে চিত্রগুপ্তের মন্দির। ওই সারির মাঝখানে জগদম্বী আর শেষ প্রান্তে কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দির।

খাজুরাহোর সব চেয়ে বড় আর সব চেয়ে শিল্প-সমৃদ্ধ মন্দির হ'ল কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির। দূর থেকে দেখলে মনে হবে বহু চূড়ার একখানা রথ। অর্ধমণ্ডপ মণ্ডপ অন্তরাল গর্ভগৃহ প্রায় সব মন্দিরেরই আছে। এই মন্দির দেখলে পুরী, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের কথা মনে হবে। গড়নটা সেই ধরণের—শিল্পকর্মের সাদৃশ্যেও। তবে শিল্প ধারাটা কোন্‌টার থেকে কোন্ দিকে এগিয়েছে, সে বিচার পণ্ডিতজনেরা করতে পারবেন।

কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দিরের পর বড় মন্দির হ'ল লক্ষ্মণ মন্দির। বিশ্বনাথ মন্দিরের কথা আগেই বলেছি। এবার পশ্চিম থেকে পূবে ঘুরে এলে আরও দুটি মন্দির মিলবে। মহালক্ষ্মী আর বরাহ-মন্দির। মন্দির দুটি ছোট। বরাহ-মূর্তিটি আশ্চর্য শিল্প-সৃষ্টি। অখণ্ড একখানা পাথর কেটে তৈরী হয়েছে এই বিশাল মূর্তিটি—তার গায়ে ভাঁজে ভাঁজে ছোট ছোট মূর্তি উৎকীর্ণ করে পুরাণের কয়েকটি কাহিনী বলা হয়েছে। মাত্র দু'তিন ফার্লঙের নাগালে চমৎকার একটি ফুলবাগানের মাঝখানে রয়েছে এই মন্দিরগুলি। মন্দির ভাঙাচোরা নয়—শিল্পকর্মে দেবদ্বেষীর নিষ্ঠুর হাত পড়েনি—দেখলে মনে হবে না এক হাজার বছরের নিদারুণ কালস্রোত ব'য়ে গেছে এদের উপর দিয়ে। দশ বিশ পঞ্চাশ বছরের আগেকার জিনিস বলে মনে হবে!

তবে কোন কোন মন্দিরের মধ্যে দেবদেবী নেই। দেবদেবী যাঁরা আছেন, তাঁরাও পূজা পান না,—যে হেতু বিধর্মীর হাতে লাঞ্ছিত হয়ে তাঁরা আজ পতিত।

নিত্য পূজা পান এই উদ্যানের পাশে বেড়ার বাইরে মতঙ্গেশ্বর মহাদেব। এমন উঁচু বৃহৎ শিবলিঙ্গ ভারতবর্ষে অল্পই আছে। একতলা সমান বেদীর উপর উঠেও মহাদেবের মাথায় ফুল জল ঢালা যায় না—এমনই উঁচু সেই মূর্তি।

এই মন্দিরের পাশেই আছে খোলা আঙ্গিনার সংগ্রহশালা। এটি পুরাতত্ত্ব-বিভাগের কীর্তি। খাজুরাহোর সীমানার ভগ্ন মন্দিরগুলি থেকে অহৃত হয়েছে বহু শিল্প-কীর্তি— ; ছোট বড় মাঝারি অসংখ্য মূর্তি, মন্দিরের দেয়াল বিমান অলিন্দ প্রভৃতির টুকরো হাজার বছর আগেকার হিন্দু-ভারতের জীবনধারা ও শিল্প-চর্চার অভ্রান্ত প্রমাণ। পুরাতত্ত্ব-বিভাগ এইগুলিকে চমৎকার ভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছেন। এসব দেখতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। আর এসব দেখে আনন্দও পাওয়া যায় প্রচুর !

কবি

শ্রীমতী শান্তি বসু

রাঙা মাটির দেশে কবি
বাঁধিলে কুটীর,
পাঠশালা এক গড়লে সেথা
ছায়া সুনিবিড়।

শিশু ভোলানাথের মাঝে
শিশু হয়ে, ছিলে
তোমার ভালবাসার ফাঁদে
তারা ধরা দিলে।

পদ্মবিলের সাথে ছিল
তোমার মিতালি,
ভাঙত ঘুম, নিত্য শুনে
পাখীর কাকলি।

মনটি নাকি, উধাও তোমার
হ'ত, চাঁদের দেশে,
শাদা মেঘের ভেলায় চড়ে
বেড়াতে যে ভেসে।

লিখলে কত গল্প-ছড়া
তুমি মোদের তরে
যতই পড়ি আনন্দেতে
মন যে ওঠে ভ'রে।

বিচিত্র-সংবাদ

শিশুদের বেশী খাওয়ানোর কুফল

পশ্চিম জার্মানীর শিশু-চিকিৎসক ডাক্তার ই. বিকেলের মতে শিশুর জীবনের প্রথম বছরেই তার বৃদ্ধির নানাবিধ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বয়স অনুযায়ী যেসব শিশুর ওজন ও উচ্চতা স্বাভাবিক অথবা স্বাভাবিক অপেক্ষাও বেশি, তাদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে

ছোট শিশুদের আজকাল খুব বেশি পরিমাণে মিষ্টি খাবারদাবার খাইয়ে তাড়াতাড়ি হৃষ্টপুষ্ট ক'রে তোলার চেষ্টা করা হয়। এ সব খাবারে শুধু কার্বোহাইড্রেট থাকে, প্রোটিন মোটেই থাকে না। এর ফলে শিশুর শরীরে তরল পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায় ও তাকে ফোলা ফেলা দেখায়। ডাক্তার বিকেলের মতে এ সব শিশুদের রিকেট ও রক্তশূন্যতা রোগের আশঙ্কা খুব বেশি এবং রোগ-প্রতিরোধের শক্তিও খুব কম।

শিশুকে খুব খাইয়ে-দাইয়ে তাড়াতাড়ি ওজন বাড়াতে গেলে অন্যান্য অভাব দেখা দিতে শুরু করে এবং ভিটামিন 'ডি'-র অভাব অন্যতম। এখন দেখা যাচ্ছে ভালো খাওয়ানোর দরুণ যে সব শিশুর দৈহিক উন্নতি দ্রুততর করে তোলা হয়, তাদেরই রিকেট রোগ হয় খুব বেশি। এদের রিকেট রোগ ঠেকাতে হলে তাড়াতাড়ি ভিটামিন'ডি' খাইয়ে চিকিৎসা শুরু করা উচিৎ। চারমাস বয়স থেকেই শিশুকে ভিটামিন 'ডি' খাইয়ে চিকিৎসা শুরু করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

এ ছাড়া পুষ্টিজনিত অভাবে শিশুরা আরেক রোগে ভোগে যার নাম কার্ভি। সময় সময় এই রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। সেজন্য ডাক্তার বিকেল পরামর্শ দিয়েছেন যে, পাঁচ ছয় সপ্তাহ বয়স থেকেই ভিটামিন 'সি'-র অভাব পূরণ করার জন্য শিশুদের তাজা সব্জি ও ফলের রস খাওয়ানো প্রয়োজন।

কৃত্রিম সুতো থেকে তৈরি 'ফার'

পশুলোম অর্থাৎ 'ফার' দিয়ে তৈরী পোশাক-পরিচ্ছদ য়ুরোপে খুবই জনপ্রিয়, কিন্তু আসল ফার দিয়ে তৈরী জামা-কাপড় কেনা আজকাল সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। সুতরাং কৃত্রিম সুতো দিয়ে তৈরী 'ফার' বাজারে বেরিয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ফার বিজ'। খুব কাছের থেকে না দেখলে এই নকল ফার থেকে তৈরী জামা-কাপড়ের সঙ্গে আসল ফার দিয়ে তৈরী জামা-কাপড়ের পার্থক্য বোঝা যায় না।

আসল 'ফারের' তুলনায় কৃত্রিম ফার অনেক হাল্কা, মসৃণ ও জল-রোধক আর দামেও খুব সস্তা। তাছাড়া আসল ফারের একদিকে চামড়া ও একদিকে লোম থাকে, কিন্তু কৃত্রিম ফারের দু'দিকেই লোম থাকে। বিভিন্ন জীবজন্তুর চামড়ার নকলে কৃত্রিম ফার তৈরী করা হচ্ছে, আর তা দিয়ে শুধু জামা-কাপড় তৈরী হচ্ছে না, জুতো, মনিব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, টুপি সবকিছুই তৈরী হচ্ছে। মনোহারিত্বে এগুলি আসল ফার থেকে যে কম আকর্ষণীয় নয়, লণ্ডনের ফ্যাসন প্রদর্শনী থেকে বেলজিয়ামের রাজকুমারী পাওলা ও রাশিয়ার নভচারী টেরেশকোভা কর্তৃক জার্মানীর তৈরী 'ফার বিজু' থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ কেনাই তার প্রমাণ।

স্প্রে-বন্দুক দিয়ে তৈরী বাড়ি

তৈরী শুরু করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 'গ্লাস ফাইবার' নামে কৃত্রিম পদার্থ দিয়ে তৈরী এই বাড়িটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এক গাদা ইস্পাতের পাইপ, গ্লাস ফাইবারের পাত, আর টিন ও পাতলা বেকালাইট দিয়ে তৈরী এই বাড়িটি স্থায়িত্বে, ওজনে, শব্দ তাপ নিয়ন্ত্রণে তথা ঝড়ঝাপটা, বৃষ্টিবাদল ঠেকাতে সাধারণ চলতি বাড়িকে হার মানায়। এ রকম বাড়ি তৈরী করতে খরচও অনেক কম পড়ে। পশ্চীম জার্মানীর ইঞ্জিনীয়ার ডিটার স্মিট নিজেই এই বাড়িটির পরিকল্পনাকার ও প্রথম বাসিন্দা। এই বাড়ির কাঠামো তৈরী হয়েছে ইস্পাতের পাইপ দিয়ে, ভেতরের দেওয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে প্লাষ্টিক-মোড়া ও সাধারণ কাঠ এবং বাইরের দেওয়ালে লাগানো হয়েছে স্প্রে-করা কাঁচতন্তু ও বেকালাইটের মিশ্রণ। অতি অল্প সময়ে বাড়ির মধ্যে ঘরের পার্টিশন ও অন্যান্য আয়োজন সম্পূর্ণ করা যায়। ডিটার স্মিট মনে করেন এই সব মালমশলা দিয়ে ভবিষ্যতে বাড়ি তৈরী করলে মানুষের গৃহ-সমস্যার সুরাহা হবে।

আকাশে ও মাটিতে পুলিসের যোগাযোগ

স্থল-পুলিসের সঙ্গে আকাশচারী পুলিসের যোগাযোগ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে হামবুর্গের স্থল-পুলিসের প্রত্যেকটি গাড়ীর ছাদে মোটা মোটা করে নম্বর লিখে দেওয়া হয়েছে। গাড়ীর সাদা রঙের ছাদে কালো রঙ দিয়ে লেখা নম্বরগুলি ৯০০ ফুট ওপরে হেলিকপ্টার থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। কোথায় কোন দুর্ঘটনা ঘটলে হেলিকপ্টারের বেতার থেকে স্থল-পুলিসের গাড়ীতে সংবাদ পাঠালে পুলিসের পক্ষে অকুস্থলে দ্রুত পৌছানো এখন খুব সহজ হয়ে উঠছে

তিন শত সরকারী রাজহাঁসের শৈত্যাবাস

শহরের শোভাবর্ধনের উদ্দেশ্যে হামবুর্গের আলস্টার হ্রদে প্রায় শ' তিনেক রাজহাঁস ছাড়া থাকে। মুশকিল হয় শীতকালে যখন এই হ্রদটি বরফে জমে যায়। শহর কর্তৃপক্ষের আদেশে প্রতিবছর ঐ রাজহাঁস-গুলিকে ধ'রে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঐ রাজহাঁস ধরার ভার পড়ে ওদের রক্ষক নিস ও তার সহকর্মীদের ওপর। খুব সন্তর্পণে ওদের ধরতে হয়, কেন না ওদের ডানার ঝাপটায় পূর্ণবয়স্ক মানুষেরও হাত ভাঙ্গতে পারে। সবগুলিকে ধ'রে-বেঁধে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয়, যে পুকুরের
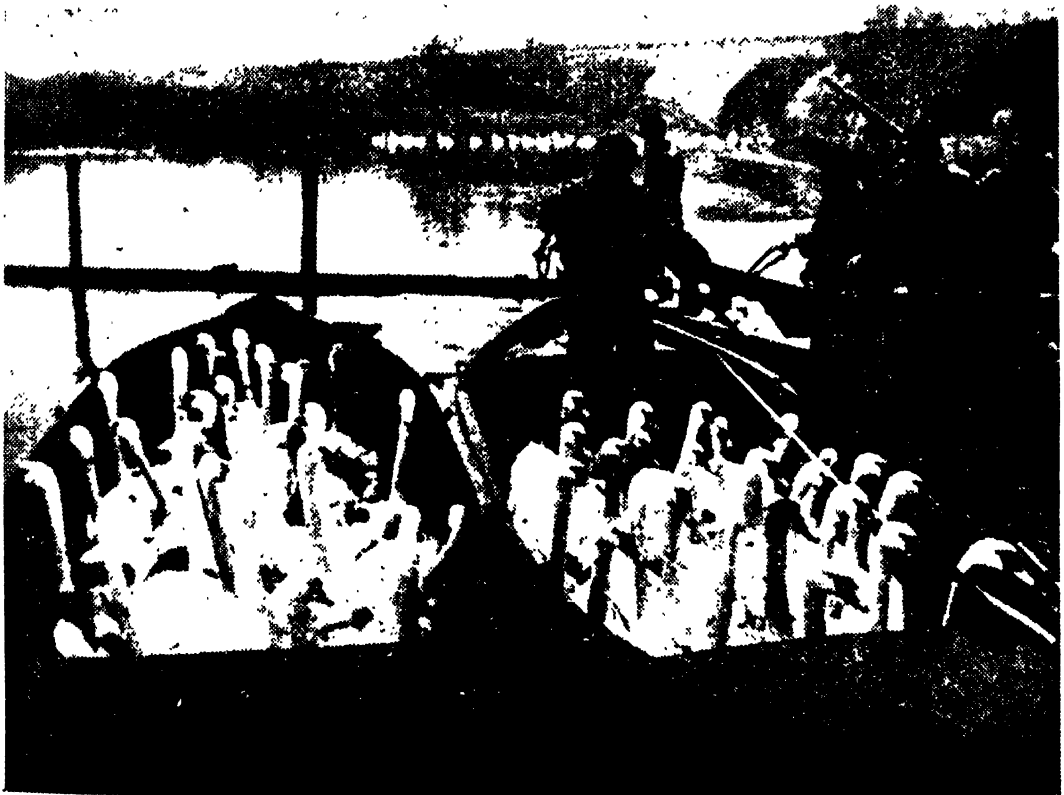
জল জমে না। ছেড়ে দেবার আগে ওদের ডানা ছেঁটে দেওয়া হয় যাতে উড়ে পালাতে না পারে। সারা লম্বা শীতকালটা এই ৩০০ সরকারী রাজহাঁসের পালকে সাধারণের পয়সায় খাওয়ানো হয়ে থাকে।

বড় শহরের
মধ্যে
ক্ষুদে শহরের
যাদুঘর

আগামী বছরের বসন্তকালের মধ্যে ডুসেলডর্ফ শহরের কাছে এক লক্ষ বর্গ-গজ জায়গা জুড়ে "মিনিডম" নামে এক ক্ষুদে শহর গড়ে তোলা হবে। এই ক্ষুদে শহরে থাকবে পশ্চিম জার্মানীর যেখানে যত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ আছে সেসবের মডেল। এই ক্ষুদে শহরের সব মডেল তৈরী হচ্ছে ডুসেলডর্ফের স্থপতি উইলি ডোমেলের কারখানায় যেখানে বহু শিল্পী, স্থপতি, ভাস্কর, ছুঁতার মিস্ত্রী ও কারিগর

এই পরিকল্পনাকে সফল করার জন্যে দিনরাত কাজ করছেন। সব মডেল তৈরী হচ্ছে ১ : ২৫। ক্ষুদে শহরটিতে শুধুই সেযুগের বিভিন্ন সময়ের ঘরবাড়ীর মডেল থাকচে না, এ যুগের রাস্তাঘাট,

কলকারখানা, আকাশচুম্বি অট্টালিকা মায় জাহাজসমেত বন্দরেরও মডেল থাকবে। তাই "মিনিডমে" গেলে সেযুগ এবং এ যুগের স্থাপত্যশিল্পের একটা ধারাবাহিক চেহারা দেখা যাবে।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ডিম

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সংগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ ডুইসেলডফ শহরের লোয়েবেকে যাদুঘরে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ডিম সংরক্ষিত আছে। অবশ্য আসল দশ ইঞ্চি উঁচু বিরাটাকার ডিমটির পরিবর্তে জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরে রাখা হয়েছে ঐ ডিমের একটি অবিকল নকল—যাতে এই বিরাটাকার বিরল ডিমের কোনরূপ ক্ষতি না হয়। এতাবৎ লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক পাখীদের প্রসবিত ডিম একমাত্র মাদাগাস্কার দ্বীপে পাওয়া যেত। স্বভাবতই এই বস্তুগুলি অত্যন্ত দুর্লভ ও সেহেতু খুবই মূল্যবান। দৈবাৎ বার্লিনের এক সংগ্রহকারী এই ডিমটি কেনেন। প্রথমে মনে হয়েছিল ডিমটি জাল এবং ফেলে দেবার উপক্রম হয়েছিল। পরে যখন দেখা গেল ডিমটি আসলে একটি প্রাগৈতিহাসিক ডিম, তখন ঐ ভদ্রলোক ডিমটিকে বিজ্ঞানীদের হস্তে অর্পণ করেন। এই ডিমের মধ্যে যে পদার্থ আছে তার ওজন ১৪ পাইট অর্থাৎ সাতটি উটপাখী অথবা ১৮৩টি মুরগীর ডিমের সমান। যাদুঘরে ঐ বিরাট ডিমের পাশেই "হামিং বার্ডের" একটি ডিম রাখায় প্রাগৈতিহাসিক পাখীটির ডিমের বিরাটত্ব দেখলে অবাক হতে হয়।

—

যানবাহন চলাচল অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা

রাস্তা খারাপ হয়ে গেছে, সারাতে হবে কিন্তু তাই বলে কি মেরামত না হওয়া পর্যন্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে? মোটেই না। সুতরাং পশ্চিম জার্মানীর এসেন শহরে ঐ খারাপ রাস্তার ওপর দিয়ে চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ৭২০ ফুট লম্বা ও ১৮ ফুট চওড়া দু'সারি গাড়ি চলার উপযুক্ত এক ইস্পাতের পুল তৈরী করা হয়েছে। খারাপ রাস্তাটি মেরামত করতে দু'বছর লাগবে, ততদিন পুলের ওপর দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চলাচল করবে। ৫২০ টন ওজনের ইস্পাতের পুলটির ৩০০টি খণ্ড খণ্ড অংশ বিশেষ কোন যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে মেকানো পদ্ধতিতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই চলন্ত ইস্পাতের পুল তৈরী করতে খরচ পড়েছে ১.৩ মিলিয়ন মার্ক। পুলটি ছোট-বড় করতে কোন অসুবিধা নেই ব'লে দরকারমত অন্যত্র রাস্তা মেরামত করার সময় ব্যবহার করা চলবে।

গামা দি সেকেণ্ড

শ্রীঅরূপরতন ভট্টাচার্য

হরিপদ উঠে গেল ষ্টেজে।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগী—মাসে পনেরো দিন সর্দি, জ্বর, কাসি নানা উপসর্গ। ষোল বছর বয়সের ছেলে, কেউ বলবে না, বারোর কোঠা পেরিয়েছে।

বন্ধুরা বললে, তুই যাসনি, ঐ তো প্যাকাটির মতো চেহারা, কেন মিছে সাধ করছিস? লোহার বাক্স তোলা তোর কম্ম নয়। তার চেয়ে ভাল হয়ে বোস চুপ করে।

হরিপদ কিন্তু বসলে না। মুখে-চোখে তখন তার গামার ভাব-ভঙ্গী। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে-উঠছে। বন্ধুদের নাগাল ছাড়িয়ে হরিপদ গোঁ গোঁ করতে করতে ষ্টেজে গিয়ে উঠল। সবাই হেসে উঠল হো হো করে।

ম্যাজিক দেখতে এসেছিল বন্ধুদের সঙ্গে। গ্রামের মাঠে ষ্টেজ বেঁধে শহরের ম্যাজিসিয়ান ম্যাজিক দেখাতে এসেছে। মাঠ ভর্তি লোক। বিপুল বিস্ময় আর অসীম কৌতূহলের মধ্যে ম্যাজিক হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। রিংয়ের খেলা, তাসের খেলা, খালি ঝুলি ভর্তি করার খেলা দেখানোর পরে আরো অনেক খেলা হ'ল। হরিপদ একটাও ম্যাজিক ধরতে পারলো না। তারপরে বাক্সের খেলা। একটা মাঝারি আকারের কাঠের বাক্স এনে সেটাকে ষ্টেজের মাঝে একটা টেবিলের উপর বসানো হ'ল। সামনে শতরঞ্চির উপরে ছেলের দল ঘাড় উঁচু করে বসে খেলা দেখছে। ম্যাজিসিয়ান সেই দিকে তাকিয়ে একজনকে এসে ঐ বাক্স তুলতে বললে। কথাটা যেন হরিপদকেই বলা—হরিপদ এমনভাবে লাফিয়ে উঠলো। বন্ধুরা সামলাবার চেষ্টা করছিল, কেউ তাকে ঠেকাতে পারল না। ষ্টেজে উঠে হল-সুদ্ধ লোকের চোখের সামনেই ঠোঁট কামড়ে হরিপদ সেই বাক্স দু'হাত দিয়ে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল। হল-সুদ্ধ চুপ। এই বুঝি ফস্কায়। কিন্তু ফস্কালো না একবার। হাজার হাজার লোকের সামনে হরিপদ সেই বাক্স তুলে সবাইকে অবাক করে দিলে। কিন্তু এখনও অবাক হওয়ার আরও অনেক বাকী ছিল।

বাহবা দেবার পরে ম্যাজিসিয়ান একজন শক্তিশালী লোককে এগিয়ে আসতে বললে। চারিদিক নিস্তব্ধ তারপরে। কিছুটা সময় যাচ্ছে। হরিপদ এখন বুক ফুলিয়ে স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে। সবাই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে আমন্ত্রণ রক্ষা করে কে

যেন এগিয়ে আসছে। চেনা চেনা লাগছে হরিপদর। কাছে আসতেই হরিপদের বুক শুকিয়ে গেল। ষ্টেজ থেকে নেমে পড়বার তালে ছিল—ম্যাজিসিয়ান বারণ করলে। গদাই গুণ্ডা—এই লোকটাকেই গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে সে ভয় করে। গুণ্ডাটা একবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে হরিপদর দিকে তাকাল। বাঁ গালে হাত বুলোতে বুলোতে হরিপদ একদিকে সরে দাঁড়াল। এই গত বছরের কথা, গুণ্ডাটার একচড়ে হরিপদ রাস্তার মাঝে উল্টে গিয়েছিল।

ম্যাজিসিয়ান বললে, আপনার এই সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে আমার হিংসে হচ্ছে। আজকালকার দিনে এরকম স্বাস্থ্য সচরাচর দেখা যায় না।

গদাই জামার হাতা গুটোতে গুটোতে বললে, মেহনৎ কম নাকি মশায় এর জন্যে, ডেলি পাঁচশো ডন, পাঁচশো বৈঠক। সকালে আধসের ছোলা, গাছের ডজন ডজন কলা, পোলট্রির ডিমের অভাব নেই, দু'বেলা আড়াই সের চালের ভাত।

হরিপদর পা থরথর করে কাঁপছিল।

ম্যাজিসিয়ানের চোখ জ্বলছে, বটে ? বটে ? আচ্ছা, আপনি বাক্সটা তুলতে পারবেন ?

গদাই হেঁ হেঁ করতে করতে বললে, এতো কোন সমস্যাই নয় মশায়।

ম্যাজিসিয়ান বললে, তবে একবার চেষ্টা করে দেখুন।

গদাই এগিয়ে এলো। আলতোভাবে চেষ্টা করলো, উঠলো না। তখন আর একটু জোর দিলে, তাও না। তখন সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করলে গদাই। মুখ লাল হয়ে উঠলো, গা গরম, শীতকালেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। কিন্তু তাও উঠলো না।

হরিপদই অবাক হ'লো খুব। সামান্য একটা বাক্স। গদাইও কম অবাক হয়নি; মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে হরিপদর দিকে। আর অতটা তাচ্ছিল্য নেই দৃষ্টিতে।

ম্যাজিসিয়ান আর একবার হরিপদকে চেষ্টা করতে বললে। হলভর্তি লোকের তুমুল চীৎকার আর হাততালির মধ্যে তুলে ফেললো হরিপদ। গদাইয়ের মুখ চোখ কালো হয়ে এসেছে। এত ডিম, কলা, ছোলা; এত ডন-বৈঠক সব বৃথা যাবে নাকি ? ছাড়বার পাত্র নয় সে, বললে আর একবার চেষ্টা করে দেখি। ম্যাজিসিয়ান হাসি মুখে বললেন, দেখুন।

কিন্তু কিছুই করতে পারলো না। বেচারা গদাই। একেবারে এতটুকু হয়ে গিয়ে সকলের ছ্যা-ছ্যা আওয়াজের মধ্যে নীচে নেমে এলো। আসলে ওর কোনো গাফিলতি নেই। ওর ডিম, ছোলা, কলা ওর ডন-বৈঠক কিছু বৃথা যায়নি। শুধু বিজ্ঞান ওকে কায়দা করে অপদস্থ করেছে।

কাঠের বাক্সের তলায় একটা লোহার প্লেট আছে, আর যে টেবিলটার উপরে বাক্সটা বসানো

হয়, সেই টেবিলটায় লোহার একটা রড লুকোনো থাকে কায়দা করে। লোহার ভিতর দিয়ে ইলেক্‌ট্রিকের কারেণ্ট পাঠিয়ে লোহাকে চুম্বক করা যায়। ইলেক্‌ট্রিকের কারেণ্ট পাঠিয়ে লোহাকে চুম্বক করা হয় বলে সেই চুম্বককে ইলেক্‌ট্রো ম্যাগনেট বলে। আর চুম্বক মাত্রেই লোহাকে টানে সে তো সবাই জানে। এখানে টেবিলের ভিতরে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ছাঁদা করে উপর থেকে নীচে লম্বালম্বি ভাবে একটা লোহার রড ঝুলোবার ব্যবস্থা হয়, সেটাকে তার জড়িয়ে কারেণ্ট পাঠানোর বন্দোবস্ত থাকে। সমস্ত টেবিলটাই টেবিলক্লথে মোড়া থাকে বলে বাইরে থেকে বুঝবার উপায় থাকে না। গদাই হাতল ধরে বাক্স তুলবার সময় শুধু চালাকি করে কারেণ্ট চালিয়ে দেওয়া হয়। আর সেই জন্যেই লোহার রডটা চুম্বক হয়ে যায়। আর এই চুম্বক বাক্সের তালার লোহার প্লেটকে এত জোরে টানে যে বাক্সটাকে কিছুতেই টেবিল থেকে তোলা যায় না। শুধু গদাই নয়, গদাইয়ের মতো তিনটে শক্তিশালী লোকও একসঙ্গে চেষ্টা করে কিছুতেই টেবিল থেকে বাক্সকে আলাদা করতে পারবে না। আর হরিপদর কপাল ভাল, তার বেলায় কারেণ্ট অফ করে দেওয়া হয়। আর তখন টেবিল থেকে বাক্স আলাদা করা কোনো কঠিন কাজ নয়।

খুব খুশী হরিপদ। ম্যাজিসিয়ানের দৌলতে সহজেই জব্দ করা গেছে গদাইকে। কোনোদিন সে আর তাকে চড় মারতে সাহস পাবে বলে মনে হয় না।

শিশুর কামনা

মহম্মদ গোলাম আম্বিয়া

প্রস্ফুটিত পুষ্পসম সংসার কাননে,
হাসি আর খুশী দেব সবার আননে।
ব্যথার পসরা মোরা দুই হাতে ঠেলি,
উঠিব হাসিয়া ফুটি শতদল মেলি।

বিভেদের গণ্ডি ভাঙ্গি হবো একপ্রাণ,
হিন্দু-মুসলিম মিলে গাহি ঐক্যতান।
জাতির সঙ্কটকালে দাঁড়াইব রুখে,
একযোগে একবাক্যে শত দুঃখ-সুখে।

স্বদেশ মাতার পায় দানিয়া অঞ্জলি,
উচ্চ-নীচ সংকীর্ণতা স্বার্থে দেব বলি।

গোড়তে পারো?

শ্রীরবি গুপ্ত

(১)

নৌকো গড়ো, জাহাজ গড়ো
    আকাশযানও গোড়ছ জানি,
করতে পারো দেবের আলয়—
    গোড়তে আপন দেহখানি?

(২)

আনছ তুমি মোহর সোনা
    পিরামিডের কবর খুঁড়ে
হায় জানো না সে কোন মণি
    গোপন তোমার প্রাণের পুরে!

(৩)

গোড়তে পারো এমন দেহ
    রোগ যা দেখে পালায় ভয়ে,
আত্মজয়ের কঠিন-ব্রত—
    বচন-বীরের কর্ম নয়-এ!

(৪)

তুচ্ছ ক'রে বিপুল বাধা
    সাগর-নিচে জমাও পাড়ি,
ডুবতে পারো আপন মাঝে?—
    কেরামতি খুব তো ভারি!

(৫)

রাস্তা বানাও, গোড়ছ নগর—
    তোলো বিরাট অট্টালিকা,
বানাও দেখি মনের প্রদীপ
    চিরন্তনীর অমল-শিখা!

(৬)

এমন শিখা পুড়বে যাতে
    হিংসা-দ্বেষ আর স্বার্থ কালো,
সকলখানে ফুটবে হাসি
    সকল জনের ক'রবে ভালো।

(৭)

বিদ্যুতে বশ মানাও তুমি
    শূন্যে জানি উড়তে পারো,
আপন মাঝে গুপ্ত যে ধন—
    রত্নখনি খুঁড়তে পারো?

(৮)

নেপচুনে আর মঙ্গলে ধাও
    চন্দ্রলোকে দিচ্ছ হানা,
আপন ঘরে চরকি ঘোরো—
    আপনাকে হায় চিনতে মানা!

(৯)

গোড়ছ বটে আণব বোমা—
    হাতছানি তার ধ্বংস ডাকে,
গোড়তে পারো 'ইচ্ছা' এমন
    বোদ্‌লে দেবে জগৎটাকে?

(১০)

ইস্পাত আর লোহার মত
    গোড়তে পারো পেশী, স্নায়ু?
ভাঙবে না যা—হবে না ক্ষয়—
    আপন হাতে আপন আয়ু?

(১১)

হাতির পায়ে পরাও শেকল
ইঙ্গিতে বাঘ ওঠে বসে,
নিজের কাছেই নাস্তানাবুদ
মন-প্রাণ রয় কে কার বশে ?

(১২)

নিজের সাথে মুখোমুখি
নেইকো সাহস, হায়, দাঁড়াবার,
"লেজ কুকুরের হয় না সোজা"
"—আসল কথা : ভয়—হারাবার।"

(১৩)

বিশ্বজয়ের যজ্ঞে মাতো—
ছোঁড়ো মিসাইল—মৃত্যু-গোলা,
কামনা-কীট জর্জরিত—
নাচায় বাঁদর লোভের দোলা !

(১৪)

এই পৃথিবী নতুন ক'রে
সত্যি যদি গোড়তে চাও
সবার আগে নিজের পরেই
নিজের মাঝেই দৃষ্টি দাও !

(১৫)

বিশ্বাসে প্রাণ গোড়তে পারো
নিঃশ্বাসে সেই নির্ভরতা,
অরূপ যেথা দাঁড়ান রূপে
সামনে এসে কইতে কথা !

পালতোলা জাহাজের যাদুঘরে রূপান্তর

একালেও পশ্চিম জার্মানীর কয়েকটা পাল তোলা জাহাজ ছিল যেমন "পাসাট", "পামীর", "ডয়েস্টলাণ্ট", "সয়েটে ডীন" ইত্যাদি। বেশ অনেক দিনের পুরোনো এইসব জাহাজ। "পামীর" ১৯৫৭ সালের ঝড়ে সমুদ্রে ডুবে যায়। ডয়েস্টলাণ্টকে করা হয়েছে নাবিকদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। "সয়েটে ডীন" এখন হোটেলে পরিণত হয়েছে। চুয়াম্ন বছরের পুরোনো "পাসাট"কে প্রথমে ভেঙ্গে ফেলার কথা হয়েছিল, কিন্তু এখন ঠিক হয়েছে ওটাকে একটা যাদুঘর করা হবে, যেখানে নানারকম জাহাজের যন্ত্রপাতি ও মডেল থাকবে। একমাত্র পালতোলা জাহাজ যে এখনও জার্মান পতাকা উড়িয়ে সমুদ্রে চলাচল করে, তা হ'ল দ্রুতগামী নাবিক শিক্ষায়তন জাহাজ "গচ ফক্"।

ক্রৌঞ্চদ্বীপের ফকির

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

'ডাকঘর'-এর 'অমল' তার বিছানার পাশে এক ছদ্মবেশী ফকিরকে দেখেছিল। সেই ফকির এসেছিল কল্পিত এক ক্রৌঞ্চদ্বীপ থেকে। বলেছিল,—সে পাখীদের দেশ। যে-দিকে তাকাও, পাখী আর পাখী, সেখানে মানুষ নেই।

ছোটবেলায় আমি একবার পাড়ার থিয়েটারে অমল-এর পার্ট করেছিলাম বলে কথাগুলো প্রায় সবই আমার মনে আছে। অমল জিজ্ঞাসা করেছিল,—যায়গাটা কোথায়? সমুদ্রের ধারে?

ফকির বলেছিল,—সমুদ্রের ধারে বইকি!

অমল আরও উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল,—সব নীল রঙের পাহাড় আছে?

ফকির উত্তর দিয়েছিল,—নীল পাহাড়েই ত তাদের বাসা! সন্ধের সময় সেই পাহাড়ের ওপর সূর্যাস্তের আলো এসে পড়ে, আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ রঙের পাখী তাদের বাসায় ফিরে আসতে থাকে,—সেই আকাশের রঙে পাখীর রঙে পাহাড়ের রঙে সে এক কাণ্ড হয়ে ওঠে!

যেদিন আমি 'অমল' হয়েছিলাম, সেদিন স্বপ্নেও আমি ভাবিনি, যে, ঐরকম এক দ্বীপের সন্ধান সত্যিই একদিন আমি পাবো, আর খোঁজ পাবো সেই সব পাখীর, যাদের পাখার রঙে আকাশের রঙে পাহাড়ের রঙে সে এক কাণ্ডই হয়ে ওঠে!

আমি সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ-ঘরের ছেলে, খুবই গরীব,—কোনো রকমে ইস্কুলের পড়াটা শেষ করে যা-হোক কিছু একটা চাকরীর চেষ্টা করা ছাড়া আমার আর কোনো উচ্চাভিলাষ ছিল না। বাবার সামান্য মাস্টারী ছিল ভরসা, কিন্তু তা দিয়ে পাঁচ ভাইবোনের সংসার ঠিক মতো চলতে পারে না। আমি বাবা-মার মেজো ছেলে, আমার দাদা ক্লাস নাইনে ফেল্ ক'রেই পড়াশুনা চুকিয়ে দিয়ে অনেক ঘোরাঘুরির পর একটা কারখানায় কাজ জুটিয়ে নিয়েছে, কিন্তু তাতেও আমাদের সংসার-খরচ কুলোতো না, প্রতি মাসে ধার লেগেই থাকতো।

আমরা অন্য ভাইবোনগুলো ছোট ছোট। অগত্যা, আমাকেও একটা কারখানা-টারখানা খুঁজে নিতে হয়। কারণ, কলেজে গিয়ে ভর্তি হবার সঙ্গতিও আমাদের ছিল না, আর সে স্বপ্নও আমরা দেখিনি।

দাদার চেষ্টায় একটা মোটর-মেরামতির কারখানায় গিয়ে দিনমজুরের কাজ শুরু করলাম। হাফপ্যাণ্ট্ আর গেঞ্জি কালি লেগে কালো হয়ে যেতো। মুখে কালি গায়ে কালি হাতে কালি মেখে সন্ধ্যার সময় যখন বাড়ী ফিরতাম, তখন চেহারা দেখে আমাকে চিনবে কার সাধ্য?

এক-আধ-দিন নয়, এই ক'রে ক'রে আমার পাঁচটি বছর কেটে গিয়েছিল। কিন্তু এতোতেও কি আমাদের সংসারের সুরাহা হয়েছিল ? পর-পর তিনটি বোন আমার পরে। তার মধ্যে বড়ো বোনটির বিয়ে বাবা দিয়েছিলেন কষ্টে-সৃষ্টে অনেক খোঁজাখুঁজি করে। এই ভগ্নীপতিটির নাম ছিল—বিকাশ। বিকাশ কাজ করত খিদিরপুর জাহাজ-ঘাটায়,—জাহাজ থেকে মাল ওঠানো-নামানোর তদ্বির-তদারক করতো। কেন জানি না, আমার সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গেল ভীষণ। ওর যখন রাতের ডিউটি পড়তো, তখন দিনের বেলায় চলে আসতো আমার কারখানায়। ছুটির পর গল্পগুজব করতে করতে বাড়ী আসতাম। আবার বাড়ী থেকে কোনো-কোনোদিন চলে যেতাম ওর সঙ্গে জাহাজ-ঘাটায়। বিকাশ আমার থেকে আসলে বছর দু-তিনের বড়ো হলেও দেখতে ছিল আমার থেকে রোগা আর খাটো। আর মুখখানাও ছিল একটা অদ্ভুৎ ছেলেমানুষীতে ভরা। আমরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়ালে আমাকেই বড়ো বলে মনে হতো।

এইভাবে, ওর সঙ্গে মিশে আমি জাহাজ কাকে বলে দেখলাম। দেখলাম, গঙ্গার বুকে ধীর গতিতে কেমন করে জাহাজ চলে, কেমন করে আস্তে আস্তে জেটিতে এসে বাঁধা পড়ে জাহাজ।

বড়ো অদ্ভুৎ লাগতো জাহাজগুলোকে দেখতে। পৃথিবীর কোন্ প্রান্ত থেকে মানুষগুলোকে নিয়ে এসেছে জাহাজ, অদ্ভুৎ তাদের ধরণ-ধারণ, অদ্ভুৎ তাদের ভাষা। কেউ ইংরেজী বলে অদ্ভুৎ নাকি সুরে, কেউ বলে একেবারে অন্য ভাষা,—জার্মান, সুইডিশ, ইটালীয়ান,—কতো নাম করবো ? বিকাশকে বলতাম,—হ্যাঁ হে, বাঙালী কেউ জাহাজে থাকে না ?

বিকাশ একটু অবাক হয়েই আমার দিকে তাকাতো, বলতো,—সে কী ! থাকবে না কেন ! আমাদের যে সব দেশী জাহাজ বিদেশে যায়, তাতে বাঙালী অফিসারও থাকে, লস্করও থাকে। দাঁড়াও, তোমাকে একদিন দেখাবো। দেখলাম। সিন্ধিয়া কোম্পানীর একটা জাহাজে জন চারেক বাঙালী লস্করের দেখা পেলাম একদিন। বাঙালী মুসলমান ত ছিলই, এরা চারজন ছিল বাঙালী হিন্দু। তাদের মধ্যে একজন আবার ছিল আমারই মতো ইস্কুলের-পড়া-শেষ-করা ছেলে।

বেশ মনে আছে, সেদিনটা মনের মধ্যে অদ্ভুত একটি আনন্দ অনুভব করেছিলাম। লোকটি বলেছিল,—সে সারা ইয়োরোপ ঘুরে এসেছে। বলেছিল,—'কোবেনহাভন' চেনেন ? ইংরেজ নাম দিয়েছিল, কোপেনহাগেন। নর্থ সী পেরিয়ে একেবারে মুখ ঘুরিয়ে বাল্‌টিক সাগরে। এবার ত সেখান থেকেই আসছি আমরা। মালবাহী জাহাজগুলো পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যে যায় না। যাত্রী-জাহাজ-গুলো থেকে মালবাহী জাহাজে কাজ করার আরাম হাজারগুণ। হাজারো দেশ দেখে বেড়ানো যায়।

বলেই, আবার ফের জিজ্ঞাসা করেছিল,—কী মশাই চিনলেন কোপেনহাগেন ? ডেনমার্কের রাজধানী।

পড়াশুনার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে পাঁচ-ছ' বছর। কোথায় ডেনমার্ক কোথায় জার্মানী, সব ভুলে গেছি। বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ওরও আমার মত অবস্থা। জাহাজের মাল তদারক করতে করতে ও ও ভূগোলের পাঠ ভুলে গেছে।

কিন্তু, নতুন পরিচিত এই মানুষটি কাছে হার মানাটা চলবে না। তাই 'আজ্ঞে হ্যাঁ চিনি বই কি,—কী বলে গিয়ে,—জার্মানীর কাছেই'—বিকাশ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো, হ্যাঁ, একবারে লাগোয়ো বললেই হয়!

ভদ্রলোক যেন খ্যাঁক করে উঠলেন। ভেংচে বললেন,—লাগায়ো বললেই হয়! কিচ্ছু জানেন না মশাই আপনারা! কোপেনহ্যাগেন থেকে জার্মানীর 'রুজেন' পাক্কা আশী মাইল। সেখানেও কি যায় নি মনে করেছেন? বার তিনেক আগে গিয়েছিলুম!

অগত্যা হার মেনে চুপ করে বসে থাকতেই হল। বাড়ী এসে বোনেদের ভূগোল নিয়ে বসা গেল। ম্যাপ বার করে যদি বা ডেনমার্কের রাজধানী খুঁজে বার করা গেল, 'রুজেন' খুঁজতে খুঁজতে গলদঘর্ম।

কথাটা অবিশ্বাস্য শোনাবে, আমরা দু'জনে সেই থেকে ম্যাপ্ দেখা শুরু করলাম। ম্যাপ দেখি, আর ঐ সব নাবিকদের সঙ্গে গিয়ে গল্প করি। আমরা যদিই বা কোনো দূর বন্দরের নাম করি, ত, ওরা পাল্টে এমন সব নাম ক'রে বসে, যা আমাদের ইস্কুল-পাঠ্য বইয়ের ম্যাপে পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে!

অন্ততঃ বছরখানেক ধ'রে ওই ম্যাপের নেশায় আমরা মশগুল হয়ে রইলুম বলা চলে।

শেষ পর্যন্ত বিকাশ একদিন বললে,—দূর ছাই, ম্যাপ দেখে-দেখে অরুচি ধ'রে গেল। আসল দেশগুলো যদি দেখা যেতো!

উৎসাহ হতো, আবার সঙ্গে সঙ্গে নিরাশও হয়ে পড়তাম। দেশ বেড়ানো সোজা কথা নাকি? কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার দরকার। বিকাশ বললে,—ফি মাসে একটা-না-একটা লটারী কিন্‌ছি, একটা প্রাইজও কি উঠ্‌তে নেই!

—উঠ্‌লে কী করতে?

বিকাশ বলতো,—কোপেনহ্যাগেন-রোজেন-ফোজেন সব দেখে আসতাম! তবে, জাহাজে নয় ভাই, এরোপ্লেনে! দেশ স্বাধীন হবার পর এরোপ্লেনের ঘটা খুব। এই ত ধর না? আমি যে কোম্পানীতে চাকরী করি, তাদের বাড়ীর একটি ছেলে আমেরিকা চলে গেল। এরোপ্লেনে। বলতাম,—আজকাল বাঙালীরা খুব ঘুরতে পারছে, তাই না?

—সে বাঙালী কারা? বিকাশ বলতো, সব বড়লোক বাঙালী। গরীব বাঙালী ঘুরবে কী করে?

বলতাম,—এই যে জাহাজগুলোতে বাঙালী লস্কর সব দেখি, এরা কি বড়লোক ?

—না—তা নয়,—বিকাশ বলতো,—বড়লোক হলে কি আর অমন হাড়ভাঙা খাটুনীর চাকরী নেয় !

বলতাম,—কী এমন হাড়ভাঙার খাটুনী, মোটর-মেরামতির খাটুনীর থেকে ?

বলতো,—না ভাই, আমার পোষাবে না। নইলে, আমি ঠিক একটা খালাসীর কাজ বাগিয়ে নিতাম।

—কী করে ?

বিকাশ চোখ মিট্‌মিট্‌ করে বলতো,—আছে রাস্তা।

ওর দুটো হাত ধরে বলে উঠেছিলাম,—সে রাস্তা বাত্‌লাতে পারো আমাকে ?

ও আমার মুখের দিকে হাঁ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপরে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়েছিল হাত। বলেছিল,—হ্যাঁ, তোমাকে রাস্তা বাত্‌লে দেই, আর বকুনী খাই শ্বশুরবাড়ীতে ! ওটি হচ্ছে না।

সেদিন না হলেও, অন্যদিন কথাটা আবার আমি পেড়েছিলাম। ও আবার আমাকে তাড়া দিয়েছিল, বলেছিল,—পাগল নাকি ? আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। ওর কাছে ঘন ঘন যেতে শুরু করে দিলাম। ও শেষ পর্যন্ত বলেছিল,—কী মুশকিল, তোমাকে ছাড়বে কেন বাড়ী থেকে ? বলেছিলাম,—তোমাকে বলতে বাধা নেই, আমাদের সংসারের অবস্থা ভালো নয়, তাছাড়া, বাবার অনেক ধারও হয়ে গেছে। টাকা বেশী পাবো শুনলে আর আপত্তি করবে না। দাও না ভাই, একটা কাজ জুটিয়ে ?

এইভাবে অনেক ধরাধরির পরে, বিকাশ রাজী হলো শেষপর্যন্ত। ওদের কোম্পানীর কোন্ কর্তাকে ধরে একখানা চিঠি লিখিয়ে আনলো। বললে,—এখনো ভেবে দেখো ভাই। শেষকালে যে সবাই আমাকে দুষবে, তা হবে না।

—না-না—তোমার কোনো ভাবনা নেই। তুমি যে আমার জন্য এত কাণ্ড করলে, এ আমি কাউকে বলবো না।

—ঠিক ত ?

বিকাশ একদিন নিয়ে গেল আমাকে এক জায়গায়। গঙ্গার ধারে, একটা ছোট জাহাজে। জাহাজের 'বড়া মালিক',—বা 'চীফ্ অফিসার' দেখা করবার হুকুম দিলেন আধ ঘণ্টা বসিয়ে রাখবার পর। চিঠি পড়লেন, আমাকে দেখলেন। আমার স্বাস্থ্যটা মোটামুটি ভালোই ছিল। জিজ্ঞাসা করলেন,—লেখাপড়া কিছু করেছো ?

বললাম,—ইস্কুলের শেষ পরীক্ষাটা পাশ করেছিলাম।

মনে হলো, মুখের ভাবটা একটু খুসী-খুসী দেখাচ্ছে। আমাকে আপাদমস্তক কয়েকবার দেখে নিয়ে বললেন,—আচ্ছা, ডেক্ ডিপার্টেই তোমাকে নেওয়া যেতে পারে। কাল থেকে কাজে লেগে যাও।

বিকাশ আমতা আমতা ক'রে জিজ্ঞাসা করলো,—আজ্ঞে মাইনে—'বড়া মালিক' বললে,—মাইনে দৈনিক হিসাবে—নো ওয়ার্ক নো পে—কাজ নেই ত মাইনে নেই।

বিকাশ বললে,—আজ্ঞে, তাহলেও—

'বড়া মালিক' দৈনিক যে টাকাটার কথা বললেন, সেটা হিসাব করে দেখা গেল,—যা আমি মোটর-কারখানায় আজকাল পাচ্ছি, তা থেকে টাকা দশেক কম হবে।

বিকাশ আর আমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। 'বড়া মালিক' বললেন,—ফর্ম-টর্ম সব সই ক'রে দিয়ে যাও।

বিকাশ ইতস্ততঃ করছিল। আমি নীচু গলায় ওকে বললাম,—ঠিক আছে। জাহাজটা কবে ছাড়্ছে, জিজ্ঞাসা করো ত ?

বিকাশ চোখ কপালে তুলে বললে,—সে কী হে! জাহাজ আবার ছাড়বে কী ? এখানে তুমি তিনমাস জাহাজের কাজ শিখবে। তারপরে—এদের সার্টিফিকেট পাবার পর—তা-ত অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে,—তখন হবে জাহাজে যাবার প্রশ্ন। বললাম—ঠিক আছে। আনো ফর্ম, সই করছি।

তখন আমার বয়স বাইশ তেইশ হবে, খুব একট ভেবে-চিন্তে কাজ করবার বয়সই সেটা নয়। স্থির করে ফেললাম, কাজ শিখে জাহাজের নাবিকই হবো।

বিকাশকে বোঝালাম,—কত দেশ-টেশ দেখে বেড়াবো, সেটা বলো ?

—বাড়ীতে বলবে না ?

—আপাততঃ নয়।

বিকাশ বললে,—মাস-কাবারে দশ টাকা মাইনে হাতে কম পেলে শ্বশুরমশাই কিছু বলবেন না ?

বললাম,—সেটা একটু ম্যানেজ করতে হবে।

পরদিন—জাহাজে গিয়ে হাজির হলাম। 'বড়া মালিক' বললেন,—তোমার বিছানাপত্র কই ?

কথাটা না বুঝতে পেরে ওঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। কাজ করতে এসেছি, বিছানাপত্র দিয়ে কী হবে ?

উনি ধমকে উঠলেন,—জাহাজেই তিন মাস থাকতে হবে যে! শুধু রোববার-রোববার ছুটি পাবে বাড়ীতে সবার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবার জন্য।

—কী হবে স্যর ?

'বড়া মালিক' বললেন,—যাও, নিয়ে এসো। তাছাড়া, ফর্মটাও নিয়ে যাও, তোমার গার্জিয়েনের সই চাই। কাল ভুলে ওটা তোমাকে বলা হয়নি।

নিরাশ হয়ে পড়লাম। আমি জানি, জাহাজের নাম শুনলে বাবা-মা কেউই রাজী হবেন না। ধীরে ধীরে জাহাজ থেকে নেমে এলাম। চলে গেলাম জাহাজ-ঘাটার সেই জায়গাটিতে, যেখানে বিকাশ মাল চলাচলের তদারকী করে।

কিন্তু এম্‌নি দুর্দৈব, বিকাশের দেখা পেলাম না। তার সেদিন সকালের ডিউটি নয়, বিকেলের ডিউটি। মনে মনে রেগে উঠলাম ওর ওপরে। মনে মনে বিকাশকে বলতে লাগলাম,—তোমার যখন সকালে ডিউটি ছিল না, তখন তুমি সকালে আমার সঙ্গে জাহাজে এলে না কেন ?

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, আর কোনো উপায় নেই, ভাগ্যই বিরূপ। হাতে দিয়েছিলেন 'বড়া মালিক' সেই ফর্মটা। আমি গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে সেই ফর্মটা দেখলাম খানিকখন। তারপরে ভাবলাম, না হয় পেলাম বিকাশকে খুঁজে তার বাড়ীতে, কিন্তু বাবা কি সই করবে ? মা কি ছেড়ে দেবে ?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সবই চিন্তা করছি, এমন সময় দুটো হতচ্ছাড়া কাক ঝগড়া করতে করতে একেবারে গায়ের ওপরে এসে পড়লো। অন্যমনস্ক ছিলাম বলে ভয়ানক চমকে উঠলাম।

মনে পড়লো, ছোটবেলায় একদিন তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে নিয়ে স্কুলের দিকে ছুটছি দেরি হয়ে গেছে বলে, এমন সময় একটা কাক ঐ রকম আচমকা এসে আমার গায়ে ঠোক্কর দিয়েছিল। মা দাঁড়িয়েছিল, দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিল কাছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল,—বালাই ষাট-ষাট।

তারপরে, হাত থেকে স্কুলের খাতাপত্র নিজের হাতে নিয়ে বলে উঠেছিলেন,—থাক, আজ আর স্কুলে গিয়ে তোর কাজ নেই। কাক গায়ে লাগা,—অযাত্রা।

জানি না এসব সংস্কার সবাই মানে কিনা, কিন্তু সেই থেকে আমার মনে একটা সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছিল সত্যই।

হাতের ফর্মটার দিকে তাকিয়ে মায়ের কথাগুলোই মনে পড়লো। দূর ছাই, ভগবানেরই ইচ্ছা নয়, আমি জাহাজে যাই। ভাবতে ভাবতে হাতের ফর্মটা টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিলাম। [ক্রমশঃ]

সতীনাথবাবু বললেন, 'যেতে পারি কিন্তু তিন সর্তে। প্রথম সর্ত রাত আটটার মধ্যে ফিরিয়ে দেবেন—'

'আটটার মধ্যে!' সভার উদ্যোক্তারা যেন কিছু বিমর্ষ হল।

'উপায় নেই। ঐ দিনই রাত নটা বারো মিনিটে গৌতমের ট্রেন। ও স-আটটা নাগাদ বেরুবে বাড়ি থেকে।'

'গৌতম—গৌতম মানে—'

'গৌতম মানে আমার ছেলে। ও একটা চাকরিতে ইন্টারভিয়ু পেয়েছে, ঐদিন ওর না বেরুলেই নয়।' সতীনাথ একটু হাসলেন: 'ওর বেরুবার আগে আমার পৌঁছুনো দরকার। একটু আশীর্বাদ-টাশীর্বাদ করে দিতে হবে তো।'

'বেশ তো তাই হবে।' উদ্যোক্তার দল সোৎসাহে রাজি হয়ে গেল। 'বেশ তো, আপনি প্রধান অতিথি বা সভাপতি না হয়ে একেবারে উদ্বোধক হয়ে বসবেন। ওপনিং সং-এর পরেই আপনার বক্তৃতা।'

'আর বক্তৃতান্তেই প্রত্যাবর্তন। বসা, বলা আর উঠে পড়া।'

'শুধু উঠে পড়া নয়, সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে পড়া।' উদ্যোক্তার দল আশ্বস্ত করল: 'তাই হবে। ছটায় মিটিং, মোটরে এক ঘণ্টার পথ, আমরা এখান থেকে পাঁচটায় বেরুব। ওপনিং সং আর কতক্ষণ, আপনি সাতটায় ভাষণ শেষ করেই স্টার্ট করবেন। গাড়ি মজুত থাকবে।'
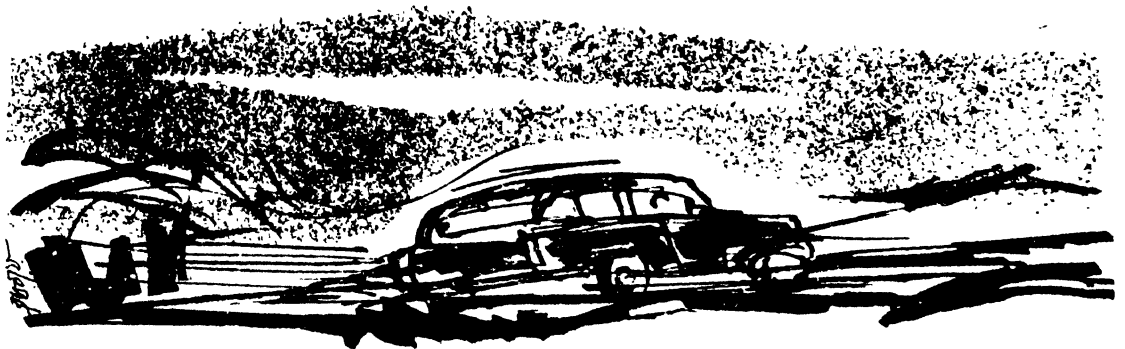
'আর, শুনুন, দ্বিতীয় সর্ত, আপনাদের কারু প্রাইভেট গাড়িতে যাব না, ট্যাক্সিতে যাব।'

উদ্যোক্তার দল অবাক মানল। 'সে কী! প্রাইভেট গাড়িই তো ভালো।'

'হোক ভালো, তবু ওতে যাব না।' সতীনাথের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল: 'শেষে বক্তৃতার পরে দেখব, ড্রাইভার নেই, কাউকে পৌঁছে দিতে গিয়েছে, কিংবা খেতে বসেছে, কিংবা—পরের গাড়ির ড্রাইভার নিয়ে হাজার গণ্ডা ঝামেলা। সে তো আর আমার কন্ট্রোলের লোক নয়, দেরি করে দিলে আমি করি কী! তার চেয়ে ট্যাক্সি অনেক নিরাপদ, সে নিজের স্বার্থেই তাড়াতাড়ি করবে। ফুরন করে নেবেন, কিছুটা আগাম, বাকিটা বাড়িতে ফিরে এসে। তা হলেই সে আমার কন্ট্রোলে থাকবে। সেও নিশ্চিন্ত, আমিও নিশ্চিন্ত—'

'তাই হবে।' অপর পক্ষও মরীয়া। 'আর তৃতীয় সর্ত?'

'সে কিছু নয়।' সতীনাথ মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, 'আপনাদের ওদিকে ভালো ছানার জিলিপি পাওয়া যায়, তাই পাঁচ সের—'

'সে আবার বলতে!' হাসতে-হাসতে সভাসদরা বিদায় নিল।

নির্দিষ্ট দিনে-ক্ষণে ট্যাক্সি এসে হাজির হল। সতীনাথ যাচাই করে নিলেন। হ্যাঁ, ড্রাইভার প্রচণ্ড আশ্বাস দিল, ঠিক আটটার মধ্যে পৌঁছে দেবে। আর ভাড়া? মোট পঁচিশ টাকা। আগাম দশ আর ফেরত এসে বাকিটা।

যাক, শেষ পর্যন্ত সতীনাথের কন্ট্রোলেই থাকবে। নিশ্চিন্ত হয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসল সতীনাথ। ছাড়বার আগে দুর্গা-দুর্গা বললে।

কিছুটা এগিয়ে এসে রাস্তার পাশে গাছের নিচে মন্দির মতন ছোট একটা ঘরের কাছে এসে ট্যাক্সিটা স্লো হল। ড্রাইভার একটা সিকি না আধুলি ছুঁড়ে মারল মন্দিরের দিকে। পুজুরী ঠিক কুড়িয়ে নিলে।

'ও আবার কী ঠাকুর?' জিগগেস করলেন সতীনাথ।

'য়্যাকসিডেন্ট ঠাকুর।' ড্রাইভার গম্ভীর মুখে বললে, 'ভীষণ জাগ্রত। এ পথে গাড়ি নিয়ে এলেই কিছু দিতে হয়। না দিলেই সর্বনাশ। বিপত্তারণ মধুসূদন।' পলকের জন্যে হুইলের থেকে হাত তুলে কপালে ঠেকাল।

শুভেলাভে ভাবণ শেষ হল। বাইরে ট্যাক্সি প্রস্তুত, ট্যাক্সির মধ্যে জুতো নিখুঁত, এত আরামে আর কোনোদিন নিশ্বাস ফেলেননি সতীনাথ।

এবার ফিরে চলো।

মিষ্টির দোকানই দেরি করিয়ে দিল। আগের থেকে অর্ডার দিয়ে রাখেনি কর্তারা, এখন এক দোকানে সবটা পাওয়া যাচ্ছে না। যা পাওয়া যাচ্ছে তাই দিন, তাতেই হবে। সতীনাথ

তাড়া দিতে লাগলেন। তা কি হয়? এ-দোকান, ও-দোকান, আরো কত দোকান আছে। সব মিলিয়ে হাঁড়ি বেঁধে দিচ্ছি দেখুন না। দরকার নেই। ড্রাইভার পর্যন্ত হর্ন বাজাতে লাগল। কিন্তু কে-কার কথা শোনে। হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। পরে, এইবার নিন ভাড়ার বাকি টাকাটা। আপনার কাছে রাখুন।

টাকাটা পকেটে গুঁজে সতীনাথ প্রশান্ত মুখে বললেন, 'চলুন।'

'দেরি হয়ে গেল।' ড্রাইভার আপশোষ করার মত করে বললে।

সতীনাথ ঘড়িতে দেখলেন, সাতটা বেজে কুড়ি। বললেন, 'একটু স্পিড দিয়ে চলুন, যাতে ছেলের বেরুবার আগে ঠিকঠাক গিয়ে পৌছতে পারি।'

তারপর ড্রাইভার ট্যাক্সি ছোটাল। যেন কালবোশেখির খ্যাপা ঝড়, সঙ্গে সঘন গর্জন হর্ণের আওয়াজ। পঞ্চাশে যাচ্ছে না ষাটে যাচ্ছে তা কে বলবে। না, তারও চেয়ে বেশি!

ড্রাইভারের পাশে তার মেট, আর পিছনের সিটে সতীনাথ একা। কাজ ফুরিয়েছে, ভাড়াও দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন আর লোকের কী দরকার!

তবু, সতীনাথের মনে হল, পাশে একটা লোক থাকলে বুঝি সাহস হত!

খানিকটা শহর-বাজার, আলোকিত কোলাহল আসে, ট্যাক্সিটা একটু সংযত হয়, আবার পেরিয়ে এসে ফাঁকায়, অন্ধকারে, হেড লাইট ফেলে সেই উদ্দাম মূর্তি ধরে।

'আরেকটু আস্তে গেলে হয় না?' ত্বরান্বিত সতীনাথই চাইলেন মন্থর হতে।

ড্রাইভার গ্রাহ্যও করল না।

আবার মিনতি করলেন সতীনাথ, 'এত জোরে যাবার কী দরকার!'

'আপনার দরকার না থাকতে পারে, আমার দরকার।' ড্রাইভার ধমকে উঠল: 'ঐ একটা ফুরন খাটলেই আমার পুষিয়ে যাবে? আমাদের সময়ের দাম নেই?'

নিশ্চয় আছে, সতীনাথেরও আছে—সতীনাথ চোখ বুজলেন। কিন্তু চোখ বন্ধ করে আরও তাঁর ভয় করতে লাগল।

খুললেন চোখ, আর তক্ষুনি কী দেখলেন!

লোকটা রাস্তার বাঁ পাশে দিব্বি চুপচাপ ছিল, গাড়ি দেখে হতচকিতের মত ছুটল ও-পাশে, আর অমনি পড়ল গাড়ির সামনে। আর ঐ গাড়ির সামনে পড়ার মানে মুহূর্তে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া।

ট্যাক্সিটা দাঁড়াল না। পিছনের লাইট নিবিয়ে দিয়ে ছুটল নক্ষত্রবেগে।

জায়গাটা শহর-বাজার থেকে দূরে, ফাঁকার মধ্যে। তাই পিছনে তেমন একটা জোর

চিৎকার উঠল না। ধর-ধর গেল-গেল—ঐ পর্যন্তই। কেউ ট্যাক্সিটার পিছু নিল না। দিব্বি বেরিয়ে আসতে পারল।

'কী করলেন বলুন তো?' সতীনাথ ধিক্কারের স্বরে বললেন।

'আমি কী করলাম!' ড্রাইভার বললে নির্লিপ্তের মত: 'যা করবার ওর নিয়তি করল। ওই বা ঐ সময় ওখানে থাকে কেন, আর কেনই বা ও রাস্তাটা তখন ক্রস করে?'

'কিন্তু এখনো হয়তো ওর প্রাণ আছে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো এখনো বেঁচে যায়—কার না জানি ছেলে কার না জানি স্বামী—' সতীনাথ মিনতি করতে লাগলেন: 'চলুন, ফিরে চলুন, ওটা তো আমাদের কর্তব্য—ওকে হাসপাতালে দিয়ে আসি—'

ড্রাইভার পাগলের মত হেসে উঠল। তার মেট বললে, 'ওখানে এখন গাড়ি নিয়ে গেলে গাড়ি তো পুড়িয়ে ফেলবেই, আমাদেরকেও লাশ করে ছাড়বে, আপনাকেও রেহাই দেবে না।'

কথাটা হয়তো সত্যি। কিন্তু কী জানি সতীনাথ যদি বুঝিয়ে বলেন, জনতা মারমুখো নাও হতে পারে। বিশেষত যখন দেখবে সেই অপরাধী ট্যাক্সিই দয়াপরবশ হয়ে ফিরে এসেছে আহতকে সাহায্য করতে।

'যদি মরে গিয়ে থাকে!' মুখ খিঁচিয়ে উঠল ড্রাইভার: 'তখন তো আমরা সকলে পুলিশের হাতে। তাই চান?'

সত্যিই তো, তাও তো কাম্য নয়।

'একবার বেরিয়ে আসার পর ফের ফেরা যায় না।' মেট ঝাজিয়ে উঠল: 'গোড়ায় পালিয়ে গিয়েছিলাম কেন তারই জন্যে আরেক প্রস্থ মার চলবে।'

'কী হবে ধরা পড়লে?' ড্রাইভার বললে, 'জেল নয় জরিমানা হবে। লাইসেন্স যাবে। কিন্তু মার তো খেতে হবে না। গাড়িটাও তো আস্ত থাকবে।'

'কী করে ধরবে?' মেট সতীনাথের দিকে তাকাল রুষ্ট চোখে: 'কে খবর দিতে যাবে? কেউ দেখেনি, কেউ নম্বর নিতে পারেনি। প্রমাণ কী যে আমাদের ট্যাক্সি মেরেছে।'

'না, না, সে কথা হচ্ছে না।' সতীনাথ কণ্ঠস্বর মোলায়েম করলেন: 'আমি বলছিলাম একটা নিরীহ বিপন্ন লোকের সাহায্যের কথা—'

'যান, আমার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নেমে যান,' ড্রাইভার গাড়ি থামাতে চাইল: 'সাহায্য করুন গে।'

সতীনাথ চোখে অন্ধকার দেখলেন। এই বেঘোরে নামিয়ে দিলে যাবেন কোথায়?

সতীনাথকে নীরব-নিশ্চল দেখে ড্রাইভার আবার গাড়ি ছোটাল। বললে, 'আমার সাহায্যের কোনো দরকার নেই। কিন্তু এই র‍্যাশ ড্রাইভিং কার জন্যে? এই য়্যাকসিডেন্টের মূল তো

আপনি। আপনাকেই তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যেই এই দুর্দশা। আপনি এখন ভালোমানুষ সেজে সাহায্য করতে চলেছেন!'

সতীনাথ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সন্দেহ কী, তিনিই তো প্ররোচনাদাতা, আসল অপরাধী। তার যে শাস্তি আছে তা হোক, কিন্তু অকারণে মার খেয়ে তাঁর চোখের সামনে একটা নির্দোষ লোক পড়ে থাকবে, তিনি তার কোনো উপশমে লাগবেন না, এ যন্ত্রণাও দুর্বিষহ।

বাড়িতে পৌঁছে দিল ট্যাক্সি। কিন্তু পৌঁছে দেখেন, হুলুস্থুল কাণ্ড। সাড়ে আটটা বাজে কিন্তু গৌতম এখনো বেরোতে পারেনি। আধ ঘণ্টার উপর একটা ট্যাক্সি যোগাড় হচ্ছে না। বাড়ির চাকর-ঠাকুর দু'জন দু'দিকে বেরিয়েছে, ট্যাক্সি নেই।

বাবার ট্যাক্সিটা দেখে গৌতম একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ড্রাইভারকে বললে, 'আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে হাওড়া স্টেশন।'

ড্রাইভার দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললে, 'কুড়ি মিনিট।'

ছেলেকে সতীনাথ আশীর্বাদ করে দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর দু'হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল। মনে হল এই হাওড়া যাবার পথেই আরেকটা য়্যাকসিডেন্ট ঘটবে। চরম য়্যাকসিডেন্ট। কে জানে নিয়তি হয়তো অমনি করেই ছকে ঘুঁটি সাজাচ্ছে।

আকুলস্বরে ছেলেকে বললেন, 'স্টেশনে পৌঁছেই যদি সময় পাস একটা টেলিফোন করে দিস যে ঠিক মত পৌঁছেচিস।'

ড্রাইভার ভাড়ার জন্যে হাত বাড়াল। হ্যাঁ, ফুরনের প্রাপ্য বাকিটা দিয়ে দিতে হবে বৈকি। রুগীকে মেরে ফেললেও ডাক্তারকে তার ফি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

কিছু বলবার দরকার নেই। ড্রাইভারের প্রাপ্য টাকাটা দিয়ে দিলেন সতীনাথ। শুধু আরেকবার ট্যাক্সির নম্বরটা দেখে রাখলেন।

এবার গৌতমই প্ররোচনা যোগাল: 'শিগগির চলুন, খুব তাড়াতাড়ি। কুড়ি মিনিট, যদি পারেন তো আরো দু'চার মিনিট কম।'

তীরবেগে ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল।

বাড়ির ভিতরে পা দিতেই সতীনাথের স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল: 'ছানার জিলিপি!'

এই যা। এ আরেক য়্যাকসিডেন্ট। ট্যাক্সির মধ্যে রয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়িতে নামানো হয়নি। ড্রাইভার আর তার মেট বসে বসে খাবে মনের সুখে। খুনও করল মিষ্টিও খেল।

যাক গে জিলিপি। ছেলেটা ঐ ড্রাইভারের হাত থেকে রক্ষা পায় তা হলেই হল। দুর্গা-দুর্গা। অনেক দেরিতে হলেও আরেকবার বললেন সতীনাথ। ছেলেটা কোনো দোষ করেনি। ঐ উদ্‌ভ্রান্ত পথচারীটাই বা কী দোষ করেছিল?

না, গৌতম খুব ভালো ছেলে। সে জানে তার বাবা কেমন উদ্বেগী। স্টেশন থেকে ঠিক টেলিফোন করেছে। 'বাবা, ঠিকমত পৌঁচেছি স্টেশনে। ট্রেন এখনো ইন্ হয়নি। কিচ্ছু ভেবো না। ঠিকঠাক ঘুমিয়ো রাত্তিরে।'

কিন্তু, এ কী, কতক্ষণ পরে সেই ট্যাক্সি এসে হাজির। 'আপনার মিষ্টির হাঁড়িটা দিয়ে যেতে এসেছি, ভুলে তখন নামানো হয়নি।' এক মুখ হাসল ড্রাইভার। পরে বাঁকা করে হেসে বললে, 'গাড়ির নম্বরটা আশা করি ভুলে যাবেন। য়্যাকসিডেন্টের ঠাকুরকে তো আর মিছিমিছি পয়সা দিইনি।'

'য়্যাকসিডেন্টের ঠাকুর? সে কী?' সতীনাথ জ্বলে উঠলেন: 'সে তো য়্যাকসিডেণ্ট করিয়ে ছাড়ল।'

'তা করাক। আমাকে তো বাঁচিয়ে দিল। ভক্তকে বাঁচানো নিয়ে হচ্ছে কথা।' ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেল ড্রাইভার।

সতীনাথ তাকালেন নম্বরের দিকে। কে জানে নম্বরপ্লেটটা ইতিমধ্যে বদলে ফেলেছে কিনা।

শরীর খারাপের ওজুহাতে সতীনাথ মিষ্টি স্পর্শও করলেন না, ছেলের অনুরোধ সত্ত্বেও ঘুমুতে পারলেন না একফোঁটা। তারই জন্যে একটা লোক আহত হল অথচ তার জন্যে কিছুই তিনি করতে পারলেন না এ দুঃখে তিনি পুড়ে যেতে লাগলেন।

পরদিন খবরের কাগজ দেখে সতীনাথের চক্ষুস্থির। কাল যখন ও যেখানে তাদের ট্যাক্সিটা য়্যাকসিডেন্ট করেছে তারই বিস্তৃত খবর বেরিয়েছে।

'একটা প্রাইভেট গাড়ি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একটি লোককে চাপা দিয়েছে। সেই গাড়িতে করেই লোকটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবস্থা সঙ্গিন। পুলিশ গাড়ির মালিক-চালককে গ্রেপ্তার করেছে। আহত লোকটিকে এখনো সনাক্ত করা যায়নি। যতদূর মনে হয় লোকটি বাঙালী।'

কী ব্যাপার, অনেক খুঁজে-পেতে দিন কয়েক পরে সতীনাথ সেই প্রাইভেট গাড়ির মালিক-চালককে বার করল। কী হয়েছিল বলুন তো?

'আরে মশাই, পরোপকার করতে গিয়ে এই বিপদ।' ভদ্রলোক বললেন, 'রাস্তায় দেখলাম চাপা-পড়া একটা লোক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। বাঁচানো যায় কিনা তাই ভেবে লোকজন ডেকে ধরাধরি করে আমার গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। পুলিশ এমন চতুর, যেহেতু আমার গাড়িতে হাসপাতালে বয়ে নিয়ে এসেছি, আমিই চাপা দিয়েছি। আসল লোকের খোঁজ নেই, আমাকেই য়্যারেস্ট করলে। স্থানীয় লোকেরা সাক্ষ্য দিচ্ছে, আমি ঘটনার পরে এসেছি, তা পুলিশ শুনতে চায় না।'

'আহত লোকটির কী হল ?'

'হাসপাতালে ভর্তি হবার চারদিন পর মারা গেছে।'

'আর আপনার কী হল ?'

'পুলিশের হাত থেকে ছাড়ান পেয়েছি বটে কিন্তু হাসপাতালের হাত থেকে রেহাই নেই।'

'কেন, সেখানে কী ?'

'দেখুন না, হাসপাতাল আমার নামে এই পঁয়তাল্লিশ টাকার বিল পাঠিয়েছে।' ভদ্রলোক বিল দেখালেন। বিরক্ত মুখে বললেন, 'যেহেতু আমি ঐ আহত লোকটিকে হাসপাতালে পৌছে দিয়েছি, হাসপাতাল আমার নাম-ঠিকানা রেখেছে ও চারদিন চিকিৎসা করতে যা খরচ হয়েছে তারই লম্বা বিল পাঠিয়েছে আমাকে।'

'ও, হ্যাঁ, আপনাকে আমি সেই টাকাটা দিতে এসেছি।' সতীনাথ মানিব্যাগ খুলে টাকাটা বের করলেন। রাখলেন টেবলের উপর।

'সে কী', ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন : 'ঐ লোকটি আপনার কেউ হয় নাকি ?'

সতীনাথের দু'চোখ ছলছল করে উঠল। বললেন, 'হ্যাঁ, ও আমার আত্মীয়। আমার ভাই।'

খুকুর চিঠি লেখা

শ্রীননীলাল দে

খুকুমণি বিদ্যালয়ে চপল অতিশয়,
ক্লাসে দিলেন লিখ্‌তে চিঠি গুরু মহাশয়;
লিখ্‌তে হবে মায়ের কাছে ইংরেজী ভাষায়,
"কেমন তার কাট্‌ছে নূতন, বিদ্যালয়ে আসায়।'
ভাবছে খুকু বিপদ বড়ই ইংরেজীতে চিঠি—
এদিক-ওদিক চাইছে, দুটি চক্ষু মিটি-মিটি।
গুরু এসে বলেন —"খুকু, ভাবছ তুমি কি ?
মায়ের কাছে দু'চার কথা লিখ্‌তে পারিনি ?"
বল্‌লে খুকু —"লিখ্‌ব আমি, কিন্তু স্যর মা যে,
কেমন করে পড়বে চিঠি, ইংরেজী জানে না যে !"

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল

শ্রীসত্যব্রত দে

কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলটি পৃথিবীতে বিখ্যাত আধুনিক প্রাসাদগুলির অন্যতম।

১৯০৪ সালে প্রথম ভিত্তি স্থাপন হয় আর তৈরী শেষ হয় ১৯২১ সালে। কিন্তু তখনও প্রাসাদটির চার কোণায় যে চারটি স্তম্ভ আছে তাদের মাথার গম্বুজগুলো শেষ হয়নি। সেগুলো তৈরী শেষ হলো ১৯৩৪-৩৫ সালের দিকে।

হলটি লম্বায় ৩৩৮ ফিট আর চওড়ায় ২২৮ ফিট। তাজমহলের শ্বেতপাথর এসেছিল রাজপুতনার যোধপুর রাজ্যের যে মাকরাণা খনি থেকে—ভিক্টোরিয়া হলের পাথরও আনা হয়েছিল সেই খনি থেকে।

হলটির নির্মাণ পরিকল্পনা করেছিলেন স্যার উইলিয়াম এমারসন এবং তৈরী করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বর্তমানের বিখ্যাত মার্টিন বার্ণ কোম্পানী। মার্টিন বার্ণ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় স্যার লেস্‌লী মার্টিন ও বর্তমান মার্টিন কোম্পানীর কর্ণধার স্যার বীরেন মুখার্জীর পিতা স্বর্গতঃ স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জীর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে হলটি নির্মিত হয়। তখনকার দিনের হিসেবে হলটি তৈরী করতে খরচ হয়েছিল এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা। এখানে পাথরে খোদাই যত মূর্তি আছে তার বেশীর ভাগই তৈরী হয়েছিল ইতালীতে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ব্রোঞ্জে তৈরী মূর্তিটি উচ্চতায় ১৬ ফিট আর ওজনে তিন টন।

ময়দানের দিক থেকে উত্তর দিকের সদর দরজা দিয়ে হলের ভেতর ঢুকলে প্রথমেই নজরে আসবে রাজা সপ্তম এডোওয়ার্ড, রাণী আলেকজান্দ্রা, রাণী মেরী, রাজা তৃতীয় জর্জ ও রাণী সোফিয়ার তৈল চিত্র ও ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলি। তাছাড়া সামনেই আছে ১৭৮৮ সালের তৈরী পৃথিবীখ্যাত সুরেলা ঘড়িটি, যার নাম "গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক্"।

ডান দিকে এগিয়ে এলে দেখা যাবে রয়েল আর্ট গ্যালারী। অনেক প্রাচীন ও ঐতিহাসিক তৈলচিত্রের সমাবেশে গ্যালারীটি পরিপূর্ণ। রাণী ভিক্টোরিয়ার পিয়ানো ও চেয়ার এ ঘরটির আর একটি আকর্ষণীয় বিষয়।

বাম দিকে আছে পোর্ট্রেট গ্যালারী। মেজর জেনারেল লরেন্স, লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক লর্ড ডালহৌসী, লর্ড হেষ্টিংস ওয়েলেস্‌লী ইত্যাদির ছবি ও মূর্তির সঙ্গে ভারতীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর, আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিকৃতিও রয়েছে। এ ঘরের আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ১৬১০ সালে মীর এমাদ কৃত পার্শিয়ান সাহিত্যের সাত খণ্ডের একটি তর্জমার পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডু-

লিপির প্রতিটি শব্দের জন্যে সম্রাট জাহাঙ্গীর মীর এমাদকে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন।

কুইনস্ হলে আছে ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্তি এবং বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ফাঙ্ক স্যালিস্‌ব্যারী অঙ্কিত রাণীর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির তৈলচিত্র।

প্রিন্সেস্ হলে রক্ষিত আছে লর্ড ক্লাইভের এবং সমসাময়িক অনেক সামরিক পদস্থ ব্যক্তিদের মূর্তি। তাছাড়া পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত ফরাসী দেশে তৈরী দুটি পিতলের বন্দুকও এ ঘরের বৈশিষ্ট্য।

দরবার হলের তৈলচিত্র ছাড়া যে জিনিসটি বিশেষ দ্রষ্টব্য, সেটি একটি পাথরের তৈরী সিংহাসন। ১৬৪১ সাল থেকে শুরু করে সাহাসুজা এবং বাংলার অনেক নবাব-বাদশা ঐ পাথরের সিংহাসন ব্যবহার করেছিলেন। হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের দুটি ব্যক্তিগত তরবারী এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিস্ ফিলিপের মধ্যে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে যে দুটি রিভলবার তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলোও রক্ষিত আছে একটি কোণে।

ডেনিয়াল রুম, কুইন মেরী রুম ছেড়ে এসে—দোতলায় আছে হেষ্টিংস রুম ও ক্যালকাটা রুম। পুরান কলকাতার অনেক ছবি, দলিল পত্র, চুক্তিপত্র রক্ষিত আছে এখানে। এ ঘরে যে জিনিসটি সবাইকে আকর্ষণ করে, সেটি হলো মহারাজা নন্দকুমারের তথাকথিত জালিয়াতীর নিদর্শনটি। অনেক জিনিস দেখবার ও জানবার মত এমন সুন্দর স্মৃতিসৌধ ভারতবর্ষে খুব কমই দেখা যায়।

শ্যামাকান্ত

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্যামাকান্ত

আমাদের ছেলেবেলায় আমরা বড়দের কাছে নানা গল্প শুনতাম। বাঙ্গালীর বীরত্বের কথা, বাঙ্গালীর অদম্য উৎসাহের কথা—নানা দিকে, নিজেরও বাঙ্গালী জাতির উন্নতির জন্য—এই সকলই ছিল সেসকল গল্পের বিষয়। সেই সঙ্গে শুনতাম অনেক শক্তিশালী লোকের নাম যাঁরা দেহের শক্তির হিসাবে পৃথিবীর যে কোন জাতের লোকের সমান ছিলেন। ঐ সকল বীর, সাহসী ও জ্ঞানী লোকদের কথা শুনে আমাদেরও মনে ভরসা আসতো, উৎসাহ জাগতো, আমরা বাঙ্গালীরা যে জগতের যে কোনও জাতির সমকক্ষ, ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকলে যে বাঙ্গালীর ছেলে যে কোন বিষয়ে যে কোনও কাজে সমানে এগিয়ে নিজের ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে পারে, এই বিশ্বাসে মন জোরালো হয়ে উঠতো। হয় তো সেই কারণেই সেই সব দিনে সারা ভারতে বাঙ্গালীর নাম ছিল সাহসের জন্য, বুদ্ধির জন্য এবং অশেষ উদ্যমের জন্য আর আজকে আমরা সেই সকল লোকের কথা ভুলে, নিজেদের গৌরবের স্মৃতি হারিয়ে, সিনেমার হলে, নাচ-গানের আসরে, ঝুটা মণিমুক্তার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি বলেই বাঙ্গালী এমন কোন-ঠাসা হয়ে, সর্বহারা হয়ে, সব কিছু খোয়াতে চলেছে।

সেই পুরানো দিনের একজন বাঙ্গালীর কথা আজ তোমাদের বলি। ইনি একদিকে ছিলেন প্রচণ্ড শক্তিশালী ও অন্যদিকে ছিলেন অসাধারণ সাহসী। এঁর নাম ছিল শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খ্যাতি হয়েছিল সার্কাসে বাঘের খেলা ও নিজের দৈহিক শক্তি দেখিয়ে। সেই সার্কাস ছিল ছোট, কেননা শ্যামাকান্ত কোনও কোম্পানীর বা কোনও সার্কাস ব্যবসায়ীর চাকর বা অংশীদার ছিলেন না, একাই সব কিছু করতেন ও সামলাতেন।

আমরা ছেলেবেলায়—তার মানে, প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্বে—সেই সার্কাস দেখেছি। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিটে যেখানে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির, তার উল্টো দিকে একটা বাড়ীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম এখন রয়েছে। সেই বাড়ী ও তার উত্তরের কয়খান বাড়ী সে সময় ছিল না। ছিল ঐখানে একটা মাঠ এবং রাস্তার দিকে কয়টা চালাঘর মাত্র। সেই মাঠের নাম ছিল "পান্তির মাঠ" এবং সেখানেই আমি প্রথম দেখি শ্যামাকান্তকে এবং তাঁর সার্কাসের খেলা।

খেলার মধ্যে প্রধান বস্তু ছিল দুইটি। প্রথম বুকের উপর পাথর ভাঙ্গা এবং দ্বিতীয় ছিল বাঘের সঙ্গে লড়াই ও শেষে বাঘের মুখ টেনে খুলে তার ভিতর নিজের মাথা ঢুকিয়ে বার করে নিয়ে আসা। দুটোর মধ্যে কোনটাতেই ফাঁকি বা চোখের ধাঁধা ছিল না। ছিল নিছক অমানুষিক দেহের বল ও ছিল দুর্দান্ত সাহস।

একজন বিরাট জোয়ান লোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর ঘাড় ও কাঁধের নীচে এবং অন্য দিকে কোমর ও পায়ের নীচে দুটো মোটা তক্তা ও খুঁটি দেওয়া চৌকী আছে আর বুকের উপর ভাগ একটা পুরু কাপড়ের টুকরায় ঢাকা রয়েছে। তারপর কয়জন লোক ধরাধরি করে একটা বড় পাথরের চাঁই, প্রায় দেড় হাত লম্বা এক হাত চওড়া ও পনের ইঞ্চি মত মোটা—তাঁর বুকের উপর চাপিয়ে দিলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দু'জন পালোয়ান দুটো মস্ত হস্বর হাতুড়ি দিয়ে পাথরের উপর বিষম জোরে ঘা দিতে লাগলো। হাতুড়ির ঘায়ে পাথর থেকে আগুনের ফুল্‌কি ছট্‌কে দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে ছুটে যেতো একথা আমার এখন মনে আছে। ঐভাবে পাথরটা টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে ভেঙ্গে পড়ে যাবার পর শ্যামাকান্ত উঠে দাঁড়াতেন।

বাঘের সঙ্গে কুস্তি বা লড়াই এবং তার মুখে মাথা ঢুকিয়ে বার করে নেওয়া এসবও ছিল সোজাসুজি। বিলাতী সার্কাসে যেমন বাঘ বা সিংহের খেলায় খেলোয়াড়ের হাতে ইস্পাতের বাঁট দেওয়া চাবুক, খাঁচার মাঝে, চেয়ার বা বেঞ্চী এবং খাঁচার বাইরে লোহার শিকে মশাল জ্বালাবার সরঞ্জাম নিয়ে লোক থাকে, শ্যামাকান্তের খেলায় সে সব কিছুই ছিল না। তাঁর বাঘের খেলার বাঘ কি করে তাঁর হাতে এলো, সেই কথা বললেই বুঝা যাবে ওসব সরঞ্জাম শ্যামাকান্তের প্রয়োজন হ'ত না কেন।

শোনা যায় শ্যামাকান্ত সার্কাস দেখাবার সময় টাকার অভাবে বাঘ কিনতে পারেন নি। প্রথমে বোধহয় চিতাবাঘ নিয়ে খেলার চেষ্টা হয়, কিন্তু কলিকাতার ময়দানে ওয়ারেন, হার্মোনষ্টোন ইত্যাদি বিলাতী সার্কাসে বড় বড় সিংহ এবং বাঘের সঙ্গে খেলা দেখানো হোতো। সুতরাং শ্যামাকান্তের মত অতবড় "কবাটবক্ষ শালপ্রাংশু" জোয়ান যদি চিতাবাঘ নিয়ে খেলা দেখায় তো সেটা হাসির কথা হবে এই ভেবে সেটা বন্ধ করা হয়। তাঁর প্রয়োজন ঐরকম প্রকাণ্ড বাঘ বা সিংহের সঙ্গে খেলা। কিন্তু সে বাঘ বা সিংহ আস্‌বে কোথা থেকে, টাকারই যে অভাব!

প্রথম তিনি চেষ্টা করেন ওয়ারেন সার্কাসের একটা সিংহ যোগাড় করতে। সে বৎসর তারা অন্য বাঘ সিংহের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড সিংহ এনেছিল, যেটা শুধু দেখানো হোতো আলাদা খাঁচায়। সেটা নাকি ভয়ানক হিংস্র ও মানুষখেকো এবং সবে ধরা হয়েছে ও পোষ মানে নি। শ্যামাকান্ত তাদের বলেন যে, "আমি যদি ওর খাঁচায় ঢুকে ওকে গায়ের জোরে বশ করতে পারি, তবে তোমরা কি আমায় ঐ সিংহটা দেবে?"

ওয়ারেন সার্কাস সেকথা কানে তুল্‌তেও রাজী হয় নি।

তারপর শ্যামাকান্ত খবর পেলেন যে, মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছে একটা বাঘিনী এসেছে, যেটা সবে ধরা হয়েছে। সেটা যেমন প্রকাণ্ড বড় তেমনিই হিংস্র—মানুষ-মারার কুখ্যাতিও তার ছিল। নবাব সেটাকে নিজের পশুশালায় একটা বড় বড় ইস্পাতের শিক দেওয়া মজবুত পিঁজরায় রেখেছেন এবং নাম দিয়েছেন "বেগম"। সে খাঁচার কাছেও কোন লোকের ঘেঁষবার উপায় ছিল না বাঘিনীর তর্জন-গর্জনের চোটে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, বিদেশী সার্কাসের খেলায় যে সকল বাঘ, সিংহ চিতা দেখা যায়, সে সবই প্রায় বাচ্চা অবস্থায় কেনা এবং সেই অবস্থা থেকেই তাদের খেলা শেখানো আরম্ভ হওয়ায় তারা অনেকখানি সহজে বশ হয়ে যায়। তবুও তাদের সঙ্গে খেলার সময় অতো সাবধানতা অবলম্বন ও সরঞ্জামের ব্যবহার করা হয়।

"বেগমের" কথা শুনে শ্যামাকান্ত মুর্শিদাবাদে গিয়ে নবাবের সঙ্গে দেখা করে বলেন, "আমি যদি ঐ বাঘিনার খাঁচায় ঢুকে ওর সঙ্গে লড়ে এবং ওকে হারিয়ে দিতে পারি, তবে কি আপনি ঐ বাঘিনীটা আমায় দেবেন?"

নবাব তো প্রথমে অবাক! তারপর শ্যামাকান্তর চেহারা ও শরীর দেখে, সব কথা শুনে, বলেন, "আমি বুঝলাম যে তোমাব সাহস ও গায়ে খুব শক্তি আছে। কিন্তু ওটা বনের বাঘ এবং ছোটও নয়, বুড়োও নয়। ও যদি তোমায় পেড়ে ফেলে, মেরে শেষ করে, তখন তার দায়িত্ব নেবে কে?

শ্যামাকান্ত বল্‌লেন, "দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁর এবং সেকথা তিনি সাক্ষী রেখে লিখিত-পড়িত করে দিতে রাজী আছেন।" নবাবের সভাসদরাও উৎসুক হয়েছিল ঐ অসমসাহসী বাঙালীর সঙ্গে ঐ দুরন্ত বাঘিনীর লড়াই দেখবার জন্যে। তারাও বল্‌ল, "হুজুর, আমরা বন্দুক পিস্তল মশাল এবং আগুনে তাতানো লোহার শিক এসব নিয়ে তৈরী থাকবো। যদি বাঘিনী এই পালোয়ানকে কাবু করে, তবে তাকে তাড়িয়ে ভিতরের খাঁচায় পুরে এঁকে বার করে আনতে পারবো।"

সেই মত সব ঠিক করে একদিন নবাবের ও তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও সভাসদদের সামনে শ্যামাকান্ত বাঘিনীর সঙ্গে লড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর দেহে প্রচণ্ড শক্তির ও মুখে-চোখে অসমসাহসের নিদর্শন দেখে উপস্থিত সকলে চমৎকৃত হল।

তারপর সুরু হয় বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ের পালা। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন শ্যামাকান্তর বন্ধু। তিনি পরে জিগেস করেন যে, ঐ রকম হিংস্র রক্তপিপাসু বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ের আগে তাঁর মনে কি কোন রকম ভয়-ভাবনা আসেনি? শ্যামাকান্ত তাতে বলেন, "দেখেন বোস সাহেব! ভয়-ডর এ সব কাজে চলে না। আমার শুধু চিন্তা ছিল কি করে প্রথম থেকেই বাঘিনীটাকে বে-কায়দায় ফেল্‌তে পারি। একবার ওকে বে-কায়দায় ফেলে বাগে আন্‌তে পারলে তারপর আমার গায়ের জোর ও মাথার বুদ্ধি এই দুই দিয়ে যে কোনও জানোয়ারকে কাবু করতে পারবো সে ভরসা আমার আছে।"

শ্যামাকান্তর কথা আমি নিজের ভাষায় দিয়েছি, এখানে সে কথা বলে রাখা ভাল। সে যাই হোক, তিনি তারপর বলেন যে, ঐ চিন্তায় তিনি বাঘিনীর খাঁচার কাছে, তার দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ান। একটা লোক ঐভাবে সোজা এসে খাঁচার পাশে দাঁড়ালো দেখে বাঘিনীও খাঁচার ভিতর খাড়া হয়ে মুখোমুখী দাঁড়ায়। শ্যামাকান্ত দেখেন যে, বাঘিনীর চোখের তারা গোল হয়ে রয়েছে এবং তিনি জান্‌তেন যে ঐ রকম চোখ গোল করে দেখা মানে তার কৌতূহল জেগেছে মাত্র, যদি সে ক্ষেপে থাকতো বা তার হিংস্র প্রকৃতি চাগিয়ে উঠতো তবে তার চোখের তারা কুচকিয়ে একটা রেখার মত দেখাতো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খাঁচার দরজার খিল খুলে দরজাটা ঠেলে সরিয়ে, সট্ করে ঢুকে পড়েন। বাঘ সেই দাঁড়ানো অবস্থাতেই ফিরে যেমন ধরতে এলো তিনি তাকে এক মোক্ষম ধাক্কা মেরে দূরে ফেলে দেন।

ধাক্কা খেয়ে ছট্‌কে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঘিনী বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে, গর্জে ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্যামা-কান্তর উপর এবং তিনিও সেই রকমই ক্ষিপ্রগতিতে সরে বাঘের মাথায় প্রচণ্ড ঘা দিলেন মুষ্টিবদ্ধ খালি হাতে। তারপর বাঘিনীতে ও শ্যামাকান্তে চল্‌লো দ্রুত ধর-পাকড় ও মার দেওয়ার চেষ্টা। শ্যামাকান্ত আচার্য জগদীশকে বলেন, "আমি জান্‌তাম যে একবার জড়িয়ে ও কাম্‌ড়ে ধরতে পারলে বাঘিনী আমায় শেষ করার সুবিধা পাবে। তাই আমি ওর খাম্‌চা এড়িয়ে ওর নাকে ঘাড়ে প্রচণ্ড মার দিয়ে এবং বটক মেরে, ওর ধরবার চেষ্টা এড়িয়ে চলেছিলাম। সেই সঙ্গে আমার চেষ্টা ছিল ওকে একবার বাগিয়ে এমন কায়দায় ধরা যাতে ওর থাবাগুলো আমার গা আঁকড়ে ধরতে না পারে। আমি জানতাম বাঘিনী ভাবতেও পারে না, যে আমি ওকে ধরবার চেষ্টা করতে পারি এবং সেখানেই ছিল আমার সুবিধা।"

"ঐভাবে ঝট্‌কা-ঝট্‌কির মধ্যে একবার সে লাফিয়ে আমার ঘাড়ে পড়ার চেষ্টা করার সময় আমি ওকে বে-কায়দায় পেয়ে সট্-করে ধরে তুলে আছাড় দিই। আছাড় খেয়ে বাঘিনী আবার গর্জিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার ওকে ধরে আছাড় মারি। এইভাবে দুইবার আছাড় দেওয়ার পর সে যখন আর এগোয় না তখন আমি তাকে তেড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে

গেল সরে। এইভাবে মিনিট দুই তিন ঘোরাফেরার পর আমি খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলাম, কেননা আমার সারা গা বয়ে রক্ত পড়ছিল।

কথাগুলো শুনতে খুবই সহজ কিন্তু একজন প্রত্যক্ষদর্শী, যিনি ঐ লড়াইয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন যে, নবাব দরবারের সকলেরই প্রায় আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থা হয়েছিল। কেউই ভাবেনি যে শ্যামাকান্ত ঐ ভীষণ সাক্ষাৎ যমের তুল্য বাঘিনীর কবল এড়িয়ে জীবন্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসবেন। বাঘিনীর হাঁক-ডাক-গর্জন বহুদূর কাঁপিয়ে তল্লাটের লোককে জানিয়ে দেয় যে, একটা জীবন-মরণ লড়াই চলেছে। শ্যামাকান্ত যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর সারা গা ক্ষতবিক্ষত।

নবাব মুর্শিদাবাদ শ্যামাকান্তর সাহস ও শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ঐ বাঘিনী ও অন্য নানা পুরস্কার দিয়েছিলেন। ঐ "বেগম" ছিল শ্যামাকান্তর সার্কাসে খেলার বাঘ এবং আমরাও তার সঙ্গে শ্যামাকান্তকে বাঘের খেলা দেখাতে দেখেছি।

শোনা যায় ওয়ারেন সার্কাসের মালিকেরা এর পরে শ্যামাকান্তর বিষয় সব কথা শুনে তাঁকে বলেছিল ঐ বিলেতী সার্কাসে সিংহ বাঘ খেলানোর কাজ নিতে, কিন্তু তিনি রাজী হ'ন নাই।

কিছুদিন ঐভাবে সার্কাস দেখিয়ে কাটাবার পর, একটা বিশেষ কারণে, শ্যামাকান্তের মনে সংসারের উপর বিতৃষ্ণা আসে এবং নিজের জীবন সম্বন্ধেও নানা প্রশ্ন মনে জাগে। সে সব কথা এখানে বলার মত নয়। তবে তিনি সব ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। সন্ন্যাস নেবার পর তাঁর নাম ছিল সোঽহং স্বামী। তিনি ছিলেন জ্ঞানমার্গে বিশ্বাসী এবং ভারতের স্বাধীনতা ছিল তাঁর একটি ধ্যানবস্তু।

১৯০৫ সালে বেনারসে কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেবার গোখ্‌লে। সেই কংগ্রেসের প্রথম সাধারণ অধিবেশনের দিন সোঽহং স্বামী উপস্থিত হ'ন। আমি সেখানে তাঁকে দেখি ত্রিশূল হাতে, বিরাট ও বলিষ্ঠ দেহ গৈরিকে ঢাকা অবস্থায়। সে চেহারা, তাঁর মুখের জ্যোতি, সবই এখনও আমার মনে আছে; কেননা আমি ছিলাম যে প্রবেশ দ্বার দিয়ে তিনি ভিতরে আসেন, তার খুবই কাছে। আমার বয়স তখন কম সুতরাং দেখা পর্যন্তই হয়। পরে তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে অল্প-স্বল্প শুনেছিলাম তাঁর বিষয়ে। আর শুনেছিলাম তাঁর কথা কয়জন গুর্খা সৈনিক অফিসারের কাছে। এঁরা ছিলেন তখনকার ভারতীয় সেনাদলের চতুর্থ গুর্খা রেজিমেণ্টের প্রথম ব্যাটালিয়নের জমাদার, সুবাদার ইত্যাদি। হিমালয়ের গায়ে "ল্যান্সডাউন", "ডালহৌসী" এইসব নামের ক্যাণ্টনমেণ্ট শহরগুলির নীচে, জঙ্গলের এলাকায় সোঽহং স্বামীর আশ্রম এবং সসময় ঐ গুর্খা রেজিমেণ্ট ছিল ঐ একটা ছাউনিতেই। জমাদার হরিসিং গুরুং বলেন যে, একদিন বিকালে, সন্ধ্যার মুখে দু'জন গুর্খা মেয়ে হাট থেকে ফিরবার পথে দু-তিনজন মাতাল গোরা সৈন্যের

তাড়া খেয়ে ছুটে এসে দেখে এক সন্ন্যাসী ধুনি জ্বেলে তার পাশে ধ্যানে বসে আছেন। এরা তাঁর পায়ে আছড়ে পড়ে রক্ষা করতে বলে। তিনি চোখ খুলে দেখেন সেই মত্ত গোরা সৈন্যেরা সেই মেয়ে দুটোর হাত ধরে টানাটানি করছে। তিনি ছেড়ে দিতে বলায় একজন লাথি মারে তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে একজনকে চড় মারতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়, অন্য একটাকে তিনি আছড়ে মাটিতে ফেলেন এবং তৃতীয় জন গালি-গালাজ কর্‌তে কর্‌তে ছুটে যায় গোরা ব্যারাকের দিকে। গুর্খা মেয়ে দুটো ছুটে যায় গুর্খাদের ছাউনিতে এই ঘটনার খবর দিতে এবং গিয়ে বলে যে, গোরা সৈন্যেরা নিশ্চয়ই পাল্টা নিতে যাবে, মার খেয়ে হজম করবে না। জমাদার হরি সিং বলে যে, সেকথা শুনে সুবাদার হরিসিং ও আরও তিন-চারজনকে খুকুরি (ভুজালি) নিয়ে দ্রুত গিয়ে দেখতে বলে। তারা গিয়ে দেখে যে, সন্ন্যাসী একটা গোরাকে চেপে বসে আছেন এবং সে তাকে ছেড়ে দেবার জন্য অতি অভদ্র ভাষায় হুকুম কর্‌ছে ও ভয় দেখাচ্ছে। গুর্খারা অনুরোধ করতে তাকে ছেড়ে দিতে সে উঠে পড়ে খানিক দূর গিয়ে তার দলের তিনচারটে গোরার সঙ্গে ফিরে এলো। সেই তিন-চারটের হাতে ছিল সঙ্গিন ও লাঠি। তারা আসতে গুর্খারা বলে যে, এই বাবা আমাদের গুরু। এঁর উপর কোনও জুলুম যদি কর তো আমরাও দেখে নেবো।" গুর্খাদের শাসানির পর গোরার দল চলে যায়। এবং সেই থেকে ঐ ছাউনির গুর্খারা তাঁর কাছে পূজা দিতে ও আশীর্বাদ নিতে প্রত্যহই কেউ না কেউ যেতো। হরি সিং আরও বলে যে, যদি কখন হাট থেকে ফেরাব পথে ঐ ঘোর জঙ্গলে, বুড়ো লোক বা স্ত্রীলোকের দেরি হয়ে যেতো তবে তারা ঐ আশ্রমেই রাত্রিটার মত আশ্রয় নিতো। এবং তাদের অনেকেই দেখেছে, "বাবা ধুনির পাশে ধ্যানে বসে এবং দূরে একটা বাঘ শুয়ে আছে।

আরও অনেক কথা তারা বল্‌তো সোহহং স্বামীর বিষয়ে, তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ইত্যাদির কথা। তিনি যে পূর্বাশ্রমে বাঙালী ছিলেন একথাও তারা জান্‌তো এবং বৃটিশ কর্তাব্যক্তিরা যে সেই কারণে গুর্খাদের তাঁর কাছে যাওয়া-আসাটা একেবারেই নেকনজরে দেখতো না। কিন্তু যেহেতু গুর্খারা তাঁকে ঐ রকম শ্রদ্ধা-ভক্তি কর্‌তো এবং "পাঠ" শুন্‌তে যেতো, সে কারণেই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক তাঁকে জোর করে হটাবার চেষ্টা করেনি।

সোহহং স্বামীর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিষ্টার বসন্তরঞ্জন দাস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ছোটভাই। তিনি অল্পবয়সেই মারা যান টাইফয়েড রোগে। সুতরং তাঁর কাছ থেকে সামান্যই আমরা শুনেছি। অন্য আর একজন ছিলেন ভারতে বিপ্লববাদের একজন প্রথম দিকের নেতা, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পরে নিরালম্ব স্বামী।

সোহহং স্বামীর তিরোধান সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। তবে সেটা তাঁর ঐ সন্ন্যাসী জীবনেরই শেষাংশে হয় এটা জানি, এবং তিনি এদেশে আর ফেরেন নি তাও শুনেছি।

মেঠুড়ে

নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট দল

শীতকালই ভারতের ক্রিকেট মরসুম। এতকাল বিদেশের ক্রিকেট দল শীতকালেই ভারত সফর করেছে। নিউজিল্যাণ্ড দল ছিল ভারতের বসন্তের অতিথি। জন রিড এবং বার্ট সাটক্লিফের মতন দু'জন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় দলে থাকলেও পৃথিবীর মধ্যে নিউজিল্যাণ্ড সবচেয়ে দুর্বল দল বলে অভিহিত। ১৯৫৫ ৫৬ সালে নিউজিল্যাণ্ড যখন প্রথমবার ভারতে এসেছিল তখনও তারা বিশেষ শক্তিশালী ছিল না। নিউজিল্যাণ্ড দলের সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচগুলো চারদিন করে চলেছিল। মাদ্রাজের নেহরু স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলা বৈচিত্র্যহীন অবস্থায় অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ভারত টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেলেও প্রথম দিন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় ৬ উইকেটে ২২৫ রান তোলে। ১১৪ রানের ভেতর ৫টা উইকেট পড়লে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। দ্বিতীয় দিনে ভারতে ব্যাটিং খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। অষ্টম উইকেটে ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ও বাপু নাদকার্নীর জুটিতে মাত্র ১১৫ মিনিটে ১৪৩ রান সংগ্রহ করে প্রাণবন্ত ক্রিকেটের পরিচয় দেন। ফারুক ও নাদকার্নীর এই ১৪৩ রান ভারতের অষ্টম উইকেটের নতুন টেস্ট রেকর্ড। নাদকার্নী শেষ পর্যন্ত ৭৫ এবং ইঞ্জিনিয়ার ৯০ রান করে আউট হয়েছিলেন। ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিল ৩৯৭ রানে। নিউজিল্যাণ্ড ২ উইকেটে ৯৩ রান করলে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়। তৃতীয় দিন ১০৯ রানের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ডের ৪টে উইকেট যাবার পর বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়। কিন্তু যে দু'জন খেলোয়াড়কে কেন্দ্র করে নিউজিল্যাণ্ডের

খ্যাতি সে দু'জন খেলোয়াড়, অধিনায়ক জন রিড এবং সাটক্লিফ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করে বিপদ কাটিয়েছিলেন। সাটক্লিফের ব্যাটিং নৈপুণ্য প্রশংসার দাবি রাখে। ভারতের রানের ৮২ রান পেছনে থেকে ৩১৫ রানে নিউজিল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ১৯৯ রান তুলে ডিক্লেয়ার্ড ঘোষণা করে। বিজয় মঞ্জরেকার সেঞ্চুরী করে টেষ্ট খেলায় নিজের সপ্তম সেঞ্চুরী পূর্ণ করেন। নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৬২ রান করার পর খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়।

* * *

কলকাতায় ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলাটিও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় এবং খেলায় জয়লাভের জন্যে কোনো দলই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন নি। নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে ৪৬২ রানের বিরুদ্ধে ভারতের কিছুটা সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। নিউজিল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা যেমন চার ও ছয়ের মার মেরেছেন, তেমনি ভারতের ব্যাটস্‌ম্যানরাও তার যোগ্য উত্তর দিয়েছেন। চারদিনের খেলায় দু দলের তিনটে সেঞ্চুরী ও দশটা ওভার বাউণ্ডারী হয়েছে। তাছাড়া ঘনঘন বাউণ্ডারী দর্শকদের সত্যিই আনন্দ দিয়েছে। যদিও নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক জন রীড সেঞ্চুরী করতে পারেন নি, ৮২ রান করে আউট হয়েছেন, তবু তাঁর খেলাই দর্শকদের উত্তেজনার খোরাক যুগিয়েছে সবথেকে বেশি। ৮২ রানের ভিতর ৬৪ রানই তিনি তুলেছেন ১০টা বাউণ্ডারী ও ৪টে ওভার বাউণ্ডারী মেরে। সাটক্লিফের ১৫১ রান সময়োপযোগী এবং নির্ভুল ব্যাটিং ভঙ্গীর সুন্দর একটা ইনিংস। রীড ও সাটক্লিফ ছাড়া নিউজিল্যাণ্ড দলের আর যে খেলোয়াড় বিশেষ প্রশংসার দাবি করতে পারেন, তাঁর নাম ব্রুস টেলার। ভারত সফরকারী নিউজিল্যাণ্ড দলে প্রথমে টেলার কোনো জায়গা পাননি। বার্টলেট আসতে পারেন নি বলে তিনি দলে স্থান পান। সিনক্লেয়ার অসুস্থ ছিলেন বলে টেলর কলকাতায় জীবনে প্রথম টেষ্টে খেলার সুযোগ পান এবং টেষ্ট খেলায় প্রথম আবির্ভাবেই শতরান করেছেন এমন পৃথিবীর কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে নিজের নাম যোগ করেন। সেঞ্চুরী করা ছাড়াও টেলর বোলিং-এ পাঁচটা উইকেট নিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নিউজিল্যাণ্ড দলের চিত্তাকর্ষক ক্রিকেটের প্রত্যুত্তর দেন ভারতের অধিনায়ক, বোরদে এবং ইঞ্জিনিয়ার। বেশ বিপজ্জনক পরিস্থিতির ভেতর প্রথম ইনিংসে বোরদে ও পাতৌদিকে ব্যাট করতে হয়। দু'জনেই স্বকিয় ভূমিকায় ব্যাট করে শুধু ভারতকে বিপদের হাত থেকে বাঁচান নি, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ক্রিকেটের পরিচয় দেন। বোরদের ৬২ এবং পাতৌদির ১৫৩, সাহস ও সৌন্দর্যে মেশানো সুন্দর ক্রিকেটের নিদর্শন। কলকাতার টেষ্টে সাহসী ক্রিকেটারের ভূমিকা গ্রহণ করেন ফারুক ইঞ্জিনিয়ার

শেষ দিনের খেলার শেষ দিকে। ব্যাটের বাড়িতে বান ডাকিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার। ফারুক দর্শকদের দিয়েছেন সমাপ্তির আনন্দ।

* * *

ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের তৃতীয় টেষ্ট খেলায় দু' দলের কোনো দলই হারেনি বা জেতেনি। আশা-নিরাশার দোলায় দোলানো এমন প্রাণবন্ত ক্রিকেট বড় বেশি দেখা যায় না।

ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামের উইকেটকে বলা হয় ব্যাটসম্যানদের স্বর্গ। এ উইকেটে বোলাররা কোনো সুযোগই পেতেন না। উইকেটের মাটি ছিল পাথরের মত শক্ত। তাই এবার মাঠে গর্ত খুঁড়ে দু' পর্দা ইট বিছিয়ে তার ওপর নতুন মাটি ফেলে নতুন উইকেট তৈরি করা হয়। ফলে বোলাররা পান বিশেষ সুযোগ। নিউজিল্যাণ্ড টসে জিতে ১৭৯ রানে ইনিংস শেষ করবার পর ভারতের ইনিংস মাত্র ৮৮ রানে শেষ হয়ে যাবে একথা কেউই ভাবতে পারেন নি। ভারতের ব্যাটসম্যানরা ব্যাট হাতে এক একজন প্যাভেলিয়ন থেকে গিয়েছেন আর একটু পরেই আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে এসেছেন। একমাত্র চাঁদু বোরদের সাময়িক দৃঢ়তা ছিল একটু সান্ত্বনার। ৮৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর 'ফলো অনে' বাধ্য হয়ে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করবার পরও ৮ রানের মধ্যে একটা উইকেট হারায়। কিন্তু পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ব্যাটসম্যানেরা যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না। ৫ উইকেটে ৪৬৩ রান তুলে শেষ দিনের মধ্যাহ্ন-ভোজের পর ভারতের অধিনায়ক পাতৌদি যখন দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ জানালেন তখন খেলার সময় ১৭৫ মিনিট বাকি ছিল। জয়ের জন্যে নিউজিল্যাণ্ডের তখন দরকার ২৫৫ রান। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যাণ্ডের ভাগ্যবিপর্যয় খেলার মধ্যে এনে দিয়েছিল নতুন উত্তেজনা। মাত্র ১৮ রানের মধ্যে পর পর তিনজন খেলোয়াড় আউট। চা পানের পর সমস্ত প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের পালা করে বিদায়। ঘন ঘন উইকেট পড়ছে। ভারতের দুই স্পিন বোলার চন্দ্রশেখর এবং দুরানী তখন নিউজিল্যাণ্ডের ভয়ের কারণ। ৮০ রানের মধ্যে পড়ে গেছে আটটা উইকেট। দুটো উইকেট হাতে রেখে কোনো মতে নিউজিল্যাণ্ড খেলার সময় শেষ করে। তৃতীয় টেষ্টে দু' দলের তিনজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেছেন। নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে জি. ডাউলিং এবং ভারতের পক্ষে সারদেশাই এবং বোরদে। ডাউলিং এর এটা প্রথম টেষ্ট সেঞ্চুরী, বোরদের তৃতীয়। সারদেশাইয়ের শুধু সেঞ্চুরী নয়—ডবল সেঞ্চুরী এবং নট আউট। সারদেশাইয়ের জীবনে প্রথম টেষ্ট সেঞ্চুরী। শুধু সেঞ্চুরীর জন্যে নয়—যে অবস্থার ভেতর তিনি প্রায় দু'দিন ধরে ব্যাট করে সেঞ্চুরীর পর ডবল সেঞ্চুরী করেও শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকেছেন, তা ভারতের টেষ্ট খেলার ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত ভারতের

যে চারজন খেলোয়াড় টেষ্টে পাঁচবার ডবল সেঞ্চুরী করেছেন, তার চারটে ডাবল সেঞ্চুরীই হয়েছে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে।

*　　*　　*

মাদ্রাজ, কলকাতা ও বোম্বাইয়ে ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম তিনটে টেষ্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর দিল্লির চতুর্থ ও শেষ টেষ্ট খেলায় ভারত ৭ উইকেটে জয়ী হয়ে আবার নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 'রাবার' পেয়েছে। শেষ টেষ্টম্যাচে ভারত জিতলেও নিউজি-ল্যাণ্ডের কৃতিত্ব কম নয়। শেষ টেষ্টের শেষ দিকে হারার মুখে দাঁড়িয়ে তারা যে সংগ্রাম করেছে তা গৌরবে উজ্জ্বল। তাদের দৃঢ় প্রতিরোধে ভারতের জয়লাভের সুবর্ণ সুযোগ প্রায় হাতছাড়া হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু খেলা শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের তেরো মিনিট আগে বিশেষ উত্তেজনার মধ্যে ভারত ৭ উইকেটে জয়লাভ করে।

দিল্লির চতুর্থ ও শেষ টেষ্টে ভারতের ব্যাটসম্যানদের সাহসী ভূমিকা টেষ্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। একথা বলছি এইজন্যে নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে দিল্লি টেষ্টে ভারত যে চিত্তাকর্ষক এবং প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেলা খেলেছে, আর কোনো টেষ্ট খেলায় তার পরিচয় মেলেনি। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্ন-ভোজের কিছু পরে ভারতের ৮ উইকেটে ৪৬৫ রান উঠলে অধিনায়ক পাতৌদি ইনিংসের শেষ ঘোষণা করেন। প্রথম ইনিংসের খেলায় ২০৩ রান পেছনে থেকে নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। কিন্তু ওই দিন পৌনে তিন ঘণ্টার মত সময় পেয়েও ৯৫ রান তুলতে তারা হারায় চারটে উইকেট। ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে নিউজিল্যাণ্ডের তখনো ১০৮ রানের দরকার। হাতে ছ'টা উইকেট। চতুর্থ দিন হারার মুখে দাঁড়িয়ে নিউজিল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা এমন অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং করেন যে, জয়ের প্রশ্নে ভারতের সন্দেহ জাগে। শেষ পর্যন্ত চা পানের পরে ২৭২ রানে যখন নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়, তখন জয়ের জন্যে ভারতের ৭০ রানের দরকার সময় মাত্র প্রায় এক ঘণ্টা। খেলা শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের ৭ মিনিট আগে নাটকীয় উত্তেজনার ভেতর তিনটে উইকেট হারিয়ে ভারত জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে। এ টেষ্টে সারদেশাই এবং পাতৌদির সেঞ্চুরী আর বোরদে ও হনুমন্ত সিংয়ের নিপুণ হাতের ব্যাটিং-এ ভারতের জয়ের পথ প্রশস্ত করে। প্রথম ইনিংসে স্পিন বোলার বেঙ্কটরাঘবনের ৭২ রানে আটটা উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৮০ রানে চারটে উইকেট লাভ টেষ্ট খেলার ইতিহাসে স্মরণীয় বোলিং-কীর্তি। ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের শেষ টেষ্ট দিলীপ সারদেশাই তাঁর টেষ্ট খেলায় হাজার রান পূর্ণ করেছেন।

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

অমর জহর—শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে ডি মেহ্‌রা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১·০০

কবিতায় লেখা আশ্চর্য বই 'অমর জহর'। ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, আমাদের প্রিয় পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর বংশ-পরিচয় ও জন্ম থেকে জীবনের বিশিষ্ট ঘটনা সমূহ বিভিন্ন কবিতার মধ্যে, বিভিন্ন মধুর-মিষ্টি ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে এই বইখানির মধ্যে। পণ্ডিতজীর চিত্রসহ রঙিন কাগজে, বড় টাইপে ছাপা এই গ্রন্থ ছোট ছেলেমেয়েদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করবে। তারা এই উপভোগ্য কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে জানতে পারবে তাঁর জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাসমূহ।

এই গ্রন্থের গোড়াতেই খ্যাতনামা কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতাসহ সুন্দর একটি গদ্যে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এমন একখানি সুন্দর, সুমুদ্রিত বই যে দেশের ছেলেমেয়ে ও তাদের অভিভাবকরা আগ্রহসহকারে গ্রহণ করেছেন, তার পরিচয় পাওয়া যায়, তিন মাসের মধ্যে তিনটি সংস্করণে নয় হাজার বই বিক্রি হওয়ার মধ্যে। আমরা এমন একখানি বই প্রতিটি ছেলেমেয়ের হাতে সকলকে তুলে দিতে অনুরোধ করি।

ডাকের কথা—লরিন জিলিয়াকাস। শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে ডি. মেহ্‌রা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৪·০০

আজকাল ছোটদের সাহিত্যে গল্প-উপন্যাস ছাড়া নানা ধরণের বিচিত্র বিষয় নিয়ে, জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে বহু বই যে প্রকাশিত হচ্ছে সেটা খুবই আশার কথা। 'ডাকের কথা' সেই পর্যায়েরই একটি সুন্দর তথ্যপূর্ণ বই। এ থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় ডাকঘর ও চিঠিপত্র আদান-প্রদান কি ভাবে গোড়া থেকে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আধুনিক উন্নত অবস্থায় উপনীত হয়েছে তা যেমন জানা যাবে, তেমনি একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে ভারতের ডাকের ইতিহাসও জানা যাবে ভালভাবে।

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সহজসাধ্য হয়েছে। কেবলমাত্র ছেলেমেয়েরাই নয়, পরিণতরাও এই বই থেকে বহু তথ্যের সন্ধান পাবেন। সুসাহিত্যিক শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। বইখানির ছাপা, বাঁধাই উৎকৃষ্ট এবং বিশেষভাবে শিল্পী শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্তর প্রচ্ছদপটটি চিত্তাকর্ষক।

নতুন বছর এলো। একটি পূর্ণ বছর অতিক্রম করে এসে নববর্ষের নবপ্রভাতের দ্বারে আমরা উপস্থিত হয়েছি। পুরাতন বছরের জীর্ণ জড়িমা ক্লান্তি কেটে গেছে। নবোদ্যমের উৎসাহ বহন করে এনেছে নববর্ষ। সেই বার্তা আজ ঘরে-ঘরে প্রচারিত হোক। এসো, আমরা নববর্ষকে স্বাগত জানাই। শপথ গ্রহণ করি এই বলে যে, এই বছরটিকে এবং আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমরা আমাদের দেশের সকল সমস্যা দূর করবো—প্রাণোজ্জ্বল জীবনের প্রতিষ্ঠা করবো। অভাব অনটন আর অসন্তোষের স্থায়ী অবসান ঘটাবো। জীবনকে সুন্দর, শান্ত ও কল্যাণময়ী করে তুলবো।

আগামী পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরুর পুণ্য জন্মদিন। নতুন করে তা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। এই পুণ্য-দিনটিকে স্মরণ করে তোমাদের বলতে চাই—আমরা রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্মেছি, তাঁর সৃষ্টির পরশে আমরা সঞ্জীবিত হয়েছি। বিশ্বের দরবারে কবিগুরু ভারতবর্ষের যে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তার পূর্ণ মর্যাদা যেন আমরা যুগ যুগ ধরে দিতে পারি।

মহাজীবন থেকে—

বারাণসীর গঙ্গার ঘাট। রাত শেষ হতে আর দেরি নেই। চারিদিকে ঘন কুয়াশা, পথঘাট নির্জন। এমনি সময়ে আচার্য রামানন্দ এসে দাঁড়ালেন ঘাটে—ব্রাহ্মমুহূর্তের আগে স্নান সেরে নেবেন। এক পা এক পা করে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছেন রামানন্দ। জলের কাছাকাছি সিঁড়িতে পা রেখেছেন, এমনি সময় তার পায়ে লাগলো কার দেহের স্পর্শ। মৃতদেহ নয় তো? রামানন্দের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো রাম! রাম! রাম! যার দেহের স্পর্শ লেগেছিল তাঁর পায়ে, তিনি এক কোণে দাঁড়িয়ে উঠেছেন। আবছা অন্ধকারে সেই মূর্তিটি পরম শ্রদ্ধায় আনত হয়ে বল্লে: প্রভু আমি কবীর দাস, আপনার শিষ্য।

রামানন্দ বল্লেন : সে কি কথা? আমি কবে তোমায় শিষ্যরূপে গ্রহণ করলাম—তুমি ভুল করছো!

মাথা নেড়ে কবীর বল্লেন : না প্রভু, ভুল আমার হয়নি। আমি গরীব অস্পৃশ্য জোলা, বন্ধন-দশার মধ্যে থেকে আমি এতদিন মৃতকল্প হয়েছিলাম। আজ আপনার পুণ্যস্পর্শে নূতন জীবন পেলাম আমি। বন্ধন-দশার অবসানে লাভ করলাম মুক্তি, আপনার কাছে পেলাম আমার নাম দীক্ষা।

রামানন্দ হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন। কবীর ছিলেন ধর্মের প্রচারক—মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য স্বীকার করতেন না তিনি। ধর্মের জাঁকজমক আড়ম্বর সহ্য হতো না তাঁর। মন্দির, মসজিদ, শাস্ত্রাচার আর বাইরের জীবনের ভেদ-বিভেদ এসব তুচ্ছ করে তিনি মানুষের ভালোবাসার মধ্যে খুঁজে পেতেন জীবনের চরম সার্থকতা। কোনো পার্থিব শক্তিকেই তিনি ভয় করতেন না—তার জীবনের একটি ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়।

দিল্লীর বাদশাহ ইব্রাহিম লোদী সেবার জৌনপুরে এসেছেন। কবীর প্রচলিত সমাজব্যবস্থা আইন-কানুন কিছুই মানেন না। ধর্মের আনুষ্ঠানিক অঙ্গ নিয়ে তিনি বিদ্রূপ করেন—এসব খবর বাদশাহের কানে পৌঁচেছিল। তাই তার ডাক পড়লো দরবারে। বাদশা বল্লেন, কবীরদাস তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। মুসলমান জোলার ঘরে তোমার জন্ম—তবু তুমি ধর্মের কোনো অনুশাসনই নাকি মানো না। তুমি কি স্বধর্ম ত্যাগ করেছ?

কবীর উত্তর দিলেন : 'জাঁহাপনা, আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই, আমার দেশ হচ্ছে অমরধাম, সেখানে জাতের বিচার নেই, আমার কাজ হচ্ছে সে দেশের খবর সকলকে পৌঁছে দেওয়া।' বাদশা কিছু বলার আগে তাঁর এক সভাসদ গর্জে উঠলেন : 'থামো কবীর! তোমার দুঃসাহস আমাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে, কি আস্পর্দা তোমার! বাদশাহের মুখের উপর এ কথাগুলো বলতে একটুও ভয় করলো না তোমার?

কবীরদাস একটু হেসে বল্লেন : কবীরা কাঁহাকো ডরে, শিরপর সৃজন হার। হস্তী চঢ়ী ডরিয়ে নহী, কুত্তিয়া ভুখে হাজার। অর্থাৎ কবীর কাউকেই ভয় করে না, তার মাথার উপর আছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। হাতীতে চড়ে যে যাচ্ছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ তার কি করবে?

বাদশাহ ছিলেন বুদ্ধিমান। কবীরদাসের মনের খবর তাঁর অজানা ছিল না। সভাসদদের উত্তেজনা থামিয়ে তিনি কবীরকে সম্মানে বিদায় দিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, রাজশক্তির ভয় দেখিয়ে এই সিদ্ধপুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। ভগবানে বিশ্বাস যাঁর আছে, তিনি নির্ভয়, তিনি স্বাধীন। সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। তোমাদের—মধুদি

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
: ০.৪৫ পয়সা

নতুন বছর
১৩৭২ সালের
✹ মৌচাকের নিয়মাবলী ✹

১। **মৌচাকের** বার্ষিক চাঁদা—৫·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক—২·৫০ নয়া পয়সা এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য—০·৪৫ নয়া পয়সা। বৈশাখ মাস হ'তে বর্ষ আরম্ভ। যে কোনও মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। কোন সংখ্যা না পেলে সেই মাসের ২০ তারিখের মধ্যে জানাতে হ'বে, নচেৎ উক্ত সংখ্যা পরে পাওয়া যাবে না। ঠিকানা পরিবর্তন করতে হ'লে পূর্ব-মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে জানাতে হ'বে। চিঠি-পত্র এবং মনিঅর্ডার কুপনে সব সময়েই **গ্রাহক নম্বরের** উল্লেখ থাকা চাই। গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ না থাকলে চাঁদা জমা করা হয় না। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন'** কথাটির উল্লেখ থাকা দরকার।

৩। লেখা পাঠাতে হ'লে সকল সময়েই নকল রেখে পাঠাতে হ'বে। উপযুক্ত ডাক-টিকিট না দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব হয় না। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না দেওয়া থাকলে সে লেখা গ্রাহ্য হয় না।

৪। **এজেন্সীর জন্য** ৫৲ টাকা অগ্রিম জমা রাখতে হয় এবং কমপক্ষে ৫ কপি ক'রে পত্রিকা নিতে হয়। বর্ষশেষে বিক্রিত কপির হিসাব ও অবিক্রীত কপি ফেরৎ পাঠাতে হয়। কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা।

কলিকাতার আদি কালীমন্দির—কালীঘাট।

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *
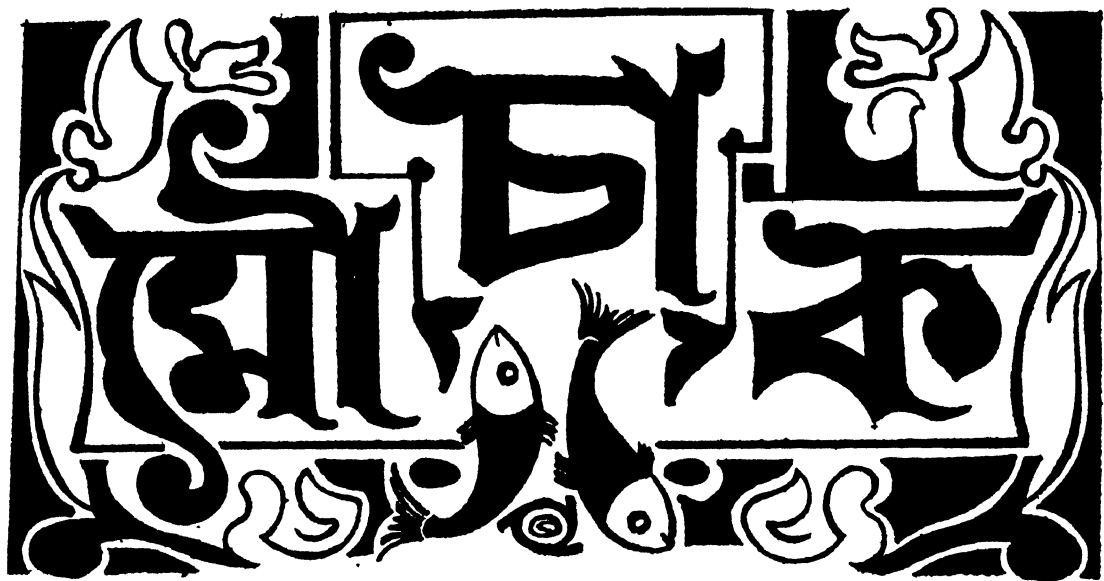
৪৬শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৩৭২ [২য় সংখ্যা

শ্যামনগরীর জঙ্গলেতে

শ্রীআশানন্দন চট্টরাজ

শ্যাম্‌নগরীর জঙ্গলেতে কাজল-কালো রাতে,
তিন্‌-কুকুরে কাপড় বুনে বসে যে-যার তাঁতে।
ডাহুক সেথা ডালায় ভ'রে তুলে কাপাস তূলো,
চর্‌কা কাটে চাতক পাখী, দেখে বিড়াল-'হুলো'।
সারস করে সেলাই খালি, বুনো বাঘের টুপি,
কাঠবিড়ালী তারই কাছে জ্বালে তেলের-কূপী।
পুতুল গড়ে পিঁপড়ে যত মাঠের মাটি দিয়ে,
ময়ুরগুলো মাথায় ক'রে যায় তা হাটে নিয়ে।

চিল, শকুনি চাম্ড়া কেটে বানায় খালি জুতো,
গাধার ছেলে গামছা-গায়ে রঙ্ যে করে সুতো।
তমাল-তলে তলাই পেতে, বসে বানর বুড়ি,
তৈরী সেথা করে কেবল নানা মাপের ঝুড়ি।
ইঁট সাজিয়ে ইঁদুর সেথা বাঁধে বাঘের বাসা,
রঙ্ করে তা রামছাগলে, এক্কেবারে খাসা!
খাবার খেয়ে খরগোসেরা জোনাক সেথা ধরে
হাজার বাতি, তাইতো হেসে, বনকে আলো করে।
এসব কিছু দেখ্‌বে যদি, এসো খুড়োর সাথে,
শ্যাম্‌নগরীর জঙ্গলেতে কাজল-কালো রাতে।

পুরাতন অতিথি

শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

সজনে ডাঁটা শেষ, বেলও যায় বাড়ি
পটোল, কুমড়ো, ঝিঙের, দেমাক ভারী।
'কুলপি-মালাই' হাঁকে, কুলপিওলা
সূর্য তেতেছে যেন তপ্ত খোলা।
শুকুতে হয়েছে শুরু পুকুরগুলো
বিপদ দুয়ারে ভাবে ব্যাঙ গলা-ফুলো।
ছাতার আদর বাড়ে যেন সে জামাই,
প্রয়োজনে তবে না প্রণতি জানাই।

পুরুতের ন্যাড়ামাথা, গামছা চাপা,
পবন বেগে তাঁর, ছুটে চলে পা।
চাদর অনেক আগেই নিয়েছে বিদায়
মেঘেরা চাদর হ'য়ে আকাশে জড়ায়।
বিজলী, তালপাতা, টানাপাখা সব
'আবার এলাম' বলে করে কলরব।
কাছারী বা আদালত, যেথা যাবে ভাই,
'বড়ই গরম' কথা, শুনিবে সবাই।

খোকনের বন্ধু

'বনফুল'

খোকন খুব ভোরে ওঠে। ভোরের পাখীর ডাক খোকনের বাবা মা শুনতে পান না, কিন্তু খোকন পায়। ভোরে উঠে আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস দেখতে পায় খোকন। একদিন দেখেছিল—একটা বড় সবুজ গঙ্গাফড়িং আয়নার উপর ব'সে আছে সামনের পা দুটো তুলে। আর একদিন দেখেছিল—দেওয়ালের উপর একটা সুন্দর ছবি আঁকা হ'য়ে গেছে, নানা রঙের সুন্দর ছবিটা। পরে জানা গেল ওটা ছবি নয়, একরকম প্রজাপতি, ইংরেজী নাম 'মথ'। আর একদিন ভোরে উঠেই জানলা দিয়ে দেখেছিল—তাদের পুরানো চাকর ব্রজ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল, রাত্রের ট্রেনে এসেছে, কারও ঘুম ভাঙায় নি, বাইরের বারান্দায় শুয়েছিল। খোকনের সঙ্গেই দেখা হ'য়ে গেল প্রথমে। ভোরে উঠলে এইরকম আশ্চর্য জিনিস প্রায়ই দেখা যায়। তাদের বাড়ির উঠোনে যে আকন্দ গাছটা ছিল তার ফল হয়েছিল অনেক, অনেকেই দেখেছে তা। কিন্তু একদিন ভোরে উঠে খোকন যা দেখেছিল তা আর কারও চোখে পড়েনি প্রথমে। আকন্দ ফল ফেটে তুলো বেরিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাতাসে। কিন্তু সেদিন ভোরে যা তার চোখে পড়ল তা একেবারে—ভাষা নেই তা বর্ণনা করবার।

ইঁদুরের খাঁচায় ইঁদুর ধরা পড়েছে একটা। জলজলে কালো চোখ, ছুঁচলো মুখে চালাক-চালাক ভাব, সরু সরু গোঁফ—মুগ্ধ হ'য়ে গেল খোকন। মা রাত্রে কখন যে খাঁচাটায় রুটির টুকরো বেঁধে রেখেছিল তা খোকন জানতই না। কিন্তু তার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন ইঁদুরটা মানুষের মতো কথা ক'য়ে উঠল।

"রুটির লোভে এ ফাঁদে ঢুকে পড়েছি। ভাই খোকন, আমাকে বাঁচাও—"

খোকনের ভুরু কপালে উঠে গেল।—"ও তুমি ধরা পড়েছ! তুমি তো পাজির শিরোমণি খাবার চুরি ক'রে নিয়ে পালাও, বই খাতা বালিশ কুঁচোকুঁচি কর, দেওয়ালে ক্রমাগত গর্ত ক'রে চলেছ। তোমাকে বাঁচাব? মা উঠেই তোমাকে জলে চুবিয়ে মারবে। সেই হবে তোমার উচিত শাস্তি—"

ইঁদুর পিছনের দিকে ল্যাজটি খাড়া ক'রে উবু হ'য়ে বসল, তারপর হাতদুটি জোড় ক'রে বলল—"ভাই খোকন, বাংলা দেশে তুমিই তো সেরা লোক। বাংলা দেশের আকাশে তুমিই তো একমাত্র সূর্য, বাংলা দেশের পুকুরে তুমিই তো একমাত্র পদ্ম, বাংলা দেশের রাস্তায় তুমিই তো একমাত্র পথিক

তোমাকে প্রণাম করি। সব শুনেও তুমি যদি আমাকে মেরে ফেলতে চাও, আমি আপত্তি করব না। আমার অনুরোধ, আমার বক্তব্যটা তুমি মন দিয়ে শোন একটু। তুমি মহাপুরুষ, আমায় তুমিই বুঝতে পারবে—"

খোকন গম্ভীরভাবে চাপটালি খেয়ে বসল।

"বেশ বল—"

ইঁদুর বলত লাগল—"দেখ ভাই খোকন, আমরা চাকরি করি না, ব্যবসা করি না, চাষবাসও করি না। কি ক'রে ওসব করতে হয় তা কেউ আমাদের শেখায় নি। ওসব রেওয়াজই নেই আমাদের মধ্যে। কিন্তু তবু আমাদের খেতে হবে, বাঁচতে হবে, আমাদের কাচ্চাবাচ্চাদের মানুষ করতে হবে। কি করে করব বল? তাই আমাদের দিন-রাত ওই এক চিন্তা কোথায় কি সংগ্রহ করব। যেখান থেকে যা পাই মুখে ক'রে তুলে আনি, কিংবা ব'সে ব'সে খেয়ে ফেলি—"

খোকন গম্ভীর ভাবে বলল, "কিন্তু বালিশ ছিঁড়ে তুলো বার কর কেন! বই ছিঁড়ে কুচি কুচি কর কেন। তুলো আর কাগজ কি তোমাদের খাবার নাকি!"

ইঁদুর বলল—"বাঃ, ওসব দিয়ে আমার বাচ্চাদের বিছানা তৈরি করি যে। সেই সময় যা যখন পাই মুখে ক'রে নিয়ে যাই। অনেক বাজে জিনিসও জমে যায় গর্তে। তুমি যদি চাও এনে দেব তোমাকে। বিশ্বাস কর, আমাদের বাঁচবার জন্যে যেটুকু দরকার তার বেশী আমরা কিছু নিই না। চাকরি, ব্যবসা, বা চাষবাস করলে হয়তো রোজগার করতে পারতুম। কিন্তু ওসব তো আমাদের রেওয়াজ নেই। কি ক'রে বাঁচি বল। সাধারণ লোকে আমার মনের কথা বুঝবে না, কিন্তু তুমি তো অসাধারণ, তুমিও বুঝবে না?

তুমিও মৃত্যুদণ্ড দেবে আমাকে?"

খোকন থুত্‌নিতে আঙুল রেখে ভাবল একটু, তারপর খাঁচার দরজাটা খুলে দিল। সুট্‌ ক'রে পালিয়ে গেল ইঁদুরটা।

মা উঠতেই মাকে খবরটা দিয়ে দিল খোকন।

"মা খাঁচায় আজ ইঁদুর ধরা পড়েছিল। ছেড়ে দিলুম তাকে—"

"ছেড়ে দিলি? সে কি রে। মতিভ্রম হয়েছে নাকি তোর!"

"ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। ওরা চাকরি করে না, ব্যবসা করে না, চাষবাস করে না—খাবে কি ক'রে বল—"

মা খোকনের গাল টিপে হেসে বললেন, "খাবে তোমাদের মতো বোকাদের ঠকিয়ে। ইঁদুরের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব হয় নাকি বোকা কোথাকার—"

তার পর দিন ভোরে খোকনের তখনও ঘুম ভাঙেনি। হঠাৎ তার নাকের উপরটা সুড়সুড় ক'রে উঠল। খোকন উঠে বসল ধড়মড় ক'রে। দেখল ইঁদুরটা এসেছে। সে ফিসফিস করে
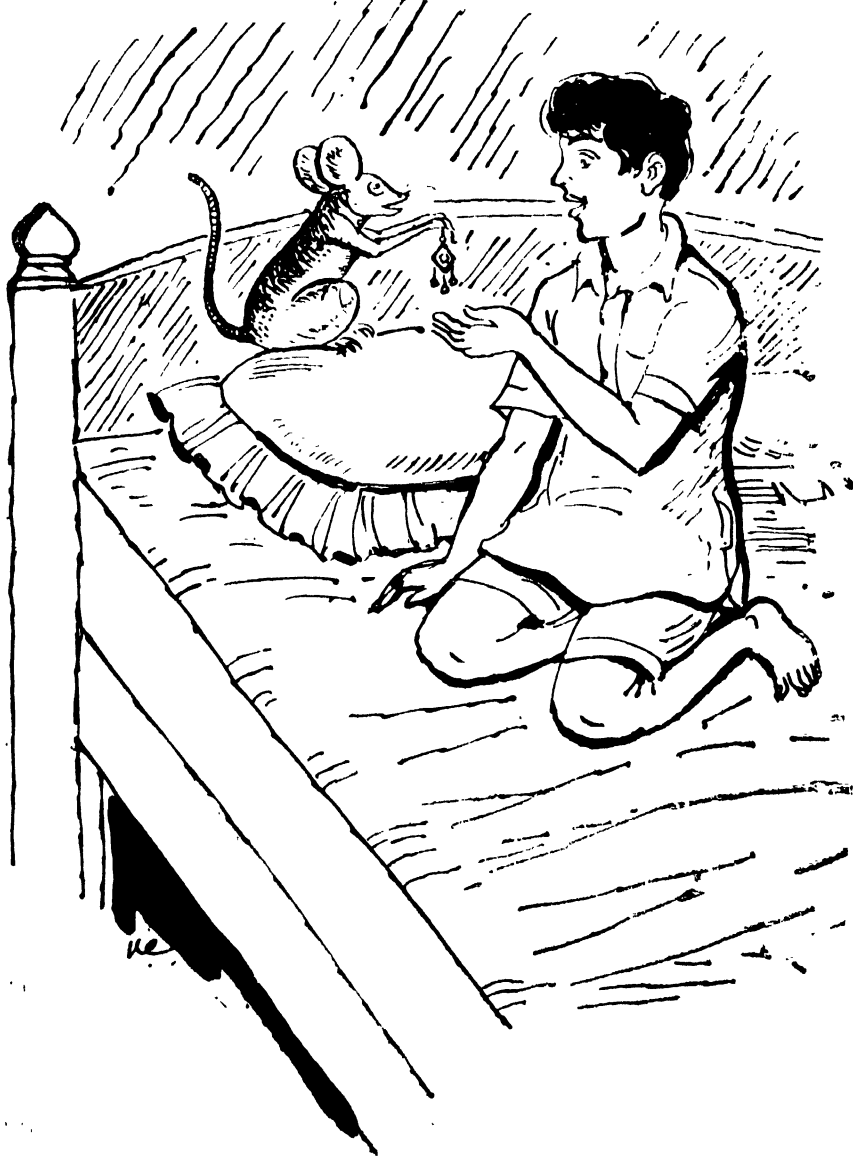
ইঁদুর—'তুমি যদি নিতে চাও নাও'—

বলল, "অনেক দিন আগে এটা নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এটা অতি বাজে জিনিস। আমাদের কাজে লাগল না। তুমি যদি নিতে চাও নাও—"

দিয়েই চলে গেল ইঁদুরটা।

খোকন দেখল বেশ সুন্দর চকচকে দুল একটা।

মাকে দেখাতেই মা বললেন—"ওমা কোথা পেলি এটা! এটা আমার হীরের সেই দুলটা যে! কোথা পেলি!"

খোকন উদ্ভাসিত চোখ দুটি তুলে বললে—"আমার ইঁদুর বন্ধু দিয়ে গেছে!"

অংক হলেই

শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম

অংক হলেই শক্ত হবে
মিথ্যে কথা নয় যে!
বুক কাঁপে যে নাম শুনে তার
সত্যি লাগে ভয় যে!

মিলবে নাকো যতোই কষো,
যতোই মাথা চুলকে,
কিচ্ছুতে ভাই পারবে নাকো
এড়িয়ে যেতে ভুল্‌কে!
কেমন ক'রে ভুলরা হঠাৎ
অংকে ঢুকে সত্যি

গোলকধাঁধায় দেয় ঠেলে ভাই
নয় মিছে একরত্তি!
তাই যদি কেউ অংক হঠাৎ
খোকনকে দেয় করতে—
মিথ্যে ছুতোয় হয় না দেরি
দুই চোখে জল ঝর্‌তে!

মৈঁ চোর হুঁ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

এক জায়গায় বসে চা খাচ্ছিলাম সকলে। লম্বা-পানা একটি লোক এসে মেজরকে বলল: ঝাড়ু দেতে বখ্‌ত্ রদ্দি কাগজমে দশ রুপেয়াকে দো নোট মিলে।

মেজর মাথা নেড়ে বললেন: দশ টাকার দু'খানা নোট খুঁজে পাচ্ছিলাম না বটে। ভেবেছিলাম, ওটা বোধহয় বাজার করতে গিয়েই হারিয়ে থাকবে—ক্যাপ্টেন ভাটিয়া শুনে বললেন, He coul'd easily take it—a very honest man I see!

মেজর বললেন, But originally—well, let me tell you his story.—ওর প্রাক্-ইতিহাসটা বলি শুনুন।

আমি তখন অমৃতসরে। মিলিটারী চাকরী। ব্যারাকের কাছেই একটা ছোট্ট বাড়িতে থাকি। ঘর বেশি নেই—শোয়ার ঘর, স্নানের ঘর আর করিডোরের সঙ্গে একফালি জায়গায় ছোট্ট একটি রান্নাঘর। তার দরজা মাত্র একটি, জানালার বালাই নেই। ধোঁয়া উঠবার অবশ্য একটা চোঙ্গ আছে উপরে।

বেশি ঘরের দরকারও ছিল না অবশ্য। বাসীন্দা আমি একা এবং আমার সঙ্গী মুন্সী। মুন্সীর চাকরীটি বেশ ভালো—ঝোলে-ঝালে-অম্বলে সব তাতেই সে আছে। মুন্সী মিলিটারী ব্যারাকের নাইট-গার্ড, আমার পাচক, অফিসের পিওন, বাগানের মালী এবং জল সরবরাহের লস্কর।

লোক এক হ'লেও মাইনে কিন্তু তার প্রত্যেক কাজের জন্য স্বতন্ত্র। এইজন্য বিভিন্ন কাজে পোষাকও তার বিভিন্ন।

রাত্রে যখন মুন্সী চৌকী দেয়, তখন নীল পাকড়ী পরে রাউণ্ড দেয় আর চিৎকার করে বলে,—জাগতে রহো, হুসিয়ার। সকালে মুন্সী নীল রংয়ের হাফপ্যাণ্ট প'রে ঝাড়ুদার। তারপরই খাকি জামা পরে আমার রান্নাঘরের 'কুক'। এগারটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরেই মুন্সী আমার অফিসের পিওন। তখন তার পোষাক হচ্ছে—লম্বা সাদা জামা, মাজায় বেল্ট আর মাথায় পাকড়ী।

সেদিন রাত্রে অসম্ভব গরম। ঘরের ভিতর থাকবার উপায় ছিল না কারও। বাইরে একটা খাটিয়ার উপর পড়েছিলাম। রাত্তির তখন প্রায় একটা হবে। ফাঁকা উঠোনেও গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠেছি গরমে। বাথরুমে গিয়ে ভিজে গামছায় গা-হাত-পা মুছে নিলাম ভালো করে। বেরিয়ে আসতেই বাঁ-দিকে সেই রান্নাঘর। দেখলাম, শেকলটা খোলা রয়েছে। শেকলটায় অবশ্য তালা দেওয়া হয় না কোন দিনও। মুন্সী বোধহয় শেকলটা তুলে দিতে ভুলে গেছে মনে করে আমি শেকলটা তুলে দিয়ে আবার বাইরের সেই খাটিয়ায় শুয়ে পড়লাম।

শেষ রাত্রের দিকে ঘুমের আমেজটা একটু এসেছে এমন সময় কানে এল—খুব দূর থেকে

যেন অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কে ডাকছে—বাবুজী! কান খাড়া করে রইলাম। আবার সেই ক্ষীণ কণ্ঠের কাতর আহ্বান—বাবুজী!

মুন্সী নাকি? হাক দিলাম—মুন্সী, কোথায় তুমি? উত্তর নেই!

আবার সেই ক্ষীণ কণ্ঠের কাতর উক্তি—বা-বু-জী! লক্ষ্য করলাম, আমার ঘর থেকেই এই ক্ষীণ আওয়াজ আসছে। টর্চ নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। কোথায়ও কেউ নেই! হাক দিলাম কোন হ্যায়?

রান্নাঘর থেকে উত্তর এল,—মৈ চোর হুঁ!

চোরটির দুঃসাহস তো কম নয়! মিলিটারী ব্যারাক, চৌকীদার রয়েছে—এর মধ্যে ঢুকে খোদ অফিসারের ঘরেই চুরি!

জোর গলায় জিজ্ঞাসা করলাম—তুম্ কিয়া মাঙ্গতা? চিচি করতা হ্যায় কাহে?

: বাবুজি, মুঝে ছোড় দোও—বহুৎ সাজা মিলা—ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর এল।

এ সময়ে মুন্সীকে দরকার। হাক দিলাম, চৌকীদার! কোন উত্তর নেই!

চৌকীদার নিশ্চয় তখন ঘুমুচ্ছিল তার ঘরে। কিন্তু ঘর থেকে সে উত্তর দিলে ধরা পড়ে যাবে। তাই বোধ হয় ছুটে খানিকটা দূরে মিনিট কয়েক পরে উত্তর দিল—বাবুজী আতা হুঁ।

খানিক পরেই মাথায় নীল পাগড়ী জড়াতে জড়াতে চৌকিদার বেশী মুন্সী হাজির হ'ল। বাবুজী, কেয়া হুয়া? ঘর মে চোর আয়া-হ্যায়—

চোরের নাম শুনেই চৌকিদার তিন হাত পেছিয়ে গেল!—কোউন ঘর বাবুজী?

: বাবুরচীখানা মে।

: আপকো রাইফেল কাঁহা হ্যায়?

হাসি পেল চৌকিদারের বীরত্ব দেখে। বললাম, রাইফেল কি হবে? চোর আটকা পড়েছে—আমি শেকল আটকে দিয়েছিলাম বাইরে থেকে। চোর আটকা পড়েছে শুনে চৌকিদারের বীরত্ব যেন ফিরে এল। হাতের আস্তিন গুটিয়ে মুন্সী এগিয়ে গেল রান্না ঘরের দিকে—উল্লুক, গিধড কি বাচ্চা, তোর মুণ্ডু ছিড়ে দেবো তুই কোন্ হ্যায় রে?

উত্তর নেই!

লোকটা গরমে মরে গেল নাকি তা'হলে!

শেকল খুলে টর্চ ফেলে দেখলাম, লোকটা আধমরা হয়ে পড়ে আছে মেঝেয়। মুখে হাত দিয়ে দেখাল, একটু জল—

আরও কয়েকজন এসে গেছে তখন। সকলে ধরাধরি করে তাকে বাইরে আনা হ'ল। ক্ষিধের জ্বালায় লোকটা রান্নাঘরে ঢুকেছিল কিছু খাওয়ার আশায়—তারপর তার এই দশা!

সব শুনে সেদিন থেকেই তাকে এই চাকরীতে বহাল করে দিলাম। একা মানুষ। অভাব মিটেছে বোধহয়। এখন আর ও চুরি করে না।

পরী কোথায়?

শ্রীমতী আভা পাকড়াশী

মীরাটে বিরাট চালের ব্যাবসা ভোলাবাবুর। দেশ-বিদেশেও সেই চাল চালান যায় বড় বড় ট্রাকে করে। লক্ষ্মৌতেও যায় তাঁর আড়তের চাল। ভোলাবাবু একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক। কি যে তাঁর উপাধি তা কেউ জানে না। জানলেও বোধ হয় ভুলে গেছে। ঐ ভোলাবাবু নামেই তিনি পরিচিত। মাথায় টাক, টকটকে রং, মোটাসোটা ভোলাবাবু, তাঁর পুজোআচ্ছা আর চালের আড়ত নিয়েই থাকেন। মাঝে-মধ্যে ওখানে একজন স্কাল্পটার মানে মূর্তিকার আছেন, তার বাড়িতে গিয়ে বসেন। স্ত্রী নেই দুজনেরই। তবে ভোলাবাবুর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে আছে। ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছেন, ডাক্তারী পড়তে। তাকে আর চালের আড়তের গদিতে বসাবেন না, এই ইচ্ছে। ভেবেছেন গদিটি দেবেন তাঁর মেয়েকে। সেও বড় দূরে থাকে। সেই সুদূর বাংলা দেশে বিয়ে হয়েছে তার। কচিৎ-কখনো আসে বাপের কাছে। ওখানে তার শরীর ভাল থাকে না।

স্কাল্পটার ভদ্রলোকের ছেলেপুলে কিছুই নেই। একাই থাকে সে। বলে তো তার একটি ভাই ছিল, সে নাকি ছোটতেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। এই মূর্তিকার লোকটি জাতে মারাঠি। ভোলাবাবু আর মূর্তিকারে আলাপটা জমে উঠেছে খুবই।

মূর্তিকারের হাতে মূর্তিগুলি কিন্তু হয় খুব সুন্দর। যেন মনে হয় জীবন্ত। অনেক দূর দূর দেশ থেকেও অর্ডার আসে ঐ শিল্পীর কাছে। এই তো সেদিন লক্ষ্মৌ-এর এক নবাব সাহেব ওকে দুটো সিংহের মূর্তি আর একটা মানুষ প্রমাণ পরীর মূর্তি তৈরী করে দেবার অর্ডার দিয়েছেন।

নবাব সাহেবের দ্বিতীয় বিবির প্রথম ছেলে হয়েছে। তারই জন্মদিন। বিরাট ধুমধাম করে জন্মদিন হবে। আগাগোড়া প্যালেস ঢেলে সাজানো হচ্ছে। পূর্বপুরুষের তৈরী যে সিংহ মূর্তি দুটো আছে, গেটের দু'ধারে, সে দুটো ভেঙ্গে গেছে। তাই নতুন দুটো সিংহ চাই, আর বাগানের ফোয়ারার ওপর যে পরী আছে, তার হাত ভেঙে গেছে, তাই একটি নতুন পরীও চাই, বলেছেন বেগম সাহেবা। সবই তো হ'ল। এখন মূর্তিও তৈরী, উৎসবও আসন্ন, কিন্তু জিনিসগুলি আনার অভাবে পড়ে আছে। কে আনবে? আর কি করে আনা যায়? সেই এক দুশ্চিন্তা। বাড়ির বিরাট ভোজের জন্য চালের অর্ডার গেল সোজা ভোলাবাবুর কাছে। তখন নবাব সাহেবই ভোলাবাবুকে অনুরোধ করলেন, যেন তিনি তাঁর পাঠানো চালের সঙ্গে মেহেরবানি

করে মূর্তিগুলিও পৌঁছে দেন তাঁর প্রাসাদে। সুতরাং ঐ চালের ট্রাকেই ভাল ভাবে প্যাক করাঅবস্থায় মূর্তি-গুলি মিরাট থেকে লক্ষ্ণৌ রওনা হয়ে গেল।

মূর্তিকারের বাড়িতে ভোলাবাবুর সঙ্গে মূর্তিকারের আলাপ-আলোচনা চলছে।

জন্মদিনের তারিখের তিনচার দিন আগেই পৌঁছে গেল মূর্তিগুলি। অনেক সাবধানে নামানো হ'ল প্যাকিং-বক্স তিনটি! দুটো চার-কোণা আর একটা মস্ত লম্বা-চওড়া বাক্স নামান হ'ল।

জাফরাণী রং ওড়না আর সাটিনের সালোয়ার কামিজ পরা ছোট ছোট মেয়েরা তাদের পায়ের খড়ম বাজিয়ে আর মেহদি মাখা হাতের চুড়ি বাজিয়ে ছুটে এলো দেখতে। ছোট ছোট ছেলেরা মাথায় সলমা-চুমকির কাজ করা ভেলভেটের টুপি আর চুড়িদার পাজামা কুর্তা পরে দৌড়ে এলো সিংহ আর পরী দেখতে। খিড়কির আড়ালে অতিথি-অভ্যাগতা আর বেগম সাহেবাদের ভিড়। সকলেরই মহা কৌতূহল। কিন্তু নবাব সাহেব বললেন, থামো, আগে রাজমিস্ত্রী ডেকে পাঠাই, সে এসে পুরনো সিংহ আর পরী আগে নাবিয়ে দিক, তারপর প্যাকিং বাক্স খুলে নতুন সিংহ আর পরী বার করা হবে।

এদিকে আরও অনেক অর্ডার পেয়েছে ঐ ভাস্কর। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই তার। সারা দিন-রাত কাজ করে চলেছে। ছেনি আর হাতুড়ির শব্দ উঠছে ঠক্ ঠক্ ঠক্।

ভোলাবাবুর চালের কারবারও পুরো দমে চলেছে। এখন শীতকাল, নতুন চাল উঠেছে—রকম রকম আসছে আড়তে। কোনটা বা সরু কোনটা বা মোটা, কোনটার বা সুন্দর গন্ধ। কত বা নাম সব চালের—শর্কর চিনি, বাদশা ভোগ, দেরাদুনী, পাটনাই হরেকরকম চাল।

এদিকে নবাব বাড়িতে মিস্ত্রী এসেছে। পুরোনো মূর্তি সরানো হয়েছে। পরীকে অত উঁচু মঞ্চের ওপর থেকে নামাতে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন লোকও হিমসিম খেয়ে গিয়েছে। তার গলায় দড়ি বেঁধে বাঁশের ঠেকনা দিয়ে অনেক কষ্টে নামানো গেছে। সে যেন একটা দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল! বহু লোক ভেঙ্গে পড়েছিল ঐ পরী নামানো দেখতে। অনেকে আবার একথাও বলাবলি করতে লাগল, যে নবাব সাহেবের এই কাজটা ঠিক উচিত হচ্ছে না—কতদিনের পরীমূর্তি এটি, ও যেন এই বাড়ির মঙ্গলদায়িনী—ওকে এভাবে নড়ানো যেন এই প্রাসাদকেই অপমান করা! যাক্ এবার নতুন পরী বসানো হবে। তাহলেই বাগিচার রোশনাই খুলবে। সমস্ত প্যালেসটাই মেরামত করে, চুনকাম করে, ঘষে-মেজে ঝকঝকে করে তোলা হয়েছে। এখন শুধু ঐ মূর্তি ক'টি বসানো বাকি।

কিন্তু ঐ গুদাম-ঘরে যেখানে প্যাকিং বাক্সগুলি রাখা হয়েছে, সেখানে যায় কার সাধ্য! ক'দিন ধরে বিষম পচা গন্ধ বেরুচ্ছে সেখানে। প্রথম প্রথম অতটা তীব্র ছিল না গন্ধটা। চাকর-দারওয়ানরা ভাবছিল হয়তো ইঁদুর বা ছুঁচো মরে পচেছে ও-ঘরে। কিন্তু নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে কেউ আর সাফ করবার ফুরসত পায়নি। আজ বাক্সগুলি খোলা হবে। কিন্তু ঘরে ঢোকাই দুঃসাধ্য হয়েছে। গন্ধের চোটে বমি উঠে আসছে সকলের!

খবর গেল নবাব সাহেবের কাছে—ভীষণ বদ্‌বু ঐ গুদামে। তিনি এসে কিন্তু জোর ধমক লাগালেন। তখন তারা কোনরকমে ভেতরে ঢুকে চৌকো বাক্স দুটোকে বাইরে নিয়ে এলো। খোলা হ'ল বাক্স। চমৎকার গড়নের সিংহ বেরুল দুটো। তাদের ভাবে-ভঙ্গীতে যেন পশুরাজের গাম্ভীর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এবার পরীর বাক্সটা অনেক কষ্টে ধরাধরি করে সকলে বাইরে নিয়ে এলো খোলার জন্য। এইটার মধ্যে থেকেই যে উৎকট পচা গন্ধটা বেরুচ্ছে এবার বুঝতে পারল ওরা। এক দিকের তক্তা চাড় দিয়ে তুলতেই জুতোসুদ্ধ একটা মানুষের পা বেরিয়ে এলো। তাই দেখেই ছেনি-হাতুড়ি ফেলে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে, বলল, হুজুর ইয়ে এক মুর্দা হ্যায়, হাম লোগ নেহি ছুঁয়েঙ্গে। এটা একটা মড়া, আমরা ছোব না। আশ্চর্য! পরী গেল কোথায়? আর তার বদলে এই লোকটা ভরে দিল কে? কারই বা দেহ এটা? উৎসবের দিনে বাড়িতে একটা মড়া বেরুতে সকলেই ভীষণ মুষড়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত পুলিসে খবর গেল।

পুলিস এসে লাশ বের করল। মড়া পচে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে ক'দিনে। তার মাথার পেছনে একটা গভীর গর্ত। বোঝা গেল তাতেই মৃত্যু হয়েছে লোকটির। কিন্তু কে এই মানুষটা? সনাক্ত করাও কঠিন ব্যাপার। উৎকট পচা গন্ধে সারা বাড়ি ভরে গেল!

প্রথমটা তো নবাব সাহেবকে খুব খানিক হয়রান করল পুলিস—থানা আর বাড়ি ছুটোছুটি

করতে গিয়ে তাঁর উৎসবের আনন্দ মাথায় উঠল। তাঁর বাড়ি থেকে যখন লাশ বেরিয়েছে, তখন সহজেই সন্দেহটা তাঁর ওপরে হয়। মনে হয় কারুর সঙ্গে তাঁর শত্রুতা ছিল, তাকে নিকেশ করে নবাব সাহেব, নিজেই পরী সরিয়ে ফেলে, লাশটা পরীর বাক্সে পুরেছেন। কিন্তু পুরো বাড়িখানা তল্লাসী করেও সেই পরী পাওয়া গেল না। উপরন্তু নবাব সাহেবের একবাড়ি লোকের সামনে অপমানের চূড়ান্ত হ'ল। উনি যত বলছেন, আমিই যদি খুন করব তবে আমিই আবার কেন যেচে গিয়ে পুলিসে খবর দিতে যাব? এই সোজা কথাটা আপনারা বুঝছেন না কেন, বলুন তো? পুলিস বলে, ওটাই তো আপনার চাতুরী। নিজে যে খুন করেছেন সেটা এইভাবে চাপা দেবার চেষ্টা।

এবার তিনি তাঁর মূর্তি আনাবার বৃত্তান্ত পুরোপুরি খুলে বললেন পুলিসদের। পুলিস তখন মীরাটে গিয়ে চালের আড়ত আর মূর্তিকারের বাড়ি সব তন্ন তন্ন করে সার্চ করল। তাছাড়া মীরাট থেকে লক্ষ্ণৌ যাবার রাস্তার দু'ধারে জঙ্গলের মধ্যেও খোঁজ করা হ'ল। পরী তো কোথাও পাওয়া গেল না। তার ওপর ওখানকার স্থানীয় লোকদের জেরা করে তারা জানল—যেদিন আড়তের চাল লরীতে লক্ষ্ণৌ গেছে, সেদিন এবং তার আগের দিন মূর্তিকার তার ঘরেই সারাদিন সারারাত কাজ করেছে। কোথাও যায়নি। তারা পাশাপাশি থাকে। একেবারে এক পাড়ার পড়শী। তারা জানবে না তো জানবে কে? কয়েক দিন ধরেই প্রায় সারারাত ধরে মূর্তিকারের ঘরে আলো জ্বলেছে আর ছেনি-বাটালির শব্দ উঠেছে ঠক্ ঠক্ ঠক্। ওর সঙ্গে তো আর কেউ থাকে না যে ঐ শব্দ করবে। লোকটা তো একাই থাকে। রাত্রের অত শব্দে ঘুম না হওয়ায় ওরা বিরক্ত হয়েই নালিশ করেছিল মূর্তিকারকে। সে বলেছিল, কি করব বল ভাই বড় বেশী কাজের চাপ পড়েছে। তবে সে খুন করল কখন? এইসব ব্যাপার জেনে গিয়ে পুলিস আবার সেই নবাব সাহেবকেই খুনী বলে ধরল।

তিনি কোন রকমে জামিনে খালাস হয়েই, নিজেই বহু টাকা খরচ করে ইকবাল আসলাম নামে একজন পাকা ডিটেকটিভকে নিযুক্ত করলেন, এই ব্যাপারটার কিনারা করার জন্য। সে এসে নবাব সাহেবের কাছে বসে পুরো বৃত্তান্ত শুনল, তারপর পুলিসের কাছ থেকে সেই মড়ার জুতোর মাপ, পরনের কাপড়ের ধোপার বাড়ির চিহ্ন, সব নিয়ে মীরাট রওনা হয়ে গেল।

সেখানে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করে যা দেখল, তাতে তো তার চক্ষুস্থির! ঐগুলি তার সেই চালের আড়তদার ভোলাবাবুর জামা জুতো। কিন্তু ভোলাবাবু যে জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে। পুরো দমে আড়তের কাজ চালাচ্ছে। তবে? কিন্তু ইকবাল আসলাম ঘাগী গোয়েন্দা, ছাড়বার পাত্র নয়। সে ছদ্মবেশে হিন্দু গোমস্তা সেজে ভোলাবাবুর চালের আড়তে ক্যাসিয়ারের

কাজ আদায় করল। অবশ্য তার জন্য তাকে অনেক বুদ্ধি খাটাতে হ'ল। অনেক কথা বানিয়ে বলতে হ'ল, তবে ভোলাবাবু রাখল ওকে।

ইকবালের কথায়-বার্তায় এমন একটা গেঁও ভালমানুষীর ছাপ লাগান আর এমন নম্র ব্যবহার যা সহজেই ভোলাবাবুর বিশ্বাস কিনে নিল। কোন রকম সন্দেহই তাঁর মনে আসতে পেল না।

ইকবাল কাজের সুরুতেই খাতায় সই-এর গরমিল পেল। আবার সেটা মিলিয়ে দেখল যে গরমিলটা আরম্ভ হয়েছে নবাব সাহেবের বাড়ি চাল যাবার পর থেকেই। তারপর পেলো কতকগুলি চিঠি, ছেলে লিখছে বাপকে—"বাবুজী, তুমি তো আগে আমাকে এমন করে বকে ধমকে চিঠি লিখতে না। এখন এমন চিঠি লেখ কেন? আর আমার জন্য তো তোমাকে বেশী টাকা পাঠাতে লিখিনি যা বরাবর পাঠাতে তাই তো পাঠাতে বলেছি। তবে তুমি ওরকম কথা লিখেছ কেন? আর নিজে হাতেই বা চিঠি লেখ না কেন? তোমার কি অসুখ করেছে পত্রপাঠ উত্তর দিও।" এরপর আরও ক'খানা চিঠিতেও ছেলে খালি বাপের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আর টাকা চেয়েছে। আরও চিঠি এসেছে মেয়ের বাড়ি থেকে। মেয়ে শাওলীতে আসতে চেয়ে বাপকে চিঠি লিখেছিল, কিন্তু কোনো উত্তর না পেয়ে আবার অনেক দুঃখ করে লিখেছে। এবার ইকবাল বুঝতে পারল যে, এই ভোলাবাবু জাল, আসল নয়। সেই আসল ভোলাবাবুই খুন হয়েছে। এখন তার চিন্তা হ'ল দুটো, একটা কে সেই ভোলাবাবুকে খুন করেছে? আর এ যে জাল ভোলাবাবু, সেটা প্রমাণ করবে কি করে? ঠিক মত প্রমাণ না দেখালে পুলিসে মানবেই না যে ও জাল। আশ্চর্য, কেউই তো ধরতে পারেনি যে লোকটা আসল ভোলাবাবু নয়, নকল। খুব ধোঁকা দিচ্ছে সবাইকে। আর এই জন্যই আড়তের সব পুরনো লোক বিদেয় করে নতুন লোক ঢোকাচ্ছে। তারও বরাতে চাকরী জুটছিল অবশ্য খানিকটা এই কারণেই।

চেহারার সাদৃশ্য তো নিশ্চয়ই আছে, তার সঙ্গে গলার আওয়াজেও খুব মিল আছে বোধহয়। যার জন্য আজ অবধি কেউ ভদ্রলোককে সন্দেহ করেনি। তবে কি এই লোকটাই খুন করেছে? কিন্তু কেন করেছে? টাকার জন্য? অতবড় আড়তের মালিক হওয়া কম কথা নয়। কিন্তু আসলে এই লোকটা কে? কোথাকার লোক? এখন কি ভাবে ও নিজের কাজ সুরু করবে? এই সব ভাবে আর ভোলাবাবুর পায় পায় ঘোরে ইকবাল। বলে, হুজুর যে মেহেরবানি করে তাঁর গদিতে ঠাঁই দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতার্থ। না হলে আজ আমার কি দশাটাই না হ'ত। ভোলাবাবুর সব কাজে সাহায্য করে করে, অনবরত তাঁর কাছে কাছে থেকে, সহজেই বিশ্বাসভাজন হ'য়ে উঠল ইকবাল। আর ভোলাবাবুর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে লাগল।

ইকবাল তার নকল চেহারাটি বানিয়েছে চমৎকার। মাথায় তেল জবজবে বাবরি চুল, নাকে

ওপর মাছি-মারা ছোট্ট গোঁফ। গায় একটা ফতুয়া আর পরনে আধময়লা ধুতি। এবং সব সময় হাত কচলে অনুগতের হাসিতে হেঁ-হেঁ করেই আছে। একেবারে বিনয়ের অবতার! হুকুমবরদার।

ধীরে ধীরে ভোলাবাবুর সুকাজ-কুকাজ দুয়েরই অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে উঠল ইকবাল। এই ভোলাবাবু বাইরে সাত্বিকতার ভান করতেন, যাতে আসল ভোলাবাবুর মত মনে হয় তাঁকে। রোজ গঙ্গা-স্নান করা, পুজাপাঠ, পণ্ডিত ভোজন, কীর্তন, ভজন শোনা এই সব করতেন আর এদিকে লুকিয়ে মূর্তিকারের বাড়ি গিয়ে মাংস মদ খেতেন। আর মূর্তিকারের সঙ্গে কি সব গুজগুজ করতেন। ইকবালও তাঁর সাকরেদ হিসেবে এই মদ মাংসের ভাগ পেত। দোকানের খাতা হ'ল দুটো। একটা সদরি আর একটা অন্দরি। এই সবই ইকবালের ওপর ভার। সে শুধু ঐ ভোলা-বাবুই নয় ঐ মূর্তিকারকেও তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে। নানা ভাবে সাহায্য করে তাকে। ভাল তামাক খাবার নেশা আছে মূর্তিকারের। ঐ তামাক ইকবাল লরির ড্রাইভারকে বলে সংগ্রহ করে দেয়। মাংসটা নিজেই রান্না করে। মনে মনে ভাবে ভাগ্যিস আম্মাজান রান্নাটা শিখিয়েছিল। তা ডিটেকটিভ হতে গেলে সবজান্তাই হতে হয়।

মাস দুয়েক পর হঠাৎ একদিন ভোলাবাবুর চালের আড়তে আবার পুলিস হানা দিল।

অবশ্য ইকবালেরই নির্দেশে। তারা সব কিছু ওলট-পালট করে খুঁজল। কিন্তু যা ওরা চাইছিল সেই সড়কির মত ছুঁচলো ধারালো কোন অস্ত্র, যা দিয়ে মৃত ভোলাবাবুর মাথার পেছনে গভীর গর্ত করা হয়েছিল, তা ওরা পেল না। ভোলাবাবু সেই পুলিস ইনস্পেক্টরকে ভেতরে ডেকে ইকবালকেই বললেন তাঁকে একটু ভাল রকম পান সরবত খাইয়ে দিতে।

ঐ পুলিস অফিসারটির সঙ্গে এরপর থেকে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ করেন ভোলাবাবু। ছোট শহর মীরাট। সকলেই প্রায় সকলের চেনা। একদিন এই অফিসরকে মূর্তিকারের সেই ভোজের আসরে নিমন্ত্রণ করলেন ভোলাবাবু। তাঁর ভয়, ভবিষ্যতে আবার এই অফিসরটি তাঁকে না বিরক্ত করে। একেই তো বার বার আড়ত সার্চ হওয়ায় বাজারে একটু বদনামই হয়েছে তাঁর। সুতরাং মাংসর বিরিয়ানী পোলাও, কোপ্তা, কাবাব খাইয়ে যদি বশ করা যায়।

তখন গরম কাল। তবে একটু আগেই মানে সন্ধ্যের ঝোঁকে আঁধি ওঠায় আবহাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। দইয়ের লস্যি বা ঘোলের সঙ্গে সিদ্ধি মিশিয়ে বার দুয়েক পান করেছেন ভোলাবাবু। ইকবালও প্রসাদ পেয়েছে। এইবার সেই অন্দরি খাতার হিসেব থেকে টাকা নিয়ে বাজারে গেল ইকবাল, রাত্রের মৌতাতের জন্য মাংস কিনতে। ঐ ফাঁকে থানাটাও একবার ঘুরে এলো। তার বন্ধু, মানে সেই পুলিস অফিসরকে কিছু নির্দেশ দিয়ে এল।

মূর্তিকারের বাড়ির আসরে আজ কিন্তু ইচ্ছে করেই বাদ পড়েছে ইকবাল। বলেছে আজ

তার শরীরটা তেমন জুতের নেই। আজকের দিনটা তাকে ছুটি দেওয়া হোক। অবশ্য সে সব যোগাড়-যন্ত্র করে দিয়ে তারপর ছুটি নেবে। এতে প্রথমে আপত্তি করলেও পরে রাজী হয়েছেন ভোলাবাবু। একটু খুশীর সঙ্গেই যেন বলেছেন—তাহলে যাবার সময় মুন্সিজী তুমি গোটাকতক কাবাব নিয়ে যেও।

রাত একটু বাড়তে ধীরে ধীরে বাজারে লোকজন কমে এলো। সেদিনকার মত আড়ত বন্ধ হ'ল। ইকবালও মূর্তিকারের বাড়ি থেকে সব গোছ করে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

মূর্তিকারের তো আজ কথা বলার পর্যন্ত সময় নেই। কোথা থেকে কি অর্ডার পেয়েছে, ক'দিন ধরে দিনরাত সমানে কাজ করছে। পাড়ার লোকের তো প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। একে দুর্দান্ত গরম পড়েছে তায় সমানে এই ঠক্ ঠক্ ঠক্ শব্দ।

গুদামের পেছনের দরজা দিয়ে ভোলাবাবু বেরুলেন। হঠাৎ কি মনে হতে আবার ঢুকলেন নিজের ঘরে। ও গালের আঁচিলটা লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন। ব্যাটা পুলিসের বাচ্চা এক্ষুনি ধরে ফেলত।

মূর্তিকারের কোয়ার্টারে মাত্র দুটি ঘর। একটিতে সে জোর আলো জ্বালিয়ে কাজ করছে। অন্য ছোট ঘরটিতে ভোলাবাবু পুলিস অফিসরটিকে নিয়ে বসেছেন। মাঝখানের ছোট টেবিলে রয়েছে পানীয়র গেলাস আর প্লেটে রয়েছে মাংসের কাবাব। পুলিস অফিসরটি ভোলাবাবুর দিকে মুখ করে বসেছে। তার ঠিক পেছনেই রয়েছে একটি দরজা। সেই দরজা দিয়ে ওঘরের জোর আলো এসে পড়েছে অফিসরটির মাথার পেছনে, পিঠে। এঘরের আলো আবার তেমনি মৃদু। ঐ দরজার পাশেই একটা ছেঁড়া দড়ির খাটিয়া দাঁড় করানো রয়েছে। তার ওপর দিয়ে একটা চাদর ঝুলিয়ে সেটাকে সভ্য করা হয়েছে। ইকবালই করেছে এসব। উপস্থিত সে দাঁড়িয়েও আছে ঐ খাটিয়ার পেছনে। মুসলমান মেয়েরা যেমন জানালার সামনে একটা পর্দা ঝুলিয়ে তার আড়াল থেকে রাস্তা দেখে, সেও তেমনি ঐ চাদরের আড়াল থেকে দেখছে সব। কিন্তু একটা ব্যাপারে ও যেন কেমন চমকে ওঠে। একটা যে কিছু আজ ঘটতে চলেছে এটা সে আন্দাজ করলেও, এতটা ভাবেনি। মূর্তিকার তো এঘরে দাঁড়িয়ে, তবে ওঘরে শব্দ করছে কে ? তবে কি এরা আরও লোক এনেছে আজ ? যাই হোক এবার ওদের কথাবার্তায় মন দেয় ইকবাল।

মূর্তিকার বলছে, এই যে পুলিস সাহেব নমস্তে! ভাল, ভাল, খুবই আনন্দের দিন আজ। আমার এই গরীবখানায় আপনি এসেছেন, এ জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কথা বলছে আর কেমন একটা ক্রুর দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে এক পা এক পা করে পুলিস সাহেবের চেয়ারের দিকে এগুচ্ছে। তিনি একবার যতটা সম্ভব ঘাড় ঘুড়িয়ে মূর্তিকারকে সম্ভাষণ করলেন। তারপর আবার সামনে ফিরে খানা-পিনায় আর ভোলাবাবুর হাসি-মস্করায় মন দিলেন। মূর্তিকার তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে, তবে এখনো কিন্তু ঘরে ছেনি-বাটালির শব্দ উঠছে। এইবার ইকবাল মূর্তিকারের

পেছনে রাখা হাত দুটো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ওকি! ওর হাতে যে একটা মূর্তির মুণ্ডু আর সেই মুণ্ডু থেকে বেরিয়ে আছে একটা লোহার শলা—এইবার মূর্তিকার নিঃশব্দে সেই মুণ্ডুটা দু'হাতে মাথার ওপর তুলেছে। আর তার লক্ষ্যস্থল হ'ল পুলিস সাহেবের ঘাড়! ভোলাবাবু তাঁকে কথায় ব্যাপৃত রেখেছে; সে বেচারী টেরও পাচ্ছে না যে কত বড় সর্বনাশটা হতে যাচ্ছে তার। সাক্ষাৎ যমদূত যে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে, তা সে জানতেও পারছে না!

আর দেরি করে না ইকবাল, নিমেষের মধ্যে খাটিয়ার পেছন থেকে বেরিয়ে নিজের পিস্তলের নলটা ঠেকিয়ে ধরে মূর্তিকারের পিঠে। অন্য হাতে বাঁশিটা বাজিয়ে দেয়। মূর্তিকার কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বটে, কিন্তু দাঁত কড়মড় করে মুখে গালাগাল দিল—নেমকহারাম, কুত্তা, তুই যে টিকটিকি এ আমি আগেই আন্দাজ করে তোকে রাখতে বারণ করেছিলাম ছোটেলালকে! যেমন শোনেনি! ভোলাবাবু ছিল পালিয়ে যাবার তালে, তাকে ধরে ফেলেছে পুলিস অফিসর। এবার ঘর ভরে যায় পুলিসে। তারা এতক্ষণ সংকেতের অপেক্ষায় গলির মধ্যে অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়েছিল।

নবাব সাহেবের কলঙ্কমোচন হ'ল। এতদিনে আসল খুনী ধরা পড়ল। সেদিন পুলিস মূর্তিকারের ঘরে ঢুকে দেখেছিল মস্ত বড় একটা প্যাকিং-বক্স তৈরী। শুধু লাশটা তাতে ঢুকিয়ে ওপরের তক্তাটা কাঁটা পেরেক দিয়ে ঠুকে দেওয়া বাকি ছিল। আর কোণের দিকে একটা টেপ-রেকর্ডার চলছিল, তাতেই ছেনি-বাটালির শব্দ উঠছিল ঠক্ ঠক্ ঠক্। নকল ভোলাবাবু ওরফে ছোটেলাল ঐ মূর্তিকারের আপন ভাই। শহরের কুখ্যাত গুণ্ডা।

আসল ভোলাবাবুর সঙ্গে খানিকটা ওর চেহারার মিল ছিল সত্যি, বাকিটা মেকাপ। এবারও একটা বড় মূর্তির অর্ডার এসেছিল আগ্রা থেকে। তার বদলে যাচ্ছিল পুলিস সাহেবের লাশ।

এর মানে পাড়ার লোকেরা জোর পাওয়ারের আলো জ্বলতে দেখেছে আর টেপ-রেকর্ডারের শব্দই শুনেছে, আর জেনেছে পরী বা মূর্তি তৈরী হচ্ছে। আসলে মূর্তিকার পাশের এই ছোট ঘরে খাটিয়ায় শুয়ে মদের নেশায় অঘোরে ঘুমিয়েছে। ঐ মুণ্ডুটা একটা মূর্তির শরীর থেকে নিয়েছিল। ঐ শলার মত শিকটা ঐ মূর্তির গলার ফুটো দিয়ে চালিয়ে দিলে খাপে খাপে বসে যেত। এইজন্য পুলিস আজ সার্চ করে কিছু পায়নি। ঐ মূর্তিকারের কোয়ার্টার ছিল যত চোরাই কারবারের আস্তানা। ইকবাল অবাক হয়ে ভাবে, একই মানুষের মধ্যে কি করে এমন সৃষ্টি আর লয় লুকিয়ে আছে? যে শিল্পীর হাতের যাদুতে মূক পাথরে জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে, তারই হাতের নির্মম আঘাতে আবার জীবন্ত মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে! কি অদ্ভুত মানুষ ঐ মূর্তিকার! আসলে পরী ও তৈরীই করেনি। তার বদলে পাঠিয়েছিল ও ভোলাবাবুর লাশ! তাই পরী খুঁজে পাওয়া যায়নি। যেমন এবারও প্যাকিং-বাক্সে ভরছিল পুলিস সাহেবের দেহ।

চার্লি চ্যাপলিন

শ্রীঅশোক গুহ

এই তো করসিয়ার গ্রাম !

বেশ নিরিবিলি। পথের দু'ধারে বড় বড় বাগান-ঘেরা বাড়ি। সেখানে গাছে গা
চেরীফল থোলো থোলো ঝুলে আছে, কোথাও বা থোলো আপেল আর পীয়ার ফল। দেখে চো
জুড়োয়, নোলায় জল সরে। আবার সব্জী বাগানও আছে। দেখতে দেখতে চলেছি।

একটা বাগান-ঘেরা বাড়ির সুমুখে এসে থেমে পড়লাম, এই তো সেই বাড়ি। এই ে
মানোর স্থ বান !

কাউকে তো দেখতে পাচ্ছিনে। কি করব ভাবছি, এমন সময় কয়েকটি ছেলেমেয়ে নি
এসে দেখা দিলেন এক মহিলা।

কাকে চাই ? তিনি শুধালেন ?

বললাম, বাড়ির কর্তাকে।

আসুন।

তাঁর সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লাম, বিরাট বাড়ি। শুনলাম—সাঁইত্রিশ একর জ
তাতে ক'বিঘে হয়, মনে মনে হিসেব কষতে গেলাম। অঙ্কে একটু কাঁচা, তাই হিসেব আর হল ন
বাড়ির ভেতরে আপেল আর ফলফুলের বাগিচা, আবার সব্জী বাগানও আছে।

মস্ত লন পেরিয়ে এবার এসে উঠলাম বারান্দায়। সেখানে বসার জায়গা আছে। ব
পড়লাম। ভদ্র মহিলা চলে গেলেন বাড়ির কর্তাকে খবর দিতে। ছেলেমেয়েরাও চলে গেল।
বসে আছি, সূর্য ডুবছে। সোনালী আলো চল্‌কে পড়ছে চারিদিকে।

দূরে দেখা যায় রুপোর রেখার মতো হ্রদ, তার ওপারে পাহাড়ের সার। বসে বসে দেখছি

এমন সময় কার পায়ের শব্দ। চমকে ফিরে তাকালাম। দেখি একজন ভদ্রলোক।
নন, কিন্তু ঢ্যাঙাও নন। মাথার চুল সাদা। সুন্দর তাঁর চোখ দুটি। সে-চোখ হাসিতে যেমন
ওঠে, তেমনি দরদে কাঁদতে পারে, আবার চোখের কোণে ঝিলিক দিয়ে যায় কেমন যেন
দুষ্টুমি। তাকিয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক বললেন, কি মিলিয়ে নিচ্ছেন ? ছোট্ট গোঁফ নেই, গায়ে নেই জোব্বা, মাথায়
আঁটো টুপী। পায়ে নেই বেঢপ জুতো, হাতে নেই ছড়ি। কিন্তু সে তো চার্লি, আমি তো চা
চ্যাপলিন। আমি তো সে নই।

চার্লি চ্যাপলিন

বললাম, আপনিই সেই, সে-ই আপনি।

কে বললে? চ্যাপলিন হাসলেন। সে কি আমার মত এমন ভদ্দর লোক? সে কি আপনার দেশের মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে গল্প করতে বসে যায়। সে কি পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে বসে ডিনার খায়? জানেন, এই বাড়িতে নেহেরু এসেছিলেন? কত কথা হল। কিন্তু চার্লি কিন্তু কথা বলেনি, বলেছে চার্লস। যাহোক আপনি কাকে দেখতে এসেছেন বিদেশী বন্ধু? চার্লিকে তো দেখি, উত্তর দিলাম, ছবিতে, তবু চার্লি ও চার্লস দুজনকেই দেখতে এসেছি। আপনার কাছে শুনব আপনার কথা, আপনার ঐ ভবঘুরে চার্লির কথা।

চার্লস তাকিয়ে রইলেন দূরে হ্রদের দিকে, তারপর বললেন, মা ছিলেন অভিনেত্রী। গলা খারাপ হয়ে গেল, গান গাইতে পারেন না। আমার তখন পাঁচ বছর বয়েস, আমি মার সঙ্গে গেছি থিয়েটারে। মা গান ধরেছেন, হঠাৎ গলা ভেঙে গেল। স্বর শোনাই যায় না, যেন ফিস ফিস করছে। যারা এসেছে দেখতে, তারা তো হাসছে, বেড়াল ডাকছে। মা কি আর করবেন, লজ্জায় দুঃখে মঞ্চ থেকে চলে এলেন। ম্যানেজার জানতেন, আমি মার কাছে গান শিখেছি, হাসির গান। তিনি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। আমি গাইতে শুরু করলাম।

টাকা-পয়সা এসে পড়তে লাগল মঞ্চের উপর। আমি হঠাৎ গান থামিয়ে বললাম, আমি আগে পয়সা কুড়োব, তারপর গান গাইব। শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাসির ধুম পড়ে গেল। ম্যানেজার রুমাল নিয়ে ছুটে এলেন। তিনি আর আমি কুড়োতে লাগলাম। তারপরে আবার গান শুরু হল। মার গলা নকল করেই গাইতে লাগলাম, এমন কি ভাঙা গলারও নকল করলাম। আবার হাসি, এসে আমাকে কোলে করে নিয়ে গেলেন। সেই আমার প্রথম অভিনয়।

তারপর?

তারপর মা পাগল হলেন, আবার সুস্থ হলেন। আমরা ওয়ার্কহাউসে গিয়ে রইলাম। মার সঙ্গে তখন দেখা হোত কালেভদ্রে, সে এক দুঃখের জীবন। ওয়ার্কহাউস থেকে গেলাম অনাথ আশ্রমের ইস্কুলে। তখন আমার সাত বছর বয়েস। দুষ্টুমি তো এ বয়েসের ছেলেরা করবেই, কিন্তু

শাস্তি ছিল ভীষণ। কথায় কথায় বেতের বাড়ি। একদিন আমারও পালা এল। কারা কাগজ ছিঁড়ে আগুন জ্বালিয়েছিল, আমি জানতাম না। তবু আমি ধরা পড়লাম, আর কবুল করে ফেললাম—আমি দোষী। বেতের বাড়ি ভাগ্যে জুটল। এই যে অন্যায় ওরা করল, এতে আমি রাগিনি। শুধু ব্যথায় কেঁদে উঠলাম। আমার দাদা সিডনী তো কেঁদে আকুল। তারপরে সেখান থেকে বাবার কাছে এলাম, সেখানে সৎ-মা। মা আবার সুস্থ হয়ে সেলাইয়ের কাজ নিলেন আমরা আবার একসঙ্গে আছি। ইস্কুলে ভর্তি হলাম। এদিকে অভিনয়ের নেশাও বাড়তে লাগল। এমন সময় বাবা মারা গেলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে না থাকলেও টাকা দিতেন সেই টাকা বন্ধ হয়ে গেল। আমি এবার ফুল বিক্রিওয়ালা হলাম। কিন্তু মার সে-কাজ ভাল লাগল না। অনেক রকম ব্যবসার কথা ভাবছি, কিন্তু হাতে পুঁজি নেই। এদিকে ইস্কুলে পড়ার খরচও আর চলে না। তাই ইস্কুল ছেড়ে কাজের খোঁজে বেরুলাম। এক দোকানে ফাই-ফরমাস খাটার কাজ পেলাম। তারপরে এক ডাক্তারের ওখানে ঝাঁটপাট দেওয়া কাজ। তারপর ডাক্তারের বাড়িতে চাকরগিরি। কত কি যে করতে হল।

বললাম, আমাদের দেশে একে বলে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, তার মানে চামারের কাজ থেকে শুরু করে পাদ্রী-গরি পর্যন্ত।

তিনি হেসে বললেন, তা বলতে পারেন। কাঠও কেটেছি, তারপরে অভিনয়ের দলে ভিড়ে গেলাম, এই আমার বরাত ফিরতে শুরু হল।

আপনি বুঝি বরাতে বিশ্বাস করেন? বললাম।

করি বইকি। মানুষের দুঃখ কি চিরদিন থাকে, সুখ আসবেই। আমার জীবনে তো দেখেছি। তারপরে শুনুন, বাচ্চা ছেলের পার্ট করি, আর আমার বন্ধু নেই। দাদা চলে গেছে জাহাজে লস্কর হয়ে। তাই একটা খরগোস কিনে ফেললাম। সেই খরগোস নিয়ে রাতে শোবার ঘরে রেখে দিই, একদিন ধরা পড়ে গেলাম। সেদিন ফিরে এসে দেখি, খরগোশটি নেই। বাড়ির মালিকানীকে জিজ্ঞেস করলাম, কই গো, আমার খরগোশ কই!

সে বললে, কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে, নয়তো পালিয়ে গেছে।

খরগোশের জন্যে আর দুঃখ করে কি হবে! দুদিন পরে সেখান থেকে আমাদের নাট্য দল চলে গেল আর-এক জায়গায়, এমনি করে আমার ঘোরা শুরু হল। ইংলণ্ডের নানা জায়গায় ঘুরি, প্যারিসেও গেলাম; আবার একদিন আমেরিকায় চলে এলাম। আর এইখানেই ফিল্ম থেকে ডাক পড়ল।

তখন কেমন ছিল ছায়া-ছবির অবস্থা?

ছায়া-ছবি? হাসলেন চ্যাপলিন, তখন একেবারে বাচ্চা, হামাগুড়িও ভাল করে দিতে পারে না। তখন একদিনে একখানা ছবি তৈরি হয়। আর সে ছবিতে থাকে মারামারি, নয় তো সাততলা বাড়ি থেকে একটা তার ঝুলছে, সেই তার বেয়ে কেউ চলেছে, কোন গল্প নেই, যা-হয় তুললেই হল। আমি তখন নাটুকে-দলে হাসির পার্ট করে নাম করেছি, ওরা বললে, তোমাকে হাসির পার্ট করতে হবে। তাড়াতাড়ি সেজে নাও! কি আর করি, আমি গিয়ে তো সাজঘরে দাঁড়ালাম। আমাকে সাজতে হবে খবরের কাগজের সংবাদদাতা, যাকে বলে রিপোর্টার। আমি করলাম কি, একটা ঢিলে ঢোলা পাজামা পরে নিলাম, একজোড়া বেঢপ জুতো পায়ে গলিয়ে নিলাম, হাতে নিলাম একগাছা বেতের ছড়ি, মাথায় একটা টুপী, তারপরে একটু ছোট্ট গোঁফ লাগিয়ে নিলাম, আরে—একে যে চেনা যায় না; এযে এক হতচ্ছাড়া, ভবঘুরে! কথায় কথায় মুচকি হাসে। আর চলতে গিয়ে টলে টলে পড়ে, হুমড়ি খায় আর কি!

সাজঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সবাই অবাক হয়ে গেল। এ-ই চার্লি, চার্লিকে দেখে সবাই হাসল। সেদিন থেকে চার্লি জয় করে নিলে তুনিয়ার মানুষকে। কত ছবি যে করলাম! এক ১৯১৪ সালেই এক-রীলার, দু-রীলার আর ছ-রীলার ছবি করলাম কমসে কম পঁয়ত্রিশখানা। চার্লি আজ পর্যন্ত ছবি করেছেন আশীখানা। তাদের মধ্যে, দুই আর তিন রীলারই বেশি। বড় ছবি আছে ন' খানা। আর সব ক'টিতেই চার্লির জয়-জয়কার।

এগুলির মধ্যে কোন্‌খানা সবচেয়ে সেরা? জিজ্ঞেস করলাম।

চার্লি হেসে বললেন, আমার কাছে সব ক'খানিই সেরা! তবে কেউ বলবে—দি কীড, কেউ বলবে দি গোল্ডরাস, কেউ বা মর্ডান টাইমস, কেউ বা সিটি লাইটস্, কেউ বা গ্রেট ডিকেটটর, কেউ বা মঁসিয়ে ভের্দু। আমি কিন্তু তা বলিনে, আমি বলি, আমি যা-কিছু দেখেছি, শুনেছি, জেনেছি, ভেবেছি সব ছবিতেই তা ফুটে উঠেছে।

আপনি বলেছেন, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, পণ্ডিত নেহেরু এখানে এসেছিলেন—আমি তাঁদের দেশের মানুষ—আমাকে তাঁদের কথা বলুন।

মহাত্মা গান্ধী যখন গোল টেবিল বৈঠকে লণ্ডনে যান, চ্যাপলিন বললেন, তখন আমিও লণ্ডনে। চারিদিকে রব উঠেছে, মহাত্মা গান্ধী এসেছেন। চার্চিল বলছেন, আধো-ন্যাংটা ফকির। কেউ বা বলছে, ওকে গারদে পুরে রাখা হোক! ভাবলাম, যাই লোকটাকে দেখে আসি। দেখা হল, ভেবে পেলাম না কি বলব। অথচ আমাকেই প্রথমে কথা বলতে হবে। মহাত্মা তো আমার ছবি দেখেন নি যে বলবেন, চার্লি, তোমার অমুক ছবি আমি দেখেছি। তিনি কোন ছবিই

দেখেছেন কিনা সন্দেহ, তাই গলা সাফ করে নিয়ে বললাম, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর সহানুভূতি আমার আছে, কিন্তু আপনি কল-কারখানার উপর এমন খাপ্পা কেন ?

মহাত্মা হাসলেন। আমি আবার বললাম, কল-কারখানা চালু হলে মানুষের পরিশ্রমের লাঘব হয়। সে বই পড়বার, আর ভাববার সময় পায়।

আমি তা বুঝি, তিনি উত্তর দিলেন, কিন্তু কল-কারখানা আগে নয়, ইংরেজরা কল চালিয়ে আমাদের তাদের চাকর করে রেখেছে, তাই আমাদের কাজ এখন সুতো কাটা, নিজের কাপড় নিজে বোনা। ইংরেজের উপর এই ভাবেই আমরা আক্রমণ চালাচ্ছি। ইংলণ্ডের দাস হব না, তার কল-কারখানার উপর নির্ভর করে থাকব না।

চ্যাপলিন একটু থেমে বললেন, সেদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কৌশলে কি সেকথা জানলাম। পণ্ডিত নেহেরুর কথাও মনে পড়ছে। ভারতে পাঁচশালা কল্পনা শুরু হয়েছে, বড় বড় কারখানা বসেছে স্বাধীন দেশে, আরো বসবে—তখন তিনি এলেন। এই বাড়িতেই এলেন। মোটরে আমরা আসছিলাম, জোরসে ছুটছে মোটর, তিনি বলছেন, তাঁর দেশের কথা। গাড়ি জোর ছুটছে, আমার ভয় করছে দুর্ঘটনা না ঘটে, কিন্তু নেহেরু ও কথা ভাবছেন না। তিনি বলে চলেছেন তাঁর দেশের কথা। তাঁর দেশ উন্নতির পথে চলেছে। তাঁর মেয়ে ইন্দিরা ছিলেন সঙ্গে। তিনি অন্য কোথাও যাবেন। তাঁকে বিদায় দেওয়ার পালা এল। অমনি নেহেরু স্নেহময় বাপ হয়ে গেলেন, বললেন, সাবধানে থেকো! আমার মতই খুদে মানুষ বনে গেলেন নেহেরু।

বললাম, আপনি কি খুদে মানুষ নাকি ?

তা নয় তো কি ? আমি খুদে মানুষ চার্লির পার্ট করি, লোককে হাসাই, কাঁদাই।

কিন্তু সেই খুদে মানুষই যে মহান্ মানুষ। সে তো মানুষকে বলে, যুদ্ধ কোরোনা, য়্যাটম বোমা ছুঁড়োনা! সেই তো বলে, হতাশ হোয়ো না!

চ্যাপলিন হাসলেন, তারপরে বললেন, খুদে মানুষ কখনো বড বড় কথা ভাবে বই কি আমিও ভাবি, নইলে দেখুন তো নিরিবিলিতে কেমন আছি। স্ত্রী আছেন, ছেলেমেয়েরা আছে বাগানে ঘুরে বেড়াই। এই বারান্দায় বসি। দূরের হ্রদ আর আকাশের পটে আঁকা পাহাড় দেখি ভাল লাগে।

আর কি আমরা চার্লিকে দেখতে পাব না ? জিজ্ঞেস করলাম।

বললেন, চার্লি তো চুপ করে বসে থাকতে চায় না। সে বলে, লেখো একখানা নাটক একখানা অপেরা, তোল একখানা ছবি! আমাকে তার কথা তো শুনতেই হবে।

আচ্ছা আসি, নমস্কার। হাত তুলে ভারতীয় ঢঙে নমস্কার করলাম।

তিনিও হেসে আমায় ঢঙেই নমস্কার করলেন।

হঠাৎ শুনি কে ডাকছে?

তাকিয়ে দেখি—ডাকছে ববি আর মুন্না। আর পিঙ্কি।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। কোথায় করসিয়ার গ্রাম, কোথায় চ্যাপলিনের মানোর হু বান! এ যে দেখি, আমার ঘরে বসে বসে ঝিমুচ্ছি। আর আমার সামনে চ্যাপলিনের নিজের লেখা জীবনী খোলা।

মুন্না শুধালে, কার সঙ্গে ঘুমোতে ঘুমোতে কথা কইছিলে?

চার্লির সঙ্গে, উত্তর দিলাম।

চার্লি—'কিড্'-এর চার্লি?

হাঁ রে, হাঁ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাঁর কাছে গিছলাম, তিনি কত কথা বললেন!

আমরা শুনব সে-কথা। সব্বাইকে বলতে হবে কিন্তু!

তাহলে 'মৌচাকে' লিখে ফেলি, সবাইকে শোনাই।

ওরা মাথা নেড়ে সায় দিলে।

বিশ্বজয়ী ভণ্টুবাবু

শ্রীসুশীল মণ্ডল

বিশ্বজয়ী ভণ্টুবাবু
'হেভি ওয়েট্ চাম্পিয়ান্',
চম্‌কে দেখি পার হয়েছেন
বিরাট সাগর 'কাস্পিয়ান্'।

'ম্যারাথনে'র দৌড়ে গিয়ে
সবার আগেই সত্যি ঠিক্—
জায়গা নেবেন তাই প্রথমে
অন্যে যতই কায়দা নিক।

'পোল্ ভোল্টে'র বিজয় মালা
কণ্ঠে তাহার দুলবে যে,
'বর্শা' ছোঁড়ায় পাঁচ মাইলের
'রেকর্ড'টি তার ভাঙ্‌বে কে!

এই পৃথিবীর নেই যে রে ভাই
সমান জুড়ি তার কেহ,
পারবে নাকো বইতে সবাই
সত্যিকারের সেই দেহ!

কালীঘাটের মন্দির

শ্রীনমিতা বসু

আজকাল মিনুর মন-মেজাজ বড় খারাপ। ডাক্তারবাবু বলেছেন তার মা নাকি আর ভাল হবে না। তাই মিনু দিনরাত মুখ গোমড়া করে থাকে। দিনের মধ্যে হাজার বার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, 'ভগবান, আমার মাকে ভালো করে দাও।'

সেদিন বুধবার। মায়ের অবস্থা ভীষণ খারাপ। ডাক্তারবাবু দেখে বললেন যে, মা আর বাঁচবে না। মিনু মুষড়ে পড়লো। মনে মনে ভাবল, ভগবান যদি একবার মাকে ভালো করে দেন, তাহলে মিনু অনেক ফল দিয়ে আর বাতাসা দিয়ে পুজো দেবে। পুজো দেওয়ার কথায় মিনুর কালীঘাটের কথা মনে হলো।
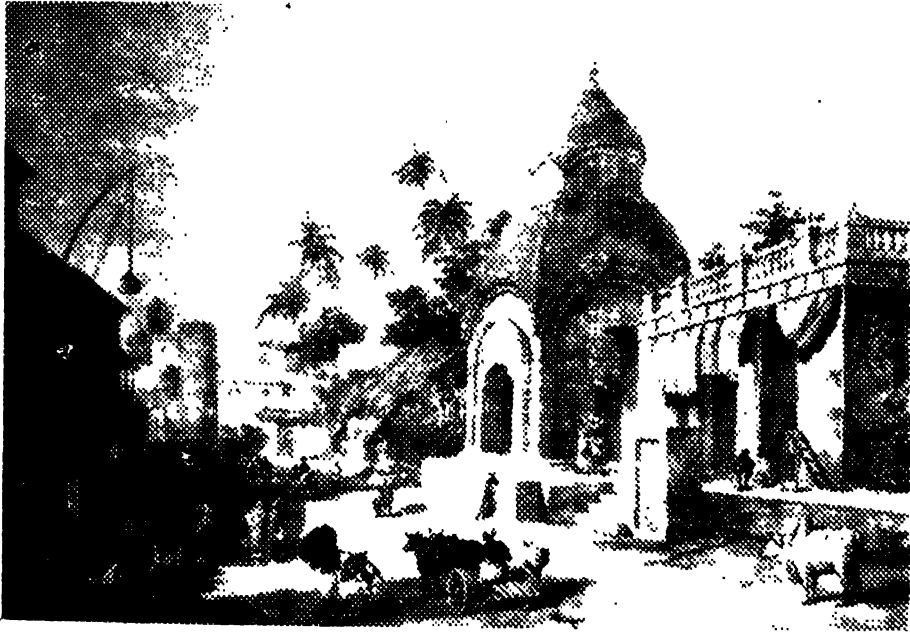
মিনুর একবার ডিফ্‌থেরিয়া হয়েছিল। মা তাই কালীঘাটে গিয়ে মানত করে এসেছিল। মিনু ভালো হয়ে গেল। কিন্তু মিনু ভাবল একবার কালীঘাটে গিয়ে মার জন্য মানত করে আসবে। কিন্তু যাবে কার সঙ্গে? দাদারা যা অসভ্য। কথা বললেই হয়ত গেঁয়ো সেকেলে ভূত ইত্যাদি বলবে।

অনেক ভেবে মিনু ঠিক করল, ছোটকাকুকেই বলবে তাকে কালীঘাট নিয়ে যাবার জন্যে। ছোটকাকু তাকে কালীঘাটের অনেক গল্প শুনিয়েছেন। ছোটকাকু বলেন, অনেকদিন আগের কথা, প্রায় সাত-আটশ' বছর হবে। সাহেবরা তো এদেশে আসেই নি। এমনকি বাবর আকবর পর্যন্ত সে সময়ে জন্মায় নি। পৃথ্বিরাজ যে সময়ে স্বয়ংবর সভা থেকে সংযুক্তাকে নিয়ে ঘোড়ায় পিঠে চড়ে আজমীর থেকে দিল্লী এসেছিলেন, তারও আগের কথা। কলকাতা বলে তখন নাকি কোন জায়গাই ছিল না। এসব জায়গায় তখন গভীর বন ছিল। বড় বড় গাছের ডালপালার জন্য অনেক জায়গায় সূর্য পর্যন্ত দেখা যেত না। সেই জঙ্গলে বিরাট বিরাট সাপ ছিল, আর বাঘ ভাল্লুকের মত হিংস্র প্রাণীও ছিল অনেক।
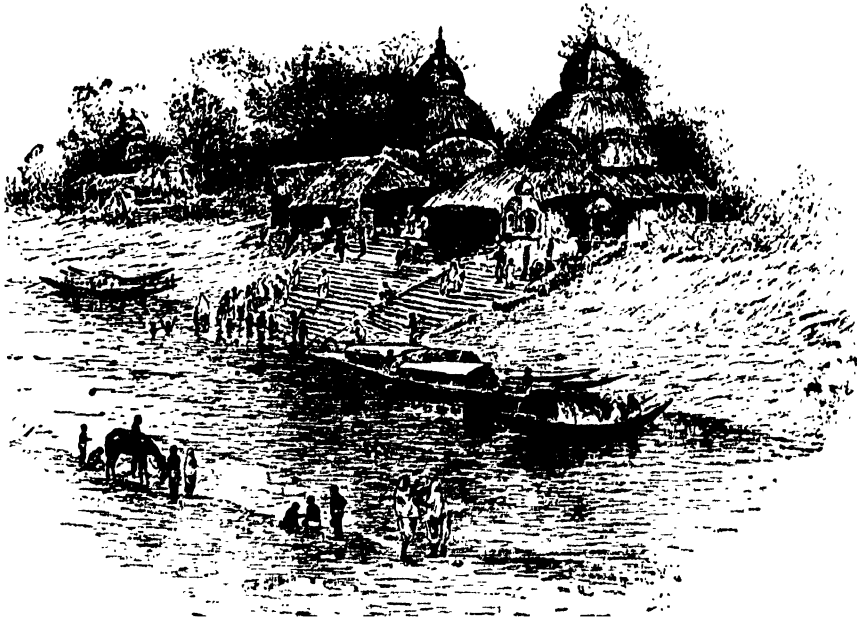
ছোটকাকু বলেন যে, সেই জঙ্গলে মানুষরাও বাস করতো। তারা ছিল আদিবাসী, তাহাদের নাম ছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, তাছাড়াও বাগ্দি, জেলে, কাঠুরে এইসব জাতের লোক ছিল। তাদের গায়ের রং ছিল আলকাতরার মত কালো, তাই তারা কালো রং-এর এক দেবীকে পুজো করতে আরম্ভ করে। সেই দেবী উলঙ্গ, গলায় মুণ্ডমালা, হাতে খড়্গ আর জিহ্বা বেরিয়ে আছে রক্তের লোভে। সেই দেবীর নামই কালী। তারপর বল্লাল সেন যখন রাজা হলেন, তখন তান্ত্রিক মতের প্রচলন হয় আর অনার্য দেবতা কালীও সাধারণের পূজার যোগ্যা হয়ে ওঠেন।

তারপর আস্তে আস্তে সেই সব বন-জঙ্গল অদৃশ্য হতে থাকে। লোকের বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে গ্রাম গড়ে ওঠে। এই উন্নতির সময় আদিবাসীদের অনেকেই দস্যুগিরি করত। তারা এই কালীর কাছে পুজো দিত আর বোম্বেটেগিরি করে বেড়াত। তারপর কালীর নামেই এ জায়গার নাম কালীক্ষেত্র—তারপর কালীক্ষেত্র থেকে কলিকাতায় রূপান্তরিত হয়।

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের অনেক গল্প মিনু অনেক বইতে পড়েছে। ছোটকাকু বলে যে, প্রতাপাদিত্যের কাকা বসন্ত রায় আদি-গঙ্গার তীরে একটি মন্দির তৈরী করেছিলেন। তিনি সে সময়ের সেবায়েত ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য ছিলেন। যশোরের কায়স্থ রাজা এই জায়গাটিকে দেবত্র বলে কালী মন্দিরকে দিয়ে যান। সেই থেকেই ভুবনেশ্বরের নাতি হালদার ও তার বংশধরেরা এই দেবত্র সম্পত্তি ভোগ করে আসছে। তখন কিছু ব্যবসায়ীরা সাগরে যাওয়ার আগে ঘাটে নেমে এই মন্দিরে পুজো দিয়ে যেতেন। সেই থেকেই এই জায়গার নাম কালীঘাট।

ইংরেজদের আগে পর্তুগীজরা বাংলাদেশে ব্যবসা করতে আসে। পর্তুগীজরা যখন আসে তখন আদি-গঙ্গা আজকের মতো একটা শুকনো খাল ছিল না। সেটা ছিল বড় নদীর মতো গভীর ও প্রশস্ত। পর্তুগীজরা সেই আদি-গঙ্গাতেই জাহাজ ঢুকিয়ে এনে, এখন যেখানে গার্ডেনরীচ সেখানে নামত। তারপর ব্যবসা সেরে চলে যেত। যাওয়ার আগে কালীর পুজো দিত আর গ্রাম জ্বালিয়ে দিত।

ছোটকাকুর কাছে শোনা গল্পগুলো মিনুর বেশ ভালোই মনে আছে। ছোটকাকু খুশি হয়ে, মিনুকে তারপর দিন সকালে কালীঘাটে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার পথে গাড়ীতে ছোটকাকু বললেন, 'মিনু তোমায় কালীঘাট সম্পর্কে আরেকটা কথা বলা হয়নি। দক্ষযজ্ঞের কথা জানো তো? দক্ষযজ্ঞের কথা মিনু জানে। দক্ষ একবার বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জামাই শিবকে তিনি নিমন্ত্রণ করেন নি। তাঁর মেয়ে সতী জামাইকে নেমন্তন্ন করার কথা বললে দক্ষ সতীকে অপমান করেন। সতী সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেন। তখন সতীর শোকে শোকাক্রান্ত হয়ে সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে শিব তাণ্ডব নিত্য শুরু করেন। পৃথিবী যায় যায়। বিষ্ণু তখন চক্র দিয়ে সতীর মৃত দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন।

ছোটকাকু বলেন, 'বা তোমায় তো সব মনে আছে। সতীর ডান পায়ের কড়ে আঙুলটি এই কালীঘাটে পড়েছিল।'

মন্দিরে যাওয়ার রাস্তার দু'ধারেই ভিখারীরা বসে আছে। তাদের দেখে মিনুর ভীষণ দুঃখ হলো। ছোটকাকু বললেন, 'একদল লোক আছে এদের নিয়ে তারা ব্যবসা করে, দু'বেলা এদের খাবার দিয়ে যায় আর এরা যা পায় সব নিয়ে যায়।'

মন্দিরের দরজায় আসতে পাণ্ডার দল তাদের ঘিরে ধরলো। মিন্থু প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু ছোটকাকু এক ধমক দিতে তারা সরে গেল। ছোটকাকু ঢুকেই একটা দোকানে জুতো রেখে, পুজো নিয়ে একজন পুজারীর সঙ্গে চললেন। মিন্থুও সঙ্গে গেল। একটা ছোট সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠলো তারা। এই বারান্দাটা মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে। সেই বারান্দা দিয়ে ঘুরে তারা সামনের দিকে এলো। সেখানে ভিড়ের মধ্যে কোন রকমে মিন্থু একবারটি কালীমূর্তি দেখে নিল। তারপর ঘুরে এসে বাঁ দিকের একটা দরজা দিয়ে তারা ঠাকুরের কাছে গেল। পুরুত ঠাকুর একটি টাকা মায়ের পায়ে ছুইয়ে মিন্থুর হাতে দিলেন। তারপর অঞ্জলি দিয়ে, প্রণাম করে তারা সেই দোকানে এলো। আসার আগে মিন্থু বলির জায়গা পর্যন্ত দেখে নিল।

দোকানে ছোটকাকু যখন পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছিলেন, দোকানদারকে টাকা দিচ্ছিলেন, মিন্থু তখন আরেকবার মন্দিরটা চেয়ে দেখলো। মন্দিরের চূড়াটা অনেক উঁচু। কে জানে কত ফুট হবে। বেরিয়ে এসে মিন্থু ছোটকাকুকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করলে। ছোটকাকু বললেন, 'বইতে আছে ৯০ ফুট।'

বাড়ী ফেরার পথে ছোটকাকু বললেন, 'তোমাকে যে মন্দিরের গল্প আমি শুনিয়েছি এটা কিন্তু সেই মন্দির নয়। বসন্ত রায়ের তৈরী করা মন্দিরটা এখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। এই নতুন মন্দিরটা ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয়। বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায় এই মন্দির তৈরী করার সমস্ত টাকা দেন।

এই মন্দিরে যে শুধু হিন্দুরাই আসে তা নয়। আগেকার দিনে অনেক সাহেবও এই মন্দিরে এসে পুজো দিয়ে যেতো। আলিপুর কোর্টে যত মামলা চলে তার প্রায় প্রত্যেক বাদী-বিবাদী এখানে এসে আগে মায়ের পুজো দিয়ে যায়—যেমন আগেকার দিনে ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যে যাওয়ার আগে পুজো দিয়ে যেতো। তাই ব'লে যে ব্যবসায়ীরা এখন আর পুজো দেয় না তা ভেবো না। নববর্ষের দিন সকালে যদি এখানে আস তাহলে দেখবে, নতুন খাতায় পুজো দিতে ব্যবসায়ীরা কিরকম ভিড় করে!

বাড়ী এসে মিন্থু সেই টাকাটা মায়ের কপালে ছুঁয়িয়ে তুলে রাখল। মায়ের মাথায় ঠাকুরের প্রসাদী ফুল ছুঁইয়ে মাকে প্রসাদ দিল। প্রসাদ নিয়ে মা বললেন—'আর ভয় নেই—বিপদ কেটেছে।' মার কথায় মিন্থুর মুখে হাসির রেশ দেখা দিল। মিন্থু ভাবে মা কালীর দয়ার কথা। দস্যু, ডাকাত, মামলাবাজ, সাধারণ মানুষ সবারই বাসনা তিনি পূর্ণ করেন।

উপন্যাস

জৌথমীলের ফকির

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

—দুই—

বলা বাহুল্য, মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হন্ হন্ করে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, আ মনে-মনে রেগে উঠছি ভীষণ। একবার রাগ হচ্ছে নিজের ওপরে, আরেকবার রাগ হচ্ছে বিকাশে ওপরে, আবার রাগ হচ্ছে ঐ ছোট-জাহাজের 'বড়া মালিকের' ওপরে।

আমি 'বাস্'-এ উঠে সেদিন বিকাশের বাড়ী যেতে পারতাম। গিয়ে, ওকে বাড়ী থেকে টে বার করে, কোনো পার্কে-টার্কে ব'সে এই সব কথা নিয়েই তর্ক-বিতর্ক করতে পারতাম। কি কিছুই আমার ভালো লাগলো না। 'বাস্' ধরলাম বটে, কিন্তু সে বিকাশের বাড়ীর দি যাবার জন্য নয়, আমাদের কারখানার দিকে যাবার জন্য। ভাবলাম, বোঝা গেছে আমা ভাগ্যলিপি, দেশ-বিদেশ ঘোরা আমার ভাগ্যে নেই, সুতরাং বাধ্য ছেলের মতো সুড় সুড় ক কারখানায় গিয়ে ঢুকে পড়াই ভালো। মিছিমিছি কাজ কামাই করে লাভটাই বা কী ?

'বাস্' থেকে নেমে কারখানার দিকেই হেঁটে চলছিলাম, হঠাৎ আমার মনটা বিগ্ড়ে গেল থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবলাম, দূর ছাই, কারখানাতে আজ যাবো না। কাজ-কর্ম আজ অ ভালো লাগবে না। একটা দিনের মাইনে কাটা যাবে, তা' যাক্। কী আর করা যাবে মানুষের মন বলে একটা বস্তু আছে ত'? সত্যি, সেদিনকার কথাটা আমার বেশ মনে আছে এতো মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল সেদিন !

কিন্তু, সে যাক্, আপাততঃ যাওয়া যায় কোথায় ? জাহাজঘাটা নয়, বিকাশের বা নয়, কারখানা নয়, তাহলে যাবো কোথায় ? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত বাড়ীর দি রওনা হলাম। সূর্য প্রায় মাথার কাছাকাছি। জানি, বাবা স্কুলে বেরিয়ে গেছেন এতক্ষ বোনগুলোও স্কুলে। মা আমাকে দেখে চমকে যাবে নিশ্চয়। মুখখানা বিরস করে বলবো, শরীরটা খারাপ লাগ্ছে।

মা অস্থির হয়ে উঠবে। তাড়াতাড়ি বিছানা পেতে দিয়ে বলবে,—শুয়ে পড়, শীগ্‌গির।

এই সব কল্পনা করতে-করতে চলেছি। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। বাড়ীতে বোনগুলো স্কুলে গেছে ঠিকই, কিন্তু বাবা বেরোন নি তখনো। গায়ে জামা-টামা পরা, হয়ত বেরুচ্ছিলেন, কিংবা, স্কুলে গিয়ে হাজিরা দিয়েই ফিরে এসেছেন। খাটের উপর বসে বাবা, মেঝেতে মা, আর মায়ের অদূরে মুখটা নীচু করে বসে আছে,—বিকাশ।

আমাকে দেখতে পেয়েই হুংকার ছাড়লেন বাবা,—এই যে এসেছো, এতক্ষণে?

মা উঠে দাঁড়ালো ধড়মড় করে, বলে উঠলো, কী সব্বনেশে ছেলে বাবা তুই, জাহাজে গিয়ে নাম লেখাচ্ছিলি? ভাগ্যিস্, বিকাশ এসেছিল, তাই জানতে পারলুম! বোস্ এসে এখানে? কারখানা কামাই করলি ত'?

কী আর বলবো? শুধু আড়চোখে বিশ্বাসঘাতক বিকাশের দিকে একবার তাকালুম। সে মুখটা নীচু করে চোরের মতো চুপচাপ বসে আছে।

বাবা বললেন,—বিকাশ তোকে ধ'রে নিয়ে আসবার জন্য জাহাজে গিয়েছিল। তোকে না পেয়ে বাড়ীতে ছুটে এসেছে। কই, সেই ফর্ম্ কই, যাতে আমার সই দরকার?

দেয়ালে ঠেস দিয়ে গুম্ হয়ে বসে পড়েছি ততক্ষণে। মুখ কালো করে বললাম,—ছিঁড়ে ফেলেছি।

—ও, সুবুদ্ধি হয়েছে তাহলে! বাবা বললেন,—আমার ছেলে কিনা জাহাজে গিয়ে খালাসী হবে!

মুখ তুলে তাকালাম। ইচ্ছে হলো একবার বলি,—আপনার ছেলে যদি মোটর কারখানার মজুর হতে পারে, তাহলে জাহাজের খালাসী হলে দোষের কী?

কিন্তু, কিছু বললাম না, মুখ নীচু করলাম।

মা বলতে লাগলো,—এ-চিন্তা তোর মনে এলো কী ক'রে? আমাদের ছেড়ে দেশ-দেশান্তর তুই ঘুরবি, জাহাজে করে? কথায় বলে,—সমুদ্দুর! ছোটবেলায় আমি একবার পুরী গিয়েছিলুম মা-বাবার সঙ্গে। বাব্বাঃ! সে কী প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ঢেউ! আমার এখনো মনে আছে! ভাবতে গেলেই ত' বুক কাঁপে!

বাবা বললেন,—যাক, যা হবার তা হয়েছে! আমার আজ মিছিমিছি স্কুল কামাই হলো।

তারপরেই মার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—খাওয়া হয়েছে ওর? মা ঝংকার দিয়ে উঠলো,—সে কী খাওয়া! আলুভাতে আর আধ-ফোটা ডাল দিয়ে কোন রকমে দুটো মুখে গুঁজে—

বাবা আমার দিকে ফিরে বললেন,—তাহলে খেয়ে নে—আমার সঙ্গে এখুনি বেরুতে হবে তোকে।

বিকাশ এতক্ষণে আমার দিকে আড়চোখে একটু তাকালো, আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। বাবা আবার তাড়া দিলেন। ভাত নিয়ে বসলাম বটে, কিন্তু কিছুই মুখে রুচ্‌লো না। ইচ্ছে হচ্ছিল, এখন যদি ছাড়া পাই, ত', নিরুদ্দেশ হয়ে যাই! যে দিকে ছ'চোখ যায়!

যাই হোক, বাবা আমাকে নিয়ে বেরুলেন সেই রোদ্দুর মাথায় ক'রে। বিকাশ বাড়ীতে রইলো, মার সঙ্গে বসে বসে গুজগুজ করতে লাগলো। আমরা হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম রাস্তায় এসে পড়লাম, সেখান থেকে আরও বেশ খানিকটা দূর।

পথের মধ্যে একটাও কথা বলেন নি বাবা। বাবার হাতে সর্বক্ষণ ছাতা থাকে, সেদিন ছাতা নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। রোদ্দুর লেগে দর্‌দর্‌ করে ঘাম্‌ছেন, কিন্তু পকেট থেকে রুমাল বার করে যে ঘাম মুছবেন, সে দিকে লক্ষ্য নেই; গভীর ভাবে কী যেন চিন্তা করতে করতে পথ হাঁট্‌ছেন!

একটা সাইন্‌বোর্ড টাঙানো বড়ো-পুরানো দোতলা বাড়ীর সামনে এসে বাবা থামলেন। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—আয়।

সিঁড়ি ভেঙে দোতলা। সেই দোতলারই একখানি ঘর। সারি সারি সব টাইপ্‌ রাইটার-যন্ত্র সজোনো। একটা-কি-ছুটো খালি, বাদ বাকী সব গুলোতেই ছেলেরা ব'সে ঠক্‌-ঠক-খটাস্‌-খটাস্‌ করে টাইপ্‌ ক'রে চলেছে। বাবাকে দেখে একটা লোক ছুটে এলো, বললে,—মাস্টার মশাই, আপনি! বাবা বললেন,—আমার মেজোছেলে—স্থকুমার। তোমার এখানে ভর্তি করে দিতে এসেছি। প্রতিদিন রাত্রে এসে ও টাইপ্‌ করা শিখবে।

কথাবার্তায় বুঝলাম, টাইপরাইটিং-স্কুলটার মালিক ঐ ভদ্রলোক এক কালে বাবারই ছাত্র ছিলেন। সেই খাতিরে কিছু অল্প মাইনেয় আমাকে এখানে ভর্তি ক'রে দিলো বাবা। কারখানার হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে আসবার পর রোজ এখানে এসে আমাকে টাইপ্‌ করা শিখতে হবে। ব্যাপারটা ভাবতেই আমার কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু, বাবার মুখের ওপর ত' কিছু বলতে পারি না! মনে-মনে ঠিক করলাম, নির্ঘাৎ একদিন পালাবো! এ-সব টাইপ্‌ করা-টরা আমার পোষাবে না।

যা-যা করণীয়, সব ক'রে বাবার সঙ্গে আবার হেঁটে আসছি বাড়ীর দিকে, বাবা হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন,—হ্যাঁ রে, সত্যিই তোর দেশ বেড়াতে ভালো লাগে?

কী আর বলবো? হঠাৎ ছ'চোখ ভরে জল এসে গেল। আমি মুখ নীচু করলাম। বাবা সেটা লক্ষ্য করলেন, তারপরে বললেন,—ছোট বেলায় আমার ভীষণ সখ ছিল—দেশ-বিদেশে

বেড়াবার! এমন কি মনে মনে কল্পনা করতাম, আমি বিলেত গেছি—ফ্রান্স গেছি—জার্মানী গেছি! কিন্তু হলো কই, বল্?

বাবা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর চলতে চলতে আবার এক সময় বললেন,—হঠাৎ তোর এ-ইচ্ছে হলো কেন?

কোনক্রমে বললাম,—কারখানা ভালো লাগে না।

—সে ত' বুঝতেই পারছি,—বাবা বললেন,—কিন্তু, কী করা যাবে? যা দিন-কাল, এখন সবাই মিলে সংসারের চাকা না ঘোরালে ও-যে একেবারে অচল হয়ে যাবে!

তারপর, একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে আমার দিকে মুখ ফেরালেন, বললেন,—আমাকে সত্যি করে বল্, দেশ-বেড়ানোর নেশা তোর সত্যিই আছে?

বললাম,—হ্যাঁ। আমাকে যদি ছেড়ে দেন—

—না, বাবা বললেন,—ছেড়ে দেবার কথা এখন ওঠে না। আর তাছাড়া, তোমার মা শুনলে ত' একেবারে কেঁদে-কেটে এক্‌সা করবেন! তুমি মন দিয়ে টাইপ্‌টা শেখো দেখি? যদি পাঁচ-ছ'মাসের মধ্যে শিখে উঠতে পারো, ত' তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ করবার চেষ্টা করতে পারি।

—কী ক'রে?

বাবা প্রায় ধম্‌কেই উঠলেন এবার,—সে তোমাকে ভাবতে হবে না। তবে ঐ একটি সর্ত,—পাঁচ-ছ'মাসের মধ্যে তোমাকে টাইপটা শিখতে হবে, এবং খুব ভালো ক'রে শিখতে হবে।

বলে উঠলাম,—আমি রাজী।

—বেশ,—বাবা বললেন,—সর্ট-হ্যাণ্ড শিখতে পারলে আরও ভালো হতো। কিন্তু সে যাক, তুমি এটাই ভালো করে শেখো।

আমি বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বাবার কপালে গভীর হয়ে কয়েকটা রেখা পড়েছে। মাথার চুল পাতলা হয়নি, বা টাক্ পড়েনি, কিন্তু পাকা চুলে ভরে গেছে।

আগে সোজা হয়ে হাঁটতেন, এখন একটু নুয়ে পড়েছেন। চোখের ভুরু-দুটো মোটা, এবং কালো, কিন্তু সেখান থেকেও কয়েকটি সাদা অবাধ্য চুল প্রজাপতির শুঁড়ের মতো সামনের দিকে বেরিয়ে আছে।

বাবা রুমাল বার করে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে নিয়ে বললেন,—কী হলো? দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

বললাম,—তাহালে, সর্ট হ্যাণ্ড-টাও—

বাবা বলে উঠলেন,—না। আপাততঃ দরকার নেই। বরং পারো ত' অবসর সময়ে বাড়ীতে বসে বসে একটু ট্রান্স্লেসন করতে পারো। পড়া-শুনার পাঠ ত' চুকিয়ে দিয়েছো! সব ভুলে গেছো নিশ্চয়? একটু চর্চা থাকা দরকার। অন্ততঃ ইংরেজীটা—

আর কোনো কথা হয়নি। বাড়ী পৌঁছে দেখি, বিকাশটা এতক্ষণে চলে গেছে। আমার অবশ্য তখন আর বিকাশের ওপর ততটা রাগ ছিল না। আমার তখন মনে হচ্ছিল, বাবা নিজের মুখে যখন বলেছেন, তখন আমার বিদেশ-বেড়াবার একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। আমি প্রাণপণে টাইপ্‌রাইটিং আর ইংরেজী শিখবোই।

বলা বাহুল্য, পরদিন থেকেই লেগে গেলাম কাজে। কারখানার কাজ শেষ ক'রে ইস্কুলে গিয়ে টাইপ-রাইটারে ঠক্-ঠক্-খটাস্-করা,—এক-একদিন এমন হয় যে, হাত যেন আর চলতে চায় না? তবু, আমার যেন ততদিনে 'রোখ্' চেপে গেছে। বাড়ী, কারখানা আর ইস্কুলে, আর কোনো দিকে মন নেই, বিকাশের সঙ্গে অতো ভাব ছিল, সেই বিকাশের বাড়ী যাবো, বা, ওর সঙ্গে দেখা করবো, সে-ইচ্ছেও জাগে না।

বিকাশ অবশ্য একদিন এলো, আমার ইস্কুলে দিন-পনেরো কেটে যাবার পর। রাত তখন প্রায় ন'টা, স্কুলের দোতলা থেকে নেমে এসেছি, ফুট্‌পাথে আলোর নীচে দেখি বিকাশ দাঁড়িয়ে আছে,—চুপচাপ।

—কী ব্যাপার?

ও বললে,—পনেরো দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে কি একদিনও দেখা করতে নেই? এতো রাগ?

বললাম, না-না, রাগ আবার কিসের?

ও বললে,—রাগ তুমি নিশ্চয়ই করেছো। কিন্তু, ভেবে দেখ, আমার কী দোষ? মনে পড়ে সেদিনকার কথা? তুমি পরদিন সকালে জাহাজে গিয়ে ঢুকবে, আর আমি ছট্‌ফট্ করেছি সারারাত শ্বশুরমশাই শুনলে আমাকেই দায়ী করবেন। তাই আমি—

ওর কথা কেড়ে নিয়েই বলে উঠলাম,—তাই তুমি তোমার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে সব কথা ফাঁস করে দিলে, এই ত'? থাক্ ওসব কথা—আমি ত' ওসব ভুলেই গেছি!

বিকাশ আমার হাতটা তাড়াতাড়ি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলো, বললে,—তাহলে আমাকে ক্ষমা করেছো?

অল্প একটু হাসলাম, বললাম,—ক্ষমা করতাম না, যদি না বাবা আমার জন্য এই ব্যবস্থাটা করতেন !

বিকাশ ঠিক তখুনি কথা বললো না। বললো একটু পরে, পাশাপাশি পথ চলতে চলতে। বললো,—টাইপ শিখতে ভালো লাগছে ?

—লাগবে না কেন ?

—না, তাই বল্‌ছি।

বললাম, বাবা আমাকে একটা আশা দিয়েছেন, তাই—

বিকাশ বললে,—চাকরী ত' ? আমি বুঝেছি। বিশ্বাস করো, আমি খুব খুসী হয়েছি। অফিস-টফিসে ভালো চাকরী পেয়ে যাবে।

বললাম,—না ভাই, এখন আমাকে নেশায় পেয়ে বসেছে। দূর দূর দেশে ঘোরবার নেশা।

জানি না বাবার মনে ঠিক কি আছে, আর কতটা কী উনি করতে পারবেন,—আমাকে বিদেশ যেতে হবেই। পাঁচ-ছ'মাস পরে আমি যখন টাইপ শিখে বেরুবো, তখন বাবা যদি কোনো ব্যবস্থা না করতে পারেন, আমি জাহাজে গিয়ে ঢুকবোই—নিজের চেষ্টায়। তিন মাসের জন্য খালাসী-গিরির শিক্ষাই নেবো।

বিকাশ আমার মুখের দিকে তাকালো। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললো, শাশুড়ী-ঠাকরুণ তোমাকে কিছুতেই যেতে দেবেন না।

বললাম,—যেতে দিতে হবেই। আমি যাবো। তুমি দেখে নিও। আমি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী, নরওয়ে সুইডেন,—সব ঘুরে আসবো।

সত্যিকথা বলতে কী, আমার একটা অদ্ভুত জেদ চেপে গিয়েছিল। আমার মতো সাধারণ ছেলে, মটোর কারখানায় কালিঝুলি মেখে দিন কাটাই, অথচ, এই জেদের ফলে আমি ছ'মাসের মাথায় টাইপ শিখে ফেললাম, এবং মোটামুটি ভালোই শিখলাম। বাবা বললেন,—আমার সঙ্গে এসো।

আমাকে নিয়ে চললেন ড্যালহাউসী অঞ্চলের এক অফিসে। খুব বড়ো অফিস। লিফ্‌টে করে ওপরে উঠতে হলো। দরজার কাছে একটা প্রকাণ্ড ম্যাপ ঝুলছে দেয়ালে,—সারা পৃথিবীর ম্যাপ ভিতরে ঢুকে দেখি, দিনের বেলায় জোরালো আলো জ্বলছে, আর তার আলোয় বহু লোক কাজ করছে টেবিলে ব'সে।

[ক্রমশঃ]

টপ সিক্রেট

বিক্রমাদিত্য

রাশিয়ান স্পাই রুডলফ এবেল এবং 'ইউ টু'র আমেরিকান পাইলট গাই পাওয়ারের গল্প তোমাদের আগেই বলেছি। আজ তোমাদের ব্রিটীশ গুপ্তচর বিভাগ এম-আই ফাইভের কাহিনী শোনাব

ব্রিটীশ ইনটেলিজেন্স দপ্তর—এম-আই ফাইভ। পুরো নাম হলো মিলিটারী ইনটেলিজেন্স ফাইভ। পৃথিবীর চতুর্দিকে এম-আই ফাইভের স্পাই ছড়িয়ে আছে। কোন দেশে কোথায় কী ঘটছে সবই এই দপ্তরের নখদর্পণে। মস্তো বড়ো হুসিয়ার এবং হুসিয়ার দপ্তর এম-আই ফাইভ। কিন্তু একদিন এম-আই ফাইভ একটি মারাত্মক ভুল করে বসলো। আর এই সামান্য ভুলের জন্যে তাদের বিস্তর নাজেহাল হতে হলো।

আজকের এই ঘটনা এক ইংরেজ কর্মচারী এবং তার বান্ধবীকে কেন্দ্র করে। কর্মচারী ছিলো অতি সামান্য কেরানী—ব্রিটীশ নৌবন্দর পোর্টল্যাণ্ডে কাজ করে। পোর্টল্যাণ্ড নৌবন্দরে কাজ করা সহজ কথা নয়। এখানে কাজ পাওয়া বিস্তর ঝামেলা। কারণ এই বন্দরে আমেরিকার সাহায্য নিয়ে এ্যাটমিক সাবমেরিণ তৈরি হচ্ছে। রুশ সরকার এই সাবমেরিণ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানতে চান। অতএব এই বন্দরে সিকিউরিটির কঠিন বন্দোবস্ত। প্রতিটি লোক নিয়োগ করার আগে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড তাদের সিকিউরিটি চেক্ করে।

হাউটনের বান্ধবী এলিজাবেথ গী ছিলো অতি সাধারণ মেয়ে। পোর্টল্যাণ্ড নৌবন্দরে হাউটনের সঙ্গে কাজ করতো। হাউটন এবং এলিজাবেথের ভারী বন্ধুত্ব।

হাউটন এবং এলিজাবেথ এই কাহিনীর নায়ক-নায়িকা। কিন্তু এই নাটকের পরিচালক হলেন বিখ্যাত রাশিয়ান গুপ্তচর মোলডি ওরফে লনসডেল। তার সহকর্মী ছিলেন দুই কম্যুনিষ্ট, মরিস এবং লোনা কোহেন। বলতে গেলে এই তিনজন ছিলেন এই ঘটনার 'ব্রেইন ট্রাষ্ট' বা দলের সর্দার।

লণ্ডন ১৯৬০ সাল।

ব্রিটীশ পার্লামেণ্টে এম-আই ফাইভের অযোগ্যতা নিয়ে তুমুল আলোচনা হচ্ছে। সবাই অভিযোগ করছেন যে, ব্রিটীশ গুপ্তচর বিভাগ কোন কাজের যুগ্যি নয়। অভিযোগের যথেষ্ট কারণ ছিলো। হালে এক ইংরেজ সরকারী কর্মচারী ব্লেক সরকারী গোপন তথ্য শত্রুর কাছে বিক্রী করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। বিখ্যাত ইংরেজ স্পাই ম্যাকলীন বার্জেসের কাহিনী ব্রিটীশ পার্লামেণ্টের সদস্যদের মনে রঙ্গীন হয়ে আছে। অতএব ব্লেকের ব্যাপার নিয়ে দেশময় আলোড়ন হবে এ আর নতুনত্ব কী? কিন্তু আজকের এই হৈ-হল্লার আরো কারণ ছিলো। ব্লেকের ব্যাপার

নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমীলান যখন তাঁর বিবৃতির খসড়া তৈরি করছেন, অমনি দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো যে শুধু ব্লেক নয়, পোর্টল্যাণ্ড নৌবন্দরের গোপন তথ্য এবং এ্যাটমিক সাবমেরিণের নকশা বিক্রী করতে গিয়ে হাউটন এবং তার বান্ধবী এলিজাবেথ ধরা পড়েছে। ব্যস্, আর যায় কোথায়? সমস্ত দেশময় এ ব্যাপার নিয়ে হৈ-হল্লা সুরু হয়ে গেলো। সবার মুখে একই কথা এম-আই ফাইভ অকর্মণ্য—তাদের অযোগ্যতার দরুণ হাউটন এলিজাবেথ দেশের বে-সরকারী গোপন তথ্য বিক্রী করতে সক্ষম হয়েছে। ব্রিটীশ পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের নেতারা তদন্ত দাবী করলে। এ ব্যাপারে শুধু ব্রিটীশ পার্লামেণ্টের সদস্যরা বিচলিত হননি, ওয়াশিংটনের কর্ত্তারাও একটু চিন্তিত হলেন। কারণ, ওয়াশিংটনের সাহায্য নিয়েই পোর্টল্যাণ্ড নৌবন্দরে কাজকর্ম হচ্ছিলো। অতএব তাদের চিন্তা হবার কথাই বটে।

* * * *

এবার শোন হাউটন-এলিজাবেথের কাহিনী। হাউটন সামান্য কেরানী। লড়াই শেষ হবার পর নৌদপ্তরে কাজ নিলে। বছর দু'য়েক এই দপ্তরে কাজ ক'রে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ'র ব্রিটীশ এম্বাসীতে কেরানীর কাজ নিলে।

লড়াই তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। পোল্যাণ্ডে দুর্দিনের সীমা নেই। জিনিসপত্র কিছুই পাওয়া যায় না। সব জিনিসই আক্রা, বিশেষ করে ওষুধপত্র। হাউটনের এক পোলিশ বান্ধবী ক্রিশ্চিয়ানা এসে হাউটনের কাছে প্রস্তাব করলেঃ কালোবাজারে ওষুধ বিক্রী করলে যথেষ্ট পয়সা পাওয়া যাবে। তুমি ডিপ্লোমাট। ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে জিনিসপত্র আনা তোমার পক্ষে সহজ। সেই জিনিস যদি কালোবাজারে বেশী দামে বিক্রী করতে পার, তাহলে অল্প দিনেই যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাবে। ক্রিশ্চিয়ানার সঙ্গে হাউটনের ভারী বন্ধুত্ব। বলতে গেলে প্রেম। হাউটনই কালোবাজারে জিনিস বিক্রী করতে চায়। অতএব ওষুধের ব্ল্যাকমার্কেটিং সুরু করলো। তখন কী ছাই জানতো যে তার সমস্ত কীর্তিকলাপের হিসেব রুশ গুপ্তচর বিভাগ রাখছে এবং একদিন 'ব্ল্যাকমেল' করার চেষ্টা করবে। পুরো দু'বছর কালোবাজারে ওষুধ বিক্রী করে হাউটন প্রায় হাজার আশী টাকা জমা করলে। তারপর একদিন এম্বাসীর চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়ে পোর্টল্যাণ্ড নৌবন্দরের কেরানীর কাজ নিলে।

* * * *

আগেই বলেছি পোর্টল্যাণ্ড নৌবন্দরে এ্যাটমিক সাবমেরিণ নিয়ে গবেষণা হচ্ছিলো। সহজে কাউকে এই বন্দরে নিয়োগ করা হতো না। কিন্তু এম-আই ফাইভের গাফিলতির জন্যে হাউটনের অতীত নিয়ে কোন তদন্ত হলো না। তখন যদি কোন তদন্ত হতো, তাহলে হাউটনের পোল্যাণ্ডের কীর্তি-কাহিনী সবই জানা যেতো।

পোর্টল্যাণ্ড নৌবন্দরে হাউটনের সহকর্মী এলিজাবেথ গী। অতি সাধারণ মেয়ে, কিন্তু হাউটনের সঙ্গে তার গভীর ভাব। নিজের বউ-এর সঙ্গে হউটনের কোনকালেই বনিবনা ছিলো না। তাই অতি সহজে এলিজাবেথের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব দৃঢ় হলো। কয়েক দিন বাদে হাউটন প্রায় লাখ টাকা দিয়ে একটা বাড়ী কিনলে। আর সেই বাড়ী সাজাবার ভার নিলে এলিজাবেথ। সিনেমা, ক্লাবে, সদা-সবদাই হাউটন এবং এলিজাবেথকে একত্রে দেখা যেতো।

কিন্তু হাউটনের সুখের দিন চিরস্থায়ী রইলো না। একদিন হাউটন তার দপ্তরে বসে কাজ করছে এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল · হাউটন ?

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে এক পরদেশীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

হাউটন একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে : কে ?

: আমি ক্রিশ্চিয়ানার বন্ধু···

: কোন্ ক্রিশ্চিয়ানা ? হাউটনের বিস্ময় কিন্তু তখনও ভাঙ্গেনি।

: তোমার পোল্যাণ্ডের বান্ধবী ক্রিশ্চিয়ানা। মনে নেই ক্রিশ্চিয়ানার সাহায্যে নিয়ে তুমি কতো ওষুধের ব্ল্যাক-মার্কেটিং করেছ—উত্তরে বললে।

এই সংবাদে হাউটন একটু শঙ্কিত হলো। ভয় পাবার কথাই বটে। কারণ তার পোল্যাণ্ডের কীর্তি-কলাপের কাহিনী ব্রিটীশ কর্তৃপক্ষ জানতে পারলে আর রক্ষে নেই!

প্রশ্নকর্তা এবার স্পষ্টই বললেন : ক্রিশ্চিয়ানার কাছ থেকে তোমার জন্যে একটি বিশেষ গোপনীয় সংবাদ এনেছি হাউটন।

হাউটনকে এবার বলা হলো এক আর্ট-গ্যালারীর সামনে দেখা করতে। নির্দিষ্ট সময়ে হাউটন আর্ট-গ্যালারীর সামনে গিয়ে হাজির হলো। এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এসে হাউটন

সঙ্গে দেখা করলে। ভদ্রলোক বিদেশী—তার কণ্ঠস্বর শুনলেই বোঝা যায় তিনি পোল্যাণ্ডের কেউ হবেন।

ভদ্রলোক প্রথম সম্ভাষণেই বললেন: হাউটন, তুমি যে পোল্যাণ্ডে ওষুধের কালো-বাজারী করতে, এ-খবর আমাদের জানা আছে। আমরা শুধু এখন ভাবছি যে তোমার কর্তাদের এই সব কীর্তি-কলাপের কোন আভাস দেবো কিনা…'

হাউটনের দুশ্চিন্তা বাড়ে। কিন্তু ভদ্রলোক এবার আশ্বাস দিলেন…এক সর্তে তোমাকে রেহাই দিতে পারি…।

: কোন্ সর্তে? হাউটন উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে।

: যদি তুমি আমাদের সাহায্য করো।

: কিসের সাহায্য—হাউটন ভদ্রলোকের মুখের কথা লুফে নেয়।

: আমরা পোর্টল্যাণ্ড নৌবন্দরের সম্বন্ধে কিছু গোপনীয় খবর চাই। অর্থাৎ সেখানে যে সমস্ত এ্যাটমিক সাবমেরিণ তৈরী হচ্ছে তার নকশা চাই।

এবার হাউটন বুঝতে পারলে যে, সে বিদেশী গুপ্তচরদের হাতের মুঠোয় পড়েছে। এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু ওদের আদেশ অমান্য করা যায় না। কারণ তাহলে তাঁর পোল্যাণ্ডের জীবন-কাহিনী প্রকাশিত হবে। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে হাউটন পোলিশ গুপ্ত-চরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলে। ঠিক হলো পোলিশ গুপ্তচর তাকে কাজ করার নিদেশ দেবে। আর সেই নির্দেশ অনুযায়ী হাউটন কাজ করবে।

মাস দু'য়েক বেশ নির্বিবাদে কেটে গেলো। একদিন হঠাৎ হাউটন একটি পোষ্টকার্ড পেলে। সেই কার্ডে তাকে পোলিশ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছিলো।

পোলিশ ভদ্রলোক দেখা হবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন: যে খবর চেয়েছিলাম এনেছ?

কোন খবর? বিস্মিত হয়ে হাউটন জিজ্ঞেস করে।

পোর্টল্যাণ্ড নৌবন্দরের গোপনীয় নকশা। এই প্রশ্নের জবাবে হাউটন কতোগুলো পুরাতন দৈনিক সংবাদপত্র পোলিশ ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিলে। বললে: এই কাগজের ভেতর পোর্টল্যাণ্ড নৌবন্দরের অনেক খবর পাবে।…

খবরের কাগজের সংবাদে আমার আগ্রহ নেই। এ্যাটমিক সাবমেরিণের কতোগুলো গোপন নকশার আমার প্রয়োজন।

হাউটন এবার একটু ইতস্ততঃ করে বলে, গোপন নকশা আমার পক্ষে সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব।

পোলিশ ভদ্রলোক এবার ধমক দিলেন। স্পষ্টই বললেন যে, গোপনীয় নকশাগুলো তার একান্ত প্রয়োজন।

তারপর আরো দু'বার হাউটন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করলে। প্রতিবার একই প্রশ্ন, একই জবাব। হাউটন যতই বলে গোপনীয় নকশা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব, ভদ্রলোক অতোই ধমক দেন। একদিন দু'জন ভাড়া করা গুণ্ডা এসে হাউটনকে বেদম মার দিলো। তাকে বলা হলো, যদি ঠিক মতো সে কাজকর্ম না করে, তবে তার বান্ধবী এলিজাবেথকে ধরে মার দেওয়া হবে।

এর কিছুদিন বাদে পোলিশ ভদ্রলোকের পরিবর্তে নিকি বলে আর একটি পোলিশ গুপ্তচর এলো। কিন্তু নিকিও হাউটনের কাছ থেকে বেশী খবর বার করতে পারলেন না। নিকি একটা খালি দেশলাই এর বাক্স দিয়ে বললে, এই বাক্সের ভেতর সমস্ত নির্দেশ লেখা আছে। যদি কখনও আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও লণ্ডনের অমুক পার্কের দেয়ালে দুটো অক্ষর লিখে রেখো। তা'হলেই আমি বুঝতে পারবো যে আমাকে তোমার প্রয়োজন।

কিন্তু নিকিও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে এবার রুশ গুপ্তচর বিভাগ জি-আর-ইউ এবং তাদের এক বিশিষ্ট কর্মচারী কনন মোলডি ওরফে লনসডেল হাউটনের সঙ্গে বোঝাপড়ার দায়িত্ব নিলে। (ক্রমশঃ)

চাঁদ সম্বন্ধে নূতন তথ্য

রকেটের সাহায্যে চাঁদের যে সব ছবি তোলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে পূর্বকার বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, চাঁদের দেহে একজন মানুষের ভার সহ্য করবার ক্ষমতা নেই। কোনো মহাকাশ যান চাঁদে গেলে, সেটা চাঁদের পাতালপুরীতে ঢুকে যাবে। জনৈক বিজ্ঞানীর মতে চাঁদের উপরকার ধূলার নীচে আছে তুষারের স্তর।

কিন্তু বর্তমান সোভিয়েট রকেট লুনা ৫ মারফৎ এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে যে, চাদের উপর এত বেশী ধূলা যে সেখানে মসৃণের পথে নামা বেশ শক্ত হবে। ঐ রকেটের যন্ত্রপাতি ভাল ভাবেই কাজ করেছিল, কিন্তু সেটা চাঁদে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল, ধীরে ধীরে নামতে পারেনি।

সংবাদ-বিচিত্রা

কাঠির মাথায় স্যাণ্ডউইচ

হ্যানোভারের ধনী পল্লীতে পশ্চিম জার্মানীর সবচেয়ে মনোরম একটি উদ্যান আছে। একদিন এখানে ছিল শতাব্দী-প্রাচীন প্রাসাদ, যেখানে জার্মান সম্রাটের নিযুক্ত হ্যানোভারের শাসকবর্গ গ্রীষ্মকালে বাস করতেন। গত যুদ্ধে, বোমার আঘাতে ঐ প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যায়।
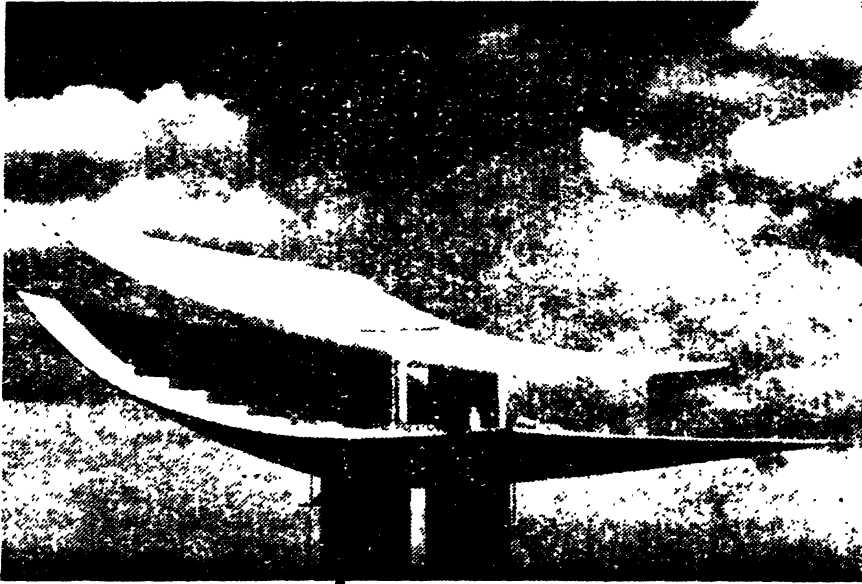
এবছর এই উদ্যানের ত্রিশতবার্ষিকী পালিত হবে। সেই উদ্দেশ্যে যেখানে একদিন প্রাসাদ ছিল, সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে স্থির হয়েছে। এটি হবে একাধারে একটি স্মৃতি-স্তম্ভ ও তোরণ। এর পরিকল্পনা করেছেন ওলন্দাজ স্থপতি অধ্যাপক আর্নে জ্যাকবসন। স্মৃতি-স্তম্ভের মডেল দেখে একজন সাংবাদিক মন্তব্য করেছেন যে, জিনিসটা দেখতে যেন ঠিক একটি কাঠির মাথায় স্যাণ্ডউইচ। এ স্যাণ্ডউইচের মত দুটি অর্ধচন্দ্রাকার বাটির মধ্যে থাকবে একটি রেস্তরাঁ—যেখান থেকে ভ্রমণকারীরা উদ্যানের এক অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণ করতে পারবেন।

বৈদ্যুতিক হিসাব-যন্ত্রের মস্তিষ্ককোষ

পশ্চিম জার্মানীর বিজ্ঞানী ও কুশলী কারিগররা নতুন এক বৈদ্যুতিক হিসাব-যন্ত্রের জন্য এমন ক্ষুদ্র ও সরু মস্তিষ্ককোষ সম্প্রতি উদ্ভাবন করেছেন, যেটি আঙ্গুলের ডগায় রাখলেও চোখে পড়ে না। অথচ এই সূক্ষ্ম সরঞ্জামটির মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় সংযোগ ব্যবস্থাসহ ১৫টি সিলিসিয়াম ট্রানজিস্টার ও ১২টি প্রতিরোধক। এই মস্তিষ্ককোষ চার হাজার থেকে সোয়া পাঁচ লক্ষ বিভিন্ন সংকেত অনুধাবন করতে সক্ষম। সংকেত গ্রহণ ও তার মর্মোদ্ধার করতে এতে সময় লাগে মাত্র •'৮৪ থেকে ২ মাইক্রো-সেকেণ্ড। এই যন্ত্রের আরেক সুবিধা যে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তৈরী হিসাব-যন্ত্রের 'নির্দিষ্ট ভাষা' এটি বুঝতে পারে এবং নিজের ভাষা ছাড়াও "কোবোল" ও "ফোটান" নামে আন্তর্জাতিক হিসাবের ভাষাতেও ফলাফল প্রকাশ করতে পারে।

একটি শহরের সহস্র বর্ষ পূর্তির উৎসব

হাজার বছরের অস্তিত্ব নিয়ে গর্ব করতে পারে, দুনিয়ায় সেরকম জনপদের সংখ্যা বোধহয় গুটিকয়েক। পশ্চিম জার্মানীর দ্বিতীয় বৃহৎ বন্দর-নগরী ব্রেমেন সেই সৌভাগ্যের অধিকারী। ইতিহাস বলে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের নির্বাচিত প্রথম সম্রাট মহাবীর অটো ৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রেমেন শহরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রা-প্রচলনের অধিকার দিয়েছিলেন। সেই হাজার বছর পূর্তির উৎসবের আয়োজন চলেছে এই বছর। কিন্তু এই উৎসবের মাঝে হঠাৎ দেখা দিয়েছে খানিকটা তর্কবিতর্কের ঝড়। কারণ প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে ঐতিহাসিকরা প্রমাণ পেয়েছেন যে ৭৭ বছর আগেই ব্রেমেন শহরের হাজার বছর পূর্তির উৎসব পালিত হওয়া উচিত ছিল। কারণ, ৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দেই করিন্থিয়ার রাজা আরনুলফ্ এই শহরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার দিয়েছিলেন। যাই হোক 'গতস্যশোচনানাস্তি' ক'রে ব্রেমেনের অধিবাসীরা এই বছরেই সেই হাজার বছর পূর্তির আনন্দ-উৎসবের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

ব্রেমেন সম্বন্ধে প্রথম যে প্রাচীন দলিলপত্র পাওয়া গেছে, তার তারিখ সেই ৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের। শহরের প্রাচীনতম ক্যাথিড্রাল ভবন নির্মিত হয়েছিল একাদশ খ্রীষ্টাব্দে। শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বন্দরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই ও শহরের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্বিত হলেও উনবিংশ শতাব্দীতে, ব্রেমেন হয়ে দাঁড়ায় জার্মানীর একটি অন্যতম বন্দর। বর্তমানে ব্রেমেন যুরোপের মধ্যে সর্ববৃহৎ মৎস্য ব্যবসায়ের বন্দর। অধুনা বন্দরসহ ব্রেমেন শহর পশ্চিম জার্মানীর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অঙ্গরাজ্য, যার আয়তন ৯৯৮০০ একর ও অধিবাসীর সংখ্যা সাত লক্ষ পঁচিশ হাজার।

পাটকিলে ভূত বনাম সাদা ভূত

বাগ-বাগিচার শখ আছে যাদের পশ্চিম জার্মানীতে, তাদের অনেকেই বামনাকার ভূতপ্রেতের পুতুল দিয়ে বাগান সাজাতে ভালোবাসেন। আগেকার দিনে এইসব পুতুলের মুখের রঙ হ'ত সাদা ও গোলাপী। হালে এই মাটির পুতুলগুলোর রঙ বদলে করা হচ্ছে গাঢ় পাটকিলে

রঙের। এই পাটকিলে বামন ভূতেরা সাদা ভূতদের যে কিছুদিনের মধ্যেই সব বাগান থেকে তাড়াবে, তা সংবাদপত্রে পাটকিলে ভূতদের প্রশংসা পড়লেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

'নিজে কর' খেলনার প্রদর্শনী

খেলনা পেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর কিছুই চায় না। আগে রেওয়াজ ছিল তৈরী খেলনার, আর এখন বিশেষতঃ বিদেশে রেওয়াজ হয়েছে 'নিজে তৈরী ক'রে নাও' খেলনার ঢেউ। এগুলো অনেকটা 'মেকানো' ধরনের। অনেকগুলো আলাদা আলাদা অংশ থাকে এতে, যেগুলো জুড়ে জুড়ে নানা রকমের খেলনা করা যায়। ছোটরা এগুলো পেয়ে অনেকক্ষণ বসে বসে ভেবে মাথা খাটিয়ে মনের মত সব খেলনা তৈরী করতে পেরে খুব খুশি হয়।

এই রকম খেলনার একটি প্রদর্শনী গত মাসে পশ্চিম জার্মানীর নূরেনবের্গে হয়ে গেছে। পৃথিবীর ২২টি দেশের ১০৬১টি প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছিল আর সারা পৃথিবী থেকে খেলনা কিনতে নূরেনবের্গে লোক এসেছিল প্রায় ষোল হাজার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্থনীতে একটি আশ্চর্য খেলনা-যন্ত্র এনেছিল। ছেলেমেয়েরা এই যন্ত্রে প্লাস্টিকের পাত তৈরী ক'রে, তাতিয়ে, ৫০ রকম ধাঁচে কেটেকুটে নিয়ে বিমান, মোটরগাড়ী, জাহাজ ও নানা রকম জীবজন্তু বানাতে পারে। গয়না তৈরীর বাক্স দিয়ে ছেলেমেয়েরা নিজেরাই নানারকম ধাতুর গয়না তৈরী করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন অংশ-ভরা এমন সব খেলনার বাক্স এসেছিল, যেগুলি জুড়ে জুড়ে নানা রকমের বিমান, সুসজ্জিত বিজ্ঞান গবেষণাগার, মাইক্রোস্কোপ মায় গ্রামাফোন পর্যন্ত তৈরী করা যায়।

অনেক ছেলে যাদের খুব মোটরগাড়ীর বাতিক, তাদের জন্যে এবারের প্রদর্শনীতে প্রথম দেখা দিয়েছে "ইলেক্‌ট্রিক কার"। এতে আসলের মত সব কিছুই আছে, যেমন চার রকমের গীয়ার, ক্লাচ্, নিউট্রাল গীয়ার ও ইগ্নিশন কী। ঘরে এনে ছেলেরা এই গাড়ী চালালে বাড়ির লোকদের কানে তালা লেগে যাবে এইসা শব্দ হয় এতে। যেসব ছেলেরা "যুদ্ধ যুদ্ধ" খেলতে ভালবাসে, তাদের খেলার জন্যেও বাক্স-ভর্তি যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরী হয়েছে, যেমন সাইলেন্সার দেওয়া পিস্তল, হ্যাণ্ডগ্রেনেড, ফিল্ড-গ্লাস, জ্যাক নাইফ অর্থাৎ একজন গুপ্তচরের পক্ষে যা কিছু দরকার সব!

ডল পুতুলগুলি আগেকার মত দেখতে শান্ত-শিষ্ট হলেও তাদেরও অনেক ভোল বদলেছে। তারা এখন গান গাইতে পারে, জিভ বার ক'রে ভেংচাতে পারে, ঠোঁট ওল্টাতে পারে, মুখে দুঃখের ভান করতে পারে, আর সাজপোশাকের তো কথাই নেই! আজকাল আবার নানা ধাঁচের আলগা পরচুলাসমেত ডলপুতুল পাওয়া যায়, যাতে তিনি এক এক সময় কেশসজ্জাও করতে পারেন।

মেঠুড়ে

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

বোম্বাইতে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে বোম্বাই দলকে ৩—০ গোলে হারিয়ে পাঞ্জাব তৃতীয়বার জাতীয় হকির চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে। এর আগেও দু'বার ১৯৫৪ এবং ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে।

পাঞ্জাব পুলিস এবং পাঞ্জাব রাজ্য এবার জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার শুরু থেকে যেমন সংঘবদ্ধ ক্রীড়াধারার পরিচয়ে এক-একটা দলকে হারিয়েছে, তাতে তাদের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ যোগ্য পুরস্কার। বিশেষ করে চারজন অলিম্পিক খেলোয়াড় নিয়ে গড়া গতবারের রানার্স সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে সেমি-ফাইন্যালে পাঞ্জাবের জয় খুবই কৃতিত্বের। বোম্বাই সম্পর্কে এই একই কথা বলা চলে। বোম্বাই দলে টোকিও অলিম্পিকের কোনো খেলোয়াড়-ই ছিলেন না। অপর দিকে ভারতীয় রেলওয়ে দলে ছিলেন পৃথ্বীপাল, যোগীন্দার সিংয়ের মত টোকিও অলিম্পিকের চারজন খেলোয়াড়। কিন্তু গত বছরের চ্যাম্পিয়ন রেল দলকে বোম্বাইয়ের কাছে সেমি-ফাইন্যালে হারতে হয়েছে। সেমি-ফাইন্যালে পরাজিত দু'দল রেলওয়ে ও সার্ভিসেসের ভেতর জাতীয় হকির তৃতীয় দল নির্বাচনের খেলায় সার্ভিসেস দলকে আবার রেল দলের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। ভাঙা ছেঁড়া দল নিয়ে জাতীয় হকির কোয়ার্টার ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠে কোয়ার্টার ফাইন্যালে সার্ভিসেস দলের সঙ্গে একদিন গোলশূন্যভাবে খেলা শেষ করে দ্বিতীয় দিনের খেলায় বাংলার মাত্র ১—০ গোলে হারাকে অভিজ্ঞ হকি ক্রীড়া-রসিকরা অন্যায় বলবেন না।

ক্রিকেট টেস্ট : অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটা দেশের ভেতর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ও

অস্ট্রেলিয়ার স্থান প্রথম ও দ্বিতীয়। তাই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলাকে অনেকেই 'ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ অব দি ওয়ার্লড' এই নতুন নাম দিয়েছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান টেস্ট সিরিজের আগে দু'দেশ কুড়িটা টেস্ট খেলেছে। কুড়িটা খেলার ভেতর অস্ট্রেলিয়া তেরোটা টেস্টে জিতেছে; তিনটে টেস্টে জিতেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ; তিনটে টেস্ট ড্র হয়েছে এবং একটা টেস্ট 'টাই' (দু'দলের সমান রান) হয়েছে। যেটা এখনো পৃথিবীর একমাত্র 'টাই' টেস্ট হয়ে আছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত খেলা, সবার ওপর তাদের খেলোয়াড়-সুলভ মনোভাবের কথা কারোই অজানা নেই। তাই কিংসটনের সাবিনা পার্কে এই সিরিজের প্রথম টেষ্ট খেলার অনেক আগে থেকেই মাঠের সমস্ত আসন পূর্ণ হয়ে দাঁড়াবার জায়গাতেও তিল ধারণের স্থান ছিল না। প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অস্ট্রেলিয়াকে ১৭৯ রাণে হারিয়ে দেবার পর ত্রিনিদাদে দু'দেশের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংশিতভাবে শেষ হয়। নিজের দেশে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম জয়। টসে জেতার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাট করতে আরম্ভ করলে অনেকেই আশা করেছিলেন, প্রথম ইনিংসে তারা অন্ততঃ পাঁচশ-র মত রান তুলবে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার নতুন ইনসুইং ফাস্ট বোলার মেন এবং লেগব্রেক বোলার ফিলপটের নিখুঁত বোলিংয়ের জন্যেই মাত্র ২৩৯ রাণে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়া কোনো উইকেট না হারিয়ে ৪২ রাণ তুললে প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়। ব্যাটিং ব্যর্থতাকে বলের জোরে পুষিয়ে নিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ চেষ্টার ত্রুটি করেনি। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হল একাই অস্ট্রেলিয়া দলের অর্ধেক খেলোয়াড়কে তাঁবুতে ফেরত পাঠান। প্রথম দিন যে অস্ট্রেলিয়া কোনো উইকেট না হারিয়ে ৪২ রাণ তুলেছিল দ্বিতীয় দিন তারা ৯ উইকেটে ২১০ তোলে। তৃতীয় দিন ২১৭ রাণে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ তিন উইকেটে ১৯৯ রাণ তোলে। চতুর্থ দিন ৩৭৩ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার, জয়ের জন্যে ৩৯৬ রাণের দরকার থাকে। চতুর্থ দিনের শেষে বাকী সময়েতে ৪২ রাণ তুলতেই অস্ট্রেলিয়ার দুটো উইকেট পড়ে যায়। পঞ্চম দিনে ২১৬ রাণে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়ায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১৭৯ রাণে জয়ী হয়। পাঁচ দিনের মধ্যেই ছ-দিনের টেষ্ট খেলার ওপর ছেদ পড়ে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স এই খেলার শেষে টেষ্টে চার হাজার রাণ ও একশ উইকেট দখল করে নতুন কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন।

ত্রিনিদাদের কুইন্স পার্ক ওভালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেষ্টের ফলাফল শুধু অমীমাংসিত হয়নি, ছ-দিনের টেষ্টে দু' দল পুরো দু'ইনিংস করেও খেলতে পারেনি। আগের দিন বৃষ্টি হওয়ায় অধিনায়ক সিম্পসন টসে জিতেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ

দেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে ৪২৯ রাণ উঠতে দেখে যাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন আবার হয়তো অস্ট্রেলিয়ার বিপদ দেখা দেবে, তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ের প্রশংসা না করে পারেন নি। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের রাণ থেকে ৮৭ রাণ এগিয়ে থেকে ৫১৬ রাণে ইনিংস শেষ করা অস্ট্রেলিয়ার কৃতিত্বের পরিচায়ক। বিশেষ করে অয়েষ্ট ইণ্ডিজের বলের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় টেষ্টে তিনজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেছেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে বেসিল বুচার, অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে বব কাউপার ও ব্রায়ান বুথ। তবে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ওপেনিং ব্যাটসম্যান কান্‌রাড হাণ্টের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতন। প্রথম টেষ্টে ৪১ ও ৮১ রাণের অধিকারী হাণ্ট দ্বিতীয় টেষ্টে ৮৯ ও ৫৩ রান করে ৪ ইনিংসে সংগ্রহ করেছেন ২৬৪ রান! ওপেনিং ব্যাটসম্যানের পক্ষে খুবই কৃতিত্বের কথা। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলে টেষ্টে নবাগত ডেভিসের কৃতিত্বও সমান উল্লেখযোগ্য। জীবনের প্রথম টেষ্টে এবং প্রথম ইনিংসে বৃষ্টি-ভেজা মাঠে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে তাঁর ৫৪ এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ৫৮ রাণ ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্রের নিদর্শন।

হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন বি. এন. আর

প্রথম ডিভিসন হকি লীগে বি. এন. রেল দলের সর্বপ্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের সম্মান তাদের গৌরবোজ্জ্বল ক্লাব ইতিহাসের আর এক নতুন অধ্যায়। শুধু অপরাজিত থেকে হকি লীগ নয়— বি. এন. আর এবার 'গোল্ড কাপ'-ও বিজয়ী।

হকি লীগে এবার গোলের সংখ্যা খুব বেশি। হ্যাট্রিকের সংখ্যাও কম নয়। বিভিন্ন দলের ন-জন খেলোয়াড় এগার বার হ্যাট্রিক করেছেন। কিন্তু শক্তিশালী দল হিসেবে যাদের নাম আছে তাদের কারোই খেলাতে এবার নৈপুণ্য এবং উন্নত ক্রীড়াশৈলীর আভাস মেলেনি। গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল পরপর দশটা খেলায় জেতার পর ইষ্টার্ণ রেলের কাছে প্রথম হার স্বীকার করে এবং পরে মোহনবাগানের কাছেও হেরে চ্যাম্পিয়নশিপের আশা নষ্ট করে। মহমেডান স্পোর্টিং এবার পরপর চোদ্দটা খেলায় জেতার পর বি. এন. রেলের কাছে প্রথম হার স্বীকার করে। ফলে মোহনবাগান ও বি. এন. রেলের লীগ জয়ের সম্ভাবনা বড় হয়ে দেখা দেয়। দুই অপরাজিত দল বি. এন. আর ও মোহনবাগানের খেলায় রেলদলের জয়ের ফলে একদিকে যেমন তারা চ্যাম্পিয়নশিপের মুখে এসে পৌছয়, অন্যদিকে তেমনি তারা অপরাজিত দলের গৌরব নিয়ে এগিয়ে চলে একটার পর একটা খেলায়। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগানের সঙ্গে এক পয়েণ্টের ব্যবধানে এবং উনিশটি খেলায় অপরাজিত থেকে বি. এন. আর প্রথম লীগ জয়ের এবং মোহনবাগান রানার্সের সম্মান পায়।

এবার কুড়িটা দল নিয়ে প্রথম ডিভিসন হকি লীগের খেলাগুলো হয়েছিল। পোর্ট কমিশনার্স ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবার প্রথম ডিভিসন থেকে দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে গেছে এবং আসছে বার সে-জায়গায় দ্বিতীয় ডিভিসনের রিভার সাইডার্স ও ডালহৌসী খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

আমি এক বছর হ'ল লণ্ডনে এসেছি এবং এখানকার স্কুলে ভর্তি হয়েছি। এই স্কুলের নাম CLITTER HOUSE JUNIOR SCHOOL. আমাদের স্কুলে আমি নিয়ে দু'জন ভারতবাসী। আমাদের স্কুল সাড়ে ন'টায় আরম্ভ হয় এবং চারটের সময় ছুটি হয়। আমাদের খাওয়াদাওয়া সবই স্কুলে হয়। আমাদের ১১টার সময় ছুটি হয়; তখন আমাদের দুধ খাবার সময়। তারপর ১২টায় Lunch-এর সময়। তারপর আবার ছুটি। আমাদের তিন-বার ছুটি হয় খেলার জন্য। স্কুল থেকে বেড়াতে নিয়ে যায়—Hampton Court, Windsor এবং অন্যান্য স্থানে। সেখানে সাঁতার কাটতে হয়। স্কুল থেকে সাঁতার শেখাবার ব্যবস্থা আছে। ৭।৮ মাইল প্রায়ই আমাদের হাঁটতে হয়। স্কুলে সব বই খাতা রাখা থাকে। বাড়ীতে কোন বই আনবার উপায় নেই। যা আমরা পড়ি, সব মনে রাখতে হয় এবং তাই পরীক্ষা দিতে হয়। কলকাতা থেকে C. L. T. এসে এখানে নাচ দেখিয়ে গিয়েছিল। আমাদের স্কুলে Sport হয়। আমি এইসব খেলায় যোগ দিই। এখানে Beatles দেখতে পাই। ওদের গান আমার খুব ভাল লাগে। ওদের এক-একজনের নাম পল, জন, জর্জ আর রিংগো—আমার আসল নাম চিত্রা, তবে এখন আমার এখানের নাম জেনেট। স্কুলের মিসট্রেস এই নাম দিয়েছেন এবং খাতায় এই নাম লিখে নিয়েছেন।

জেনেট মুখার্জী

মৌচাকের বার্ষিক পুরস্কার

'মৌচাক পুরস্কার' শিশু-সাহিত্যের জন্য বাংলা দেশের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরস্কার।

ভারতবর্ষের মধ্যে কোন পত্রিকার তরফ থেকে শিশু-সাহিত্যিকদের এ ধরণের এক-কালীন ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা পুরস্কার আর কোথাও দেওয়া হয় না। 'মৌচাক' কর্তৃপক্ষ সেদিক থেকে এদেশে শিশু-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে একটি উদার নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন।

আজ আট বছর ধরে এই পুরস্কার বাংলার খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিকদের দিয়ে আসা হচ্ছে।

'মৌচাক পুরস্কার' প্রথম পান প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক স্বর্গত হেমেন্দ্রকুমার রায়। পরবর্তী বৎসরগুলিতে ক্রমান্বয়ে এই পুরস্কার-লাভের গৌরব অর্জন করেন—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, স্বপনবুড়ো (?) রাও, শিবরাম চক্রবর্তী, স্বর্গত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও নরেন্দ্র দেব।

১৩৭১ সালের জন্য বর্তমান বৎসরে এই পুরস্কার লাভ করেছেন ধীরেন্দ্রলাল ধর। দীর্ঘ দিন ধরে শিশু-সাহিত্যকে নানা ধরণের রচনায় পুষ্ট করে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। বয়সে তিনি পঞ্চাশের কোঠায় এখনো পদার্পণ না করলেও, তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছে গেছে।

———
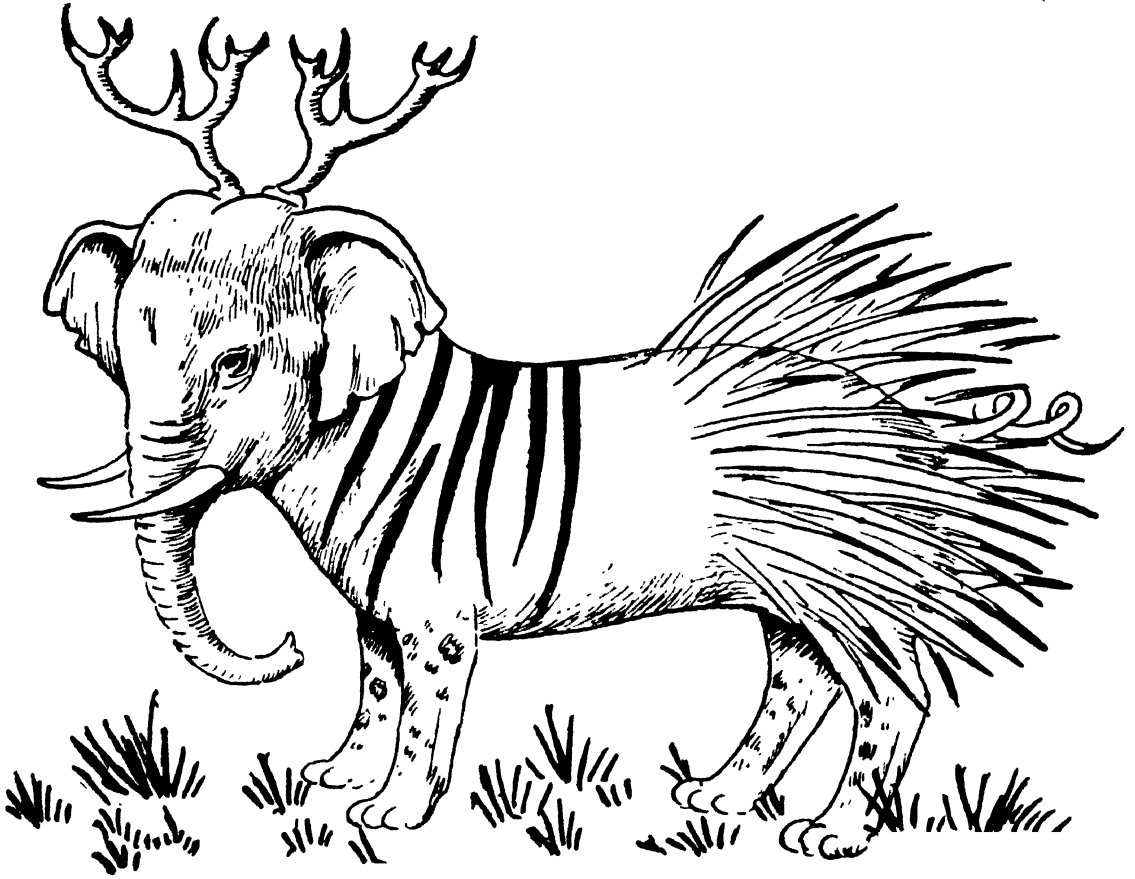
উপরের এই অদ্ভুত জীবটিকে নিশ্চয়ই কখনো কোন চিঁড়িয়াখানায় দেখনি তোমরা। আসলে এমন কোন জন্তুই নেই পৃথিবীতে। তবে এটি কি? এই প্রশ্নই এখন জাগবে সবার মনে। এটি অনেকগুলি জন্তুর সংমিশ্রণে তৈরী শিল্পীর আঁকা একটি কিম্ভূতকিমাকার জন্তুর ছবি। এই ছবিটি দেখে, এর মধ্যে ক'টি জন্তুকে পাওয়া যায় তোমরা বার করার চেষ্টা করো।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ২০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০·৪৫ পয়সা

সাবান-গোলা জলে মজা ক'রে
ফেনার ফানুস ফোলাই ফুঁয়ের জোরে।
[ফটো : শ্রীসুকুমার রায়]

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *
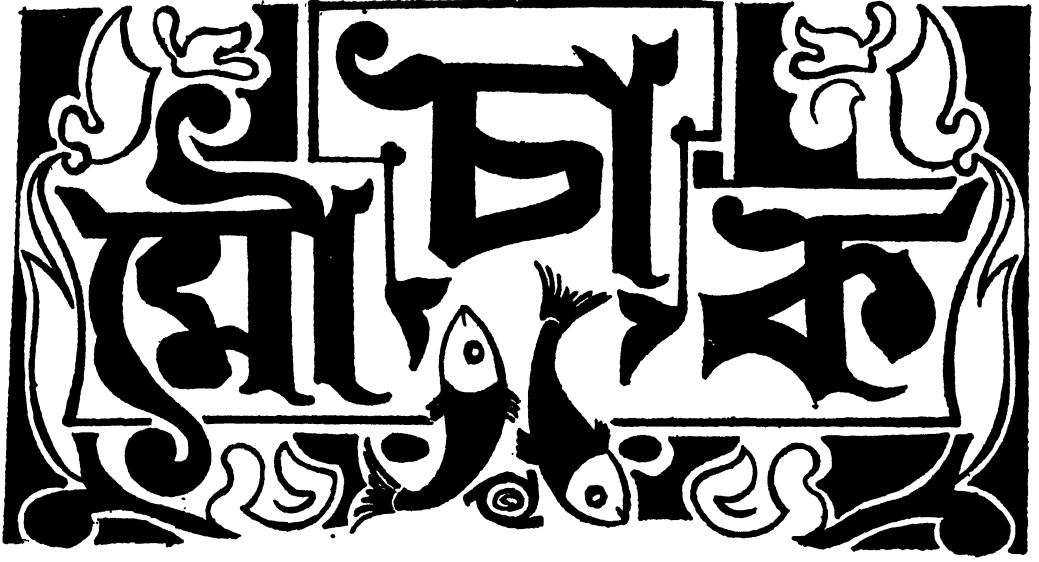
৪৬শ বর্ষ]　　আষাঢ় ঃ ১৩৭২　　[৩য় সংখ্যা

কিশোরদের জন্য প্রার্থনা

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

সবুজ বাহিনা,　তোমার কাহিনী
লেখা হয়ে ইতিহাসের পাতায়
একদিন যেন দেশকে মাতায়।

কচি কিশোরের যেই কিশলয়ে
জ্বলজ্বল আজ　সবুজ শিখার,
একদা তা হোক জ্যোতিস্তম্ভ
দূর সমুদ্রে আলোক-লিখার ;
দূর করে দিক সকল আঁধার
যাবৎ বাধার　কুজ্ ঝটিকার !

আজ তা যেমন স্বতোৎসারিত
হাসিখুশি আর আমোদ বিলায়,
তেমনি একদা সহজ লীলায়,
জীবন-ছন্দে হোক ছন্দিত, হোক নন্দিত
হউক ধন্য হউক পূর্ণ
হউক বিশ্বজনবন্দিত—
এই প্রার্থনা করি বিধাতায় ॥

কবি-হওয়া

শ্রীবিশ্বেশ্বর সামন্ত

বাগিয়ে নিয়ে কাগজ কলম
লিখবো ভীষণ বেগে,
রবির মত কবি হবো
রাত পোয়াবার আগে,
আমি যদি চেষ্টা করি
হতেও পারি কবি,
কেউ বা বলে, তুই কি নব—
রবিঠাকুর হবি ?

অনেক কিছু ভাবার শেষে
লিখতে বসে দেখি,
সব কিছু যায় জট পাকিয়ে,
কলম অচল—একি !
কবি হওয়া সহজ কথা
মনে মনে ভাবি,
লিখতে গিয়ে কলমখানা
খাচ্ছে কেবল খাবি !

একটি লাইন লিখতে গিয়ে
কাগজ কালি নষ্ট,
কবি হওয়ার আশা ছেড়ে
পাচ্ছি মনে কষ্ট।

একদিন সন্ধ্যায়

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

'আমি এখন এই বাসনের গোছা নিয়ে বসেছি।'

বাড়ীতে তারাপদবাবুর অশান্তির সীমা নেই। সন্ধ্যার সময় অফিস থেকে ফেরবামাত্রই সদরে পাঁচ ছেলেমেয়ের চ্যাঁ ভ্যাঁ ঝগড়া মারামারি—একে চড়, ওকে ঘুষি, তাকে কানমলা দিয়ে অন্দরে ঢোকবামাত্র স্ত্রীর খিঁচুনি—ঝি আসেনি—বাসনকোশন মাজবে কে লোক দেখ—এমনি উৎপাত লেগেই আছে। তিনি একে ব্যতিব্যস্ত তার উপর কোনদিন এই উৎপাতের বিরাম নেই।

সেদিন অফিসে একটা হিসাবের গোলমাল নিয়ে সাহেবের কাছে খুব তাড়া খেয়েছেন। মন মেজাজ খুব খারাপ—তার উপর বাসে-ট্রামে ঝোলবার মতো জায়গাটুকুও পাননি—লালদীঘি থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত হেঁটে বাড়ী ফিরেছেন। বাড়ী ফিরে দেখেন সদরে বসবার ঘরে তক্তপোশের চাদরে ছেলেরা কালি ফেলে ধেই-ধেই নৃত্য করছে। সামনে যেটাকে পেলেন তাকে চড়-চাপড়ে ভূমিশায়ী করে তিনি অন্দরে ঢুকলেন। ঢুকে দেখেন, স্ত্রী কলতলায় বসে একরাশ বাসন মাজছেন।

স্ত্রী বললেন,—রোজ বলছি একটা নতুন লোক দেখ—এই ঝি নিয়ে কাজ চলবে না। আজও তিনি আসেন নি। আমি এখন এই বাসনের গোছা নিয়ে বসেছি। আমি এতো ঝক্কি সইতে পারবো না। তুমি লোক দেখ—নইলে আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাব।

তারাপদবাবু নিঃশব্দে শুনলেন। শুনে তিনি দোতলায় উঠলেন। এতোখানি পথ হেঁটে এসে গলা শুকিয়ে টা-টা করছে। ভেবেছিলেন স্ত্রীকে দিয়ে একটু চা তৈরী করিয়ে খাবেন, কিন্তু স্ত্রীর ঐ মেজাজ—চায়ের ফরমাশ করলে কি জানি হয়তো বজ্রপাত হয়ে যাবে। বসে তিনি ভাবছেন একবার বেরিয়ে মোড়ে চায়ের দোকানে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসবেন! কিন্তু তা হলো না। দুম্-দুম্ শব্দে স্ত্রী এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন,—আরাম করে বসছো কি? ছোট খোকার খুব জ্বর—এখুনি যাও হরিশ ডাক্তারকে ডেকে আনো। বসে হাওয়া খেতে হবে না।

কথাটা বলেই স্ত্রী চলে গেলেন। তারাপদবাবু ভাবলেন ধুত্তোর বাড়ীর নিকুচি করেছে! একদিন শান্তি পাব না। এই জীবন রেখে লাভ! কেউ আমার মুখের পানে চায় না।

তিনি বসে বসে ভাবতে লাগলেন। অনেক কিছু ভাবলেন—তারপর কি মনে হলো ছেলেদের খাতা থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে সেই কাগজে লিখলেন—"জীবনে আমার ধিক্কার ধরে গেছে। আমি চললুম—গঙ্গায় ডুবে মরব। ইতি—তারাপদ।"

চিঠিখানি ভাঁজ করে টেবিলের উপর রাখলেন। রেখে জামা গায়ে দিয়ে তিনি নীচে নামলেন। স্ত্রী বললেন,—হ্যাঁ, যাও হরিশ ডাক্তারকে নিয়ে এসো।

সেকথার জবাব না দিয়ে তারাপদবাবু বাড়ী থেকে বেরুলেন। বেরিয়ে একেবারে বাগবাজারে গঙ্গার ঘাটে।

ক'খানা বড় নৌকা থেকে খড়-বিচুলি নামানো হচ্ছে। দু'একখানা ইষ্টিমার খচ্ খচ্ করে চলেছে। দূরে কে গান গাইছে—

"সাগর কূলে বসিয়া বিরলে
হেরিব লহর মালা
মনোবেদনা তব সমীরণে
গগনে জানাবো জ্বালা।
প্রতারণাময় মানব-প্রাণ
আর না হেরিব নর-বয়ান
সমাজ-শ্মশানে রহিব না আর
সহিব না দুঃখ জ্বালা।"

তারাপদবাবু ভাবলেন, ঠিক কথা! মানব-প্রাণ সত্যই প্রতারণাময়! এই যে আমি এতো খেটে মরছি—তার ফলে, কি পাচ্ছি?···

এমনি ভাবতে ভাবতে ছেলেবেলার কথা মনে পড়লো—একজামিনের গুঁতো ছিল সত্যি, কিন্তু সঙ্গী-সাথীদের ভালবাসা সেই অনাবিল আনন্দ···

কতক্ষণ ভাবছেন ঠিক নেই হঠাৎ দেখলেন ঘাটের একটু দূরে একটি লোক জলে চুবন খাচ্ছে। তারাপদবাবু শিউরে উঠলেন। তিনি সাঁতার জানেন না। তবু মানুষের মন···তিনি থাকতে পারলেন না। তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঝাঁপিয়ে পড়েই তাকে ধরলেন। সে লোকটি অবলম্বন পেয়ে তারাপদবাবুকে জাপটে ধরলো। তারপর দু'জনে আরো অথৈ জলে দু'জনের চুবন খাওয়া। দু'জনেই হয়তো ডুবতেন, কিন্তু বিধাতার নির্বন্ধ! Rowing Club-এর একদল কিশোর হৈ হৈ করতে করতে নৌকায় ওপার থেকে ফিরছিল। তখন সন্ধ্যা নেমেছে—আকাশে ফালি চাঁদ—জলে-স্থলে ফিকে জ্যোৎস্না ঝিক্‌মিক্ করছে। তারা দেখলো, সেই জ্যোৎস্নার আলোয় দু'জন লোক জাপটাজাপটি করে জলে ডুবছে। তখনি তারা দু'জনকে টেনে নিজেদের নৌকায় তুলল। তুলে ঘাটে এনে first aid দিয়ে দু'জনকে চাঙ্গা করে তুললো। কাহিনী শুনলো—স্নান করতে নেমে ডুব-জলে চলে গিয়েছিল এবং চুবন খাচ্ছিলো। তাই দেখে তারাপদবাবু ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাকে উদ্ধার করবার জন্য। কিন্তু তিনি সাঁতার জানেন না এবং ডুবন্ত লোকটি তাঁকে জাপটে ধরার দরুণ দু'জনেই ডুবে যাচ্ছিলেন।

হিরো, হিরো, বলে কিশোরের দল চীৎকার করে উঠলো। ঘাটে তখন বেশ লোক জমায়েৎ হয়েছে এবং সকলের জয়ধ্বনির মধ্যে তারা তারাপদবাবুকে নিয়ে কাছেই তাদের ক্লাব—সেই ক্লাবে চললো।

ক্লাবে খুব সমারোহ করে তাঁর গলায় ফুলের মালা পরানো হলো—তখুনি গরদের ধুতি কিনে এনে কিশোররা সেই ধুতি তাঁকে পরালো এবং চা ও সন্দেশ প্রভৃতি অর্ঘ্যদানের ব্যবস্থা।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজলো এবং ঘটল তখনই এক কাণ্ড। পুলিশ এসে ক্লাবের দোরে হাজির। ইন্সপেক্টর বললেন,—তারাপদবাবু আছেন? কিশোররা বলে উঠলো,—এই যে—এই যে তারাপদবাবু। ইন্সপেক্টর বলল,—থানায় যেতে হবে। তারাপদবাবু বললেন,—কেন? ইন্সপেক্টর বলল,—আপনি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। জানেন, আত্মহত্যা করার চেষ্টা ফৌজদারী আইনে অপরাধ!

তারাপদবাবুর বুকখানা ধড়াস করে উঠলো। ক্লাবের মেম্বাররা বললেন,—সে কি মশায়, আত্মহত্যা!

ইন্সপেক্টরবাবু বলল,—হ্যাঁ, এই চিঠি। ইনি বাড়ীতে এই চিঠি লিখে এসেছিলেন, গঙ্গায় ডুবে মরবেন এ কথা জানিয়ে। বাড়ীর লোক এই চিঠি দেখে থানায় এসে খবর দেন। আমরা থানা থেকে তখনি গঙ্গার ঘাটে আসি ওঁর সন্ধানে। ঘাটে এসে শুনি, আপনারা জল থেকে তুলে ওকে আপনাদের ক্লাবে নিয়ে এসেছেন—তাই এসেছি এ্যারেষ্ট করতে।

মেম্বাররা বললে,—কিন্তু উনি একজন লোককে জল থেকে উদ্ধার করবার জন্যই নেমেছিলেন।

ইন্সপেক্টর বললেন,—কোথায় সে লোক?

তাই তো! সে লোকটির নামধাম কিছুই তো জানা হয়নি। মেম্বাররা হিরোকে নিয়ে মত্ত।

তারাপদবাবু রেহাই পেলেন না। তাঁকে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে থানায় যেতে হলো। সে রাত্রে থানা থেকে জামিনে খালাস পেলেও পরের দিন আদালতে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। তাঁর বিরুদ্ধে মস্ত প্রমাণ, তাঁর লেখা সেই চিঠি। খরচ করে উকিল দিয়ে কোন মতে কুড়ি টাকা জরিমানা দিয়ে সে যাত্রা তিনি মুক্তি পেলেন।

তারপর বাড়ীতে…সে কথায় আর কাজ কি!

নাই

শ্রীসমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

শুধু নাই আর নাই শুধু খাই খাই,
পেটে নাই অন্ন মাথা গুজি নাই ঠাঁই।
পরিধানে বস্ত্র নাই হয়েছি স্বাধীন
বচনেতে মহাবীর করমেতে হীন।
বেতারে ছড়াই শুধু বাক্যের বেসাতি
কর্মের আসিলে চাপ পালাই ঝটিতি।

জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি শুধু কল্পনায়,
দেশের মানুষ মরে পেটের ক্ষুধায়।
রপ্তানিতে রপ্তানিতে উজাড় সকল
চাল চিনি ডাল তেল আর ফুল ফল।
রেশনে, কণ্ট্রোলে দেশ রসাতলে যায়,
অসাধুর পোয়াবারো সাধু মরে হায়!

স্বর্ণপ্রসূ রত্নগর্ভা জন্মভূমি হিন্দ্,
অনাহারে মরে নর গাহি 'জয়হিন্দ্'!
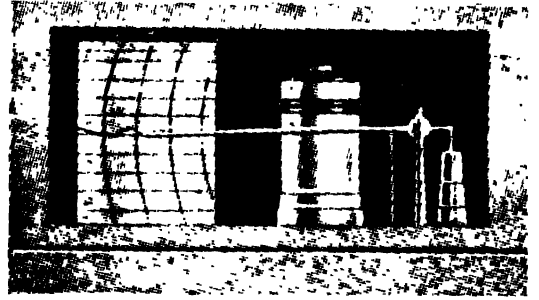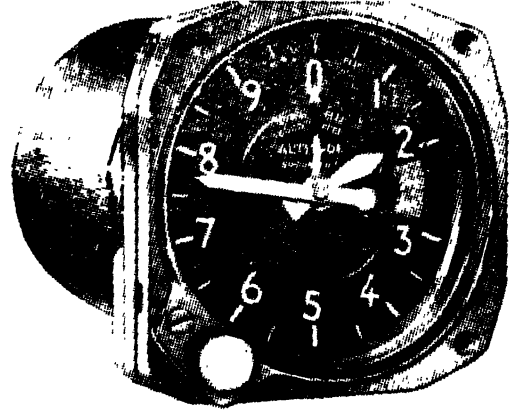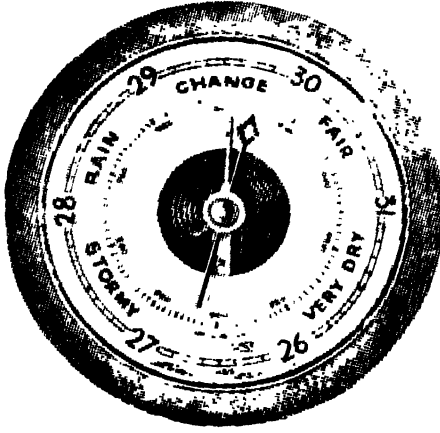
ছবিটির বাঁ দিকে সোজা দাঁড় করানো একটি মারকারি ব্যারোমিটার আছে। উপরে বাঁয়ে অ্যানারয়েড ব্যারোমিটার এবং ডাইনে প্লেনের অল্‌টিমিটার। এ ছাড়া নীচে একটি ব্যারোগ্রাফ দেখা যাচ্ছে।

বাতাসের ওজন মাপা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মাছ যেমন জলের মধ্যে ডুবে থাকে, আমরাও যে সেই রকম বাতাসের মহাসমুদ্রে ডুবে আছি—এ ধরণের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। আর এ-ও শুনেছো বোধ হয় যে, এই বাতাস আমাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ দেয়—যে চাপের পরিমাণ মাত্র এক বর্গ ইঞ্চি জায়গার ওপর প্রায় সাড়ে সাত সের। এই চাপ, অর্থাৎ বাতাসের ওজন আমরা কি করে মাপি বলো ত'?

যে যন্ত্র দিয়ে বাতাসের ওজন মাপা হয়, তার নামটা কিন্তু সবাই জানো—ব্যারোমিটার।

ব্যারোমিটার সাধারণতঃ তিন ধরণের হয়ে থাকে, অ্যানারয়েড ব্যারোমিটার, মারকারি ব্যারোমিটার আর অল্টিমিটার।

ছবিতে অ্যানারয়েড ব্যারোমিটারের মোটামুটি একটা চেহারা পাবে। ব্যারোমিটারের ডায়ালের ওপর যেমন বাতাসের চাপের মাত্রা আছে—তেমনি চাপের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন কেমন হবে সে কথাও লেখা আছে। যখন বাতাসের চাপ যেমন, ব্যারোমিটারের নির্দেশক কাঁটাটি সেই ঘরে এসে দাঁড়ায়। দেখেই বুঝতে পারছো—বাতাসের চাপ কমে গেলে তা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেয়, হঠাৎ আরো কমে গেলে ঝড় হতে পারে। তেমনি, যত চাপ বাড়ে আবহাওয়া ততো শুষ্ক হয়ে পড়ে। রেডিওতে যে আবহাওয়ার খবর পাও, তার মূল জিনিস কিন্তু এই ব্যারোমিটার।

অ্যানারয়েড ব্যারোমিটার তৈরী হয় ধাতুর তৈরী একটা চওড়া ফাঁপা বাক্স দিয়ে। এর ওপরটা থাকে ঢেউ খেলানো। দেখতে ভাল করবার জন্য এই ঢেউ তোলা হয় না, জিনিসটা শক্ত করবার জন্য এটা করা হয়। কারণ, বাক্সর ভেতরে সব বাতাস বার করে নেওয়া হয়। ফলে—ভেতরের বাতাস বাইরের দিকে কোন চাপ দিতে পারে না, অথচ বাইরের দিকের বাতাস প্রচণ্ড চাপ দিয়ে বাক্সটাকে দুমড়ে ফেলতে চায়। সেজন্য বাক্সর ওপরটা একটা শক্ত স্প্রিং দিয়ে আটকানো থাকে। আসলে বাক্সর ওপরের ওঠা-নামা দেখেই বাতাসের চাপ মাপা হয়। যখন বাতাসের চাপ অল্প থাকে, তখন ওপরটা একটু বেশী উঠে থাকে। কিন্তু চাপ বাড়লে ওপরটা চাপ প'ড়ে খানিক নিচে নেমে যায়। অবশ্য এই ওঠা-নামা এত সামান্য যে খালি চোখে বোঝা যায় না, তাই লিভার আর কাঁটা দিয়ে ছোটখাটো পরিবর্তন ধরবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মারকারি ব্যারোমিটার খুব সূক্ষ্ম ধরণের যন্ত্র। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে এই ব্যারোমিটার দেখা যায়। যন্ত্রের গায়ে দাগ দেওয়া থাকে—পারদের ওঠা-নামা দেখে বাতাসের চাপ মাপা হয়।

কিন্তু ব্যারোমিটারে যেমন বাতাসের চাপ মাপা যায়—উচ্চতাও মাপা যায়। কারণ, যত উঁচুতে উঠবে বাতাস তত কমে যাবে—তার মানে, বাতাসের চাপও কমবে। কতটা ওপরে উঠলে চাপ কতটা কমবে তা সব সময়ই একরকম। যেমন, এক হাজার ফিট ওপরে বাতাসের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে আধ পাউণ্ড বা প্রায় এক পোয়ার মতো কমে যায়।

এইটাকে কাজে লাগিয়েই অল্টিমিটার তৈরী করা হয়। এই অল্টিমিটার এরোপ্লেনকে খুব সাহায্য করে। কিন্তু বুঝতেই পাচ্ছো—এই যন্ত্র আর ব্যারোমিটার মোটেই আলাদা নয়।

মুক্তি

শ্রীমঞ্জিল সেন

এবার পূজোর সময় ঝাড়গ্রাম গিয়েছিলাম —অবশ্য আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল শহরের লোকালয় ছাড়িয়ে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে এক সাঁওতাল পল্লীর কাছাকাছি। খুব নির্জন স্থান। পল্লীটিও আধ মাইলের ওপর দূরে। আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম তার থেকে মিনিট তিনেক হাঁটা-পথে আর একটা বাড়ী। আশেপাশে আর কোন বসতবাটী নেই, শুধু বড় বড় গাছ আর ঝোপ-ঝাড। এই পাশের বাড়ীতেই আমার এক আত্মীয় থাকেন, তাঁর মুখেই ঘটনাটি শোনা। তাঁর মুখ থেকে যেমনটি শুনেছি ঠিক সেই ভাবে পুরো কাহিনীটি বলছি।

প্রায় বছর ত্রিশেক আগেকার কথা। এখনই যদি শহুরে লোকদের এখানে এসে নির্জন লাগে, অন্ধকার হলেই শেয়ালের ডাক্ শুনে গা ছম্‌ছম্ করে, তবে তখনকার অবস্থা বুঝতেই পারছ। সাঁওতাল পল্লীটি অবশ্য তখনও ছিল। আমি তখন কাঁথিতে কাজকর্ম করি। এই সময় ঝাড়গ্রাম বেড়াতে এসে সুবোধবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়। ক্রমশঃ সেটা অন্তরঙ্গতায় পরিণত হ'ল। সুবোধবাবু এখানে ঘর-বাড়ী করে আত্মীয়স্বজন নিয়ে বসবাস করছিলেন। জায়গাটার নির্জনতা, প্রকৃতির অরূপ শোভা আর চাঁদনী রাতে শাল-মহুয়ার বন পেরিয়ে ভেসে আসা সাঁওতালদের বাঁশি ও মাদলের ধিতাং-তাং বোল্ আমাকে সত্যি মুগ্ধ করেছিল। সুবোধবাবু তো আমাকে প্রতিবেশী রূপে পাবার জন্য ব্যাগ্র হয়ে উঠেছিলেনই, তার ওপর জায়গাটা আমাকে আকর্ষণ করছে বুঝতে পেরে তিনি আর কাল বিলম্ব না করে তাঁর বাড়ীর কাছেই কয়েক বিঘা ধানি জমি খুব সস্তা দরে আমাকে কিনিয়ে দিলেন। আমিও মাথা গুঁজবার মত একটা ছোট-খাটো খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর তুলে ফেল্‌লাম। কার্যো-পলক্ষে কাঁথিতে থাকি আর ছুটি-ছাটা পেলেই এই প্রকৃতির কোলে চলে আসি। সুবোধবাবুর কাছে কথায় কথায় শুনেছিলাম তিনি এবং তাঁর তিন বন্ধু কোন এক সাহেব কোম্পানীতে চাকরী করিতেন সেখানে কারখানার অত্যধিক পরিশ্রম ও নানা প্রকার বিষাক্ত গ্যাসের সংস্রবে এসে তাঁর তিন বন্ধুই যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন, তিনিই শুধু পালিয়ে বেঁচেছেন। আমি যখন কাঁথি থেকে ঝাড়গ্রাম আসতাম, তখন অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে আমরা দু'জনে গল্প করতাম। তারপর সুবোধবাবু হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে, আমার কুঁড়েঘর পর্যন্ত আমায় পৌঁছে দিয়ে যেতেন। পেছনে পেছনে হাতে লণ্ঠন নিয়ে আমাদের অনুসরণ করত তাঁর এক বিশ্বস্ত সাঁওতাল ভৃত্য। আমিও অবশ্য জমির তদারকি ও চাষবাসের জন্য দু'জন সাঁওতাল রেখেছিলাম। তাদের একজনের নাম চাম্‌টা আর একজনের নাম চিনিবাস। তারা দিনে মাঠে কাজ করত আর রাত্রে আমার বাড়ীতে থাকত এইভাবে বেশ দিন কাটছিল।

কিছুদিন পর কাঁথি থেকে ঝাড়গ্রাম এসে সুবোধবাবুকে বেশ একটু শীর্ণ ও বিষণ্ণ দেখলাম, গলাটাও কেমন যেন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। আগের মত আর হৈচৈ, গল্পগুজব করার উৎসাহ নেই—বাড়ী থেকে পারতপক্ষে বেরোন না।

একদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর চাম্‌টাকে নিয়ে সুবোধবাবুর বাড়ী গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি বাইরের ঘরে একটা আরাম কেদারায় শুয়ে আছেন। আমাকে দেখে তাঁর মুখে কোন রকম ভাব প্রকাশ পেল না।

জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তাঁর শরীরটা কিছুদিন ধরে ভাল যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমি বিদায় নিলাম। পথে যেতে যেতে চাম্‌টাকে শুধালাম, সুবোধবাবুর কি হয়েছে? চাম্‌টা যা বল্লে তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সুবোধবাবুর নাকি যক্ষা হয়েছে। মনে পড়ল একদিন পরিহাস-ছলে সুবোধবাবু বলেছিলেন যে, সেই বিলেতী ফার্মে আর কিছুদিন কাজ করলে অন্য তিন বন্ধুর মত তিনিও এই রোগের কবলে পড়তেন। হায় বিধির কি লিখন! সুবোধবাবুও এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন শুনে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। বলতে গেলে আমার এখানকার জমি-জমা, বাড়ী সব কিছু তাঁরই কল্যাণে। এ ছাড়া আমার অনুপস্থিতিতে আমার ভূ-সম্পত্তির দেখাশোনা তিনিই করিতেন।

সেবার কাজের খাতিরে দিন দুয়েকের মধ্যেই আমাকে কাঁথি ফিরে যেতে হ'ল। প্রায় মাস ছয়েক পরে ঝাড়গ্রাম এসে শুনলাম সুবোধবাবু মারা গেছেন। আত্মীয়স্বজন সব চলে যাওয়ায় বাড়ীটা খালি পড়ে আছে। এই দুঃসংবাদ শোনার পর আমার মনের অবস্থা সহজেই বোঝা যায়। নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হ'ল। সারাদিন আর বাড়ী থেকে বেরুলাম না। তখন গরম কাল। রাত্রে উঠোনে একটা চারপাই পেতে শুয়ে পড়লাম। চামটা ও চিনিবাসও ব্যবস্থামত আমার বাড়ীতে রইল। শুক্লপক্ষ ছিল—চাঁদের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না। ঘুরে-ফিরে শুধু সুবোধবাবুর কথাই মনে পড়ছিল। হঠাৎ একটা আর্তনাদে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম! গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি তাকিয়ে দেখলাম চিনিবাস ও চাম্‌টা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ভাবলাম, হয়ত শেয়ালের ডাককে মানুষের চীৎকার বলে ভুল করেছি। কিন্তু হঠাৎ আবার সেই আর্তনাদ। আমি চমকে উঠলাম। এ যে সুবোধবাবুর গলা! অসুখ হবার পর থেকে সেই যে গলা ভেঙ্গে গিয়েছিল, ঠিক সেই ভাঙ্গা গলায় যেন তিনি অসহায়ের মত বিলাপ করছেন। চীৎকারটা আসছেও তাঁর বাড়ীর দিক্ থেকে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। চিনিবাস আর চাম্‌টাকে ডেকে তুললাম। ওরা সব শুনে বললে যে, সুবোধবাবু মারা যাবার পর থেকেই নাকি গভীর রাত্রে এমন করে কে যেন কেঁদে ওঠে। আমি চাম্‌টা আর

চিনিবাসকে বললাম যে চল সুবোধবাবুর বাড়ী গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখে আসি। ওর আমাকে নিরস্ত করবার চেষ্টাও খুব করল। কিন্তু আমার তখন জোয়ান বয়স, তা ছাড়া—আমা কেমন যেন জিদ চেপে গেল। তাদের বললাম, তোরা দুটো জোয়ান মরদ আমার সঙ্গে যেতে ভয় পাচ্ছিস! তোরা না গেলে আমি একাই যাব। তখন অগত্যা ওরা হাতে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে আমার অনুগামী হ'ল। সুবোধবাবুর বাড়ীর কাছাকাছি হতেই একটা শেয়াল তা বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। বাড়ীটার চারপাশ এই কয় মাসেই জঙ্গলে ভরে গেছে—বাড়ীটার ইট, দেওয়াল এদিক-ওদিক ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছে চাঁদের ফুটফুটে আলোয় বাড়ীটাকে ঠিক ভুতুড়ে বাড়ীর মতই দেখাচ্ছে। আমরা বাড়ীতে ঢুকে সব ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলাম—কেউ কোথাও নেই। যে ঘরে সুবোধবাবুর সঙ্গে রাতের পর রাত অন্তরঙ্গ ভাবে গল্প গুজব করেছি, সেই ঘরটার কাছে এসে দেখলাম, ঘরের দরজা ভেজানো রয়েছে আস্তে করে ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। আমরা ঘরে পা দিতেই মনে হ'ল দেওয়াল ঘেঁষে যে তক্তপোশটা রয়েছে সেটা যেন সামান্য নড়ে উঠল, আর কেউ যেন তক্তপোশের ওপরে আমাদের দিকে পাশ ফিরল। আমি বরাবরই একটু ডানপিঠে ছিলাম, কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতার প আমাদের মনে একটু সাহস এল।

চৌকাঠের ওপর তিনজনই বসে পড়লাম এবং তক্তপোশটার ওপর লক্ষ্য রাখতে লাগলাম কতক্ষণ এইভাবে বসেছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চিনিবাস বলে উঠল, "আহা বাবুটা বড় ভাল ছিল রে—কত কষ্ট পেয়ে শেষে মারা গেল!" আমার মুখ দিয়েও অজান্তে বেরিয়ে গেল, 'আহা!' আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর আমরা ফিরে যাবার জন্য উঠে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল কেউ যেন তক্তপোশ থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়াল। দরজার দিকে পা বাড়াতে আমি ঘাড়ের ওপর একটা তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করলাম। ভগবানের নাম জপ করতে করতে প্র একরকম ছুটেই আমরা ফিরে এলাম।

পরের দিন দিনের বেলা আবার চিনিবাস ও চামটাকে নিয়ে আমি সুবোধবাবুর বা গেলাম। কাল তাড়াতাড়িতে তাঁর ঘরের দরজাটা বন্ধ করা হয়নি, আজ দেখলাম দরজা ভেজানোই রয়েছে। মৃদু ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। এবারও মনে হ'ল তক্তপোশের ও অশরীরী কে যেন আমাদের দিকে পাশ ফিরে শুল। আমি সেই অদেহীকে লক্ষ্য করে বল্ল 'সুবোধবাবু, আমি আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম, তাই বন্ধুর কর্তব্য আমি যথাসাধ্য পালন কর এসেছি।'

শুনেছিলাম, গতবার আমি ঝাড়গ্রাম ছেড়ে যাবার পরই সুবোধবাবুর অবস্থা খারাপের দিকে যায়। তিনি তখন সু-চিকিৎসার আশায় কলকাতার কোন এক আত্মীয়ের বাড়ী রওনা হন। কিন্তু আত্মীয়ের বাড়ী আর পৌছতে পারেন নি, পথে ঘোড়ার গাড়ীর মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তক্তপোশের ওপর থেকেই স্পষ্ট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ভেসে এল। পরে আমি সুবোধবাবুর বাড়ীতে তাঁর শ্রাদ্ধকর্মাদি করালাম। এরপর আর কেউ কোনদিন রাত্রে সুবোধবাবুর বাড়ী থেকে সেই বুক-ফাটা আর্তনাদ শুনতে পায়নি।

মৌচাক

শ্রীসুকমল দাসগুপ্ত

চুলবুলে ওই মৌমাছিরা
গড়ছো মধুর চাকটি
হুল্ ফুটিয়ে ভুল করো না
ফুল-খাওয়া সে ঝাঁকটি।

আমের বনে মুকুল ঝরে
দু'কূল ভরা চিত্তে
জোছনা রাতে হাস্নাহানা
হাসছে কি গো মিথ্যে!

দিঘীর জলে পদ্ম ভাসে
স্বর্ণকমল নামটি
আম-কাঁঠালের গন্ধে ভরা
ছবির মতন গ্রামটি।

গোলাপ বনের নাম-না জানা
একটি রঙিন পুষ্প,
ফুটতে গিয়ে ফুরিয়ে গেল,
হায়—কা-কে বা দুষবো।

চাঁপার বুকে আঁকা যেন
হলুদ বরণ রংটি
রক্ত-রাঙা কৃষ্ণচূড়ার
চোখ বাঁকানো ঢংটি।

আগুন লাগে ওই সুদূরে
পলাশ গাছের শীর্ষে
রামধনু রং কলাবতীর
জাগিয়ে তোলে ঈর্ষে।

জগত-ভরা মৌ-বনেতে
মধুর খোঁজে ভোম্‌রা
দুষ্ট দামাল মিষ্টি পাগল
বিশ্ব-শিশু তোমরা।

টপ্ সিক্রেট

বিক্রমাদিত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আমার এই কাহিনীর প্রধান নায়ক হলো কণ্‌ণ মোলার্ড বা লনসডেল। কণ্‌ণ মোলার্ড লন্‌সডেলের নাম ভাঁড়িয়ে লণ্ডনে বসবাস করছিলেন।

আসল লন্‌সডেল থাকতেন ফিনল্যাণ্ডে। তার মা ছিলেন ফিনল্যাণ্ডের—বাবা কেনাডিয়ান। লড়াইয়ের আগে লন্‌সডেলকে নিয়ে মা চলে এলেন ফিনল্যাণ্ডে। লড়াই শুরু হলো। ফিনল্যাণ্ডের এক অংশ রুশ সরকার দখল করে নিলে। লন্‌সডেল এবং তার মা রুশ কর্তৃপক্ষের অংশে বসবাস করতেন।

এমনি সময় একদিন কণ্‌ণ মোলার্ড লন্‌সডেলের নাম ভাঁড়িয়ে কেনাডায় চলে এলেন। তাকে সন্দেহ করবার কেউ নেই। কারণ আসল লন্‌সডেলের খবর কারুর জানা নেই। আর লন্‌সডেল এবং কণ্‌ণ মোলার্ডের ভেতর চেহারার ভারী সাদৃশ্য ছিলো। অতএব বোঝবার কোন সম্ভাবনাই ছিলো না যে, জাল এবং আসল লন্‌সডেলের ভেতর কোন পার্থক্য আছে কিনা।

কেনাডার রাজধানী অটোয়ায় এসে লন্‌সডেল কেনেডিয়ান পাশপোর্ট সংগ্রহ করলে। তারপর একদিন কেনাডিয়ান পাশপোর্ট করে জাল লন্‌সডেল সোজা চলে এলো লণ্ডনে। এইখানে এসে নিজেকে ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিলে। শুধু পরিচয় নয়—বেশ পুরোদমে ব্যবসাও শুরু করলে। লন্‌সডেলকে সন্দেহ করার কোন অবকাশই হলো না। প্রথমতঃ লন্‌সডেল ছিলো বেশ ফুর্তিবাজ লোক। হৈ-হল্লা আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে থাকতে ভালোবাসতো। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসাতে তার ছিলো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। বেশ কিছুদিনের মধ্যে নিজের ব্যবসা গুছিয়ে নিলে। ব্যাঙ্কের কর্তারা তাকে ওভারড্রাফট্ দিতে সঙ্কোচ বোধ করতেন না।

লন্‌সডেলের সঙ্গে মস্কোর যোগাযোগ ছিলো। অটোয়া যাবার নাম করে দু-একবার লন্‌সডেল মস্কো ঘুরে এলেন। শেষের যাত্রায় তাকে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হলো যে, পোর্টল্যাণ্ডে যে-সব এ্যাটমিক সাবমেরিণ তৈরী হচ্ছে, তার হদিশ অবিলম্বে চাই। আর দেরি নয়।

এবার লণ্ডনে ফিরে লন্‌সডেল নিকির হাত থেকে এই কাজের দায়িত্ব নিলেন। লন্‌সডেলের প্রথম কাজ হলো হাউটনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। এ কাজ করতে তার বেশী বেগ পেতে হলো না।

একদিন রোববার প্রভাতে লন্‌সডেল হাউটনের বাড়িতে গেলেন। নিজেকে আমেরিকান

এম্ব্যাসীর নেভাল এটাচী বলে পরিচয় দিলেন। বললেন, পোর্টল্যাণ্ড বন্দরে গিয়েছিলুম। সবাই তোমার সুখ্যাতি করলে। তাই তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে এলুম।

এ কথা শুনে হাউটন বেজায় খুসী। একবারও মনে সন্দেহ জাগেনি যে লন্‌সডেল আমেরিকান এম্ব্যাসীর কেউ নন—মস্কোর এক ধুরন্ধর গুপ্তচর।

তারপর দু'জনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা সুরু করলে। লন্‌সডেল গল্প করতে ভালোবাসে। বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তার অগাধ জ্ঞান। কথায় কথায় হাউটন বললে, যে তার বান্ধবী এলিজাবেথ সংগীত ভালোবাসে। তখন লণ্ডনে 'বলশয়' থিয়েটার হচ্ছে। বলশয় থিয়েটারের টিকিট পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। হাউটন তার বান্ধবীকে নিয়ে বলশয় থিয়েটারে যেতে চায়। লন্‌সডেল প্রতিশ্রুতি দিলে, যে বলশয় থিয়েটারের দু'খানা টিকিট সে যোগাড় করে দেবে। লন্‌সডেলের পক্ষে টিকিট সংগ্রহ তো অসম্ভব নয়। রাশিয়ান এম্ব্যাসীর কাউকে বললেই হলো।

এই টিকিট পাবার পর হাউটনের মনে সন্দেহ জাগলো। লন্‌সডেল কে? কী করে এই টিকিট যোগাড় করলে। এবার তার মনে কোন সংশয় রইলো না যে লন্‌সডেল রাশিয়ান স্পাই এবং নিকির কর্তা।

হাউটনেরও কপাল ছিলো খারাপ। এতোদিন ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ তার কাজকর্মের বিন্দুবিসর্গও জানতো না। একবারও সন্দেহ জাগেনি যে হাউটন দেশদ্রোহিতা করছে। পোর্টল্যাণ্ড নৌবন্দরের গুপ্ত খবর মস্কোর গুপ্তচরকে দিচ্ছে।

হাউটনের এক সহকর্মী একদিন এক বেনামা চিঠি পেলো। চিঠিখানা তাকে শাসিয়ে লেখা হয়েছিলো। সহকর্মীর সঙ্গে হাউটনের ঝগড়া। তাই বেনামী চিঠি নিয়ে সহকর্মী গেলো পুলিশের দপ্তরে। হাউটনের নামে নালিশ করলে।

পুলিশ তদন্ত সুরু করলে। অবশ্যি তদন্তে প্রকাশ পেলো যে হাউটন এ ব্যাপারে নির্দোষী। কিন্তু তদন্তে অন্য একটি খবর প্রকাশিত হলো যা পুলিশকে বিচলিত করে তুললে। হাউটন বিস্তর টাকা দিয়ে বাড়ি করেছে। বেশ খরচপত্র করে বান্ধবীকে নিয়ে সিনেমা ও ক্লাবে যায়। এতো পয়সা আসে কোত্থেকে? মাইনে তো পায় মাত্র আটশো টাকা।

এবার পুলিশ গোপনে গোপনে হাউটনের সম্বন্ধে তদন্ত সুরু করলে। তার কীর্তিকলাপের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হলো। হাউটন এবং লন্‌সডেলের সঙ্গে যে প্রায়ই দেখা হতো একথাও পুলিশ জানতে পারলে। একদিন এক 'পাবে' তাদের দু'জনের ভেতর যে কথাবার্তা হচ্ছিলো তার সারাংশও পুলিশ শুনতে পেলো।

'পাবে' বসে লন্সডেল এবং হাউটন কথাবার্তা বলছিলো। হাউটনের হাতে ছিলো একটা এটাচী কেস। এই এটাচী কেস ভর্তি ছিলো পোর্টল্যাণ্ড বন্দরের গোপন নকশা। লন্সডেল বললে : তোমার এটাচী কেস্ দেখে মনে হচ্ছে এর ভেতর বিস্তর মাল আছে?

: হ্যাঁ, মৃদুকণ্ঠে হাউটন জবাব দেয়।

: এর পর আবার কবে দেখা করছো? লন্সডেল প্রশ্ন করে।

: শীগিগর। হাউটন জবাব দেয়। একটু বাদে তু'জনে এক টেলিফোন বুথে গেলো। সেইখানে হাউটন লন্সডেলের হাতে, এটাচী কেসটা দিলে। লন্সডেল এর পরিবর্তে দিলে তাকে টাকা। এই যে গোপনীয় কাগজপত্রের আদান-প্রদান, টাকা-পয়সার লেন-দেন, সবই কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের চোখের সামনে হচ্ছিলো। কিন্তু তবু সেদিন তারা হাউটন লন্সডেলকে গ্রেপ্তার করেনি। তার প্রধান কারণ ব্যাপারটা আরো গভীরভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন। সেদিন যাবার আগে লন্সডেল বললে, হাউটন জিব্রাল্টার বন্দরে সাবমেরিণ নিরীক্ষণ করার জন্যে এক নতুন যন্ত্র বসানো হয়েছে। এই যন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের কিছু বিস্তৃত খবর চাই। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে তুমি জিব্রাল্টারে যাও। যাতায়াতের খরচপত্র আমরাই দেবো। শুধু তোমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করো এই নতুন যন্ত্রটা কী?

এবার হাউটনের ইতস্ততঃ করার পালা। সে স্পষ্টই জবাব দিলে : জিব্রাল্টারের বন্ধুরা আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ নয়। ওদের কাছে কোন প্রশ্ন করা সমীচীন হবে না। সন্দেহ জাগতে পারে।

কিন্তু লন্সডেল ধমক দিয়ে বললে, হাউটন, বহুদিন ধরে তুমি আমাদের ফাঁকি দিচ্ছো। টাকা নিচ্ছো বটে কিন্তু তার পরিবর্তে কোন কাজ করছো না। এই ভাবে আর বেশীদিন চলবে না। যদি শীগ্গিরই কোন ভালো খবর না দিতে পারো তাহ'লে তোমার বান্ধবী এলিজাবেথের একটা সুরাহা করতে হবে…

এলিজাবেথের নাম শুনে হাউটন বেশ একটু সমস্যায় পড়ল। বুঝতে পারল, বেশ কঠিন খপ্পরে পড়েছে। কিন্তু এর হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি নেই। একবার ভাবলে সে এলিজাবেথের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দেবে। কিন্তু তার মনের ইচ্ছে পূরণ হলো না। কারণ তার আগেই একদিন লন্সডেল হাউটন এবং এলিজাবেথকে ডেকে পাঠালে। বললে : তোমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিচ্ছি। পোর্টল্যাণ্ড নৌবহরের জাহাজে একটা সিক্রেট বই যাচ্ছে। তার নাম হলো 'পার্টিকুলার্স অব ওয়ার ভেসেলস্।' এই বইয়ের প্রতিটি পাতা আমাদের দরকার। চারশো পাতার বই। এই ক্যামেরার সাহায্যে তার প্রতিটি পাতা 'ফটো কপি' করতে হবে।

কাজটা সহজ নয়। এর উপর এলিজাবেথকে কয়েকটা প্রশ্ন দেয়া হলো। লন্সডেল বললে :

এলিজাবেথ তোমার দপ্তরে এই সব প্রশ্নের জবাব পাবে। এই সব প্রশ্নের উত্তর আমার চাই-ই চাই।

হাউটন এবং এলিজাবেথ এবার উঠে পড়ে লাগলো খবর সংগ্রহ করতে। চারশো পাতার বই ফটো কপি করা হলো। এলিজাবেথ গোপনীয় দলিলপত্র পড়াতে লাগলো। সব প্রশ্নেরই জবাব চাই। কিন্তু ব্যাপারটা অত্যধিক টেক্‌নিক্যাল। তাই তার ভ্যানিটি ব্যাগে করে কাগজপত্র-গুলো বাড়ীতে নিয়ে এলেন। ঠিক হলো এই সব কাগজপত্র লন্‌সডেলের হাতে তুলে দেয়া হবে।

এলিজাবেথ সুটকেসটা লন্‌সডেলের হাতে দিতে যাচ্ছে—পিছনে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্‌সপেক্টার।

একদিন শনিবার প্রভাতে হাউটন ও এলিজাবেথ গেলেন লণ্ডনে লন্‌সডেলের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে। বাদলার দিন, বরফ ঝরছে। তাই মোটরে না গিয়ে দু'জনে ট্রেনে গেলেন লণ্ডনে। প্রথমে খানিকটা সময় কাটলো বাজারে কেনাকাটা করতে। তারপর সেখান থেকে ওরা দু'জনে

গেলেন ওয়াটারলু ষ্টেশনে। সেইখানে লন্‌সডেল তাদের জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো। যাবার সঙ্গে সঙ্গে এলিজাবেথ তার গোপনীয় কাগজ-ভর্তি সুটকেস লন্‌সডেলের হাতে তুলে দিলে।

ব্যাস আর যায় কোথায়? হাউটন এলিজাবেথের পেছনে ছিলো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্‌সপেক্টর। তিনি এসে লন্‌সডেলের হাত থেকে সুটকেস ছিনিয়ে নিলেন।

এবার তিনজনকেই গ্রেপ্তার করা হলো। তারপর সুরু হলো জেরা। সবাই নিজেকে নির্দোষ বলে স্বীকার করলে। লন্‌সডেল পুলিশের জবাবের উত্তর দিতে অস্বীকার করলে।

* * * *

এই কাহিনীর এখনও সমাপ্তি হয়নি। কারণ এই নাটকের শেষ অংকের অভিনেতা হলো পিটার জন ক্রয়গার এবং তার স্ত্রী হেলেন ক্রয়গার। এই গল্পের জের টানবার আগে ক্রয়গার দম্পতির গৌরচন্দ্রিকা দেবার প্রয়োজন আছে।

পিটার জন ক্রয়গার ছিলেন আমেরিকান কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন নেতা। তার স্ত্রী ছিলেন পোলিশ। এরা দু'জনেই ছিলেন বিখ্যাত এ্যাটম স্পাই রসেনবার্গের সহকর্মী।

রসেনবার্গ ধরা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমেরিকার কম্যুনিষ্ট পার্টির ভেতর আলোড়ন সুরু হলো।

রসেনবার্গের সহকর্মীরা চিন্তিত হলেন। ক্রয়গারের আসল নাম ছিলো কোহেন। কোহেন সোভিয়েত ট্রেড সেণ্টারে সোভিয়েত স্পাই সবোলের সহকর্মী হিসেবে কাজ করতো। কিছুদিন বাদে সবোলের জায়গায় কাজ করতে এলেন বিখ্যাত রাশিয়ান স্পাই এবেল। এবেলের সঙ্গে কোহেনের ছিলো ঘনিষ্টতা।

রসেনবার্গের কীর্তিকলাপ প্রকাশ হবার সঙ্গে-সঙ্গে কোহেন সতর্ক হলো। আর দেরি নয়। আমেরিকা থেকে পালানো চাই। কোহেন দম্পতি বাক্স-প্যাটরা নিয়ে অষ্ট্রীয়ায় চলে এলো। সেখানে এসে নিজেদের নিউজিল্যাণ্ডের বাসিন্দা বলে পরিচয় দিলে। তারপর নিউজিল্যাণ্ডের পাশপোর্ট সংগ্রহ করে সোজা চললেন লণ্ডনে।

লণ্ডনে এক শহরতলী রুইস্লিপ গ্রামে এসে কোহেন দম্পতি আস্তানা গাড়লেন। নাম ভাড়ালেন। নাম হলো ক্রয়গার। পিটার ক্রয়গার স্কুলের কাজ করেন। সেই সঙ্গে-সঙ্গে পুরানো বইয়ের ব্যবসা করেন। অধিকাংশ পুরানো বই সুইজারল্যাণ্ড রপ্তানী করতেন। আসলে এই পুরানো বইয়ের ভেতর গুপ্ত-সংবাদ লুকানো থাকতো। মাইক্রোডটের নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ; মাইক্রোডট হলো ফুলষ্টপের সমান আকৃতির বিন্দু। বইয়ের ভেতর ফুলষ্টপের পরিবর্তে মাইক্রোডট ব্যবহার করা হতো। আর এই সব মাইক্রোডটের ভেতর থাকতো গুপ্ত-সংবাদ। এক-একটি মাইক্রোডটের ভেতর হাজার লাইনের সংবাদ লুকানো থাকতে পারে।

ক্রুয়গার পুরানো বইয়ের মাইক্রোডট ব্যবহার করতো। সুইজারল্যাণ্ডে তার এক সহকর্মী ছিলো। তিনি এই বই থেকে মাইক্রোডট উদ্ধার করে সেগুলোক মস্কোতে পাঠাতেন।

শুধু তাই নয়, ক্রুয়গার তার বাড়ী স্পাই সেণ্টার করেছিলেন। প্রায়ই লন্সডেল তার বাড়ীতে আসতো। যেদিন থেকে লন্সডেলের উপর পুলিশের নজর পড়লো সেদিন থেকেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ক্রুয়গারের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগলো।

হাউটন লন্সডেল গ্রেপ্তার হয়েছে এ খবর কিন্তু ক্রুয়গারের জানা ছিলো না। তাই হঠাৎ একদিন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ ইন্সপেক্টর স্মিথকে দেখে ক্রুয়গার দম্পতি বেশ বিস্মিত হলো।

পুলিশকে দেখে মিসেস ক্রুয়গার একটু বিচলিত হয়ে রান্নাঘরে যাবার চেষ্টা করলেন। তার হাতে ছিলো ভ্যানিটি ব্যাগ। কিন্তু ইন্সপেক্টর স্মিথ যেতে বাধা দিলেন। ভ্যানিটি ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়া হলো। সেই ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর ছিলো এক টুকরো কাগজ। সেই কাগজে লেখা ছিলো গুপ্ত-সংবাদ। ইন্সপেক্টর স্মিথ এই গুপ্ত-সংবাদটি ছিনিয়ে নিলেন।

তারপর সমস্ত বাড়ীখানা তল্লাসী সুরু হলো। বাড়ীতে ছিলো একটি সর্টওয়েভ ওয়ারলেশ ট্রানশমিটর। মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার যন্ত্র। সাইফার প্যাড। কোড এই প্যাডে লেখা ছিলো। আর লেখা ছিলো রেডিও ট্রানসমিটরের ওয়েভ লেংথ। প্রচুর অর্থ।

মস্কো তখনও জানতো না যে হাউটন লন্সডেল ক্রুয়গার ধরা পড়েছে। অতএব নির্দিষ্ট সময়ে রেডিও মারফৎ খবর পাঠাতে লাগলো। আর সেই খবর গিয়ে পড়লো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ ইন্সপেক্টর স্মিথের হাতে।

* * *

এর পরবর্তী দৃশ্য লণ্ডনের ওল্ড বেইলী কোর্ট। হাউটন এলিজাবেথ, লন্সডেল, ক্রুয়গার দম্পতির বিচার সুরু হলো। হাউটন এলিজাবেথ বললে, তারা নির্দোষ। লন্সডেল নিজের ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব নিলে। স্বীকার করলে সে হলো রুশ স্পাই।

বিচারে লন্সডেলের সাজা হলো পঁচিশ বছর। ক্রুয়গার দম্পতির কুড়ি বছর এবং হাউটন এলিজাবেথের পনের বছর। হাউটন ও এলিজাবেথ হোম সেক্রেটারীর কাছে দণ্ড মকুব করার জন্যে আবেদন করলে। কিন্তু তাদের সেই আপীল অগ্রাহ্য করা হলো।

* * *

এম. আই. ফাইভের কাহিনী আজ তোমাদের বললাম। এর পরে বিখ্যাত মেয়ে স্পাই জুডি কোপল্যাণ্ডের কাহিনী তোমাদের শোনাব।

এমনও হয়

শ্রীমতী পুষ্প বসু

(সত্যঘটনা)

বয়স্করা এবং ছোটরা সবাই ভূতের গল্প শুনতে ভালবাসে। আমি ত' এমন মানুষ দেখিনি, যে ভূতের গল্প শুনতে চায় না! প্রশ্ন হচ্ছে,—কেন, ভূতের গল্পই বা এত ভাল লাগে কেন? এর উত্তর বা একমাত্র কারণ হচ্ছে: অজানা যা কিছু তার উপরই আমাদের কৌতূহল অদম্য। তার উপর যদি অলৌকিক এবং আতঙ্ক-জড়িত বিস্ময়কর ঘটনার সমাবেশ হয়, তাহলে ত' আর কথাই নেই! ভূতের গল্প ঠিক এই পর্যায়ে পড়ে।

এইরকম পরলোক সম্বন্ধেও আমাদের আবছা কতকগুলি ধারণা আছে। যেমন মৃত্যুকালে যমদূত বা বিষ্ণুদূত মানুষের আত্মাকে নিয়ে যেতে আসে এবং যে ভাল লোক তাকে বিষ্ণুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়, আর মন্দ লোককে নরকে। মনীষীরা বলেন, স্বর্গ বা নরক সব কিছু পৃথিবীতেই দৃষ্ট হয়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—তবে ভাল লোক কষ্ট পায় কেন, আর দুষ্টুলোকেরা সুখে আনন্দে থাকে কেন?

আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, ভাললোকরা ইহজন্মে কষ্ট পায় গতজন্মের দুষ্কৃতি বা কর্মফলে, ঠিক মন্দ লোক যা কিছু সুখ-ঐশ্বর্য ভোগ করে তা গতজন্মের সুকৃতির ফলে।

যাই হোক, আমি তোমাদের এই ধরণের একটি গল্প বলব। এ ঘটনাটি কিন্তু কাল্পনিক নয়, সত্যই এটি ঘটেছিল আমাদেরই পরিবারের মধ্যে। এখন শোন গল্পটি।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তিনটি ভাই বোনের সংসার। বড়বোন বিন্দুবাসিনী ও ছোট দুই ভাই কেদার ও নগেন। বিন্দুবাসিনীর সাত বছর বয়েসে বিয়ে হয় এবং মাত্র তের বছর বয়েসে তিনি বিধবা হন। তারপর থেকে বিন্দুবাসিনী বাপের বাড়ী চলে আসেন। আজীবন দুটি ভাই ও তাদের ছেলেপুলে সংসার নিয়েই থাকেন। ভাইদের দিদি-অন্ত প্রাণ। এমন কি পাড়া-প্রতিবাসীরাও বিন্দুবাসিনীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। বিন্দুবাসিনীর মধুর স্বভাবের জন্য ছেলেবুড়ো সবাই তাঁকে ভালবাসত।

কেদার ও নগেনবাবুদের সামনের বাড়ীতেই থাকত এক ব্রাহ্মণ পরিবার। বাড়ীর কর্তার নাম মহেশ চক্রবর্তী। ইনি বিন্দুবাসিনীকে মাসীমা বলে ডাকতেন। মহেশবাবুদের বাড়ীর সঙ্গে বিন্দুবাসিনীর খুবই আত্মীয়তা ছিল।

বেশ দিন কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন ভীষণ পেটের পীড়ায় বিন্দুবাসিনী বিছানা নিলেন। চিকিৎসা ও সেবার কোন ত্রুটি হ'ল না, কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বেড়েই যেতে লাগল। উপশমের কোন আশাই রইল না। শেষ পর্যন্ত একজন তান্ত্রিক চিকিৎসকের নির্দেশে বাঘের জিবের কিছুটা অংশ পর্যন্ত বিন্দুবাসিনীর অজ্ঞাতে কলার ভেতর দিয়ে কৌশলে তাঁকে খাওয়ান হ'ল। কিন্তু দুই ভাই-এর অক্লান্ত সেবা এবং অর্থ ব্যয় সবই হ'ল বৃথা। একদিন শেষরাত্রে সকলকে অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে বিন্দুবাসিনী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তুমুল বিলাপ-ধ্বনির মধ্যে হরিনাম কীর্তনসহ বিন্দুবাসিনীকে নিমতলা শ্মশানে আনা হ'ল। মুখাগ্নির আগেই ঘটল এক অঘটন! দেখা গেল—বিন্দুবাসিনীর দেহে জীবনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
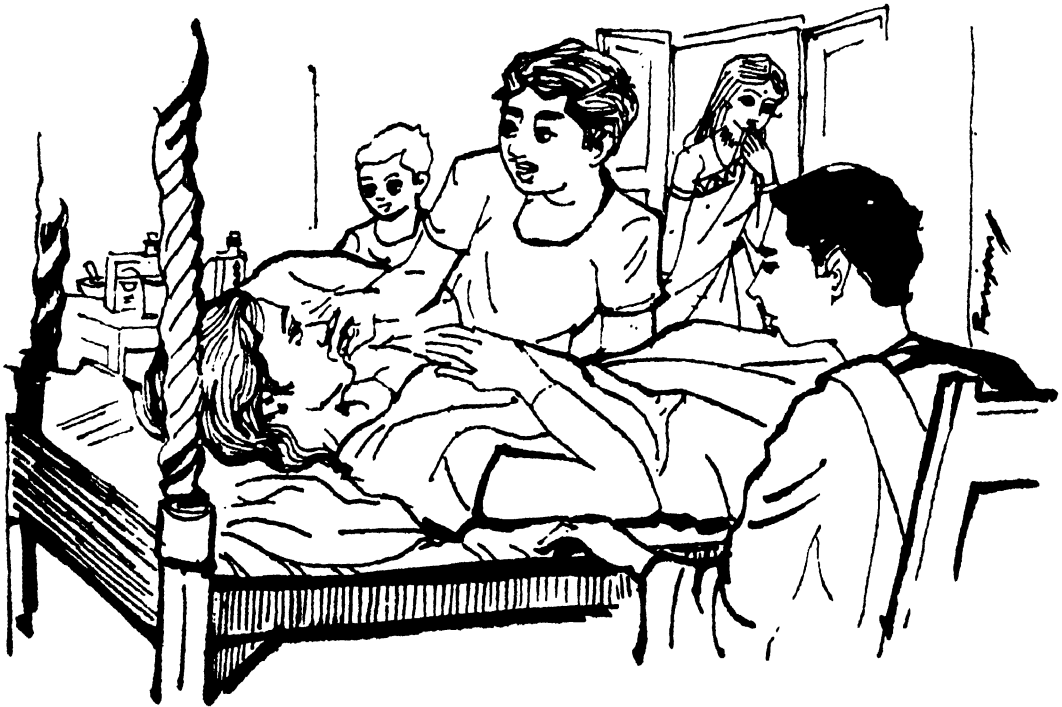
একজন তান্ত্রিক চিকিৎসকের নির্দেশে বাঘের জিবের কিছুটা অংশ কলার ভিতরে করে তাঁকে খাওয়ান হ'ল।

ক্রমে প্রাণের সমস্ত লক্ষণ দেহে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠল, অল্পক্ষণের মধ্যে সবাই নিশ্চিত জানতে পারল বিন্দুবাসিনী মৃত নয়, জীবিত।

ভাইদের শোকাবহ বিষাদক্লিষ্ট মুখ আনন্দে-হর্ষে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, কিন্তু এ আনন্দ হ'ল ক্ষণস্থায়ী। পরক্ষণেই তাঁরা বুঝলেন—দিদিকে তো এখন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল, কেউ শ্মশান থেকে ফিরে এলে তাকে গৃহে স্থান দেওয়া মহা অলক্ষণ! অতএব তাকে থাকতে হ'ত সমাজ-সংসার আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্ত হয়ে। এক কথায়, তাঁকে নির্বাসিত হয়ে বাকী জীবন কাটাতে হ'ত।

ভাইরা তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। অবশেষে সকলের পরামর্শে সাব্যস্ত হ'ল, উপস্থিত ছোট ভাই নগেন যেখানে থাকেন বিন্দুবাসিনীকে সোজা সেই গাজিয়াবাদে নিয়ে যাবেন। বিদেশ-বিভুঁই, সেখানে এসব ব্যাপার নিয়ে কোন হাঙ্গামাই হবে না।

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থামত বিন্দুবাসিনী ছোট ভাই নগেনের সঙ্গে গাজিয়াবাদ চলে গেলেন।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। বিন্দুবাসিনীকে শ্মশানে নিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে বিন্দুবাসিনীদের প্রতিবেশী মহেশ চক্রবর্তী অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রীয়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেন। সকলে বলাবলি করতে লাগল—আসলে যম মহেশবাবুকেই নিতে এসেছিল, ভুলে বিন্দুবাসিনীকে নিয়ে গিয়ে আবার তখনি ফেরত দিয়ে যায়।

এই ঘটনার এক বছর পরে বিন্দুবাসিনী গাজিয়াবাদ থেকে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন।

ইতিপূর্বে গাজিয়াবাদে থাকতে নিশ্চয়ই মহেশ চক্রবর্তীর মৃত্যু-সংবাদ বিন্দুবাসিনীর কাছে পৌচেছিল! যাই হোক বাড়ীতে এসে পাঁচটি কথার মাঝে চক্রবর্তী পরিবারদের একটি বিপর্যয়ের কথাও শুনলেন যে—মহেশবাবু হঠাৎ মারা যাওয়ায় দরকারী কাগজপত্তর ও বাড়ীর দলিল ইত্যাদি যে কোথায় রেখে গেছেন তার কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। এই এক বছর ধরে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে স্ত্রী ও ছেলেরা, কিন্তু এ পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পায়নি।

কেদারবাবু বিন্দুবাসিনীকে বললেন, "সত্যি দিদি, ছেলেগুলোকে দেখলে কষ্ট হয়—বেচারীরা মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

এই সব শুনতে শুনতে বিন্দুবাসিনী কিছুক্ষণ আবিষ্টের মত কি যেন ভাবতে লাগলেন, তারপর ভাইকে বলতে লাগলেন, "দেখ ভাই, আমি রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ি…"

বাধা দিয়ে কেদার বলে উঠলেন, "বাবা, সে যে সাংঘাতিক ঘুম দিদি, তুমি ত' মরেই গিয়েছিলে। আমাদের ভাগ্য যে আমরা আবার তোমায় ফিরে পেলুম—তা ঘুমিয়ে পড়ে কি হ'ল—কিছু বুঝতে পেরেছিলে নাকি?"

"মা রে, শোন না,—অগাধে ঘুমুচ্ছিলুম, শরীরে রোগ-টোগ বলে কিছুই বোধ ছিল না ; তারপর স্বপ্নে দেখছি কি, কারা যেন আমায় নিয়ে শূন্যে উঠছে। যাচ্ছি তো যাচ্ছি—শরীরটা খুব হাল্‌কা বোধ হচ্ছিল, যারা নিয়ে যাচ্ছে তারাও যেন ছায়ার মত হাওয়ায় ভেসে চলেছিল···

"অনেকক্ষণ পরে তারা এক জায়গায় এসে থামল। সে এক নূতন দেশ, কেউ কোথাও নেই, জনমানবশূন্য স্থান, ঘর-বাড়ীও কিছু নেই, শুধু চারিদিকে আবছা চাঁদের আলো! ভাবছি এ আবার কোথায়? কারাই বা নিয়ে এল!···

"তারপর একসময় দেখি কি আমি একটা অজানা পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি। আনমনে কত পথ যে চলেছি তার ঠিক নেই! হঠাৎ চোখ পড়ল নীচের দিকে একটা অন্ধকার পথ বেয়ে কে চলেছে, তার মাথায় একটা বালতি। ক্রমে লোকটি আরও কাছে আসতে দেখি, ও মা এ যে আমাদের মহেশ গো!

"আমাকে দেখে মহেশ থমকে দাঁড়াল ; তারপরে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, "আর মাসী বল কেন, হঠাৎ আমায় সব ছেড়ে চলে আসতে হ'ল, কিন্তু ভারী ভাবনায় পড়ে গেছি, তাড়াতাড়িতে ব'লে ক'য়ে আসতে পারলুম না ; ছেলেরা আথান্তরে পড়বে'খন—দলিলগুলো এমন জায়গায় রেখেছি, ওরা খুঁজে পেলে হয়! সেই তেতলার কোণের ছোট ঘরটায় একটা ঘুলঘুলিতে কাঠের বাক্সর মধ্যে আছে দলিলগুলো। এ এক যন্ত্রণা আমার—বলতে বলতে আবার সেই অন্ধকার পথে পা বাড়াল মহেশ।

"আমি একটু চেচিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলুম—তা তোমার মাথায় একটা বালতি কিসের?

"মহেশ একটু থমকে দাঁড়াল। দু'হাতে বালতিটা চেপে বললে, মাসী, তুমি তো জান না, আমি মহাপাপী, নরকভোগ হচ্ছে আমার, এই বালতি নিয়েই ঘুরতে হবে!

"আমি বললুম তা বালতিতে আছে কি?

"মহেশ বললে, বালতিটা বিষ্ঠার!

"তারপরই আমার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর দেখি শ্মশানের খাটে শুয়ে!—তা হ্যাঁ রে, ওদের ঐ তেতলার ঘরে ঘুলঘুলিটা দেখতে বললে হয় না—স্বপ্নর আবার সত্যি-মিথ্যে!—তবু একবার যদি লেগে যায়।"

কেদার বললে, "নিশ্চয়, স্বপ্ন হোক যাই হোক দেখতে দোষ কি, আমি এখনি গিয়ে বলছি।"

আশ্চর্য ব্যাপার! ঘুলঘুলির মধ্যেই দলিল পাওয়া গেল। এরপর আর কি বলবার আছে! এখানেই এই ঘটনার পরিসমাপ্তি।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এমনি একটা টেবিলের সামনে এসে বাবা দাঁড়ালেন। দুই হাত জোড় ক'রে বললেন,—নমস্কার, সুরঞ্জনবাবু।

মানুষটি মুখ তুললেন। বাবারই বয়সী। তবে, চেহারাটা ঝক্‌ঝকে। পুরু কাঁচের চশমা রয়েছে চোখে। পরনে সাদা প্যাণ্ট, সাদা সার্ট, সার্টের ওপরে একটা লাল রঙের টাই।

মানুষটি একটু হাসলেন। বাবাকে বসতে বলে আমার দিকে তাকালেন, বললেন,—ছেলে বুঝি ?

বাবা বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ, এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম। তারপরে, নানান্ কথা হতে লাগলো। কী-কী সব কাগজপত্র এলো, এখানেও ফর্মের ব্যাপার। বাবাকে সই করতে হলো, আমাকেও সই করতে হলো।

সই-টই হবার পর সুরঞ্জনবাবু আমাকে এক সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। সাহেব আমার নাম-টাম ছাড়া আর কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না, সুরঞ্জনবাবুর সঙ্গেই নীচু গলায় আলাপ-সালাপ করতে লাগলেন।

মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরেই আমরা সাহেবের ঘর থেকে বাইরে এলাম। বাবা বললেন,—কী হলো ?

সুরঞ্জনবাবু হাসিমুখে বললেন,—হয়ে গেল। হাসিমুখে বাড়ী চলে যান। সোমবার থেকেই ওর চাকরী আরম্ভ।

বাবা আমাকে নিয়ে বাইরে এলেন, কিন্তু ভেঙে কিছু বললেন না। শুধু বললেন,—আমার বন্ধু এই সুরঞ্জনবাবু, কলেজে একসঙ্গে পড়েছিলেন। আমি জানতাম না, ও এখানকার একটা ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু। হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা। কিন্তু যাক সে-সব কথা ! এখানে তোমার চাকরী হয়ে গেল, দেড়শো টাকা মাইনে।

আমি বললাম,—তাহলে আমার বিদেশে যাবার কী হবে ?

বাবা একটু হাসলেন, বললেন,—এখনো সে-সখটা আছে? অভিমানে আমার চোখে জল এসে গেল। তাহলে এতদিন ধ'রে এই অমানুষিক খাটুনি আমি খাটলাম কেন? বাবা বোধহয় আমার মনোভাব বুঝলেন। আমার পিঠে হাত রাখলেন, বললেন,—অফিসে কাজ কর। ওটা জাহাজী অফিস। ছ'সাত মাস, কি, বড়ো জোর—বছরখানেক। কাজকর্ম না শিখলে জাহাজে যাবি কী করে? সুরঞ্জনবাবুকে বলে রেখেছি, উনি তোর একটা ব্যবস্থা করে দেবেনই। কিন্তু একটা কথা, জাহাজের কথা তোর মাকে বলিস নি।

মাকে আমি বলিনি। দেড়শো টাকা মাইনে শুনেই মা খুসী। কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে এলেন।

দাদা শুধু সব শুনে মুখ ভার করলো। বললো,—দেড়শো টাকায় আরম্ভ, বড়োজোর আড়াই-শোয় শেষ হবে। অথচ কারখানায় কাজ শিখছিল, আমি ওকে দু'দিন পরে ঠিক আমার কারখানায় ঢুকিয়ে দিতাম। আড়াইশো'র ঢের বেশী রোজগার হতো।

মা ধমকে বললেন,—তুই থাম। তোর নিজের মাইনে আড়াইশোয় তোল দেখি, ওর কথা ভাবতে হবে না।

যাই হোক, ভাগ্যটা বোধহয় আমার খুব খারাপ নয়। বছর খানেক সময়ও লাগলো না। ততদিনে আমি কাজকর্ম কিছু কিছু শিখে নিয়েছি, আমার অফিসের কর্তারাও খুসী আমার ওপর। সুরঞ্জনবাবু বললেন, একটা জাহাজে কাজ খালি হয়েছে। রাইটারের কাজ। যাবে? মাইনেও কিছু বেশী।

—রাইটার কী?

সুরঞ্জনবাবু বললেন,—অফিসে যা করছো, ওখানেও তাই করবে। কালই কিন্তু রওনা হতে হবে।

— কাথায়?

—বম্বে। বম্বেতে জাহাজটা আছে।

বললাম,—আমি যাবো। জাহাজটা কোথায় যাবে? লণ্ডন?

উনি বললেন,—তা বলতে পারি না। তবে জাহাজ যখন, সমুদ্রে সমুদ্রে ত' ঘুরবেই।

ডাক্তারী পরীক্ষা-টরিক্ষা সব হয়ে গেল সেই দিন। কাগজ পত্রে সই ক'রে সোজা বেরিয়ে পড়লাম বাবার স্কুলের দিকে। বাবা একটা ক্লাস শেষ করে সবে ওঁদের ঘরে এসে বসেছেন, আমি গিয়ে প্রণাম করলাম।

—কী রে?

বললাম সব।

বাবা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন, তারপরে বললেন,—সত্যিই জাহাজে যাবি?

বললাম—হ্যাঁ বাবা, এইজন্যই ত' আমি সব—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—জানি।

উনি উঠলেন। হেডমাষ্টার মশাইয়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আমাকে সঙ্গে করে বেরুলেন। আমরা গেলাম কালীঘাট। বাবা পুজো দিলেন। কিছু ফুল দিলেন আমার হাতে। বললেন,—এটা কাছে রাখবি সবসময়। আর শোন্?

—কী?

উনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কথা বললেল, গলাটা একটু কেঁপে গেল। বললেন,—মাকে কিছু বলিসনি। কেঁদে ভাসাবে। শুধু বলবি, অফিসের কাজে বম্বে যেতে হচ্ছে।

মাকে বললাম না, কিন্তু বিকাশকে বললাম। ও আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপরে বললে,—সত্যি?

—সত্যি। কিন্তু দয়া করে বাড়ীতে যেন কাউকে কিছু ব'লো না।

ও বললে,—শ্বশুরমশাই যেতে দিলেন তোমাকে?

বললাম,—কিন্তু এর জন্যে অবাক হবার কী আছে? আজকে চাকরীর ব্যাপারে বাঙালীকে কোথায় না যেতে হচ্ছে! জাহাজের চাকরীর মধ্যে এমন নতুনত্ব কী আছে? বরং টাকা বেশী পাবো, সংসারের একটু সুরাহা হবে।

বিকাশ চুপ করে রইলো। এবং এবার সত্যিই বাড়ীতে গিয়ে মাকে কিছু বললো না।

পরদিনই রওনা হলাম বম্বের দিকে। হাওড়া ষ্টেশনে বাবা আসবেন বলেছিলেন, কিন্তু এলেন না। বাড়ীতে ওঁকে প্রণাম করবো বলে খুঁজলাম, পেলাম না। বিকাশ আমার সঙ্গে ষ্টেশনে এসেছিল। বললো,—উনি কোথাও লুকিয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই। হয়ত লুকিয়ে লুকিয়ে কোথাও চোখের জল মুচছেন। রওনা হবার সময় মা বললেন,—গিয়েই চিঠি দিবি। কী যে পোড়া অফিস বম্বে-টম্বে পাঠানো কেন বাপু? কবে আসবি? কোনক্রমে বললাম,—কতবার বলবো? ধরো দিন পনেরো।

—এই দিন পনেরো যে কেমন করে কাটবে আমার!—বলতে বলতে চোখে আঁচল দিলো মা। বোনেরাও কাঁদ্‌ছিল। দাদা ছিল কারখানায়।

আমি তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলাম। বিকাশকে নিয়ে একেবারে হাওড়া ষ্টেশন।

ট্রেনটা ছাড়বার পুর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ও আমার কাছে কাছে ছিল। বললাম,—জানি না, জাহাজ

কোথায় যাবে। যেখানেই যাক, তোমাকে চিঠি দোবো নতুন নতুন জায়গা থেকে। 'আমষ্টার্ডাম্' 'য়াজেন', 'কোপেন হ্যাগেন',—এসব জায়গা থেকে চিঠি পেলে তুমি খুব খুসী হবে, না?

বিকাশ মুখ ফিরালো। বুঝলাম, ওরও চোখে জল এসে গেছে।

একটু পরেই ঘণ্টা পড়লো। নেমে গেল বিকাশ। ছলো-ছলো চোখে আমার দিকে তাকালো, কোনো কথা বললো না।

আমিও কিছু বললাম না। গাড়ী ছেড়ে দিলো।

এই-ই আমার জাহাজ চড়ার ইতিহাস। বম্বে পৌছে, সুরঞ্জনবাবুর নির্দেশ মতো জাহাজী এজেন্ট্ অফিসে গেলাম। সেখানকার কাজকর্ম মিটিয়ে একেবারে সোজা জাহাজঘাটায়। এ-অফিস থেকে একটি লোক দেওয়া হয়েছিল আমার সঙ্গে। কোনো অসুবিধা হলো না। মালবাহী জাহাজটা স্থির হয়ে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সঙ্গীটির পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে জাহাজে উঠতে লাগলাম। (ক্রমশঃ)

বংশ-গৌরব

সুখরঞ্জন রায়

উচ্চ কুলে জন্মিলেই বড় নাহি হয়,
নিজ নিজ গুণে বড় হয় সমুদয়;
আপন সুকৃতি দিয়া লোকে যশ কিনে,
কেহ নাহি খ্যাতি লভে নিজ চেষ্টা বিনে;
বড়র সন্তান আমি এই স্বপনেতে
যে বিভোর তার মান নাই ভুবনেতে,
দিনে দিনে ধন যায় বংশ-খ্যাতি ক্ষীণ,
আপন স্বপন মাঝে হয় সে বিলীন।

বটগাছ তরু মাঝে কুলীন মহান্,
তাহার ফুলের তবু নাহিক সম্মান;
কুৎসিৎ কর্দমে কালো যে কমল ফুটে
মলয় অনিল তারি সৌরভেরে লুটে,
নর-নারী মুগ্ধ তার গন্ধে সুষমায়,
নিবেদন করে তারে দেবতার পায়।
দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম, পৌরুষ নিজের—
একথা আঁকিয়া রেখো মনেতে সবের।

পণ্ডিতজীর সারমেয়-প্রীতি

দিল্লীর বাসভবনে জওহরলাল তাঁর প্রিয় কুকুরটিকে আদর করছেন

ইষ্টিগ্রামের মিষ্টি কথা

শ্রীবিমল দত্ত

ইষ্টিগ্রামের মিষ্টি কথা
শুনবে নাকি তোমরা ?
গুন্‌গুনিয়ে উঠ্‌ছে মনে
একটি সুরের ভোমরা—
শুনবে নাকি তোমরা ?

ছায়ায় ঢাকা বাঁশের বনে
ডাহুক চরে, কোকিল স্বনে
কেঁয়া-শেয়ালকাঁটার ঝোপে
সোঁদা মাটির বাস,
মন ছোটে মোর সেই সে গ্রামে
স্বপ্ন যেথায় রাশ।

ভাঙা ঘাটের শ্যাওলা ঢাকা
সিঁড়ির পিছল ধাপ,
রুই কাৎলা সাঁৎরে বেড়ায়
সাঁৎরে বেড়ায় সাপ,
শাপলাগুলো কৌতূহলে
রূপের ডালি সাজিয়ে জলে
ভাসছে ময়ুর পঙ্খা যেন
জলের সাথে ভাব ॥

আমের বনে জামের বনে
হাওয়ার লুকোচুরি
ঘুমিয়ে বুঝি রাজকন্যা
ঘুমিয়ে যাদুপুরী—
নেউল চরে আস্তে ধীরে
বক চরে ঐ বিলের তীরে

কাদা খোঁচা খোঁচায় কাদা
মাছ রাঙা খায় পাক্.
চল্‌-কল্‌মীর ফুলের গেলাস
একশ হাজার, লাখ্‌।

বড়ই ভাল লাগে আমার
ইষ্টি গাঁয়ের ছায়া
মাঠে আলি পথে কত
ছড়িয়ে আছে মায়া—

গাঁয়ের মেটে কুটীরগুলি
এঁকেছে কে বুলিয়ে তুলি,
পথের বাঁকে হাজার চমক
ফুল মুকুলের হাসি
ইষ্টি গ্রামের মিষ্টি কথা
বলতে ভালবাসি।

শহর-ঘেঁষা তোমরা যারা
ইট-পাথরের পুরে
বন্দী হয়ে রয়েছো, ভাই,
গাঁয়ের থেকে দূরে—

একটি দিনের জন্যে এসে
গ্রাম দেখে যাও, ভালবেসে
প্রকৃতি-মা কোল পেতেছেন
তোমাদেরই তরে—
ইষ্টি গাঁয়ের মিষ্টি ছবি
মনটি দেবে ভরে।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন। তিনি 'মৌচাকে'র অগণিত পাঠক-পাঠিকার একান্ত প্রিয়জন ছিলেন। 'জগন্নাথ পণ্ডিত' ছদ্মনামে ছোটদের মহলে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা তা চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয়ে রইল।

কেদারনাথ ছিলেন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভ্যু'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রামানন্দবাবু ছিলেন ভারতবর্ষের একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক। এই জ্যৈষ্ঠ মাসেই রামানন্দ জন্ম শত-বার্ষিকী প্রতিপালিত হচ্ছে। ঠিক এই সময়ে কেদারনাথের মৃত্যু বড় দুঃখের।

কেদারনাথ বাল্যকালে এলাহাবাদে ও কলকাতায় পড়াশোনা শেষ করে লণ্ডনে বি, এস, সি, পড়তে যান। সেখানে রয়্যাল কলেজ অব সায়েন্স থেকে বি, এস, সি, পাশ করেন। তিনি এ, আর, সি, এ, উপাধিও লাভ করেন।

ছোট বয়স থেকে কেদারনাথ বই পড়তে ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, অলংকার, মণিমুক্তা, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ইত্যাদিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এ ছাড়া, পিতা রামানন্দের মৃত্যুর পর তিনিই এতদিন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভ্যু'র সম্পাদনার কাজ করতেন।

কেদারনাথ চরিত্রে মহৎ ছিলেন, তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও স্নেহশীল মনোভংগীর জন্য তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। যেমন সুন্দর ছিল তাঁর প্রকৃতি, তেমনি সুন্দর ছিল তাঁর আকৃতি। সমগ্র খদ্দরের পোষাকমণ্ডিত সেই দেহাবয়ব যে না দেখেছে সে অনুমান করতে পারবে না, কি সুপুরুষ তিনি ছিলেন। কথা বলতেন কম, কিন্তু কেউ কিছু প্রশ্ন করলে নীরব থাকতেন না, অতিশয় বিস্তারিত ভাবে তিনি তার উত্তর দিতেন।

তাঁর কাছে আমরা কত কি যে শুনতাম, যদি সেইগুলি লিখে রাখা যেত তাহলে হয়ত একখানি মূল্যবান বই হয়ে যেত। সব বিষয়ে অতি অল্প বয়স থেকে জানার আগ্রহ থাকায় তিনি এত বেশী জ্ঞানলাভ করেছিলেন।

'জগন্নাথের খেয়াল-খাতা' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় কেদারনাথ ছোটবেলার কয়েকটি কথা লিখে-ছিলেন। তা এখানে তুলে দিচ্ছি—"আমরা তখন এলাহাবাদে, পিতার কর্মস্থলে। খেলার
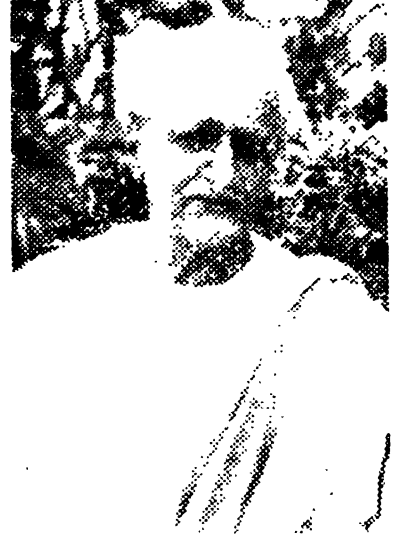
সাথীর মধ্যে হিন্দুস্থানীই ছিল বেশী, আর গল্প শোনাবার লোকের মধ্যে ছিল একজন পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, বাবার আরদালী। সে যৌবনে ফৌজী সিপাহী ছিল এবং সিপাহী বিদ্রোহে কোম্পানীর বিরুদ্ধ দলে যোগ দেয়। আর ছিল বাবার বেয়ারা হিন্দুস্থানী কাহার, সে কৈশোরে কুলীর আড়-কাটির পাল্লায় পড়ে ট্রিনিডাড যায়। খেয়াল-খাতার গল্প ঠিক তাদের গল্প নয়, তবে তাদের জীবনের ছায়া এর মধ্যে কয়েকটিতেই আছে—"

এই কয়েকটি কথার মধ্যেই কেদারনাথের শৈশব-জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শৈশব থেকেই নানা বিষয়ে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। জানার এই অসীম আগ্রহ তাঁকে উত্তর-কালে বহু বিষয়ে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করেছে। কেদারনাথের ভগ্নী শান্তা দেবী লিখেছেন—"এত কম কথা বললেও দাদার ছেলেবেলা থেকেই খুব রসবোধ ছিল। তাঁর একটা 'অতি গোপনীয় খাতা' ছিল। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকত, "ইহা কেহ খুলিবেন না, বা পড়িবেন না।" এই খাতাতে তাঁর স্বরচিত নানা হাসির গল্প থাকত।'' এই রকম গল্পই 'জগন্নাথের খেয়াল-খাতা'র গল্পগুলির মধ্যে ঠাই নিয়েছে। এই 'জগন্নাথের খেয়াল-খাতা'র প্রথম ছড়া 'ঢ্যাংএর ফলার' থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি—

''উটফল গাছ এক ঘন যার পাতা
রোদ জল আটকায় ঠিক যেন ছাতা।
নিচে তার বাস করে একজোড়া ঢ্যাং
দেড় জোড়া শিং মাথে তিন জোড়া ঠ্যাং।
কোনোদিন গান গায়, কোনোদিন খায়,
কোনোদিন পূজা করে নামাবলী গায়।''

এখন এমন যে বিচিত্র ঢ্যাং পরিবার, যারা কোনোদিন গান গায়, কোনোদিন খায় আবার কোনোদিন পূজা করে, তারা যেদিন শহরে ফলার খেতে গেল, সেদিন গোহালে আগুন লাগলে, জগঝম্প বাজলে, রেলে কলিসন হলে বা মোহনবাগান দশ গোলে জিতলে যেমন হট্টগোল সুরু হয় তেমনই অবস্থা হল এবং শেষ পর্যন্ত তারা বিরক্ত হয়ে 'মানুষ ব্যাটারা জন্তু' বলে ঘরে ফিরে গেল। একটু বিস্তৃত বিবরণ দিলাম, তার ফলে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবে যে জগন্নাথ পণ্ডিতের রচনা কেন অপূর্ব। শিশুদের মনের মত করে গল্প বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

কেদারনাথ 'সন্দেশ' সম্পাদক সুকুমার রায়ের সান্নিধ্যে আসেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বালক অবস্থায়। তারপর নানাভাবে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দু'জনের মধ্যে চার-পাঁচ বছরের বয়সের প্রভেদ ছিল, কিন্তু এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় আসার পর এবং বিলাতে থাকার সময় সুকুমার রায়ের সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন কেদারনাথ। এই ভাবেই ছোটদের জন্য লেখার

আগ্রহ তাঁর মনে গড়ে ওঠে। কেদারনাথ ছোটদের জন্য লিখেছেন অনেক কম, কিন্তু যেটুকু লিখেছেন তা অবিস্মরণীয়। ঢ্যাংএর ফলার, ভবম হাজাম, শাহ চুকন্দর, হাকিম হুড়ুকবাজ, বব্বরখোর বন্দুক, ভৌতিক ব্যাপার প্রভৃতি কাহিনী ও ছড়াগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

ব্রাহ্ম সমাজের অধীনে তখনকার কালে ছাত্র সমাজ নামে একটি সংস্থা ছিল। সুকুমার রায়, কেদারনাথ প্রভৃতি তরুণরা ছিলেন সেই সংস্থার সদস্য। এঁদের প্রতিজ্ঞা করতে হ'ত—কি কি করা উচিত এবং কি কি করা উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত নানা কারণে ছাত্র সমাজ উঠে গিয়ে ব্রাহ্ম যুবক সমিতি গঠিত হয় এবং কেদারনাথ ছিলেন তার একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য। এই সূত্রে এবং পারিবারিক পরিধির যোগাযোগে কেদারনাথের জীবনে অতি অল্প বয়সেই বহু মনীষীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির সঙ্গে নানা বিষয়ে চর্চা করার সুবিধা হয়। এই সময়ে 'ফ্রেটারনিটি' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। খেলাধূলা ও স্বাস্থ্য-চর্চার প্রতিও কেদারনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। 'স্পোর্টিং ইউনিয়ন'-এর তিনি একসময় সদস্য ছিলেন।

বিদেশ থেকে ফিরে এসে কেদারনাথ কিছুকাল বিভিন্ন কারখানায় রাসায়নিকের কাজ করলেও তাঁর মন ছিল সাংবাদিকতায়, তাই তিনি পরে সব ত্যাগ করে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভ্যু'র কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

'মৌচাক' আপিসে 'মৌচাক' সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদকীয় টেবিলটি ঘিরে যে সাহিত্য মজলিস বসে, সেই মজলিসে বাংলা সাহিত্যের অনেক বিশিষ্ট লেখক প্রতিদিন হাজির হন, সেই আসরে নিত্য উপস্থিত থাকতেন কেদারনাথ।

'ভারত' নামক দৈনিক পত্রিকা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এই 'ভারত' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন কেদারনাথ।

১৯৪২-এ যে আগষ্ট আন্দোলন সুরু হয়, সেই জাতীয় সংগ্রামেও কেদারনাথ এক সক্রীয় অংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি আপনাকে জাহির করা অতিশয় অপছন্দ করতেন। ফলে, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর যে কি ভূমিকা ছিল তা শুধু জানেন তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন তাঁকে ঢাকায় ডেপুটী হাইকমিশনার পদের জন্য ভারত সরকার আমন্ত্রণ জানান, তিনি তা গ্রহণ করেন নি। 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদনাই তাঁর কাছে বেশী সম্মানের মনে হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাংবাদিকতা'র ক্লাস নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতেন কেদারনাথ অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে। ছাত্রমহলে তাই তাঁর অনেক সুনাম।

উচ্চ-নীচ সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখতেন। নিজের শরীরের কথা ভুলে গিয়েও লোকের

উপকার করার চেষ্টা করতেন। কেদারনাথ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্যে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে একটি মজার গল্প শুনেছি, পারস্যে সেখ সাদীর যেখানে সমাধিভূমি সেইখানে একখানি বই আছে, যে প্রশ্ন মনে নিয়ে দর্শক সেই বইটির যে কোনো পাতা খুললেই সেই প্রশ্নের জবাব মিলবে। রবীন্দ্রনাথ এই বইটি উন্মুক্ত করলেন এবং তাঁর মনে সেই মুহূর্তে প্রশ্ন জেগেছিল—আমার দেশ কবে স্বাধীন হবে? সেই পৃষ্ঠায় লেখা ছিল—দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, মুক্তির আনন্দবার্তা শীঘ্রই সেই দ্বারপথে এসে পৌঁছবে। রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এই কাহিনী আমাকে কেদারনাথ বলেছিলেন বেতারের এক প্রশ্নোত্তর কালে। এমনই সহস্র রকমের কাহিনী তাঁর জানা ছিল। 'মৌচাকে'র পাঠক-পাঠিকাদের মত আমরাও আর কোনোদিন শুন্‌তে পাব না কেদারনাথের বিচিত্র কথা-কাহিনী। সংগীত-হারা বাঁশীর মত সেই কণ্ঠ আজ স্তব্ধ।

ইলেকট্রোলাইট

লবণজাতীয় বস্তুকে জলে গুলে দিলে যে লবণাক্ত জল তৈরী হয় তা সহজেই তড়িৎ পরিবহন করে। তড়িৎ পরিচালনার ফলে লবণের অণুকণাগুলো ভেঙে গিয়ে দু'টি ইলেকট্রোডে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নের সৃষ্টি করে। এই জাতীয় বস্তুকে বলা হয় 'ইলেকট্রোলাইট'। ইলেক্‌ট্রোডের অর্থ তড়িৎ-দ্বার, অর্থাৎ তড়িৎ-পরিবাহী দণ্ড, চাকতি বা তার, যার মধ্যে দিয়ে গ্যাসীয় বা তরল পদার্থে তড়িৎ প্রবেশ করে বা বেরিয়ে যায়।

হাতী রমজান

জগন্নাথ পণ্ডিত*

আমাদের মণ্টু মাস্টার সেদিন বক্সিং দেখতে গিয়েছিল। পরদিন রবিবার, স্কুল ছুটি, তার উপর বাড়ির বড়রাও কেউ ছিল না। কাজেই মণ্টুবাবু তার দুই ভাই, আর বন্ধু কালু, এই ক'জন মিলে দুপুর বেলায় বাইরের বারান্দায় বেশ জমিয়ে গল্প আরম্ভ করলে।

মণ্টু খুব হাত-পা নেড়ে বক্সিং-এর বর্ণনা করছিলো। লালু আর গণেশ দু'জনেই তার ছোট, কাজেই তার দাদার সব কথা হাঁ করে গিল্‌ছিল, যদিই বা সে কিছু নেহাত অবিশ্বাস করার মত বলে, তো তাতেও তাদের কিছু বলবার উপায় নেই। শুধু এক কালু মাঝে মাঝে "যা-যাঃ, বাজে বকিস নি।" ইত্যাদি বলে নিজের মান বজায় রাখছিলো।

মণ্টু বল্লে—"যাই বলিস, বক্সিং জিনিসটা একটা সায়েন্সের মত সায়েন্স; ঠিক ওজন মাফিক এক ঘুষি চোয়ালের নিচে বসালে খুব বড় জোয়ানকেও চিতপটাং—যাকে বলে নক্ আউট্ করে ফেলা যায়।"

লালু ভয়ে ভয়ে বল্লে—"দাদা, বক্সিং করতে কি খুব গায়ের জোর দরকার?"

"না, তেমন কিছু নয়। ওটা কি জানিস, ঠিক কুস্তির প্যাঁচের মত, জোরের চেয়ে কায়দার দরকার বেশী।"

গনেশ বল্লে—"আচ্ছা দাদা, যদি একটা কুস্তিগির পালোয়ান আর একটা বক্সিং-এর ওস্তাদে লড়াই হয় তো কে জেতে?"

মণ্টু কুস্তিগিরের নামে নাক সিঁটকিয়ে বল্লে—"দূর গাধা! কুস্তিগিরের আবার লড়াই, তারও আবার কথা! ঐ যে কাল ব্যাট্‌লিং প্যাট বক্সিং করলে। সে ইচ্ছে করলে এক মিনিটে তোর কাল্লু কিঙ্কর গামা সব কটাকে ঘায়েল করে দিতে পারে।"

কালু ছেলেবেলায় কিঙ্কর সিংকে দেখেছিল, তাক কাছে এ কথাটা নেহাত বাজে ঠেকাতে সে তক্ষুনি বলে উঠল—"ভাগ ভাগ, রেখে দে তোর ব্যাট্‌লিং প্যাট। কিঙ্কর এক রদ্দায় তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে গঙ্গাপার করে দিতে পারতো।"

মণ্টু মহা ক্ষেপে বল্লে—"মেলা বকিস নি, যা জানিস না তা নিয়ে কথা বলিস কেন? ঢের ঢের কুস্তিগির দেখেছি, যত ভুঁদো মোটা মেড়ার দল! বক্সিং লড়নেওয়ালার সামনে দাঁড়ায় এমন

* জগন্নাথ পণ্ডিত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভ্যু' পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। এই নামে 'সন্দেশ' ও 'মৌচাক' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু গল্প তিনি লিখেছেন। এই গল্পটি পুরাতন 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁর এই প্রথম গল্পটি এখানে আমরা পুনরায় মুদ্রিত করলাম। মোঃ, সঃ

কুস্তিগির জন্মায় নি। বিলেতে কে কুস্তি দেখে রে ? আর এক-একটা বক্সিং লড়িয়ে প্রতি ম্যাচে দশ বিশ হাজার পাউণ্ড পায়।"

বাড়ির দারোয়ানদের বুড়ো জমাদার, রামগিদ্ধড় সিং (সে মণ্টুর ঠাকুরদাদার আমলের লোক) এতক্ষণ কাছে বসে ঝিমোচ্ছিল। কুস্তি, বক্সিং, লড়াই—এই সব শুনে সে হঠাৎ কান খাড়া করে উঠে বল্লে—"এ মণ্টুদাদা, বোক সিং কোন্ দেশের পালোয়ান আছে ?" বুড়ো তো ইংরেজী জানে না, কাজেই সে ভেবেছে বক্সিং বুঝি বা বোক সিং গোছের একটা নাম।

দারোয়ানজীর কথা শুনে মণ্টুর দল তো প্রথমে অবাক হয়ে হাঁ করে খানিক তাকাল, তারপর ব্যাপারটা বুঝে চারজনে খুব হাসল। একটু সামলে নিয়ে মণ্টু বুড়োকে বক্সিংটা কি জিনিস তা বুঝিয়ে দিলে।

সব শোনবার পর দারোয়ানজী বল্লে—"ও, বোক্সিং গোরাদের ঘুষা লড়াকে বোলে। হামি তো ভাবলো যে সেটা না জানি কি জবরদস্ত পালোয়ান হোবে। গামাকে মারে ; কিঙ্করকে পিটে দেয়—হেঃ, হেঃ, হেঃ !"—দারোয়ানজী খুব এক চোট হেসে নিলে।

বুড়োর হাসিতে মণ্টু চটে বল্লে—"এতে হাসবার কি আছে ? একটা ঘুষি লড়াইয়ে গোরা অমন দশ-পনরটা কুস্তিগির পালোয়ানকে মেরে ফ্লাট করে দিতে পারে। তুমি তার জান কি ?"

দারোয়ানজী গম্ভীরভাবে বল্লে—"হামি আর কি জানে ! হামি তো আজ পচাশ বর্স কলকাতায় রয়েছি আর তার আগে পন্দ্রা বর্স পল্টন মে কাম করেছি ; হামি তো অনেক দেখলো অনেক শুনলো।" এই বলে খানিক চুপ করে, বুড়ো হঠাৎ মণ্টুর দিকে ফিরে বল্ল, "এক দিকে কিঙ্কর সিং অন্য দিকে—বন্দুক সঙ্গীন বাদে—এক পল্টন গোরা দাঁড় করিয়ে দাও। কিঙ্কর এক-এক রদ্দায় দশ-বিশটাকে জখম করে, পল্টনকে পল্টন দু' ঘণ্টায় সাফ করে দেবে। আরে কিঙ্কর তো মরে গেলো, গোলাম, আলিয়া, ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে, সব তো মরে গেলো, এখন বোক্সিং এল লড়াই করতে, হাঁঃ !"

মণ্টু বেশ তিলকে তাল করে বাড়িয়ে বলতে পারত। কিন্তু দারোয়ানজীর একা কিঙ্কর এক পল্টন গোরা সাফ করার বহর দেখে সে বেজায় দমে গেল। তাই দেখে গণেশ মহা খুশী হয়ে দারোয়ানজীকে জিগ্যেস করলে—"জমাদার, ভেট্‌কুয়ার কে ছিল ?"

আরে ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ের নাম শুনোনি ! আড্‌ঢাই (আড়াই) প্যাঁচ ভেটকুয়ার—তার দু প্যাঁচ ছিল হাত পা সব লাগিয়ে, আর আধা প্যাঁচ ছিল হাত লাগান বাদে। এই আড্‌ঢাই প্যাঁচে সে দুনিয়া ফতে করেছিল। শুনবে তার কথা ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনবো।" সবাই বলে উঠলো। দারোয়ানজী তখন গোঁফে তা দিয়ে সোজা হয়ে বসে বলতে লাগলো।

বলম্বটেরের লওয়াব (নবাব) ছিল একটা ভারী বড়ো লওয়াব। তার ছিল বড়ো বড়ো হাথি, হাজার ঘোড়া, সিপাহি, পল্টন, তোপা তমঞ্চা, আরও কত কি। আর ছিল তার এক পালোয়ান, হাথি রমজান। সেটা দেখতে ছিল একটা হাথির মতো আর তার গায়ে জোর ছিল দুটো হাথির সমান। তার সঙ্গে কুস্তিতে কেউ পেরে উঠতো না। জয়পুর, ঢোলপুর, মূলতান, লাহৌর, সব দেশের পালোয়ান তার কাছে লড়তে এসেছিল। রমজান লড়তে নেমে এদিকে লাফিয়ে, ওদিকে কুঁদে, দুই হুমকি মেরে, তিন পাঁয়তারা ক'ষে, ঠিক বাঘের মতো গর্জিয়ে, অন্য পালোয়ানটার ঘাড়ে পড়ত আর দুই হাথির শুঁড়ের মতো লম্বা হাতে জড়িয়ে তাকে কাবু করে এক আছাড়ে চিত করে ফেলতো। আছাড়ের চোটে কত পালোয়ানের হাড়গোড় ভেঙ্গে-চুরে যেতো।

শেষে ভয়ে কেউ তার সঙ্গে লড়তে চাইত না। না লড়তে পেয়ে রমজান ঠিক বুনো বাঘের মতো হয়ে গেলো। সে আজ এর বাড়ির দেয়াল ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, কাল কারুর গাড়ি ঘোড়া উল্টে দেয়। এই মত করে শহরে বড় অত্যাচার লাগিয়ে দিলো। শেষে যখন শহরের লোক সব মিলে লওয়াবের কাছে লালিশ (নালিশ) করলো তো, তখন লওয়াব হুকুম দিলে রমজানকে মোটা মোটা শিকলি দিয়ে বেঁধে রাখতে। সকাল বিকাল সেই শিকলি ধরে চারটে হাথি, হাথি রমজানকে টহলাতে নিয়ে যেতো।

অনেকদিন গেলো সত্তপুরের রাজার গদ্দি হোলো। সে খুব ধুম, কত তামাসা, নাচ-গান, খেল, ঠেট্‌র কত কিচ্ছু হোলো। কত দেশের রাজা-উজির লওয়াব-ওমরাহ্ এল সে সব দেখতে। আর সেই সময় এল সেই বলম্বটেরের লওয়াব। লওয়াব তো যা দেখে তাতেই বলে, "বেশ, বেশ, তবে হামার রাজত্বে এসব অনেক রকম আছে।" কি রকম আছে জিগ্যেস করলে সে কিছু বোলে না শুধু হাসে। সব শেষের দিন হোলো দঙ্গল।

লালু বল্লে—"দঙ্গল আবার কি?"

দারোয়ানজী বল্লে—"দঙ্গল মানে কুস্তির ভারী লড়াই, অনেক লোক লড়ে, যে জিতে যায় সে এক ঘড়া টাকা আর শাল-দোশালা অনেক কিছু পায়।"

মণ্টু বল্লে—"ও বুঝেছি। টুরনামেণ্ট।"

দারোয়ানজী বল্লে—"তা হোবে।"—ব'লে বলতে লাগলো—"রাজার বড় পালোয়ান ভুট্টা সিং আর তার দুই সাগির্দ (চেলা) তো অনেক খেল অনেক কুস্তি দেখালো। রাজা খুশী হয়ে তাদের বকশিশ করে, লওয়াবকে বল্লে—"লওয়াব সাহাব, কুস্তি কেমন হোলো?" লওয়াব বল্লে—"বেশ, বেশ, তবে হামার দেশে এসব অন্যো রকম হয়।"

রাজা অবাক হয়ে বল্লো—"সে কি হুজুর, কুস্তির আবার অন্যো রকম কি হোবে?" লওয়াব তো কিছু বল্লো না, শুধু হাসলো।

রাজা চটে বল্লে—"লওয়াব সাহেবের দেশে সবই নতুন, সেখানের কুস্তিও আজব গোছের কিছু হোবে।"

লওয়াব বল্লে—"বিশ্বাস না হয় আপনার পালোয়ানদের পাঠিয়ে দেবেন, তাদের নতুন রকম কুস্তি শিখলিয়ে (শিখিয়ে) দেবো।"

রাজা বল্লে—"হাঁ? তবে আলবাত আমার পালোয়ান সব সেখানে যাবে। আপনি তাদের শিখলাবার বন্দোবস্ত করুন।"

লওয়াব বল্লে—"বেশ, বেশ। তাই হোবে।" বলে একটু হাসলো।

তারপর কিছুদিন গেলো রাজার হুকমে পালোয়ানরা দিন দশ দশ হাজার ডন, বৈঠক, দৌড়, কুস্তি চালাতে লাগলো। শেষে যখন তারা বল্লে—"হুজুর অন দাতা সব তৈয়ার।" তখন রাজা তাদের লোক-লস্কর সমেত পাঠিয়ে দিলে বলম্‌বটের শহরে। সেখানে লওয়াব তো তাদের খুব খাতির করে থাকার, খাওয়ার, দেখার, সব বন্দোবস্ত করে দিলে। দু'চার-পাঁচ দিন যাবার পর রাজার বড় পালোয়ান ভুট্টা সিং একদিন মস্ত পাগড়ি বেঁধে লওয়াবের দরবারে গিয়ে লম্বা সেলাম ঠুকে বল্লে—"হুজুর সরকার, এবার হুকম হোক আমাদের কুস্তির লড়াইয়ের।"

লওয়াব বল্লে—"বেশ, বেশ, কাল হোবে।"

তার পরদিন বিকালে লওয়াবের দরবারের সামনে কুস্তির জায়গা ঠিক হোলো। হাথি রমজানের লড়াই দেখতে মুল্লুকসুদ্ধু লোক জড়ো হলো। চারিদিকে সোরগোল, চারিদিকে ঠেলাঠেলি, সবাই সামনে এগোবার চেষ্টা করছে। এমন সময় কাড়া-নাকাড়া, শিঙ্গা বেজে উঠলো। সিপাহী সোয়ার চারিদিকে ছুটলো। দেখতে দেখতে লওয়াব সাহেবের সওয়ারি এসে পড়ল। চারিদিকের লোক ঝুঁকে কুনিশ করে একবার চেঁচিয়ে বন্দেগি জানালো, তারপর সব চুপ।

লওয়াব এসে কুস্তির আখড়ার ধারে সিংহাসনে বসলো। খিদমতগার, খাওয়াস, চামর বরদার সব চারিদিকে ছুটাছুটি করে তার আরামের বন্দোবস্ত করলে। লওয়াব একটু জিরিয়ে নিয়ে গম্ভীরভাবে বল্লে—"সত্তুপুরের পালোয়ানরা কোথায়?"

"হুজুর খোদাবন্দ"—বলে লম্বা সেলাম ঠুকে ভুট্টা সিং এসে দাঁড়ালো।

"তোমরা আমার শহর দেখেছ কেমন? এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে না তো?"

"হুজুরের তো দুনিয়া মশুর (প্রসিদ্ধ) আর হুজুর সরকারের মেহেরবানী (কৃপা) যার উপর পড়েছে তার সুখের সীমা নেই। সে কথা এ বান্দা হরঘড়ি (প্রতি মুহূর্তে) বুঝছে।"

নওয়াব খুশী হয়ে বল্লে—"বেশ, বেশ, তবে আর কিছুদিন আরাম করো। তারপর দেশে ফিরে যাও।"

ভুট্টা সিং ফের ঝুকে লম্বা সেলাম ঠুকে বল্লে—"যো হুকুম খোদাবন্দ। তবে গোস্তাকি মাফ (অপরাধ ক্ষমা) করলে এ গোলাম একটা আরজি পেশ (নিবেদন) করে।"

নওয়াব বল্লে—"বেশ, বেশ, নির্ভয়ে বলো।" পালোয়ান বল্লে—"হুজুর রাজা সাহেবের হুকম ছিল এখানের কুস্তি দেখে যেতে।"

নওয়াব একথা শুনে একটু হাসলো। তারপর খানিক চুপ করে তামাক টানলো। চারিধারে একেবারে চুপ। কেউ কথা বলে না। তারপর নওয়াব বল্লো—"তোমাদের কি প্রাণের মায়া নেই। হাথি রমজানের হিম্মতের কিছু খবর রাখো।"

ভুট্টা সিং ফের লম্বা সেলাম ঠুকে বল্লে—"হুজুর এ বান্দার জান (প্রাণ) তো মনিবের হাতে। আর গোস্তাকি মাফ করবেন। অনেক পালোয়ানের হিম্মত আমি দেখছি, না হয় রমজানেরটাও দেখে নেবো।"

এই কথা শুনে নওয়াবের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো। সে একবার সিংহাসনের হাতলে ভর দিয়ে চোখ লাল করে তল্‌ওয়ার মুঠিতে চেপে ধরে, পালোয়ানের দিকে ঝুঁকলো, তার পরই একটু হেসে বল্লো—"বেশ বেশ, তবে তোমরা সব তৈরী হও, আমি তোমাদের শিখ্‌লাবার (শিক্ষা দেবার) বন্দোবস্ত করছি।" এই বলে নওয়াব জোর গলায় হুকম দিলে—"রমজানকে হাজির করো।" বলে সে সিংহাসনে ঠেস দিয়ে গম্ভীরভাবে তামাক খেতে লাগলো।

সত্তুপুরের পালোয়ানরা তৈরী হয়ে আখড়ায় নামলো। ওস্তাদের লম্বা-চৌড়া শরীর, প্রকাণ্ড বুক, লম্বা হাত, মহিষের মত ঘাড়। সে আখড়ায় নেমে একবার সেখানের মাটি মাথায় ঠেকালে, তারপর নওয়াবকে সেলাম করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকের উপর হাত গুটিয়ে যে পথে হাথি রমজান আসবে সেদিকে তাকিয়ে অচল হয়ে রইলো। তার সাগির্দরাও ঠিক তারই মতো সব করলো।

অল্প দেরি হোলো, তারপর হঠাৎ দূরে একটা ভয়ানক চেঁচামেচি সোরগোল শোনা গেল। আওয়াজটা এগিয়ে আসতে ক্রমে দেখা গেল যে রাজার সড়ক (রাজপথ) দিয়ে চারটে হাথি আর এক দল বর্ষা বল্লমধারী সিপাহী, বিষম সোরগোল আর হুড়াহুড়ি করতে করতে আসছে। আরো কাছে এলে দেখা গেলো যে, ডাইনে দুই হাথি, বাঁয়ে দুই হাথি শিকলি ধরেছে আর তার মাঝে, সেই শিকলিতে বাঁধা হাথি রমজান গর্জাতে গর্জাতে চলে আসছে। তার দাপটে, শিকলি জঞ্জীরের ঝনঝনাতে আর সিপাহীদের 'হঠ যাও, হঠ যাও' চিৎকারে পথের দু'ধারের

লোক প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। এই রকম গোলমাল করতে করতে রমজান কুস্তির আসরে এসে পৌঁছাল।

পাঁচ হাথ লম্বা, চার হাথ ছাতিরবেড়, ছ' মন ওজন, লাল ভাঁটার মত দুই চোখ,— তার উপর সে দুটো ক্রমাগত ঘুরছে—বাঘের মতো মোছ (গোঁফ)। তারপর লড়াইয়ের নামে সে ক্ষেপে রয়েছে,—তার গায়ের লোম খাড়া, আর সে ক্রমাগত গজরাচ্ছে আর দাঁতে দাঁত ঘষছে—ঠিক যেন একটা হাথি মস্ত (মত্ত) হয়েছে। আসরের ধারে এসে সে প্রথমে নওয়াবকে সেলাম করলে, তারপর এদিক-ওদিক মাথা ফিরিয়ে খুঁজতে লাগলো, কে চায় তার সঙ্গে লড়তে।

সত্তুপুরের পালোয়ানরা তার নজরে পড়তেই সে কোমরের শিকলিতে টান মেরে, সেদিকে ঝুঁকে, বেশ ভাল করে তাদের দেখে নিলে। দেখা হয়ে গেলে হঠাৎ সে ভয়ানক জোরে হো-হো করে হেসে উঠলো, আর তার পরই মুখ চোখ লাল করে, ঘাড় বেঁকিয়ে, বুক ফুলিয়ে, ভীষণ গর্জন করে সত্তুপুরের পালোয়ানদের দিকে লাফিয়ে এগোবার চেষ্টা করলে—ঠিক যেন একটা বুনো বাঘ শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ছে।

তার চেহারা দেখে আর গর্জন শুনে চারিধারের লোকের মধ্যে ভয়ের চিচকার শুনা গেলো, আর সত্তুপুরের পালোয়ানদের মধ্যে এক ওস্তাদ বাদে আর সবাই পালিয়ে ভেগে গেলো। ওস্তাদেরও মুখ সাদা, গায়েও ঘাম ছুটছে, কিন্তু সে ইজ্জত বাঁচানর জন্যে তখনো দাঁড়িয়ে রইলো। চারিদিকে যখন এই মতো গণ্ডগোল, তখন নওয়াব সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে জোর হেঁকে বল্লো—"খবরদার বেয়াদব বেতমিজ, চুপ রও।"

মনিবের তাড়া খেয়ে ডালকুত্তা যেমন চুপ হয়ে যায়, তেমনি নওয়াবের ধমকে রমজানও আড়ষ্ট হয়ে গেলো। নওয়াব খানিক তার দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, ফের এসে বসলো। বসে হুকম দিলে—"লোহারকো বোলো শিকলি খুলে দিতে।" লোহার গিয়ে শিকলি খুলে দিলে। মাহুতরা হাথি নিয়ে দূরে সরে দাঁড়ালো। রমজান চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

নওয়াব হুকুম দিলে—"হাথ মিলাও।"

কট্‌মট্ করে তাকাতে তাকাতে, ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে, রমজান আস্তে এগিয়ে ভুট্টা সিং-এ দুই হাত চেপে ধরলে।

নওয়াব বল্লে, "তফাত যাও"। রমজান সরে দাঁড়ালো। নওয়াব ফের ভুট্টা সিংকে জিগ্যেস করলে—"কি লড়বে তুমি? ওস্তাদের তখন মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না, সে মাথা ঝুঁকিয়ে বুঝালো যে সে লড়তে চায়। (ক্রমশঃ)

সাপের কথা

সাপের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত কম। এদের ঘ্রাণশক্তি একেবারে নেই বললেই চলে। চলন্ত পদার্থের কম্পন এরা দেহের স্নায়ু দিয়ে ধরতে পারে। একমাত্র উপায় যার সাহায্যে সাপ বুঝতে পারে তার সামনে কি আছে বারবার তার জিভ পোকামাকড়ের শুঁড়ের মত বের ক'রে। এর চোয়ালের সামনেটা খাঁজ-কাটা—যার সাহায্যে মুখ না খুলে এরা জিভ ঠেলে বার করতে পারে।

শিশিরের জন্ম

সারাদিন ধরে নদী, গাছপালা ইত্যাদি আর্দ্রতা হারায় এবং তা বাষ্পাকারে বাতাসে মিশে যায়। রাত্রে পৃথিবী তার কিছুটা উত্তাপ হারালে এটা আর্দ্র বায়ুরূপে ওঠে। রাত্রে পৃথিবীর ঠিক উপরের স্তরের আর্দ্রতাও নষ্ট হয়, এবং শীঘ্রই এমন একটি বিন্দুতে উপস্থিত হয় যখন সে মাটির থেকে ওঠা আর্দ্রতার সমস্তটা রাখতে পারে না। এই কারণে আর্দ্রতাকে ছোট ছোট জলবিন্দুতে পরিণত হয়ে পরের দিন সকালে শিশিররূপে পড়তে দেখা যায়।

সূর্য

পৃথিবীর নিকটতম তারকা সূর্য; পৃথিবী হ'তে এর দূরত্ব ৯৩ মিলিয়ন মাইল। তারার মধ্যে সূর্য বেশ ক্ষুদ্র। এর ব্যাস মাত্র ৮৬৫০০০ মাইল, যদিও তিন লক্ষ পৃথিবী এর উপাদানে তৈরী হতে পারে। সূর্যের পর পৃথিবীর নিকটতম তারা হ'ল Alpha centauri. পৃথিবী থেকে ২৫ মিলিয়ন মাইলেরও বেশী দূরে থাকায় আমাদের কাছে এটা একটি আলোকবিন্দু মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সূর্যের চেয়ে শত শত গুণ বড়ো।

নুনের পরিমাণ

সমুদ্রের সমস্ত নুন জমি থেকেই আসে। প্রত্যেক নদী জমির ওপর দিয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়বার সময় জমির সমস্ত নুন নিয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ বছর এভাবেই চলে আসছে এবং যে নুন সমুদ্রে পড়ছে, সেখানেই থেকে যাচ্ছে। প্রতি বৎসর নদীগুলি সমুদ্রে ১৫৮ মিলিয়ন টন পরিমাণ নুন ঢেলে দিচ্ছে, ফলে সমুদ্র উত্তরোত্তর লবণাক্ত হয়ে পড়ছে। হিসাব করে দেখা গেছে, এক গ্যালন সমুদ্রের জলে চার আউন্স নুন থাকে।

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

গল্পের মায়াপুরী—শ্রীসুজিতকুমার নাগ। পাল পাবলিশিং কনসার্ন, ২৪এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীরামপদ পাল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১·২৫

রূপকথার দু'টি গল্প সদামামার মুখ দিয়ে এই সচিত্র ও শোভন বইটির মধ্যে বলিয়েছেন লেখক। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গীটি বেশ সুন্দর। এই ধরনের মায়াপুরীর গল্প এবং চরিত্র হিসাবে দৈত্যরাজ হিংটং, সেনাপতি লম্বোদর, ডাইনী বুড়ি, সুমতি-কুমতি লাললিল্ ওরফে হীরামন পাখী, অচিনকুমার প্রভৃতিগুলিকে নিয়ে কাহিনীর বিস্তার ছোটদের মনের উপর গভীর ছাপ রেখে যাবে---ছোটরা পড়ে ও ছবি দেখে খুশি হ বে

—

ছোটদের গালিভার—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। ১, ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১·০০

জোনাথান সুইফট এর 'গালির্ভারস্ ট্রাভল' বিশ্ব-শিশুসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বই। গালিভারের ভারী মজার-মজার কাহিনী আছে। শিশু-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক ধীরেন্দ্রলাল ধর সেই কাহিনীর মধ্যে বামনের দেশে, দানবের পুরি, মেঘ ভবন, গবেষণা নগর, ভূতুড়ে বাড়ি, অমর মানুষের দেশে, ঘোড়া-রাজার অতিথি নামক কয়েকটি গল্প সুন্দর সহজ ভাষায় যুক্তাক্ষর বজন করে খুব ছোটদের জন্য প্রকাশ করেছেন। বইটিতে প্রচুর ছবি আছে। প্রত্যেকটি গল্পই ছোটদের আনন্দ দেবে।

—

হাজার বছর পরে আমাদের কবি—শ্রীসতীকুমার নাগ। টি. এস. বি. প্রকাশন, ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ মূল্য ০·৫০

বড় বড় টাইপে লেখা এটি একটি মজার ছোট্ট নাটিকা। হাজার বছর পরে আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে কি ভাবে দেশের ছেলে-মেয়েরা দেখবে সেই কাল্পনিক চিত্র নাটকের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন লেখক। 'পাঠশালা' পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং বেতারেও অভিনীত হয়। মাত্র চারটি চরিত্রের সাহায্যে নাটিকাটি লিখিত হয়েছে। একজন ষাট বছরের দাদু আছেন, আর তাঁর সঙ্গে আছে তাঁর নাতি ও দুই নাতনী। রবীন্দ্রনাথের দু'একটি গানও আছে নাটিকাটিতে। ছোটরা এটি অভিনয় করলে নিজেরা যেমন আনন্দ পাবে, তেমনি দর্শকদেরও আনন্দ দিতে পারবে।

মেঠুড়ে

রণজি ট্রফির ফ্যাইন্যাল

রণজি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে বোম্বাই আবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। এবার নিয়ে বোম্বাই পরপর সাতবার এবং একত্রিশবারের প্রতিযোগিতায় ষোলবার রণজি ট্রফি ঘরে তুলল।

ভারতীয় ক্রিকেটে বোম্বাইয়ের প্রাধান্য একচ্ছত্র। দলে ছ-জন টেষ্ট খেলোয়াড় ছাড়া বাকি পাঁচজনও টেষ্ট খেলোয়াড়ের প্রায় সমকক্ষ। ফাইন্যালে বোম্বাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হায়দরাবাদের শক্তিও কম ছিল না, তবু হায়দরাবাদেই তাদের নিজেদের রাজ্যে এক ইনিংস ও ১২৬ রানে বোম্বাইয়ের কাছে শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করতে হয়েছে। পাঁচদিনের ফাইন্যাল খেলা চারদিনেই শেষ হয়।

বিশ্ব হেভিওয়েট বক্সিং

২৬ মে ১৯৬৫। লিউস্টন মেন থেকে সারা দুনিয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়ল—প্রথম রাউণ্ডেই এক মিনিটের মধ্যে ক্যাসিয়াস ক্লে লিষ্টনকে ধরাশায়ী করেছেন বিশ্ব হেভিওয়েট বক্সিংয়ে। যদিও এর আগে এগারোবার প্রথম রাউণ্ডে হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসা হয়েছে, তবু ক্লের মতন এতো কম সময়ে কেউই প্রতিদ্বন্দ্বীকে নক-আউট করতে পারেন নি। অবশ্য যেভাবে সময় গুণে লিস্টনকে পরাজিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং যেভাবে লিষ্টন পরাজিত হয়েছেন, তাতে মুষ্টিযুদ্ধ মহলে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এ তো বক্সিং নয়, মনে হয় প্রহসন অথবা ভোজবাজি।

১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লিস্টন ও ক্লের প্রথমবারের লড়াইতে ষষ্ঠ রাউণ্ডে লিস্টন অবসর নেওয়ায় ক্লে চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান পান। তখন লিস্টনের কাঁধের হাড় সরে গিয়েছিল।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর। আমেরিকার বোস্টন শহরে অগণিত মানুষের ভিড় হয়েছে এবং প্রবল উত্তেজনায় সারা শহর সরগরম। সকলের মুখে এক কথা কে জিতবে? ক্লে না লিষ্টন?

ক্লে বোষ্টনের রাস্তায় দলবল নিয়ে হইচই করছেন—হাতে তাঁর দড়ি ও কুকুরের গলার বকলস। ভাল্লুক নাচের তালে তালে তিনি গান করছেন এবং তাঁর সঙ্গীরা তালে তাল দিচ্ছেন। ক্লে-র এই

আচরণের কথা লিষ্টনের কানে এসেছে, কিন্তু তিনি মুখে কিছু বলেননি। অমানুষিক মেহনৎ করে চর্বিবহুল দেহটাকে তিনি লড়াইয়ের উপযুক্ত করেছেন। ডাক্তার, কোচ, যে যা বলেছেন তিনি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছেন। হারার শোধ নেবার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে তিনি প্রস্তুত। লিষ্টন যেন অন্য মানুষ। শুধু তিনি অপেক্ষা করছেন ক্লে-র সঙ্গে রিংয়ের মধ্যে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবার জন্যে। তাঁর একমাত্র মনের কথা—মিয়ামী বীচের পরাজয়ের প্রতিশোধ চাই।

এর মধ্যে দেখতে দেখতে কথা দিয়েছি' মাস কেটে যায়। জগতবাসী জানতে পারলেন, লিউষ্টন মেন শহরে ১৯৬৫ সালে আবার ক্লে ও লিষ্টনের লড়াই হবে। গতবার মানুষের মধ্যে যতোটা উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল এবার আর ততোটা নয়। অগণিত দর্শকে ষ্টেডিয়াম ভরে গেছে। মঞ্চে প্রথম দেখা দিলেন লিষ্টন। উল্লাসের সঙ্গে দর্শকরা হাততালি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। পরে এলেন ক্লে—তাঁর ভাগ্যে জুটলো কিছু সমাদর, কিছুটা ব্যঙ্গও। অতীতের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জো লুই, জিম ব্রাডক, প্যাটার্সন প্রমুখকে রিংয়ের ওপর দর্শকরা দেখলেন। দর্শকরা উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন যখন রেফারী ওয়ালকট লড়াই শুরু করে দিলেন। ক্লে চকিতে হানলেন ডান ও বাঁ হাতের দুটো প্রচণ্ড ঘুষি লিষ্টনের মাথায়। প্রত্যুত্তরে লিষ্টন ঘুষি চালালেন ক্লে-র চোয়াল লক্ষ্য করে, কিন্তু চঞ্চল ক্লে-র মুখে ঘুষি স্পর্শ করল মাত্র। এই সুযোগে ক্লে চালালেন একটা ডান হাতের হুক—লিষ্টন ছিটকে গেলেন রিংয়ের ধারে, তেড়ে গিয়ে আর একটা বাঁ হাতের হুক—সঙ্গে সঙ্গে লিষ্টন ধরাশায়ী হলেন। লিষ্টন উঠে দাঁড়ালেন বটে, তবে সময় পার হয়ে যাওয়ায় ক্লে লড়াইয়ে জিতলেন। দর্শকরা চটে চীৎকার করে উঠলেন, 'স্রেফ জোচ্চুরি'। কিন্তু কে কার কথা শোনে—ততক্ষণে বাজি শেষ হয়ে গেছে।

মুষ্টিযুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী দশ সেকেণ্ডের মধ্যে ভূতলশায়ী মুষ্টিককে উঠে পড়ে আবার লড়াই শুরু করতে হয় এবং সেকেণ্ড গোনা আরম্ভ হয় প্রতিদ্বন্দ্বী মুষ্টিককে নিউট্রাল কোণে সরিয়ে নেবার পর থেকে। কিন্তু এখানে সে নিয়ম নাকি পালন করা হয়নি। আগেই গোনা আরম্ভ হয়েছে এবং লিষ্টন বলেছেন, তিনি গোণা শুনতে পাননি। আর ক্লে নিজেই লড়াই শেষ হবার পর বলেছেন, আমি জানতুম প্রথম রাউণ্ডেই ভাল্লুকটা কুপোকাৎ হবে। তবে এসব কথা আগে বলিনি কারণ তাতে দর্শক সমাগম কম হতে পারে।

যা হোক ক্লে তাঁর বিশ্ব বিজয়ীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, লিষ্টন হয়েছেন পরাজিত। শুধু পরাজিতই নয়, সম্ভবতঃ এখানেই তাঁর মুষ্টিযুদ্ধ জীবনের ইতি।

ক্লে এবার প্যাটার্সনকে লড়বার জন্যে আহ্বান করেছেন।

(১) এই ছবিটির মধ্যে কমপক্ষে দশটি ভুল আছে। এই ভুলগুলি কি কি তোমরা কি বলতে পারো ?

---

(২) নেত্রাক্ষরে নাম মোর অতি
দীর্ঘাকার,
পড়িলে অঙ্গের পরে, করে
হাহাকার।
প্রথম অক্ষর মোর ছেড়ে যদি
দাও,
তা'হলে তো নিজ দেহে
দেখিবারে পাও।
দ্বিতীয় অক্ষর যদি তুলে নাও
তবে,
বোলতা কি মৌমাছির বাসস্থান
হবে।
দ্বিতীয়, তৃতীয় যদি দুই-ই তুলে
নাও,
তা'হলে যা হয় ভাই, তা কি
তুমি খাও ?
খেলে হয় অপকার খাইও না
তাহা,
লিখিও 'মৌচাকে' ভাই,
ভাবিয়াছ যাহা।

—শ্রীহরিহর সিংহ

(৩) এমন একটি অর্থসমষ্টির নাম কর, যা নিয়ে একজন লোক তার চার জামাইবাড়ি যাত্রা করল। প্রথম জামাই-বাড়ি পৌঁছে তিনি সেই বাড়ির দ্বারওয়ানকে ঢোকবার সময় ১ টাকা দিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন, তারপর জামাইয়ের দিদিমাকে বাকী যা ছিল তা দিয়ে প্রণাম করতে, তিনি তাকে দ্বিগুণ দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় আবার দ্বারওয়ানকে ১ টাকা দিলেন। এইভাবে চার জামাইবাড়িতেই তাঁর এই রকম

ঘটনা ঘটল। এরপর তিনি যখন নিজের বাড়িতে ফিরলেন, তখন তাঁর হাতে একটিও পয়সাও নেই। এখন বলো দেখি, তিনি কত টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন।

—শ্রীসুনন্দা শ্রীমানী

(৫) বৃক্ষপরে বসে কিন্তু নহে পক্ষীরাজ,
কাঁদর নয় কিন্তু নব রসরাজ।
ত্রিনয়নধারী সেই নহে শূলপাণি,
পরনে বাকল, কিন্তু নহে রঘুমণি।

—শ্রীঅরুণ মুখার্জী

(৪) লোকে বলে চলে, কিন্তু নড়ি না এক পা;
ইঙ্গিতে সঙ্গীত করি, কথা কহি না;
মাঝে মাঝে কিছু কিছু কানমলা খেয়ে,
দিবারাত্র খেটে মরি বিশ্রাম না লয়ে।

——শ্রীপ্রদীপ ঘোষ

(৬) রাজার ধন মানিক পরে কে সে মহাজন
সে না হলে হয় না শুভ কর্ম সমাপন ?

—শ্রীবিবেকানন্দ চৌধুরী

(৭) সরকারী ডাক আর টেলিগ্রাফ যোগে,
হইবে অদ্ভুত সৃষ্টি—ধন্বন্তরী রোগে।

—শ্রীশান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

(উত্তর আগামী মাসে বেরোবে)

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

হরিণ, হাতী, জেব্রা, সজারু, চিতাবাঘ ও শূকর।

প্রচণ্ড দাহনে যখন শহরবাসীরা অস্থির হয়ে পড়েছে, বৃষ্টির জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষা করছে—এইরকম অবস্থায় তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বসেছি। প্রখর গ্রীষ্মের তাপ। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হতে চললো অথচ কালবৈশাখী এলো না। এই প্রখরতার মধ্যে মন যখন বিমিয়ে উঠেছে সেই সময়েই কত না ঘটনা পৃথিবীতে ঘটছে তাই শুনছি আমরা—প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই চীন পাকিস্তান হুমকি, যুদ্ধ বা আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা—এমন কত অপ্রিয় সংবাদ। এই রকম সময়ে আর একটি যে খবর ইতিমধ্যেই তোমরা অনেকে জানতে পেরেছ তা হলো হিমালয় অভিযানে সাফল্যের কথা—হিমালয় পাহাড়ের উপর উঠতে হবে—এই ইচ্ছে বহুদিন ধরে বহু লোকেরই মনের মাঝেই ছিল। বিভিন্ন সময়ে এক-একটি পর্বতারোহীর দল কত না চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নানান বাধা তাঁদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাঁদের চেষ্টা সফল হয়নি। এই তো মাত্র কয়েক বছর আগে তেনজিং-হিলারা এক বিজয় অভিযান করে সাফল্য লাভ করেছিলেন। ১৯২১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এভারেষ্ট অভিযানের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এবারের অভিযানটির কি বিশেষত্ব বলো তো? এর আগে যে সমস্ত অভিযান চালানো হয়েছিল সেগুলির নেতৃত্ব নিয়েছিলেন বিদেশীরা। যদিও সেই সব দলে কোন না কোন ভারতীয় ছিলেন। তবে তাঁরা নেতৃত্ব করেননি। কিন্তু এবারের এই অভিযানে নেতৃত্ব করেছেন সামরিক বাহিনীর জনৈক ভারতীয়। নাম তাঁর লেফটেনেণ্ট কর্নেল কোহলী। আর এই দলের উপনেতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেজর কুমার। এই অভিযানের আর একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র দু'তিন দিনের ব্যবধানে পর পর চার বার এভারেস্টের চূড়োয় ওঠেন অভিযাত্রীরা। এর আগে ১৯৬০ সালে এক অভিযান হয়েছিল কিন্তু সেটা সফল হয়নি।

ভারতবাসীর তাই আজ খুব আনন্দের দিন। অপেক্ষা করে আছি আমরা এই ভারতীয় দলের কাছে তাঁদের অভিযান কাহিনী শোনবার। ইতি—

তোমাদের **মধুদি'**

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩[illegible] বিধান সরণী, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।

রেনবো কালি
সর্বজনপ্রিয়
Rainbow
FOUNTAIN PEN
Ink
রেনবো ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ
২-২এ, আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

॥ সূচীপত্র ॥

৪৬শ বর্ষ — শ্রাবণ
৪র্থ সংখ্যা — ১৩৭২

সূচীপত্র

নতুন দিল্লীর তিন মূর্তি প্রাসাদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রথম মৃত্যুদিবস (২৭শে মে, ১৯৬৫) উপলক্ষে তাঁর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও আলোকচিত্র সমূহের যে প্রদর্শনী হয়, দর্শকদের মধ্যে দুটি মেয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে সেই চিত্রগুলি দেখছে।

★ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্ব পুরাতন মাসিকপত্র ★

৪৬শ বর্ষ] শ্রাবণ : ১৩৭২ [৪র্থ সংখ্যা

বৃষ্টিপাত!

শ্রীঅতীন মজুমদার

মেঘ থম্ থম্ আকাশটা
এলোমেলো বাতাসটা
ঝম্ ঝমাঝম্ অকস্মাৎ
সুরু হ'ল বৃষ্টিপাত।

বৃষ্টিপাত! বৃষ্টিপাত!
দিনের বেলায় ঘনায় রাত!
ডুব্‌ল জলে রাস্তাঘাট
বন্ধ হ'ল দোকানপাট।
কড়্ কড়া কড়্ পড়্‌ল বাজ
কপালটা কার ভাঙ্গল আজ!

ঘর বাড়ী সব ভাস্‌ল রে,
প্রলয় নেমে আস্‌ল রে !
থাম্‌ল ট্রাম, থাম্‌ল বাস,
হায়রে একী সর্বনাশ !
বৃষ্টিপাত ! বৃষ্টিপাত !

নেইক ছাতা—মাথায় হাত !
একটা দেখি রিক্সা যায়,
দু'গুণ ভাড়া হায় সে চায়।
পকেট যেরে গড়ের মাঠ,
নই তো আমি লাট-বেলাট।

হেঁটেই শেষে দিই পাড়ি
ভিজে ভিজেই যাই বাড়ী।
এক পা দু' পা যেই এগোই,
ছাতা মাথায় যায় কে ঐ
দেখেই আমি জোর ছুটি,
ছাতার তলায় তার জুটি।
গল্প জুড়ি তার সাথে
তার ছাতা রয় মোর মাথে !
বৃষ্টিপাত ! বৃষ্টিপাত !
পরের ছাতায় কিস্তিমাৎ !

॥ কাঠবিড়ালি ॥

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ বসু

কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি
কাঠফাটা রোদ্দুরে
সারাদিনটা টো-টো করে
কোথায় বেড়াস ঘুরে ?
দুপুরবেলা একটুও কি
ঘুম আসে না চোখে ?
একলা অমন ঘুরে বেড়াস,
কেউ বকেনা তোকে ?
তোর মত নই দুষ্টু আমি
কাঠবিড়ালি শোন,

দুপুরবেলা মায়ের কোলে
ঘুমাই সারাক্ষণ।
ঘুম না এলে লক্ষ্মী ছেলের
মতন পড়ি বই,
বিকেল হলে তবেই আমি
খেলতে বাহির হই !
কাঠবিড়ালি, দুপুর রোদে
উঠিসনে আর গাছে,
বসে বসে গল্প করি—
আয় না আমার কাছে ॥

আমার শিকার কাহিনী

(রস-রচনা)

শ্রীশতদল গোস্বামী

বার্ধক্যজনিত স্বাভাবিক কারণেই হয়ত বাঘের মৃত্যু হয়েছিল, অথবা বিষাক্ত সাপের কামড়ে সে ইহলীলা সংবরণ করেছিল, কিংবা বাঘিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জলঢাকা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। বাঘের মৃত্যুর কারণ আর যাই হোক না কেন, আমি গুলি করলেও তাকে যে হত্যা করিনি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ হলে কি হবে, বাঘ মারার কৃতিত্বটা সম্পূর্ণ আমার ঘাড়েই অযাচিত এসে পড়ল এবং রাতারাতি আমার নাম দক্ষ শিকারী হিসাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হ'ল না।

এক মাসের জন্যে জলপাইগুড়ির এই চা-বাগানে বেড়াতে এসেছিলাম। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যিই মনোরম। চারিদিকে পাহাড়বেষ্টিত এই চা-বাগানকে একটি দ্বীপ বলে মনে হয়। জলঢাকা নদী, ঝরনা, শাল-সেগুনের বন, পাহাড়ের আড়ালে মেঘের লুকোচুরি—এদের মধ্যে এসে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললাম।

দুর্গাদাস আমার আত্মীয়, তার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হতেই হয়। সে তার ক্যামেরা এবং বন্দুক আমাকে অকাতরে ব্যবহার করতে দিল। ফোটো তোলার কৌশল যত্ন করে শিখিয়ে দিল। আমিও আগ্রহ করে শিখলাম। কিন্তু বন্দুক আর রপ্ত হয় না কিছুতেই। দুর্গাদাস অভয় দিয়ে বলল, লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপলে লক্ষ্যভেদ নিশ্চিত।

লক্ষ্য স্থির করে যথারীতি ট্রিগার টিপে চলেছি এবং যথারীতি ঝাঁকুনি খেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছি। একটা পাখিও ঘায়েল করতে পারিনি। সুতরাং রোখ চেপে গেল, লক্ষ্যভেদ করতেই হবে।

বন্দুক হাতে আমি একা একাই ঘুরে বেড়াই বনে-জঙ্গলে গহন অরণ্যে। পাখির পেছনে ধাওয়া করে বেড়াই। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! গুলিই শুধু খরচ হয়, পাখি আর মারা পড়ে না কিছুতেই। বলা বাহুল্য, লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নিরীহ পাখিই বেছে নিয়েছিলাম, কুকুর, বেরাল, হাঁস কিংবা দুর্গাদাসের পোষা হরিণ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে হয়ত এতদিনে সাফল্য অর্জন করতে পারতাম।

সেদিন যথারীতি পাখি শিকার করতে ঢুকেছি বনে এবং পাখির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে ছুটতে হাজির হয়েছি একেবারে হিংস্র জলঢাকা নদীর কিনারে। হঠাৎ দেখলাম, অনেকগুলি শকুন বড় বড় পাথরের উপর বসে জটলা করছে। আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আর যা দেখলাম, তাতে আমার চক্ষুস্থির! দেখলাম, একটি মাঝারি সাইজের বাঘ চার হাত-পা উঁচু করে চিৎ হয়ে মরে পড়ে আছে। শকুনেরা তার মাংস ভাগাভাগির পরিকল্পনা করছে। আমাকে দেখে তারা একবার ভ্রূকুটি করল মাত্র, সরেও বসল না।

কি খেয়াল হ'ল, ভাবলাম, এতদিন তুচ্ছ পাখি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি, এবার হাতের কাছে বিরাট লক্ষ্যবস্তু পেয়েছি—তা সে মৃতই হোক, বাঘ তো! একে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে হাতের 'এম'টা ঠিক করে নিই। বেশ মনে আছে, গোটা দশেক গুলি করেছিলাম, তার মধ্যে কটা লেগেছিল, মনে নেই। এতগুলি গুলির আওয়াজে শকুনেরা উড়ে গেল, চা-বাগানের বাবুরা এবং কুলী-কামিনরা হৈ হৈ করতে করতে ছুটে এলো।

দুর্গাদাস জোর করে আমার একখানা ফোটো তুলে নিল।

তারপর।

তারপর আমাকে কাঁধে করে কুলীদের সে কি উদ্দাম নৃত্য। উদয়শংকরকে পর্যন্ত হার মানায় তারা। তাদের 'দুশমন'কে ঘায়েল করেছি, সুতরাং আমি তাদের কাছে 'দেওতা'। দেবতার পায়ে অনেকগুলি মুরগীও তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে উপহার দিয়ে গেল।

দুর্গাদাস জোর করে আমার একখানা ফোটো তুলে নিল। বাঘের পেটে পা ঢুকিয়ে বন্দুক হাতে বুক ফুলিয়ে আমি হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

বাঘটাকে কুলীরা উপরে বেঁধে আনবার ব্যবস্থা করছিল, অকস্মাৎ জলঢাকা নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মুখে চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে খড়কুটোর মতো সে যে কোথায় ভেসে গেল, তার পাত্তা পাওয়া গেল না।

আমার সেই সচিত্র বাঘ-শিকার কাহিনী খবর কাগজে ফলাও করে ছাপা হ'ল। সাধারণ একটা রোগা জির-জিরে বুড়ো বাঘকে 'নরখাদক' বলে পরিচয় দেওয়া হ'ল। সে যে কত ডজন মানুষ খুন করেছে, কত গোরু-ঘোড়া-মোষ-ছাগল মেরেছে—তার একটা দীর্ঘ তালিকা বার হ'ল, এবং তিন হাত বাঘকে টেনেটুনে ছ'হাত লম্বা করা হ'ল। সংবাদদাতার এই বিস্ময়কর কেরামতি দেখে আমি তাজ্জব ব'নে গেলাম।

এবং তেনজিং-এর মতো আমার নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

দুর্গাদাস আফসোস করে বলল, বড়দা, একেই বলে বরাত! বাঘ মারব বলে বন্দুক কিনলাম, এই দশ বছরের মধ্যে একটা বাঘও চোখে পড়ল না। আর তুমি কিনা বলা নেই কওয়া নেই, দু'দিন বন্দুক ছোড়া শিখে আর কিছু না সটান বাঘ মেরে নাম কিনে ফেললে!

তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, যা বলেছ! সত্যিই বরাত বলতে হবে। তা না হলে আমার মতো একজন আনাড়ি শিকারী পাখি-মারা গুলি দিয়ে বাঘ মারতে পারব, এ-আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। বাঘেরও ছিল। এটা দৈব-ঘটনা কিংবা অলৌকিক দুর্ঘটনাও বলতে পার। যা তোমার খুশি।

দুর্গাদাস বলল, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি বড়দা, এখন মনে পড়ল। আমাদের এ-অঞ্চলের প্রসিদ্ধ শিকারী রাধেশ কর তোমার সঙ্গে দু-একদিনের মধ্যেই দেখা করতে আসবেন, খবর পাঠিয়েছেন। তিনি তোমার কাছ থেকে শিকারের খুঁটিনাটি কৌশল জেনে নিতে চান।

আমি চমকে উঠলাম, ঘাবড়েও গেলাম সেই সঙ্গে। তবু সপ্রতিভ মুখেই বলতে হ'ল, তা কি করে হয়? আমি যে আজই কলকাতা রওনা হচ্ছি!

দুর্গাদাস যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, অসম্ভব! আগামী রবিবার তোমার 'অনারে' এখানে একটা বিরাট ফীস্টের আয়োজন করেছি। আশপাশের বাগান থেকে অনেক ভদ্রলোক আসবেন। গান-বাজনা হবে। আমার কন্যা কণা তো রীতিমত গলা সাধা শুরু করে দিয়েছে।

বললাম, তা হোক। আমাকে যেতেই হবে।

দুর্গাদাস ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, তুমি যাবে সে জানি, বেশিদিন কেউ এখানে এসে থাকতে রাজী হয় না। এক মাসের জন্যে বেড়াতে এলে, মাসটা অন্তত কাটিয়ে যাও। হঠাৎ চলে যেতেই বা চাইছ কেন, বুঝতে পারছি না।

কেন যে চলে যেতে চাইছি তার বিশদ ব্যাখ্যা করা যায় না। এই মিথ্যা-খ্যাতির নায়কের বিবেক অতি তীব্র ভাবেই দংশন করে তাকে পালানোর ইঙ্গিত করছে। অথচ, সত্য প্রকাশের পথটাও রুদ্ধ। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের রোমাঞ্চকর কাহিনী এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে যে এখন প্রতিবাদ করলেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

দুর্গাদাস তাড়া দিল, কই, আমার জবাব দিলে না তো বড়দা?

আমতা-আমতা করে বললাম, কলকাতায় একটা জরুরী কাজ ফেলে এসেছি। এখন না গেলে কাজটা পণ্ড হয়ে যাবে।

কৈফিয়ৎটা যে খুব জোরালো হ'ল না, বুদ্ধিমান দুর্গাদাস সেটা হয়ত বুঝতে পেরেছিল। তবু আমাকে থেকে যাবার জন্যে আর পীড়াপীড়ি করল না, গুম হয়ে বসে রইল।

চা-বাগানের সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে, দু-বেলা মুরগী খাওয়ার প্রলোভন ত্যাগ করে আমি ভাঙ্গা মন নিয়ে কলকাতায় রওনা হলাম। ভয় ছিল, পথে আবার রাধেশ করের সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়, দেখা হলেই তো শিকারের খুঁটিনাটি কলাকৌশল তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে। আশঙ্কা ছিল, আশপাশের চা-বাগানের বাবুরা আমার হাত ধরে টানাটানি শুরু করে না দেন, আর বলে না বসেন, এদিক দিয়ে যাচ্ছেনই যখন, আমাদের বাগানের দু-চারটে বাঘ-ভালুক মেরে দিয়ে যান। কেউ অনুরোধ করলে আমি আবার না বলতে পারি না। কেমন যেন চক্ষুলজ্জায় বাধে। ঐ তো আমার দোষ!

ভেবেছিলাম, কলকাতায় ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। তা আর হ'ল না। ফিরে আসতে না আসতেই বন্ধুরা উন্মত্তের মতো আমাকে ছেঁকে ধরল। তাদের সহর্ষ অভিনন্দন, ফুলের মালা এবং পিঠ চাপড়ানোর পৃষ্ঠপোষকতার ফলে প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। নরখাদক বাঘ মেরেছি আমি, সুতরাং আমি কেউকেটা নই।

পিনাকী সবজান্তার মতো মুখ করে বলল, জানতাম, জানতাম, শান্তনু যে অসাধ্যসাধন করবে—সে বিষয়ে আমার সন্দেহই ছিল না কোনদিন। ছাই-চাপা আগুন কি লুকিয়ে থাকতে পারে বেশি দিন? পারে না।

কেষ্ট নতুন গান শিখছে। সে বলল, শান্তনুদা, আপনার সম্পর্কে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখে দিন। আমি সুর দিয়ে তাকে অমর করে রাখব।

কয়েকটি কিশোর জিজ্ঞেস করল, তারা যদি তাদের পাড়ার ফ্রী-রীডিং লাইব্রেরীর নাম পালটে 'শান্তনু রায় মেমোরিয়াল লাইব্রেরী' রাখে—তাতে আমার আপত্তি আছে কিনা!

অতনু জোরের সঙ্গে বলল, এবার রাষ্ট্রপতি-পদক তোর ভাগ্যেই জুটবে, বলে রাখলাম।

স্থানীয় স্কুলের হেডপণ্ডিত মুখ বিকৃত করে বললেন, চিরটা কাল সংস্কৃতে গোল্লা পেয়ে এসেছে ও, উনি আবার বাঘ মারবেন! 'লতা' শব্দ আগাগোড়া মুখস্থ বলুক দেখি, বুঝব কেরামতি।

প্রচণ্ড করতালির মধ্যে গেম-সেক্রেটারী সহাস্যে ঘোষণা করলেন, শান্তনুকে আমাদের ফুটবল টীমের ক্যাপ্টেন করে নেওয়া হ'ল।

অনেকগুলি ক্যামেরার সামনে গলায় মালা প'রে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। কিশোর-কিশোরীদের অটোগ্রাফ খাতায় বাণী দিতে হল: বড় হয়ে বাঘ মেরো।

পরদিন সন্ধ্যায় আমাদের স্কুল-প্রাঙ্গণে পাড়ার নাগরিকবৃন্দ আমাকে সম্বর্ধনা জানালেন। এক-একজন বক্তা আমার অসাধারণ সাহস আর অটুট মনোবলের ভূয়সী প্রশংসা করে নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। আমার বীরত্ব সম্পর্কে কত অসম্ভব কাহিনী তাঁরা অনর্গল বলে গেলেন,

আর আমি নির্লিপ্ত উদাসীনের ভান করে কান খাড়া করে সেগুলি উপভোগ করলাম। শুনে রোমাঞ্চ হ'ল।

সম্বর্ধনার উত্তরে এবার সবিনয়ে আমাকে কিছু বলতে হবে। বলতে হবে আমার শিকারের অভিজ্ঞতা। সুতরাং বলতে হ'ল—

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও বালকবৃন্দ,—আপনারা আমার বাঘ মারার কাহিনী শুনতে চেয়েছেন। কিন্তু বাঘ বড় হলেও, এর কাহিনী অতি ক্ষুদ্র। আর সে-কাহিনী আপনারা কাগজে পড়েছেন, বিভিন্ন বক্তার মুখে আবার তা শুনলেন। আমি আর নতুন কি বলব ? পাখি শিকার করতে গিয়েছিলাম বনে, ঘুরতে ঘুরতে লোকালয় বর্জিত হিংস্র জলঢাকা নদীর তীরে এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই বাঘের হুংকারে চমকে উঠেছিলাম। সে কি হুংকার! হুংকার দিয়েই সেই সুবৃহৎ বাঘটি বড় একটি পাথরের উপর থেকে আমার মাথা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল, আমিও তৎক্ষণাৎ একটি গুলিতে তাকে ঠাণ্ডা করে দিলাম।

ঘন ঘন হাততালি দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করা হ'ল। আমিও মহা-উৎসাহে আবার শুরু করলাম—

এই বাঘ মারার পর আমি আরও আটটি বাঘ মেরেছি তিন দিনে। তা ছাড়া, হরিণ-শুয়োর-ভালুক-সম্বর কত যে মেরেছি তার হিসেব দিতে পারব না। ছোট একটা গণ্ডারও ঘায়েল করেছি। কিন্তু চা-বাগানের কাউকে জানাইনি। কারণ, ওখানকার লোকেরা অত্যন্ত হুজুগপ্রিয়, বিশেষ করে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য। দুর্গাদাস যদি কোনক্রমে একবার জানতে পারত আমি এত কাণ্ড করেছি, তাহলে হৈ হৈ কাণ্ড শুরু করে দিত আর প্রত্যেকটি মৃত জন্তুর পেটে আমার পা ঢুকিয়ে হাতে বন্দুক দিয়ে ফোটো তুলে নিত এবং খবরের কাগজে সেগুলি ফলাও করে ছাপিয়ে দিত। সেখানেই আমার আপত্তি! কারণ, আমি নামের কাঙাল নই। একটা বাঘ শিকারের গল্প পড়েই লোকে আমাকে নিয়ে যে-ভাবে নেত্য-নাচন শুরু করে দিয়েছে, এর পরে যদি আরও ধারাবাহিক শিকারের গল্প বার হ'ত, তাহলে তাদের প্রশংসা আর অভ্যর্থনার ঠেলায় সত্যিকথা বলতে কি, আমি পাগল হয়ে যেতাম।

…কি বলছিলাম? হ্যাঁ, হাতে বন্দুক নিয়ে হিংস্র বন্যজন্তু শিকারে আনন্দ নেই। ও যে কেউ পারে, এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশুরা পর্যন্ত ইচ্ছে করলে করতে পারে। বাঘ লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলে বাঘ মরবেই, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং এতে একমাত্র প্রাণী-হত্যা ছাড়া আর কোনও কৃতিত্ব নেই। কৃতিত্ব আছে সেখানেই, যেখানে নিরস্ত্র অবস্থায় শুধুমাত্র উপস্থিত বুদ্ধি আর কৌশলের সাহায্যে অনায়াসে আত্মরক্ষা করা যায়।

—আপনি নিরস্ত্র অবস্থায় হিংস্র জন্তুর পাল্লায় পড়েছিলেন নাকি? কি কৌশলে আর উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন, অনুগ্রহ করে বলবেন আমাদের সে-গল্প?

—বলব, বলব। বলতেই তো এসেছি। হ্যাঁ, উপস্থিত বুদ্ধি আর কৌশলের কথা বলছিলাম। যে-দিন আমি চা-বাগান থেকে ফিরি, সেদিনই এই অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছিল। চা-বাগান থেকে রেল-ষ্টেশনের দূরত্ব প্রায় বারো কিলোমিটার। দুর্গাদাস লরীতে করে আমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। আমি রাজী হইনি। তার অনুরোধ এড়িয়ে আমি একাই স্যুটকেস হাতে রওনা দিলাম। পূর্ণিমা রাত্রি। চাঁদের আলোয় পথঘাট দিনের মতোই উদ্ভাসিত। নির্জন রাস্তা দিয়ে আপন মনে গুন্‌গুন্ করতে করতে চলেছি, 'হিলা-ঝোরা' পুলের উপর উঠেই কিন্তু আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হ'ল। দেখলাম, আমার সামনে দশ-বারোটি হিংস্র জন্তু স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর আমার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করছে।

—কি জন্তু, বাঘ নাকি?

—না, হাতি।

—কি সর্বনাশ! হাতি? তারপর?

—এক-একটা হাতির চেহারা ছোটখাটো পাহাড়ের মতো। কি কদর্য দেখতে! সম্ভবত ওরা দলবেঁধে জল খেতে চলেছিল ঝরনায়। একটা দ্বি-পদ 'শত্রু'কে এত কাছাকাছি দেখে ওদের মধ্যে জিঘাংসা জেগে উঠল। ওরা গজেন্দ্রগমনে আমার দিকে এগুচ্ছিল—একবার নাগাল পেলে শুঁড়ে জড়িয়ে তাদের পায়ের তলায় ফেলে পিষে মেরে ফেলবে—এই ছিল তাদের মতলব।

—তারপর? তারপর? অধৈর্য শ্রোতারা প্রশ্ন করলেন, কি করলেন তারপর?

মৃদু হেসে বললাম, উপস্থিত বুদ্ধি খাটালাম। আমি শান্তনু রায়, নিরস্ত্র হলে কি হবে, অত সহজে হার স্বীকার করতে রাজী নই। আমি চট করে স্যুটকেস খুলে ফেললাম এবং এমন একটি জিনিস বা'র করে হাতিদের চোখের সামনে মেলে ধরলাম যে, চক্ষের পলক ফেলতে না ফেলতে বাছাধনেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দিল। একটা বাচ্চা হাতির ছন্দপতন ঘটল, পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে হাত-পা ভাঙলো, সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এবং কাঁদতে কাঁদতে তার গার্জেনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। আমিও নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় গুন্‌গুন্ করে একটা শ্যামা-সঙ্গীত গাইতে গাইতে ষ্টেশন অভিমুখে হাঁটতে লাগলাম। বুঝলেন, একেই বলে উপস্থিতবুদ্ধিতে মৃত্যুর হাত থেকে ফেরা।

অধৈর্য শ্রোতারা পুনরায় প্রশ্নবান নিক্ষেপ করলেন, আপনি স্যুটকেস থেকে কি বার করে দেখালেন হাতিদের?

একটা আত্মপ্রসাদের গর্বিত হাসি ফুটে উঠল আমার মুখে। বললাম, বিশেষ কিছু নয়, সেই

খবর-কাগজ। বাঘের পেটে পা-ঢোকানো, হাতে বন্দুক—আমার সেই ফোটো দেখেই হাতিদের এমন চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিল যে, দ্বিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটলোকের মতো উত্তেজিত হয়ে উন্মত্তের মতো ছুটে পালিয়েছিল। শিকারীর ফোটো দেখেই এই, শিকার কাহিনী পড়লে না জানি তাদের অবস্থা আরও কতদূর শোচনীয় হ'ত—তাই ভাবি!

* হাসি *

শ্রীনির্মল ভট্ট

চিলে-কোঠার ঘুল্‌ঘুলিতে লক্ষ্মীপেঁচার বাসা।
খাঁদা নাকে নোলক-পরা বৌটি বটে খাসা॥
নাকটি বৌয়ের হলেও বোঁচা চোখ দুটি টুলটুল।
হাস্‌লে পরে ঠোঁটের থেকে ঝরে মোতির ফুল॥
শীতের ভোরে শিউলিতলায় ছড়িয়ে ফুলের রাশি।
তারি ভেতর কুড়িয়ে পেলাম লক্ষ্মী বৌয়ের হাসি॥
আঁজলা ভোরে তুল্‌তে গেলাম আন্‌তে ঘরের কোণে।
চল্‌কে উঠে ছড়িয়ে প'ল চরের কাশের বনে॥
লক্ষ্মী বৌয়ের হাসির ছোঁওয়ায় উথ্‌লে ওঠে প্রাণ।
শীতের ভোরের হিমেল হাওয়ায় ডাক্‌ল খুসীর বান॥
খুসীর হাওয়া লাগলে পালে নৌকো ওঠে দুলে।
ঢেউয়ের হাসির কাঁপন জাগে নদীর কূলে কূলে॥
হাসির আলো পড়্‌ল এসে শিশির-ভেজা ঘাসে।
চিলে-কোঠার ঘুল্‌ঘুলিতে লক্ষ্মীপেঁচা হাসে॥

এভারেষ্ট শিখরে চারবার

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশিখর এভারেষ্টের চূড়ায় ২৯,০২৮ ফিট উচ্চে ভারতীয় অভিযাত্রীদলের একজন ভারতের জাতীয় পতাকা পুঁতে সগৌরবে বিজয়বার্তা ঘোষণা করছেন।

হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করবার জন্যে মানুষ অনেক বৎসর ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করে কৃতকার্য হয়েছে, এটা আমরা সকলেই জানি। এর মধ্যে দুঃসাহসিকতা, বীরত্ব ও একাগ্রতা যে প্রচুর পরিমাণে আছে তা আমরা সকলেই স্বীকার করি। এই বৎসর, অর্থাৎ ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে এভারেষ্টের চূড়ায় পুনর্বার কেবলমাত্র ভারতীয় দল পর পর চারবার উঠতে পেরেছে— এটা একটা বিশেষ দুঃসাহসিক ঘটনা যা তোমাদের সকলেরই জানা উচিত।

১৯২১ খৃষ্টাব্দ হ'তে এভারেষ্টে ওঠবার প্রথম প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল জন্ হাণ্টের অধীনে একটি ইংরাজ দল ২৯শে মে তারিখে সর্বপ্রথম এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গে ওঠে। যে দু'জন উঠতে পেরেছিল তাদের নাম তেনজিং ও হিলারী। এঁরা দু'জন ২৯,০২৮ ফিট উঠেছিলেন। ১৯৫৬খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের তৃতীয় দল ২৩শে এবং ২৪শে মে—এই দু'দিন সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠতে পেরেছিলেন।

কথিত আছে, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে একটি চীনদেশীয় দল এই পর্বতচূড়ায় উঠতে পেরেছিল—যদিও এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে একটি আমেরিকান দল সাউথ কোল দিয়ে এই গিরিশৃঙ্গে উঠেছিলেন। তারপর সর্বশেষ ১৯৬৫-র মে মাসে ভারতীয় এভারেষ্ট অভিযাত্রীরা পর পর চারবার শীর্ষে আরোহণ ক'রে একটি রেকর্ড স্থাপন করেন। তাঁদের এই অতুলনীয় কৃতিত্ব সম্ভব হয়েছিল একত্র কাজ করার জন্য। তাছাড়া, এর সঙ্গে ছিল সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা, সুসংযত নেতৃত্ব, শেরপাদের সাহসিকতা এবং সর্বোপরি দলের শীর্ষারোহী ন'জন সদস্যের অসীম পর্বতারোহণ যোগ্যতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও নির্ভীকতা। তাঁদের এ অভিযান শুধু মাত্র শৃঙ্গ-বিজয় অভিযান ছিল না—তাদের মধ্যে ছিল তীর্থযাত্রীর মনোভাব। হয়ত বা তাঁদের এই মনোভাবের জন্যেই হিমালয়ের রাণী এভারেষ্ট শৃঙ্গ সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ-স্বরূপ দলের গলায় চার-চারবার চারটি জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছেন।

২০শে মে সকাল সাড়ে ৯টায় প্রথম ভারতীয় দলের ক্যাপটেন এ. সি. চীমা ও নওয়াঙ গোম্বু এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন। তার ঠিক দু'দিন পরে বেলা সাড়ে ১২টায় শীর্ষে আরোহণ করেন সোনাম গিয়াৎসো ও সোনাম ওয়াঙ্গিয়াল। এঁরা যথাক্রমে দলের বৃদ্ধতম ও কনিষ্ঠতম সদস্য। আরও দু'দিন পরে সি. পি. ভোরা ও আং কামি শীর্ষে আরোহণ করে হ্যাট্রিক করেন। তারপর ২৯শে মে দলের আরও তিনজন সদস্য—ক্যাঃ আলুওয়ালিয়া, এইচ. সি. এল. রাওয়াট ও সর্দার ফু দোরজি শীর্ষে আরোহণ করে পর্বতারোহণের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

গত এপ্রিলে সাউথ কোলে পৌঁছোনর পর সাময়িকভাবে এই অভিযাত্রীদল দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাষ পেয়ে বেস ক্যাম্পে নেমে আসেন। এই সর্বভারতীয় দলের নেতা ছিলেন লেঃ কমানডার কোহেলি। আবহাওয়ার যতটা সদ্ব্যবহার করা যায় তৎটাই তিনি করেন। তাঁর অসীম ধৈর্য, সাহস, আস্থা এবং অতুলনীয় নেতৃত্বের জন্যেই ভারতীয় অভিযাত্রীরা এবং সমগ্র ভারত আজ এতটা গর্ব বোধ করতে পারছে।

বুদ্ধের বাণী

ক্রোধকে ক্রোধের দ্বারা, অসাধুকে সাধুতার দ্বারা, কৃপণকে দানের দ্বারা এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যের দ্বারা জয় করবে।

*　　*　　*

লোহা থেকে উৎপন্ন মরচে যেমন লোহাকেই নষ্ট করে, তেমনি ধর্মত্যাগীদের নিজের কাজই তাকে দুর্গতির মধ্যে নিয়ে যায়।

হাতী রমজান

জগন্নাথ পণ্ডিত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নওয়াব একবার মুখ বেঁকিয়ে বল্লে—"রমজান লড়ো।" হুকম পাবামাত্র রমজান বাঘের মত গর্জ্জিয়ে, তোপের মতো আওয়াজ করে তাল ঠুকে ভীষণ দাপটের সঙ্গে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে আখড়া তোলপাড় করে ফেল্লে। সত্তুপুরের ওস্তাদও তাল ঠুকবার, পাঁয়তারা কষবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তখন তার ধড় থেকে জান বেরোবার মতো হয়েছে, পা আর চলে না, হাত আর নড়ে না।

দু'চার-দশবার লাফালাফি করে হঠাৎ মোড় ঘুরে ভয়ানক তেজে হুমকী দিয়ে রমজান ভুট্টা সিং-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভুট্টা সিং ঝুঁকে, দু' পা ফাঁক করে, হাথ এগিয়ে রমজানের হমলা (আক্রমণ) সামলাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার হাথ পুরো এগোবার আগেই রমজানের দুই লম্বা হাথ তার ঘাড় গর্দান বেড়িয়ে, পিঠের উপর দিয়ে ঘুরে, তার দুই বাজু চেপে ধরলো। তাকে এরকম করে ধরে রমজান খানিক চুপ করে দাঁড়ালো। তারপর দুই ঝাঁকিতে সত্তুপুরের ওস্তাদের পা মাটি থেকে ছাড়িয়ে এক ঝটকায় তাকে মাথার উপর শূন্যে তুলে ধরল! চারিধার তখন চুপ, সবাই দম বন্ধ করে দেখছে যে কি হয়।

তারপর "বিসমিল্লাহ্" বলে রমজান ভুট্টা সিংকে জোরে আছড়িয়ে ফেলে দিলো।

ভুট্টা সিং দাঁতে দাঁত লেগে বেহুঁস অবস্থায় চিত হয়ে পড়ে রইলো।

নওয়াব হুকম দিলে—"হাথি লাও, রমজানকে শিকলি বাঁধো। আর একে ডুলিতে কোরে নিয়ে গিয়ে হকিম বৈদ্ (বৈদ্য) দেখাও।"

দু'দিন পরে ভুট্টা সিং-এর জ্ঞান হোলে সত্তুপুরের রাজার লোকেরা তাকে নিয়ে দেশে ফিরলো। সাগিদরা তো পালিয়ে গিছলো, তারা সরমের (লজ্জার) দরুণ আর দেশে ফিরলো না।

নওয়াব রাজাকে চিঠ্ঠি দিলো—হুজুরের পালোয়ানকে ঠিক মত কুস্তি শিখাতে পারলাম না। এ-লোকের সাহস আছে কিন্তু এ নেহাত কমজোর, একজন জোয়ান মরদ যদি পাঠাতে পারেন তো তাকে শিখ্‌লিয়ে দেবো।"

চিঠ্ঠি পেয়ে রাজার মাথা হেঁট হোলো। রাজা সভাসদ সকলকে বল্লে—"দশ হজার লাগে, পচাশ হজার লাগে, রমজানকে হারাতে পারে এমন পালোয়ান চাই। এ অপমানের শোধ না দেওয়া পর্যন্ত আমি আর মাথায় পাগড়ি লাগাব না।"

—এতদূর বলে দারোয়ানজী একটু দম নিলে। এই সুযোগে কালু মণ্টুকে বল্লে—"কি রে, তোর ব্যাটলিং প্যাট হাতী রমজানের সঙ্গে পারতো?"

মণ্টু একটু দমে গিয়েছিল। সে ঢোক গিলে বল্লে—ব্যাটলিং প্যাট তো মিডল ওয়েট, সে পারতো না, তবে ডেম্পসি কিম্বা টুনি হলে কি হোতো বলা যায় না!"

দারোয়ানজী জিগ্যেস করলে—ডেমসি কে?"

কালু বল্লে—সে মার্কিন দেশের এক মস্ত ঘুষো লড়িয়ে।"

দারোয়ানজী বল্লে—"হোঃ, মার্কিন! রমজান তাকে ঠিক মার্কিন কাপড়ের মতো ফেড়ে দুই টুকরো করে দিত।"

গনেশ বল্লে—"হাঁ হাঁ তা হবে। তারপর কি হোলো বলো না।" দারোয়ান বল্লে—"রও বাবা, এগটু খইনি খাইয়ে লিই।"—বলে একটু খইনি মুখে দিয়ে সে ফের আরম্ভ করলে—"তারপর তো সত্তুপুরের রাজার লোক চারিদিকে ছুটলো। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, মূলতান, আগ্রা, দিল্লী, লাহৌর, বম্বই—সব দেশে লোক গেলো। কিন্তু কোনও পালোয়ান রমজানের সঙ্গে লড়তে রাজী হোলো না। সবাই বলে, "জিতলে তো অনেক পাবো, কিন্তু মরে গেলে জান ফিরে দেবে কে?"

এদিকে সত্তুপুরের রাজ (রাজত্ব) তো অচল হোয়ে গেলো। রাজার মাথায় পাগড়ি নেই, কাজেই দরবার হয় না, লোক সব হয়রান হয়ে গেলো।

কিছুদিন যায়, তারপর একদিন সত্তুপুরে এক সন্ন্যাসী এলো। সন্ন্যাসী যেখানে যায় সেইখানেই হায় হায় শোনে। শেষে সে একদিন জিগ্যেস করলে, হয়েছে কি? তাকে লোকে সব কথা বলতে সে বল্লো—"আচ্ছা, এর উপায় আমি করছি।" এই বলে সে সটান রাজার সামনে গেল। সেখানে গিয়ে সন্ন্যাসী "মহারাজের জয় হোক" বলে আশীর্বাদ করতে রাজা বল্লে—"ঠাকুর! হেরে অপমান হয়ে তো বসে আছি। জয় হবার তো কিছু লক্ষণ দেখছি না।"

সন্ন্যাসী বল্লে—"মহারাজ আমি সব শুনেছি। কেউ রমজানের সঙ্গে লড়তে চায় না তাও জানি। তবে যে লোক লড়তে পারে তার কাছে লোক গিয়েছিল কি?"

রাজা উজির সর্দার সবাই মুখ উঁচিয়ে জিগ্যেস করলে—"কে সে বাহাদুর মরদ?"

সন্ন্যাসী বল্লে—"নেপালের সেরা ওস্তাদ ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে; সে জানে আড়্‌-ঢাই প্যাঁচ, তার দেড় প্যাঁচে সে দুনিয়ার সব পালোয়ানকে হারিয়েছে। তার হাতে আছে এখনো পুরা এক প্যাঁচ।"

রাজা একথা শুনে উজীরের মুখের দিকে তাকালো। উজীর বল্লে—"আড়্‌-ঢাই প্যাঁচ ভেট্‌কুয়ারের নাম আমরা শুনেছি। তবে সে ওস্তাদ কারুর কথায় বা খাতিরে লড়ে না তাই তার কাছে লোক যায়নি।"

সন্ন্যাসী একটু হেসে বল্লে—"ঠিক। তবে সে আমার ভক্ত, আর মহারাজের বাপও আমাকে

ভক্তি করতেন, কাজেই আমি এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" এই বলে সন্ন্যাসী তার গায়ে বাঘছাল থেকে অল্প চারটি লোম ছিঁড়ে নিলো আর ঝুলি থেকে একটা শুকনো আমলকী বা করলে। এইগুলো রাজার হাতে দিয়ে সে বল্লে—"তোমার লোকের মারফত এক চিঠি আর এক নিশান (চিহ্ন) দাও পাঠিয়ে ভেটকুয়ারকে, আর চিঠিতে লিখো যে, বাবা টঙ্করনাথের হুকুম তুমি হাজির হও।"

এই বলেই "মহারাজের জয় হোক" বলে সন্ন্যাসী হন হন করে চলে গেলো। না নিল ভিক্ষা, না নিল দান। যা হোক সেদিনই তো সত্তুপুর থেকে লোক রওয়ানা হোলো নেপালে। দু' তিন হপ্তা পরে সব লোকজন এলো ফিরে, আর তাদের সঙ্গে এলো ভেটকুয়ার পাঁড়ে।

সাড়ে তিন হাথ লম্বা মানুষটা, তার মাথায় দেড় হাথ পাগড়ি, তিন হাথ ছাতির বেড়, জাংঘ বরাবর লম্বা হাথ, ছোট ছোট বেঁকা পা,—তার ধড়টা যেন পাঁচ হাত লম্বা জোয়ানের মত; পা দুটো যেন ছোট ছেলের, মুখে শিকারী বিল্লির মত মোছ আর উঁচু হাড্ডিদার গালের উপর ছোট ছোট চোখ। কথায় কথায় সে হাসে, আর হাসলেই তার চোখ যায় লুকিয়ে, এই রকম তো ভেটকুয়ার পাঁড়ের চেহারা। সে যখন সভায় এসে সেলাম করে "মহারাজ কী জয় হোক" বলে দাঁড়ালে, তখন সভাসুদ্ধ লোক তো তাকে দেখে অবাক।

ভেটকুয়ার পাঁড়ে ব্যাপার বুঝে একটু হেসে বল্লো—"আমার আছে আড়্ঢাই প্যাঁচ। এ পর্যন্ত দেড় প্যাঁচের বেশীর খরিদ্দার জোটেনি। হুজুরের কৃপায় পুরা আড়্ঢাই প্যাঁচের খরিদ্দার পাই তো খুশী হয়ে দেশে ফিরে যাব।"

এ কথায় রাজার ভরসা বাড়লো। সে তখনি পাঁড়েজীর দরুন বলম্বটেরের লওয়াবের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিল। চিঠিতে লেখা ছিলো—"শিখ্বার জন্যে যাকে আপনার কাছে পাঠালাম, তাকে তো আপনার পালোয়ান যা জানে তাই শিখ্লালো। এখন আপনার পালোয়ানকে শিখ্লাবার জন্যে আমার কাছে লোক মওজুদ। যদি হুজুরের অনুমতি হয় তো তাকে পাঠাই।"

লওয়াব চিঠি পড়ে রেগে লাল হয়ে উঠলো। তারপর একটু হেসে জবাব দিলো—"বেশ বেশ। ওস্তাদকে পাঠিয়ে দিন। যদি হুজুরের দেশে রমজানকে শিখলাবার মতো ওস্তাদ কেউ থাকে তো সে শিখিয়ে যাবে। শিখ্লাবার মতো জ্ঞান যদি তার না থাকে, তা হলে সে ফিরে যাবে কি না সন্দেহ।

রাজা ভেটকুয়ারকে জবাব পড়ে শুনালো। শুনে পাঁড়েজী চোখ মুঁজে দাঁত বার করে হেসে বল্লো—"সবই তো বাবা টঙ্করনাথের হিচ্ছা (ইচ্ছা)! শিখতে হয় শিখবো। শিখ্লাতে হয় শিখ্লাবো।" তারপর লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে ভেটকুয়ার পাঁড়ে একদিন বলম্বটেরের দরবারে হাজির হোয়ে সেলাম করলে।

তার সাড়ে তিন হাত শরীরের উপর দেড় হাত পাগড়ী। এই অদ্ভুত চেহারা দেখে নওয়াবের দরবারসুদ্ধ লোক তো হেসে উঠলো। ভেট্‌কুয়ার এদিক-ওদিক দেখে, নওয়াবের দিকে ফিরে, চোখ মুঁজে, দাঁত বের করে খুব জোর হাসলো। তার হাসির চোটে সবাই অবাক হয়ে চুপ করে গেলো। তখন সে ফের নওয়াবকে সেলাম করে বল্লে—"আমাকে দেখে হুজুর আর হুজুরের দরবারের সকলের এত আনন্দ হোয়েছে দেখে বড্ডে খুশী হলাম। এখন সরকার (প্রভু) আজ্ঞা করুন আপনার পালোয়ানও আমায় খুশী করুক।

নওয়াব বল্লে—"বেশ, বেশ, কালই হোবে।"

পরদিন সেই আগেকার মত ভিড় গণ্ডগোল বাধলো। আবার নওয়াব এসে ভেট্‌কুয়ারকে লড়বে কিনা জিগ্যেস করলে। তারপর তাকে তৈরী হতে বলে, রমজানকে আনতে হুকুম দিলে। ভেট্‌কুয়ার যখন তৈরী হয়ে আখড়ায় নামলো, তখন তাকে দেখে নওয়াবের একটু চোখ ফুটলো। নওয়াব দেখলে যে, তার পা দুটো ছোট আর বেঁকা, কিন্তু তার বদনটা (দেহ) অসম্ভব হিম্মতি জোয়ানের। তার ঘাড়-গর্দান, ছাতী, পিঠ সব যেন পেটা লোহার তৈরী, আর সব জায়গায় যেন বড় বড় সাপ খেলে বেড়াচ্ছে। তার হাথ দুটো তো যেন দুটো জ্যান্ত অজাগর সাপ।

কালু বল্লে—"সাপ কিরে? কি বলে?"

মণ্টু তাচ্ছিল্য করে বল্লে—"বুঝলি না! মসল্ প্লে।"

দারোয়ানজী তাদের দিকে একটু তাকিয়ে ফের বলতে লাগলো—"এদিকে হাথিতে ঘেরা রমজান তো হুল্লোড় করতে করতে এগিয়ে এলো। পাঁড়েজী সে দিকে দেখে গম্ভীর ভাবে নওয়াবকে বল্লে—"হুজুরের দেশে বুঝি কুস্তির আগে ভাল্লুক নাচের রীত আছে? আমাদের দেশে তো মানুষে ভাল্লুক নাচায়, হুজুর তো দেখি হাথিকে ভাল্লুক নাচান শিখ্‌লিয়েচেন।"

তারপর রমজান এসে পৌঁছে ত গর্জন লাফ ঝাঁপ দাঁতে দাঁত ঘষা আরম্ভ করলে। ভেট্‌কুয়ার মোছে (গোঁফে)। তা দিতে দিতে বেশ মন দিয়ে তাকে দেখতে লাগলো, ঠিক যেন সে একটা চিড়িয়াখানায় নতুন জানাওয়র (জানোয়ার) দেখছে।

রমজানের শিকলি খোলা হাত মিলানো সবই হোলো। ভেট্‌কুয়ার বেশ সহজ ভাবেই সব করলো; তারপর নওয়াবের হুকমে যখন রমজান লড়তে নেমে লাফালাফি গর্জন আরম্ভ করলো, তখন ভেট্‌কুয়ার তার দিকে ফিরে চোখ মুঁজে দাঁত বার কোরে খুব হেসে উঠলো, যেন সে কতই আমোদ পাচ্ছে। হেসেই সে হাততালি দিয়ে তালে তালে বোলতে লাগলো—"বাহরে বেটা, বাহ, বাহ; নাচে ভালু নাচে ভালু, নাচে মেরে ভালুয়া।"

আসরসুদ্ধ লোক তো অবাক! রমজান তো এমনিতেই ক্ষেপে ছিলো, এসব দেখে-শুনে

সে আরও ভয়ানক রেগে ক্ষেপে, হাঁ করে গর্জন করে, রাচ্ছুসের (রাক্ষসের) মতো হুমকি দিয়ে ভেট্‌কুয়ারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পাঁড়ে সট কোরে—যেন ডুব মেরে—রমজানের পায়ের ভিতর দিয়ে গলে পেছনে চলে গেলো,—যেন ছু-মন্তর, এই ছিল সামনে, এই গেল পেছনে। পেছনে গিয়ে ছোট এক পা তুলে রমজানের পেছনে এক লাথি লাগালো। লাথির চোট আর নিজের বেগ না সামলাতে পেরে রমজান গদ্দাম করে পড়ে গেলো। তা দেখে ভেট্‌কুয়ার লওয়াবের দিকে ফিরে চোখ মুঁজে বত্তিশটা দাঁত বার কোরে বিনা আওয়াজে হাসতে লাগলো, মনে হোলো যেন সে লওয়াবকে ভেংচাচ্ছে।

আছাড় খেয়ে রমজানের চেঁচান বন্ধ হলো। সে মুখবন্ধ করে দস্তুরমাফিক লড়তে লাগলো। কিন্তু কি করবে? ভেট্‌কুয়ার ঠিক ভেল্কিবাজির মতো সড়াক সড়াক এদিক ডুব ওদিক গোঁত্তা খেয়ে তাকে এড়িয়ে তার প্যাঁচ ছাড়িয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

মণ্টু বল্লে—"সাইড স্টেপিং। লোকটা নিশ্চয় বক্সিং জানতো।"

দরোয়ানজী চোটে বল্লে—"ফের বোক সিং। সে বেটা কুস্তির কি জানে? বোক সিং এর বাপ এলেও এরকম লড়তে পারতো না। শুনবে তো শোনো।"

কালু বল্লে—"হাঁ, হাঁ, শুনবো! মণ্টু তুই চুপ কর।"

দারোয়ানজী বলতে লাগলো—এই মতো ত লড়াই চল্লো। যদিই বা রমজান কোনও রকমে ভেট্‌কুয়ারের বদনের কোথাও হাথ লাগায়, তো সেখানে ঠিক যেন সাপ কিল্‌বিল্ করে খেলে উঠে আর রমজানের হাথ খুলে যায়। ভেট্‌কুয়ার সরে গিয়ে কেবল লাথি চালায় আর হাসে। হাথ একবারও উঠায় না। খানিকক্ষণ এ রকম হবার পর রমজান আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। সে আবার গর্জন করে, দু' হাথ বাড়িয়ে ভেট্‌কুয়ারের উপর লাফিয়ে পড়লো, যেন সে তাকে চেপে পিষে মারতে চাহে।

রমজানের লাফানোর সঙ্গে সঙ্গে "জয় বাবা টঙ্করনাথ" বলে চেঁচিয়ে ভেট্‌কুয়ার ঠিক বিজলীর চমকের মত, এক গোঁত খেয়ে রমজানের দুই পায়ের মাঝে ঝুঁকে নিজের ঘাড় ঢুকিয়ে দিলে, দেখে মনে হোলো যেন রমজান তার পিঠে সওয়ার হয়েছে। তারপর পলকের মধ্যে এক ভীষণ ঝট্‌কায় সে সোজা হোলো, আর রমজান ঠিকরে আসমানে উঠে তিন-চার ঘুমণ্ডি (ডিগবাজী) খেয়ে গদ্দাম করে আছড়িয়ে চিত হয়ে পড়লো।

তখন ভেটকুয়ার পাঁড়ে লওয়াবের সামনে এগিয়ে এসে ঝুঁকে সেলাম ঠুকে বল্লে—"হুজুর ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে তো জানে আড়-ঢাই প্যাঁচ, আধা প্যাঁচে তো সরকারের পালোয়ান চিত হয়ে গেলো, এখন হুকম হোক জনাবের, অন্য কেউ আসুক বাকী দুই প্যাঁচ তাকে শিখলায়ে দি।"

নওয়াব তো এতক্ষণ মন্তর-ফুকা সাপের মতো আড়ষ্ট হয়েছিলো। পাঁড়েজীর কথায় উঠে বসে সে তার তারিফ (প্রশংসা) করে, তাকে শাল, দোশালা দিয়ে বল্লে—"আমি তোমার কুস্তি দেখে খুশী হয়ে গেছি। তুমি ফিরে যাও। আমি রাজা সাহেবকে চিঠি দিচ্ছি।"

ভেট্‌কুয়ার চিঠি নিয়ে সত্তুপুরে ফিরে এলো। চিঠিতে ছিলো—"যে শিখতে এসেছিলো, সে শিখে গিয়েছে। যে শিখ্‌লাতে এসেছিলে সে শিখ্‌লিয়ে গিয়েছে। সাবাস হুজুর। আমি আসবো হজুরের সঙ্গে হাত মিলাতে।"

রাজা চিঠি পড়ে ভেট্‌কুয়ারের পাগড়িতে নিজের শিরপ্যাঁচ লাগিয়ে দিলো। তারপর তাকে দশ হাজার মোহর, শাল, দোশালা, জওহরাত (মণিমুক্তা) ইনাম (বকশিশ) দিয়ে হাথির উপর বসিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলো।

শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

হিজিবিজি দেশের রাজা আজগুবি সব সৈন্য
রেখেছিলেন ঢাকতে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির দৈন্য,
জুজুবুড়ির সঙ্গে সেথায় লড়াই হ'ত নিত্য,
প্রভুর কাঁধে ঘুরতো যত বেতনভোগী ভৃত্য।

অ-আ-ক-খ পড়ে সবাই বিষম বিষম পণ্ডিত,
তর্কযুদ্ধে হারলে পরে টিকি হ'ত খণ্ডিত ;
হাওয়ায় সেথা উড়তো শুধু ধূলিমুঠি নস্য—
বাঁচতো সবাই অনেক বছর না থাক খাদ্য-শস্য।

হিজিবিজি দেশের রাজা আমায় ডেকে বললেন,
'কি মহাশয়, এরি মধ্যে নিজের দেশে চললেন ?
বেশ, তাহলে কাগজ দিলাম, দোয়াত, কালি, নিব, পেন,
দেশে ফিরে আমার কথা ফলাও করে লিখবেন।'

উদোরাজা বুধোমন্ত্রী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

বুদ্ধদেব থেকে চৈতন্যদেব অবধি এদেশে কোন বড় চোর জন্মগ্রহণ করেনি। চুরি-বিদ্যার মত একটা মহাবিদ্যা এদেশ থেকে লুপ্ত হবার উপক্রম হলো। স্বয়ং নারায়ণ সমুদ্রমন্থনের পর অমৃতের কলসী চুরি করে যে-বিদ্যার উদ্বোধন করেছিলেন, সেই বিদ্যা এদেশ থেকে লুপ্ত হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সেই মহাবিদ্যার পুনঃ প্রচলনের জন্য রাজস্থানের বৈষ্ণবেরা সচেষ্ট হলেন। নারায়ণের পূজারী আচার্য বংশের সাত ভাই এই বিদ্যার পুনরায় প্রবর্তন করলেন।

রাজস্থান মরুভূমির দেশ। বাসিন্দারা গরীব। ঘরে সিঁদ কেটে খাটুনি যা হয়, লাভ হয় সে তুলনায় কম। তবে বিদ্যা বজায় রইল, এইটাই সুখের কথা।

কষ্টেসৃষ্টে দিন যায়।

এমন সময় খবর এলো বাংলা মুলুকে চুরির খুব সুবিধা, সেখানে পুকুর অবধি চুরি হয়। পুকুর চুরি! সাত ভাই অবাক হয়ে যায়। ব্যাপার কি জানবার জন্য সাত ভাই একদিন মাথায় পাগড়ি বেঁধে, কাঁধে কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

অনেক পথ হেঁটে, অনেক বনবাদাড়, জলা-জঙ্গল পার হয়ে সাত ভাই এসে পৌঁছলো বাংলাদেশে। দেশ দেখে তাদের চোখ জুড়িয়ে গেল—গোলা-ভরা ধান, বাগান-ভরা ফলমূল। খাওয়া-পরার দুঃখ নেই।

এবং তার চেয়েও বড় কথা, চোর ধরার চৌকিদার নেই।

ক'দিন বাগানের ফল চুরি করে, গোলার ধান চুরি করে সাত ভাইয়ের তো কাটলো। তারপর তারা বড় চুরির সুযোগ দেখতে লাগলো। বিদেশ-বিভুঁয়ে পাছে বিপদ ঘটে, তাই তারা আগে দু'চারজন চোরের সঙ্গে ভাব-সাব করতে চাইল। তারা শুনে নিল, বাংলা মুলুকে চোরাবাজার আছে, আর চোরবাগান আছে। ঘুরতে ঘুরতে সাত ভাই চোরবাগানে গিয়ে পৌঁছলো।

গঙ্গার ধারে সারি সারি বাড়ী, বাগান কোথায়? একজন বললো—একেই আমরা বাগান বলি।

বড় ভাই জিজ্ঞাসা করলো—এখানে কি সব চোর থাকে?

লোকটি হেসে বললো—এ দেশে চোর কেউ নেই, সব জোচ্চোর।

—জোচ্চোর মানে কি?

—সবাই মিলে জোট বেঁধে চুরি করা।

—সে কি রকম?

চোর চুরি করে টাকা, চুরি করতে গেলে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়, রাত জাগতে হয়, লাফালাফি দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়, কিন্তু জুয়াচুরিতে ও-সব দরকার হয় না, টাকা আপনি আসতে থাকে। শুধু একজনেরই আসে না, দলের সবাইকার আসে। কোন ঝুঁকি নেই।

—ভালো তো বুঝলাম না ?

—খুব সহজ কথা। যারা চাল বেচে তারা একটা দল করলো। প্রত্যেকে চালের সঙ্গে এক সেরে এক ছটাক কাঁকর মিশিয়ে দিলে। এক-এক মণ চালে আড়াই সের করে কাঁকর চলে গেল চালের দামে। মাখনের সঙ্গে কচু সিদ্ধ মিশিয়ে দিলে, সর্ষের তেলের সঙ্গে তিসির তেল মিশিয়ে দিলে, টাকা আসতে লাগলো। সবাই দল বেঁধে বাজারে চিনি বেচা বন্ধ করে দিলে, বললে চিনি নেই। যার চিনির খুব দরকার সে দ্বিগুণ দাম দিয়ে কিনলে। এই ভাবে সবাইকার পয়সা বাড়ছে। একেই বলে জোচ্চুরি।

—এতো ভারী মজার ব্যাপার।

—মোড়ল বাড়ী গেলে এমনি ব্যাপার কত শুনবে, যাও না সেখানে।

—লোকটি সাত ভাইকে চোরবাগানের মোড়ল বাড়ী পৌঁছে দিল।

মস্ত বাড়ী। বাড়ীর দরজায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে :

কর—গঙ্গাস্নান পূজাহ্নিক হরি-সংকীর্তন।
হরে—মহাপুণ্য, পরলোকে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
তবে—এসো ভাই, নাম গাই,—হরি হরি বোল্।
সবে—মহানন্দে নৃত্য করি, বাজাই শ্রীখোল ॥

সামনেই বৈঠকখানা ঘর, শতরঞ্চি বিছানো। এক পাশে তাকিয়াতে ঠেস দিয়ে বসে আছেন নামাবলী গায়ে একটি মোটা-সোটা লোক। গলায় তিনকণ্ঠী তুলসীর মালা, মাথার উপর লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি। সাত ভাই তাঁকে প্রণাম করলো। বললো, আপনাকে দর্শন করতে আসছি বহুদূর থেকে। আপনি যদি আমাদের একটা কাজ দেন, আমরা সাত ভাই বেকার।

—বসো, —মোড়ল বললেন।

সাত ভাই বসলো।

মোড়ল প্রশ্ন করলেন—তোমাদের ধর্ম কি ?

—হিঁদু।

—সে তো পরলোকের ধর্ম, ইহলোকের ধর্ম কি ? অর্থাৎ কি বৃত্তি অবলম্বন করে তোমরা দেহধারণ করো ?

—এখন কোন বৃত্তিই নেই।

—জাতি কি ?

—আচার্য ব্রাহ্মণ।

—আমার কাছে তোমরা কাজ চাও ?

—আজ্ঞে।—সাত ভাই মাথা নাড়লো।

—কিন্তু আমাদের এখানে কাজ করতে হলে তোমাদের সব সংস্কার ছাড়তে হবে, আমরা এখানে সেই আগেকার বামুন কায়েত্ জাত মানি নে। আমরা সবাই এক জাত—বজ্জাত। আমাদের এক লক্ষ্য পয়সা উপার্জন করা। অর্থ উপার্জন করার জন্য আমরা যা-কিছু করি তাই সত্য। আমরা দল বেঁধে কাজ করি, যে যা-ই করুক তাকে আমরা সমর্থন করি, এই হলো আমাদের ভক্তি অর্থাৎ দলভক্তি। আমরা বিশ্বাস করি, ভগবান কলিযুগে টাকারূপে দেখা দিয়েছেন, টাকাই সর্বশক্তিমান,—যে যত অর্থলাভ করে সে ততো ভগবানের কৃপা পেয়েছে। এই ভাবে আমরা এক নতুন সমাজের পত্তন করছি, যা হবে দেশের আদর্শ সমাজ। তোমরা যদি এই সব মানতে পার তো তোমরা আমাদের কাছে কাজ পাবে। কাজ আমাদের অফুরন্ত— লোকেরই অভাব।

—এ তো ভাল কথা, আমরা কেন মানবো না।

—আমাদের মন্ত্র হোল :

টাকা ধর্ম টাকা কর্ম, টাকার করি পূজার্চন।
টাকা কল্কী অবতার, টাকাই মোর নারায়ণ ॥

—এ তো ভাল মন্ত্র।

মোড়ল সুর করে গেয়ে উঠলেন :

গোলাকার মূর্তি তাঁর জগৎময় ছড়িয়ে আছে।
সবার মন তাঁরই পানে, ছুটছে জগৎ তাঁরই পাছে ॥

আশেপাশে যে ক'জন বসেছিল, তাঁরা ধূয়া ধরলো—প্রভু, এসো তুমি মোদের কাছে।

সাত ভাই সেইদিনই বজ্জাতের দলে ভিড়ে গেল।

দলের কর্তা শ্রীভণ্ড নায়ক বললেন—তীর্থে গেলে যেমন প্রথমে দেবদর্শন করতে হয়, তেমনি তোমরা এই রাজ্যে এসেছ, আগে রাজদর্শন করে এসো, রাজার চেয়ে বড় রাজ্যে আর কেউ নেই। তিনি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁকে দর্শন করে তারপর কর্মে যোগ দিও।

সাত ভাই পরদিনই রাজসভায় গেল রাজাকে দর্শন করতে।

রাজদর্শন

সকালে রাজসভা বসে। সাত ভাই সূর্যোদয়ের পরেই রাজার সভায় এসে পৌঁছলেন।

ফটকের দরোয়ান তখন বসে বসে দাঁতন করছে, বললো এখন কিসের রাজসভা? সকাল হোক্, মহারাজের ঘুম ভাঙুক।

—কখন মহারাজের ঘুম ভাঙবে।

—যখন সকাল হবে। সকাল হয় কেন? ঘুম থেকে ওঠার জন্য তো? যখন মহারাজ ঘুম থেকে উঠবেন তখনই সকাল হবে। রাজসভার মঞ্চে তখন সানাই বাজবে, শুনতে পাবেন।

—রাজসভা বসবে কখন?

—রাজা সভায় এলেই রাজসভা বসবে। মঞ্চে তখন নহবৎ বাজবে, শুনতে পাবেন।

—তাহলে রাজদর্শন করতে আসবো কখন?

—যখন তোমাদের ইচ্ছে, রাজা সারাদিন সভায় থাকবেন।

বড় ভাই বললো—চল তাহলে এখন খানিক ঘুরে-ফিরে আসি।

অন্য ভায়েরা বললো—পথে পথে কোথায় ঘুরবো?

দরোয়ান বললো—পথে ঘুরবেন কেন, এখানেই অপেক্ষা করুন।

—কোথায় অপেক্ষা করবো বলে দাও?

—কেন, ওই তো গাছতলায়।

—গাছতলায় বসে থাকবো?

—গাছতলার চেয়ে ভালো জায়গা আপনি কোথায় পাবেন? এমন ঘাসের আসন, গাছের ছায়া, আকাশের চাঁদোয়া আপনি কোথায় পাবেন? বড় বড় মুনিঋষিরা তো গাছতলাই পছন্দ করতেন। আমাদের মহারাজার সাধু-সন্ন্যাসীতে বড় ভক্তি।

—বেশ, গাছতলাতেই বসে থাকি।

সাত ভাই সামনের এক আমগাছের নীচে বসে পড়লো।

সময় বয়ে গেল, রোদের তেজ বাড়লো। বেলা প্রায় এক প্রহর হলো। এমন সময় সানাই বাজলো। সাত ভাই সচকিত হলো, রাজা তাহলে এবার ঘুম থেকে উঠলেন।

আরো দু'দণ্ড পর নহবৎ বাজলো, রাজা তাহলে এবার সভায় আসছেন। সাত ভাই এবার গাছতলা থেকে উঠে পড়লো। ফটক পার হয়ে এসে ঢুকলো রাজসভায়।

রাজা ইতিমধ্যে সভায় এসে গেছেন। মস্ত ঘরে সভা বসেছে, রাজা এসে গেছেন, তাকিয়াতে ঠেস দিয়ে সিংহাসনে বসেছেন। পাশে মন্ত্রী সেনাপতি কোটাল, আর সামনে সভাসদেরা। সাত ভাই একপাশে বসে পড়লো।

সভার কাজ সুরু হয়ে গেছে, একজন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছে—মহারাজ খাওয়া-পরা থাকা ঘুমানো সব যথারীতি চলছে। জন্ম ও মৃত্যু ঠিকই ঘটছে, রাজ্যে কোন অনিয়ম নেই।

একজন পারিষদ দাঁড়িয়ে উঠে বললো—মহারাজ, আমার পল্লীতে একটু অনিয়ম দেখা দিয়েছে, পানীয় জলের বড় অভাব, পুকুর শুকিয়ে গেছে।

রাজা বললেন—ঠিকই তো হয়েছে, চৈত্র মাসে পুকুর তো শুকিয়ে যাবেই।

—পুকুরগুলো গভীর করে কাটিয়ে দিলে ভাল হয়।

মন্ত্রী বললেন—বেশ তো, তোমরা নিজেরা কাটিয়ে নাও।

—অনেক খরচ, সে টাকা আমরা কোথায় পাব ?

খরচ কিসের ?

মজুরের মজুরী।

বাইরের মজুর নেবে কেন ? তোমরাই মজুর হ'য়ে যাও। তোমাদের টাকা তোমরাই ঘরে রাখ। মানুষ সবাই সমান, মজুর যা পারে তোমরাই বা তা পারবে না কেন ?

রাজা বললেন—ঠিকই তো, আমার রাজ্যের সব মানুষ সমান। রাজা ও রাজমিস্ত্রীতে তফাৎ নেই, রাণী ও চাকরাণী এক।

মন্ত্রী সেনাপতি মাথা নেড়ে বললো—ঠিক কথা, ঠিক কথা।

এবার আরেক জন উঠে দাঁড়ালো, বললো—মহারাজ আমাদের পল্লীতে বসন্ত লেগেছে, একজন বসন্ত-বদ্যি যদি পাঠিয়ে দেন, তাহলে বিশেষ অনুগ্রহ হয়।

রাজা বললেন—বসন্ত লাগলো কেন ? তোমরা এবার শীতলা মায়ের পূজা করেছ ?

—আজ্ঞে, আমরা চৈত্র মাসে পূজা করি, এইবার হবে।

—মা আর অতো দেরি সইতে পারছেন না, তিনি আগে পূজা চাইছেন, কালই পল্লীতে শীতলা মায়ের পূজার ব্যবস্থা করগে যাও।

আপনার আদেশ শিরোধার্য কিন্তু যাদের অসুখ করেছে তাদের জন্য একটা বদ্যি পাঠালে ভাল হয় মহারাজ।

উদোরাজা মন্ত্রীর পানে তাকালেন, বললেন—বদ্যি পাঠাতে হলে তো অনেক খরচ হবে মন্ত্রী।

বুধোমন্ত্রী বললো—এখনই বদ্যি যাবে কেন ? শাস্ত্রে আছে শত মারী ভবেৎ বদ্যি। একশো জন মরার পরে পাড়ায় বদ্যি ডাকতে হবে। তা তোমাদের পল্লীতে কি একশো জন মারা গেছে ?

—এখন শীতলা মায়ের চরণামৃত খাক্, ওর চেয়ে বড় ওষুধ তো আর কিছু হয় না।

সভাসদরা বললো—ঠিক তো, মায়ের চরণামৃতের কাছে আর কি আছে !

এবার তৃতীয় ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। বললো—মহারাজ আমাদের গ্রামে বাঘের উপদ্রব দেখা দিয়েছে। পাশের বন থেকে বাঘ বেরিয়ে রোজ রাত্রে গরু-ছাগল নিয়ে যাচ্ছে। শিকারী পাঠিয়ে এর একটা বিহিত করুন।

রাজা বললেন—শিকারীরা কি করবে ?

—বাঘ মারবে।

—সেটি হবে না, আমার রাজ্যের নীতি হলো অহিংসা। কেউ কাউকে মারবে না। সবাই মিলেমিশে শান্তিতে বাস করবে।

—বাঘের সঙ্গে শান্তিতে বাস করবো কি করে মহারাজ ?

—বাঘের সঙ্গে বাস করবে কেন ? বনের বাঘকে বনে পাঠিয়ে দাও।

—মারের ভয় না দেখালে সে যাবে কেন ?

—ভয় না দেখালেও সে যাবে। বুদ্ধি দিয়ে তাড়াতে হবে। ছেলেবেলায় সেই গল্প পড়নি ? রাখাল ও বাঘ। রাখাল যদ্দিন মিছে কথা বলেছিল, বাঘ আসেনি ; রাখাল যেই সত্যি কথা বলল, অমনি বাঘ এসে পড়লো। আজ থেকে তোমাদের গাঁয়ে আমার হুকুম জানিয়ে দিও—কেউ যেন ভুলেও সত্যি কথা না বলে, কি বল মন্ত্রী ?

বুধোমন্ত্রী মাথা নেড়ে বললো—ঠিক কথা, আমাদের শাস্ত্রে আছে, বিদুর বলেছেন—

মিথ্যা বল, মিথ্যা বল, মিথ্যার বেসাতি,
মিথ্যা নিয়ে দিনে-রাতে কর মাতামাতি।
মিথ্যার কীর্তন কর, সত্য রাখো দূরে,
বাঘ বনে ফিরে যাবে, বলেন বিদুরে।

এবার চতুর্থ ব্যক্তি উঠলো, বললো—মহারাজ, আমাদের অঞ্চলে সব খাদ্য ভেজাল হয়ে গেছে, তা-ই খেয়ে সব মানুষ অসুখে ভুগছে।

উদো বললেন—ব্যাপারটা কি ?

লোকটি বললো—আজ্ঞে, ঘি বলে যা বিক্রী হচ্ছে, তা ঘি নয়, মাখন বলে যা চলছে, তা মাখন নয়, একরকম শাদা চূর্ণ জলে গুলে দুধ বলে চালানো হচ্ছে, এ-সব খেলেই পেটে ব্যথা, বুক ধড়ফড়ানি, মাথা ঘোরা দেখা দিচ্ছে, ছোট ছেলে-মেয়েদের হাত-পা ফুলছে, সবাই শুকিয়ে যাচ্ছে, এর একটা প্রতিকার করুন।

—কারা এসব করছে ?

—দোকানদাররা।

—কোটাল, এই সব দোকানদারদের ধরে আনো।

—ধরে আনতে হবে না, আমরা নিজেরাই এসেছি মহারাজ—কয়েকজন লোক উঠে দাঁড়ালো।

—তোমরা এইভাবে খাদ্যে ভেজাল মেশাচ্ছ ?

—ভেজাল নয় মহারাজ, আসল জিনিসের সঙ্গে নকল মেশালে ভেজাল দেওয়া হয়। আমরা তা দিই না, আমরা বিকল্প খাদ্য বিক্রী করি।

—বিকল্প খাদ্য কি ?

—যা আসল খাদ্যের বদলে খাওয়া যায় এবং খেয়ে অসুখ করে না।

—তাহলে এদের অসুখ করছে কেন ?

—অসুখ করাটা দেহের স্বভাব, খাঁটি জিনিস খেয়েও কি লোকের অসুখ করে না ? খাবারের জন্য অসুখ করছে না, স্বভাবের জন্য অসুখ করছে।

মন্ত্রী মশাই কি বলেন ?—রাজা মন্ত্রীর পানে তাকালেন। বৃধোমন্ত্রী মাথা নেড়ে বললেন—মহামতী বিদুর বলেছেন—

অসুখের নাই কোন প্রতিকার।
হতে পারে যথা তথা যার তার ॥
মিছে তুমি দোষ দেবে কার 'পরে
রেহাই পাবে যেদিন যাবে মরে ॥

যাদের অসুখ হয়েছে তারা মারা যাবার চেষ্টা করুক, অসুখ আর থাকবে না।

রাজা বললেন—বেশ কথা, যাদের অসুখ করেছে, তুমি তাদের তাড়াতাড়ি মারা যেতে বলগে।

লোকটি বললো—সে কি মহারাজ ?

রাজা বললেন—হ্যাঁ, আমার বিচারে কোন ভুল নেই, যাও।

দোকানদাররা বললো—আমাদের উপর কি হুকুম হয় মহারাজ ?

রাজা বললেন—তোমাদের কোন দোষ নেই, তোমরা সব খাবারের বিকল্প বের করে বিক্রী করে যাও, কোন ভয় নেই।

দোকানীরা চলে গেল।

ইতিমধ্যে আরেকজন সভাসদ উঠে দাঁড়ালো। বললো—মহারাজ···

উদোরাজা বললেন—আজ আর কারও কথা শুনবো না, আজ অনেক কাজ হয়েছে।

—আমি অনেক দূর থেকে আসছি মহারাজ।

—কাল তোমার কথা শুনবো, আজ আমি পরিশ্রান্ত। এখন আমি বিশ্রাম করবো।

—বড় জরুরী আবেদন মহারাজ, আমাদের চারিপাশের বনে আগুন লেগেছে, এবার গাঁয়ে হয়তো আগুন লাগবে। যদি কয়েকজন কাঠুরে···

—সব কাল ব্যবস্থা হবে।

—আগুনের ব্যাপার মহারাজ।

—জ্বলুক না, কাল ব্যবস্থা করবো।

'জোড় হাতে বললো—আমি আপনাকে স্বস্তি দিতে পারি মহারাজ!'

লোকটি আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কোটাল ধমক দিল,—মহারাজ পরিশ্রান্ত, এখন আর কোন কথা নয়, যাও।

এবার কোটাল জামার পকেট থেকে তেলের শিশি বের করলো, বললো—মহারাজ নাকে একটু সর্ষের তেল দিয়ে দিই।

উদোরাজা সিংহাসন থেকে নেমে মেঝেতে শুয়ে পড়লেন, কোটাল তার নাকে তেল লাগিয়ে দিল। উদো বললেন—সিংহাসনে আর বসতে ইচ্ছে করে না, বড় খাটুনি।

বুধো বললো—মহামতী বিদুর বলেছেন—

সিংহাসনে সিংহের গোঁফগুলো যেন কাটা।
বসলে পরে বিঁধবে গায় যেন মুড়ো ঝাঁটা॥

তাই অনেক রাজা সিংহাসন ছেড়ে বনে চলে গিয়েছিলেন।

উদো বললেন—সেই ভালো, চলো আমরাও বনে চলে যাই।

—বনে যে বড় বাঘের ভয় মহারাজ।

—কোথাও স্বস্তি নেই দেখছি।

এবার সাত ভাই চোরের বড় ভাই উঠে দাঁড়ালো, জোড় হাতে বললো—আমি আপনাকে স্বস্তি দিতে পারি মহারাজ!

—কে তুমি?

—আমরা সাত ভাই চম্পা। ফুল দিয়ে যেমন দেবতার পুজো হয়, আমরা তেমনি মানুষ ফুল, দেশে-বিদেশে রাজা-মহারাজার পুজো করে বেড়াই।

—তোমরা আমাকে স্বস্তি দিতে পার?

—পারি।

—কি করতে পার?

—সিংহাসনে বসতে যদি কষ্ট হয়, সিংহাসনটা বদ্‌লে ফেলুন মহারাজ।

—কিসে বসবো?

কেন, অন্য আসন তো আছে, নারায়ণের গরুড়াসন আছে, শিবের বৃষাসন আছে, কার্তিকের ময়ূরাসন, গণেশের মূষিকাসন, আসনের অভাব কি? আপনি আদেশ করুন আমি নূতন আসন বানিয়ে দিই।

—কি আসন বানাবে?

নতুন বানিয়ে দিই, যা কারও নেই, উট-আসন।

—উট, না-না সে বড় উঁচু হবে।

—রাজার আসন উঁচু হওয়াই ভালো মহারাজ। যত উঁচু আসন, ততো বড় রাজা। মর্যাদা ততো বেশী। আর উটের গোঁফ নেই যে ঝাঁটার মত বিঁধবে।

—বেশ তবে উট-আসনই করে দাও।

—তাহলে এই সিংহাসনটা যে দরকার মহারাজ, ভেঙ্গে গড়তে হবে।

—নিয়ে যাও সিংহাসন।

তখনই সাত ভাই সিংহাসন মাথায় তুলে নিল। সিংহাসন নিয়ে বেরিয়ে এলো রাজবাড়ী থেকে। বড় ভাই বললো—এতদিনে একটা সত্যিকারের চুরি করতে পারলাম। এই সিংহাসনের সোনা বেচে সাতপুরুষ বসে খাবো। আর অভাব থাকবে না।

উদোরাজার সিংহাসন আর উটাসন হয়ে ফিরে এলো না। উদোরাজা মেঝেতে ফরাস পেতে রাজ কাজ চালাতে লাগলেন, অর্থাৎ নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুতে লাগলেন। আসন আসবে, বসবেন, তারপর তো রাজকাজ!

॥ উপদেশ ॥

শ্রীশশধর ভট্টাচার্য

বড্ড গরম? কে বলেছে?
　　কাঁদবি নাকি তাই বলে?
তোরা যেন ননীর পুতুল
　　একটু তাপে যাস গলে।
আনবি ছাতা? নেই প্রয়োজন
　　যাবনাকো খুব দূরে,
তোরা কি চাস বারোটা মাস
　　বইবে হাওয়া ফুরফুরে?
মনের হদিস পাইনা তোদের
　　তিলকে শুধু করিস তাল।
মাঘের শীতে মরিস কেঁপে
　　স্যাঁতা বলিস বর্ষাকাল।
মানুষ কেন হলি তোরা
　　বুঝতে পারা হচ্ছে দায়,

মানুষ তারা কখ্খনো নয়
　　গ্রীষ্মে যারা ভিরমী যায়।
ডাব কেন রে খাবি হাঁদা
　　এইটুকু ছাই পথ চলে?
রাগে আমার জ্বলছে শরীর
　　দেব এবার কান মলে।
খেতে যদি হয় খেয়ে নে
　　হয় চা, নয় ঝাল-চানা,
ডাব শুধু খায় রুগী, বুড়ো,
　　কারণ তাদের সব মানা।
গরমে পথ চলতে হ'লে
　　ঠাণ্ডা খাওয়া উচিত নয়,
শাস্ত্রে আছে পড়ে দেখিস
　　বিষ দিয়ে বিষ হয় রে ক্ষয়।

মহাকাশে মার্কিন দূত

শ্রীসুকুমার বিশ্বাস

তোমরা নিশ্চয়ই জান, মানুষ চাঁদে যাবার জন্যে কি আপ্রাণ চেষ্টা করছে। রাশিয়া আর আমেরিকা দু'জনেই এ ব্যাপারে প্রায় সমান তালে এগিয়ে চলেছে। দুটো দেশই আশা করছে, ১৯৭০-৭৫ সাল নাগাদ মানুষের পক্ষে চাঁদে পৌঁছনো সম্ভব হবে। একটা জিনিস মনে রেখে, এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের যা কিছু বলবার তা তাঁরা বলেছেন। তাদের ছক কাটা শেষ। এখন যা কিছু করার, তার দায়িত্ব ইঞ্জিনীয়ার এবং ডাক্তারদের। ইঞ্জিনীয়াররা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করবেন এবং ডাক্তারদের কাজ হচ্ছে মহাকাশে মহাশূন্যে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার খোঁজখবর করা। অর্থাৎ সেই অসীম মহাশূন্যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমানার বাইরে পৌঁছে মহাকাশচারীর শারীরিক, মানসিক এবং কাজকর্ম করার অবস্থা কিরকম স্বাভাবিক থাকে, সেটা পরীক্ষা করাই ডাক্তারদের উদ্দেশ্য।

বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন যে, চাঁদে যেতে হলে প্রথমে পৃথিবী থেকে প্রায় এক হাজার মাইল ওপরে একটা 'স্পেস স্টেশন' তৈরী করা বিশেষ দরকার। এই স্পেস স্টেশন কেমন হবে, তার পরিকল্পনাও সমাপ্ত। গ্রহান্তরে যাবার উদ্দেশ্যে পৃথিবী থেকে যে মহাকাশযানগুলো ছাড়া হবে, সেগুলোর জন্যেই এই স্পেস স্টেশন তৈরীর ব্যবস্থা। রেলগাড়ী যেমন স্টেশনে থেমে প্রয়োজনীয় ইন্ধন সংগ্রহ করে, মহাকাশযানগুলোও তেমনি পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করে, স্পেস স্টেশনে থেমে গ্রহান্তরের উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা শুরু করার আগে, প্রয়োজনীয় ইন্ধন নেবে, যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে কিনা সেসব পরীক্ষা করে নেবে। বলা বাহুল্য, সেই স্পেস স্টেশনে বৈজ্ঞানিকেরা থাকবেন এইসব কাজ করার জন্যে।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমানার বাইরে কিভাবে, কেমন করে রকেটগুলো পাঠানো হচ্ছে, কিভাবেই বা সেই রকেটের মাথায় মহাকাশযানগুলো বসানো থাকে, কিভাবে নির্দিষ্ট সময় পরে সেই মহাকাশযান রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কক্ষপথে পরিভ্রম ণশুরু করে, স্পেস স্টেশন কিভাবে তৈরী করার পরিকল্পনা বৈজ্ঞানিকেরা করেছেন—এসব কথা পরে অন্য এক সময় তোমাদের বুঝিয়ে বলব।

এখন শুধু এইটুকু জেনে রাখ, গত ৩রা জুন, বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এডওয়ার্ড হোয়াইট যে মহাকাশে পদচারণা করে এলেন, এ হচ্ছে গ্রহান্তরে যাবার উদ্দেশ্যে মহাশূন্যে স্টেশন তৈরী করবার পরিকল্পনারই একটা অংশ। এইভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, মহাশূন্যে হাঁটা বা

চলাফেরা করতে গিয়ে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও কাজকর্ম করার অবস্থা কতটা স্বাভাবিক থাকে।

জেমিনির যাত্রা-পর্বের পূর্বে জেমস ম্যাকডিভিট ওজন প্রভৃতি বিবিধ পরীক্ষায় বসেছেন।

এক-একটা মহাকাশ অভিযান করার বহু আগে থেকেই তার সমস্ত খুঁটিনাটি পরিকল্পনা করা হয়। কাকে কোন অভিযানে পাঠানো হবে, তাও স্থির করা হয়। সেইভাবে প্রার্থীকে নির্বাচিত করে তাকে উপযুক্ত কঠিন ও কঠোর ট্রেনিং দেওয়া হয়। যেমন ধর, জেমস এ. ম্যাকডিভিট আর এডওয়ার্ড হোয়াইটকে যে মহাকাশে পাঠানো হবে তা সেই ১৯৬২ সালের

সেপ্টেম্বর মাসেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমানবিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা স্থির করেছেন। এর পর জেমিনি ৫ মহাকাশযানে যাবেন গর্ডন কুপার এবং চার্লস কনরাড। তাঁরা সম্ভবতঃ সামনের অগাষ্টে মহাকাশে পাড়ি জমাবেন। তারপর জেমিনি ৬ মহাকাশযানে যাবেন ওয়ার্ণার শিরা এবং টমাস ষ্ট্যাফোর্ড।

জেমিনি ৪ মহাকাশযানের প্রধান পাইলট হিসাবে মহাকাশ পরিক্রমণের আগে ৩৬ বৎসর বয়স্ক ম্যাকডিভিট তিন হাজার ঘণ্টার বেশী বিমান চালনা করেছেন। এর মধ্যে আড়াই হাজার ঘণ্টা চালনা করেছেন জেট বিমান। ১৯৫১ সালে মার্কিন বিমান-বাহিনীতে ভর্তি হবার পর থেকেই তাঁর বিমানে ওড়া শুরু হয়। কোরিয়ার যুদ্ধে বিমান আক্রমণে তিনি ১৪৫ বার অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ওই সময় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে তাঁকে তিনটে ফ্লাইং ক্রস্ ও পাঁচটা পদক দিয়ে এবং দক্ষিণ কোরীয় সরকারের চু মু পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯ সালে বিমানবিজ্ঞানে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে তিনি বি, এসসি, পাশ করেন।

মহাকাশচারী হিসাবে নির্বাচিত হবার আগে ৩৫ বৎসর বয়স্ক হোয়াইট ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান-বাহিনীর একজন প্রথম শ্রেণীর বৈমানিক। তিনি জেট বিমানে ২,২০০ ঘণ্টা এবং মোট ৩,৬০০ ঘণ্টা আকাশে উড়েছেন। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯ সালে বিমান-বিজ্ঞানে তিনি এম, এসসি পাশ করেন।

প্রায় এক বছর আগে ১৯৬৪ সালের ২৭শে জুলাই জেমিনি ৪ মহাকাশযানের পাইলট ও সহ-পাইলট হিসাবে যথাক্রমে ম্যাকডিভিট ও হোয়াইটকে নির্বাচিত করা হয়। তারপর থেকে তাঁরা ওই মহাকাশযানের সঙ্গেই "বাস করেছেন" বলা যায়। মিসৌরীর সেন্ট লুইসে জেমিনি যখন নির্মিত হয়, তখন থেকেই তাঁরা তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তারপর কেপ কেনেডীতে টাইটান-২ রকেটের ওপর যখন জেমিনিকে স্থাপন করা হ'ল, তখনও তাঁরা সেখানে।

এইবারকার জেমিনি ৪ অভিযানের মিশন ডিরেক্টর ছিলেন মিঃ ক্রিষ্টোফার ক্র্যাফ্‌ট্‌; প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এবং মেডিক্যাল ডিরেক্টর ছিলেন যথাক্রমে মিঃ চার্লস ম্যাথুজ এবং ডাঃ চার্লস এ, বেরি।

ম্যাকডিভিট ও হোয়াইটকে নিয়ে ৯০ ফুট লম্বা, ৭৬০০ পাউণ্ড ভারী জেমিনি ৪ মহাকাশ-যানটা অতিকায় টাইটান-২ রকেটের সাহায্যে কেপ কেনেডী থেকে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। সেদিন ৩রা জুন, ১৯৬৫। আমাদের এখানে তখন সময় রাত ৮টা ৪৬ মিনিট। টাইটান রকেটটা দুই পর্যায়ের। প্রথম পর্যায়ে সেকেণ্ডে ১৫৬ গ্যালন করে জ্বালানি নিঃশেষ হয়। উৎক্ষেপের ২ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড পরে টাইটানের প্রথম পর্যায় থেকে জেমিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; আর এর

৩ মিনিট ৬ সেকেণ্ড পর রকেটের দ্বিতীয় পর্যায় থেকে জেমিনি নিজেকে মুক্ত করে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশচারী দু'জন জেমিনির হাল ধরলেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থার গোলযোগের জন্যে প্রথমে খানিকক্ষণ তাঁদের কথাবার্তা শোনা যায়নি। তারপরেই ম্যাকডিভিটের প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "সব কিছু চমৎকার।"

জেমিনি ৪ তখন পৃথিবীর উর্ধ্বে ১০০ থেকে ১৮৫ মাইলের মধ্যে ঘণ্টায় ১৭,৫০০ মাইল বেগে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। সমগ্র অভিযানে ওর কক্ষপথের পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কম দূরত্ব ছিল ১০৩ মাইল এবং সবচেয়ে বেশী দূরত্ব ছিল ১৮০ মাইল।

কথা ছিল দ্বিতীয়বার পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় হোয়াইট মহাকাশে পায়চারী করবেন। কিন্তু তখনও তাঁরা ষোল আনা প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেন নি। তাই তৃতীয়বার পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় জেমিনি যখন প্রশান্ত মহাসাগরের ১৫০ মাইল ওপরে হাওয়াই-এর কাছাকাছি, তখনই নীচে হিউষ্টন কেন্দ্র থেকে এল এগিয়ে যাবার নির্দেশ। তার আগেই মহাকাশযানের ভেতরের চাপ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে মহাকাশে বেরিয়ে এলেন হোয়াইট। মহাকাশযানের সঙ্গে ২৫ ফুট দীর্ঘ একটা নাইলনের দড়িতে তাঁর দেহ বাঁধা। হাতে তাঁর জেট গান। এই জেট গানের সাহায্যেই তিনি নিজেকে ইচ্ছেমত চালিয়েছেন। জেট গানে চাপ দিলে যে অক্সিজেন বের হয়ে আসে, তাই তাঁকে চলতে সাহায্য করেছে। তিনি জেটগানটা ছুঁড়লেন এবং মহাকাশে পদচারণা শুরু করলেন। আমাদের এখানে তখন রাত সওয়া একটা!

বেতারে ম্যাকডিভিটের হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হোয়াইট মহাকাশ যান থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তারপরই দুই মহাকাশচারী নিজেদের মধ্যে খানিকক্ষণ খোসগল্প সেরে নিলেন। তারপর ম্যাকডিভিট আবার পৃথিবীর উদ্দেশ্যে বললেন, হোয়াইট বাইরে তার চলাফেরার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সে বাইরে গিয়ে যখন ঘুরতে শুরু করলে, তখন জেমিনিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

এদিকে হোয়াইট তখন ছবি তুলতে ব্যস্ত। জেট গানের ব্র্যাকেটে আন ক্যামেরাটা বসানো হয়েছে। ম্যাকডিভিট আবার ভেতরে বসেই হোয়াইটের ছবি তুলতে শুরু করে দিয়েছেন। হোয়াইট তখন আমেরিকার ওপর দিয়ে সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল বেগে হেঁটে চলেছেন! ম্যাকডিভিট বললেন, "ওহে এড! একটু আস্তে চল, আমি তোমার ছবি তুলব।"

ওপরে যখন তাঁরা এইসব করছেন, নীচে হিউস্টন মহাকাশ কেন্দ্রের ডাক্তাররা তখন হোয়াইটের হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনের গতি এবং তার রক্তের চাপের মাত্রা পরীক্ষা করছিলেন।

যাই হোক, ২০ মিনিট মহাকাশে পায়চারী করে আবার হোয়াইট ফিরে এলেন জেমিনিতে। আসতে কি আর মন চায়! কিন্তু কি করবেন, জেট গানের কর্মশক্তি তখন গেছে

ফুরিয়ে। ম্যাকডিভিট তাড়াতাড়ি তাই তাঁকে ডেকে নিলেন। নীচের হিউস্টন কেন্দ্র থেকেও নির্দেশ গেল ফিরে যাবার।

বারমুডা থেকে ৫৮৫ মাইল দূরে আতলান্তিক মহাসাগরে জেমিনি এসে পড়ে।

ভেতরে এসে আবার এক ফ্যাসাদ। দরজাটা আর কিছুতেই বন্ধ করা যায় না। এদিকে দরজা যদি বন্ধ না করা যায়, তবে নামবার সময় পৃথিবীর আবহাওয়ার চাপে তাঁদের ঝলসে মারা পড়বার সম্ভাবনা। দরজাটা বন্ধ করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন হোয়াইট। অবশেষে প্রায় দশ মিনিট চেষ্টা করার পর দরজাটা বন্ধ করা গেল। এদিকে কথা ছিল, মহাকাশে হোয়াইটের পায়চারী করা হয়ে গেলে নানা অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাইরে ফেলে দিয়ে জেমিনিকে একটু হাল্কা করা হবে। কিন্তু আবার দরজা খুলতে তাঁদের সাহসে কুলোল না। নীচের হিউস্টন কেন্দ্রও এবিষয়ে একমত হলেন।

আরও স্থির ছিল, মহাকাশে জেমিনি টাইটান-২-এর সঙ্গে মিলিত হবে। টাইটান-২ ছিল জেমিনির অনেক নীচে। তার কাছে আসতে গেলে জেমিনিকে অনেক ইন্ধন খরচ করতে হ'ত। ম্যাকডিভিট দেখলেন, সেটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তিনি সেকথা জানালেন হিউস্টন কেন্দ্রে। তাঁরাও তাঁর সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে সে পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বললেন।

তাঁদের চারদিনব্যাপী মহাকাশ বিহারের সময় ম্যাকডিভিট ও হোয়াইট তাঁদের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যান। তাঁরা পালা করে একটানা চার ঘণ্টা ঘুমোতেন এবং প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় চারবার খেতেন। তাঁদের সঙ্গে চিংড়ী মাছ, মুরগী প্রভৃতি ৪৯ রকমের বিভিন্ন শুকনো খাদ্য

প্লাস্টিকের থলেয় মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। খাবার আগে পিচকারীর সাহায্যে তাঁরা খাদ্যে জল মিশিয়ে নিতেন। হাতমুখ পরিষ্কার করার জন্যে ছিল প্লাস্টিকের আধারে ভিজে ন্যাকড়া। চুইংগাম ছিল খাবার পরে তা মুখে দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করে নেবার জন্যে। চুল দাড়ি সমস্যা নয় বলে তাঁদের সঙ্গে ক্ষুর দিয়ে অযথা মহাকাশযানের ভার বাড়ানো হয়নি।

ম্যাকডিভিট ও হোয়াইট জেমিনিতে চারদিন ছিলেন। এর মধ্যে তাঁরা ৬২ বার পৃথিবী পরিক্রমা করেন। প্রতি পরিক্রমায় সময় লেগেছে ৯০ মিনিট।

৯৭ ঘণ্টা ৫৮ মিনিটে মহাকাশে ১,৬০৯,৬৮৪ মাইল পাড়ি দেওয়ার পর ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলের অদূরে অবতরণের জন্যে ম্যাকডিভিট চারটে প্রতীপগতি বা রেট্রো রকেট ছোঁড়েন। পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্যে মহাকাশযানের দুরন্ত গতিবেগ কমাতে পাল্টা ধাক্কা দেওয়ার ওই চারটে রেট্রো রকেট ওইখানেই লাগানো ছিল। ৭ই জুন, সোমবার ভারতীয় সময় রাত ১০টা ২৬ মিনিটে সেই রকেটগুলো ফাটানো আরম্ভ হয়। তার ৪ মিনিটের মধ্যেই জেমিনি পৃথিবীর আবহাওয়ায় পৌঁছে নীচে নামতে শুরু করে।

ভারতীয় সময় রাত ১০টা ৪১ মিনিটে মূল প্যারাশুটটা মাটি থেকে ১০,৫০০ ফুট উঁচুতে খুলে যায়; আর বারমুডা থেকে ৫৮৫ মাইল দূরে অতলান্তিক মহাসাগরে জেমিনি নেমে পড়ে। তখন আমাদের এখানে রাত ১০টা ৪৩ মিনিট। আমেরিকায় তখন বেলা ১২টা ১৩ মিনিট।

কম্পিউটার বিগড়ে যাওয়ায় নির্ধারিত সময়ের এক সেকেণ্ড আগেই রকেট ফাটানো আরম্ভ করায়, নির্দিষ্ট জায়গা থেকে জেমিনি ৪০ মাইল দূরে গিয়ে পড়ে।

অতলান্তিক শান্ত ছিল। বিমানবাহী জাহাজ ওয়াস্‌প্‌ সেখান থেকে ৪৬ মাইল দূরে অপেক্ষা করছিল। জলে পড়েই ম্যাকডিভিট বেতারে খবর পাঠালেন, বিমান নয়—আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে হেলিকপ্টার পাঠান। খবর পেয়েই ওয়াস্‌প্‌ ঘণ্টায় ৩০ নট বেগে মহাসাগরের সেই নির্দিষ্ট জায়গার দিকে ছুটে চলল। সন্ধানী বিমান আকাশে উঠেই মিনিট খানেকের ভেতর তাঁদের দেখতে পেয়ে খবর পাঠাল।

তাঁরা দু'জনে তখন পরস্পরের গায়ে জল ছিটিয়ে খেলা করছেন।

হেলিকপ্টার থেকে কয়েকজন ডুবুরী আর একটা ভেলা জলে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। ডুবুরীরা জেমিনিতে লাগানো আঙটার সঙ্গে ভেলাটা বেঁধে দিলেন। পরে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ১৪ মিনিটে ওয়াস্‌প এসে জেমিনিকে তুলে নেয়।

তখন আমাদের এখানে রাত ১১টা ২১ মিনিট। হেলিকপ্টারে মহাকাশচারী দু'জন উঠলেন। তার ১৮ মিনিট পরে হেলিকপ্টার তাঁদের নিয়ে এলো ওয়াস্‌পে। রিয়ার-অ্যাডমিরাল ম্যাকরনিক এগিয়ে গেলেন তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। নাবিকদের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে হেলিকপ্টার থেকে বেরিয়ে এলেন প্রথমে ম্যাকডিভিট, তাঁর পেছনে হোয়াইট।

আমার বিলেত যাত্রা

শ্রীকালিদাস দত্ত

"ভূমৈবস্থখম্, নাল্পেস্থখমস্তি"—উত্তর দিয়েছিলেন মৈত্রেয়ী। ভূমা অর্থাৎ বৃহতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই। ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য বর দিতে চেয়েছিলেন প্রিয়তমা দুই পত্নীকে। অন্যতমা ঋষি পত্নী মৈত্রেয়ী ধনসম্পদ প্রত্যাখ্যান করে নিবেদন করেছিলেন, "যেনাহং নামৃতস্যাং, তেনাহং কিং কুর্যাম্" ?—যা আমাকে অমৃত দেবে না, যা নিয়ে আমি অমর হতে পারব না, তা নিয়ে হে ঋষি, আমি কি করব ?

যে কোন সংবেদনশীল মানুষই যুগ যুগ ধরে এই একই প্রশ্ন বার বার নিজেকে করেছে। বলেছে—বৃহতেই সুখ, আমাকে বৃহৎ করো, আমাকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যাও। মানুষের জীবনে গণ্ডীর শেষ নেই, সীমিত বন্ধনের শেষ নেই। ঠিক তেমনি শেষ নেই সীমাকে উত্তীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষার। এ যেন মহাবিশ্বের ক্রমাগত আত্মপ্রসারণের মত কেবলই নিজের সীমা ছাড়িয়ে অনন্তের দিকে এগিয়ে যাওয়া। অসীম থেকে অসীমতর হওয়ার সাধনা। নতুবা কেনই বা মানুষের এই দুর্দম আকূতি দুর্লঙ্ঘ্য অতিক্রম করার, সীমা-সমুদ্রকে ডিঙিয়ে দিগন্তের ওপারে যাওয়ার ? নতুবা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ ছেলে আমিই বা কেন চাইব সাত সমুদ্দুর পাড়ি দিয়ে বিলেতের মাটি স্পর্শ করতে ? হয়তো মৈত্রেয়ীর মত বৃহৎকে জানার স্বাদ আমিও পেয়েছি। অহমিকার যদি কিছু প্রকাশ ঘটে মার্জনা করবেন।

কিন্তু বৃহতের স্বাদ পাওয়া কি সহজ সাধনা ? কত মাশুল দিতে হয়েছে এই অহংকারী সাধনায়। থাক সে হিসেবে কাজ নেই। হলাহলটুকু আমি না হয় নীলকণ্ঠের মত নিজের মধ্যেই সংগোপনে রাখি। অমৃতও আছে। সেই অমৃতই পরিবেশন করি আজ। যদি কিছু কাঁটার সাক্ষাৎ তবু পেয়ে যান, ভাববেন গোলাপে পৌঁছুতে গেলে কণ্টক পেরিয়েই তো যেতে হয়।

বিলেত কি গোলাপ ? গোলাপ হোক না হোক্ গোলাপী বটেই। নেশার মত গোলাপী। শুধু বাংলা দেশ কিংবা ভারতবর্ষেরই বা কেন—এশিয়া ইউরোপের সমস্ত স্বাধীন সুন্দর বৃহতের সত্যান্বেষী শিশু যুবা বৃদ্ধ সবাই ছেলেবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখেন বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-গ্রহণের, তার স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-অ্যাভন, শেক্‌সপীয়রের যৌবনের লীলা আর কর্মভূমি দেখার, এই লণ্ডন শহরে ইতস্তত: পরিভ্রমণ করার। এই হোলো বিলেতের গোলাপ। গোলাপী হোলো গিয়ে আমাদের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। কাঁটা তবে কোন্‌টা ? বলছি। ইদানীং কাঁটার বন্ধন কিছু ঘনিষ্ঠ হয়েছে। প্রথম বন্ধনের রুদ্ধশ্বাস যা অনুভব করতে হয় তা হোলো ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বিলিতি মুদ্রা। টাকা থাকলেই আজ আর ভারতবর্ষ থেকে বিলেতে আসার উপায় নেই। সেই মধুর গোলাপী স্বপ্ন তবে পূর্ণ হয় কাদের ? কারা আসতে পারে বিলেতের এই মেঘ-বৃষ্টি

হাড়-কাঁপানো শীত, ঐতিহ্যময়ী শীর্ণ টেম্‌স্ নদী আর গ্রীষ্মের উচ্ছল রং-এ রঙময় ড্যাফোডিল ফুলের হাট দেখতে ?

নিজের ভাগ্যকে আমি যতই কেন না নিন্দা করি, আমি হয়তো সেই সব ভাগ্যবানদেরই একজন যাদের বিলেত দেখার স্বপ্ন সফল হয় ; বৃহতের অংশ দেখার সুযোগ মেলে। আমি এই মহাবিশ্বের স্বাদ পেয়েছি জাহাজে। সে জাহাজ এই বিশাল পৃথিবীর সকল জাতির মহান্ প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। ছোটখাটো এক শহরে যেন নানা জাতির এক মিলিত সমাজ। আমি মিসেস্ মারিয়ার সজল চোখের হাসি দেখেছি, দেখেছি ফুলের মত ডোমিনিককে, কোলে তুলে নিয়েছি তুলতুলে সোফিয়া আর কার্লোকে। সমুদ্রের বিরাট প্লেটের ওপর ভাসমান আমাদের নৃত্যময়ী জাহাজ কলার ভেলার মত, আকাশকে মনে হয়েছে মহাবিশ্বের সুনীল টুপি, অস্তাচলগামী সূর্য অতিশয় হালকা ভাসমান এক সোনার কলসীর মত ডুবে গেছে সমুদ্রের তলায়। এই সুন্দরের শোভাযাত্রা আমি ভুলব কেমন করে ? আমি যা কিছু ছেড়ে এসেছি, যা কিছু মাশুল গুনেছি, এই অসীমের অনন্ত সৌন্দর্য দেখার জন্যে সবই আজ তুচ্ছ মনে হয়। বড়ো মূল্য না দিলে বড়ো প্রাপ্তি কি সম্ভব ?

ভারতবর্ষের উষ্ণ হাওয়া-বাতাস, বাংলা দেশের শ্যামল দিগন্ত, সূর্যের আলো, চাঁদের হাসি—আমার প্রিয়-পরিজন সব কিছু ছেড়ে এলাম। অসীমের বুকে ভেসে পড়েছি কাগজের নৌকার মত। তার বদলে আমি পেয়েছি মহাবিশ্বের এই অনন্ত সৌন্দর্যের স্বাদ। সব চাইতে বড়ো প্রাপ্তি কি আমার ? আমি ভারতবর্ষকে চিনেছি। শিশু যখন মায়ের কোলে থাকে—তার রূপের সামান্যই সে দেখতে পায়। মাতৃসৌন্দর্যপূর্ণ-রূপের উদ্‌ঘাটন করে যখন শিশু দূরে দাঁড়ায়। দূরে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ-নয়নে সে মায়ের কোলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক ছাড়পত্র দিয়েছেন মাত্র তিন পাউণ্ড, অর্থাৎ সাকুল্যে চল্লিশটি টাকা সঙ্গে নিতে। জাহাজে ওঠার আগে স্বাস্থ্যদপ্তর কিংবা কাষ্টম্‌স্ এর চমৎকার সহজ ব্যবস্থা ভুলবার নয়। কিছুই ভোলা যায় না। জাহাজ ছাড়ার আগে আত্মীয়-পরিজনদের সেই উদ্বেগ, সেই চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকা—একি কেউ ভুলতে পারে ? যেমন নির্বাসন-যাত্রায় সজল বিদায় দিতে এসেছেন সবাই। কিন্তু কিসের আশঙ্কা ? মহাপৃথিবীর পথ কি নির্বাসনের পথ ? সাত সমুদ্র নয়, মাত্র তিন সমুদ্র ডিঙিয়েছি আমরা। ছয় হাজার মাইল আজ তো ঘরের পাশে। তবু সুয়েজ আর ইংলিশ চ্যানেল পার হতে হতে সূর্যের দৃশ্য বদলে গেছে। জেনোয়া থেকে ট্রেনে ইটালি আর ফ্রান্সের বুক চিরে যেতে যেতে সবুজের বদলে দেখেছি—সারা দেশের শ্যামপত্র শূন্য শীতের মৃতদেহের উপর জুঁইফুলের মত তুষারের শুভ্র শবাচ্ছাদন। ভাবলুম, এ কোথায় চলেছি আমি ? ব্যতিব্যস্ত মানুষের ছোটাছুটি। Sorry, Thank you, Excuse me-র রাজ্যে

সবাই তো দেখছি যান্ত্রিক। এখানে প্রাণের স্পর্শ কোথায় পাব আমি? সূর্যের উষ্ণ আলিঙ্গন সহজে মেলা ভার। ডোভারের কাষ্টমস্ ইংল্যাণ্ডের রাজস্বের অতিব্যস্ত দ্বাররক্ষী। বিলেতের মাটিতে পা দিয়েই অনুভব করলুম, এই সন্ধ্যার অন্ধকারে বড়ো একা আমি, কেউ কোথাও নেই আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবার।

পরদিন সকালে সূর্য উঠল একঝলক হাসি মুখে ছড়িয়ে। হাত বাড়িয়ে দিল প্রবাসের নতুন বন্ধু রজনীগন্ধার গুচ্ছের মত শুভ্র হাসির অভ্যর্থনায়। এদের আমি ভুলব না।*

* লণ্ডন বি বি. সি. বেতার বিচিত্রার সৌজন্যে।

‘সমালোচনা প্রতিযোগিতা’র সময় বৃদ্ধি

(কেবলমাত্র গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য)

আমাদের পূর্ব-ঘোষিত মৌচাকের সমালোচনা প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ আষাঢ় মাস পর্যন্ত ছিল। কিন্তু উক্ত তারিখের মধ্যে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায়, এই প্রতিযোগিতার তারিখ আগামী আশ্বিন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হ’ল।

এই প্রতিযোগিতাটি ছিল—বিগত ১৩৭১ সালের সম্পূর্ণ ১২ মাসের মৌচাকে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস বা অন্য যে-কোন লেখা বেরিয়েছে, তার একটি সমালোচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাতে হবে।

এর জন্য তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রথম পুরস্কার : ৩ বছরের মৌচাক, দ্বিতীয় পুরস্কার : ২ বছরের মৌচাক ও তৃতীয় পুরস্কার : ১ বছরের মৌচাক বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হবে।

দি ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী

(বুড়ো মানুষ ও সমুদ্র)

আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ে

আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ে একজন বিখ্যাত আমেরিকান লেখক। তাঁর লেখা উপন্যাস বিশ্ববিশ্রুত। তাঁর বয়স যখন ২০ বছর (১৯১৭-১৮) তখন থেকে তিনি সম্মান পেতে আরম্ভ করেন। উপন্যাস, ছোটগল্প রচনা ও সাংবাদিকতা করে, সমুদ্রে মাছ ধরে এবং শিকার করে তিনি অনেক সম্মান ও অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

এখানে আমরা তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "দি ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী" সংক্ষেপে বঙ্গানুবাদ করে দিলাম। এই উপন্যাসের জন্য তিনি 'নোবেল' পুরস্কার পান।

গাল্‌ফ স্ট্রীমের জলে একটা খুব শক্তিশালী প্রকাণ্ড মাছ বাস করতো। মাছটির রঙ রুপালী, ধারে ধারে বেগুনী লালের ছোপ এবং লেজটি খুব ভারী ও কাস্তের ফলার মত তীক্ষ্ণ।

গাল্‌ফ স্ট্রীমের তীরে অবস্থিত একটি গ্রামে একজন বৃদ্ধ জেলেও বাস করতো। এই বৃদ্ধ লোকটি রোগা, কঠোর এবং গলার পিছনে বলিরেখা ছিল ও দড়িতে বড় বড় মাছ ধরার জন্য তার হাতে ডোরা ডোরা দাগে ঘা হয়ে গিয়েছিল। বৃদ্ধ লোকটি শক্তসমর্থ ও কুশলী জেলে হলেও এই সময়ে তার ভাগ্যবিপর্যয় হয়। আজ ৮৪ দিন ধরে সে মাছ ধরছে, কিন্তু একটাও মাছ ধরতে পারেনি। ৮৫তম দিনে অন্য অন্য জেলের চেয়ে বেশী দূর সমুদ্রে মাছ ধরার আশায় সে চলে গেল। সেইখানে তার বঁড়শিতে একটা প্রকাণ্ড মাছ ধরা পড়লো। সেই মাছটা বঁড়শিতে ধরা পড়ার পর গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল। মাছ ও জেলের মধ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মত যুদ্ধ হ'ল। শক্তিতে প্রায় দু'জনেই সমান। প্রকাণ্ড মাছটি ক্রমেই সমুদ্রের গভীরতার দিকে এগোতে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট নৌকাটিকেও দূরপাল্লায় টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। বৃদ্ধ লোকটি সুতোটা খুব সাবধানে ধরে রেখেছিল, যাতে মাছটা হ্যাঁচকা টানে সুতো ছিঁড়ে সমুদ্রের মধ্যে পালিয়ে না যেতে পারে এবং তাকেও না টেনে নিয়ে যেতে পারে নৌকোসুদ্ধ জলের মধ্যে।

তৃতীয় দিনের সকালে দেখা গেল যে মাছটি ভারী নৌকোটা টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে সমুদ্রের ওপরে ভেসে উঠল।

এখন এই বেদনাতুর ও ক্লান্ত বৃদ্ধ জেলে ঠিক করলো যে মাছটিকে কঠিন আঘাতে মেরে ফেলতে হবে, কারণ মাছটিকে পঙ্গু করলে পরে সে আরো উত্তেজিত হয়ে তার অনিষ্ট করবে।

ঐ বৃদ্ধ জেলে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে মাছের দেহে হারপুন চালিয়ে দিল। এইবার মাছটি জলে ঝাপিয়ে পড়ে মরে গেল। তখন সেই প্রকাণ্ড মাছটাকে নৌকোয় জাপ্টে তুলে অনুকূল

বাতাসে বাড়ির দিকে ফিরলো জেলে। তারপর নৌকোতে এই প্রকাণ্ড মরা মাছ দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঙ্গর ছুটতে লাগলো। তাদের ক্ষুরের মত ধারাল দাঁত দিয়ে তারা এই নৌকোতে জাপ্টে তোলা মাছকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে লাগলো। পুরো তিনটি রাত ধরে হাঙ্গরদের সঙ্গে বৃদ্ধ লোকটি যুদ্ধ করলো। নৌকোর হাল ঘোরাবার হাতল,ছুরি, মোটা লাঠি ও হারপুন দিয়ে হাঙ্গরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বৃদ্ধ লোকটি যখন নামলো, তখন মাছের খালি শাদা শিরদাঁড়াটি পড়ে আছে। এই রকম করে মাছটিকে হারিয়ে বৃদ্ধ লোকটি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। পরদিন সকালে গ্রামের সকলে অবাক হয়ে দেখলো, মাছের নৌকোর সঙ্গে বাঁধা কঙ্কাল নৌকোর চেয়েও ২ ফিট লম্বা। একজন হোটেলের মালিক বললে, কি চমৎকার মাছই ছিল এটা। এরকম মাছ জীবনে দেখা যায়নি। তারপর তারা অবাক হয়ে বৃদ্ধ জেলের দিকে তাকিয়ে দেখলো যে তিনদিন সমুদ্রে যুদ্ধ করে সে মাত্র এই মাছের কঙ্কালটি নিয়ে এসেছে।

স্বপ্ন

শ্রীসুবীর চট্টোপাধ্যায়

গভীর রাতে ঘুমের মাঝে স্বপ্ন এলো ভেসে,
রাতে যেন চলছি আমি, রূপ-কাহিনীর দেশে।
ঘুমের পরীর সাথে সাথে অনেক অনেক দূরে,
মাঝে মাঝে রাতের পাখি, গাইছে কত সুরে।
স্বপ্ন যদি, হায়রে ভাবি, সত্যি কথা হতো—-
এলেমেলো খেয়াল-খুশির চিন্তাগুলো যতো।
ভেসে আসে স্বপ্ন হয়ে আমার ছু'টো চোখে,
রাতে রাতে তাইতো ঘুরি, দূরের কল্পলোকে।
যেন কত দেশ-বিদেশে বেড়াই আপন ভুলে,
চলছি তো তাই মেঘের ভেলায় হাওয়ায় ছুলে ছুলে।
আমি যেন রাজপুত্তুর যাচ্ছি উড়ে সেথা,
রূপ-জগতের রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে যেথা।
কাহিনীর শেষ হবার আগেই ভাঙ্গলো আমার ঘুম,
দেশেই আবার ফিরে এলেম, সূয্যি দিলো চুম।

পাখীর ডাকে

শ্রীসুখেন্দু দত্ত

'পুত কৈ, পুত কৈ !'

সামনেই আমগাছের পাতার আড়াল থেকে কি একটা পাখী করুণ স্বরে ডাকছে। প্রতি বছরই বর্ষার সময় কোথা থেকে আসে পাখীটা, আর এমনি করুণ স্বরে ডাকে।

বার কয়েক ডেকেই পাখীটা উড়ে যায়। কিন্তু একটু পরেই আবার পাশের ডাল থেকে শোনা যায় তার সেই বিষণ্ণ করুণ-কণ্ঠের ডাক, 'পুত কৈ, পুত কৈ !'

কেউ জানে না, পাখীটা ডেকে ফিরছে তার ছানাদের। আর সেই সঙ্গে খুঁজে ফিরছে তার সেই হারান নীড়, যেখানে সে একদিন তার ছানাদের রেখে গিয়েছিল। কিন্তু ফিরে এসে সে তাদের কাউকে আর পায়নি।

নদীর তীরে সেই ববালা গাছের ছোট্ট ডালে তার সেই ছোট্ট বাসাটির কথা আজও পাখীর মনে পড়ে। আজও সে ভুলতে পারেনি তার সেই ছোট্ট ছানা তিনটির কথা। তখনও তাদের সব পালক ওঠেনি, উড়তেও শেখেনি তারা। বাবলা গাছের ডালের সেই ছোট্ট বাসাটিতে সারা দিন পড়ে থাকত ছানাগুলো, কখন তাদের মা ফিরে আসবে তাদের খাবার নিয়ে সেই আশায়।

সেদিনও ভোর হতেই পাখী তার বাচ্চাদের রেখে বেরিয়েছিল। তাকে যেতে হবে অনেক দূর, কারণ কাছাকাছি কোথাও আর খাবারের একটা দানাও পাওয়া যাচ্ছিল না। ক'দিন ধরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। শ্রাবণ মাসের সেই বর্ষণের যেন আর অন্ত নেই ! খাল-বিল-নালা সব জলে ভরে গেছে। নদীরও কূলে কূলে জল। পাখীর বাসায় বাচ্চাগুলোয় ক'দিন ধরে সমানে জলে ভিজছে।

পাখীকে সেদিন তাই উড়ে যেতে হয় অনেক দূরে। যেতে যেতেই সে দেখতে পায়, আশেপাশে চারিদিকে শুধু জল। ক্ষেত-খামার সব জলে ডুবে গেছে, একটা ধানের শিষও কোথাও মাথা তুলে নেই। তখনও ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, আকাশও মেঘলা।

পাখীকে তাই সেদিন উড়ে যেতে হয় অনেক, অনেক দূরে। খাবার নিয়ে তাকে ফিরতে হবে। বাচ্চারা যে তার মুখ চেয়ে বসে আছে !

তাই পাখী সেদিন ফিরে আসে অনেক দেরী করে। কিন্তু একি ! দূর থেকে দেখেই পাখী চমকে ওঠে। নদীর আজ একি রূপ ! দুই কূল গ্রাস করে ঘোলা জলের রাশি ছুটে চলেছে, জলে ভেসে যাচ্ছে কত লতা-পাতা-ডাল ! মাঠ-ঘাট-গাছপালা সব ডুবে গেছে। নদীতে একটা নৌকো নেই, তীরে একটা লোক নেই। কিছু নেই, কিছু নেই ! চারিদিকে শুধু শোনা যাচ্ছে একটা আর্ত হাহাকার বন্যা, বন্যা !

দেখে আতঙ্কে শিউড়ে উঠে পাখী। ডানা মেলে প্রাণপণে উড়ে যায় নদীর তীরে সেই বাবলা গাছটার দিকে। কিন্তু কোথায় সেই বাবলা গাছ আর কোথায়ই বা গাছের ডালে তার সেই ছোট্ট বাসা! আগের দিনও যে নদী ছিল শান্ত, এখন তা রাক্ষসীর মত দুই কূল গ্রাস করে খলখল হাসিতে ছুটে চলেছে। খরস্রোতে কুটোর মত কোথায় ভেসে গিয়েছে তার সেই ছোট্ট বাসা আর ছানারা! মুহূর্তে পাখীর চোখে সমস্ত জগৎ-সংসার যেন অন্ধকার হয়ে যায়। ভাঙা বুকের মধ্য থেকে আর্তস্বরে হাহাকার করে ওঠে সে, 'পুত কৈ, পুত কৈ!'

কিন্তু সে ডাকে কেউ সাড়া দেয় না। শুধু খলখল হাসিতে ছুটে চলে নদী, যেন কিছুই হয় নি! কোন দুরন্ত শিশু যেন আপন মনে খেলছে-হাসছে-ছুটছে, আর অবহেলায় সরিয়ে দিচ্ছে সব কিছু। তার খেলার খেয়ালে সব বাধাকে ঠেলে দিয়ে উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে সে কোন্ নিরুদ্দেশের পথে।

নদীর সেই কালস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে পাখীও এবার উড়ে চলে। নদী-তীরের কাশবন আর বনঝাউ জলে ডুবিয়ে, গাছপালা সবকিছু জলে ভাসিয়ে, হাহা-হাহা শব্দে ছুটে চলেছে নদী। ফুঁসতে, ফুঁসতে ছুটে চলেছে যেন অনন্ত জলস্রোতের ধারা! যত দেখে ততই শিউরে ওঠে পাখী। ভয়ার্ত করুণ স্বরে ডাকে, 'পুত কৈ, পুত কৈ!'

কত-গ্রামের পর গ্রাম উড়ে পার হয়ে যায় পাখী, কিন্তু সেই ডাকের কোন সাড়া পায় না। ঘোলা জলের স্রোতে নদী শুধু দুরন্ত বেগে বয়ে যায়, কে জানে কোন অজানার টানে!

তারপর আবার একদিন বন্যার স্রোত কমে আসে, জল নেমে যায়। শান্ত হয়ে আসে নদী। পাখী তখন ফিরে আসে। মাঠ-ঘাট, ক্ষেত-খামার, বন-বসতি সব কিছু আবার জেগে উঠেছে। ঐ তো, নদীর তীরে সেই ছোট্ট বাবলা গাছটাও আবার দেখা যাচ্ছে! ডানা মেলে প্রাণপণে উড়ে যায় পাখী। কিন্তু নেই, গাছের ডালে তার সেই ছোট্ট বাসাটা আর নেই! তার ছানারাও নেই!

'পুত কৈ, পুত কৈ!' বাবলা গাছের উঁচু ডালে পাখী উড়ে এসে যেন আছড়ে পড়ে। তারপর উড়ে গিয়ে বসে সেই ডালটায়, যেখানে একদিন তার ছোট্ট বাসাটা ছিল! গাছের ডালে ঘষে ঘষে দুই ঠোঁটকে সে রক্তাক্ত করে তোলে আর শোকার্ত করুণ স্বরে ডাকে, 'পুত কৈ!'

কিন্তু সে ডাকে কেউ সাড়া দেয় না। শুধু উচ্ছলিত চোখের জলের মত নদীর জল ছলছল শব্দে বয়ে যায় আর জল থেকে সদ্য জেগে ওঠা গাছগুলো বাতাসে করুণভাবে মাথা দোলায়, নেই নেই, তারা নেই!

সেই থেকে আজও পাখী তার সেই হারানো ছানাদের কেঁদে কেঁদে খুঁজে ফিরছে। 'পুত কৈ, পুত কৈ!' যুগ যুগ ধরে এমনি করে কেঁদে ফিরছে পাখী। তার সেই খোঁজার বুঝি শেষ নেই, সেই কান্নারও শেষ নেই!

উপন্যাস

তৌথক্ষীদের ফকির

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। কলকাতার অফিসে জাহাজের ব্যাপার-ট্যাপার নিয়েই কাজকর্ম শিখেছিলাম. কিন্তু জাহাজ-সম্পর্কে আমার সরাসরি কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। অফিস থেকে কখনো-সখনো কাজের ব্যাপারে আমাকে জাহাজে পাঠাতো অবশ্য, কিন্তু জাহাজের ভিতরকার খুঁটিনাটি বা তার খবরাখবর আমি জানবো কোথা থেকে ?

সেই জন্য, বম্বের জেটিতে জাহাজে ওঠার মুহূর্তটি থেকে আমার মনের চাঞ্চল্য আর উত্তেজনার সীমা-পরিসীমা ছিল না। এজেন্টের লোকটির পিছনে-পিছনে জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌ছি, আর আমার মন যেন সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে,—নিউইয়র্ক, লণ্ডন, কোপেনহেগেন, আর ফরাসী বা জার্মানীর কোনো নাম-না-জানা বন্দরে।

এজেন্টের লোকটি প্রথমেই আমাকে নিয়ে গেল জাহাজের ঠিক মাঝখানে যে-ঘরগুলো আছে, তারই তে-তলায়, ক্যাপ্টেনের ঘরে ? ফর্সা ধবধবে রঙ , ঝক্‌ঝকে চেহারার ভারিক্কী ধরণের সাহেব-সুবোই হবে ক্যাপ্টেন, এই ছিল আমার ধারণা। গিয়ে দেখি, মানুষটি অতিরিক্ত লম্বা, রোগাটে চেহারার লোক, গায়ের রঙ্ ধবধবে ফর্সা নয়, বরং বেশ একটু ময়লা। লোকটিও সাহেব-সুবো নয়, রীতিমত ভারতীয়। তবে বাঙালী নয়,—গুজরাটি। নাম,—মিষ্টার দুধওয়ালা।

মিষ্টার দুধওয়ালা এজেন্টের লোকটিকে খাতির ক'রে বসতে ব'লে আমার দিকে মুখ ফেরালেন, বললেন,—কেয়া নাম তুম্‌হারা ?

'তুম্' বা 'তুমি' শুনে একটু বিশ্রীই লাগলো। তার ওপরে হিন্দীতে কথাবার্তা, আরও বিশ্রী। রাগটা 'হিন্দী-ভাষা'র ওপরে নয়, আমার কল্পনায় আঘাত পড়াটাই আমার রাগের কারণ। মনে-মনে কতো ইংরেজী কথাবার্তা বলে নিয়েছি, অফিসের অবসরে কতো ট্রান্‌স্লেসন করেছি খেটেখুটে, অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে দরকার না থাকলেও কতো ইংরেজীতে কথা বলার অভ্যাস করেছি,—কিন্তু সে কী এই জন্য ?

অবশ্য, চাকরী রাখতে গেলে এ-সব গায়ে মাখলে চলে না। মনের রাগ মনেই চেপে রেখে উত্তর দিলাম ওঁর কথার। তবে ইংরেজীতে, বললাম,—মাই নেম্ ইজ্ সুকুমার ভট্টাচার্য।

মিঃ দুধওয়ালার মুখখানা একটু হাঁ হয়ে গেল, বললেন,—সু—হোয়াট্? ফিন্ বোলো।

আবার বললাম। মিঃ দুধওয়ালা হাত নেড়ে বলে উঠলেন,—না বাবা, মুঝ্‌সে নেহী হোগা। বহুত্যা—কেয়া বোলো? ইয়াদ নেহী রহেগা। তুম্‌হারা 'ফার্ষ্ট নেম'ই হামারা পসন্দ হায়। সু—কুমার? আচ্ছা?

বললাম,—অল্ রাইট্।

মিঃ দুধওয়ালা বললেন,—না বাবা, আভিতক্ 'রাইট্' নেহী হুয়া। উস্‌কো সিধা 'কুমার' কর্ দো।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এজেন্টের লোকটি মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগলো।

মিঃ দুধওয়ালা বললেন,—তো কুমার, তুম্‌হারা 'পেপার্স' দিখলাও।

এজেন্টের লোকটির কাছে আমার কাগজপত্র ছিল। সে সেগুলি তার বড়ো ব্যাগটা থেকে বার করে ক্যাপ্টেনের টেবিলে রাখলো।

ক্যাপ্টেন ওগুলোতে সামান্য একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন,—অল্‌রাইট্ ও-গুলি পরে দেখবো'খন।

কথাটা এবার অবশ্য পুরোই ইংরাজীতে তিনি বলেছিলেন এজেন্টের লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে। আমি বোঝানোর সুবিধার জন্য বাংলায় লিখলাম।

তারপরে উনি করলেন কী, কলিং বেল্‌টা টিপলেন। ভিতরে—কিংবা—দোতলায় কোথাও 'ক্রিং'-শব্দ হলো।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন (আবার সেই হিন্দীতে),—তোমার জিনিসপত্র কোথায়?

আমি বলতে লাগলাম,—আই হ্যাভ কেপ্ট মাই থিংস্ ডাউন বিলো (অর্থাৎ, আমি নীচে রেখে এসেছি)।

আমার ইংরেজীর ধরণ শুনে মিঃ দুধওয়ালার চোখ দুটো কৌতুকে ঝলমল করে উঠলো। এজেন্টের লোকটি মুখ ফেরালো। ক্যাপ্টেন উত্তরে বললেন,—আচ্ছা?

জিনিসপত্র বলতে একটি সুটকেশ, আর বালিস-জড়ানো একটা শতরঞ্চি।

যাই হোক, ততক্ষণে ওঁর 'কলিং বেল'-এর উত্তরে একটি লোক তটস্থ হয়ে এসে দাঁড়ালো দরজার বাইরে।

তাকে দেখে ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন,—এ হচ্ছে 'কুমার'-রাইটার,—একে চীফ ষ্টুয়ার্টের কাছে নিয়ে যাও।

তারপরেই আমার দিকে ফিরে,—আচ্ছা যাও তুমি ওর সঙ্গে, নীচের তলায়।

এ-সব কথাবার্তা হলো হিন্দীতে। আমি এজেন্টের লোকটির দিকে তাকিয়ে মাথাটা একটু

হেলিয়ে তাকে ইঙ্গিতে 'যাচ্ছি' বলে লোকটির পিছনে-পিছনে গেলাম। লোকটা সিঁড়ি দিয়ে তর্‌তর্ ক'রে নেমে গেল, আমি অতো তাড়াতাড়ি পারবো কেন ?

'লোকটা' 'লোকটা'—বলছি বটে, কিন্তু বয়সে আমারও ছোট। নীল রঙের সরু লম্বা প্যান্টের ওপরে ডোরাকাটা জার্সি পরা, গায়ের রঙ ফর্সাই, মুখখানা একটু তামাটে দেখায়, উনিশ কুড়ির বেশী হবে না বয়েস।

আমরা দোতলা থেকে আবার সিঁড়ি দিয়ে নীচে এলাম। ছেলেটা এই সময় আমার দিকে ফিরে বললে,—জিনিসপত্র কোথায় রেখেছেন ? পরিষ্কার বাঙলায় কথা বলে উঠলো ছেলেটি। আমি তো অবাক! সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছে থম্‌কে দাঁড়িয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে।

ও বললে,—কী হলো ?

বললাম,—তুমি—মানে—আপনি—বাঙালী ?

ছেলেটা হেসে ফেললো, তারপরে বললে,—'তুমি' করেই বলবেন। আপনি জাহাজের রাইটার, আর আমি সামান্য 'প্যান্‌ট্রি-বয়'। কোথায় জিনিসপত্র ?

বললাম,—জাহাজের সিঁড়ির কাছে যে পাহারা দিচ্ছে, তার কাছে।

ও বললে,—বুঝেছি। আসুন আমার সঙ্গে।

গলির মতো সরু পথ, তার দু'পাশে ছোট-ছোট কেবিনগুলো খোপের মতো সারি সারি সাজানো। সেই কামরাগুলো পেরিয়ে ছেলেটা চলতে লাগলো, আমি পিছনে-পিছনে।

বম্বেতে—জাহাজে উঠে—একজন বাঙালীর দেখা পাবো, এ আমি ভাবতেই পারিনি। সেজন্য খুশীর উচ্ছ্বাস আমি সামলাতে পারছিলাম না। পিছন থেকেই বলে উঠলাম,—আপনার—তোমার—নাম কী ভাই ?

ছেলেটা চল্‌তে চল্‌তে মুখ ফিরিয়ে আমাকে বললে,—বিশ্বাস।

তারপরেই দ্রুত পা চালিয়ে একেবারে ডান দিককার শেষ কামরাটির সামনে এসে দাঁড়ালো। টোকা দিলো।

ভিতর থেকে সাড়া এলো,—কাম্ ইন্।

ছেলেটা আমাকে ইঙ্গিত করে ভিতরে ঢুকলে দরজা ঠেলে। আমি ঢুকে-পড়া উচিত কিনা, বুঝতে না পেরে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বিশ্বাস এক মুহূর্ত পরেই দরজা ঠেলে মুখ বাড়ালো। বললে,—আসুন। সাহেব ডাকছে। ঘরে ঢুকে কিন্তু বিশ্বাস ছাড়া কাউকে দেখতে পেলাম না। হকচকিয়ে গেছি দেখে বিশ্বাস

বললে,—বাথরুমে আছে। যান না? দরজা খোলা। কাগজ পড়ছে। বেশী বক্‌বক্ করবে না, দেখা করেই চলে আসুন।

ব'লে বিশ্বাস করলো কী, দেয়ালে একটা ফ্রেমের মধ্যে সারি সারি পেরেকে টাঙানো একটা চাবি নিয়ে দরজা ফাঁক করে বাইরে চলে গেলো।

—ইয়েস?

বাথরুমের দিক থেকে গলার সাড়া পেয়ে সেদিকে নিজের অজান্তেই একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম। অদ্ভুত কাণ্ড!

মোটা মতন রোমশ একটি লোক চেয়ারে বসার মতন বসে আছে, সামনে একটি ইংরেজী খবরের কাগজ খোলা। কোমরের কাছে একটা ঘোর নীল রঙের লুঙ্গি জড়ো করা।

লোকটা কালো নয়,—রোদে পুড়ে তামাটে চেহারা হয়ে গেছে। মুখে থুতনির কাছে একটু দাড়ি, ঠোঁটের ওপরে ছাঁটা গোঁফ,—বাকীটা সযত্নে কামানো।

আমি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছি দেখে লোকটা যেন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো বললে,—হোয়াই লুক অ্যাট্? মি নো অ্যানিম্যল্।

এ আবার কী ধরণের ইংরেজী রে বাবা! এ-রকম ইংরেজী ভুল যদি করতুম ট্রান্‌স্লেসনে বাবা অমনি কান দুটো ধ'রে আচ্ছা করে মলে দিতেন।

আমার থতমত ভাব দেখে লোকটা বুঝি একটু নরম হলো, বললে,—ইয়ু—রাইটার?

আমি একটু ঢোঁক গিলে ব্যাকরণ শুদ্ধ করে (যেমন করে ট্রানস্লেসন করতাম) বলতে গেলাম —I am the—

—আই নো—আই নো—বলে লোকটা আমাকে থামিয়ে দিলো, বললে,—ইয়ু গো—টক লেটার।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু মাথাটাথা কেমন সব ঘুলিয়ে গেল।

'ইয়ু গো' না হয় বুঝলাম—'টক্ লেটার' আবার কি? কলকাতার অফিসেও তো কাজ করেছি, দু'একবার জাহাজেও গেছি, সে-সব সাহেবদেরই জাহাজ,—কিন্তু এরকম ইংরেজী কখনো শুনিনি।

(ক্রমশঃ)

জাতীয় স্কুল মুষ্টিযুদ্ধ

কয়েকদিন আগে কলকাতার কাছেই ফলতায় ভারতের প্রথম জাতীয় স্কুল মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। এই প্রতিযোগিতায় ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিচয় পাওয়া যায়। পি. এল. রায়ের মতন প্রবীণ মুষ্টিযোদ্ধা ছাত্রদের লড়াই দেখে বলেছেন: স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে যে ক্রীড়াসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়েছি এবং তাদের মধ্যে যে নৈপুণ্যের আভাস মিলেছে তাতে উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পেলে মুষ্টিযুদ্ধে এরা ভারতের যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে গড়ে উঠতে পারবে। শ্রীরায় ছাড়া আরো অনেকেই এরকম আশা প্রকাশ করেছেন।

জাতীয় স্কুল মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার প্রথম বছরের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সমেত আটটি রাজ্যের একাত্তরজন মুষ্টিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেন। ৪৮ পয়েন্ট পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ দল দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর সম্মান লাভ করে সিনিয়র বিভাগে মধ্য প্রদেশের গৌর ঘোষ এবং জুনিয়র বিভাগে পশ্চিমবঙ্গের প্রবীর দে।

হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ

বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশন ও পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গের হকি খেলোয়াড়দের এক মাস কোচিং দেবার জন্যে অতীতের খ্যাতনামা হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ কলকাতায় এসেছিলেন। ধ্যানচাঁদ সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। তোমরা যারা খেলাধুলোর খোঁজখবর রাখো তারা সবাই জানো, ধ্যানচাঁদ ছিলেন বিশ্বের হকি-বিস্ময়। শুধু একজন ভালো খেলোয়াড় হিসেবে নয়—খেলার জ্ঞান, শিক্ষা দেবার অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির জন্যে ধ্যানচাঁদ ভারতের গর্ব।

বর্তমানে হকি খেলার চেয়ে ফুটবল ক্রিকেটে আমাদের উৎসাহ বেশি। ধ্যানচাঁদ দুঃখ করে বলেছেন: হকি খেলায় ভারতের সুনাম বজায় রাখতে হলে হকিকে মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ

জাতীয় ক্রীড়া-শিক্ষায়তনের হকি-প্রশিক্ষক বিশ্বখ্যাত হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যানচাঁদ ইডেন উদ্যানে আয়োজিত হকি খেলার শিক্ষা-শিবিরে স্কুলের ছাত্রদের শিক্ষাদান করছেন।

করতে হবে, হকিকে ভালোবাসতে হবে। স্টিকের মাথায় বল নিয়ে একের পর একজন প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দিয়ে গোল করার মধ্যেই আমি পেতাম অপূর্ব আনন্দ আর হাততালি।

ছোটরা যারা হকি খেলতে ভালোবাসে এবং ভালো হকি খেলোয়াড় হতে চায়, কলকাতায় থাকার সময় ধ্যানচাঁদ তাদের বেশ কয়েকদিন হকি খেলার নানারকম কলা-কৌশল শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। ধ্যানচাঁদ যে কথাগুলো বলেছেন বাঙলার কিশোর হকি খেলোয়াড়রা নিজেদের জীবনে সেই শিক্ষাটুকু গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে তাদের সাফল্যের পথ অনেকখানি পরিষ্কার হবে, তা বলাই বাহুল্য।

উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা

প্রতি বছরই জুন-জুলাই মাসে ইংলণ্ডে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডন খেলা হয়। এবারও হয়েছে। আন্তর্জাতিক টেনিস সংস্থার ব্যবস্থাপনায় টেনিসে বিশ্বপ্রাধান্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নেই। উইম্বলডন বিজয়ীই বিশ্বজয়ী টেনিস খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়ে থাকেন। যুদ্ধের কয়েকটা বছর বাদ দিলে প্রতি বছরই উইম্বলডন প্রতি-যোগিতা হয়েছে। এবারকার অনুষ্ঠান উইম্বলডনের ৭৯তম অনুষ্ঠান।

উইম্বলডনের পক্ষকালব্যাপী খেলায় প্রায় আড়াই লক্ষের মতন দর্শকের সমাগম হয়। শুধু খেলোয়াড়-রাই নন, ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে, এমন কী ইউরোপের বাইরে থেকেও টেনিস-রসিকরা এই খেলা দেখতে ছুটে আসেন। এবার প্রাথমিক প্রতিযোগিতা নিয়ে ২৯৮ জন পুরুষ, ২০৭ জন মহিলা এবং ৮০ জন তরুণ উইম্বলডনে অংশ গ্রহণ করেছেন।

ভারতের কোন্ খেলোয়াড় সর্বপ্রথম উইম্বলডনে অংশ নেন তার সঠিক খবর জানা না গেলেও বিশ দশকের আগে সম্ভবতঃ ভারতের কোনো খেলোয়াড়

(পাশের ছবিটি গাউস মহম্মদ)

উইম্বলডনে যোগ দেননি। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড গাউস মহম্মদ প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তারপর মদনমোহন, সুমন্ত মিশ্র, নরেশকুমার, রমানাথন কৃষ্ণন, জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিত লাল প্রমুখ ভারতীয় খেলোয়াড়রা উইম্বলডনে অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এক কৃষ্ণন ছাড়া কেউই বেশি দূর এগোতে পারেননি। কৃষ্ণনই ভারতের একমাত্র খেলোয়াড় যিনি ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালে পর পর দু' বছর সেমি-ফাইন্যালে উঠেছেন এবং একমাত্র তিনিই বাছাই তালিকায় স্থান পেয়েছেন।

এবারের প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলীয় খেলোয়াড়রা একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করেছেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যালে রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) ৬—২, ৬—৪ ও ৬—৪ গেমে ফ্রেড স্টোলেকে (অস্ট্রেলিয়া), মহিলাদের সিঙ্গলস্ ফাইন্যালে কুমারী মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৪ ও ৭—৫ গেমে গতবারের বিজয়িনী কুমারী মারিয়া বুনোকে (ব্রাজিল), পুরুষদের ডাবলস্ ফাইন্যালে টনি রোচ ও জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) ৭—৫, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে কেন ফ্লেচার ও বব্ হিউইটকে (অস্ট্রেলিয়া), মহিলাদের ডাবলস্ ফাইন্যালে মারিয়া বুনো (ব্রাজিল) ও বিলি জিন মোফিট (আমেরিকা) ৬—২ ও ৭—৫ গেমে এফ. ডুর ও জে. লিফরিগকে (ফ্রান্স), এবং মিকসড্ ডাবলস্ ফাইন্যালে কেন ফ্লেচার ও মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) ১২—১০ ও ৬—৩ গেমে টনি রোচ ও কুমারী জে. এম. টেগার্টকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

চোখের ধাঁধা
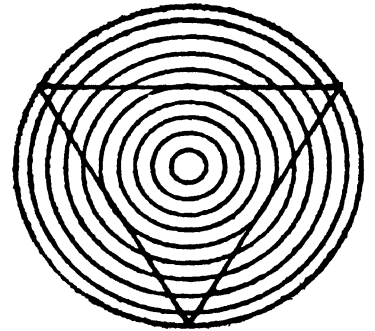
ছবি দু'টির মধ্যে দুটি চোখ-ধাঁধানো ব্যাপার আছে। বাঁয়ের ছবিটিতে একটি কালো জায়গার ভিতর থেকে একটি চৌকো অংশ কেটে নিয়ে সমান মাপের সাদা অংশের মধ্যে রাখা হয়েছে। তাতে কাল অংশটিকে বড দেখাচ্ছে, কিন্তু আসলে এটি বড় নয়। ডাইনের ছবিটিতে গোল কতকগুলি বৃত্তের মধ্যে একটি ত্রিভূজ আঁকা আছে। ত্রিভুজটির লাইনগুলি বেঁকা নয়, কিন্তু দেখলে বেঁকা মনে হয়।

বার্ড অব প্যারাডাইস (Bird of Paradise) একটি অতিসুন্দর পাখির নাম। ১৫২১ খৃষ্টাব্দে নিউগিনিতে এই পাখি সবপ্রথম দেখা যায়। এই পাখি দেখতে এত চমৎকার যে এর নাম দেওয়া হয়েছিল স্বর্গীয় পাখি।

* * * *

Cenotaph কথাটা তোমরা হয়ত অনেকেই শুনেছ। এর প্রকৃত অর্থ অন্যত্র সমাহিত ব্যক্তির স্মৃতিস্তম্ভ। জাতীয় যুদ্ধস্মারক হিসাবে যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এই স্মৃতিস্তম্ভটি তৈরী হয়। কলিকাতার গড়ের মাঠে এইরূপ একটি Cenotaph আছে।

* * * *

মরুভূমির ভিতর দিয়ে উটরা অনেকদিন জল না খেয়ে যেতে পারে। কেউ কেউ বলে, উটের পিঠে যে কুঁজ আছে তার মধ্যে জল জমা হয়ে থাকে। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। এই কুঁজের মধ্যে থাকে চর্বি যার সাহায্যে মরুভূমিতে খাদ্য না পেলেও উটরা অনেকদিন বাঁচতে পারে। উটের পেটের ভেতর কয়েকটি কোষ আছে। সেগুলির ভেতর জল জমা থাকে।

* * * *

'ইফেল টাওয়ার'-এর নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ। ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার Gustave Eiffel প্যারিস এগজিবিশনের সময় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এই লৌহস্তম্ভ তৈরী করেছিলেন! এই স্তম্ভটি একটি রাস্তার দু'ধারে পা ফেলে দাঁড়িয়ে আছে এবং উচ্চতায় এটি ৯৮৪ ফিট। এই স্তম্ভের শীর্ষে একটি গ্যালারি থেকে সমস্ত প্যারিস শহরের দৃশ্য দেখা যায়। এই সর্কোচ্চ স্থানে খাবারের দোকান (Restaurant) আছে। স্তম্ভের চূড়ায় একটি হাওয়া-ঘর আছে এবং সেখান থেকে একটি বেতার-গৃহের সাহায্যে রেডিও ও টেলিভিসনে কথা বলা ও ছবি পাঠানো হয়।
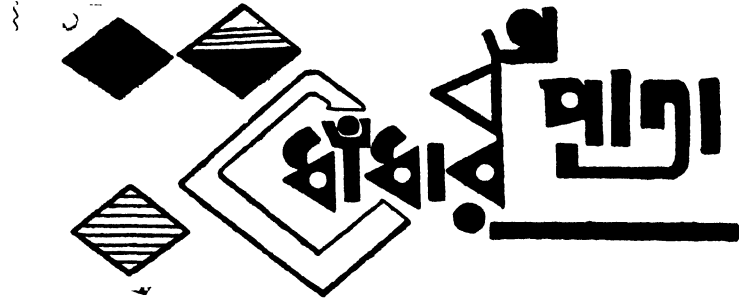
১। আদ্যাক্ষর বলব না, শেষাক্ষরও ঐ
নির্মস্তক ভেদাকার ভেদমাত্র ঐ।
মধ্যম রায় বলি হে তোমারে
মূর্খেতে বুঝিতে নারে দ্বাদশ বৎসরে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। দেখিতে সুন্দর অতি রূপ মনোহর
বণিকের গুণে বদ্ধ আছে বহুতর।
এক মুখে গুণ তার কেবা সহ্য করে,
দশ মুখ বাস করে তাহার ভিতরে।

শ্রীবকুল বসু

৩। কোন পক্ষী গেলে বলি রাজার সদন
পীড়িত লোকের করে মঙ্গল সাধন ?

কুমারী কমলা রায়

৪। এমন কি বস্তু দেহে লভিলে আকার,
সমাদর করে লোকে ধনী বলে তার।

শ্রীমিনতি মুখোপাধ্যায়

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

(১) খেলার সময় মুখে পাইপ দিয়ে কেউ খেলে না। সাত নম্বর দেওয়া জামাটা ভুল পরা, পেছনের দিকটা সামনে এসেছে। ঐ ছেলেটিই এক পায়ে খেলার বুট ও অপর পায়ে 'গাম বুট' পরেছে, এ ভাবে কেউ খেলতে নামে না। মধ্যের ছেলেটির এক পা খালি, অপর পায়ে জুতোও এটা হাস্যকর। বাকী ঐ ছেলেটি এক হাতে একটি 'বক্সিং গ্লাব' পরেছে। ওর জামার একটি হাতা পুরো 'জার্সি'র মত, অপরটি স্বাভাবিক; এ কি ক'রে হয়! শেষ বাঁ দিকের ছেলেটির জামার দু'দিকের হাতা দু'রকম। তাছাড়া তার দু'টি পায়ে দু'রকম জুতো। প্যাণ্টের দু'পায়ের ঝুল দু'রকম। বাকী মধ্যে ও ডাইনের ছেলে দু'টির মাথার চুলে রঙ দেওয়া হয়নি। মাথার চুল তিনটি ছেলেরই একরকম হওয়া উচিত ছিল।

(২) চাবুক (৩) ২৸৹ (৪) নারিকেল (৫) ঘড়ি (৬) পরামাণিক (৭) ডাক্তার।

প্রশ্ন ও উত্তর

১। হ্যাট্‌ট্রিক (Hat-trick) কাকে বলে ?

একই লোকের পর পর তিনটে গোল দেওয়া বা পর পর তিন বলে উইকেট নেওয়াকে 'হ্যাট্‌ট্রিক' বলে।

২। Wightman Cup কাদের দেওয়া হয় ?

ব্রিটিশ বা আমেরিকান অপেশাদার মহিলা লন্ টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে যারা চ্যামপিয়ান হয়, তাদের এই কাপ দেওয়া হয়।

৩। কোন জন্তুদের invertebrate বলা হয় ?

যে সব জন্তুর মেরুদণ্ড নেই।

৪। কচ্ছপরা কোথায় ডিম পাড়ে ?

গরম বালির উপরে।

৫। যে উটের মাত্র একটি কুঁজ আছে তাকে ইংরেজীতে কি বলে ?

Dromedary.

৬। সূর্যের চারদিকে কয়টি উপগ্রহ ঘুরছে ?

পৃথিবী, বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), শনি (Saturn), মঙ্গল (**Mars**), বৃহস্পতি (Jupiter), ইউরেনাস (Uranus), নেপচুন (Neptune) ও প্লুটো (Pluto)—এই নয়টি।

৭। সাধারণ নুনের বৈজ্ঞানিক নাম কি ?

সোডিয়াম ক্লোরাইড (Sodium Chloride).

৮। এ-কথা কি ঠিক ?—বিংশ শতাব্দী ১লা জানুয়ারী, ১৯০০ থেকে শুরু হয়েছে

হ্যাঁ, ঠিক।

৯। হকি খেলা কেমন করে আরম্ভ হয় ?

Bully-off-এর সঙ্গে সঙ্গে।

১০। ক্রিকেট খেলায় ক'রকম ভাবে ব্যাটসম্যানকে আউট করা যায় ?

Bowled, Caught, Stumped, Run-out, L.B.W., Hit-wicket, Striking the ball twice এবং Obstruction of the fielder.

গত সংখ্যায় যখন তোমাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম—অসহ্য উত্তাপে তখন সারা পৃথিবী যেন ঝলসে যাচ্ছে, একটু বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে আর পথে বার হবার কথা মনে হলে ভয় করতো—এই ভাবে গোটা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কেটে গেল। মানুষের প্রাণ আর্তনাদ করছিল একটু শীতলতার জন্য, বৃষ্টি চাইছিল মানুষ প্রাণপণে। কি অসহ্য কি নিদারুণ প্রখর তপন তাপ!

আজ যখন তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি—তখন বৃষ্টির অজস্র ধারায় পৃথিবী শীতল হয়েছে—আকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি নেমেছে। কিন্তু আজ কয়েক দিন তা বিরামহীন বিশ্রামহীন। শহরের অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হয়ে আছে, বৃষ্টির ধারা যেন বিরাম মানছে না।

উত্তাপ কমে গেছে অজস্র বর্ষণে, কিন্তু দু'টো ঋতুই এ-বছর আমাদের কাছে এসেছে অস্বাভাবিক ভাবে। প্রখর গ্রীষ্মও যেমন—অঝোর বর্ষণও তেমনি।

তবু দু'টো—না দু'টো কেন, ছ'টা ঋতুই আমাদের প্রয়োজন—সব ক'টিকেই আমাদের চাই—না হলে চলবে না। তাই প্রখর গ্রীষ্ম, অশ্রান্ত বর্ষণ সবই আমরা চাই।

অনেকে পাশ করেছ জানিয়েছ—খুশী হয়েছি। একটি একটি করে পরীক্ষার খবর প্রকাশ হতে সুরু হয়েছে। এ-বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খবরে ভালো লাগছে। তোমরা যারা কৃতকার্য হয়েছ তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। যারা কৃতকার্য হওনি তাদের উৎসাহিত করছি আগামী বছরে সাফল্যের আশায়।

মহাজীবন থেকে—

অনেক পুরানো দিনের কথায় আসছি। কবে কত যুগ আগে বেদ লেখা হয়েছিল তার হিসেব করতে গেলে অন্ততঃ তিন-চার হাজার বছর আগে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। সেটা খুব পুরানো যুগ, কিন্তু পুরানো হলে কি হবে, সে সময় ভারতবর্ষে খুবই উচ্চস্তরের সভ্যতার

অস্তিত্ব ছিল। পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশেই তখন অজ্ঞানতার অন্ধকার। কিন্তু ভারতবর্ষ তখন থেকেই জ্ঞানের আলোতে দীপ্যমান। বেদ বেদান্ত উপনিষদ—এ-সব নিয়ে যারা আলোচনা করেছেন, তাঁরা সবাই ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছেন যে, অতো প্রাচীন যুগের মানুষের মনে ঐ রকম উচ্চাঙ্গের চিন্তা-ভাবনা কি করে এসেছিল। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, যে সমাজে অতো প্রাচীন যুগেই দর্শন ধর্ম ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে উচুঁদরের আলোচনা সম্ভব হয়েছিল—সে যুগের অধিবাসীরা শিক্ষা-দীক্ষায় কত উন্নত ছিলেন। এটা শুধু অনুমান নয়, ঐতিহাসিকরা একে সত্য বলেই মেনে নিয়েছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, আজ থেকে তিন-চার হাজার বছর তো বটেই, সম্ভবতঃ তারও অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষে বিরাট সভ্যতার অভ্যুত্থান হয়েছিল, আর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই সভ্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। তেমন প্রাচীন যুগেও আমরা এমন ক'জন বিদুষী নারীর পরিচয় পাই, যাঁদের জ্ঞান-গরিমার খ্যাতি হাজার হাজার বছরের দূরত্ব অতিক্রম করে আমাদের যুগে এসে পৌঁচেছে। এমনি একজন মহীয়সী মহিলা হলেন গার্গী।

আজকের কথা তো নয়—তাঁর যুগ কবে কেটে গিয়েছে। তাই তাঁর জীবনের ইতিহাস সন তারিখ মিলিয়ে বলা সম্ভব নয়। তখনকার যুগে মেয়েদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষালাভ করতেন, তাঁদের দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতো। একদল ছিলেন—বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সংসার-ধর্ম পালন করতেন, তাদের বলা হতো সদ্যোদ্বাহ। আরেক দল ছিলেন—যাঁরা চিরজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতেন, তাঁদের বলা হতো ব্রহ্মবাদিনী। গার্গী ছিলেন এমনি একজন ব্রহ্মবাদিনী। জ্ঞানালোচনাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল।

সে সময় মস্ত বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্য। তাঁর বিদ্যার পরিধি এত বিস্তৃত যে নামকরা পণ্ডিতেরাও তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে ভয় পেতেন। এহেন যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে গার্গী তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি গার্গীর পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। একবার জনক রাজা ঘোষণা করলেন যে, রাজ্যের মধ্যে যিনি সবচেয়ে জ্ঞানী আর গুণী তাঁকে তিনি একসহস্র গোধন দান করবেন। অনেক পণ্ডিত আর জ্ঞানী লোকে সভাগৃহ ভর্তি হয়ে গেলে যাজ্ঞবল্ক্য দাবী করলেন যে, গোধন তাঁরই প্রাপ্য, কারণ তাঁকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করতে পারে এমন পণ্ডিত দেশে কেউ আছেন বলে তাঁর জানা নেই। সভাগৃহে মৃদুগুঞ্জন শোনা গেল। কিন্তু কেউ যাজ্ঞবল্ক্যের দাবীর বিরোধিতা করতে সাহসী হলেন না। একমাত্র গার্গীই তাঁরসঙ্গে তর্ক করতে চাইলেন—তখন দেখা গেল, আরো সাতজন পণ্ডিত তর্ক করার ইচ্ছা জানালেন। যাজ্ঞবল্ক্য রাজী হলেন। পণ্ডিতদের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে গেল, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সহজেই তাঁর

প্রতিপক্ষদের একে একে ধরাশায়ী করলেন—শুধু গার্গীই ঋষিকে অনেক জটিল বিষয় নিয়ে দুরূহ প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবল্ক্য সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। গার্গীর কথামত জনক প্রতিশ্রুত গোধন যাজ্ঞবল্ক্যকে দান করলেন।

বচ্নু মুনির কন্যা, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী মনীষার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিভার যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন—হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও, আজও তা এতটুকু ম্লান হয়নি।

চিঠির উত্তর

রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলকাতা—

তুমি প্রশ্ন করেছ—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কোন মামলায় ব্যারিষ্টার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

—মাণিকতলা বোমা মামলায় তিনি আসামীদের পক্ষ সমর্থন করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

মৌসুমী চক্রবর্তী, বেলগাছিয়া—

তোমার প্রশ্ন কোন দেশে সবচেয়ে বেশী আগ্নেয়গিরি আছে?

—মধ্য আমেরিকার সান্-সালভাডোরে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।

নূপুর দত্ত, কোলকাতা; রণেন্দ্রমোহন লাহিড়ী, তেজপুর; শ্রাবণী পত্রনবীশ, যাদবপুর; বাবলু ঘোষ, শান্তিনিকেতন—তোমাদের চিঠি পেয়েছি। সকলে আবার চিঠি লিখো।

শুভেচ্ছা সহ—
তোমাদের
মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।
মূল্য: ০·৪৫ পয়সা
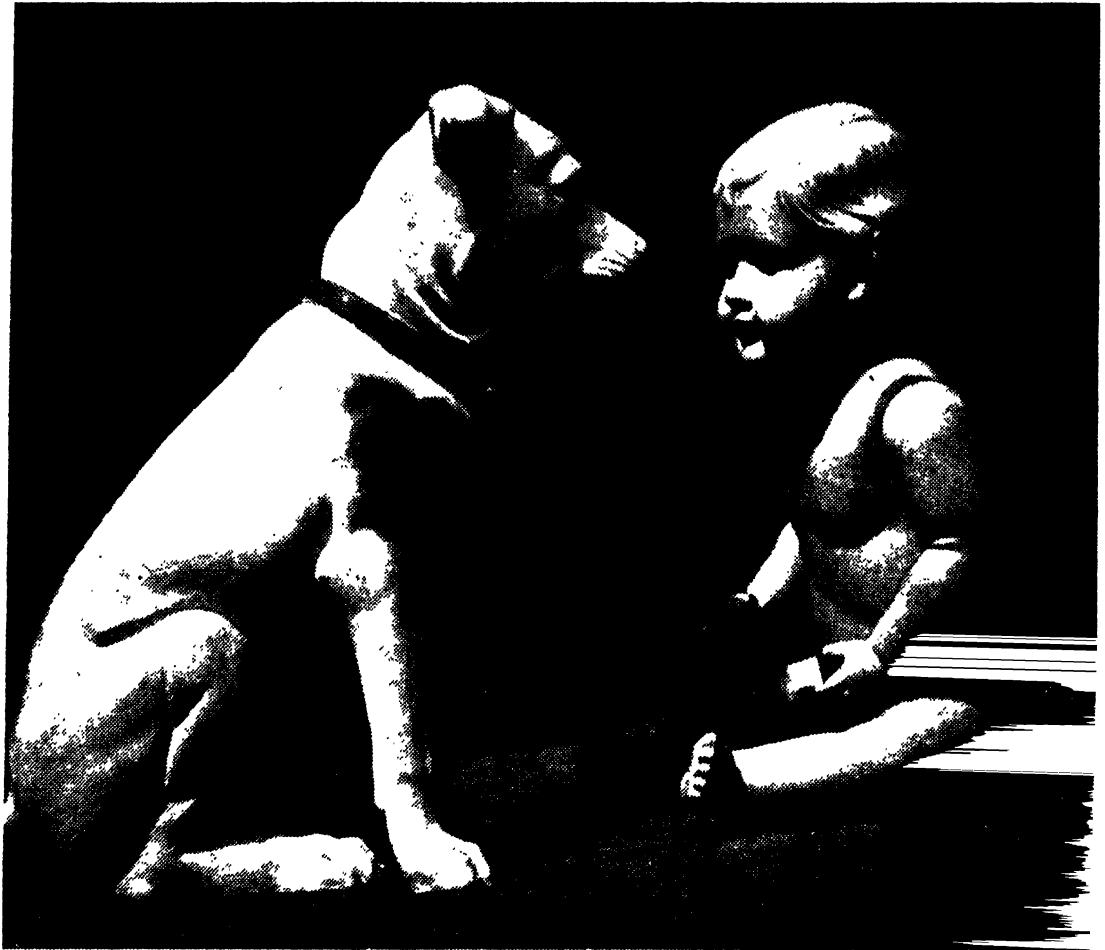
ালাপ

তোমার সঙ্গে বলব কথা কি
তুমি তো খেলার পুতুলটি।

ফটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *
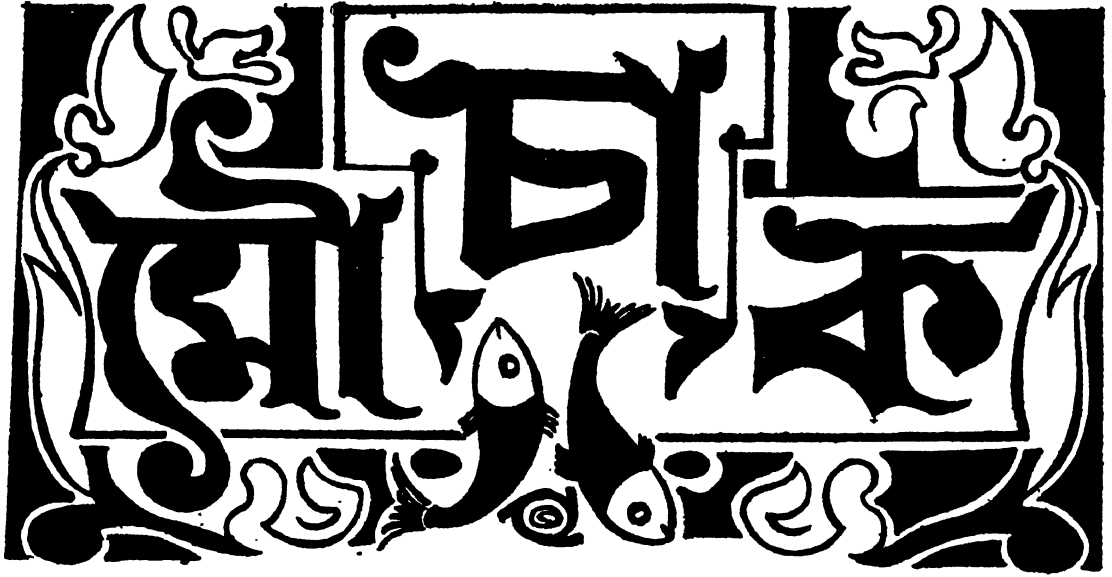
৪৬শ বর্ষ] ভাদ্র : ১৩৭২ [৫ম সংখ্যা

ভাঙতে পারো ?

শ্রীরবি গুপ্ত

"ভাঙব মোরা, ভাঙতে পারি"—
"বেশ তো ভালো, পণ কর তা',
ভাঙো, চায়ের কাপগুলো নয়,
দেহের মনের সব জড়তা।"

চিরুনি আর আয়না ভাঙো
ছুরি কাঁচি সেফটিরেজার !
ভাঙার মত ভাঙার বেলা
অবশ দু'হাত—মুখটি বেজার !

ভাঙতে পারো লোভের পাহাড়—
গুঁড়িয়ে মানুষ ওই যে ওঠে,
আকাশ-ছোঁয়া দম্ভ বধির
দেখি ধুলায় কেমন লোটে !

ভাঙতে পারো মিথ্যা-মুখোস
কঠিন হাতে ছল-চাতুরী,
উঠতে আপন সিংহাসনে
অজ্ঞানতার পাতাল ফুঁড়ি ?

কাচের গেলাস ভাঙছ রোজই—
ভাঙো প্রাণের অবাধ্যতা,
সত্যি ক'রে বলবে আমায়
উদ্যোগী যে—অসাধ্য তা' ?

তেলের শিশি ভাঙল বুঝি—
আদ্যিকালের গল্প এ যে,
হিংসা-দ্বেষের লৌহ শেকল
পড়ুক খ'সে—উঠুক বেজে !

জানলা ভাঙো দরজা ভাঙো—
চেয়ার টেবিল ভাঙতে হাজির,
হট্টমালের ভাঙতে পারো
অনিয়মের অন্ধ প্রাচীর ?

তার ছেঁড়ো আর চামড়া কাটো
উপড়ে ফেলো রেলের লাইন,
মানুষ-মারা ফন্দি যত—
ভাঙবে বোকার এমন আইন ?

আপন প্রাণের বিকাশ-পথে
ভাঙতে পারো দেয় যা বাধা ?
দেখবে শেষে সহজ অতি
হয় মনে আজ কঠিন যা' তা' !

"ভাঙব মোরা, ভাঙতে পারি"
"—বেশ তো ভালো, পণ কর তা',
ভাঙার মত ভাঙবে যদি
স্বর্গ হবেই এই মরতা।

চীনে জোঁক

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

(১)

হাঁদা ছেলে বোকন। পেটে সে কোনও কথা গেদে রাখতে পারে না। সাদা কথাকে কাদা করে ছাড়ে। তাতে হাসা-কাঁদা যা কপালে থাকে হুঁস্ নেই। ভুস্-ভাঁস্ সব ফাঁস করে দেয়!

খ্যাংরা ফড়িং-এর পাল্লায় পড়ে সে ব্যাঙ্ মাথায় তুলে ফিরে এসেছে। সে কথা শুনে শুচিবাঁই ঠাকুর মায়ের মন চন্‌চন্ করে উঠল। তিনি চিলের মত চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "এক্ষুনি চান করে গোবর জল মাথায় ঢাল গে যাও।"

এ কম্মকাণ্ড না করলে ব্রহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড হবে, বোকন তা জানে। সে অপগণ্ড হলেও পাষণ্ড নয়। এঁদো পুকুরে চুব্ চুব্ ডুবিয়ে উঠল। তারপর উঠোনের এক কোণে কচুবনের কাছে এসে দাঁড়াল। সেখানে গোবর জলের ঘড়া। আদ্যিকাল থেকে তা দিব্যি পেট ফুলিয়ে ঘাঁটি আগলে আছে। শুচিবস্থির সেরা দাওয়াই। গায়ে ঢেলেছ কি পরিপাটি পাপ ধোলাই! কিন্তু সেখানে গোবর পচে থৈ থৈ, আর তাতে পোক-জোঁকের হৈ-হুল্লোড়!

বোকন তা জানে না। চোখ বুজে, হাত চুবিয়ে সে খানিক গোবরজল গায়ে ছিটাল। তাতে গায়ে ছিট্‌কে পড়ল ছোটখাট কিছু পোকা। তা যেমন-তেমন; কিন্তু ওরে মারে, একটা সরু কালো রবার তার গা বেয়ে চল্‌ল! রবারের হাড় নেই,—হাতে টিপে দু'মাথা একত্র করা যায়। কিন্তু এ যে জ্যান্ত রবার! নিজে নিজে পা মাথা একখানে করে করে এগিয়ে চলেছে। সাড়া নেই, শব্দ নেই,—ভুতুড়ে না ম্যাজিক্!

বোকনের শরীর চিন্‌চিন্ করে ওঠে। সে সেটাকে সরাতে চেষ্টা করে, কিন্তু তা গায়ে সেটে থাকে।

বোকন শুনতে পায় তা যেন বলছে, "আমায় চেননা বোকন? আমি যে চীনে জোঁক। আমি তোমায় চিনি। পড়শী গো। পাহাড় পেরিয়ে ওপিঠ থেকে পালে পালে এসেছি। চেনা রক্ত খেতে মন আন্‌চান্ করে।"

"অ্যা, রক্ত খেতে এসেছ!" ভয়ে বোকন লাফিয়ে ওঠে।

বোকন টের পায় চীনে জোঁক ফিক্ করে হেসে বলে, "নেচ না বোকন। তোমাদের মত আমরা বেকুব নই। খাবার জিনিস আমরা কিকির করে খাই,—ফকির হয়ে থাকি না।"

বোকন বলে, "কিন্তু পরের রক্ত খেতে নেই। পাপ হয়।" চীনে জোঁক ঠাট্টা করে বলল,

"বাঃ রে, তাই বলে বুঝি পরের রক্তের বদলে খাব নিজের রক্ত? অমন বোষ্টম-ভক্ত হয়ে দুনিয়ায় বেঁচে থাকাই শক্ত। আমরা কাঁচা-খেকো শাক্ত গো, শাক্ত। নিজের শক্তিতে চড়ে-বড়ে খাই।"

বোকন বলল, "তাই তোমাদের হদ্দ কুচ্ছিৎ চেহারা। আর আমাদের দেখ।" চীনে জোঁক শরীর দুলিয়ে বলল, "আহা রে, ছুরুতের বালাই নিয়ে মরে যাই। ছুরুত দেখিয়ে কেউ পুরুত হয় না, করতাল বাজিয়ে হয় না কর্তা। রক্ত খেয়ে হয় শক্ত পোক্ত, তবেই তো জোটে শিষ্য ভক্ত!"

চীনে জোঁক বোকনের পায়ে ছোট্ট ফুটো করে রক্ত খেতে থাকে। শুরুতে সুড়সুড়ি, তারপর বোকনের থরথরি লাগে। ভয়ে সে চেঁচাতে পারে না। ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, "চেনা পড়শী মশাই, এবার রেহাই দাও। তোমার পায়ে পড়ি। আমার শরীর ঝিমঝিম করছে।"

(২)

বোকন চীনে জোঁকের অট্টহাসি শুনতে পেল। সে যেন বলল, "ভারী সৌখীন তো! হিমের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এলাম, আর তোমার মুখের ঝুম্‌ঝুমি শুনে ফিরে যাব? শস্যশ্যামল দেশের ফসল, ফলফুলারি ও মাছ, মাংস, ডিম, ঘি, দুধ খেয়ে তোমরা রক্ত জমাও। পড়শীকে খানিক রক্ত খেতে দিলেই বা। ভারী পুণ্যি হবে গো, ধন্যি ধন্যি পড়বে।"

বোকন বলে, "কিন্তু তা বলে দিনে-দুপুরে ডাকাতি জুলুম! তাতে তোমার পাপ হবে যে।"

চীনে জোঁক বলে, "ছাপার বই পড়ে দেখ। কে কবে তলোয়ার খাপে পুরে দিগ্বিজয় করেছিল? রাজ্যের ধাপের লোভে বাপকে পর্যন্ত রেহাই দেয়নি। কোনও দোহাই মানেনি।"

এ সব চমৎকার বই বোকন পড়েনি। পিঁয়াজের ফোড়নের মত কথায় তোয়াজ করে সে বলে, "শুধু পড়শী ভাই নও, তুমি হয়ত আমার এক বয়সী। আমি ছেলেমানুষ, শরীরে বেশী রক্ত নেই। পথেঘাটে কত পাঁঠা, গরু, গাধা আছে। তাদের শুষে খাও গে যাও।"

চীনে জোঁক মুখ কুঁচ্‌কায়। বলে, "কিসে আর কিসে? জামে আর নিমে, আমে আর আম্‌সীতে, মোষে আর মেসোয়! মানুষের রক্ত চুষে খেতেই তো 'হালুম লো, গালুম লো' করে আসা।"

সে যেন তাকে রঙিন্ চুষ্‌নী পেয়েছে। তবু তা থামাবার চেষ্টায় বোকন বলে, "খুব তো খেয়েছ। এখন ছেড়ে দাও না ভাই।"

চীনে জোঁক হেঁ হেঁ করে বলে, "ভাই ডেকে নাই পেতে চেও না। পাপ-পুণ্যি এড়াতে যেও না। পড়শীকে রক্ত দিয়ে পুণ্য কর। মোটে আর্ধেক খেয়েছি, তোমার হাফ-পুণ্যি হয়েছে। তোমাকে পুরো পুণ্যি করতে দিয়ে আমিও ধন্য হব। নৈলে পাব শাশমস্তি!"

বোকন ভড়কে গিয়ে বলে, "হাফ কোথায় ? খেয়ে ঢোলগোবিন্দ হয়েছ যে ! পেটে টোকা মেরে দেখ, ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্ শব্দ করবে।"

চীনে জোঁক ক্ষেপে যায়। বলে, "খেঁক্‌শেয়ালের খুঁৎ খুঁতে বাত্‌চিৎ ছাড় দিকি। হাঠের ঢোলের মত যত রাজ্যের বাজে বোল তুলেছ ! ঐটুকু রক্ত খেয়ে পেট ঢোল হয় নাকি ? আমার দাদাদের খাবার তো দেখনি। দেখলে চোখ গোল হয়ে যাবে,—সোরগোল তুলবে।"

বোকন ক্ষুদে চীনে জোঁকের খবরই ভাল করে রাখে না। তায় তার দাদার ! সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, "তারাও এসেছে নাকি ?"

চীনে জোঁক জাঁকাল গলায় জানায়, "এখনো আসেনি, তবে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। পায়তারা করছে। শুরুতে আমরা পরখ করে দেখছি, এখানকার সবাই বোষ্টম না শাক্ত। চাম নরম না শক্ত, গায়ে নীল না লাল রক্ত ? রিপোর্ট পেলে দাদারা টক্‌টকিয়ে আসবে।" বোকন ভয়ে ঝিম্ মেরে যায়। চীনে জোঁক গলায় ঝুমঝুমি বাজিয়ে বলে, "ক্ষুদে ভাই দেখেই ভড়কাচ্ছ, দাদারা এলে কি করবে গো ? তারা দত্তি-দানার মত শক্ত পোক্ত গাছের ডালে বসে তাল ঠোকে। তলা দিয়ে যে বেচারা যায় বিচার করে না। ঝুপ্ করে তার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেঁটে ধ'রে রক্ত চোষে। খ'সে পড়ার জো নেই।"

"অ্যাঁ,—ওরে মা রে !" বোকন ভয়ে লাফ মারে। থর থর কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে, "কেউ খস্‌তে পারে না ! হাতি, বাঘ, সিংহ, মোষ, কেউ না ?"

চীনে জোঁক জাঁক করে বলে, "দূর দূর। জন্তু-জানোয়াররা দূর থেকে দাদাদের গড় করে সরে পড়ে। কিন্তু দাদারা ওদের পর ভাবে না। সর, সর না বলে, নিজেই গন্ধ শুঁকে সরসরিয়ে গাছের ডালে চড়ে বসে। তারপর আড়াল থেকে চড় কসে। ভাল অঙ্ক কষতে জানে তো। সবার রক্ত চুষে খায়। খালি খেস কুটুম জোঁকের রক্ত খায় না। খুব সভ্য কিনা।"

বোকন বলে, "মানুষও তো মানুষের রক্ত খায় না। তারা আরও সভ্য, তোমাদের মত ন্যাংটো থাকে না !"

চীনে জোঁক মুখ ভেংচে বললে, "সভ্য রে আমার ! আমরা অপরের রক্ত ক'য়ে ব'লে খাই—নিজেরটা না কয়েও খাই না। কিন্তু তোমরা পরের রক্ত আড়ালে-আবডালে, না জানিয়ে খাও। তাতে নিজেরটাও না কয়ে খাওয়া হয়।"

বোকন চোখ বড় করে বলে, "রক্ত খাই—কাঁচা রক্ত ! ওয়াক্ থু। আমরা কি গাড়োল ? মাছ-মাংসও না রেঁধে খাই না।"

চীনে জোঁক ঠাট্টা করে বলে, "ভারী বাহাদুর ! চুরি-চামারি, ঠকবাজি, কাড়াকাড়ি, লুঠ-

তরাজ, লড়াই এ সব কি রক্ত খাবার সামিল নয় ? দল বেঁধে বোমা তৈরীর তালিম কেন গো ? বড় যে সভ্য বলে বড়াই ! তোমরা কি একে অপরকে কেড়ে ন্যাংটো করে ছাড় না ? মানুষের পোষাক ছেড়ে নিজেরা কি ন্যাংটো বর্বর হওনি ? জানি হে বোকন, সব জানি।"

বোকন জিজ্ঞেস করে, "আমাদের কথা কি করে জানলে ?"

চীনে জেঁাক বললে, "জানি নে আবার ? আমরাও তো এক জন্মে মানুষ ছিলেম। লোভ, স্বার্থ, জাত, ধর্ম নিয়ে মারামারি, খেয়োখেয়ি করে, ভগবানের হাতে সাজা পেয়েছি। আজ জেঁাক হয়ে কাঁচা রক্ত খাই। রান্না করা পায়েস-পোলাও রাজার মত আয়েস করে খেতে পাই না।"

বোকন বিজ্ঞের মত বলে, "তবু কয়লার মত ময়লা স্বভাব ছাড় না কেন ?"

(৩)

বোকনের কথায় চীনে জেঁাক হাসে। চোখ নাচিয়ে বলে, "মানুষের হরেক চেহারা তো দেখলেম, বোকন। কিন্তু জেঁাকের চেয়ে ভাল তো চোখে মালুম হ'ল না। সবারই তো 'হালুম হালুম' স্বভাব। পরেরটা নিংড়ে খেয়ে গোলগাল চেহারা,—ইয়া চোখ, ইয়া নাক, কিন্তু মুখে রক্তের আঁস্টে গন্ধ !"

বল্তে বল্তে সে শরীর দুলিয়ে বোকনের নাকের ডগায় উঠ্ল। কবি কবি ছাঁদে বল্ল, "এ জায়গার নাম কি গো বোকন ? গিরিগোবর্ধন নাকি ? বেড়ে স্থান তো ! তলায় দুটো গুহা, তা দিয়ে হরদম বসন্তের বাতাস বয়। দু'পাশে টল্টলে দুটো পুকুর, তার মধ্যে কালো মানিক। আরও নিচে এক ফালি জমি। তা পেরিয়ে পদ্মের পাপ্‌ড়ি ঘেরা একটা হ্রদ। তাতে দু'পাটি মুক্তোর সারি। তার মাঝে নরম জাজিমের মত লাল্‌চে ওটা কি গো ? গরম জিবেগজা নাকি ? চেখে দেখ্‌তে হচ্ছে। বোধকরি রক্তের ভিয়েন দেওয়া।"

এই সেরেছে ! তুলতুলে জিবে যদি শুঁয়োটা চীনে জেঁাকটা একবার দাঁত ফোটায়, এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করবে। অথচ ভালোমন্দ জিনিসের স্বাদ পেতে জিবই সম্বল। কাজেই যা থাকে কপালে, বোকন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চীনে জেঁাকটাকে খাম্‌চে ধরল। তারপর টানাটানি। পাজিটা তার রাজ্য ছাড়তে রাজি নয়। কারসাজি করে বোকনের আঙুলের মাঝামাঝি সেঁটে রইল। 'বাবা রে' বলে বোকন আচম্‌কা আঙুল চোখের কাছে তুল্‌ল, আর চোখাচোখি তার বিশ্রী চেহারা দেখে ভিরমী খেল। চেঁচিয়ে-মেচিয়ে চোঁচা ছুট্‌ল ঠাকুর মায়ের কাছে।

"ঠাকুমা মেরে ফেল্‌লে গো," চিৎকার শুনে ঠাকুরমা ভাবলেন, তাকে বুঝি বাঘে-ভালুকে

'কি না হয়েছে ?' বোকন আঙ্গুল তুলে দেখায়।

ধরেছে। তা যা-ই ধরুক, তাঁর ঝাঁটাগাছার কাছে কোনও কিছুর বাছ-বিচার নেই। কিন্তু তিনি কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন ? কি হয়েছে ?"

"কি না হয়েছে ?" বোকন আঙ্গুল তুলে দেখায়।

ঠাকুরমা বলেন, "কোত্থেকে হাঁড়িকুড়ির কালি ভরিয়ে এলে ? আস্তাকুঁড় ঘাঁট্‌তে গেছলে বুঝি ?"

"উঁহু হুঁ, কালি নয়। চীনে জোঁক,—সব রক্ত খেয়ে ফেল্‌ল।" বোকন কেঁদে জানায়।

ঠাকুরমা এক পা পিছিয়ে বল্‌লেন, "তা তো নোংরা জায়গায় থাকে। সরে দাঁড়াও। আস্তাকুঁড়ের ঝাঁটা নিয়ে আসি।"

কিন্তু ফ্যাসাদ দেখা দিল। হাতে যে ঝাঁটা ছিল তা শোবার ঘরের। ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতো বেঁধে তিনি ঝাঁটার জাত বিচার করেছেন। ঠাকুরঘরের ঝাঁটার লাল রঙ্, শোবারঘরের সবুজ, রান্নাঘরের হলুদ, বারান্দার বাদামী, উঠোনের নীল, আর আস্তাকুঁড়ের কালো। তাদের ছোঁয়াছুঁয়ি হবার জো টি নেই। যার যার ঘাঁটি আগলে থাকে। যদি তাঁর মনের ভুলে তাদের ঝুঁটির ঠেকাঠেকি হয়, অমনি ঝাঁটায় ঝাঁটায় পেটাপেটি করেন। তার ফলে, খেংরাগুলো খোঁড়া, মুড়ো, বুড়ো হয়। যেটা আস্ত থাকে সেটাকে ঠাকুরঘরের রাস্তা দেখিয়ে দেন।

এখন আস্তাকুঁড়ের জোঁকের গায়ে শোবার ঘরের ঝাঁটা ঠেকানো,—আবার শোবার ঘরে

আস্তাকুঁড়ের ঝাঁটা এনে পেটানো,—কোনওটাই ঘটানো ঠিক নয়। কি করা যায়? তিনি হতভম্ব হন, ঘটে বুদ্ধি পান না। ওদিকে বোকনের গলা ফাটানো বেড়ে গেল। "মরে গেলাম ঠাকুমা, বাঁচাও। কিন্তু ঝাঁটা-পেটা করো না। আর যা হয়, ঝট্‌পট করো।"

(৪)

কি করা যায়? দিশেহারা ঠাকুর মায়ের পাখসাট মারার হাল হয়। তিনি ঝাঁটা রেখে, এক খাবলা নুন নিয়ে আসেন। তা দেখে বোকন ফুলে ফুলে কান্না তোলে। বলে, "আঙ্গুলে ফুটো করে রক্ত খাচ্ছে। গল্‌গল্‌ করে রক্ত গল্‌ছে। তাতে নুন ঢেল না মা। জ্বালা দশগুণ বাড়বে।" তা'হলে কি করা যায়, ভেবে ঠাকুরমা দিশেহারা হন। হঠাৎ মনে পড়ে হুঁকোর জলে জোঁক পালায়। কিন্তু মুস্কিল এই, তিনি হুঁকো খান না। অবশ্য রাত-বিরেতে আশেপাশে শেয়ালরা দল বেঁধে হুঁকো খায়, আর হুঁকো হুয়া বলে ডাকে।

আহাহা ওদের কাছে হুঁকোর জল চেয়ে রাখলে হ'ত।

হঠাৎ ঠাকুরমা অন্য বুদ্ধি ঠাউরে জিজ্ঞেস করেন, "জোঁকটা কোথায় ছিল রে? পুকুরে না আস্তাকুঁড়ে?"

বোকন বলে, "ওটা থাকড়ে সেখানে! কুঁড়ের বাদ্‌শা। ছুটতেই পারে না, মাজা বাঁকিয়ে হাঁটে। হাটে-বাজারে যায় না। মুখ থুবরে পড়েছিল গোবরের হাঁড়িতে। আমি গোবর জল গায়ে ঢালতে চল্‌কে পড়ল।"

শুনে ঠাকুরমা মহা খুশী। হাসিমুখে বল্‌লেন, "তাই বল। এ তো ভাল জাতের জোঁক। খাঁটি বোষ্টম তপস্বী, শুচি-নিষ্ঠায় বিশ্বাসী। গোবরের হাঁড়ি হ'ল গিয়ে আখড়া। সেখানে খালি কেত্তন, আর নাম নিয়ে গড়াগড়ি। যারা ভক্ত তারা জানে। যেখানে যার বাস তার গায়ে নুন আর হুঁকোর জল দিতে আছে? সর্বনাশ! "দেখি দেখি।"

তিনি বোষ্টম দর্শনের জন্য তার আঙ্গুলের কাছে মুখ বাড়ান। আর বোষ্টম জোঁক তার কপালে ফোঁটা-তিলক কাটতে ঝাঁপ দেয়। তারপর রক্ত-তিলক পরান সুরু করে! প্রথমে সুড়-সুড়ি তারপর চিন্‌চিন্ ব্যথা। ব্যাপার টের পেয়ে ঠাকুরমা চেঁচান, "বোকন, এ যে সত্যি চীনে জোঁক জেঁকে ধরেছে। এ যে দস্যি,—হবিষ্যির বদলে রক্ত চুষছে! শিগ্রী এটার গায়ে নুনের জল ঢেলে দে।"

চীনে জোঁক বাধা দিয়ে বলে, "বোষ্টম হয়ে অমন অপকম্ম কোর না বোকন। তিলক-ফোঁটা দিতে আমরা গোটা পাহাড় পেরিয়ে এসেছি।"

তবু বোকন চুনের জল ওর গায়ে দেয় আর মুখ চুন করে চীনে জোঁকটা খ'সে প
নড়ে না, চড়ে না। দেখে ঠাকুরমা বলেন, "আহা শ্রীকৃষ্টের জীবের একেবারে জিব বার করো না!
বোকন বলে, "কি জানি মরে গেল নাকি? দেখি একটু কালি ঢেলে, জ্যান্ত হয় কিনা।"
চীনে জোঁকটা আসলে ভড়ং ধরে ছিল। মরেনি। মনে মনে ভাবল, এই সেরেছে!
দিয়েছে, এবার কালি! চুন-কালি মেখে তো আর মুখ দেখানো যাবে না। বোকন কালি আ
ফাঁকে, সে উঠে সট্‌কাল। বাইরে গিয়ে বল্‌ল, "ধিক্ ধিক্ বোকন। বোষ্টম নাম শুনে এসেছি
কিন্তু নাষ্টামী আর হিংসা করলে! বলে গেলাম, আর গুণ গাইব না।"...এমন আলুনী কথা
বোকনের মাথায় চুলকোনি দেখা দিল। খানিক মাথা চুলকে তারপর সে ভাবল, না হয় নুন
তা পূরণ করে নেবে!...

ছোড়দি'কে খোকন

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোড়দিদিটি ভীষণ বোকা
কান্না কেবল কান্না
ফুঁপিয়ে কাঁদে, যতই বলি,—
ঃ আর কাঁদেনা আর না।
ভাঙছু ব'লে পুতুলটাকে
এমনি করে কাঁদতে থাকে?
ছিঃ দিদিভাই, আর কাঁদে না
ঝরিয়ে চোখের পান্না।
তুইতো তবে ভীষণ বোকা
কান্না কেবল কান্না!

ভাঙা পুতুল যায়না জোড়া
নতুন হবে কিনলে রে
আঃ মলো যা, একটি পুতুল,
দিদিই কেবল চিনলে রে!
যতই বলি 'নতুন হবে
ভাঙলো যদি কিনতে হবে,
তার তরে ছি কান্না এত
ঝরিয়ে চোখের পান্না?
তুই তো তবে ভীষণ বোকা
কান্না কেবল কান্না!

মৌচাকের শারদীয়-সংখ্যা

আগামী আশ্বিন-সংখ্যা মৌচাকের পূজা-সংখ্যা হিসাবে বহু নামকরা লেখক-লেখিকাদের নানাবিধ রচনায় ও চিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হবে। আকারে সাধারণ-সংখ্যা অপেক্ষা এই সংখ্যা অনেক বড় হলেও, দাম বাড়ানো হবে না।

ওদের সঙ্গে যায় না পারা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

কীর্তি-কল্যাণ প্রসঙ্গ।

বিশ্বনাথবাবু অফিস থেকে ফিরতেই প্রতিমা দেবী নালিশ করলেন : হয় তোমার গুণধর পুত্র দুটিকে সঙ্গে করে অফিসে যাও, আর না হয় এই ছুটির ক'দিন আমাকে কোথাও পাঠাও।

: কেন, হল কি ?—জিজ্ঞাসা করেন বিশ্বনাথ।

: হল না কি তাই বল! সারাটা দুপুর চোখের পাতা এক করতে দেবে না। বইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই ;—কোথায় ঘুড়ি-লাটাই, দোতালার ছাদে গিয়ে দু'জনে এই দুপুর রোদ্দুরে ঘুড়ি ওড়াবে! আর সে কী দুমদাম শব্দ! পাড়ার লোকের পর্যন্ত অশান্তি ;—ধর ধর, পড়ে যাবে, গেল গেল—এইসব চিৎকার।

কীর্তি ও কল্যাণ দুই ভাই। ইস্কুলে পড়ে। গরমের ছুটি। ওরা বলে, আম খাওয়া আর ঘুড়ি উড়ানর জন্য ইস্কুল বন্ধ।

সব শুনে বিশ্বনাথবাবু হাঁক দিলেন,—কীর্তি-কল্যাণ—

কাঠগড়ার আসামীর মত দু'ভাই সভয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

: অংক করেছ ?

: হল না বাবা।

: কেন ?

: ও অংক ভুল। হয় না—

: অংক ভুল!—কি অংক বল দেখি—

কীর্তি বই খুলে পড়ে : পাঁচ বছর আগে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের সাতগুণ ছিল। দশ বছর পরে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের তিনগুণ হবে। আরও কুড়ি বছর পরে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দ্বিগুণ হবে। এখন পিতা-পুত্রের বয়স কত ?—এটা কেমন করে হবে ? জিজ্ঞাসা করে কীর্তি। প্রথমে পিতার বয়স ছিল সাত গুণ, তারপর কমে গিয়ে হল তিনগুণ, তারপর হবে দ্বিগুণ! এমনি করে কি পিতা আর পুত্রের বয়স শেষটায় সমান হয়ে যাবে নাকি ?—এ হয় না, হতে পারে না। এ অংক ভুল!

বাবা গম্ভীর হ'য়ে বললেন, হুঁ।

: আর কল্যাণ ? ট্রান্স্লেসন করতে বলেছিলাম—

: করেছি বাবা।

: কৈ, দেখাও। 'কাশীর নিকট সারনাথ'—কি লিখেছ বল ?

: ম্যানিউর হাসব্যাণ্ড ইজ—

: ম্যানিউর হাসব্যাণ্ড ! সে আবার কি ?—বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন বিশ্বনাথবাবু।

: কীর্তি বলে দিয়েছে বাবা।

: হাঁ বাবা, ডিক্‌সনারিতে লেখা আছে,—উত্তর দেয় কীর্তি। তুমি তো সব কথা ডিক্‌সনা দেখে লিখতে বলেছ। ডিক্‌স্‌নারিতে লেখা আছে 'সারের' ইংরেজি ম্যানিউর, আর 'নাথ' হ হাস্‌ব্যাণ্ড।

: তোমার মাথা—উত্তেজিত হয়ে বলেন বিশ্বনাথবাবু। সারাটা দুপুর ছাদে গিয়ে ঘু উড়াবে—পড়াশুনার বেলায় অষ্টরম্ভা—বেত নিয়ে এস।

: আর করব না বাবা—উভয়ে একসঙ্গে মিনতি করে বলে।

: কি করবে না ?

: ঘুড়ি উড়াব না।

: আর দুব-দাব করে ছাতে উঠা আর নামা ?

: তাও করব না।

: ঠিক ?

: ঠিক।

: নাকে খত দাও দু'জনে। বল, কখনও উপরে উঠব না। উভয়ে নাক মাটিতে ঘ'ষে বলে কখনও উপরে উঠব না।

: কিছুই পড়াশুনা কর না তোমরা,—বলেন ওদের মামা। জজকোর্টের উকিলের মুহুরি তিনি তোমার এই বয়সে আশু মুখুজ্যে ছিলেন ক্লাসের মধ্যে ফার্ষ্ট বয়।

: তোমার বয়সে তিনি কি ছিলেন মামা ?—জিজ্ঞাসা করে কীর্তি।

কল্যাণ তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়,—হাইকোর্টের জজ।

কথায় এদের সঙ্গে পারা শক্ত।

ইস্কুল থেকে ফিরে এসেছে কীর্তি-কল্যাণ দুই ভাই ক্লাস বসে গিয়েছে বলে। তাদের ম প্রতিমা দেবী রাগ করে জিজ্ঞাসা করলেন,—ক্লাস বসবার আগে যেতে পারনি কেন ?

কল্যাণ কাঁদ কাঁদ হয়ে উত্তর দেয়,—আমরা যাওয়ার আগেই ক্লাস বসে গিয়েছিল যে !

উত্তর শুনে প্রতিমা দেবী নিরুত্তর।

রং নিয়ে খেলতে গিয়ে কল্যাণের সারা মুখে কালী। ওদের দাদু রাগ করে বলেন,—আহা, কি রূপের ছিরি!—যেন রূপী বাদর!

কীর্তি বলে,—দাদু সবাই বলে, কল্যাণের মুখ ঠিক ওর দাদুর মত!

উত্তর শুনে দাদু গুম্ হয়ে থাকেন।

নতুন মাস্টার মশায় ওদের কাকাকে বললেন,—ওদের রেজাল্ট ভাল হয় না তার একমাত্র কারণ মনোযোগের অভাব। ওরা অংক করে কিন্তু ভাসা ভাসা। গভীরভাবে কিছু ভাবে না, দেখেও না।

তাঁর কথা কতদূর সত্যি তা দেখাবার জন্য তিনি ওদের বললেন, আমি কতকগুলি সংখ্যা লিখছি দেখ।

এই বলে তিনি মুখে বললেন, একষট্টি। কিন্তু বোর্ডে লিখলেন ১৬। মুখে বললেন—তেইশ কিন্তু বোর্ডে লিখলেন ৩২। বললেন সাতচল্লিশ—কিন্তু লিখলেন ৭৪।

ওরা চুপ করে আছে, কথা বলে না।

মাস্টার মশায় ভাবেন তারা অন্যমনস্ক।

ঃ আচ্ছা এবার এগুলির যোগফল থেকে কত বিয়োগ করব তোমরাই বল—

কল্যাণ চুপি চুপি বলে—দাদা বল্ পঞ্চান্ন কি ছেষট্টি—দেখি উনি উল্টিয়ে কি লেখেন!

অপ্রতিভ হয়ে পড়েন মাস্টারমশায়।

দিনকয়েক পরের কথা।

লাইব্রেরীর মাঠে ফুটবল খেলছে কীর্তি আর কল্যাণ। অদূরে এক পাশে মান্ধাতার আমলের এক বড় ইঁদারা। কেউই এখন ব্যবহার করে না সে ইঁদারা। তার মধ্যে এবং উপরে ঘাস জঙ্গল হয়ে ইঁদারার অস্তিত্বটাই লোপ হয়ে গেছে সাধারণের চোখে। তাতে জল আছে কি নেই সে প্রশ্ন এখন কারও মনেই জাগে না। কীর্তি-কল্যাণের বল গিয়ে পড়ল সেই এঁদো ইঁদারার ঝোপের মধ্যে। কে তুলবে সেই বলটিকে ঐ অন্ধকূপের ভিতর থেকে?

ইঁদারার ভিতরটা অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না।

কল্যাণ বলে ঃ দাদা, কুরু-পাণ্ডবের বলও তাঁদের শৈশবকালে এমনি কুয়োর মধ্যে পড়েছিল জানিস?

: কিন্তু অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য তীর মেরে মেরে সেই বলটা তোলেন—উত্তর দেয় কীর্তি। আমরা এখন সে আচার্য পাব কোথায় ?

: কেন, তোদের অংকের মাষ্টার রণজিৎ আচার্য ?

: কীর্তি উপেক্ষা-ভরে উত্তর দেয়—ধ্যেৎ !

: তুই আমার মাজায় একটা দড়ি বেঁধে দে দাদা, আমি নেমে যাই।

কিন্তু দড়ি কোথায় পাওয়া যাবে ? অগত্যা দুই ভাই-ই নেমে গেল সেই ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে। অনেক চেষ্টার পর বল পাওয়া গেল। কিন্তু তারা যখন উপরে উঠল, তখন তাদের সর্বাঙ্গ মশার কামড়ে একেবারে চাক চাক হয়ে গেছে—মুখ, কপাল ফুলে উঠেছে লাল হয়ে !

বাড়ি ফিরল দুই ভাই।

কিন্তু তারা ফিরবার আগেই বল কুড়ানোর খবর পৌছে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। বিশ্বনাথবাবু বেত হাতে নিয়ে তৈরি হয়েই ছিলেন।

: এদিকে এস। সারা গায়ে মশার কামড়ের দাগ কেন ?

: বল আনতে ইঁদারার মধ্যে নেমেছিলাম তাই—

: সেদিন তোমরা নাকে খৎ দাওনি ?—বেতগাছটা মাটিতে সপাং করে শব্দ করে বিশ্বনাথবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন : বল নাকে খৎ দিয়েছিলি কিনা ?

ওরা কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দেয়—দিয়েছিলাম।

: তবে ঐ পচা ইঁদারার মধ্যে নামলে কেন ?

কীর্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দেয় : তুমি তো উপরে উঠতে নিষেধ করছিলে—

: তবে ?

ভয়ে কীর্তি আর জবাব দেয় না। তার কথায় পরিপূরণ করে কল্যাণ। কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দেয় সে—আমরা তো নীচেয় নেমেছিলাম বাবা !

বিশ্বনাথবাবু বিস্মিত হয়ে থাকেন তার উত্তর শুনে।

লটারী

শ্রীঅরূপরতন ভট্টাচার্য

টস্ হোক।

বেলেঘাটা না মুচিপাড়া কারা জিতবে সেই নিয়ে তর্কাতর্কি।

হরিপদ গলা চড়ালে, টেবিল চাপড়ে বললে, মুচিপাড়া।

বটে? কালীপদ চোখ ঘোরালে, গলা আর এক পর্দা চড়িয়ে বললে, বেলেঘাটা।

টেবিলে বসে চা খাচ্ছিলো মামা। ভাগ্নেদের রাগারাগি দেখে সামলাবার চেষ্টা করলে। ঝগড়াঝাটিতে কাজ কী বাবা? মীমাংসা হয়ে যাক্ একটা। মানিব্যাগ বের করলে মামা। টস করে ফয়সালা করে ফেলো।

দুটোই ভাল টীম। যেমন মুচিপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, তেমনি বেলেঘাটা ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েসন। বাছা বাছা প্লেয়ার—লাফ-ঝাঁপ কায়দা-কানুনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার—চোখ ঝলসায়। যেমন বেলেঘাটার জেতার চান্স মুচিপাড়ারও তেমনি। হারবার বেলাও তাই। সমান সমান। কাজে কাজেই হেড-টেল করো। সেই সবচেয়ে ভালো। এই আধুলি। হয় অশোকস্তম্ভ, নয় রূপয়ে কা আধা ভাগ। হয় হার, নয় জিত। হয় বেলেঘাটা নয় মুচিপাড়া।

হরিপদ বললে, হেড, আমি হেড বলছি।

কালীপদ ঠোঁট উল্টোলে, হেড? হেড বললেই হলো। টসে হেড বেশীবার হয়। আমার হেড চাই।

দুজনেরই মুড়োয় লোভ—আসল জিনিস। ল্যাজা কেউ নয়। দু'জনেরই অশোকস্তম্ভ, উল্টো পিঠে মন ধরে না।

মামা রাগের ভান করলো। লেখাপড়া শিখেছো, এতটুকু বুদ্ধি নেই। আছে তো মাত্র দু'টো পিঠ। দু'টো সম্ভাবনা তাই। হয় হেড না হয় টেল। তা হেড হওয়ার চান্স যতটা টেল হওয়ারও তাই।

কী রকম? দু'জনেই জানতে চাইলে।

কী রকম আবার কী? মামা অবাক হলো।

খেলার মাঠে টস্ করে দেখোনি। সে টসে কখনো হেড হয়, কখনো টেল। জেতা-হারা কপালের উপরে। হেড বললে, হেডই হবে এমন কথা কে বলতে পারে, টেলও হয় অনেক সময়ে। আসলে দুয়ের সম্ভাবনাই সমান-সমান। কথায় বলে ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি। মামা হাসলো। তারপরে গণিতের নিয়মে বুঝিয়ে দিলো।

সবসুদ্ধ সম্ভাবনা ক'টা ? দুটো। হেড আর টেল। তার বাইরে কিছু নেই। তার মধ্যে হেড হওয়ার চান্স দুটো সম্ভাবনার একটা। গণিতিক পরিভাষায় দু'ভাগের এক ভাগ। সংখ্যায় সে সম্ভাবনা $\frac{১}{২}$। টেলের বেলাও কম-বেশী নয়। হিসেব-নিকেশে তার সম্ভাবনা ঠিক সেই হেডেরই সমান অর্থাৎ সেই $\frac{১}{২}$। কাজে-কাজেই মিছে হেড বেশী হয় ভেবে ভয় পাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। দুটোর সম্ভাবনা সব সময়ে সমান। দু'বার টস করো, সাধারণতঃ হয় একবার হেড, একবার টেল। শুধু দু'য়ে না শেষ করে একশোয় এলে সমান-সমান ভাগটা ভালো করে মালুম হবে। সেইজন্যে একশোবার টস করলে পঞ্চাশবার হেডের চান্স, পঞ্চাশবার টেলের। এদিক-ওদিক অল্প-স্বল্প কম-বেশী হতে পারে, তা বলে হেড বেশী হয় বা টেল বেশী হয় নিয়ম করে এমন কথা বলা চলে না।

লুডো খেলাতেও ছক্কার বিভিন্ন দান অনেকটা পাই পয়সা নিয়ে হেড-টেলের মতো। পুরো দমে খেলা চলেছে, হাত ঘুরে ঘুরে দান আসছে। ভাল করে গুটি নেড়ে চাল দিচ্ছো। ছয় দরকার। ভাবছো এই বুঝি ছয় পড়বে। কিন্তু প্রতি দানে আর ছয় পড়ে না, পড়ার কথাও নয়। ছক্কার ছ'টা পিঠ। এক-একটা পিঠে এক থেকে ছয় পর্যন্ত এক একটা সংখ্যা। কাজে কাজেই ছ'টা সম্ভাবনা আছে সবসুদ্ধ। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়। সেই ছ'টা সম্ভাবনার মধ্যে এক হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{১}{৬}$ দু'য়ের বেলাও তাই। বাকি ক'টার বেলাও সেই $\frac{১}{৬}$ সম্ভাবনা। ছক্কায় ছয় পড়ার সম্ভাবনাও সে রকম $\frac{১}{৬}$। সেই জন্যে, বুঝতে পারছো, ছ'বার লুডোর গুটি চাল দিলে এক থেকে ছয় পর্যন্ত সব ঘরেরই চাল একবার করে পাবার সম্ভাবনা।

লটারীর টিকিট হরদম কিনছি। মেলে কী কখনও? পাঁচ লক্ষ লোকে টিকিট কিনলো, সম্ভাবনা কতটুকু প্রাইজ পাবার ? $\frac{১}{৫০০০০০}$

জীবনটাই লটারী। জানালা দিয়ে নীচে তাকিয়ে দেখো, রাস্তা ফাঁকা একদম। এর পরে প্রথম যে লোকটা যাবে সেটা যে পুরুষ হবে তার সম্ভাবনা কী ? কী কী সম্ভাবনা আছে হিসেব করা যাক একবার। দুটো সম্ভাবনা, হয় পুরুষ না হয় মেয়ে। তার মধ্যে পুরুষ হওয়ার সম্ভাবনা, দুটো সম্ভাবনা একটা অর্থাৎ $\frac{১}{২}$।

একজনের বদলে রাস্তা দিয়ে প্রথম দু'জন পর পর পুরুষ মানুষ যাবে তার সম্ভাবনা কী ? সবসুদ্ধ সম্ভাবনা হিসেব করো আগের মতো। দু'জনেই পুরুষ হতে পারে, দু'জনেই মেয়েও হতে পারে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আরও দুটো সম্ভাবনা আছে। প্রথম জন পুরুষ, দ্বিতীয় জন মেয়ে ; প্রথম জন মেয়ে, দ্বিতীয় জন পুরুষ। মোট এই চারটে সম্ভাবনার মধ্যে প্রথম দু'জন যে পুরুষ হবে তার সম্ভাবনা $\frac{১}{৪}$ অর্থাৎ $\frac{১}{২ \times ২}$।

প্রথম দু'জন শুধু নয়, রাস্তা দিয়ে প্রথম তিনজন যারা যাবে তারা সবাই পুরুষ হবে তার সম্ভাবনা কী? আগের মতো হিসেব করলে দেখা যাবে $\frac{১}{৮}$ অর্থাৎ $\frac{১}{২×২×২}$। তিনজনের বদলে প্রথম চারজন যারা যাবে, তারা সবাই পুরুষ হবে তার সম্ভাবনা $\frac{১}{১৬}$ অর্থাৎ $\frac{১}{২×২×২×২}$। প্রথম দশজনের বেলায় $\frac{১}{১০২৪}$। যত বেশী লোক ধরবে, সম্ভাবনা তত কমে আসবে। একশোটা লোকই পুরুষ হবে তার সম্ভাবনা খুব অল্প। একেবারে কিছুই নয় বললেই চলে।

কত? ভাগ্নে দুটো জিগেস করলো।

সম্ভাবনা $\frac{১}{১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০}$ এর মতো।

প্রায় কোনও সম্ভাবনাই নেই বলা চলতে পারে। প্রায় কেন, নিশ্চিতই।—নিজের কথাবার্তায় মামা প্রত্যয় আনবার চেষ্টা করলো।

ভাগ্নে দুটো অবাক হলো।

মামা বললো, অবাক হবার কিছু নেই। পর পর একশোটা লোক যে পুরুষ হবে না একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। আর, মামা ঘুরে ফিরে বসলো, যে কোনো কিছু বাজী ধরা যায় এ নিয়ে। যে কেউ ধরতে পারে। আমিও পারি।

হরিপদ কালীপদ দু'জনে দু'জনের দিকে তাকালো। কী করা যায়? কী বাজী ধরা যায়? বেশী কিছু দরকার নেই। তোমার হাত-ঘড়ি আর বাইসাইকেল, ব্যস, সেই যথেষ্ট আমাদের পক্ষে। আর কিছু চাইনা আমরা।

মামা বললো, ঠিক আছে, কিন্তু আমি জিতলে কী পাবো সেটাও জানা দরকার।

ভাগ্নেরা বললো, খাওয়াবো তোমাকে একদিন। রেষ্টুরেণ্টে বসে পেট ভরে খাওয়াবো।

মামা বললো, পেট ভরে? আমি একসঙ্গে পনেরোটা কাটলেট খেতে পারি, পঁচিশটা চপ পঞ্চাশটা রসগোল্লা। পারবি খাওয়াতে আমাকে?

খুব, ভাগ্নেরা বলে উঠলো। হারলে নয় পঁচিশ তিরিশ টাকা যাবে। কিন্তু জিতলে? ে কথা ভাবা যায়?

মামা বললে, ভেবে দেখ একবার ভাল করে। মিছিমিছি কেন রাজী হচ্ছিস? এ রক বাজীতে রাজী হওয়াও যা, টাকা জলে ফেলে দেওয়াও তা। রাস্তা দিয়ে প্রথম একশো'জন যা যাবে তারা সবাই পুরুষ মানুষ হবে তা কী কখনও হয়? দেখলি তো কত অল্প সম্ভাবনা।

রাজী আমরা, অল্প হোক, তবু তো একটা সম্ভাবনা।

এমন সময়ে ব্যাণ্ড পার্টির আওয়াজ পাওয়া গেল। সবাই উঠে এলো জানালায়। স্বাধীন

দিবস। পাড়ার ক্লাব, সেই ক্লাবের ছেলেরা মস্ত বড় প্রোশেসন বের করেছে। সারি বেঁধে ছেলেরা মার্চ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। সাদা সার্ট, সাদা প্যাণ্ট, বাজনার তালে তালে ছবির মতে মনে হচ্ছে। দেখতে ভালো লাগার কথা অথচ মামার মুখ শুকিয়ে এলো মুহূর্তের মধ্যে।

কথা রেখেছিল মামা। জয়হরি হাতে ঘড়ি বেঁধে ঘন ঘন টাইম দেখে আজকাল, আর হরিপদ সাইকেলে দিনরাত এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে বেড়ায়।

এবার যাব বিশ্ব-সফরেতে

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

ওরে ভজা, ভজহরি কি আছে তোর সখ?
তোর দৌড় তো ধাড়া থেকে গোবিন্দপুর তক্।
এক্কেবারে কুয়োর-কুণো ব্যাঙ্ হলি যে তুই,
এই জীবনে, হতভাগা দেখলি না কিচ্ছুই।
জনমটা কি কাটিয়ে দিবি এক জায়গায় বসে?
আমাকে ছাখ্ দিল্লী গয়া একা বেড়াই চ'ষে।
নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি কতো,
শুনলে সে সব তোর, হবে ঠিক ভিরমি লাগার মতো।
মনে আছে পুরীর সে 'তাজমহল' হোটেলেতে
উর্দীপরা বাবুর্চিরা ছ্যাঁচড়া দিল খেতে।
পাটনা গিয়ে চিল্কা লেকে মাছ ধরেছি কতো,
তোকে কি আর বলবো, ভজা, আধমনী রুই যতো।
বোম্বে গিয়ে কি বেড়ালাম উশ্রী নদীর ধারে,
আমায় দেখে ঘরকুণো তুই প্রেরণা পাস্ না রে?
তন্ন তন্ন দেখেছি সব, হুঁ হুঁ, খুঁজে পেতে—
ভারত সারা, এবার যাব বিশ্ব-সফরেতে।

সংবাদ-বিচিত্রা

চ্যানেল অতিক্রমে জলচর স্কুটার

স্থলচর স্কুটার আজকাল অহরহ দেখা যায়, কিন্তু জলচর স্কুটার যে তোমরা দেখোনি এ আমি হলপ করে বলতে পারি। এই জলচর স্কুটার তৈরী করেছেন হামবুর্গের জলক্রীডাবিদ্ ফ্রান্তজ কর্ডস্। এতে চেপে তিনি ফ্রান্সের ক্যালে থেকে ইংল্যাণ্ডের ডোভার পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল পার হবেন, সেজন্য এখন তিনি তারই অনুশীলনে ব্যস্ত। এই স্কুটার জলক্রীড়ার স্কি-এর মত, তবে তাতে মোটর লাগানো হয়েছে। এতে একটা ছাতাও অবশ্য লাগানো যায়, আবার ইচ্ছে করলে খুলেও রাখা যায়। ফ্রান্তজ যখন তার এই জলচর স্কুটারে চেপে চ্যানেল পার হবেন, তখন একটা রবারের পোশাক পরবেন। এই স্কুটারে চেপে জলের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করা কিংবা অগভীর জলে এটিকে ডিঙ্গির মত ব্যবহার করাও চলবে।

কনিষ্ঠতম গণিতজ্ঞ

অঙ্ক শুনে আঁৎকে ওঠে না এরকম ছেলেমেয়ে গুণতির বাইরে। এদের দেখলে এলমার এডেরের করুণা হয়, কারণ অঙ্ক তার কাছে একেবারে জলবৎ তরলং। ফুটফুটে সুন্দর আট বছরের এডেরের বাড়ি পশ্চিম জার্মানীর পরমাণবিক গবেষণাকেন্দ্র মিউনিখ গারসিংয়ের কাছে। অন্যান্য বিষয়ে স্কুলে সে তার সহপাঠীদের থেকে আলাদা নয়, কিন্তু অঙ্কে সে এতদূর এগিয়ে গেছে যে, আগামী কয়েক বছরের মত তাকে অঙ্কের ক্লাস থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। চার বছর বয়স থেকেই অঙ্কে তার মাথা খুলে যায় ও এখন সে তার মাষ্টারমশাইকেও বোধহয় অঙ্ক শেখাতে পারে।

আশ্চর্য ছেলে এডের। কিন্তু তার বাবা বলেন, "না, আমার ছেলের অঙ্কতেই কে মাথাটা সাফ।" তবে বাবা তাকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। তিনি নিজেও একজন গণি অধ্যাপক। বাবা তাকে নানারকম শক্ত অঙ্ক শেখান ও এডেরও চটপট্ সেসব শিখে নেয়। অঙ্ক কেন, পদার্থবিজ্ঞানেও এডের তুখোড়। সে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদ বোঝে। কিভা ইলেক্‌ট্রোনিক কম্পিউটার চালাতে হয় এডের তাও জানে।

এডেরের পাঁচ বছরের বোন সুসিও অঙ্কে কম যায় না। তবে পাঁচ বছর বয়সে এ সুসির চেয়ে অঙ্কে অনেক আগিয়ে গিয়েছিল। ছোটবেলাতেই এডেরের ঝোঁক ছিল বিজ্ঞান যন্ত্রপাতির ওপর। চার বছর বয়সেই এডের পদার্থবিজ্ঞানের নানা প্রশ্ন নিয়ে বাবার কাছে হা হয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিস ভালোভাবে লক্ষ্য করে ও সেসব নিজে পরীক্ষা করে এডের তার জ্ঞ বৃদ্ধি করেছে। সমবয়সী অন্য ছেলেরা যখন ফুটবল খেলায় মত্ত, এডের তখন জলে নানা জি ছুঁড়ে সে-সবের আপেক্ষিক গুরুত্ব আবিষ্কারে ব্যস্ত থেকেছে।

এডের কিন্তু গণিতে তার ক্ষমতা সম্বন্ধে তত সজাগ নয়। তার উচ্চাশা সম্বন্ধে জান চাইলে সে বলে যে, স্টানবের্গ হ্রদের চারদিকে বছর বছর যে হাঁটার প্রতিযোগিতা হয়, তাতে প্রথম হয়ে সোনার মেডেল পুরস্কার পেতে চায়।

দু'জন আরোহীবাহী অভিনব সাইকেল

দু'জনে চেপে চালাতে পারে যে সাইকেল তাকে বলে ট্যানডেম। এরকম সাইকেল অনেকদিন হল বেরিয়েছে এবং বিদেশে যথেষ্ট ব্যবহার হয়। আমাদের দেশেও আমদানি-করা দু'চারটে ট্যানডেম মাঝে মাঝে যে চোখে পড়ে না তা নয়। পশ্চিম জার্মানীতে সম্প্রতি যে ট্যানডেম বেরিয়েছে তার অভিনবত্ব হচ্ছে যে, সেটি মুড়ে-ঝুড়ে মোটরগাড়ির পেছনে মাল
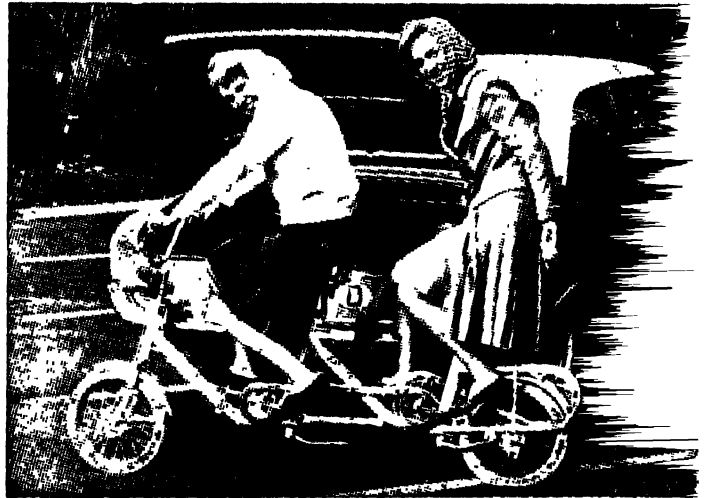
রাখার জায়গায় পুরে যন্ত্রতন্ত্র নিয়ে যাওয়া চলে। দু'জনে গাড়ি চালিয়ে কোথাও গেলেন। তারপর গাড়ি থেকে ট্যানডেম বার করে বেরিয়ে পড়লেন ধীরে-সুস্থে তাজা হাওয়ায় গ্রামের মেঠো-পথে কিছুক্ষণ বেড়াতে। অনেকক্ষণ মোটর চালাবার পর ট্যানডেম চেপে বেড়িয়ে এলে দু'জনেরই বেশ কিছুটা ব্যায়াম হয়। বেড়িয়ে এসে ট্যানডেমটি গুটিয়ে রেখে মোটরে চেপে বাড়ি ফিরলেন। এই ট্যানডেমের নাম দেওয়া হয়েছে "গ্রাৎসটেলা"। খুব সহজে এটি মুড়ে ফেলা যায় ও রাখতে জায়গা লাগে মাত্র ৩০×৪৫ ইঞ্চি। ফলে, ছোটবড় সব মোটরগাড়ির মাল রাখার জায়গায় একে পুরে রাখা যায়।

অভিনব উপায়ে নিমজ্জিত জাহাজ তোলা

ওয়াল্ট ডিস্‌নে তাঁর "ডোনাল্ড ডক" সিরিজের ব্যঙ্গচিত্রে একবার দেখিয়েছিলেন যে কেমন করে টেনিস বল দিয়ে ভর্তি করে একটা ডোবা জাহাজকে আবার ভাসান হল। কিন্তু সেটা ছিল নেহাতই শিল্পীর কল্পনা। আজ কিন্তু কল্পনা বাস্তব হয়ে উঠেছে; তফাৎ শুধু এইটুকু যে ডোবা জাহাজকে জলের ওপর টেনে তুলতে টেনিস বলের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে রাসায়নিক রবারের ফেনা দিয়ে তৈরী ছোট ছোট বল।

কিছুদিন আগে পাঁচ হাজার ভেড়া ভর্তি ডেনিশ মালবাহী জাহাজ "আল কুয়ায়েট" কুয়ায়েট বন্দরে ডুবে যায়। জাহাজটা যেখানে ডোবে সেখানে জলের গভীরতা পঞ্চাশ ফুটের মত আর জায়গাটা এমন, যার মাত্র পাঁচ হাজার ফুট আগে থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমুদ্র থেকে নোনা জল

নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পানীয় জল তৈরী করেন। তাই ভেড়াগুলো পচে যাতে জল নষ্ট না করে, তার জন্যে জাহাজটাকে তোলার চেষ্টায় সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। জাহাজ ডুবে গেলে যারা তোলে, দেশ-বিদেশের এমন অনেক প্রতিষ্ঠান জানালে যে, জাহাজ তারা দেবে বটে কিন্তু সময় লাগবে অন্ততঃ ছ'মাস। জাহাজখানা যে ডেনিশ কোম্পানীতে বীমা করা ছিল, তারা তখন অনন্যোপায় হয়ে "ডেনিশ কল্পনাপ্রবণ লোক" কার্ল ক্রিয়েরের শরণাপন্ন হল। কার্ল বীমা কোম্পানীকে পরামর্শ দিলে যে, পশ্চিম জার্মানীর একটি বিরাট রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে রবার ফেনা দিয়ে তৈরী বল যদি জাহাজটা কোন মতে ভরাট করা যায়, তাহলে জাহাজটা ভেসে উঠবে। যাহা ভাবা তাঁহা কাজ; বীমা কোম্পানী ও পশ্চিম জার্মানীর রাসায়নিক কারখানা সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল, অবশ্য তার আগে ছোটখাটো পরীক্ষা করে নিয়ে তারা কাজের সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল।

এই রবার ফেনার বলের নাম "স্টাইরোপোর"। বেশ কিছু "স্টাইরোপোর" ও আরও "স্টাইরোপোর" বানাবার সাজসরঞ্জাম, বলগুলোকে ডোবা জাহাজের মধ্যে ঢোকাবার জন্যে বহু পাম্প ও অন্যান্য জিনিস-পত্রের প্রয়োজন হয়।

পঞ্চপাণ্ডব

শ্রীশৈলশেখর মিত্র

অলোকবাবুর পাঁচটা ছেলে
　　রত্ন বলে যাকে—
একটা কেন তাদের ভেতর
　　গানের ছবি আঁকে।
একটা কেন একটু কাঁদে,
　　মিষ্টি হাসির ফাঁকে,
একটা কেন ছন্দ খোঁজে
　　মৌমাছিদের চাকে।

একটা কেন চাঁদনীরাতে
　　আলোর আতর মাখে।
একটা কেন মনের কথায়
　　গোলাপ গুঁজে রাখে।
কেউ জানে না কোন্‌দিকেতে
　　কোন্ রাস্তার বাঁকে,—
অলোকবাবুর পাঁচটা ছেলে
　　কাদের পাড়ায় থাকে।

ট্রাঙ্ক কল

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

হুগলী জেলার এক সুদূর গ্রামাঞ্চলের থানা থেকে ট্রাঙ্ক কল এসেছে কলকাতার হেড আফিসে। খবর পাঠাচ্ছেন বিখ্যাত গোয়েন্দা শ্রীমন্ত ভাদুড়ী অফিসের বড়বাবুর কাছে। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, তিনি যে আজ দু'দিন ধরে সেই দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কুখ্যাত গুণ্ডা এজমালী খাঁর সন্ধানে, তার কিন্তু কোন খবরই করতে পারেন নি ; কিন্তু এখানে একটা নতুন আখড়ার সন্ধান পাওয়া গেছে। একেবারে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবার মত ব্যাপার। এজমালী খাঁকে না পাওয়া গেলেও, যা পাওয়া গেছে তা তার তুলনায় সাপের মতই ভয়ংকর। এই জায়গাটায় রীতিমত নরহত্যা হয়ে থাকে। মনে হয় এরা হাত, পা, শরীর সব কেটে কুঁচিয়ে বস্তায় ভরে নানান জায়গায় পাঠিয়ে সরিয়ে ফেলে। আমরা মাঝে মাঝে ট্রেনের মধ্যে বা অন্য জায়গায় বস্তার মধ্যে যে সব কেটে খণ্ড খণ্ড করা মানুষ দেখতে পাই, তার সবই বোধহয় এইসব জায়গা থেকে যায়।

বড়বাবু সংবাদটা শুনে শিউরে উঠলেন। এমন জয়গা! অথচ গোয়েন্দা বিভাগ-এর আগে কোন রকম খবর পায়নি। সেখানকার থানার লোকেরা নিতান্তই ঘুমিয়ে কাটায় দেখা যাচ্ছে। কিংবা সেই সমস্ত ডাকুদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে—তাদের ডাকাতির টাকার অংশীদার হয়ে অত বড় বড় ডাকাতগুলোকে জিইয়ে রেখেছে। কি ভয়ানক কথা! দেশ একেবারে উচ্ছন্নে গেল। বদমাইশ অসাধু লোককে আর কোন প্রকারেই ধরবার উপায় নেই। সমস্ত সাধু-লোকদের তারা হস্তগত করে, তাদের অসৎ কারবারের বখরাদার করে রেখেছে। সরষেগুলো সবই ভূতে পাওয়া, এখন ভূত তাড়ানই মুস্কিল। তিনি ভাদুড়ীমশায়কে সংবাদটার সত্যতা সম্বন্ধে যথাসম্ভব তথ্য জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন।

ভাদুড়ীমশায় চেয়েছিলেন কলকাতা থেকে কিছু শক্তিশালী সাহায্য। কারণ, তাদের পাকড়াও করবার মত ফৌজ স্থানীয় থানায় নেই। সাহায্যটা সেই রাত্রির মধ্যেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। না হলে সব মাটি হয়ে যেতে পারে ; শিকার হয়তো সেখান থেকে পালিয়ে যাবে।

বড়বাবু জানিয়ে দিলেন, মিলিটারি ফৌজ মধ্যরাত্রির মধ্যেই সেখানে পৌছে যাবে এবং তিনি স্বয়ং তার অনেক পূর্বেই হাজির হতে পারবেন বলে আশা করেন।

রাত্রি দশটা আন্দাজ বড়বাবু এসে এলাহীপুরে ভাদুড়ীমশায়ের সঙ্গে মিলিত হলেন। এখন ব্যাপারটা কি এবং কোথায়? ব্যাপারটা হচ্ছে এলাহীপুর থেকে চার মাইল পশ্চিমে। ঘটনাটা যে কি, তা স্বয়ং বড়বাবুরই প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। আড়ালে দাঁড়িয়ে অন্ততঃপক্ষে কথাগুলো তাঁর স্বকর্ণে শুনে রাখা দরকার। কিন্তু প্রকাশ্যে সকলের সামনে তো আর আলোচনা করা যায় না ;

তিনি একেবারে যথাস্থানেই রওনা হয়ে যেতে চান। আগেকার দিনে হলে একমাত্র গরুর গাড়ীর ছিল ভরসা, না হয় তো হেঁটে যেতে হবে। আজকাল ভাড়াটে মোটর গাড়ী পাওয়া যায়, সময় সময় ট্যাক্সিও জোটে। গোয়েন্দা বিভাগের এঁরা দু'জন যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করে নিয়ে দুর্দমকে দমন করতে যাত্রা করলেন। সঙ্গে গেল সেখানকার থানার একজন টহলদারি চৌকিদার। কথা হল, মিলিটারি পুলিশ এসে পড়লে আর একজন চৌকিদার তাদের পথ দেখিয়ে যথাস্থানে পৌছে দেবে। পথের ওপর পরামর্শ বা আলোচনা কিছু হোতে পারল না, কারণ গাড়ীর মধ্যে সব তৃতীয় ব্যক্তিরা রয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে ঘুটঘটে অন্ধকারের মধ্যে গাড়ী এক জায়গায় তাদের নামিয়ে দিল। গাড়ী থেকে নেমেই ভাদুড়ীমশায় অন্ধকারের মধ্যেই তাঁর চেনা পথটি চিনে নিয়েছেন। তিনজনেই এগিয়ে চলেছেন একটা মেঠো পথ ধরে। জায়গাটা কি ভয়ানক বিভীষিকাময়। বড় বড় গাছগুলো মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে শাসন করছে। বড়বাবু তাঁর পিস্তলটা খাপ থেকে বার করে হাতের মধ্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন। ভাদুড়ীমশায়ের পিস্তলতো সব সময়ই প্রস্তুত। চৌকিদার বাবুও তাঁর লাঠিটা কায়দা করে ধরে রেখেছেন, দরকার হলেই এক-ঘা হাঁকরাতে পারবেন। তবে তিনি একটু লজ্জিত এবং ভীত। এ জায়গাটা তাঁদের এলাকার মধ্যে হলেও, এদিকে তাঁরা বড় কেউ আসেন না। ঘরের কাছে ঘুরেই টহলদারি শেষ করেন। এখন ওপরওলার কাছে ধরা পড়ে জিনিসটা যে কি ভাবে ব্যাখ্যাত হবে—তাদের বিরুদ্ধে নালিশ হবে কিনা—একটা ভাবনার কথা বটে। তারপর কি রকম আসামী ধরা পড়ে—ডাকাতদলের সঙ্গে তাদের কোন ষড়যন্ত্র প্রমাণ হবে কিনা—চিন্তা করলে একটু ভয় হওয়াই স্বাভাবিক।

একটা বেশ মাঝারি আকারের বাড়ী। বাড়ীর চারপাশেই ঝোপ-ঝাড়। গোপন কাজের উপযুক্ত জায়গাই বটে। ভাদুড়ীমশায় বড়বাবুকে নিয়ে পা টিপে টিপে ঝোপের মধ্য দিয়ে এসে একটা ঘরের পিছনে ঘাপ্‌টি মেরে বসে রইলেন। চৌকিদার দরজার সামনের দিকে একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়াল। কে আসে না আসে সেটা দেখতে হবে, তাছাড়া ফৌজ এসে পড়লে তাদের নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

বাড়ীর মধ্যে কথা হচ্ছে ভাদুড়ীমশায় আর বড়বাবু শুনছেন।

"গলাটাকে আগে কেটে ফেল্‌লে না কেন ?"

"আমি বুকটাকে আগে কেটে নিচ্ছি, তারপর গলা কাটব।"

"উল্টো কাজ ! একটা গলা কাটতেই এত ঘাবড়াও, তুমি কি করে আমাদের সঙ্গে কাজ করবে ? আমি এই সময়ের মধ্যে কতগুলো গলা কেটে ফেললুম দেখেছ ?

"আমার অস্ত্রটা সেরকম শানান নয়।"

"পাল্টে নিচ্ছ না কেন? ভোঁতা যন্ত্র দিয়ে কি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটা সম্ভব?"

ভাদুড়ীমশায় অতি চুপি চুপি ফিসফিস করে বললেন, "বড়বাবু শুনছেন,—ব্যাপারটা কিরকম বুঝছেন?"

"বুঝলাম তো সবই, কিন্তু আপনি এখানে প্রথম বুঝলেন কি করে?"

"আমি পথ চলতে-চলতে শুনতে পেলুম,—গলা কাট, গলা কাট! তারপরই আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম এই সব কথা।"

"এরা কি সেই থেকে খালি গলাই কাটছে? কত গলা কাটছে এরা?"

"নাঃ, শুধু গলা কাটবে কেন? কত হাত কেটেছে, পা কেটেছে, কেটে কেটে কুঁচিয়েছে; বস্তার মুখ সেলাই করেছে। এত রকম শুনেছি, তবে না খবর দিয়েছি!"

ইতিমধ্যে চৌকিদার একটা বাঁশী বাজিয়ে সংকেত করতেই তাঁরা দু'জন পা টিপে টিপে উঠে গেলেন। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী স্পেশাল গাড়ীতে এসে হাজির। চৌকিদার তাদের মাঠের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। রাত্রি ততক্ষণে গভীর হয়ে গেছে। গ্রামের মধ্যে জনমানবের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল সেই বাড়ীটার ছোট জানলার মধ্য দিয়ে ক্ষীণ আলোক-রশ্মি ঝোপটার মধ্যে যেন অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে রয়েছে।

অতি সন্তর্পণে সমস্ত বাহিনীটার কিছু অংশ গোটা বাড়ীটাকে ঘেরাও করে ফেলল—কোন দিক দিয়ে কেউ না পালিয়ে যেতে পারে। থানার অবশিষ্ট চৌকিদার দু'জন থানার ঘরে তালা লাগিয়ে চলে এসেছে। তারা দু'জন লাঠি বাগিয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল; যদি কোন লোক বাইরে থেকে সেই বাড়ীটার দিকে আসে তো তাকে পাকড়াও করবে। অথবা দুর্বৃত্তদের কেউ যদি কোন রকমে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তো তার পায়ের দিকে লক্ষ্য করে লাঠি ছুঁড়ে মারবে।

ব্যস্ সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক। এইবার কয়েকজনে বন্দুক উঁচিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল, সঙ্গে বড়বাবু আর ভাদুড়ীমশায়; একজন চৌকিদারও সঙ্গে আছে; সে পরোয়ানা তৈরী করে নিয়ে এসেছে। মস্ মস্ জুতার শব্দ। তারা একেবারেই ভিতরে ঢুকে পড়ল।

"কে আছেন বাড়ীতে? আমরা থানা থেকে আসছি।"

"কে?"

একজন গ্রাম্য পোষাকে একটা লম্ফ হাতে করে বেরিয়ে এল।

"কি চাই আপনাদের?"

"আমরা থানা থেকে এসেছি, এই দেখুন পরোয়ানা। সারাদিন যে এখানে এত কাটাকাটি হয়েছে আমরা সেই সম্বন্ধে তল্লাসী করতে চাই।"

তারা উত্তরের অপেক্ষা না করেই একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়ল। সাত-আটজন লোক ভয়ে এক রকম কাঁপতে কাঁপতে একটা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। সেই ঘরের মধ্যে গোটা তিন কেরোসিনের বাতি, নানারকম কাপড়ের ছিট, গজ ফিঁতে কতকগুলো কাঁচি! নানারকম জামা, প্যান্ট, ব্লাউজ প্রভৃতি খানিক খানিক কাটা অবস্থায় ছড়ান রয়েছে। তাই তো এই সবের গলা আর হাত পা কাটা হয়েছে সারাদিন? বড়বাবু আর শ্রীমন্ত ভাদুড়ী পরস্পরের মুখের দিকে একবার তাকালেন। যে লোকটি আলো নিয়ে বাইরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল, "আপনারা কি কোন অর্ডার-টর্ডার নিয়ে এলেন? আমরা হাটে হাটে মাল বেচে থাকি। তা অর্ডার পেলেও ঠিক সময়ে দিয়ে থাকি। আপনাদের কি পুলিশী পোষাক করতে হবে?"
ভাদুড়ীমশায় বললেন, "নাঃ, আমাদের একটা ভুল হয়ে গেছে।"

বড়বাবু জবাব দিলেন, "একটা নয়, অনেক ভুল হয়েছে,—চলুন।"

চৌকিদার বিজ্ঞের মত বলল, "তেমন হোলে কি আমরা কোনই খবর রাখতাম না। এ জায়গায় টহলদারি করি, চৌকি দিই, সরকারী নুন খেয়ে তো একেবারেই ঘুম দিই না স্যার!"

খুকুর দুষ্টুমি

শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম

গাছপালা পার হয়ে
　　ঘুড়ি ঘুরে ঘুরে—
যেনো সব ছাড়িয়ে সে
　　যেতে চায় উড়ে!
সে ঘুড়ি উড়ায় খোকা,
　　খুকু দেখে যেই
মন তার নেচে ওঠে
　　দুষ্টুমিতেই!

চুপ ক'রে খুকুসোনা
　　উঠে তাই ছাতে—
সুতো ছিঁড়ে হাত্‌তালি
　　দেয় দুই হাতে!
খোকা যেই রেগে যায়
　　খুকু বলে, 'শোন—
ঘুড়িটা আকাশ ছোঁবে
　　দেখ্‌না এখন!'

উপন্যাস

প্রোথমেদীনেজের ফকির

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তাকিয়ে দেখি, গলির অপর প্রান্তে বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে। আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কাছে গেলাম। ও একটু সরে মাঝের একটা ঘর খুললো। বললে,—আপনার ঘর। আপনার স্যুটকেশ এনে রেখেছি। ঐ দেখুন। ঘরখানা ছোট্ট। ষ্টুয়ার্ডের ঘরের আধখানা হবে। উঁচু বিছানা। একটি নীল রঙের ডোরাকাটা চাদর দিয়ে ঢাকা। একটা বালিশ। অন্য দিকে ছোট্ট টেবিল, চেয়ার, টেবিলে টাইপ্‌রাইটার।

বললাম,—একা থাকবো?

—হ্যাঁ।

বললাম,—বাথরুম আছে?

ও এগিয়ে গিয়ে একটা দেয়ালে ধাক্কা দিলে। খুলে গেল। সাহেবদের মতো 'কোমোড্' পাতা, একপাশে স্নানের জায়গা, আয়না, এই সব।

এক পলকে দেখে নিয়ে ওকে বললাম,—'টক্‌লেটার' মানে কী ভাই?

ও বললে,—ওর মানে, 'পরে কথা বলবো।'—কেন?

—ষ্টুয়ার্ড বললে কিনা?

বলেই ও চলে যাচ্ছিল। পিছন থেকে ডাকলাম,—শোনো না ভাই?

ফিরে দাঁড়ালো। বললে,—কী?

চেয়ার দেখিয়ে বললাম,—বসো না?

ও বসলো না। খোলা দরজাটার কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে,—বলো না, কী বলবে? বললাম,—ঐ মোটা লোকটা চীফ্ ষ্টুয়ার্ড? কী জাত ভাই?

—গোয়ানীজ।

—নাম?

—ডিসুজা।

বললাম,—লোকটা বাথরুমে বসে খবরের কাগজ পড়ে।

ও বললে,—তা পড়ে! সময় কম নেয় না, আধ ঘণ্টা, ঘড়ি ধ'রে। বললাম,—ঘরে বসে পড়ে না কেন ?

ও বললে,—ওর অভ্যেস যে। 'কোমোডে' ব'সে পাইখানা করতে করতে খবরের কাগজ পড়ে।

—এঃ রাম !—ঘৃণায় আমার নাক কুঁচকে গেল।

ও ততক্ষণে অল্প একটু হাসলো, বললে,—জাহাজে থাকতে থাকতে কতো কী জিনিস দেখবেন—মজার !

বললাম,—আচ্ছা ভাই, জাহাজে আর কেউ বাঙালী আছে ?

—আছে,—বিশ্বাস বললে,—ব্যানার্জী। রেডিও অফিসার। ভীষণ দেমাক। আমাদের সঙ্গে কথা বলে না।

—সে কী ?

—ওই রকম। বাঙলা বলে না কখনো। ওতে প্রেষ্টিজ 'পাংচার' হয়ে যায়। বলতে বলতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বললে,—যাই। গল্প করবো না। এখুনি ঘন্টি বাজবে, অমনি বাড়ীওয়ালার কাছে ছুট্‌তে হবে। ডিউটিতে এখন আছি যে !

—বাড়ীওয়ালা! বাড়ীওয়ালা কে ?

ও বললে,—ক্যাপ্টেনকে লস্কররা বলে,—বাড়ীওয়ালা। শুনে শুনে আমরাও বলতে আরম্ভ করেছি।

বললাম,—তাঁর নাম তো দুধওয়ালা। দুধওয়ালা বললেই পারো ?

—ধেৎ তা' কেন ?—বলতে-বলতে ঘরের বাইরে পা বাড়ালো বিশ্বাস, বললে,—কফি খাবেন ?

—কফি ? পাবো কোথায় ?

বললে,—দাঁড়ান, আন্‌ছি।

ও ছুটে চলে যাচ্ছিল দেখে ডেকে উঠলাম,—শোনো ?

দাঁড়ালো। বললাম,—তোমাকে বেশ ভালো লাগছে। তোমার পুরো নামটা কী ?

মুখখানা কেমন বিরস হয়ে উঠলো, বললে,—পুরো নাম শুনে আর কী করবেন ? বিশ্বাস বলেই সবাই ডাকে।

—তবু, শুনি ?

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললে,—অমিয়কুমার বিশ্বাস।

খুশী হয়ে বলতে গেলাম,—আচ্ছা, অমিয়—

ও তাড়াতাড়ি বললে,—ও নামটা বলবেন না, প্লীজ।

ব'লে, আবার চলে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—আচ্ছা ভাই, বিশ্বাস, কতদিন আছো এই জাহাজে?

ও একটুক্ষণ চিন্তা করলো, তারপরে বললে,—তা হবে—বছর তিনেক।

—এই জাহাজেই?

—হ্যাঁ।

—আর কোনো জাহাজে যাওনি?

—না।

বললাম,—অনেক দেশ ঘুরেছো, না? জানো, আমি কিন্তু দেশ দেখতেই বেরিয়েছি। আচ্ছা, বিলেত কেমন জায়গা ভাই? লণ্ডন? নিশ্চয়ই গেছো।

ওর চোখ দুটো বড়ো বড়ো হচ্ছিল। আমার কথার উত্তরে বললে,—না, লণ্ডন কখনো যাইনি।

—সে কী! কোপেনহেগেন?

ও বললে,—সে আবার কোথায়? যাইনি তো?

—নিউইয়র্ক?

—না, তা-ও যাইনি।

—তা'হলে গেছো কোথায়? জার্মানী? ফ্রান্স? রাশিয়া?

ও মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগলো,—না না, কোথাও যাইনি।

অবাক হয়ে বললাম,—সে কী! বছর তিনেক জাহাজে আছো? ওসব কোথাও যাওনি?

—না!

বললাম,—আমি তো ওসব জায়গায় যাবো বলেই জাহাজে এসেছি!

ও বললে,—ভুল করেছেন। এ-জাহাজ ওসব জায়গায় যায় না।

বুকটা তখন আমার ঢিপ ঢিপ করছে। কোনরকমে বলে উঠলাম,—তবে? ও বললে,—এ-হচ্ছে 'কোষ্টাল্ কার্গো শীপ্' এই দেশেরই বন্দর থেকে বন্দরে মাল বয়ে বেড়ায়। বিলেত-টিলেত কখনো যায় না। ওসব স্বপ্ন দেখে যদি থাকেন, তো ঠকেছেন।

বলে, আর দাঁড়ালো না, চলে গেল বাইরে। আমি শূন্য চেয়ারটায় হতাশ হয়ে ধপ্ করে বসে পড়লাম। (ক্রমশঃ)

মঙ্গলগ্রহে অভিযান

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারিপাশে। মঙ্গলগ্রহও ঘুরছে সূর্যের চারিপাশে, অবশ্য ভিন্ন গতিতে, ভিন্ন অক্ষপথে। এরই মধ্যে মানুষের তৈরী এক মহাকাশযান রকেট-তাড়িত হয়ে মঙ্গলগ্রহের সীমানার মধ্যে চলে এলো। পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহের দূরত্ব কোন অবস্থাতেই ৩-৪ কোটি মাইলের কম হয় না। মঙ্গলগ্রহে আসার জন্য এই মহাকাশযান মেরিনার ৪ ছুটছিল সেকেণ্ডে প্রায় আট মাইল বেগে, দীর্ঘ সাড়ে সাত মাস ধরে সমানে ছুটে সম্প্রতি (১৪ই জুলাই) তা গ্রহটির সাত হাজার মাইলের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু অভিযানটি এখানেই শেষ হয়নি। মহাকাশযানটি যদিও আকারে ছোট্ট একটা ঘরের থেকে বড়ো হবে না, কিন্তু তা ছিল অজস্র যন্ত্রপাতিতে পোরা। এ সমস্ত যন্ত্রপাতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে মঙ্গলগ্রহের অনেক খবর আমাদের জানিয়ে দিয়েছে।

মঙ্গল পৃথিবীর চোখে খুবই রহস্যময়। খালি চোখে তা লালাচে এক আলোকবিন্দু মাত্র, দূরবীনে তা একটা তামাটে রঙের চাকতি বলে বোধ হয়। এই মঙ্গলগ্রহে নাকি মানুষ রয়েছে, মানুষ না থাকলেও মানুষের মত উন্নত জীব। এককালে বিজ্ঞানী সমাজে এটাই ছিল প্রচলিত বিশ্বাস। আজ সে বিশ্বাস টুটে গেছে।

মঙ্গলগ্রহে জল খুবই সামান্য, বাতাস আছে বটে কিন্তু তাতে অক্সিজেন-এর ভাগ খুবই কম। তবে এখানের তাপমাত্রা খুবই নীচু। জল যে তাপমাত্রায় জমে বরফ হয়, রাত্রির তাপমাত্রা তা ছাড়িয়ে প্রায়ই সত্তর-আশী ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড) নেমে যায়। এমন অবস্থায় শুধু মানুষ কেন, নিতান্ত জীবাণু ও শ্যাওলা জাতীয় প্রাণী ছাড়া আর সবার পক্ষেই বেঁচে থাকা শক্ত। দূরবীনের চোখে মঙ্গলগ্রহের বুকে অনেকে নাকি টানা টানা অনেক রেখা দেখেছিলেন, সেগুলো জলবাহী খাল বলে আগে ধারণা ছিল। খাল যদি সম্ভব হয় তবে তার খননকারী বুদ্ধিমান জীবও নিশ্চয়ই রয়েছে। এ সমস্ত অনুমানের উপর নির্ভর করে আমরা এককালে মঙ্গলগ্রহে মানুষ সম্বন্ধে অনেক গল্প পড়েছিলাম। সে সমস্ত "মাঙ্গলিক" মানুষের কেউ কেউ পৃথিবীতেও চলে আসে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করে এদেশে রাজ্যবিস্তারের জন্য। তারপর পৃথিবীর সৈন্যদলের সেনাপতি মহাবীর অমুক অস্ত্র অমুকের বীরত্বে পরাজিত হয়ে আবার ঘরে ফিরে যায়।—ইত্যাদি, ইত্যাদি। সে সমস্ত গল্প কাহিনী আজ অনেক পুরনো কাহিনীর মতই বিস্মৃত হয়ে গেছে।

৪নং মেরিনার-এ রাখা ক্যামেরায় মঙ্গলগ্রহের অনেকগুলি ছবিও তোলা হয়েছে। এ সমস্ত ছবি পৃথিবী থেকে তোলা যে কোন ছবির তুলনায় অন্ততঃ ত্রিশগুণ স্পষ্ট। ভাবতে খুবই অবাক লাগে
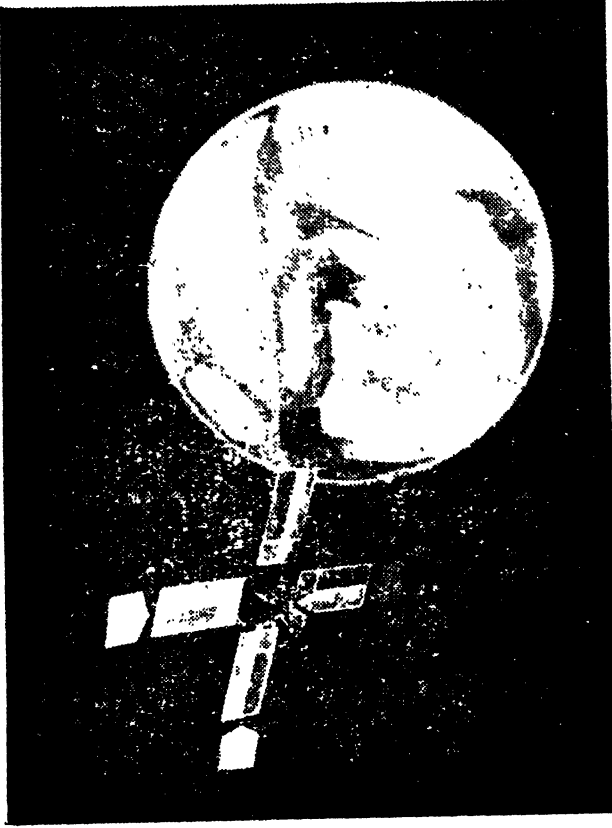
শিল্পীর কল্পনায় মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে আকাশ-যান

পৃথিবীর প্রায় চৌদ্দকোটি মাইল দূর থেকে তোলা এ সব ছবি কি উপায়ে আবার পৃথিবীর বুকে টেলি-ভিশনের পর্দায় ফুটে উঠলো।

পৌরাণিক গল্পে তিলোত্তমার কাহিনী তোমরা বোধহয় জেনে থাকবে। বিশ্বের তাবৎ জায়গা থেকে তিল তিল সৌন্দর্য চয়ন করে এই অপরূপ নারীমূর্তি তৈরি হয়েছিল। মঙ্গলগ্রহের প্রতিটি ছবিতে রয়েছে তেমনি অত্যন্ত ছোট ছোট অংশ বা বিন্দু—প্রায় আড়াই লক্ষ বিন্দু মিলে এক একটি ছবির গঠন। প্রতিটি বিন্দুই আবার খুব সাদা থেকে খুব কালো—এর মধ্যে যে কোন রঙের হতে পারে। রামধনুর সাতটা রঙের মত এই রঙগুলিকে ভাগ করা হয়েছে মোট ৬৪টা ভাগে। এই ৬৪টা রঙের প্রতিটিকে চেনার জন্য বিশেষ রেডিও-সংকেত রয়েছে। যন্ত্রের নির্দেশে পৃথিবীতে এই বেতার-সংকেত ভেসে আসে। সে অনুসারে ল্যাবরেটরীতে বিন্দুগুলি পুনরায় লেখা হয়। ক্রমে পুরো ছবিটাই এভাবে ফুটে ওঠে। মাত্র সাড়ে আট ঘণ্টায় আমরা এক একটা ছবি পেয়ে যাচ্ছি। মানুষের বহু যুগের সঞ্চিত জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলের উত্তর এভাবে সামান্য কয়েক ঘণ্টা বা দিনে পেয়ে যেতে পারি হঠাৎ একথা ভাবাই যায় না।

ল্যাবরেটরীর পর্দায় ছবি কি রূপ নেয় তা দেখার জন্য বিজ্ঞানীরা দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলেন। আজ মনে হয় সে দীর্ঘ প্রতীক্ষা এতোদিনে সফল হয়েছে। ৪নং মেরিনারে তোলা মঙ্গলগ্রহের ছবিগুলি বিশ্লেষণ করে বহু অজ্ঞাত বিষয় জানা সম্ভব হবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের পুরনো সংশয় দূর হবে।

চার্লস্ ডিকেন্স্

মধ্যবয়সের ডিকেন্স

এই নাম, আমরা যারা ইংরাজী সাহিত্যের কিছু খবর রাখি, সকলেই শুনেছি। বিখ্যাত নাট্যকার ও কবি উইলিয়াম সেক্সপীয়রের পরেই ওঁর নাম ইংরাজী সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। দু'জনেই সাধারণ লোকের হাস্যরসযুক্ত মেজাজের বৈশিষ্ট্য চিত্রিত করেছেন। এই বিষয়ে সেক্সপীয়রই একমাত্র এইরূপ মেজাজী লোকের চিত্রাঙ্কনে ডিকেন্সের প্রতিদ্বন্দ্বী। ডিকেন্সের বিরুদ্ধে সাধারণের সমালোচনা—তিনি মানুষের প্রতিদিনের জীবনের বৈষম্যকে অতিরঞ্জিত ক'রে প্রকাশ করতেন। মানুষের কাজের দিকেই তিনি বেশী নজর দিতেন, তাদের মনের দিকে নয়।
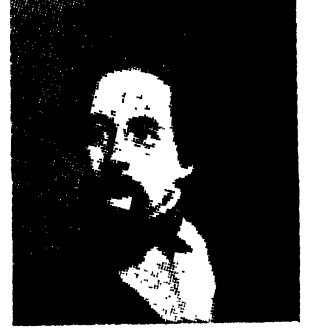
১৮১২ খৃষ্টাব্দে পোর্টসমাউথের কাছে ডিকেন্সের জন্ম হয়। ইনি একজন অতি সাধারণ কেরানীর পুত্র ছিলেন। এঁর বাল্যজীবন দারিদ্র্য, দুঃখকষ্ট ও সামান্য লেখাপড়ার মধ্যেই কেটেছিল। এই অভিজ্ঞতার জন্য দারিদ্র্যপীড়িত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ওপর তাঁর সারা জীবন সহানুভূতি ছিল, যাঁরা সমাজের অন্য শ্রেণী কর্তৃক শোষিত। কিছুদিন চ্যাথামে বাস করার পর ডিকেন্স লণ্ডনে আসেন, কারণ সেই সময়ে দেনার দায়ে তাঁর পিতার জেল হয়।

নিজের পরিবারের আর্থিক সাহায্যের জন্য তিনি কিছুদিন এক গুদামে চাকরি করেন এবং তাঁর পিতা কারামুক্ত হ'লে কিছুদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। এর পরে নানারূপ কাজের ভেতর দিয়ে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর হাস্যরসপূর্ণ লেখার বিকাশ হ'তে থাকে। এর পরে পর পর কয়েকখানি বিখ্যাত উপন্যাস লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। যেমন—পিকউইক পেপার্স, অলিভার টুইস্ট প্রভৃতি। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার আমেরিকায় বক্তৃতা সফরে যান এবং সেখানে ২০,০০০ পাউণ্ড উপার্জন করেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি Drood Mystery of Edwin নামে একটি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস অসমাপ্ত রেখে মারা যান। এখানে আমরা তাঁর লিখিত দু'টি উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার দিচ্ছি, যে দু'টির নাম 'অলিভার টুইস্ট' এবং 'ডেভিড কপারফিল্ড'। এ দুটিই ছোটদের খুব প্রিয়।

অলিভার টুইস্ট

অনাথ বালক অলিভার আহার চাইছে।

অলিভার টুইস্ট নামক বিখ্যাত গল্পটি আরম্ভ হয় এক মাতৃপিতৃহীন বালককে নিয়ে। অলিভার টুইস্ট নামে অনাথ বালক আহার-আশ্রয়ের বিনিময়ে দরিদ্রদের কারখানায় (work-house) কাজ করতো। এই কারখানার চরম দুর্দশাপূর্ণ জীবন ডিকেন্স চিত্রিত করেন।

এই বালকটি প্রতিদিনের খাদ্যাভাব ও অখাদ্য ঘ্যাট খাওয়ার ফলে কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করে। সেজন্য তাকে ভীষণ অত্যাচার সহ্য করতে হয়। এইরূপ দুরন্ত ছেলেকে রাখা উচিত নয় মনে ক'রে, একে ৫ পাউণ্ডে পেশাদার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদকের (undertaker) হাতে শিক্ষানবিস হিসাবে বিক্রি ক'রে দেওয়া হয়। এখান থেকে পুনরায় লণ্ডনে পালিয়ে যাওয়ার পর অলিভার বুঝতে পারে যে পৃথিবীতে কতটা অন্যায় আছে।

এই সময় হঠাৎ অলিভার একটি ছোট ছেলের সঙ্গে পরিচিত হয়। ফ্যাগিং নামে ন্যায়অন্যায়হীন এক চোরের বাড়িতে সেই ছেলেটি তাকে নিয়ে যায়। এই ফ্যাগিং ছেলেদের চুরি করা শেখাতো। অলিভার পুনরায় শিক্ষানবিসের কাজ পেয়েছিল বিলশাইকস্ নামে এক চোরের কাছে। শেষকালে মধুর সমাপ্তির জন্য ডিকেন্স গল্পটিকে দুর্বল ক'রে ফেলেন।

অলিভার টুইস্ট ৩,০০০ পাউণ্ডের উত্তরাধিকারী হয়। তবে এটা ঠিক, লণ্ডনের দরিদ্র-জীবনের যে ভীষণ চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন, তা সকলের মনে চিরজাগরূক থাকবে।

ডেভিড কপারফিল্ড

ডিকেন্স নিজেই বলেছেন, তাঁর সব উপন্যাসের মধ্যে তিনি এই বইখানিই সবচেয়ে ভালো-বাসেন। 'অনেক স্নেহপ্রবণ পিতামাতার মতন আমার হৃদয়ের মধ্যে আছে একটিমাত্র সন্তান এবং তার নাম হচ্ছে, ডেভিড কপারফিল্ড।'

প্রথন কয়েকটি পরিচ্ছেদে আমরা অনাথ ডেভিডকে অবহেলিত অবস্থায় দেখতে পাই। তাকে দশ বৎসর বয়সে মদের কারখানায় কাজ করতে দেখি। ডিকেন্সের বাল্যকালের অবস্থার কথাই প্রতিফলিত হয়েছে। তখন তাঁর শিক্ষা কম ছিল এবং কারখানায় কাজ করতে হয়েছিল। আমরা এই উপন্যাসে যে মিস্টার মিকোয়াবারের চিত্র দেখতে পাই, সেটা ডিকেন্সের পিতারই চিত্র। হাস্যরসপূর্ণ আইনের আপিসে নানারকম দুঃসাহসিক কার্যে এবং কিছুদিন বিদেশে থাকার পর ডেভিড একজন সফল গ্রন্থকার হলেন এবং ডিকেন্সের মত সে-ও শর্টহ্যাণ্ড রিপোর্টারের কাজ ক'রে তার ব্যয় পূরণ করতো!

এই বরষাতে

শ্রীমতী শান্তি বসু

রিম ঝিম্ রিম ঝিম্
আজ বরষাতে,
খিচুড়ি ও ডিম ভাজা
দাও, মাগো পাতে।

তেলে ভাজা, সাথে মুড়ি
খেতে, সাধ জাগে
গরম পাঁপর ভাজা
কি যে, ভাল লাগে।

দিদিভাই, শোনাবে যে
আজ, রূপকথা,
দাদুভাই, দাড়ি নেড়ে
পড়িবে, কবিতা।

জানলাটা খুলে দাও
আসুক, বাতাস,
খুকুমণি, নিয়ে আয়
এক জোড়া তাস।

মেঠুড়ে

প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন : মোহনবাগান

মোহনবাগানের প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন আখ্যা এবারেও অক্ষুন্ন থেকেছে। বি, এন, রেল দলকে হারাবার পর মোহনবাগানের লীগ জয়ের পথ বাধামুক্ত হয়। আই, এফ, এ, লীগ সাব কমিটির রায়ে মোহনবাগান-রাজস্থানের লীগের খেলাটাতে মোহনবাগানকে বিজয়ী সাব্যস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাগান এবারের লীগ বিজয়ীর আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞায় অভিনন্দিত হয়। ৮ জুন রাজস্থান মোহনবাগানের বিরুদ্ধ মাঠে হাজিরা দিতে না পারায় মোহনবাগানকেই জয়ী বলে সাবস্ত করা হয়।

মোহনবাগান গত তিনবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং সব সমেত তেরোবার লীগ বিজয়ী হয়েছে। কলকাতা ফুটবল লীগে আর কোনো প্রতিযোগী এতোবার সাফল্যলাভ করেনি।

টেস্ট ম্যাচ : ইংল্যাণ্ড বনাম নিউজিল্যাণ্ড

কয়েকদিন আগে ইংলণ্ডে ইংল্যাণ্ড বনাম নিউজিল্যাণ্ড দলের তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলা শেষ হয়েছে। তিনটি টেস্টেই ইংল্যাণ্ড জয়ী হয়ে 'রাবার' পেয়েছে। বার্মিংহামের এজবাস্টন মাঠের

প্রথম টেস্টে ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে, লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্টে ৭ উইকেটে আর লীডস মাঠের তৃতীয় টেস্টে এক ইনিংস ও ১৮৭ রানে নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়ে দেয়।

স্বদেশ এবং বিদেশে এর আগে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে এগারোটা সিরিজের একান্নটা টেস্ট খেলায় যে নিউজিল্যাণ্ড একটা টেস্টেও জিততে পারেনি, চৌত্রিশটা খেলায় হেরেছে এবং সতেরোটা খেলায় 'ড্র' করেছে, সেই নিউজিল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এবারের টেস্ট খেলাগুলোতে যে জিতবে এটা কেউ আশা করেনি।

এজবাস্টনের প্রথম টেস্টে ইংল্যাণ্ড টসে জিতে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পেয়ে প্রথম দিন ৩ উইকেটে ২৩২ রান ওঠায়। দ্বিতীয় দিন ৪৩৫ রানে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর নিউজিল্যাণ্ড ব্যাট করতে নেমে ৫৯ রানে একটা উইকেট হারায়। তৃতায় দিন ১১৬ রানে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ায় তাদের 'ফলো-অন' করতে হয়। 'ফলো-অন'-এর পর তৃতীয় দিনের শেষে তাদের ৪ উইকেটে ২১৫ রান প্রশংসা করার মতন। চতুর্থ দিন ৪১৩ রানে নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে পোলার্ড ৮১ রান করে নট আউট থাকেন। জয়ের জন্যে ৯৪ রানের মধ্যে ইংল্যাণ্ড চতুর্থ দিনের শেষে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৮ রান করে। পঞ্চম দিন লাঞ্চের ৪৫ মিনিট আগে ১ উইকেটে ৯৬ রান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খেলা শেষ হয়। ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে জয়ী হয়। প্রথম টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড হেরে গেলেও নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাটিং ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের একটু চিন্তার কারণ হয়েছিল।

লর্ডস মাঠে দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড টসে জিতলেও প্রথম ইনিংসে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে মাত্র ১৭৫ রান করে। নিউজিল্যাণ্ডের পর ইংল্যাণ্ড প্রথম দিনের শেষেই ২ উইকেটে ৭২ রান সংগ্রহ করে। ইংল্যাণ্ডের ন্যাটা ফাস্ট বোলার ফ্রেড রামসের মারাত্মক বোলিং-ই নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাটিং বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। রামসে প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৫ রানে ৪টে উইকেট পান। দ্বিতীয় দিন ৩০৭ রানে ইংল্যাণ্ডের ইনিংস শেষ হয়। কলিন কাউড্রের ১১৯ এবং টেড ডেক্সটারের ৬২ রান ছিল দ্বিতীয় দিনের খেলার প্রধান আকর্ষণ। নিউজিল্যাণ্ডের তরুণ খেলোয়াড়দের ব্যাটিং-শক্তি সম্পর্কে ইংলণ্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকদের চিন্তা যে অমূলক ছিল না, দ্বিতীয় ইনিংসে তার প্রমাণ মেলে। কারণ ইংলণ্ডের ইনিংসের চেয়েও বেশি রান উঠিয়ে ৩৪৭ রানে নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে। চতুর্থ দিনের খেলায় রাণী এলিজাবেথের উপস্থিতি হয়তো নিউজিল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকবে। তারা সত্যিই ইংলণ্ডের বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ব্যাট চালিয়ে যায়। ফলে ইংল্যাণ্ডকে জয়ের জন্যে তাড়াতাড়ি রান তুলতে হয়। পঞ্চম ও শেষ দিনের খেলা শেষ হবার পনেরো মিনিট আগে ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেটে জয়ী হয়।

ফ্রেড টিট্‌মাস
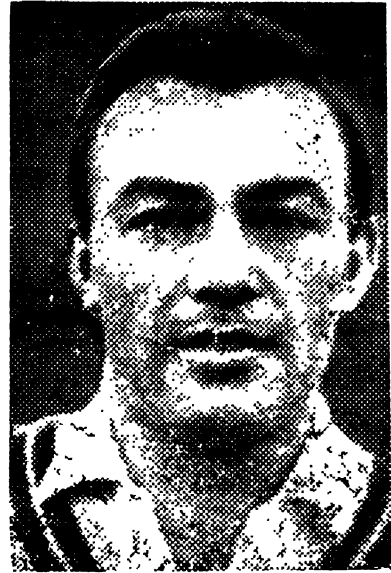
জন এড্‌রিচ

তৃতীয় টেস্টে ১৩ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেলেও দ্বিতীয় উইকেটে সারের দুই ব্যাটসম্যান কেন ব্যারিংটন ও জন এডরিচ সেঞ্চুরী পূর্ণ করেন। ইংল্যাণ্ডের রান ওঠে ১ উইকেটে ৩৬৬। এডরিচ ১৯৪ এবং ব্যারিংটন ১৫২ রান করে নট আউট থাকেন। খেলার দ্বিতীয় দিন এডরিচ ও ব্যারিংটনের অসমাপ্ত দ্বিতীয় উইকেট জুটির ৩৫৩ রানে আগের দিনই দু' দেশের টেস্ট খেলার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পার্টনারশিপের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছিল; শুধু দু' দেশের ইতিহাসে নয়—এই রান সংখ্যা ছিল সব দেশের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের পঞ্চম জুটির শ্রেষ্ঠ পার্টনারশিপ। দ্বিতীয় দিন দুই নট-আউট ব্যাটসম্যান ব্যারিংটন ও এডরিচ সব দেশের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় উইকেটে নতুন রেকর্ড করতে পারেন কিনা এটা দেখাই ছিল দর্শকদের প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু ব্যারিংটন ১১ রানে আউট হলে আর মাত্র ১৩ রানের জন্য দ্বিতীয় উইকেট জুটির রেকর্ড হয়নি। এডরিচ নিউজিল্যাণ্ডের বোলারদের বল বাউণ্ডারীর পর বাউণ্ডারী এবং মাঝে মাঝে ওভার বাউণ্ডারী মেরে ডাবল সেঞ্চুরীর পর ট্রিপল সেঞ্চুরী পূর্ণ করেন। এর মধ্যে কলিন কাউড্রে ও পিটার পারফিট আউট হয়ে যান। কিন্তু এডরিচের একদিকে যেমন অনমনীয় দৃঢ়তা, অপর দিকে খেলার মধ্যে চিত্তাকর্ষক সাবলীলতা! ইংলণ্ডের যখন ৪ উইকেটে ৫৪৬ রান এবং এডরিচ ৩১০ রান করেও নট-আউট, তখন অধিনায়ক মাইক স্মিথ ইনিংসের শেষ ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ে নিউজিল্যাণ্ড ১০০ রান তুলতে পাঁচটা উইকেট হারায়। পরের দিন ১৯৩ রানে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যাওয়ায় 'ফলো-অন' করে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে হয়। কিন্তু ফ্রেড টিটমাসের মারাত্মক বোলিংয়ের জন্যে প্রশংসনীয় চেষ্টা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যাণ্ড ১৬৬ রানের বেশী ওঠাতে পারে না। ফলে ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ১৮৭ রানে জয়ী হয়।

প্রশ্ন ও উত্তর

১। ক্রিকেট খেলায় 'bodyline bowling' কাকে বলে ?

উইকেটের দিকে বল না দিয়ে, অত্যন্ত দ্রুত যে বল ব্যাটস্‌ম্যানের গায়ের দিকে ছোঁড়া হয়।

২। ইংরেজীতে 'antonym' এবং 'synonym'-এর অর্থ কি ?

'অ্যানট্যানিম' হ'ল বিপরীতার্থক শব্দ এবং 'সিন্যানিম' হ'ল সমার্থবোধক শব্দ।

৩। সুইটস্‌জারল্যাণ্ডের ডাকটিকিটের উপর 'Switzerland'-এর বদলে কি শব্দ লেখা থাকে ?

Helvetia.

৪। বি. বি. সি (B. B. C) বৃটীশ গভর্নমেণ্টের কোন মন্ত্রী-বিভাগের অন্তর্ভূক্ত।

পোষ্টমাষ্টার জেনারেল যে মন্ত্রী-বিভাগের অধীন।

৫। স্কার্ভি (scurvy) কি রোগ এবং কি জন্যে হয় ?

শরীরে টাট্‌কা শাকশব্জির অভাব, অর্থাৎ ভিটামিন 'সি'-র অভাবজনিত রোগবিশেষ। এই রোগে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দাঁতের মাঢ়ি থেকে রক্ত পড়ে।

৬। ইংরেজীতে 'fast colours' কাকে বলে ?

যে রঙ্‌ কাচলে বা ধুলে উঠে যায় না।

৭। কয়লায় গুঁড়ো বা ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে গেলে ফুসফুসের যে রোগ হয়, তার নাম কি জান ?

নিউমোকনিয়োসিস।

৮। কোন সময় এবং কি কারণে বিলেতের টেলিফোন গুমটি থেকে টেলিফোন করলে পয়সা লাগে না ?

পুলিসের জন্যে বা কোন অগ্নিকাণ্ড অথবা এ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজনে '৯৯৯' নম্বরে ডায়েল করলে পয়সা লাগে না।

৯। প্রাচীন গ্রীসের মুদ্রা কি ধাতুতে তৈরি হ'ত জান ?

সোনা ও রূপার সংমিশ্রণে।

১০। যে টাকা ধার দেয় এবং যে টাকা ধার নেয়, তাদের উভয়কে শুদ্ধ ভাষায় কি বলে ?

'উত্তমর্ণ' বলে যে টাকা ধার দেয় তাকে এবং যে টাকা ধার নেয়, তাকে বলে 'অধমর্ণ'।

শণ গাছ

নীল ফুলযুক্ত চারা গাছ যা কাপড়ের সুতোর জন্য চাষ করা হয়। যখন এই গাছ পাকে তখন এর শিকড়সুদ্ধ টেনে তুলে ফেলা হয়, এবং এর ডাঁটি যা প্রায় তিন ফুট লম্বা, সেটা জলে ভিজিয়ে রাখা হয় ভেতরকার সূক্ষ্ম তন্তুকে আলগা করার জন্য। তন্তুদের সিল্কের মত পাতলা সুতোয় পরিণত করা হয়। এগুলি সম্পূর্ণ আলাদা করা হলে বাণ্ডিল-বাঁধা হয় এবং বুননের জন্য কারখানায় পাঠানো হয়। তুলোর পর এই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত কৃষি-তন্তু। সুতী পদার্থের মধ্যে এটি একটি প্রাচীন জিনিস। টেবিল-ক্লথ, গামছা এবং অন্যান্য মূল্যবান কাপড়ে এর ব্যবহার হয়।

রামধনু

বৃষ্টির জলবিন্দুর উপর যখন সূর্যালোক পড়ে তখন রামধনুর সৃষ্টি হয়। যদিও জলবিন্দুর রঙ সাদা, তবুও সূর্যালোকের মধ্যে কয়েকটি রঙ থাকায় রামধনু প্রতিফলিত হয়ে অন্তত সাতটি রঙ দেখায়।

বৃষ্টিবিন্দুর মধ্যে সূর্যালোক পড়লে বিভিন্ন রঙের বিচ্ছুরণ হয়। রামধনু একেবারে চক্রাকার হলেও, দিক্‌চক্রবালে পৌঁছে আধখানা ডুবে যায় এবং আধখানা আমরা দেখতে পাই।

লেড পেন্সিল

আজকাল আমরা যাকে লেড পেন্সিল বলি তাতে সীসা বা লেড একেবারেই থাকে না। গ্র্যাফাইট এবং মাটির মিশ্রিত পদার্থে পেন্সিল তৈরী হয়। গ্র্যাফাইট একটি নরম ধূসর কালো

রঙের কার্বন। এটা প্রধানতঃ চেকোশ্লোভাকিয়া, রাশিয়া এবং ইংলণ্ডে পাওয়া যায়। অবশ্য প্রথমে লেড পেন্সিল সীসা দিয়েই তৈরী হ'ত এবং গ্র্যাফাইটের মতই কাগজে দাগ পড়তো। কাঠের আবরণের মধ্যে না থেকে এই লেড কাগজের কিংবা কাপড়ের আবরণের মধ্যে থাকতো। ১৫০০ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে এই গ্র্যাফাইটের পেন্সিল আবিষ্কৃত হয়। কাঠের আবরণ দিয়ে ঢাকা আধুনিক সাধারণ পেন্সিল যা আমরা ব্যবহার করি, তা ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে আবিষ্কৃত হয়।

প্রশান্ত-মহাসাগরের গভীরতা

সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা খুবই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু বিজ্ঞানীরা নানা উপায়ে সে সম্বন্ধেও প্রায় নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সম্প্রতি প্রশান্ত-মহাসাগরের সবচেয়ে গভীর স্থান তাঁরা স্থির করেছেন। এই স্থানটি হচ্ছে ফিলিপাইন দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ। এই স্থানটিতে প্রশান্ত-মহাসাগরের গভীরতা ৩৬০০০ ফিট্।

* অক্ষরে আঁকা ছবি *

পাশের যে ছবিটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটি সাধারণতঃ রেখার সাহায্যে যে ছবি আঁকা হয়ে থাকে সে ধরনের ছবি নয়; এটি অক্ষরের সাহায্যে বইয়ের লাইন তুলে তৈরি। লাইনগুলি এখানে ব্লকে খুব ছোট হয়ে যাওয়ায় বোঝার অসুবিধা হচ্ছে বটে, কিন্তু তার জন্য চেহারিটি বোঝার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এই লাইন-গুলি যাঁর বইয়ের, চেহারাটিও তাঁরই। তিনি হচ্ছেন, স্বামী বিবেকানন্দ। এই ছবিটি তৈরী করেছেন, শিল্পী পরিচয় গুপ্ত।
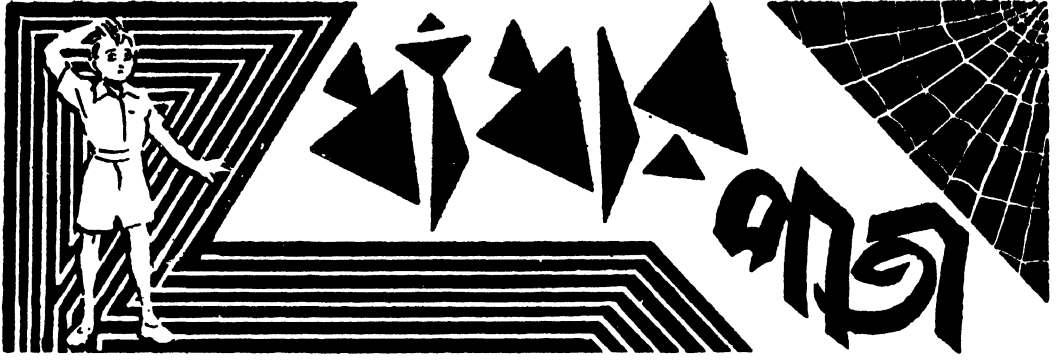
এক মিনিটে বলতে হবে।

১। এমন কি জিনিস যা একান্ত তোমার, অথচ তোমার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশী।

২। ইংরেজীতে 'hill' ও 'pill'-এর মধ্যে তফাত কি বলতে পারো ?

৩। সারাদিন কোন কাজকর্ম না-করেও কে তার জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকে ?

শ্রীশুভাশিস দত্ত (পুরী)

—

কোনটা ঠিক ?

১। জল কি থেকে তৈরী হয়।
(অ) অক্সিজেন (আ) হাইড্রোজেন
(ই) হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন

২। এর মধ্যে কোনগুলি এটমের অংশ নয়।
(অ) ইলেকট্রন (আ) প্রোটিন
(ই) প্রোটোন

৩। নিচের এই জন্তুগুলির মধ্যে কোনটি থেকে আমরা 'মটন' পাই।
(অ) হরিণ (আ) শূকর (ই) ভেড়া
(ঈ) গরু (উ) ছাগল

শ্রীকনকাঞ্জলি বসু (রাঁচি)

সত্যি না মিথ্যে ?

১। জেব্রা মাংসাশী প্রাণী।

২। কেনাডার রাজধানী অটোয়া।

৩। পেট্রোলের চেয়ে জল হাল্কা।

৪। ট্রপিক অব ক্যানসার ইকোয়েটারের দক্ষিণাংশে অবস্থিত।

শ্রীপমি সরকার (কলিকাতা)

—

উত্তর দাও

আকাশ সমান দাড়ি
তাতে নীলকমলের হাঁড়ি,
তাতে জল থই-থই-থই
যেন বৃন্দাবনের দই।

শ্রীপ্রভাতকুমার ভট্টাচার্য (কাটিহার)

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে।)

গতমাসের ধাঁধার উত্তর

১। নারায়ণ ২। লঙ্কা ৩। হাঁস (হাসপাতাল) ৪। টাক

নতুন বই

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)।

পশুরাজ্যের কাহিনী—শ্রীবিশ্বনাথ দে সম্পাদিত। শ্রীপ্রকাশ ভবন, এ ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২ হইতে শ্রীশুক্লা দে কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৮·০০

পশুরাজ্যের বিচিত্র কাহিনীর প্রতি ছোট-বড় সকলেরই একটা চিরন্তন টান থাকে। আসলে যাদের আমরা সচরাচর দেখতে পাই না, জঙ্গলের সেই হিংস্র ও অহিংস জীবজন্তুরা কি ভাবে তাদের ঘরকন্না করে, মারামারি কামড়া-কামড়ি করে, তা জানবার জন্যে কৌতূহল সবারই। এই জন্যে, জীবজন্তুদের শিকারের গল্পও আমাদের কাছে এত প্রিয়।

এই সংকলন বইটির মধ্যে সম্পাদক অত্যন্ত যত্ন ক'রে, প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত জীবজন্তুদের নিয়ে, খ্যাতনামা লেখকরা যে সব গল্প লিখেছিলেন ও লিখেছেন, তা থেকে নির্বাচিত আটত্রিশটি গল্প একত্র ধরে দিয়েছেন। এই আটত্রিশটি গল্পের লেখকগণ সকলেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। পশুরাজ্যের নানা উপভোগ্য, রোমাঞ্চকর কাহিনীতে ভরা এই সচিত্র বইখানি হাতে পড়লে না-পড়ে যেমন ছাড়া যাবে না, তেমনি কারো হাতে তুলে দিলে তার আনন্দের আর শেষ থাকবে না। ভিতরের ছবিগুলি ও বিশেষ ক'রে বাইরের রঙীন প্রচ্ছদপটটি খুবই সুন্দর। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উঁচু দরের।

রূপকথারই দেশে—শ্রীসুজিতকুমার নাগ। পাল পাবলিশিং কনসার্ণ, ২৪এ কলেজ রো, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীপার্থসারথি পাল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১·৫০

রূপকথা সব দেশের ছেলেমেয়ের কাছেই উপাদেয় ও উপভোগ্য। রাজা-রাণী, রাজকুমার-রাজকুমারী, পক্ষিরাজ ঘোড়া ও দৈত্য-দানা নিয়ে লেখা আমাদের দেশে প্রচুর রূপকথার কাহিনী আছে বিভিন্ন লেখকের লেখা। সুজিতকুমারের 'রূপকথারই দেশে' একটি উপন্যাস। গোড়া থেকেই একটি জমাটি আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে এই কাহিনী। আলোর রাজ্যের রাজা অপরূপকে নিয়ে এই গল্প আরম্ভ হয়েছে। তাঁর সব আছে কিন্তু ছেলে নেই। আর সেই রাজ্যের রাজপুরীর মাথায় দিনরাত একটা ঘণ্টা বাজে। কেন বাজে এই ঘণ্টা, কোথা থেকে এল এই ঘণ্টা, তা জানতে হলে রুদ্ধনিঃশ্বাসে এগিয়ে যেতে হবে, পাতার পর পাতা। বইটি সচিত্র।

—

অং বং চং—শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতী অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গ্রাম গোড়খাড়া, পোঃ কামরাবাদ (সোনারপুর), ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১·৫০

লেখক অনেক দিন ধরে ছোটদের কাগজে মজার মজার ছড়া লিখে আসছেন। ছড়ার মধ্যে মিলের যে যাদু সবচেয়ে ছোটদের আকৃষ্ট করে, এই ছড়াগুলির মধ্যে কোথাও তার অভাব নেই। বইখানিতে কুড়িটি ছড়া আছে; ছড়াগুলির সঙ্গে সীতেশ রায়ের আঁকা ছবিগুলিও ছোটদের খুব আকর্ষণ করবে।

ভাদ্রমাসটি গেলেই আসবে আশ্বিন। আশ্বিনে শরৎকাল আকাশ হবে নির্মেঘ। শুভ্র, শান্ত পরিবেশে পূজার বাজনা বেজে উঠবে। সারা বাংলা দেশে জেগে উঠবে উৎসবের সমারোহ। পুজোর জন্যে সারাটি বছর তোমাদের কি আকুল প্রতীক্ষাই না থাকে। কত রকমের জল্পনা-কল্পনা সকলের মনে—তাই এই উৎসবটি শুভ ও সুন্দর ভাবে যাতে উদ্‌যাপান হয়, সেই কথাই সবার মনে জাগে। তোমরাও প্রস্তুত হও।

দেশের বুকে নিত্য নতুন নতুন গোলমাল আর অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে—তবুও এসব থেকে তোমরা দূরে থাক এবং সুস্থ আবহাওয়া তোমাদের ঘিরে থাকুক—এ কথাই বলি।

মহাজীবন থেকে

বাগবাজার। শ্রীশ্রীসারদা মা তখন থাকেন একটি ভাড়াটে বাড়ীতে। তাঁর আশ্রয়ে যাঁরা বসবাস করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তাঁদের নিয়েই মা'র সংসার। মার পুণ্য-সান্নিধ্যে আনন্দে কেটে যায় তাদের দিনগুলি। ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে সুরু হয় কাজ—প্রার্থনা, জপতপ। সান্ধ্য-বিরতির সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রার্থনা। ঠাকুরের পুণ্য-জীবনী আর উপদেশ নিয়ে আলোচনা চলে অবসর সময়। মাকে ঘিরে শরণার্থীদের দল একাগ্রমনে শোনেন তত্ত্বকথা। কঠিন কথা—কিন্তু মা অতি সহজে সকলে যাতে অনায়াসে বুঝতে পারে, তেমনি ভাষায় সেই সব তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। উপদেশ দান করেন। তাঁর কথাগুলো শ্রোতাদের মনের মধ্যে গেঁথে যায়।

একদিন এই বাড়ীতে এলেন নতুন এক আগন্তুক। দিশী পোষাক, চালচলন, কিন্তু চেহারা বিদেশীর। মাত্র কিছু দিন আগে এসেছেন সাগর পার থেকে—। শুধু ক্ষণিকের অতিথি নন, বেশ

কিছু দিন মায়ের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করার জন্যই তিনি এসেছেন বাগবাজারের গলির এই বাড়ীটির অনভ্যস্ত কিন্তু বহুকাম্য পরিবেশটিতে।

মা তাকে গভীর স্নেহে কাছে টেনে নিলেন। সেদিন থেকে তিনি হলেন মায়ের পরিবার-ভুক্ত।

আশ্রমের অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে একই জীবনস্রোতে এগিয়ে চললো তাঁর জীবন-ধারা। ভোর হবার আগেই শয্যাত্যাগ, স্নান, ফুলতোলা, প্রার্থনা,—তারপর মার কাছে ব'সে তাঁর উপদেশ শোনা। দুপুরে আশ্রমের কাজকর্ম, খাওয়া, স্বল্প বিশ্রাম—তারপরেই আবার আশ্রম জীবনের কাজে নিজেকে সঁপে দেওয়া, সন্ধ্যারতি, ভক্ত সমাগম, জপতপ—এরই মধ্যে দিয়ে গভীর আনন্দ আর পরিতৃপ্তিতে কেটে যায় দিনের পর দিন।

সকলের সঙ্গে মিশে যাওয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা এই আগন্তুক বিদেশিনী মহিলাটির, কিন্তু সাধ আর সাধ্যের মধ্যে এক চিরন্তন ব্যবধান। সকলের সঙ্গে কথা বলতে ভারী ইচ্ছা, খুঁটিনাটি সব কিছু জানতে গভীর আগ্রহ—কিন্তু এই ইচ্ছা পূরণের পথে দুরন্ত বাধা—ভাষা। অবসর পেলেই উনি দেশের ভাষা আয়ত্ত করার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু এটা সময়সাপেক্ষ বিষয়—তবু আকারে ইঙ্গিতে আর আধ-শেখা কথার সাহায্যে মনের ভাব-বিনিময় করতে একটুও অসুবিধা হয় না।

মার সস্নেহ দৃষ্টি রয়েছে তাঁর উপর সর্বক্ষণ। কোথায় কি অসুবিধা হচ্ছে জানতে চান—কিন্তু অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্রভাবে তাঁকে চলতে দেবার কোনো ইচ্ছাই নেই মায়ের। সকলের মত মেঝের উপর কম্বল পেতে তাঁকেও শুতে হয়—সকলের সঙ্গে একই ঘরে। তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হলো। নিজের হাতেই বিছানা তোলা, ঘর ঝাঁট, রান্নার কাজ, বাসনপত্র ধোয়া-মোছার কাজ করতে হতো—খাদ্য-তালিকার দিক থেকেও বিদেশী বলে স্বতন্ত্র দাবীর প্রশ্ন উঠতো না, সকলের সঙ্গে ভাগ করে চলতো আশ্রম-জীবনের দিনগুলো। দিনের কাজের শেষে রাতে বিছানায় শুনে যতক্ষণ ঘুম না আসতো, ততক্ষণ শুধু একটি কথাই প্রার্থনার মত ধ্বনিত হতো তাঁর মনে, তাঁর চিন্তায়—

'মাগো তোমার শরণ নিলাম। আমায় দয়া কর।' কিছুদিন যেতে না যেতেই আগন্তুক বিদেশিনী অনুভব করলেন মায়ের সঙ্গে তাঁর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাঁর মনে হতে লাগলো—যা চেয়েছিলেন তা যেন তাঁর পাওয়া হয়ে গেছে।

একদিন সন্ধ্যারতির পর মা আসন ছেড়ে উঠতে উদ্যত। এমনি সময় গভীর ভক্তি আর শ্রদ্ধাতে আগন্তুক মহিলাটি এসে তাঁর পায়ের উপর মাথা রাখলেন। অনেকক্ষণ ধরে মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন—তারপর নিমীলিত চোখে ধীরে ধীরে তিনি বল্লেন দু'টি কথা—

'এবার তোমার কাজে নামার সময় হয়েছে।' দুটি মাত্র কথা, কিন্তু তা শুনেই তাঁর সমস্ত দেহে-মনে জেগে উঠলো এক অপার্থিব আনন্দের শিহরণ—তাঁর নিজের শক্তির মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন এক অনন্ত সম্ভবনাময় ইঙ্গিত।

পথের সন্ধানে আগেই নেমেছিলেন—এবার পেলেন সেই পথে এগিয়ে যাবার নির্দেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিবেদিত প্রাণ এই মহিলাটিই আবির্ভূত হলেন নিবেদিতা রূপে। যাঁর পুণ্যস্মৃতি আজও অম্লান হয়ে রয়েছে ভারত-নারীর মনের মণিকোঠায়।

চিঠির উত্তর—

তোমাদের কাছে থেকে যা চিঠি আসে তার উত্তর দেবার মত কিছু থাকে না। প্রশ্ন করলে তবে তো জবাব দেবো? না হলে কেবলমাত্র যাদের চিঠি পেয়েছি সেই নামই উল্লেখ করি—কিন্তু তোমরা কিছু বলো এ আশা আমি করি। **পাপড়ী, বিপুল রায়,** কোলকাতা; **শ্রেয়সী মিত্র,** বরানগর; **মালবিকা ও কাননিকা চট্টোপাধ্যায়,** শ্রীরামপুর; **রাধারাণী,** জামশেদপুর; **মালা ও দোলা,** রামপুরহাট; **গীতাশ্রী ও শুভশ্রী রায়,** হুগলী—চিঠি পেয়েছি।

ভালবাসা ও শুভাকামনায়—

তোমাদের

মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য ০·৪৫ ন. প.

॥ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসার ॥

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনার প্রধান প্রধান লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন তিনটি পরিকল্পনাতেই একটি প্রধান সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এর ফলে এই রাজ্যের বুনিয়াদী, মাধ্যমিক, কলেজীয়, চিকিৎসামূলক ও কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রাথমিক নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়

১৯৪৭—৪৮ .... ১৩,৯৫০

১৯৬৩—৬৪ .... ৩২,৪১৩

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১৯৪৭—৪৮ .... ১,৯০০

১৯৬৩—৬৪ .... ৩,৬৮৮

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১৯৪৭—৪৮ .... ১,১৪৭

১৯৬৩—৬৪ ... ১,২৯৬

কলেজ (সাধারণ শিক্ষা)

১৯৪৭—৪৮ .... ৫৫

১৯৬৩—৬৪ .... ১৪৫

বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪৭—৪৮ .... ১

১৯৬৩—৬৪ .... ৭

শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে

পশ্চিম বাংলা এগিয়ে চলেছে

রেনবো কালি
সর্বজনপ্রিয়
রেনবো ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ
২-২এ, আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
PERMANENT
Rainbow
FOUNTAIN PEN
Ink

॥ সূচীপত্র ॥

৪৬শ বর্ষ | **আশ্বিন**

৬ষ্ঠ সংখ্যা | **১৩৭২**

শ্রীশ্রীদুর্গা মা

আদর
ফটো : শ্রীসুকুমার রায়

★ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্ব পুরাতন মাসিকপত্র ★

৪৬শ বর্ষ] আশ্বিন : ১৩৭২ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি সাগর পাড়ি দেব, হব সওদাগর
সাত সাগরে ভাস্‌বে আমার সপ্ত-মধুকর !
চার পাশে মোর গাংচিলেরা কর্‌বে এসে ভিড়
হাত্‌ছানিতে ডাক্‌বে আমায় নতুন দেশের তীর !

আমি হব দিনের সহচর—
বলব, "ওরে রোদ্‌ উঠেছে লাঙল কাঁধে কর।
খামার ভ'রে রাখ্‌ব ফসল গোলায় ভ'রে ধান
ক্ষুধায় কাতর ভাইগুলিকে আমি দেব প্রাণ !
এই পুরাতন পৃথিবীকে রাখ্‌ব আমি তাজা
আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটির রাজা !

আমি হব সকাল বেলার পাখী—
সবার আগে কুসুম-বাগে উঠ্‌ব আমি ডাকি।
সূয্যিমামা জাগার আগে উঠ্‌ব আমি জেগে
'হয়নি সকাল, ঘুমো এখন' মা বলবেন রেগে!
বল্‌ব আমি, "আল্‌সে মেয়ে ঘুমিয়ে তুমি থাকো,
হয়নি সকাল—তাই ব'লে কি
সকাল হবে নাকো?
আমরা যদি না জাগি মা কেম্‌নে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠ্‌লে মাগো,
রাত্‌ পোহাবে তবে!"

আমি ফুলের বনে ফুল ফোটাব, অন্ধকারে আলে
সূয্যিমামা বল্‌বে উঠে, "খোকন ছিলে ভালো?"

বলব, "মামা, কথা কওয়ার সময় নাইক আর
তোমার আলোর রথ চালিয়ে
ভাঙো ঘুমের দ্বার।"
রবির আগে চল্‌ব আমি ঘুম-ভাঙা গান গেয়ে
জাগ্‌বে সাগর, পাহাড়, নদী,
ঘুমের ছেলেমেয়ে!!

অতুল পড়ত আমাদের সঙ্গে।

আমরা অতুলকে বলতাম, 'নামটা তোর মন্দ নয়, তবে এটা আরও ভালো হতে পারত… ভাল করা যায় আরো।'

'ভালো হতে পারে? কি করে শুনি?'

'ভালো মানে আধুনিক করা যায় এটাকে—যদি এটার শেষাংশটা বাদ দিস…।

'তুলোটাকে?'

'না, না—তুলো নয়, কৃষ্ণকে বাদ দিলে কী হয়? নামটা আরো ভালো হয় না? বল্।'

'অতুলনীয় হয়।' মানলো সে: 'কিন্তু বাবা যে…।' বলে সে চেপে যায়।

'রাগ করবে বাবা?'

'না না, রাগ কিসের! তখন ত বাবা রাগারাগির বাইরেই চলে যাচ্ছে। তা নয়। মরবার সময় বাবা আমার নাম করে মরতে চায় কিনা…!

'তোর নাম করে?' শুনে আমরা অবাক হই: 'তোর নাম করে আবার মরতে চায় নাকি কেউ?'

'বাবা চায়। বাবা বলে, মরবার সময় যদি শুধু অতুল অতুল করে মরি তো লোকে আমায় বাতুল বলবে। কিন্তু অতুল বলে ডাকতে গিয়ে যদি কৃষ্ণ বেরয় তাহলে সটান বৈকুণ্ঠে চলে যাবো, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কাছাকাছি। সেইজন্যই এই অতুলকৃষ্ণ নাম রাখা আমার।'

'তা ভাই, কৃষ্ণ বলে মরলেও যা, না মরলেও তাই, দুয়েতেই সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি। বাবাকে সেটা বুঝিয়ে বলতে পারিস না ?'

'বোঝে না যে বাবা।'

'বাবারা ভারী অবোধ হয়। কিছুতেই বুঝতে চায় না।' বলে সে জানায় : 'বাবা মরে গেলেই আমার নামের ওরফে বানাবো, বুঝলি ?

'নামের ওরফে ? সে আবার কি রে !' অবাক হয়ে জানতে চাই।

'নামের ওরফে হয় না বুঝি ? কেন, দেখিস নি খবর কাগজে ? সেইরকম করব নামটা আমার। অতুল ওরফে কৃষ্ণ ওরফে অতুলকৃষ্ণ।'

'ওরফে তো থাকে শুনিছি যতো চোর-ছ্যাঁচোড়ের। গণি মিঞা ওরফে ভগবান দাস ওরফে দিবাকর চাটুজ্যে। আমার মামার কাছে যতো ওরফেরা আসে।'

'ওরফেরা আসে তোর মামার কাছে ?'

'হ্যাঁ। আমার মামা পুলিস কোর্টের উকীল কিনা? মামার কাছে তারা সব তাদের যত মামলা নিয়ে আসে। যত চুরি-ডাকাতির মামলা ঃ মামা টাকা নিয়ে তাদের কেস ল'ড়ে জেলের হাত থেকে তাদের বাঁচায়।'

'তোর মামার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিবি ?' বলল অতুল : 'কথা কইতে গেলে কি ফি দিতে হবে নাকি ? যেমন ডাক্তারদের বেলায় লাগে ?'

'তোর বেলা লাগবে না। তুই আমার বন্ধু তো।' আমি ওকে ভরসা দিই।—'আর আমি হলুম গে মামার ভাগনে।'

পুজোর ছুটির পর ইস্কুল খুললে অতুল ক্লাসে এসে বসল আমার পাশে—'পুজোর ছুটিতে মাসীমার বাড়ি বেড়াতে গেছলাম চাঁইবাসায়—জানিস ?'

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম যে জানি।

'কি করে জানলি ?'

'এই যে বললি তুই।'

'ফিরবার সময় ট্রেনে একটা জিনিস পেয়েছি। কে ফেলে গেছল কে জানে। বেওয়ারিশ এক ব্যাগ।'

'ব্যাগ ?'

'হ্যাঁ, আর সেই ব্যাগভর্তি···বলব কী তোকে··· !'

'টাকা ?' ব্যগ্র হয়ে উঠি। 'টাকা নাকি ?'

'টাকা নয়, টাকার চেয়েও দামী। যা পেয়েছি তাতে আমার সারা জন্ম চলে যাবে বেশ।'

'বলিস কি রে···'

বলতে বলতে সার এসে পড়েন ক্লাসে—কথাটা আর শোনা হয় না।

'গোপীজনবল্লভ কথাটার মানে কি সার বলবেন আমায়?' অতুল জানতে চায় সারের কাছে।

'গোপীদের যিনি প্রিয়, মানে, শ্রীকৃষ্ণ। কেন, একথা শুধাচ্ছ কেন?'

'আমার নামও তো ঠিক তাই সার? তাই না?'

'প্রায় তাই।' সার জানান।

'আচ্ছা সার, নাম কি কারো পাল্টানো যায়? মনে করুন, যদি আমার নামটা আমি পাল্টাই?'

'টেস্‌টে নাম পাঠাবার আগে অব্দি পারো। তবে স্কুল-ফাইনাল সার্টিফিকেটে নাম একবার উঠে গেলে তারপরে বোধহয় আর পালটানো যায় না।' সার বলেন। 'তারপরে পালটাতে হলে বোধহয় আদালতে দরখাস্ত করতে লাগে।'

সেদিন ইস্কুলের ছুটির পর অতুল ধরে বসল—এই তোর মামার কাছে নিয়ে চ আমায়।

'কেন রে?'

'ওরফের জন্যে। আমার নামটা পালটে দেব।'

'পালটে দিবি?' অবাক হয়ে যাই আমি।

'হ্যাঁ, অতুলকৃষ্ণ পাল ওরফে গোপীজনবল্লভ পদরেণু পাল।'

'অ্যাঁ? কী বললি?' শুনে আমি ঘাবড়ে যাই।

'শ্রীগোপীজনবল্লভ পদরেণু পাল। নামটা কি রকম?'

'দম আটকে আসে—উচ্চারণ করতে গেলে।' আমি বলি: 'প্রায় পালচাপা পড়ার মতই অনেকটা।'

'অথচ ভেবে দেখলে নামটা পালটালামও, আবার পালটানোও হোলো না। গোপীজনবল্লভ মানে তো কৃষ্ণ, আবার অতুলকৃষ্ণ মানেও তাই। আবার এদিকে উপাধির পাল টাও বজায় রইলো। সেটা আর পালটাতে হল না।'

'আচ্ছা বেশ। শোন্, তোর বাবার পারমিশন নে আগে, তারপর কা'ল তোকে নিয়ে যাব আমার মামার কাছে।'

পরদিন অতুল ইস্কুলে এলে শুধালাম—'কি রে মত দিল তোর বাবা?'

'দিল, কিন্তু অনেক গাঁইগুঁই করে।' বলল সে—'অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করিয়েছি বাবাকে। বললাম যে ছাখো বাবা, মানে তো সেই একই, আর সেই ভগবানেরই নাম তো, অথচ কতো মিষ্টি নাম ছাখো। নামটার কেমন কবি-কবি ভাব। গোপীজনবল্লভ পদরেণু

পাল। শেষটায় রাজি হয়েছে বটে বাবা, কিন্তু বলছে যে, মরবার সময় এত বড় নাম মুখ দিয়ে

বেরুলে হয়। উচ্চারণ করাই শক্ত হবে।'

'তাহলে?'

'আমি বলেছি যে তোমার হয়ে আমি উচ্চারণ করে দেবো। তাহলেই তো হবে। শোনা নিয়ে তো কথা। তখন হোলো রাজি।'

মামার কাছে নিয়ে গেলাম ওকে। মামা এক টাকার কোর্ট-ফি দিয়ে হাকিমের কাছে দরখাস্ত করে, নামটা ওর পালটে দিলেন। তারপর ও আমাকে নিয়ে গেল ওদের বাড়ি—আমার কাজের পুরস্কারস্বরূপ আমাকে পেট ভরে খাওয়াবে ব'লে।'

গিয়ে দেখি ওর টেবিলের ওপর প্রকাণ্ড এক স্যুটকেশ রাখা।

'বাবা! তোর এত বড়ো স্যুটকেস নাকি? কী আছে রে তোর এই স্যুটকেসে? কাপড়-জামা?' জানতে চাই আমি।

'ছাখ না, খুলে ছাখ। এই ব্যাগটাই কুড়িয়ে পেরেছিলাম ট্রেনের কামরায়।'

খুলে দেখি ব্যাগ-ভর্তি—কার্ড আর কার্ড। ভিজিটিং কার্ড যতো।

দু' চার হাজার কার্ড হবে বোধহয়। নাম ছাপানো কার্ড সব।

'ব্যাগ-ভর্তি এই কার্ডগুলো পেলাম।' বল্ল সে—'সারা জন্ম চলে যাবে আমার এই দিয়ে। তাই তো পালটিয়ে ফেললাম নামটা। কার্ডগুলো পেয়ে গেলাম মাংনা—করব কি?'

দেখি যে প্রত্যেক কার্ডের ওপরে ছাপানো—গোপীজনবল্লভ পদরেণু পাল।

গোপীজনবল্লভ এট্সেট্রা এট্সেট্রা—তখন তার নামের কার্ড একখানা উপহার দিল আমায়।

অতুলকৃষ্ণর অতুলনীয় ওরফে!

ছিপ

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

জ্বালানি কাঠেতে গড়া
রঙচটা ছিপখানা চলেছে—
জাহাজের কিনারায়।
উত্তাল ঢেউ-এ ঢেউ-এ যাত্রীরা ওঠে-নামে,
প্রাণ বুঝি যায়-যায়!
উন্মাদ ঢেউগুলো অস্থির গান গায়ঃ

সমুদ্র গরজায়
নুন-শাদা গাঁজলায়।

আর এই সকালেতে
শান্ত নরম এই জলেতে
আমি হাঁটি। আর হেঁটে ছোটরাও চড়া পায়।
বড় বড় পা ফেলে যে সূর্যও হেঁটে যায়!

লোকশিক্ষা

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীচৈতন্যদেবকে লোকে খুব ভালমানুষ আর দয়ার সাগর বলে জানে, কিন্তু তিনি দরকার মতো পাথর বা লোহার চেয়েও কঠিন হতে পারতেন। অবশ্য এরকম কঠিন হতেন বেশির ভাগ তাঁর ভক্ত বা অনুরাগীদের শিক্ষা দেবার জন্যই। তিনি সত্যি সত্যিই দয়ালু ছিলেন, মানুষদের ভালবাসতেন খুব বেশী, কাজেই এই রকম ক্ষেত্রে যাদের প্রতি কঠিন হতেন, তাদের চেয়ে তাঁর বুকেই সে আচরণ বেশী বাজত; কষ্ট তিনিও কম পেতেন না—তবু একটুও নরম হননি কখনও। ছোট হরিদাস বলে তাঁর একটি ভক্তের কী একটা অশোভন আচরণে বিরক্ত হয়ে তার সঙ্গে কথা বলা বা তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে দেন। সে জন্য বেচারী হরিদাসের দুঃখের অবধি ছিল না, তার কষ্ট দেখে বহু লোক এসে চৈতন্যদেবের কাছে কাকুতি-মিনতি করে—কিন্তু তিনি অটল ছিলেন। শেষে অবধি হরিদাস আত্মহত্যা করে, তাতে চৈতন্যদেব কম দুঃখ পাননি, বিস্তর শোক প্রকাশ করেছেন তবু বেঁচে থাকতে ক্ষমা করেন নি।

এমনি আর একটি ঘটনার কথাও ওঁর জীবনী থেকে জানা যায়।

চৈতন্যদেব তখন পুরীতে, সেখানকার রাজা প্রতাপরুদ্রদেব ওঁর বড় ভক্ত, দেবতার মতো জ্ঞান করেন। তেমনি রাজার এক কর্মচারী রায় রামানন্দ খুব বড় ভক্ত .এবং পণ্ডিত চৈতন্যদেব তাঁকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করেন, তাঁর উপদেশ শুনতে বা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে বসলে চৈতন্য-দেবের আহার-নিদ্রা জ্ঞান থাকে না। রায় রামানন্দের বাবা ও ভাইয়েরা সকলেই রাজসরকারে বড় বড় কাজ করেন, রাজারও যেমন প্রিয় এঁরা—চৈতন্যদেবেরও তেমনি।

এই রামানন্দেরই এক ভাই গোপীনাথ পট্টনায়েক উড়িষ্যা রাজ্যেরই মালজাঠ্যা দণ্ডপাট বলে একটি জেলার শাসক ছিলেন, তিনিই ওখানের কর আদায় করতেন ও রাজকোষে জমা দিতেন। (এখনকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আর কলেক্টার বলতে যা বোঝায়, কতকটা তাই ছিলেন আর কি।) তখনকার দিনের প্রায় সব রাজপুরুষই রাজকর আদায় করে জমা দেবার আগে নিজের কারবারে খানিকটা খাটিয়ে নিতেন। গোপীনাথও সে নিয়মের বাইরে ছিলেন না। এই ক'রে একবার তাঁর রাজসরকারে প্রায় দু'লক্ষ টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিল। রাজা যখন খুব চাপ দিলেন, তখন গোপীনাথ এসে জানালেন যে, 'আমি তো এখনই সবটা দিতে পাচ্ছি না, একটু সময় দিন—ক্রমে ক্রমে সবটাই শোধ করে দেব। আপাততঃ আমার কাছে খুব ভালো আরবী ঘোড়া আছে বারোটা, যদি আপনারা কিনে নেন তো ঐ দামটা দেনায় ওয়াশীল হতে পারে, আমি খানিকটা রেহাই পাই।'

রাজা তাতে রাজী হলেন। রাজার বড় ছেলে 'বড় জানা' সাধারণতঃ এই সব কেনাকাটা

[শেষাংশ ৩০২ পৃষ্ঠায়]

সৈয়দ মুজতবা আলী

গম্ভীরে অঙ্কের গুরু ক্লাসে বসি কন,
"অঙ্ক দেবো ; উত্তরো তো সব বাপ-ধন।
ইস্কুল বাড়িতে আছে যে কয়টা ঘর
তার সাথে যোগ দাও, তোমার নম্বর।
তা থেকে বিয়োগ করো গত বৎসরের
সূর্যগ্রহণের সংখ্যা। তার পর ফের
যোগ করো যার যার পিসীর বয়েস
তার সাথে। ভাগ করো যে কটা সন্দেশ
এ পূজোতে খেয়েছিল—তাই দিয়ে।
শেষ ফল হয়ে গেলে তারই খেই ধরে
আমার বয়েস কত বলো চট-করে।"

তাজ্জব বেবাক ক্লাস ! এরে অঙ্ক কয় !
লসাগু, গসাগু, হাসজারু তাও নয়।
ফেলিলা গুরুজী আজ আজব এ ফাঁদে
হুংকারিয়া তিনি কন, "লে—উত্তরটা দে ।
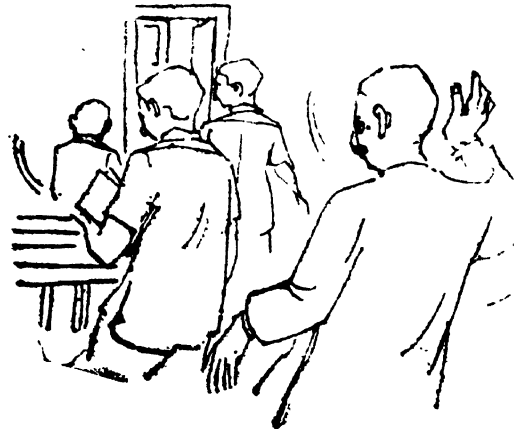
তখন একটি ছেলে গোবেচারী হেন
টিঙটিঙে, ধড়ে তার প্রাণ নেই যেন।
সবিনয় কণ্ঠে কয়—বড় অমায়িক
(মাইক্ ছিল না ক্লাসে অ-মাইক ঠিক!)

"বয়েস চল্লিশ তব মোর অঙ্ক কয়!"
"শাবাশ!" হাঁকেন গুরু, "নিশ্চয়, নিশ্চয়
কিন্তু বৎস, ফল বলে পাবে না খালাস
স্টেপগুলো সবিস্তর করহ প্রকাশ।"

চুলকালো মাথাটিরে ছাত্রটি মোদের
কহে কষ্টে কণ্ঠ হতে শব্দ করে বের;
"মোদের পাড়ার মধু আধা সে পাগল
বয়েস তাহার কুড়ি নেই কোনো গোল।
তাইতে চল্লিশ তব, সন্দেহ কি তায়!"
তার পর দিল ছুটি—গুরু পিছে ধায়॥

পরোপকার পরম ধর্ম

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

পরের উপার করা কর্তার একটা বাতিক। মাঝে মাঝে পরোপকার করতে না পারলে কর্তার মনে হয়, জীবনের ক-টা দিনই বৃথা গেল। হঠাৎ একটা পরোপকার করে ফেলতে পারলে বেশ কিছু দিন তাঁর সুখে এবং শান্তিতে যায়। সব সময় তিনি পরোপকারের ধান্ধায় ঘোরেন। সুযোগ একবার এসে গেলে, সে যতটুকু সুযোগই হোক, ছেড়ে দেন না। পাত্র-অপাত্র কোনো বাছ-বিচার নেই। যাকে হাতের কাছে পান তারই উপকার করতে কর্তা সদা প্রস্তুত। লোকে বলে, অহিংসা পরমোধর্মঃ ; কর্তা বলেন, পরোপকার পরম ধর্ম।

গরু হারিয়েছিল একজনের। পাড়াতেই থাকত সে। মুখ শুকিয়ে ঘুরছিল রাস্তায়। কর্তা চিনতেন না লোকটাকে, কিন্তু তার শুকনো মুখ আর হাতে দড়ি আর খুঁটি দেখেই ঠিক চিনেছেন যে এর গরু হারিয়েছে। সব কাজ পড়ে রইল, ভিড়ে পড়লেন তার সঙ্গে গরু খুঁজতে। কিন্তু গরু হারালে কি আর অত সহজে গরু পাওয়া যায়? কার ক্ষেতে হয়তো ঢুকে গাছ নষ্ট করছিল, সে বেঁধে রেখে দিয়েছে। কর্তার বয়স হয়েছে, তার উপর মুটিয়েছেন। খানিকক্ষণ লোকটার সঙ্গে ঘুরে হাঁপিয়ে পড়লেন। তখন বললেন তাকে—ওহে শুনছ, তোমার যখন গরু হারিয়েছে, তোমায় আমি একটি গরু দান করতে চাই। তুমি ব্রাহ্মণ তো?

ব্রাহ্মণকে গো-দান করলে পুণ্যি হয়, কর্তা জানতেন। একসঙ্গে পরোপকার এবং পুণ্যের সুযোগ ছাড়বেন কেন ?

লোকটা জিভ কেটে বললে—আজ্ঞে না আমি সদ্‌গোপ।

কর্তা বললেন—তা হোক, ও একই কথা। তুমি আমার বাড়ি এস, গরুর ব্যবস্থা করছি। আর ঘুরতে পারি নে।

তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে কর্তা গরু কেনার টাকাও দিলেন আর সে-ও তার ঘরে ফেরার পথে হারানো গরু খুঁজে পেল।

কর্তা অবশ্যই তাঁর টাকা ফেরত নিলেন না। সদ্‌গোপটির একটার জায়গায় দুটো গরু হল। এই হল কর্তার পরোপকারের জলন্ত উদাহরণ।

তারপর আর এক ঘটনা বলি।

শশীবাবু রোজ সন্ধ্যায় কর্তার আসরে আসতেন, সেদিনই আসেন নি।

কর্তা বললেন—কি হে, শশীকে দেখছিনে আজ ? আজ আমাদের পেঁয়াজ-ফুলুরির দিন। জেনে-শুনেও শশী এল না ? হয়েছে কি ?

কর্তার আসরে আজ চায়ের সঙ্গে মুড়ি আর পেঁয়াজ-ফুলুরি দেওয়া হবে জেনেও যে শশীবাবু এলেন না, এটা খুবই আশ্চর্য। অসুখবিসুখ করেনি তো ?

নন্দবাবু জানতেন আসলে কি ঘটেছে। তিনি বললেন—আজ্ঞে না, সে অন্য ব্যাপার।

—কি ব্যাপার খুলেই বল।

—আজ্ঞে, শশীবাবুর বড় ছেলেটা আজকাল বেজায় লেখাপড়ায় ফাঁকি দিতে শিখেছে। পাড়ার বদ ছেলেগুলোর সঙ্গে সারাদিন আড্ডা আর গুলি খেলা। শশীবাবু হদ্দ হয়ে গেছেন। এবারে ছেলে ক্লাস প্রোমোশান পেল না। নীচের ক্লাসেই একবছর থাকতে হবে। মনের দুঃখে শশীবাবু ছেলেকে ধরে খুবসে পিটেছেন। কিন্তু পিটলে তো আর ছেলে পাশ করবে না, তাই শশীবাবুর মনের দুঃখ যেমন-কে-তেমনি রয়ে গেছে। শশীবাবুর বড় ভরসা ঐ বড় ছেলের উপর। ছেলেপিলেরাই তো বড় হয়ে মানুষ হয়ে বাপ-মাকে দেখবে, আপনিই বলুন কর্তা ? সেই কারণেই শশীবাবুর আজ মন বড় ভার—বাড়ি থেকে বেরন নি।

কর্তা বললেন—বল কি, এ তো শশীর মস্ত সমস্যা। মন খারাপ তো হবেই। বলে গুম্ হয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন—কাল সকালেই আমি শশীর বাড়ি যাব। কিছু একটা করা দরকার।

পরদিন সকালে কর্তা কি ভেবে শশীবাবুর বাড়ি আর গেলেন না। নন্দবাবুর কাছ থেকে জেনে নিলেন শশীবাবুর ছেলের ইস্কুলটি কোথায়। সেই স্কুলে গিয়ে হেড-মাষ্টার মশাই-এর সঙ্গে দেখা

করলেন। তারপর হেড-মাষ্টার মশাইকে বিশদ ভাবে বোঝালেন এই বলে—ছেলেপুলেরা, বুঝলেন হেড-মাষ্টার মশাই, শরৎকালের আকাশের মতো—এই মেঘ-বৃষ্টি আবার এই রোদ। কখনও হাসে কখনও কাঁদে। এই দেখছেন ভালোমানুষটি তারপরেই দুষ্টুর সেরা। শশীর ছেলে যে ফেল্ করেছে তার মানে এ নয় যে সে চিরকাল খারাপ। ক-টা দিন দুষ্টুমি করেছে, পড়ায় ফাঁকি দিয়েছে, দেখবেন আবার ও ভালো হয়ে যাবে, আবার পাশ করবে।

কর্তা-হেন গণ্যমান্য লোক এইভাবে একটা নগণ্য ছোট ছেলে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন দেখে হেড-মাষ্টার মশাই হতচকিত হয়ে উঠলেন। তিনি কি করবেন ভেবে পেলেন না। শুধু বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, এক বছর নীচের ক্লাসে থাকলে লজ্জায়ই ওর পড়াশোনায় মন বসে যাবে।

হেড-মাষ্টার মশায়ের এই কথায় কর্তা আসলে যা বলতে এসেছিলেন তা তাঁর গুলিয়ে গেল। তিনি থতমত খেয়ে বললেন—তা তো যাবেই। তা তো যাবেই।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। হেড-মাষ্টার মশাই আঁচ করবার চেষ্টা করলেন, কর্তার মনের কথাটা কি? কিন্তু ধরতে পারলেন না। শেষে তিনি সোজাসুজিই জিজ্ঞেস করলেন—ছেলেটি সম্বন্ধে আপনার আর কিছু প্রস্তাব আছে নাকি? কর্তা বললেন—দেখুন, আমি ছেলেটির একটু উপকার করতে চাই। আপনি যা বলছেন, তাতে করে আসলে শাস্তি হচ্ছে। উপকার যে কবে হবে তার ঠিক নেই। আমি বলছিলুম কি, আমি ভার নিচ্ছি ওর। এবারকার মত ওকে পাশ করিয়ে দিন। সামনের বারের পরীক্ষায় ওকে ঠিক তরিয়ে দেব।

বাস্ হয়ে গেল। শশীবাবুর ছেলে পাশ করে গেল। শশীবাবু আবার কর্তার আসরে আসতে আরম্ভ করলেন। আর কর্তা শুরু করে দিলেন গাধা পিটিয়ে ঘোড়া তৈরী করা।

ছেলেটা গুলি খেলা ছেড়ে দিল। পরের বার সত্যি সত্যি ভালোভাবে পাশ করে গেল। এই নিয়ে কর্তার আর আনন্দের সীমা নেই।

একবার কর্তার হাত ফস্কে মস্ত একটা পরোপকার পালিয়ে যায়। মুখে প্রকাশ করেন নি যদিও, কিন্তু মনে মনে কর্তা সেবার ভারী দুঃখ পেয়েছিলেন। কর্তা ছিলেন পণ-প্রথার বিরুদ্ধে। বলতেন, ওটা আমাদের সমাজের একটা জঘন্য প্রথা। সেই কর্তার আসরের বংশীবাবু শোনা গেল ছেলের বিয়ে দিয়ে মেয়ের বাপের কাছ থেকে তিন-হাজার টাকা পণ আদায় করছেন। শুনে কর্তা রেগে আগুন। বললেন—এ অনাচার বন্ধ করতেই হবে। ছুটলেন কন্যাগৃহে। বুড়ো বাপ অন্নদাবাবুকে বললেন—খবরদার আপনি এ পণ দেবেন না। অন্নদাবাবু বললেন—তবে আমার মেয়ের বিয়ে হয় কি করে? কর্তা বললেন—পণ না দিয়েই বিয়ে হবে। আমি দেখছি। বলে ছুটলেন বংশীবাবুর বাড়ি। বংশীবাবুকে এই মারেন তো এই মারেন। খুব বকুনি দিয়ে শেষে বললেন—তুমি যদি এমন অনাচারের প্রশ্রয় দাও তাহলে তোমার আমি মুখদর্শন করব না।

বংশীবাবু চুপ করে সব শুনে তারপর কর্তার সামনে এক গ্লাস ঠাণ্ডা শরবৎ এগিয়ে দিয়ে বললেন —তবে শুনুন কর্তা আমার কথাটা। আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে অন্নদাবাবুর কাছ থেকে তিন হাজার টাকা পণ আদায় করছি এ কথা সত্যি। তারপর দেখুন আমার মেয়ে বীণা-মার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে জগবন্ধুবাবুর ছেলের সঙ্গে। জগবন্ধুবাবু আমার কাছ থেকে তিন-হাজার টাকা পণ আদায় করছেন।

কর্তা লাফিয়ে উঠে বললেন—অ্যাঁ, বল কি? তোমার উপরেও এই অত্যাচার? এ বন্ধ করতেই হবে।

বংশীবাবু বললেন—শুনুন! আমায় আগে কথা শেষ করতে দিন। জগবন্ধুবাবু তো আমার কাছ থেকে পণ পাবেন। এদিকে জগবন্ধুবাবুর মেয়ে আশা বড় হয়েছে। তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে নরেশ হাজরার ছেলের সঙ্গে। নরেশ হাজরা পণ চাইছেন তিন হাজার টাকা। তারপর দেখুন, নরেশ হাজরারও তো মেয়ে আছে। বছর দুইয়ের মধ্যে তারও বিয়ে দিতে হবে। নরেশবাবু চেষ্টা করছেন অন্নদাবাবুর ছেলেটির সঙ্গে সম্বন্ধ করবার। এ ক্ষেত্রে অন্নদাবাবু নিশ্চয়ই তিন হাজার টাকা পণ চাইবেন। তাহলে হিসেব করে দেখুন কর্তা কার লাভ হচ্ছে, কারই বা লোকসান। আপনি যে পরোপকার করতে বেরিয়েছেন, আগে ঠিক করুন, কার উপকার করবেন?

কর্তার গর্ব ছিল, তিনি অঙ্কটা বেশ ভালো জানেন। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে মনে মনে অঙ্কের হিসেবটা করবার চেষ্টা করলেন। অন্নদাবাবু, নরেশবাবু, বংশীবাবু, জগবন্ধুবাবু এতগুলো নাম আর তিন তিন হাজার টাকার দেনা-পাওনা একসঙ্গে মাথার মধ্যে ঢুকে জট পাকিয়ে গেল। শরবতের গেলাসটা তুলে ঠাণ্ডা শরবতে চুমুক দিয়ে বললেন—যা গরম পড়েছে, মাথাটা ঠিক খেলছে না। বল তো বংশী, কার লোকসান হচ্ছে? চেষ্টা করে দেখব যদি তাকে কিছু পুষিয়ে দিতে পারি।

বংশীবাবু হেসে ফেলে বললেন—এটাও বুঝলেন না কর্তা, যতগুলো তিন-হাজার হাত-বদলা-বদলি করলো, সবগুলোই শেষাশেষি কেটে গেল। কারুরই লোকসান নেই। পণ প্রথাকে আপনি গালাগালি করেন, কিন্তু বার করুন এর খুঁৎ।

কর্তা খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে আর তাঁর পরোপকার-প্রবৃত্তিতে বাধা দেওয়ায় বংশীবাবুর উপর খানিকটা চটে বাড়ি ফিরে এলেন।

বংশীবাবুর ছেলের বিয়ে নির্বিঘ্নে চুকে গেল।

এর পরের ঘটনায় কর্তার পরোপকার-প্রবৃত্তি যে চোট খেলো তা কাটিয়ে তিনি উঠতে পেরেছেন কিনা এখনও জানা যায়নি। একদিন কর্তার সকালের আসর সবে ভেঙেছে, বন্ধুরা যে-যার বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন, কর্তা স্নানের জন্যে তেল মাখতে যাবেন বলে উঠি-উঠি করছেন, সেই সময় একজন অচেনা লোক কাঁচু-মাচু মুখে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে ঢুকলেন।

একটু কাছে আসতে কর্তা দেখলেন, তাঁর বুক-পকেটটা ছেঁড়া। ছেঁড়া পকেটটা খাতার পাতার মতো লটপট করছে।

কর্তা তাঁর দিকে উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে আছেন দেখে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন—হুজুর, এই অবেলায় এসে আপনাকে বিরক্ত করছি বলে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কর্তা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—কি হল আপনার?

ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন—আমি আজ সতের বছর দত্তপুকুরের দত্তদের বাড়ি গৃহ-শিক্ষকতা করছি, কিন্তু এমন বিপদে কোনদিন পড়িনি।

কর্তা সোজা হয়ে বসে বললেন—বলেন কি? বলুন তবে বিশদভাবে, শুনি।

ভদ্রলোক বললেন—দত্তবাড়ি থেকে আজ মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম। দত্তবাবুদের অনুরোধ করেছিলুম তিন-মাসের মাইনে অগ্রিম দিতে। একটা বাড়ি করাচ্ছি, তার ছাদ ঢালাই করা দরকার, তাই টাকার বড় প্রয়োজন। দত্তবাবুরা দিয়েছিলেন। অনেকগুলো নোট—বুক-পকেটটা উঁচু হয়েছিল, তাই বাঁ হাতে করে পকেটটা চেপেই রাস্তা দিয়ে চলেছিলুম। আপনাদের পাড়ায় এসেছিলুম একটা ওষুধের খোঁজে। এখানকার এক ডাক্তারখানার ডাক্তারের উপর আমার অসীম বিশ্বাস। বহুদিনকার পুরোনো পেটের অসুখ যখন খুব বেড়ে ওঠে, ঐ ডাক্তারের এক শিশি ওষুধ খেলেই কমে যায়। ওষুধ নিয়ে ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে হন্ হন্ করে বাড়ির পথে আপনাদের ঐ বুড়ো-বটতলায় যেই না এসেছি, অমনি পিছন থেকে একজন মারল ধাক্কা। আমি ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়ি আর কি, বুক পকেট থেকে হাত তখন সরে গেছে, সেই সময় কে একজন—আহা হা, পড়ে গেলেন? বলে পিছন থেকে আমায় জাপটে ধরল। আমি আর পড়লুম না বটে, পিছনের লোকটি আমায় বাঁচিয়ে দিল, কিন্তু সামলে নিয়েই দেখলুম আমার পকেট খালি, ডান-হাতের ওষুধের শিশিটাও নেই। চকিতে পিছন ফিরে আমি সেই লোকটিকে ধরে ফেললুম। ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক। চোর বলে মনে হয় না। তাহলেও চোখ পাকিয়ে তাকে বললুম—আপনি আমার পকেট মেরেছেন, শিগ্‌গীর বার করুন টাকা। ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন; বললেন—হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, বাঁচালুম আপনাকে, আবার বলেন পকেট মেরেছি? লোকজন জড় হচ্ছিল ততক্ষণে। সকলের সামনে আমি ভদ্রলোককে সার্চ করলুম। একটি নোটও পেলুম না। মহা অপ্রস্তুত। বুঝলুম, টাকাটা চোখের পলকে পাচার করে দিয়েছে। ওষুধের শিশিটা পর্যন্ত। বোকা বনে গেলুম কর্তা। কি করব, ছেড়ে দিলুম লোকটাকে। তারপর নিঃস্ব হয়ে আপনার দ্বারে এসেছি।

বলে ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন।

কর্তা বললেন—আমার পাড়ায় চুরি যখন হয়েছে আমি এর বিহিত করছি। আপনি পাশের ঘরে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসুন। যতক্ষণ না ডাকি এ ঘরে আসবেন না।

বলে ভদ্রলোককে পাশের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। চাকরদের বললেন—বাবুকে অমৃতি আর ডাবের জল দে।

কর্তার পাড়ায় বুড়ো-বটতলার কাছেই ছিল পূরণ গুণ্ডার আড্ডা। কর্তা সকলেরই পরোপকার করেন, পূরণ গুণ্ডারও একবার করেছিলেন। পূরণের চোরাই কোকেনের ব্যবসা। সন্ধান সুলুক পেয়ে পুলিশের দল একবার ভোর রাত্রে পূরণের আড্ডায় হানা দিয়েছিল। পুলিশ আসছে খবর পেয়েই পূরণ তার কোকেনের থলি সমেত কর্তার বাড়ি এসে কর্তার পায়ের কাছে দড়াম্ করে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। কর্তা ভোরে উঠে তাঁর বেলফুলের ঝাড়গুলি থেকে আগের রাতের ফোটা বেলফুল তুলে তুলে হাতের মুঠোয় জমা করছিলেন, সেই সময় সাক্ষাৎ পূরণ গুণ্ডার প্রবেশ!

পূরণ হাত জোড় করে বললে—হুজুর বাঁচান।

দুস্থ এসে আশ্রয় চাইছে, কর্তার পরোপকার-প্রবৃত্তি চেগে উঠল। পূরণকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তার থলিসুদ্ধ তাকে তক্তপোষের তলায় লুকিয়ে রেখে দিলেন। পুলিশ এসে কাউকে খুঁজে না পেয়ে চলে গেল।

এই পূরণ গুণ্ডাকে কর্তা ডেকে পাঠালেন। পূরণ সব শুনে বললেন—বুড়ো-বটতলায় যদি রাহাজানি হয়ে থাকে তবে আমার জান-পছন লোক। কিছু ভাববেন না, এনে দিচ্ছি। এই বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই গৃহশিক্ষকের তিন-শ পনের টাকা আর খালি ওষুধের শিশিটা ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

কর্তা বললেন—ওষুধ কি হল?

একটা লোক জ্বরে কাঁপছিল তাকে খাইয়ে দিয়েছে।

কর্তা আঁৎকে উঠে বললেন—সে কি! ও যে পেটের অসুখের ওষুধ, জ্বরের রুগীকে খাইয়ে দিল?

—আমরা হুজুর গরীব মানুষ, আমাদের একটা ওষুধ হলেই হল। ঠিক সেরে যাবে।

—তাই বলে পুরো এক শিশি ওষুধ খাইয়ে দিলে? বোধ হয় দুদিনের ডোজ!

—হুজুর জ্বরটা একটু বেশী হয়েছিল—ভালই ফল হবে।

—হুঁঃ জ্বর কেন, মানুষসুদ্ধ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাক। এই বলে আর কথা না বাড়িয়ে কর্তা পূরণকে বিদায় দিলেন। তারপর খালি ওষুধের শিশি আর টাকা নিয়ে ঢুকলেন পাশের ঘরে।

গৃহশিক্ষকের মুখে হাসি ধরে না। ওষুধটা নেই বলে কর্তা দুঃখ করতে লাগলেন। গৃহশিক্ষক বললেন—যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। বলে কর্তার পায়ের ধুলো বার বার মাথায় নিয়ে—বেলা বেড়ে গেল কর্তা এবার স্নান করুন—বলতে বলতে বিদায় হলেন।

কর্তার সেদিন আর টুলে বসে ডলাই-মালাই করে তেল মাখবার সময় ছিল না। মাথায় এক থাব্‌লা তেল মেখে স্নানের ঘরে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় পূরণ গুণ্ডার পুনঃপ্রবেশ।

—কি পূরণ? আবার কি মনে করে?

—হুজুর দত্তবাড়ির মাষ্টারকে কি তার টাকা ফেরত দিয়েছেন?

—হ্যাঁ, এই মাত্তর তো দিয়ে দিলুম। শুধু ওষুধটা দিতে পারলুম না।

—তবে তাজ্জব ব্যাপার হুজুর। বুড়ো-বটতলায় গিয়ে দেখে এলুম একজন বসে বসে কাঁদছে। তাকে দেখে তো দত্তবাড়ির মাষ্টার বলেই মনে হয়। পকেট কিন্তু তার খালি!

—বলিস কি রে! আবার পকেট মারা গেল নাকি? চল্ তো দেখে আসি। বলে, স্নান মাথায় উঠল, খড়ম পায়ে দিয়ে কর্তা ছুটলেন বুড়ো-বটতলায়।

সেখানে সত্যিই একজন লোক বসে বসে কাঁদছিলেন। তাঁর চেহারা কিন্তু কর্তা যাঁকে দত্ত-বাড়ির গৃহশিক্ষক বলে চিনেছিলেন তাঁর মত মোটেই নয়।

খোঁজ-খবর করে সহজেই জানা গেল ইনিই দত্তবাড়ির সত্যিকারের গৃহশিক্ষক। এঁরই পকেট মারা গিয়েছে। তিন মাসের মাইনে তিন-শ পনের টাকা আর এক শিশি পেটের অসুখের ওষুধ লোপাট। নকল গৃহশিক্ষকের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই।

কর্তাকে আরো একবার পরোপকার করতে হল। প্রথমেই পাশের ডাক্তারখানা থেকে ভদ্রলোককে এক শিশি পেট-ব্যথার ওষুধ কিনে দিলেন। টাকার শোকে ভদ্রলোকের পেটের ব্যথা বেড়ে উঠেছিল। টাকার শোকে যত না কাঁদছিলেন, পেটের ব্যথায় কাঁদছিলেন তার চেয়েও বেশী। ওষুধ খাইয়ে শিক্ষক মহাশয়কে ঠাণ্ডা করে কর্তা বৈঠকখানায় নিয়ে এলেন। তারপর তিন-শ পনেরটি টাকা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন—আমার এই সামান্য উপহারটুকু দয়া করে গ্রহণ করুন।

ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করে শেষ অবধি গ্রহণ করলেন টাকাটা। কর্তা তখন জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, বলুন তো, বুক-পকেট থেকে টাকা মেরে দিতে গেলে পকেটটা না ছিঁড়লেও কি চলে?

ভদ্রলোক বললেন—তা তো বটেই। এমন হাত সাফাই ওদের, জানতেই পারবেন না কখন হাত চলে গেল পকেটে। দেখুন না, আমার পকেট যেমন কে তেমনি আছে। সেলাই-এর একটি সুতো পর্যন্ত সরেনি। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছেন এ কথা হুজুর?

কর্তা বললেন—সে কিছু নয়। আপনি আজ তবে বাড়ি যান। বলে, ভদ্রলোককে বিদায় দিলেন।

কর্তার একটা পরোপকার আজ হল বটে, কিন্তু অন্য পরোপকারটা করতে গিয়ে যে বেদম ঠকে গেলেন সেটা ভুলতে পারছিলেন না। তেলা মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালতে ঢালতে কেবলই বলতে থাকলেন—ইস্ ছেঁড়া পকেটটা দেখেই আমার বোঝা উচিত ছিল যে লোকটা ঠগ্।

তর্ক করো

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

কি বল্‌লে হে, শত্রু এসে দিচ্ছে হানা?
আক্রমণই ক'রে বসেছে, সঠিক জানা?
শত্রু কিনা দেখতে হবে, তর্ক করো।
আগন্তুকও হতেই পারে ভিন্ন তরো।
হানাদার যে নয়কো ওরা, তাই কে জানে?
হানা দিলেই শত্রু হবে, তার কি মানে?
ছুড়দাড়িয়ে ঢুকলো বলে শত্রু হবে?
এমন কথা বললে পরে হাসবে সবে।
হয় তো তারা পথ ভুলে বা তাড়ার চোটে
এলোপাতাড়ি ঢুকে পড়েছে পিছন হ'টে।
আক্রমণ-ই কেমন ক'রে বলতে পারি?
মিলিয়ে সেটা দেখতে হবে ডিক্‌সনারি।
অস্ত্র নিয়ে তেড়ে এলেই বলবো কি তা?
ভয় দেখিয়ে দেখছে মজা, হয়তো মিতা?
সদলবলে হল্লা ক'রে দাঙ্গাকারী
তেড়ে এলে কি আক্রমণ তা ধরতে পারি?
তারা তো মেয়ে ঘর জ্বালিয়ে লুঠেই নেবে।
তেড়ে গেলেই বামাল নিয়ে লম্বা দেবে।
আক্রমণ কি বলবো সেটা! যুক্তি মতো?
সকল দেশে হচ্ছে রোজই অমন কতো।
কামান গোলা মর্টার বোমা অস্ত্র হানে?
প্র্যাকটিস্‌ বা করে, কেমন ছুঁড়তে জানে।
মরছে লোকে? জন্মালে তো মরতে হবে।
কবি বলেন অমর কে বা কোথায় ভবে।
তাই বলি হে, কারো কথাতে যেও না তেতে
দেখবে ভেবে থিতিয়ে ব'সে আসন পেতে।
শুনলে ব'লে ছুটতে হবে তাদের পিছু?
তর্ক করে', দেখতে পাবে হয়নি কিছু।

অ্যালেস্যান্‌ড্রো ভোল্‌টা

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

আচ্ছা, তোমরা বল তো কে কত বছর বয়সে কথা কইতে শিখেছ? নিশ্চয়ই বাবা মার কাছে তা শুনে থাকবে। কেউ হয়ত বলবে এক বছরে, কেউ বা বলবে দেড় বছরে। কিন্তু ইটালি দেশে ১৭৪৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি ছেলে জন্মেছিল, সে যখন চার বছরে পদার্পণ করলে তখনও তার মুখ দিয়ে একটিও কথা ফুটলো না! তার বাপ মা তো ভেবেই আকুল—হায়, ছেলে বোবা হলো! শুধু বোবাই নয়, হাবাও। অর্থাৎ সেই চার বছরেও কেমন যেন বোকা বোকা ভাব, বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই জাগলো না, আকারে-ইঙ্গিতেও বুদ্ধির আভাস পাওয়া যায় না।

কিন্তু আর এক আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, সেই চার বছরে পড়বার পর থেকেই তার একটি একটি ক'রে চট্‌পট কথা ফুটতে লাগলো দিব্যি, আর বেশ চালাক-চতুরও হয়ে উঠতে লাগলো। তারপর যখন তার সাত বছর বয়স, তখন স্কুলের সব ছেলের মধ্যে সে-ই সব চেয়ে সেরা ছেলে পড়াশুনায় ও কথাবার্তায়। তারপর বড় হয়ে এই ছেলে সারা জগতে যখন এক বিখ্যাত ব্যক্তি, তার বাবা বললেন, "আমাদের ঘরে যে একটি রত্ন জন্মেছে তা আমরা বুঝতেই পারিনি বহুকাল।"

এই ছেলের নাম, অ্যালেস্যান্‌ড্রো ভোল্টা। আজকাল বিদ্যুতের (electricity) খেলা সারা পৃথিবীময়। ঘরে ঘরে বিজলীর বাতি, পাখা, স্টোভ, রেডিও, আরও কত কি! এসব যেন আজকাল জল-ভাত—সহজেই পাওয়া যায় মিত্র রূপে। কিন্তু দু'শো বছর আগে পৃথিবীর লোক জানতো বিদ্যুৎ আছে সুদূর ঐ মেঘের মধ্যে মারাত্মক শত্রু রূপে—মাঝে মাঝে মারণঅস্ত্র হানে কড়্‌কড়্‌ শব্দে ভূতলে। আকাশের বিদ্যুৎকে ইটালি দেশের এই ভোল্‌টা নামক চিন্তাশীল ব্যক্তি বহু গবেষণা, সাধনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা ধরাতলে ধরবার প্রণালী আবিষ্কার করলেন। তিনি যেভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করলেন, তার নাম হলো তাঁরই নামে—ভলটাইক্ ইলেকট্রিসিটি।

তাঁর সমকালীন ঐ ইটালি দেশেরই আর একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বিজলীর ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণায় মেতেছিলেন। তাঁর নাম লুইগি গ্যালভ্যানী। তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক এবং শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যার অধ্যাপক। তিনি হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলেন, তাঁরই শবব্যবচ্ছেদ গৃহের একটা মৃত ব্যাং-এর পা দুটো আশ্চর্য ভাবে নড়ে উঠলো। সেই থেকে তাঁর মনে হলো, জন্তুর দেহে বিদ্যুৎ আছে। কিছুদিন গবেষণার পর তিনি তাঁর এই বিদ্যুতের নাম দিলেন—অ্যানিম্যাল ইলেকট্রিসিটি বা জৈব বিদ্যুৎ। একে গ্যালভ্যানিক ইলেকট্রিসিটিও বলা হতো তাঁর নামানুসারে। কিন্তু ভোল্‌টা, গ্যালভ্যানীর এই মতটাকে আমল দিলেন না। তিনি বললেন, বাইরের কোন অলক্ষ্য বিদ্যুতের শক্তি প্রাপ্ত হয়ে ব্যাং-এর পা দুটো নড়ে থাকবে। বস্তুতঃ, তাই যে ঘটেছিল তা

পরে প্রমাণিত হয়। ভোল্‌টা তাঁর নিজের বিদ্যুৎ তৈরী করলেন দুটো বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে তরল-পদার্থ বিশেষের সংস্পর্শে, যে পদ্ধতিতে আজও ব্যাটারি তৈরী হয়ে থাকে বিদ্যুৎ উৎপন্নের জন্য। তাঁর এই ব্যাটারির বিশেষত্ব হলো বিদ্যুতের একটা প্রবাহ সৃজন করা; যে প্রবাহদ্বারা যতকিছু বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিও যানবাহন চালনা করা সম্ভব হয়েছে।

অপর দিকে গ্যালভ্যানির নামও অমর হয়ে রইল পরবর্তীকালে তাঁর আর একটি যন্ত্রের আবিষ্কারের দরুন। সে যন্ত্রের নাম হলো, তাঁরই নামানুসারে—গ্যাল্‌ভ্যানোমিটার। এই যন্ত্রের দ্বারা জানা যায় বিদ্যুৎপ্রবাহের অস্তিত্ব এবং গতির বেগ।

এদিকে ভোল্‌টা যখন তাঁর নামাঙ্কিত ভোল্‌টায়িক ইলেক্‌ট্রিসিটি আবিষ্কার ক'রে জগদ্বিখ্যাত হলেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ। এইবার তিনি বিবাহ করলেন এবং ঘর-সংসার করতে লেগে গেলেন। এতকাল বিজ্ঞানের সাধনায় এমনি ডুবে ছিলেন যে, বিয়ের কথা ভাববার সময়ই পাননি। একেই বলে বিজ্ঞান-সাধনা।

অবশ্য একথাও এখানে বলা দরকার যে, ভোল্‌টার এই ভোল্‌টায়িক ইলেক্‌ট্রিসিটি আবিষ্কারের পূর্বেও কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বিদ্যুতের বিভিন্ন উৎপাদন-পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভোল্‌টার মতো বিদ্যুতের স্রোত সৃষ্টি করতে পারেন নি। এই বিদ্যুৎ-স্রোতের বলেই বৈদ্যুতিক সব-কিছু চলছে আজ। পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা শুধু লক্ষ্য করেছিলেন যে, কোনো কোনো জিনিস অপর বিশেষ বিশেষ পদার্থের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। এই বিদ্যুৎকে বলা হয় ফ্রিক্‌শন্যাল ইলেক্‌ট্রিসিটি। ১৬৬০ সালে অটো ভন্ গুয়েরিকে নামে এক বৈজ্ঞানিক এই প্রকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি যন্ত্র পর্যন্ত প্রস্তুত করেছিলেন। ১৭৩৩ সালে ডু ফে নামক বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেছিলেন যে, দুটো কাচের ডাণ্ডা যখন রেশমের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎশক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন তারা পরস্পরকে আকর্ষণ না করে বিকর্ষণ করে, অর্থাৎ দূরে ঠেলে দেয়। আর যদি পশমে ঘষা একটা গালার ডাণ্ডার কাছে ঐ কাচের একটা ডাণ্ডাকে আনা যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে জোড়া লেগে থাকে। গালার সঙ্গে হয় তখন গলাগলি ঐ কাচের ডাণ্ডার।

যাই হোক, এই ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা ক'রে বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বিদ্যুৎ দুই প্রকারের আছে। একটাকে বললেন ধনাত্মক (positive), অপরটার নাম দিলেন ঋণাত্মক (negative)। দুটি সমবিদ্যুৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, আর বিপরীত দুই বিদ্যুৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

আচ্ছা আর একটা কথা এইবার বলি। তোমরা তো সকলেই ঘুড়ি ওড়ানোয় ওস্তাদ। আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে বিদ্যুতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন—ভোল্‌টার আগে। তাঁর নাম বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন্। সে এক অভিনব কাণ্ড।

আজকাল সবচেয়ে শক্তিশালী যে প্রকার বিদ্যুৎ জগতে কাজ করছে সর্বত্র, সে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় চুম্বক লোহার সাহায্যে। তার বর্ণনা করা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তা লিখতে গেলে অনেক কিছু লিখতে হয়।

যাই হোক, ভোল্‌টা যে শুধু বিজ্ঞানীই ছিলেন তা নয়। ছোটবেলা থেকেই প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল। তাইতেই প্রকৃতির একটি রহস্য এই বিদ্যুৎকে তিনি যেমন আয়ত্ত করেছিলেন, তেমনি আবার প্রকৃতির সৌন্দর্যও তাঁকে গভীর ভাবে মুগ্ধ করেছিল। তার ফলে তিনি বহু কবিতা রচনা ক'রে গেছেন। তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছিলেন ল্যাটিন ভাষায় এবং লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই কবিতাটিতে যেমন কবিত্বের ভাব ও ভাষা-সম্পদ ছিল প্রচুর, তেমনি আবার তাঁর পূর্ববর্তী বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের প্রশস্তিও ছিল বেশ। জোসেফ্ প্রিষ্টলী, বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলীন্, জেম্‌স্ ওয়াট্ প্রভৃতির উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসায় পূর্ণ ছিল সেই কবিতাটি। বিজ্ঞান ও কাব্য—উভয় বিষয়ের গুণই ভোল্‌টাকে অলংকৃত করেছিল।

হুলো-মেনীর ছড়া

শ্রীসুধীরকুমার করণ

১

কানে গুঁজবো তুলো,
পিঠে বাঁধবো কুলো,
বকো-ঝকো কিল দমাদম্—
নাম পেয়েছি হুলো;
চুপটি করে বসেই আছি
কোথায় চাঁছি মেলে,—
ধান নেইকো চাল নেইকো
চালান হ'ল রেলে।

২

আয়রে আমার মেনী
বাঁধবি যদি বেণী,—
বেণীর ডগায় ধুত্‌রো ফুল
নগদ হাজার টংকা 'মূল'।
চুল নেইকো মূল নেইকো
বাঁধবো আমি কি!
পরের হাঁড়ি খেয়ে আমি
মুখ পুড়িয়েছি।

স্পুটনিক

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গেছে উল্‌টিয়ে, বিদায় পুরোনো দিন,
আজকে নতুন ঋতু, টিটভ্‌ আর গাগারিন্‌
হিমালয় আজ আর কতটুকু উঁচু বলো ?
আজকের মন বলে 'চাঁদে চলো, চাঁদে চলো'
তারপর আরো চলো তারও সীমা ছাড়িয়ে
অসীমকে মুঠো করে ধরো হাত বাড়িয়ে।
অজানাকে জানাতেই মন চায় ছুটতে,
লাফ দিয়ে তুড়ি মেরে আকাশেতে উঠতে,
পৃথিবীটা পাক দিয়ে শোঁ শোঁ করে উড়তে
'হ্যালো' বলে ডাক দিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে।

হাউই সেকেলে বাজি বৃথা করে হুশ্‌-হুশ
একটু উঠেই ব্যস্‌ ফেটে যায় ফুসফুস।
খেলাঘরে থাক্‌না সে, করুক তা টিমটিম
সূর্যের নীচে হয়ে সল্‌তের পিদ্দিম।
আজকের বাজি দেখে দুনিয়াটা তাজ্জব
দিকে দিকে জয়গান, নতুনের উৎসব।
'ল্যুনিক' আর 'স্পুটনিক' রকেটের বিস্ময়
নবজাত 'ভোস্টক আরো বেশী নিশ্চয়।
বিজ্ঞান-সবিতার এ নতুন রোশনাই
চোখে লেগে আজ যেন স্বপ্নের শেষ নাই।

মনে মনে তাই নিয়ে ভুশ্‌ করে উঠে যাই
চোখের নিমেষে গিয়ে তারা লোকে পৌঁছাই
যেতে যেতে দুমিনিট দাঁড়িয়ে সে শূন্যেই
আড়িমুড়ি ভাঙি আর জলযোগ সেরে নেই,
তারপর খুশিমত ফের কল টিপলেই
আবার চলার সুরু, চলছে তো চলছেই,
গতিবেগে তারাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি
হঠাৎ সুমুখ পানে চেয়েই চমকে উঠি,
শূন্যে রয়েছে ভেসে কি রে ওটা গোলাকার ?
যতই আসছে কাছে বিরাট শরীর তার
ফুটছে কি আলো ছায়া, অবাকের ঝিলমিল,
ধূসর পাহাড়, খাদ, সাগরের ধুধু নীল
রোমাঞ্চে কেঁপে কেঁপে চোখ রেখে যন্ত্রে,
দেখেই চেঁচিয়ে উঠি, 'এসে গেছি চন্দ্রে !'

ভাবতেও কি যে সুখ, চাঁদে এসে থামলাম
ছমছম নির্জনে চুপি চুপি নামলাম,
শব্দের লেশ নেই নিশ্চুপ চারিধার
নিরেট আঁধারে ডুবে সব কিছু নিরাকার।

হঠাৎ কে কাছে এলো ? খাড়া হয়ে ওঠে কান,
পাশেই কে নড়েচড়ে, খুঁজে চোখ হয়রান।
আওয়াজটি বারে বারে নিঃসাড়ে তোলে ঢেউ
তবে কি আমারো আগে এখানে এসেছে কেউ ?
শিকারী না ভবঘুরে ? গায়ক না গায়িকা ?
শেষে দেখি কেউ নয়, ল্যাজ নাড়ে 'লাইকা'।
ওমা, এ যে চেনা মুখ, তুমি এলে কতদিন ?
কেন, তা কি জানতে না ? এসেছি অনেক দিন,
পৃথিবীর মুখখানা কতকাল দেখি না যে—
একা একা পড়ে আছি নিরালা চাঁদের মাঝে।
রোজই থাকি পথ চেয়ে, এই বুঝি লাগে ধুম
মানুষের কলরবে ভাঙা এ চাঁদের ঘুম।
এতদিনে এলে তুমি ? হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম,
নিজেরে বিলিয়ে দিয়ে আমিই তো বাঁধলাম
অকূলে প্রথম সেতু পাকা হবে একদিন
তোমাদের মহাজয়ে আমার নীরব ঋণ
সেদিন ভুলোনা যেন, রেখে দিও ইতিহাসে :
তোমরা আসবে যাবে আমি রব পাশে পাশে।

আহা, কবে সত্যই সে ঘটনা ঘটবে ?
'লাইকা'র আশা-কলি ফুল হয়ে ফুটবে ?
নোঙরের টান ছিঁড়ে এগোনোর মন্ত্রে
বিজয়ী প্রথম প্রাণ আমি হবো চন্দ্রে।
রূপকথা হবে এক আলোকের ইতিহাস
'স্পুটনিক' সে উষার উজ্জ্বল আশ্বাস।

ফোলাই ফেনা'র ফা'নুস

ফটো : অরুণ সেনগুপ্ত

জ্বালাই ফুলঝুরি

ফটো ঃ শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

হবি মানে বাতিক

স্বপনবুড়ো

খোদন টিফিনের ঘণ্টায় মাথা নেড়ে বটুককে বল্লে,—ত্থাখ বটুক, একটা কিছু 'হবি' না থাক্‌লে এই জীবনটাই বৃথা।

বটুক ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর দিলে, 'হবি'? 'হবি' আবার কি? বরং তার চাইতে বল 'হকি'। এই তো কিছুদিন আগেই ইডেন গার্ডেনে হকি খেলা নিয়ে কি মাতামাতি!

খোদন বেঞ্চের ওপর একটা চাপড় মেরে বল্লে, দেখ বটুক, তুই হচ্ছিস বিংশ শতাব্দীর একটা অভিনব বোকা! নইলে 'হবি' কথাটার মানে জানিস্‌ নে? 'হবি' মানে 'সখ'। প্রত্যেক মানুষেরই একটা করে সখ থাকে। হবির বাঙ্‌লা তুই 'বাতিক'ও করতে পারিস। লোকের নানান রকম বাতিক থাকে। ধর,—কেউ গান গায়, কেউ কবিতা লেখে, কেউ ছবি আঁকে, আবার কেউ বা বাগান করে। মাছ ধারার বাতিকও অনেকের আছে।

বটুক ঠোঁট দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করলে। তারপর বল্লে, ও! এই কথা! ব্যাপারটা আগে বল্লেই হ'ত। 'হকি' নয়—'হবি'। হ্যাঁ, যদি আমায় জিজ্ঞেস্ করিস,—তা হলে আমি বলব, আমার হবি হচ্ছে—এসপ্ল্যানেডের মোড়ে দাঁড়িয়ে ফুচ্‌কা খাওয়া—

দূর—দুর! ওটা আবার একটা 'হবি'? একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর বাতিক।

বিরক্তিতে বমি আস্‌ছে—ঠিক এই রকম মুখের ভাব করে, ভুরু কুচ্‌কে, মন্তব্য করলে খোকন। তারপর একটু চুপচাপ থেকে বল্লে, আমার কি 'হবি' হবে জানিস?

—কি রে?

—আমার 'হবি' হবে গান গাওয়া। আমি এখন থেকে গান গাইতে সুরু করবো।

বটুক হাস্‌বে কি কাঁদবে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলে না।

বল্লে, অ্যাঁ! খোদন, তুই গান গাইবি? ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি? তোকে তো কোনো দিন হারমোনিয়ামের ধারে-কাছে যেতে দেখিনি!

গম্ভীর ভাবে খোদন উত্তর দিলে, দেখিস্‌নি তাতে কি? কেউ আগে জলে নামেনি বলে—জীবনে আর কখনো জলে নাম্‌বে না—এটা কি একটা যুক্তি হ'ল?

বটুক খানিকটা কি ভাব্‌লে; তারপর খুশীতে ফানুসের মতো ফুলে উঠে বল্লে, হুঁ, বুঝতে পেরেছি।

—কি বুঝ্‌তে পেরেছিস?

খোদন যেন মারমুখী হয়ে উঠ্‌বে এমনি একটা ভাব।

বটুক কিন্তু এতটুকু দমল না ওর ভাব-ভঙ্গী দেখে। শুধু ফোঁড়ন কেটে বল্লে, ইস্কুলের

পারিতোষিক বিতরণ সভায় হিমাদ্রীর খাতির দেখে তোর মনে এই ইচ্ছে জেগেছে। বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, আমার কথা সত্যি কিনা?

খোদন বটুকের কথার কোনো জবাব দিলে না, রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল আর এক দিকে।

এর দু'দিন বাদেই পাড়ার লোকেরা মরিয়া হয়ে থানায় গিয়ে হাজির।

কী তাদের নালিশ?

—সবাই মিলে জানালে যে, খোদনের গলা-সাধার দৌরাত্ম্যে সারা দিনের খাটা-খাটনীর প এ অঞ্চলে কেউ চোখের পাতা এক করতে পারছে না!

একটা ভালো কাজের বিরুদ্ধে পাড়াসুদ্ধু সবাই যে একতাবদ্ধ হতে পারে, এই তিক্ত অভিজ্ঞতায় খোদন ঘেন্নায় গান গাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে!

এইবার খোদনচন্দ্র স্থির করলে, সে ছবি আঁকবে। যত্নের অসাধ্য কোনো কাজ নেই কাজেই নিজের বাড়ীতে বসে যত খুশী ছবি আঁকতে পারবে না কেন?

প্রচুর কাগজ এলো, রঙীন পেন্সিল, ক্রেয়ন কেনা হ'ল। সস্, জল রঙ্, তেল রঙ্—আয়োজনে কিছুই বাকি রইল না।

খোদনের খেলাধূলা বন্ধ হ'ল, ইস্কুল কামাই করতে সুরু করলে! পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ ক দিয়ে সে দিন-রাত পেন্সিল আর তুলি চালাতে লাগ্‌লো।

এক হপ্তা খাটুনীর পর সে এত ছবি এঁকে ফেল্লে যে, বাড়ীর লোকেরাই তার একাগ্রতা দে অবাক হয়ে গেল!

ওর চোখের জ্যোতি কমে যাবে—এই ভয়ে ঠাকুমা খোদনের জন্যে নিত্যি মাছের মুড়ো খাব ব্যবস্থা করে দিলেন।

ঠাকুর্দা ছেলেমেয়েদের আর খোদনের বন্ধুদের ধম্‌কে দিলেন,—কেউ যেন না ওর ছবি আঁকব সময় গোলমাল করে। কালে নিশ্চয়ই খোদন দেশের একজন নামকরা শিল্পী হবে, এ সম্পা কারো মনে আর কোনো সংশয়ই রইল না।

অবশেষে একদিন খোদনের কাকা ইস্কুলের ড্রইং টিচারকে ডেকে নিয়ে এলেন। তি অনেকক্ষণ ধরে খোদনের আঁকা রাশি রাশি ছবির মধ্যে ডুবে গিয়ে খানিকক্ষণ অভিভূতে মতো বসে রইলেন।

খোদনের ঠাকুর্দা উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এসে বল্লেন, কি রকম দেখ্‌ছেন মাষ্টার মশাই আমাদের খোদন নিশ্চয়ই একজন দেশবরেণ্য শিল্পী হবে?
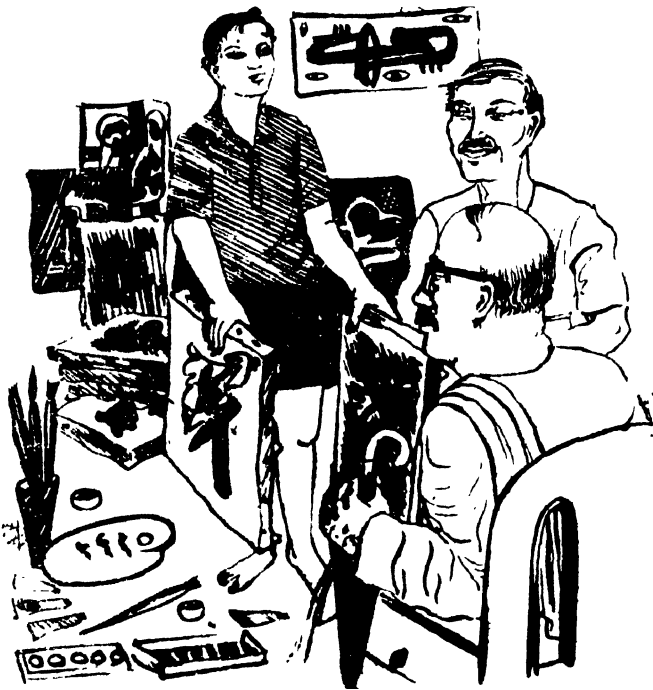
ড্রইং টিচার তার চশমাটা কপালের ওপর তুলে ধরলেন, তারপর মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু প্রত্যেকটি ছবির তলায় স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে—এটা ঘোড়া কি ব্যাঙ! নইলে লোকে বুঝ্‌বে কি করে?

খোদনের কাকা ড্রইং টিচারের জবাব শুনে প্রথমটা একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। তারপর মুখখানা বাঁকা করে শ্লেস দিয়ে বল্লেন, মডার্ণ আর্টের কোনো খবরই দেখ্‌ছি মাষ্টার মশাই রাখেন না! ছবি দেখে সহজভাবে বোঝা যাবে—কলা আর মূলো—খোদনের আর্ট কিন্তু সে স্তরের নয়। আপনি সেকেলে মানুষ, হয়ত মডার্ণ আর্টের কোনো খবরই রাখেন না!

ড্রইং টিচার উত্তর দিলেন, তা হয়ত হবে। না হয় আমার চোখের দোষ হয়েছে!

আর কথা না বাড়িয়ে শিক্ষক মশাই নিজের ছাতাটা হাতে নিয়ে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

কিন্তু রাগে ফেটে পড়ল খোদনচন্দ্র। রঙ তুলি ছড়িয়ে ফেলে, আঁকা ছবিগুলো ছিঁড়ে কুটিকুটি করে একেবারে হুলুস্থূল কাণ্ড বাঁধিয়ে বসল।

বল্লে, না, আর আমি ছবি আঁকবো না।

ঠাকুর্দা ছুটে এলেন, ঠাকুমা ছুটে এলেন। বল্লেন, তা হলে তুই ইস্কুলে যাওয়াই সুরু কর। মিছিমিছি বাড়ীতে বসে থেকে সময় নষ্ট।

খোদন ফোঁস করে উঠ্‌ল,—ওই ইস্কুলে আমি যাবো ভেবেছ? যেখানে আমার ছবির আদর নেই, সেখানে আর আমি যাচ্ছি নে!

ঠাকুর্দা বল্লেন, তা হলে তুই কি করবি শুনি? ষাঁড়ের গোবর হয়ে চুপচাপ বসে থাক্‌বি?

খোদনের মাথায় তখন নতুন প্ল্যান এসেছে। মাথা দুলিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে বল্লে, আমি বাগান করবো।

যে কথা সেই কাজ!

খোদনচন্দ্র বাগান করার কাজে লেগে পড়ল। বাড়ীর পেছনে একটা বাগান আগে থেকেই ছিল। খোদন কোদাল নিয়ে, মালকোচা মেরে মাটি কোপাতে সুরু করে দিলে। ফুল তাকে ফোটাতেই হবে। নানা রকম সার এনে খোদন বাগানের মাটিতে মেশাতে সুরু করলে। এক বন্ধু এসে পরামর্শ দিলে, এন্‌তার চুন মিশিয়ে দে সারের সঙ্গে। তা হলে যেকোনো ফল-ফুলের গাছ ফন্ ফন্ করে বেড়ে উঠ্‌বে। ফুল-ফলও ফলাবে প্রচুর।

ফুল ফোটাবার মূলমন্ত্র পেয়ে খোদন সারের সঙ্গে রাশি রাশি চুন মিশিয়ে দিলে।

এর আগেই খোদনের ঠাকুর্দা তাঁর সখের বাগানে অনেক দামী দামী গাছ লাগিয়েছিলেন। এইবার সেইসব গাছের গোড়া খুঁড়ে খুঁড়ে চুন ঢেলে দিতে—দু'দিনের মধ্যেই অমন সুন্দর সুন্দর গাছগুলি শুকিয়ে একেবারে আম্‌শী হয়ে উঠ্‌লো।

ব্যাপার দেখে ঠাকুর্দা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বল্লেন, ঢের হয়েছে। এইবার ক্ষ্যামা দাও। তোমায় আর বাগান করে আমার পিণ্ডি চট্‌কাতে হবে না।

কাজেই খোদনচন্দ্র ছেড়ে দিলে ও পথটাও। বদলে ফেললে মতলবটা।

তারপর কয়েকদিন ধরে খোদনের দেখাই পাওয়া যায় না। পাগলের মতো কোথায় যে ঘোরে—কেউ তার হদিশ পায় না। অবশেষে বাড়ীর সবাই একদিন অবাক হয়ে দেখলে, খোদনচন্দ্র একটি ময়না যোগাড় করে নিয়ে এসেছে। দিনরাত্তির ঘরের দরজা বন্ধ করে ময়নাকে বল্‌ছে,—পড়ো, ময়না পড়ো—

ভালো কাজ করিবার বহুৎ বাধা—
কৃষ্ণ নাম সাথে তুমি বলিও রাধা।

ঠাকুর্দা মাথা নেড়ে বল্লেন, এইবার আসল বাতিক হয়েছে খোদনের।

কাগ কেন কোকিলের ডিম ফোটায়

পরিতোষকুমার চন্দ্র

আজ থেকে বহুযুগ আগের কাহিনী। সে সময় মানুষ, পশু ও পাখি, সবাই সবার কথা বুঝতে পারতো। আর প্যাঁচাও তখন অন্য সব জাতের পাখির মতন দিনের বেলাতেই উড়ে বেড়াতো, এখনকার মতন দিনের বেলায় গাছের অন্ধকার কোটরে লুকিয়ে থাকতো না।

সেই সময়ে একদিন সকালে একটি দুষ্টু ছেলে একটা প্যাঁচাকে লক্ষ্য করে গুলতি ছুঁড়েছিল। ভাগ্যক্রমে গুলতির গুলিটা প্যাচার ন্যাজের গোড়ায় পালকের মধ্যে আটকে যাওয়ায় মরলো না বটে,. কিন্তু যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো। অবশেষে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে প্যাঁচা তার বন্ধু কাগের কাছে গিয়ে তার বিপদের কথা বলে বললো, ভাই আমাকে বাঁচাও।

প্যাচার কথা শুনে কাগ বললো, ভাই, আমি তোমার কিছুই করতে পারবো না, কারণ আমি ডাক্তার নই। তবে তোমাকে কোকিলের কাছে নিয়ে যেতে পারি। সে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার। আমার বিশ্বাস সে তোমাকে ভাল করে দিতে পারবে।

প্যাচা রাজী হতে কাগ তাকে নিয়ে কোকিলের ডাক্তারখানায় গেলো এবং বন্ধু প্যাচার চিকিৎসা করতে অনুরোধ করলো। কোকিল কিন্তু রাজী হলো না। সে বললো, দেখুন, উনি আপনার বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু ওর মতন ধড়িবাজ ও বদ্‌মেজাজী পাখি পক্ষীরাজ্যে আর দুটি নেই। আমাকে মাপ করুন, আমি ওঁর চিকিৎসা করতে পারব না, কারণ আমি ঠিক জানি উনি আমার ফী দেবেন না। আমি ওঁকে ভালভাবেই চিনি।

কোকিল-ডাক্তারের কথা শুনে কাগ বললো, ফীর জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ওর হয়ে জামিন রইলুম। প্যাঁচা যদি ফি না দেয়, তবে সেটা আমিই দেবো। আপনি অনুগ্রহ করে চিকিৎসা শুরু করুন। বেচারী বড্ডই কষ্ট পাচ্ছে।

কাগের কথা বিশ্বাস করে কোকিল প্যাঁচার পরীক্ষা করে দেখলো এবং বললো, যতক্ষণ না

যন্ত্রণা কমে যায় ততক্ষণ নদীর জলে ন্যাজটা ডুবিয়ে বসে থাকবেন। এছাড়া আপনার আর কোনো চিকিৎসার দরকার হবে না।

ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী প্যাঁচা উড়ে গিয়ে নদীর জলে ন্যাজ ডুবিয়ে বসে রইলো। জলে ভিজে নরম হতে হতে গুল্‌তি থেকে ছোঁড়া মাটির গুলিটা এক সময়ে গলে গেলো,—অত যে যন্ত্রণা তার চিহ্নমাত্র রইলো না। প্যাঁচা তখন ভাবলো, আমি কি বোকা! যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটে না গিয়ে একটু যদি ভেবে দেখতুম, তা হলে এই বুদ্ধিটা আমার মাথাতেও নিশ্চয়ই আসতো। ওষুধ নেই বিষুধ নেই, শুধু জলে ন্যাজ ডুবিয়ে রাখো,—এই হলো তো চিকিৎসা!—এর জন্যে ফি দেবো, না কচু দেবো।

সারাদিন কেটে গেলো, বিকেল হলো, প্যাঁচার কিন্তু দেখা নেই। কোকিল ভাবলো, যাই, রুগী কেমন আছে দেখে আসি, আর অমনি ফীটাও নিয়ে আসি। প্যাঁচার বাড়ী গিয়ে কোকিল দেখলো তার রুগী ভালো হয়ে গেছে, এখন ফীটা পেলেই হয়। ডাক্তারদের সরাসরি ফী চাওয়ার রেওয়াজ নেই। কোকিল-ডাক্তারও তাই ফী পাবার প্রত্যাশায় প্যাঁচার সঙ্গে একথা-সেকথা বলে সময় কাটাতে লাগলো। এই ভাবে বেশ কিছু সময় কেটে যাবার পরেও যখন ফী দেবার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না, তখন সে যে ফীর জন্যেই অপেক্ষা করছে আভাষে সেটাকে জানিয়ে দিলো, কিন্তু সেটা যেন বুঝতেই পারেনি এমনি ভাব দেখিয়ে প্যাঁচা আজে-বাজে কথা নিয়েই আলাপ চালিয়ে যেতে লাগলো। তাতে বেশ একটু বিরক্ত হয়ে কোকিল স্পষ্ট করেই ফী চেয়ে বসলো।

প্যাঁচা যেন আকাশ থেকে পড়লো। গোল চোখ দুটো কুঁচকে ছোট করে বললো, ফী? কিসের ফী? ওষুধ দিলেন না, কিছুই করলেন না,—শুধু বললেন জলে ন্যাজ ডুবিয়ে রাখুন। শুধু এই কথাটির জন্যেই আপনাকে ফী দিতে হবে? একজন হাতুড়েও এই উপদেশ দিতে পারতো। এই সামান্য উপদেশটুকুর জন্যে ফী চাইতে আপনার লজ্জা করলো না? প্যাঁচা ঠোঁট হাঁ করে বিকট আওয়াজ ছেড়ে ডানা ঝটপট করে নেড়ে ভয় দেখিয়ে কোকিলকে তাড়িয়ে দিলো।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, তাই কোকিল-ডাক্তার বাধ্য হয়ে তার বাড়ীতে ফিরে গেলো: কিন্তু পরের দিন সকাল হতেই সে কাগের বাড়ীতে যেয়ে তাকে বললো, আচ্ছা এক রুগী নিয়ে গিয়েছিলেন মশাই! সারা দিনের মধ্যে আমার ফী দিতে আসছে না দেখে কালই বিকেলের দিকে আপনার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিলুম। দেখলুম, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন: কিন্তু ফী চাইতেই একেবারে রেগে টং। আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন।

কোকিলের মুখে প্যাঁচার অভদ্রোচিত আচরণের কথা শুনে কাগ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

বললো, দেখুন ডাক্তারবাবু, আমার কিন্তু মনে হয় আমার বন্ধুটি আপনার সঙ্গে একটু রসিকতা করেছেন। আমার সঙ্গে আর একবার সেখানে চলুন, আমি আপনার ফী আদায় করে দেবো।

কোকিলকে সঙ্গে নিয়ে কাগ প্যাঁচার বাড়ী গিয়ে দেখতে পেলো দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলছে। তাই দেখে কাগ বললো, তাইতো! দরজায় তালা দিয়ে বন্ধুটি কোথায় গেলো?

ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে কোকিল কাগকে বললো, আপনার বন্ধু কোথায় গেলেন তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার দরকার নেই, আর সময়ও নেই। আপনি যখন তাঁর হয়ে জামিন আছেন তখন আপনিই অনুগ্রহ করে আমার ফীটা দিয়ে দিন, আমি বাড়ী চলে যাই।

কাগও ফী দিতে রাজী হলো না। মুচকি হেসে বললো, বাঃ, বেশ মজার কথা বললেন তো! আপনি করলেন প্যাঁচার চিকিৎসা, আর তার জন্যে ফী দেবো আমি? তাছাড়া আমি দেবোই বা কোথা থেকে? আমি একেবারে কপর্দকহীন নিঃস্ব। একটা কানাকড়িও দেবার সামর্থ্য আমার নেই।

ফী আদায়ের কোনো আশা নেই দেখে কোকিল আদালতে গিয়ে কাগের বিরুদ্ধে নালিশ করে বললো, ধর্মাবতার, ন্যায় বিচার করুন। আমার ন্যায্য ফীটা আদায় করার ব্যবস্থা করুন।

কোকিলের মুখে সব কথা শুনে জজসাহেব রায় দিলেন—"যেহেতু কাগ তার বন্ধু প্যাঁচার জামিন দাঁড়িয়েছিল, সেহেতু কাগই কোকিলের ফী দিতে বাধ্য, কিন্তু কপর্দকহীন হওয়ায় কাগ যখন ফীর টাকা দিতে পারবে না বলছে, তখন কাগকে কায়িক পরিশ্রম দিয়ে কোকিলের ফীর টাকা পরিশোধ করতে হবে। আমি তাই আদেশ দিচ্ছি যে, এখন থেকে কোকিল কাগের বাসায় ডিম পাড়বে, আর কাক সেই ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাবে এবং বাচ্চারা বড় না হওয়া পর্যন্ত তাদের খাওয়াতে বাধ্য থাকবে।"

জজসাহেবের রায় যখন কাগজে জানানো হলো, তখন তাকে এই ঝামেলায় ফেলার জন্যে সে প্যাঁচার ওপর ভীষণ খাপ্পা হয়ে গেলো। তাকে দেখতে পেলেই খুন করবে এই প্রতিজ্ঞা করে কাগ প্যাঁচার খোঁজে ঘুরতে লাগলো। এদিকে অন্য পাখিদের মুখে কাগের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে প্যাঁচা তখনই তার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে গাছের কোটরে ঢুকে লুকিয়ে রইলো। কাগের ভয়ে সে দিনের বেলায় বাইরে বেরুনোই ছেড়ে দিলে। রাত্রে যখন কাগ ঘুমোতো তখনই খাবারের সন্ধানে সে কোটর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতো।

সেই কোন্ অতীত কালে একটা দুষ্টু ছেলের অপকর্মের ফলে পক্ষিজগতে যে ওলোট-পালট হয়েছিল তার জের আজও চলছে। আজও কাগ কোকিলের ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাচ্ছে এবং আজও প্যাঁচাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাগের ভয়েই প্যাঁচা এখন নিশাচর।*

* ব্রহ্মদেশীয় উপকথা।

কবি ছোড়দার কীর্তি

শ্রীবিমল দত্ত

বড়বাড়ীর ছোড়দা শুধু যে একজন স্বভাবকবি ছিলেন, তা নয়। তাঁর প্রতিভা নানা দিকে ফুটে বেরুতো। যা কিছু করতেন তিনি সব অবলীলায়, বিনা দ্বিধায় অতি সহজে এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে বেমালুম করতেন।

সেদিন ছিল বর্ষার দিন। ছোড়দাকে কিনে আনতে বলা হয় একটি দুষ্প্রাপ্য রোগীর পথ্য! ছোড়দাকে যেতে হবে এসপ্লানেডের মোড়ে। এখানে ছিল ঠিক লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মুখে মস্ত এক সাহেবী ভ্যারাইটিজ্ ষ্টোর—নাম হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকান।

বৃষ্টি থামলেই ছোড়দা আমাকে বললেন, "এই আয়, জামাটা গায়ে গলিয়ে—চ একটু বেড়িয়ে আসি।"

"কোথায় যাবে?"

"আরে সাহেব পাড়া—চ' চ'—ওদের হাওয়া গায়ে লাগলে ভালো ইংরেজী শিখবি—"

বেড়াতে যাবার আনন্দে তৈরী হয়ে এলাম। ছোড়দা ত সদাই প্রস্তুত।

"ছাতা নিলে না?"

"ছাতা কি হবে? কোথায় ফেলে আসবো—তার চেয়ে চ' যদি কারো ছাতা বাগাতে পারি।"

"তার মানে?"

"মানে, মনের ভুলে অন্যের ছাতা নিজের বলে নিয়ে আসবো।"

"সত্যি?"

"আরে দ্যুৎ। ইচ্ছে করে কি কেউ তা করে? তবে ভুলও ত হ'য়ে যেতে পারে।"

"নে চ।"—

বেরিয়ে পড়লাম। বৃষ্টি থেমেছে। চলেছি পায়ে হেঁটে বেশ উৎসাহভরে। কিন্তু ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত যেতে না যেতেই এল বৃষ্টি ঝম্‌ঝমিয়ে।

একটা ট্রাম এসে দাঁড়াল। ছোড়দা বললে, 'উঠে পড় খপ্ করে।"

ট্রাম-ভর্তি লোক। আমরা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে। ট্রাম চললো ঝক্কাঝক্ ঝক্, হ্যাচাং, হ্যাচাং···

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করছে। আরো দুটো ষ্টপেজ বাকী—। ট্রাম থামতেই ছোড়দা নাম্‌বার উদ্যোগ করলে—আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "নেমে আয়।"

নেমে এলুম। বললুম, "এখান থেকে ত অনেক দূর—"

"দুর বোকা—এটুকু হাঁটতে হবে—দেখলি না কণ্ডাকটার আসছে? আর দেরি করলে ভাড়া আদায় করতো—"

"ভাড়া দাওনি?"

"চাইলে ত দেব? পয়সাটা বাঁচল, দু'জনে খাওয়া যাবে।"

সাহেবদের দোকানে জিনিস কেনা হ'ল। সাহেব আমার দিকে দেখিয়ে ছোড়দাকে বললে, "এ ওয়াটার প্রুফ ফর দি বয়? দি বয় ইজ্ কোয়াইট্ ড্রেঞ্চ্‌ড্—(ছেলেটার জন্যে একটা বর্ষাতি দেব কি? ছেলেটা একেবারে ভিজে গেছে)।

ছোড়দা বলে উঠল, "নীড্ নট্ ওয়ারি—হি ইজ ওয়াটার প্রুফ—। (ভাবনার কারণ নেই ও জলে ভেজে না)।

সাহেব হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো।

আবার ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে হণ্টন। একটু বৃষ্টি থেমেছিল আবার ঝাঁকিয়ে এলো বুঝি।

ছোড়দা হঠাৎ বললে, "আয় এই দোকানে কিছু খেয়েনি—ট্রামের পয়সা কটার সদ্ব্যবহার করা হোক্।"

কচুরী, সিঙ্গাড়া নিমকি, জিবেগজা, ঢাকাই পরোটা, খাজা, অমৃতী, দরবেশ, মিহিদানা, ক্ষীরের প্যাড়া আহা সব কি পরিপাটী করে থালায় সাজানো খাবারের পিরামিড—ইফেল্ টাওয়ার, মনুমেণ্ট, সাঁচী স্তূপ—

বেঞ্চে টেবিলে বসে অনেকে খাচ্ছে—একমনে। ছোড়দা ভুঁড়িওয়ালা দোকানদারকে খাবারের অর্ডার দিয়ে নিজেই দুঠোঙা খাবার নিয়ে, আমাকে নিয়ে একটা বেঞ্চে বস্‌লো খেতে।

ক্রমশঃ ভিড় বাড়ছে। লোক আসছে, যাচ্ছে।

ছোড়দা দেখি খাচ্ছে আর আপন মনে মুচকি মুচকি হাসছে।

এ হাসি আমি অন্ততঃ চিনি। এ হাসি পেটুকের হাসি নয়, এ হাসি ওস্তাদি খেলোয়াড়ের হাসি—দাবার চালের হাসি—ঘোড়ার উটকিস্তি দিয়ে রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করার হাসি।

বললুম, "হাসছ যে!"

ছোড়দার গোঁফ ফসকে আরো নিঃশব্দ হাসির ঝরনা।

খেতে খেতে ছোড়দা একটা নিমকি দিয়ে সামনে একটা দিক দেখিয়ে দিলে।

চেয়ে দেখি লেখা রয়েছে, "খাইবার পূর্বে দাম দিবেন।"

এ দেখে এত হাসির কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে, বোকার তিনবার হাসির প্রথম দফা তখনি হেসে ফেল্‌লাম।

খাওয়া শেষে আঁচাতে গেলাম। আঁচিয়ে এসে রুমালে মুখ মুছছি—ছোড়দা বললে, "হাঁদার মত দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? বাড়ী যেতে হবে না?"

দাঁড়িয়ে ছিলাম ছোড়দা দাম দিয়ে আসবে সেই প্রতীক্ষায়। খাবার কেনার সময়ে (অর্থাৎ খাইবার পূর্বে) ছোড়দা যে দাম দেয়নি তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম।

কিন্তু ছোড়দা দিল একটান হাত ধরে। ফুট পাথে নেমে এলাম। চলতে লাগ্লা ছোড়দার সঙ্গে।

ছোড়দা বললে, "ওরা ভেবেছিল আমরা ভিজে গেছি, তাই প্রথমে দাম নেয়নি। পরে ভেবে ওরা বোধহয় আগেই দাম দিয়েছে। তাই হাস্ছিলাম।"

এতক্ষণে ছোড়দার চাতুরী বুঝে বোকার দ্বিতীয় হাসিটি হাসলাম। এবং তার পরেই তৃতী হাসি।

সুচতুর ছোড়দা সেদিন বাড়ী এসে আমাকে বললে, "আবার একদিন হবে 'খন। পয়সাটা রইল। বুঝলি! এ জন্মে নরকে যেতে হলে তবু একলা যেতে হবে না—তোকে সঙ্গী পাবো।"

বলে, ছোড়দা দারুণ বাজখাঁই গলায় হেসে উঠল।

মনোজ হাসির শব্দে এসে জুটলো। মনোজ আমার ভাগনে।

বললে, "ছোটমামা এত হাস্‌ছ কেন?"

ছোড়দা এবার পদ্যে উত্তর দিল—

"একদা কোন এক মশার পেট থেকে
বেরিয়ে এল এক হাতী—
মশা ত' তাজ্জব! ও বাবা এ কী রে?
কে তুই? পাহাড়ের নাতি?
হাতী সে শুঁড় নেড়ে কহিল বৃংহিতে
"না গো না, আমি অতি ক্ষুদ্র
মশার বংশের ওসার বাড়িয়েছি
আমি, শ্রীশ্রীমশামা'র পুত্র।"

মনোজ ক্ষেপে গেল বললে, "আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাওনি কেন?"

ছোড়দা বললে, "তুই ভীতু আর বোকা—তোকে নিয়ে বাইরে গেলে পদে পদে বিপদ।"

দমল না মনোজ। বললে, "কিন্তু গেছলে কোথায়?"

ছোড়দা আমাকে চোখ টিপে বললে, "ভোজ রাজ্যে—"

আমি বললাম, "কয়েকটি ভোজবাজী দেখিয়ে এলাম।"

ছোড়দা অর্থপূর্ণ হেসে বললে, "ঠিক—ঠিক বলেছিস্।"

মনোজ বুঝলো এ রহস্য জানা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সরে পড়লো।

এরপর কয়েক দিন কেটে গেছে। হঠাৎ ছোড়দা একদিন বিকেলে বললে, "সে পয়সা ক'টা খরচ করে আসি চ'। সে পয়সা মানে সেই ট্রামের-ভাড়া বাঁচানো পয়সা। ছোড়দা ওদিক দিয়ে ভারী সৎ। নিজে ও পয়সা একা খরচ করেনি। সাকরেদকে ফাঁকি দেওয়া ওর ধর্মে নেই।

এবার চলি মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্ ধরে। সেই মহীষাসুরের পরোটার দোকানে। বিরাট কালো লোকটি যত পরোটা সেঁকে ততই ঘামে।

ভিতরে চৌকো চৌকো টেবিল। পরোটা আর মটর-কুমড়ো ও আলুর ঘ্যাঁট্। একটা পরোটা আর এক ডাবু ঘ্যাট্ দু' পয়সা। সে ১৯২২ সালের কথা কিনা?

আমরা ভিতরে ঢুকে দুটো চৌকো টেবিলে শালপাতা পেতে বেশ জাঁকিয়ে পরোটা আর

ঘ্যাট্ এবং মাঝে মাঝে আদার চাটনি খেতে লাগ্‌লাম। ভিড় এদিকে বাড়ছে। দীয়তাং, ভুজ্যতাম্ বেশ ভরপেট খেয়ে ছোড়দা বললে, "ওঠ আর না, পেট কেটে গেলে আবার মুচিকে পয়সা দিতে হবে পেট সেলাই করতে—কি বলো দোকানী?"

দোকানী হেসে উঠলো—কিন্তু কথা কইবার ফুরসৎ কোথা তার—কেবল খদ্দের আর খদ্দের—

ছোড়দা বললে, "মশ্‌লা দিলে না?"

দোকানী এক মুঠো মশলা দিল। ছোড়দা মুখে ফেলে চিবুতে চিবুতে বললে, "আয়, মশলা খা।" বলেই দোকান থেকে নেমে দোকানদারের সামনে দিয়ে সটান বুক ফুলিয়ে হেঁটে এসে ফুটপাথে নামলো।

এবারেও পয়সা-টয়সা একটাও খরচ হ'ল না।

আমি তবু ছোড়দাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "পয়সা দাওনি?"

ছোড়দা বললে, "দূর পয়সা কিসের? নরকে ত যেতেই হবে—তবে ফুক্ করে একদিন গিয়ে কি লাভ, বেশ কয়েক মাস যাতে থেকে আসতে পারি তার ব্যবস্থা করে রাখছি—"

আমি হেসে উঠলে ছোড়দা বললে, "হাসি না, অনেক সার্কাস দেখা যাবে, দেখিস্ নি বটতলার নরকের ছবি—ভারী মজার"—

আমি ভয় পেয়ে বললাম, "কিন্তু যদি কড়ায় করে ভাজে গরম তেলে?" ছোড়দা বললে, "দূর ইডিয়ট্—তার আগেই ত আমরা মরে যাবো—জ্যান্তে ত নরকে যাবো না!"

"কিন্তু মরার পরে?"

"তখন শরীরই থাকবে না—হাওয়া হয়ে হুশ্ করে নরকের এক দরজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে ফুস্ করে বেরিয়ে আসবো।" বলে ছোড়দা শিস দিয়ে একটা ইংরেজী গানের গৎ বাজাতে বাজাতে চললো।

এরপর আবার একদিন বের হলুম ছোড়দা ও আমি। এবারও ট্যাকে সেই ট্রামের ভাড়া ফাঁকি দেওয়া পয়সা।

এবার ডালপুরীর দোকান। বর্তমানে যেখানে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে জুতার ব্লক, ঐখানে আগে সব খোলার চালের দোকান ছিল। সেখানে একটা খাশা ডালপুরীর ও ভাজির দোকান ছিল।

দুই ভাই ত গুড্‌বয়ের মত দাঁড়ালাম। ছোড়দা ডালপুরী ও ভাজি নিয়ে সবে বেঞ্চিতে বসতে যাবে, এমন সময়ে দোকানদারের একটি 'বয়' এসে বললে, "বাবু, পয়সাটা আগে দিয়ে দিন ত!"

ছোড়দা চমকে উঠে বললে, "পয়সা? ও আগে দিইনি বুঝি? এই নাও।" বলে বহুকষ্টে পয়সা ক'টা বার করে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো—

খেতে খেতে বলতে লাগ্‌ল, "অন্ত শেষ রজনী—আর হ'ল না রে—"

এই গল্প পড়ে তোমাদের অনেকে স্থনীতি-তুর্নীতির প্রশ্ন তুলবে জানি। আমরাও অনেক ভেবেছি এ বিষয়ে।

কিন্তু কোন দিনই তখন মনে হয়নি—এমন কিছু একটা গর্হিত অন্যায় করছি—পথ-চলতে এমনি ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে পড়ে—এগুলোই ছিল তখন আমাদের পরাধীন জীবনে মস্ত বড় রোমাঞ্চকর য্যাড্‌ভেঞ্চার।

একে আমরা চুরি বলে মনে করতুম না, ভাবতুম চাতুরী। তোমরা কি বলবে—চুরি না চাতুরী!"

কাশ্মীর যুদ্ধে আমাদের জোয়ানরা
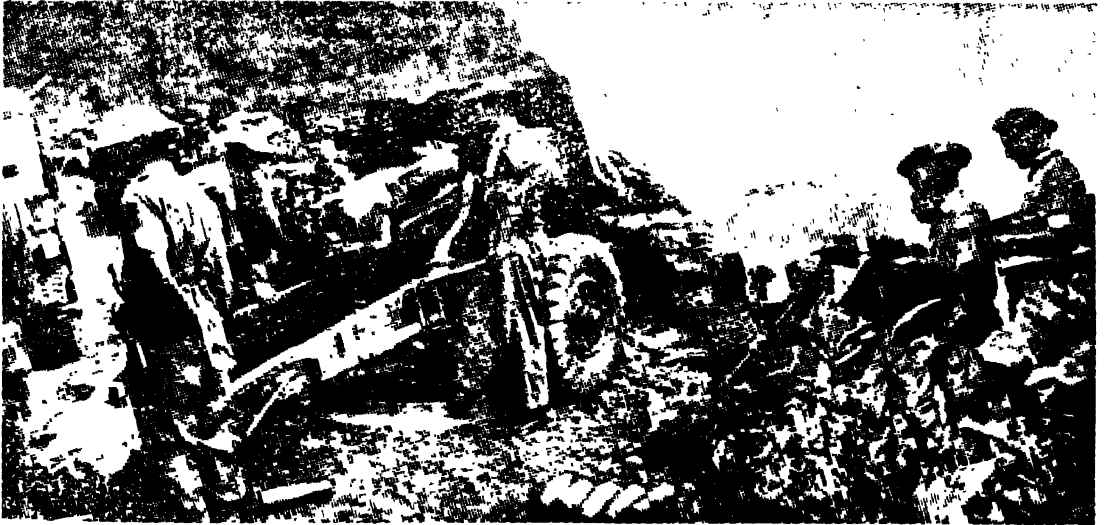
উরি-পুঞ্চ পার্বত্য অঞ্চলের শীর্ষদেশে সর্বোচ্চ বিদোরী ঘাটিটি পাকিস্তানের কাছ থেকে দখল করে নিয়ে, সেখানে আমাদের জোয়ানরা একটি কামানকে নির্দিষ্ট জায়গায় বসাচ্ছেন এবং কয়েক-জন অফিসার জায়গাটির সামরিক গুরুত্ব পর্যবেক্ষণ করেছেন।

বিদোরীর উচ্চতা সমতল ভূমি থেকে ১২,৩০০ ফিট।

প্ল্যানিটেরিয়াম

★ শ্রীসুকুমার বিশ্বাস ★
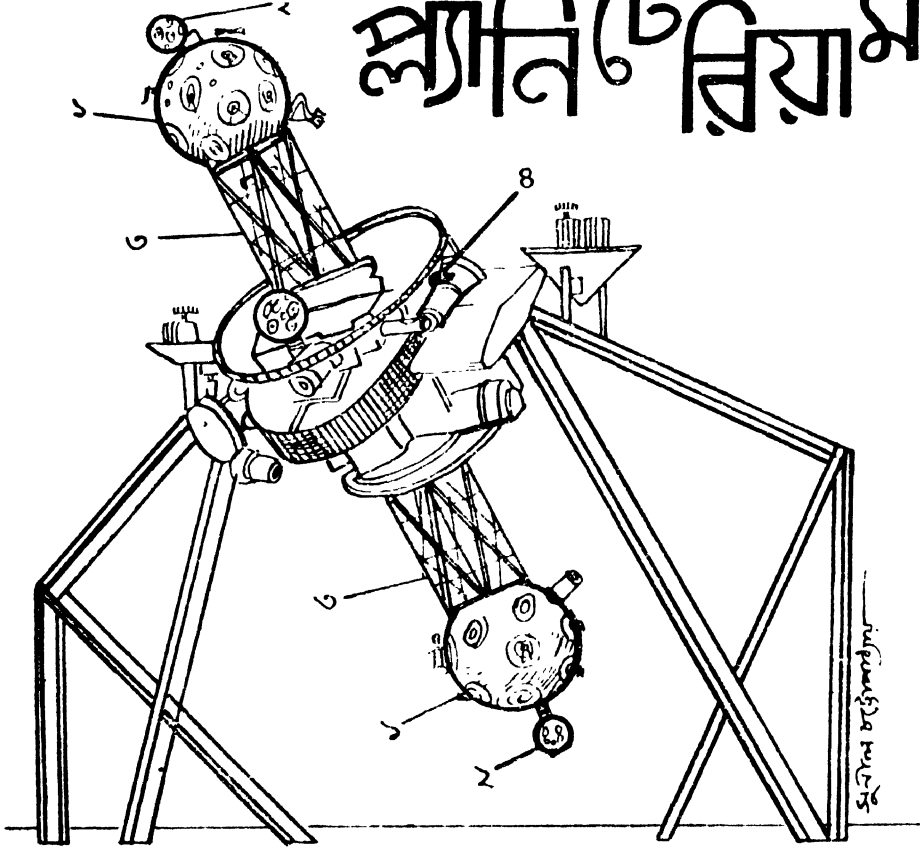
[(১) এই ধাতব গোলকটির মধ্যে ১৭টি প্রজেক্টর আছে ; তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আছে ১৬টি করে যান্ত্রিক সাটার। (২) এই গোলকটি থেকে সুপরিচিত নক্ষত্রপুঞ্জের নামগুলি গম্বুজের ওপর প্রক্ষেপ করা হয়। (৩) এই প্রজেক্টরগুলি থেকে সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহগুলিকে দেখানো হয়। (৪) এখানে স্থাপিত মোটরের সাহায্যে নক্ষত্রপুঞ্জের চলাচল দেখান হয়।]

তখনও প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়নি।

মিউনিকের বিখ্যাত কারিগরী যাদুঘরের অধ্যক্ষ ডাঃ অস্কার ভন মুলার কিছুদিন ধরে ভাবতে শুরু করেছেন, আকাশের এই যে অগণ্য নক্ষত্ররাজি এদের কোন রকমে কৃত্রিমভাবে দেখানো যায় না! চশমা, দূরবীক্ষণ যন্ত্র, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির নির্মাতা হিসাবে জার্মানীতে জাইস কোম্পানীর তখন খুব নামডাক। তাদের খ্যাতি তখন বিশ্বজোড়া।

ডাঃ মুলার একদিন সেই কোম্পানীর এক কর্তাকে ডেকে নিজের ভাবনা-চিন্তার কথা

খোলাখুলি বললেন। বললেন, এমন একটি যন্ত্র তৈরী করতে হবে, যার সাহায্যে রাত্রির আকাশকে যতদূর সম্ভব বাস্তবভাবে দেখানো সম্ভব হবে।

জাইস কোম্পানী প্রথম যে মডেলটি তৈরী করেন, তাতে দর্শকেরা একটি বিরাট গোলকের মধ্যে বসতেন। সেই গোলকটির মধ্যে ছিল অনেক ছিদ্র। সেই ছিদ্রগুলি দিয়ে বাইরের উৎস থেকে আলো আসত এবং এইভাবে একটি নক্ষত্রখচিত আকাশের বিভ্রান্তি দর্শকের মনে সৃষ্টি হ'ত। আকাশে নক্ষত্রগুলির গতিকে বোঝাবার জন্যে গোলকটিকে ঘোরানো হ'ত।

তারপর ১৯১৪ সালের অগাষ্ট মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হ'ল। জার্মানী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। সে সময় প্ল্যানিটেরিয়াম নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা মাথা ঘামান, এটা সরকারের মনঃপূত হ'ল না। সুতরাং কাজ বন্ধ রাখা হ'ল।

তারপর একদিন যুদ্ধ শেষ হ'ল। তখন জাইস কোম্পানীর কর্তা ডাঃ ওয়াল্টার বয়ার্সফেল্ড। তিনি একটি নতুন ধরনের যন্ত্র তৈরী করলেন। এই যন্ত্রে প্রাক্-যুদ্ধ আমলের চলমান গোলকের পরিবর্তে একটি স্থির গোলার্ধ দেওয়া হ'ল। নক্ষত্রগুলিকে গোলার্ধের ভিতরের দিকে প্রেক্ষা-গৃহের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত ম্যাজিক লণ্ঠনের মত প্রজেক্টর বা আলোবিকিরণযন্ত্রের সাহায্যে দেখানো হ'ত। এই ধরনের প্রথম যন্ত্রটির নির্মাণ সমাপ্ত হয় ১৯২৪ সালে। সেটিকে জেনা-য় অবস্থিত জাইস কোম্পানীর কারখানার ছাদে স্থাপন করা হয়।

সেই শুরু। তারপর জাইস কোম্পানী আরও উন্নত ধরনের যন্ত্র নির্মাণ করেন। আজ পৃথিবীতে মোট প্ল্যানিটেরিয়ামের সংখ্যা মাত্র ত্রিশটি। আমাদের এই কলকাতায় চৌরঙ্গী রোড ও থিয়েটার রোডের সংযোগস্থলে একটি প্ল্যানিটেরিয়াম আছে। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত সেখানকার প্রদর্শনী দেখেছ।

প্ল্যানিটেরিয়াম বা গ্রহ-গৃহের ছাদটি হয় গম্বুজের মত। তার ভিতরের ছাদটি সাধারণতঃ ষ্টেইনলেস ষ্টিল দিয়ে নির্মিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার অ্যালুমিনিয়ামও ব্যবহার করা হয়। প্রতিধ্বনির সৃষ্টি যাতে না হয়, তার জন্যে তাতে আছে লক্ষ লক্ষ ছিদ্র।

আগেই বলেছি, নক্ষত্রগুলিকে দেখানো হয় ম্যাজিক লণ্ঠনের মত প্রজেক্টরের সাহায্যে। এই সমস্ত প্রজেক্টরের প্রত্যেকটিতে আছে একটি করে স্লাইড বা চিত্রাদি সংবলিত কাচ-খণ্ড। এইসব স্লাইডগুলির ওপর আঁকা থাকে অনেকগুলি নক্ষত্র বা তারকা। প্রজেক্টরগুলি এমনভাবে সাজিয়ে স্থাপন করা থাকে যে, তারা যে ছবিগুলি গোলার্ধের গম্বুজে ফেলে সেগুলিকে আপাত-দৃষ্টিতে অবিচ্ছিন্ন তারকাশোভিত বলে মনে হয়।

প্রদর্শনীর সুবিধার জন্যে আকাশকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—উত্তর ও দক্ষিণ। এক এক ভাগের নক্ষত্রগুলিকে দেখাবার জন্যে ষোলটি করে প্রজেক্টরের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক ভাগের

ষোলটি প্রজেক্টরকে পৃথক ধাতব-গোলকের মধ্যে এমনভাবে স্থাপন করা হয়, যাতে কেবলমাত্র তাদের লেন্সগুলিকে দেখা যায়। পরস্পরের সঙ্গে তারা দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে। দুটি গোলক প্রত্যেকের মধ্যে আছে উত্তর এবং দক্ষিণ আকাশের জন্যে ষোলটি করে প্রজেক্টর। ঐ গোলক দুটি একটি বেলনাকার কাঠামর দ্বারা যুক্ত থাকে। সুতরাং সম্পূর্ণ যন্ত্রটি দেখতে হয় একটি ডাম্বেলের মত। এই সম্পূর্ণ যন্ত্রটিকে মেঝেয় একটি কাঠামর ওপর স্থাপন করা হয়। এই কাঠামর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একটি সমতল অক্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকে। একটি মোটর এই অক্ষের ওপর সমগ্র যন্ত্রটিকে ঘোরাতে পারে।

ওই সব প্রজেক্টরগুলি প্রত্যেকটি দু'শ থেকে তিন'শ নক্ষত্র দেখায়। সমস্ত প্রজেক্টরগুলি দেখায় মোট প্রায় নয় হাজার নক্ষত্র। পরিচ্ছন্ন আকাশে খালি চোখে ওই রকম সংখ্যক নক্ষত্রই তুমি দেখতে পাবে। অবশ্য তুমি একই সঙ্গে ওই সমস্ত নক্ষত্র দেখতে পাবে না, কারণ যে-কোন সময়েই ওই নক্ষত্রগুলির অর্ধেক থাকবে দিগন্তের নীচে। তাছাড়া, দিগন্তের কাছে এসে নক্ষত্রগুলি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে; কারণ তাদের আলোকে আরও ঘন বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসতে হয়। এই জন্যে আকাশের খুব উঁচুতে না থাকলে অনেকগুলি অনুজ্জ্বল নক্ষত্র অদৃশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং যে কোন সময়ে, কৃত্রিম আলো থেকে অনেক দূরে, অত্যন্ত পরিষ্কার এবং চন্দ্রহীন রাত্রিতেও খালি চোখে তুমি তিন হাজার নক্ষত্র দেখতে সক্ষম হবে এর সম্ভাবনা খুব কম। আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র আছে সত্যি, কিন্তু টেলিস্কোপের সাহায্য ছাড়া তাদের দেখা সম্ভব নয়।

রাত্রি যত বাড়তে থাকে, নক্ষত্রগুলি তত পশ্চিমে সরে যায় বলে মনে হয়। নক্ষত্রগুলির এই গতিকে দেখবার জন্যে ডাম্বেলের মত যন্ত্রটিও তার অক্ষের ওপর ঘুরতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রগুলি পশ্চিমে সরে না। আসলে যা হয় তা হচ্ছে, পৃথিবী নিজের অক্ষের ওপর পূর্ব দিকে ঘোরে এবং নক্ষত্রগুলি আকাশে নিজের নিজের জায়গায় স্থির থাকে।

পৃথিবী থেকে মনে হয়, নক্ষত্রগুলি আকাশে একজোট হয়ে চলেছে। কিন্তু আসলে সূর্য তার নিজের পথে চলে, গ্রহগুলি ও চন্দ্রও চলে তাদের নিজেদের পথে। সুতরাং তাদের প্রত্যেকের জন্যে আলাদা প্রজেক্টরের প্রয়োজন হয়। এই প্রজেক্টরগুলি কক্ষ বা খাঁচার মধ্যে করে যন্ত্রের বেলনাকার অংশ, যা দুটি গোলককে যুক্ত করেছে, সেখানে স্থাপন করা হয়। সেখানে মাত্র পাঁচটি গ্রহের জন্যে প্রজেক্টর আছে—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি। অন্য গ্রহগুলিকে দেখানো হয় না, কারণ খালি চোখে সেগুলিকে দেখা যায় না।

সূর্যের জন্যে যে কক্ষ বা খাঁচাটি রয়েছে তার গতি খুব সরল। সমগ্র যন্ত্রটি বছরের ৩৬ দিনের জন্যে ৩৬৫ বার ঘুরলে, সূর্যের খাঁচার মধ্যে একটি বড় গিয়ার একবার ঘোরে। সূর্যের জন্য প্রজেক্টরটি সেটি গিয়ারের সঙ্গে যুক্ত থাকে; এর ফলে প্রেক্ষাগৃহের আকাশে একটি বিরাট উজ্জ্ব

থালার উদয় হয়। আসলে এক্ষেত্রে দুটি প্রজেক্টর থাকে; দুটি সূর্য নিখুঁতভাবে একটির ওপর আরেকটি পড়ে মিলেমিশে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়ে গম্বুজের ওপর জলজল করে। যদি একটি সূর্য থাকত তবে প্রদর্শনী চলাকালীন কোন কারণে প্রজেক্টরটি জলে গেলে বা যান্ত্রিক ব্যবস্থা হঠাৎ কার্যকরী না হলে প্রেক্ষাগৃহ থেকে সূর্য অদৃশ্য হ'ত। এই ব্যবস্থার ফলে প্রদর্শক নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, প্রদর্শনীর সমগ্র সময় ধরে সূর্য জলবে। সূর্যের জন্যে দুটি প্রজেক্টর রাখার আরেকটি কারণ হচ্ছে, দুটি সূর্য থাকার ফলে সূর্য কখনই মিটমিট করে জলবে না। প্রত্যেকটি গ্রহ এবং চন্দ্রের জন্যেই একই কারণে দুটি করে প্রজেক্টর আছে।

চন্দ্রের দুটি প্রজেক্টর একটি গিয়ারের সঙ্গে যুক্ত থাকে যা যন্ত্রটির প্রত্যেক ২৭⅓ বার ঘোরার পর একবার সম্পূর্ণ ঘুরে যায়। এর কারণ হচ্ছে, পৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবে ঘুরে একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রের কাছে আবার ফিরে আসতে চন্দ্রের ২৭⅓ দিন সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে সূর্য নক্ষত্রগুলির পশ্চাদপটে পূর্ব দিকে সরে গেছে। সুতরাং সূর্যকে ধরবার জন্যে চন্দ্রের আরও প্রায় দু'দিন সময় লাগে। চন্দ্রঘটিত অন্যান্য জিনিস দেখবার জন্যে, চন্দ্রের প্রজেক্টরগুলির মধ্যে আরও জটিল অনেক যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে।

প্ল্যানিটেরিয়ামে দুটি মোটর থাকে। এ দুটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে কিংবা পশ্চিম থেকে পূর্বে দুই বিভিন্ন গতিতে ঘোরে। এই ব্যবস্থার ফলে একটি সম্পূর্ণ দিনে নক্ষত্রের গতিবিধি সাড়ে দশ মিনিটে বা সাড়ে তিন মিনিটে দেখানো যায়। বিশেষ যন্ত্রিক ব্যবস্থায় এই সময়কে কমিয়ে এক মিনিটও করা যায়। কিন্তু প্রদর্শনীর সময় এই তীব্র গতি অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করবে বলে তা আর দেখানো হয় না। তবে ছাত্রদের এই গতিকে দেখানো হয়। কারণ তখন সময়টাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়—প্রদর্শনী কত উঁচু স্তরের হ'ল সেটা নয়।

নক্ষত্রগুলিকে স্থির অবস্থায় রেখে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলির প্রজেক্টরগুলিকে চালানো যায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন গতিসম্পন্ন তিনটি মোটর ব্যবহার করা হয়। একটি সম্পূর্ণ বছরকে তাদের প্রথমটি প্রায় তিন মিনিটে, দ্বিতীয়টি এক মিনিটে ও তৃতীয়টি ছয় সেকেণ্ডে দেখাতে পারে। এই মোটরগুলি সামনে বা পিছনে চালানো যায়। এদের সাহায্যে সুদূর অতীতের বা সুদূর ভবিষ্যতের আকাশকেও দেখানো যায়। যেমন ধর, যীশুখৃষ্ট যে রাত্রে জন্মেছিলেন সে রাত্রে আকাশে নক্ষত্রগুলির অবস্থান কেমন ছিল কিংবা আজ থেকে একশ বছর পরের এক রাত্রে তাদের অবস্থান কি হবে সেটি দেখানো সম্ভব।

ধূমকেতু দেখাবার জন্যে একটি বিশেষ প্রজেক্টর আছে। তার সাহায্যে নক্ষত্ররাজির মধ্যে দিয়ে ধূমকেতুর গমন এবং তার লেজটি কেমন করে প্রথমে উজ্জ্বল ও বড় হয়ে, পরে ক্রমে ক্ষীণ ও ছোট হয়ে গেল তা দেখানো যায়।

এসব ছাড়াও, এই যন্ত্রে অনেক প্রজেক্টর থাকে, যেগুলি সচরাচর প্রদর্শনীতে দেখানো হয় না। তাদের একটি হচ্ছে সাইক্লোমিটার প্রজেক্টর। যে মোটরগুলি আমাদের দ্রুত বছরগুলিকে অতিক্রম করে নিয়ে যায়, তাদের সঙ্গে এটি যুক্ত থাকে। মোটরগাড়ীর স্পীডোমিটারে যেমন লেখা হয়ে যায় মোটরগাড়ীটি কত মাইল ভ্রমণ করেছে, এই প্রজেক্টরটিও তেমনি একটি নির্দিষ্ট আকাশকে দেখে বলে দেয় কোন বছরে আকাশে নক্ষত্রের অবস্থান ওই রকম ছিল। বিশেষ ধরনের আরেক প্রস্থ প্রজেক্টরের সাহায্যে গগনের নিরক্ষবৃত্ত (equator) দেখানো যায়।

গ্রহণ, উল্কা, উল্কাপাত, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের নয়নাভিরাম রং এবং অন্যান্য ব্যাপার দেখাবার জন্যে প্ল্যানিটেরিয়ামের কর্মচারীরা নিজেরাই অনেক স্লাইড এঁকে নেন বা তৈরী করে নেন।

পূজার প্রার্থনা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পূজার দিনে কর এবার আনন্দে উছল।
আশীর্বাদে মাগো তোমার ফিরুক বুকে বল।
না হই যেন অবাধ্য আর
পাই মা ফিরে প্রীতি সবার
মুছতে পারি বাস্তুহারার দুই নয়নের জল।

চাই, হতে চাই পরিশ্রমী পিপীলিকার মত।
সাজ না করি কাজ করিব আমরা অবিরত!
কাটব পাথর, খুঁড়ব মাটি
ধরব লাঙল পরিপাটি
সার করিব সবাই মোরা আর্ত সেবার ব্রত।

মৌমাছিদের মতন যে ভাই কর্মী হতে চাই।
রবার্ট ব্রুসের অধ্যবসায় কেমন করে পাই?
সব্যসাচীর শক্তি দিয়ে
তুলসীদাসের ভক্তি দিয়ে
রামপ্রসাদের সুরে যেন দেশের গাথা গাই।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

এক মিনিটে বলতে হবে—(১) তোমার নাম; (২) একটার উপরে ওঠা নিয়ে হাঙ্গাম, আর একটার নীচে নামা নিয়ে হাঙ্গাম; (৩) রাত্রের প্রহরী। কোনটা ঠিক?—(১) (ই) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন; (২) (আ) প্রোটিন; (৩) (ই) ভেড়া। সত্যি না মিথ্যা?—(১) মিথ্যা; (২) সত্য; (৩) সত্য; (৪) মিথ্যা (ইহা ইকোয়েটারের ২৩½ ডিগ্রি উত্তরে অবস্থিত)।

দেবতার ডাক

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

গোয়া। পশ্চিম ভারতে সমুদ্র-উপকূলে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মাইল লম্বা এক ফালি জমির উপর পর্তুগীজরা প্রায় সাড়ে চার পাঁচ শো বছর ধরে কর্তৃত্ব করছে। মুঘল সম্রাটদের বিলাস ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মধ্যযুগের কয়েকটি সদাগর জাতি হিন্দুস্থানের সম্পদ শোষণ করতে ব্যাগ্র হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক কূট-কৌশলে বৃটীশরা যেভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে, পর্তুগীজরা তা পারেনি। তা না পারলেও বিদেশে হিন্দুস্থানে যে তাদের এক ফালি রাজ্য আছে, এইতেই তাদের গৌরব মনে হতো। কিন্তু এই গৌরব রক্ষা করার ব্যাপারে বিপর্যয় দেখা দিল সেইদিন, যেদিন বৃটিশ ভারত ছেড়ে চলে গেল। গোয়ার মানুষ সেদিন সাড়া তুললো—আমাদের চল্লিশ কোটি মানুষ যখন স্বাধীন হলো, তখন আমরা ছ'লাখ লোক পর্তুগীজদের তাঁবেদারি করবো কেন?

পর্তুগালের শাসক ডাঃ আণ্টনিও ডি. আলিভেইরো সালাজার তার জবাবে বললেন—তোমরা তো ভারতবাসীর মত নও, তোমরা আধা-পর্তুগীজ, তোমরা তো পর্তুগালেরই অংশ, হিন্দুস্থানের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কোথায়?

আর সেই সঙ্গে ডাঃ সালাজার ছ'লাখ মানুষকে শায়েস্তা করে রাখার জন্য পাঠিয়ে দিলেন দশ বারো হাজার সৈন্য। আর নির্দেশ দিলেন—যাকে সন্দেহ হবে তাকেই গ্রেপ্তার করবে আর রীতিমত পিটুনি দেবে।

এই পিটুনি দিয়ে নাম করেছিল গোয়ানিজ ফিরিঙ্গি কনস্টেবল জেরোনিমো বারোটা। রাজনৈতিক বন্দীদের পিটিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে দিতে জেরোনিমোর সমকক্ষ কেউ ছিল না। সেজন্য সাধারণ কনস্টেবল হলেও পুলিশের বড কর্তাদের সে ছিল ভারী প্রিয়পাত্র।

হাজতে নিরীহ মানুষকে ঠেঙ্গিয়ে জেরোনিমো বেশ বাহাদুরি বোধ করতো, জানাচেনা মানুষকে বলে বেড়াতো—আজ এক বেটাকে খুব শায়েস্তা করেছি!

পর্তুগাল গ্রামে এইভাবে একদিন কথা বলছে, এমন সময় তারই এক সঙ্গী বললো—যাদের তুমি পিটিয়েছ তারা মন্দিরে এসে দেবতাকে ডাকছে।

—দেবতাকে ডাকছে? কোন্ দেবতা?

—শংকর মহদেব। বলছে দেবতা এর বিচার করবেন, আমরা কোন অন্যায় করিনি মিছে সন্দেহ করে আমাদেরকে থানায় নিয়ে গিয়ে ঠেঙ্গাচ্ছে, দেবতা এর বিচার করবেন। এ অন্যায় বেশিদিন সইবে না।

—শংকর মহাদেব আমার বিচার করবেন? চল, ওদের দেবতাকে একবার দেখে আসি।

জেরোনিমো মন্দিরের দিকে রওনা হলো।

পর্তুগাল গাঁয়ে অনেক দিনের পুরানো এক মহাদেবের মন্দির আছে। তার সঙ্গে আছে এক মঠ। জেরোনিমো সঙ্গীকে নিয়ে সেই মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। মদ খাওয়াটা পর্তুগীজদের কাছে জল খাওয়ার মত। সারাদিন ধরে দু-এক চুমুক করে তারা মদ খায়। তার উপর জেরোনিমো গাঁয়ের 'কেউকাটা' লোক, দু-এক চুমুকে তার কোনদিনই পোযায় না। তার নেশা জমে থাকে সারাদিনই, চোখ দুটি লাল করে সে যখন মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়ালো, পুরুতঠাকুর তখন দরজা বন্ধ করে সরে পড়েছেন? কিন্তু সরে তিনি যাবেন কোথায়? জেরোনিমোর দল তাঁকে খুঁজে বের করলো, জেরোনিমো বললো—মন্দিরের দরজা খোলো।

পুরুত শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন—কি হবে দরজা খুলে?

—তোমাদের দেবতাকে আমি দেখবো। জল্‌দি খোলো।

জেরোনিমোর কোন দুষ্টবুদ্ধি আছে আন্দাজ করে পুরোহিত এবার স্পষ্ট বললেন—না। মন্দিরের দরজা আমি এখন খুলবো না।

—দরজা খুলবে না?

—না।

—ভাঙো দরজা!

জেরোনিমো আর তার সঙ্গীরা লাথি মেরে পুরানো মন্দিরের পুরানো দরজা ভেঙে ফেললো। তারপর জুতো পরে ঢুকে গেল মন্দিরের মধ্যে। দেবতাকে অপবিত্র করলো। তারপর হুমহাম করে গুণ্ডার কায়দায় বেরিয়ে এলো, বললো—এই তো দেবতা, দেখি এবার ব্যাটাদের দেবতা আমার কি করতে পারে।

জেরোনিমো চলে গেল।

মঠের কর্তা স্বামী পরশুমাচার্য কোথায় যেন গিয়েছিলেন, পুরুত গিয়ে খবর দিলেন। আচার্য বললেন—চলো থানায়।

থানার দারোগাবাবু জেরোনিমোর নাম শুনেই বললেন—তোমাদের ডায়েরি আমি লিখতে পারবো না। আর তোমাদেরকেও উপদেশ দিচ্ছি, যা হয়েছে হয়েছে, চেপে যাও, না হলে জেরোনিমোর পাল্লায় পড়লে তোমাদের পক্ষে মাথা বাঁচানোই দায় হবে। ভাল মানুষের মত ঘরে ফিরে যাও!

আচার্য পরশুরাম ও পুরুত ঠাকুর ঘরে ফিরে এলেন। গ্রামবাসীরা বললো—তাহলে দেবতার এই অপমান,—সমস্ত হিন্দুদের উপর এই অপমান মেনে নিতে হবে? প্রতিকার হবে না?

আচার্য বললেন—আমাদের মধ্যে মানুষ থাকলে প্রতিকার হবে, সবাই যদি অমানুষ হয়, প্রতিকার করবে কে?

সবাই চুপ। জেরোনিমোর দলের বিরুদ্ধে লড়া তো সহজ নয়, অশেষ লাঞ্ছনা, শেষ অবধি হয়তো মৃত্যু বরণ করতে হবে। আর সাধারণ মানুষের এই প্রহার ও মৃত্যুকে বড় ভয়।

সহসা গ্রামবাসীদের মধ্যে সাড়া শোনা গেল—মানুষ আছে, প্রতিকার হবে।

কে সাড়া দিলে? সবাই তাকিয়ে দেখলো, এক নজরে সবাই চিনলো তিনি গুরুজী রাণাড়ে।

মোহন লক্ষ্মণ রাণাড়ে মহারাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন গোয়ার ইস্কুলে শিক্ষকতা করতে। প্রথমে তিনি গোয়া কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু পুলিশের নির্মম প্রহার ও অত্যাচার দেখে তিনি কংগ্রেসের অহিংসা নীতিতে আর আস্থা রাখতে পারেন নি। সশস্ত্র প্রতিরোধের দিকে ঝুঁকে পড়েন। গুপ্ত দলের সংগঠনে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। কথাটা গোপন রইল না। কিন্তু পুলিশ তাঁকে ধরতে পারলো না। গুরুজী রাণাড়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দলের কাজ চালাতে লাগলেন। যেখানে পুলিশের অনাচার নির্মম হয়ে ওঠে, সেইখানেই সন্ত্রাসবাদীরা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। গুরুজীর নাম শুনলে পুলিশের বড়কর্তারাও শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ তবু একটু ভরসা পায়—নিরঙ্কুশ অনাচার অবাধে চলবে না, প্রতিকার না হোক্ একটা প্রতিশোধের সম্ভাবনা রইল। গুরুজী রাণাড়ে তো আছেন।

সেই গুরুজীকে দেখে সবাই চম্‌কে উঠলো, যাকে পুলিশে এতো খোঁজাখুঁজি করছে তিনি দিনের বেলা এতো মানুষের সামনে এভাবে উপস্থিত হয়েছেন! এখনি তো পুলিশ এসে পড়বে, গুরুজীকে না পেলে, আর পাঁচজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে 'তক্তাপেটা' করবে! প্রহার-ভীত নরনারীরা ত্রস্তে সরে গেল।

গুরুজী পথের পাশে এক গাছতলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন একা একা, চারিপাশ ফাঁকা হয়ে গেল, তারপর দেখা গেল, তিনি আর সেখানে নেই।

খানিক পরেই কাথটা জেরোনিমোর কানে গিয়ে পৌঁছলো—গুরুজীকে দেখা গেছে, এই গাঁয়ে মন্দিরের সামনে। জেরোনিমো প্রথমে যেন একটু দমে গেল, কিন্তু তখনই সামলে নিয়ে মুখে সাহস দেখিয়ে বললে—ওকে একবার হাতে পেলে বুঝিয়ে দোব, ও কতবড় গুরুজী, গোয়ার ভিতরে ওই একটি লোক যত রকম হাঙ্গামা পাকিয়ে তুলছে। আর বাইরে বেলগাঁও-এ আছে আর একটা বদমায়েস—কর্ণেল চৌধুরী, সে যত ছেলেছোকরাকে বন্দুক আর বোমা দিয়ে এখানে পাঠাচ্ছে। ওই দুটো লোকের বদ-পরামর্শ না থাকলে এখানকার মানুষের এত সাহস কি করে হবে যে পর্তুগালের এই ভাল-শাসনের বিরোধিতা করে। ওই দুটোই যত নষ্টের গোড়া! এবার ওই পণ্ডিতজীকে পাকড়াও করতে হবে।

কিন্তু পণ্ডিতজীকে ধরা যে সহজ নয় তা জেরোনিমো ভাল করেই জানতো। কত জায়গায় কতবার পণ্ডিত রাণাড়েকে দেখা গেছে। কিন্তু পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও কোন সন্ধান করতে পারেনি।

জেরোনিমোর দল এবার তৎপর হলো। কত জনকে কত ভয় দেখিয়ে কত রকম জেরা করলো, সবাই বললো—তাকে দেখেছি ওই গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে, তারপর যে কোথায় গেল জানি না।

চারিপাশে জঙ্গল আর পাহাড়। এখানে লুকিয়ে থাকা কোন মানুষের পক্ষেই কঠিন নয়। জেরোনিমোও তা জানে। তবু ক্ষমতা যখন আছে, তখন দম্ভ থাকবে না কেন, সে বললো—দু'চার দিনের মধ্যে এখানকার মানুষরা তার খবর দেয় তো ভাল, না হ'লে সব কটাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে রীতিমত দাওয়াই দোব।

গাঁ-সুদ্ধ মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে রীতিমত প্রহার দেওয়া গোয়াতে নতুন কিছু নয়। এই প্রহারের একটা কৌশল আছে। ক্রিকেটের ব্যাটের মত আধ ইঞ্চি পুরু দু' ফুট লম্বা একখানি কাঠের তক্তা, সেই তক্তা দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পেটানো। চামড়া ফেটে যাবে, মার খেতে

খেতে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যাবে। মুখে জল দিয়ে জ্ঞান করানো হবে। জ্ঞান হলে আবার মার চলবে। আবার অজ্ঞান। অনেক সময় এইভাবে মার খেতে খেতে অনেকে মরেও যায়। পুলিশ ফতোয়া দেয় হার্টফেল করেছে। কয়েদীদের উপর এই নির্মম প্রহার চালিয়ে পুলিশ মহলে জেরোনিমো বেশ নাম করেছিল। এইটাই সে কৃতিত্ব বলে মনে করতো, এইতেই ছিল তার দম্ভ।

একে একে সাতটি দিন কেটে গেল।

গুরুজী রাণাড়ের কোন পাত্তা মিললো না। মন্দিরে আবার নতুন করে দেবতার অভিষেক হলো। গ্রামের জন-মানসে যে আলোড়ন উঠেছিল, তা থিতিয়ে পড়লো। জেরোনিমো বিজয়ী বীরের মত দলবল নিয়ে সদম্ভে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

সপ্তম দিনের রাত্রি নটা। গ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। এমন সময় কয়েকটি লোক এসে জেরোনিমোর বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিল। এতো রাত্রে কে ডাকে? জেরোনিমো জানালা দিয়ে দেখলো। আগন্তুকেরা সবাই পুলিশের লোক। পরনে নেভী-ব্লু জিনের উর্দি, কাঁধে স্টেন-গান। একজন বললো—বাইরে আসুন, খবর আছে।

থানা থেকে ডাকতে এসেছে। জেরোনিমো দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালো। যার হাতে স্টেন-গান ছিল, সে তৎক্ষণাৎ গুলি চালালো। গুলি খেয়ে জেরোনিমো লুটিয়ে পড়লো।

বন্দুকের আওয়াজ শুনে বাড়ীর ভিতর থেকে ছুটে এলো, তার ভাই, পিছনে আর সব লোক। আগন্তুকের হাতের স্টেন-গান আবার চলতে সুরু করলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জেরোনিমো পরিবারের সবাই গুলি খেয়ে সেইখানেই শুয়ে পড়লো। আগন্তুকেরা আর সেখানে দাঁড়ালো না, রাত্রির অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

পরদিন সকালে পঞ্জিম শহর থেকে পুলিশের দল ছুটে এলো। গ্রামের বহু হিন্দুকে ধরে তারা মারধোর করলো! মন্দিরের পুরুত ও মঠের কর্তাকে রীতিমত ঠেঙ্গানি দিল। পুরোহিত সে মার সইতে পারলো না, হাজতেই মারা গেল। মঠের কর্তা পরশুরাম আচার্য বললেন—মানুষের উপর অত্যাচার করতে করতে তোমরা দেবতার উপরেও চড়াও হয়েছ। ভেবেছ হিন্দুর দেবতা নেই, দেবতা জেরোনিমোকে সবংশে শেষ করেছেন, তোমাদের পালাও শেষ হয়ে আসছে! দেবতা ডাক দিয়েছেন, সারা হিন্দুস্থান থেকে এগিয়ে আসছে সত্যাগ্রহীর দল! এরা অহিংস হয়ে মার খেতে আসবে না, এরা আসবে বন্দুক হাতে নিয়ে।

ক'দিনের মধ্যে কয়েকবার ডিনামাইট ফাটলো, রেলপথ ও বন্দর উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হলো। পর্তুগীজ লাট সাহেব জেনারেল বের্ণাদ গেদীম দুর্ভাবনায় পড়লেন, বললেন—অনাচার থামাও! সব মানুষ ক্ষেপে উঠলে রাজ্য তো থাকবে না, প্রাণটাও যাবে।*

* চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক : শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পাশের বাড়ীর ছেলেটা

ইন্দিরা দেবী

অনেক দিন বাড়ীটা বন্ধ ছিল। সুস্মি সেদিন দেখল বাড়ীটা খুলে ফেলা হয়েছে আর মিস্ত্রীরা রং চং করে মেরামত করছে। তাহলে এবার ওখানে লোকজন আসবে—মনে মনে ভাবলো সে। অনেক দিন থেকে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভেবেছে—যদি ওখানে কেউ বন্ধু-বান্ধব থাকতো, তাহলে কী যে ভালো লাগতো! কিন্তু সে আর হয়নি। তার চেয়ে তিন বছরের বড় দাদা রঞ্জন তাকেও হষ্টেলে চলে যেতে হলো—মা বলেন বাবার বদলীর চাকরী বলে তাদের নাকি পড়াশুনোর দুর্গতি হয়। দাদা যতদিন বাড়ীতে ছিল—বেশ ভাল লাগতো। দাদার সঙ্গে ঝগড়া হতো না এমন নয়, তবু দাদার সঙ্গে ভাবও কম ছিল না। দাদার কেবল ঐ একটা দোষ, কেবল বলবে—মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা সব বিষয়ে বড়। মেয়েরা আসলে যত বড়াই করে তা কিছু নয়। আর এই নিয়েই তো সুস্মির সঙ্গে ঝগড় বাধে—আরো যখন ছোট ছিল, তখন তো মারামারি বেধে যেতো—শেষকালে সুস্মি বাবার কাছে গিয়ে নালিশ জানাতো আর রঞ্জন বলতো, সেই তো হেরে গেলে আর নালিশ করতে বাবার কাছে ছুটতে হলো—বাবা হচ্ছেন ছেলে—সে কথা কি মনে আছে?

বাবা অবিশ্যি আদর করে ভুলিয়ে দিতেন আর বলতেন, রঞ্জন কিছু জানে না সুস্মি, মেয়েরা কম কিসে? ওসব কথা আর এখন চলবে না। রকেট করে সারা পৃথিবী পরিক্রম করে এসেছে মেয়ে,—মেয়েরা এখন ছেলেদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। আর প্লেন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মহিলা পাইলট তোমাদের দূর্বাদি। তাঁর সব কথা তোমাদের কাছে শুনি—আর কত হিসেব দেবো বল? সব তাতেই এখন মেয়েদের অগ্রগতি—কাজেই মিছে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ কি?

বাবার কথা সত্যি। কিন্তু দাদা হেরে যাক সেটাও তো সুস্মির ভালো লাগে না, তাই মাঝামাঝি রফা হয় প্রায় সময়। কিন্তু দাদা হষ্টেলে চলে গেল—এটা একেবারে সইতে পাচ্ছে না সে। 'দাদা তুমি কবে আসবে' একথা প্রত্যেক চিঠিতে লেখে সুস্মি—আর গরমের ছুটি, পূজোর ছুটি, বড়দিনের ছুটির জন্য বসে বসে দিন গোনে।

দাদা না থাকার জন্যই তার বড্ড একা লাগে। তাদের বাংলো এমনই যে কাছাকাছি কাউকে পাবার উপায় নেই। বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে সুস্মি মনে মনে কত প্রার্থনা করেছে, তার মত ছোট কেউ যেন আসে ও বাড়ীতে। বাড়ীটায় মিস্ত্রীর কাজ দেখে আজ সুস্মির আনন্দের সীমা নেই।

আচ্ছা মা, বলোতো ওদের বাড়ীতে ক'টা ছেলেমেয়ে আসবে?

—আমি কি করে জানব বল? মা উত্তর দেন।

—বলো না, আন্দাজেই বল; আমার মত একজন আর দাদার মত একজন হলে বেশ হয়—না?

মা হেসে বলেন: বেশ তো তাই আসুক না!

—হ্যাঁ, তাই আসুক। আচ্ছা মা, দাদা কবে আসবে বলো তো? ক'দিন চিঠি আসেনি?

—দাদা আসবে এই পুজোর ছুটিতে—চিঠি তো ও লেখে ঠিক নিয়ম করে। 'বেশী মন-কেমন করছে' একথা দাদাকে যদি বারে বারে লেখো, তাহলে দাদার একটুও মন টিকবে না ওখানে, পড়াশুনো হবে না—তাই বেশী লিখো না। দাদা এই এলো বলে।

কথা না বাড়িয়ে সুস্মি ঐ পাশের বাড়ীটার দিকে চেয়ে থাকে আর মনে মনে ভাবে তার মত যেন একটা মেয়ে থাকে, এছাড়াও যদি দাদার মত একটা ছেলে থাকে বেশ হয়।

রোজ সকালে উঠে সুস্মি দেখে বাড়ীটার কাজ কতদূর এগোলো। মাঝে মাঝে ভাবে বড্ড আস্তে আস্তে কাজ করে লোকগুলো। একদিন তো ডেকেই ফেল্লে: মিস্ত্রী ও মিস্ত্রী, তোমরা এত ধীরে ধীরে কাজ কর কেন গো?

—কি বলছো খুকী? বুড়ো সর্দার মিস্ত্রী জিজ্ঞাসা করে।

মা ভিতর থেকে বলেন: কি হচ্ছে সুস্মি? ওরা রাগ করবে না?

তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে সুস্মি ঢোক গিলে বলে: এই যে বলছিলুম, তোমাদের বুঝি এখনও অনেক কাজ বাকী?

—তা এখনও চলবে। বাড়ীটা অনেক দিন বন্ধ ছিল কিনা।

—এটা কাদের বাড়ী, কতগুলি ছোট ছেলেমেয়ে আছে গো মিস্ত্রী?

বুড়ো মিস্ত্রী হেসে বলে: বাড়ী তো চক্রবর্তী বাবুদের, কত ছেলেমেয়ে আছে তা তো জানি না খুকী।

—এই আমার মত আছে একটাও, কিংবা দাদার মত?

—আমি ঠিক বলতে পারবো না খুকী দিদি।

—আমি খুকী দিদি নই, আমি হলাম সুস্মি।

বুড়ো মিস্ত্রী আবার হেসে বলে: তা হবে।

শেষে একদিন বাড়ীর কাজ শেষ হলো, আর বাড়ীতে অনেক জিনিসপত্র আসতে লাগলো; আরো পরে এলেন বাড়ীর সকলে। সুস্মি অনেক চেষ্টা করে অনেকক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে থেকে

আবিষ্কার করলো বড়রা অনেকেই আছেন, কিন্তু ছোট একজনকেই সে এখন দেখতে পাচ্ছে। হাফ প্যাণ্ট আর সাদা হাফ সার্ট পরে তার মত একটি ছেলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করছে। তাহলে মেয়ে একজনও নেই তার মত? মনে মনে বল্লে সুস্মি আর ভাবলো, দাদারই জিন হবে তাহলে। এইসব ভাবতে ভাবতে পাশের বাড়ীর জানলায় ছেলেটি এসে কখন দাঁড়িয়েছে দেখলো সুস্মি। ছেলেটি বল্লে : তোমরা বুঝি এই বাড়ীতে থাকো?

সুস্মি খুশী হয়ে বল্লে : হ্যাঁ, তোমরা নতুন এলে? ক'জন ভাই-বোন?

—এই তো আমি, আমার নাম কাজল।

—এসো না আমাদের বাড়ী।

ব্যস আর কি—দু'চার দিনের মধ্যেই গলায় গলায় ভাব। সুস্মি কিন্তু একদিনও নতুন বাড়ীতে যায়নি, দাদা এলে তারপর যাবে। কিন্তু কাজলটা কি সুন্দর কথা বলে, কেমন মিষ্টি স্বভাব, আর কত ভালো—কিন্তু চুলগুলো মেয়েদের মত, তাহলেও বেশ দেখতে।

মাকে সেদিন সুস্মি বলল, দেখ মা—কাজলের চুলগুলো মেয়ের মত, রাত্তিরে আবার ওর মা রিবন দিয়ে বিনুনী করে দেন—অত চুল কেন মা?

মা উত্তর দিলেন : বোধহয় মানত আছে, কিন্তু ওর মুখটি কী সুন্দর—একেবারে মেয়ের মত।

ছুটি পড়লো—সুস্মির দিন গোনা শেষ করে রঞ্জন এসে পড়লো বাড়ীতে। খুব হইচই-এর মাঝখানে সুস্মি কাজলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল দাদার—এই ছুটির আগে কাজলদের স্কুলে sports হয়ে গেলো তাতে কাজল প্রথম হয়েছে অনেক বিষয়ে, আর অনেকগুলি প্রাইজ এনেছে।

রঞ্জন গম্ভীর হয়ে বল্লে : ছেলেরা হবেই, ও যদি মেয়ে হতো তাহলে হতো না।

—বাজে কথা বলো না—শোনো না আর কিসে কিসে কত কি করেছে, ওর গুণের শেষ নেই!

—ছেলে বলেই হয়েছে।

কাজলের সঙ্গে ভাব হয়েছে বটে, আর তার গুণের কথা অনেক করে বলা হয় দাদার কাছে, কিন্তু তবু সুস্মি এখনও একদিনও ওদের বাড়ী যায়নি—কাজল মাঝে মাঝে আসে নাহলে জানলা দিয়ে কথা বলে।

রঞ্জন একদিন বল্লে : দেখ সুস্মি এবার এসে পর্যন্ত কাজলের গল্পই শুনছি, কত সে ভাল, কত সে বুদ্ধিমান—আর আমি যে বলি ছেলেরা সকলেই এমনি হবে, মেয়েরা হলে হতো না, তা এখন বিশ্বাস হচ্ছে কি?

—তা কেন বিশ্বাস হবে, মেয়েরা কি পারে না পারে তা কি জানো না? তাহলে বাবার কাছে চলো—বাবার লিষ্ট আছে—জানো?

—বাবা তার মেয়েকে ভোলান।

—কখনও না, বাবা সত্যি কথা বলেন।

—মা থামিয়ে দিয়ে বলেন: স্বস্মি, উপরে যাও, জানলায় দাঁড়িয়ে কাজল তোমায় ডাকছে, বলছে একদিনও কেন তুমি যাচ্ছ না ওদের বাড়ী।

স্বস্মি মার আঁচল ধরে বল্লে: কি বলবো মা?

—বলগে বিজয়ার দিন যাবে।

পূজোর ক'দিন খুব আনন্দে আনন্দে কেটেছে, কাজল আবার ছাতে উঠে ঘুড়ি উড়িয়েছে। চমৎকার লাট্টু ঘোরায় কাজল, ওর ঘরে বসে খেলা একটুও ভাল লাগে না। ছোট ছেলেরা যা খেলতে পারে কাজলের একটিও অজানা নেই।

দাদার কেবলই এক কথা: একসঙ্গে এতগুণ সে কেবল ছেলে বলেই সম্ভব, মেয়ে হলে শুধু পুতুল খেলতো—না হয় বোকা বোকা কথা কইতো।

স্বস্মি খুব রেগে যায়—মাঝে মাঝে ঝগড়াও বাধে। মা বলেন—ছেলে আর মেয়ে নিয়ে কী কাণ্ড তোমাদের, দিনরাত ঝগড়া কর কেন?

রঞ্জন হেসে বলে : মা তুমি কার দিকে ?

স্বস্মি চেঁচিয়ে বলে : আমার ! আমার দিকে !

মা বলেন : আমি কারুর দিকে নই, নিরপেক্ষ ! ছেলেরা অনেক কাজ করে যা মেয়েদের করা সুবিধা হয় না, তাহলেও মেয়েরা অনেককিছু পারছে, যাতে ছেলেদের লজ্জা হয়—এই তো পরীক্ষার খবর বেরুলে কাদের নাম আজকাল আগে থাকছে ? রিসার্চ করছে, ডক্টরেট হচ্ছে, দেশ-বিদেশে চলছে, কৃতি হয়ে ফিরছে—এসব দেখলে মেয়েদের কৃতিত্ব কম কোথায়—বরং ছেলেদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাই ওসব নিয়ে তোমাদের ঝগড়া করা ঠিক নয়।

রঞ্জন হতাশ হয়ে বলে : মা তুমি যে কী বলো, দু'একটা মেয়ে কে কি করলো তাই নিয়ে বল্লে তো চলবে না, সাধারণ ভাবে বলো ?

—আজকাল মেয়েরা ছেলেদের হারিয়ে দিচ্ছে সব তাতে তা তো দেখছি।

—মা দেখছি খুব খবর রাখো ! ছেলেদের কথা বলো না শুনি।

ঠোঁট উল্টিয়ে চোখ ঘুরিয়ে স্বস্মি বল্লে : মা সব খবর রাখে—খবরের কাগজ মার মুখস্থ—জানো মশাই ?

উপরের জানলা থেকে কাজল ডাকলো : স্বস্মি, শোন এদিকে।

এক দৌড়ে উপরে গেল, আবার তখনি নীচে নেমে হাঁপাতে হাঁপাতে স্বস্মি বল্লে : মাগো মা, কাজল গাছে উঠে এই এত্তো—

—গাছে উঠে ? মা জিজ্ঞাসা করেন।

—হ্যাঁ, ঐ যে শিউলি আর কৃষ্ণচূড়া গাছ—ঐ তো দেখ না—এত ফুল পেড়েছে, আমায় নিতে বলছে।

—কাজল গাছে উঠতে পারে নাকি ? হাত পা ভাঙ্গলে ? মা বলেন।

স্বস্মি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে : ওমা জানো না, ওর মা বলেন দস্যি মেয়ে !

রঞ্জন বলে ওঠে : ভুল হলো স্বস্মি—দস্যি ছেলে। মেয়ে হলে উঠতে পারতো না।

রাগ করে স্বস্মি বলে : অত জানি না বাবা, ওর মা যা বলেন তাই বলছি। আমি যাই ডাকছে কাজল।

কাজল জানলায় দাঁড়িয়ে বলছে : আমার অনেক কাপড় জামা জুতো হয়েছে পূজোয়—তোমার ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক হয়েছে আমারও—তেরোটা ফ্রক, সুন্দর সুন্দর—মামার বাড়ী, মাসীর বাড়ী এখানে, বড়দিদু আর রাঙা মামা—আর দিদিভাই মানে আমার দিদিমা একটা শাড়ী দিয়েছেন—কিন্তু আমার একটাও পেটিকোট নেই, ব্লাউস নেই, তাই ভাবনা হয়েছে।

আমারও অনেক হয়েছে প্যান্ট, সার্ট, ফ্রক, শাড়ী—কাজল মনে করবার চেষ্টা করলো। সুস্মি হেসে বল্লে! শাড়ী ফ্রকও পরবে? হি-হি—কেমন দেখাবে তোমায়! রাত্তিরে যখন চুল বাঁধো ঠিক মেয়ের মত—

কাজলের মা ডাকলেন—মাষ্টার মশাই এসেছেন কাজল নেমে এসো।

—একদিন এসো না আমাদের বাড়ী সুস্মি? কতদিন আমরা এসেছি, তুমি কেন আসো না? মাকে নিয়ে আজ এসো, কেমন? কাজলের মা বারে বারে বল্লেন জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে।

রঞ্জন বললে: সুস্মি বুঝি এতদিনেও যাওনি একবারও? মেয়েদের কাণ্ড কি রকম দেখো! অথচ কাজল কতবার এসেছে। তোমার যাওয়া উচিত তা একবারও ভাবনি।

রঞ্জনের কথা শেষ হলো না—দেখা গেল কাজল তার মাকে নিয়ে এ বাড়ীতে ঢুকছে। রঞ্জন সুস্মির দিকে তাকিয়ে বল্লে: ছেলে বলেই ওর অত বুদ্ধি।

সুস্মি মাকে ডেকে আনলো—বারান্দায় সাজানো চেয়ারে বসেই সকলে গল্প করতে লাগলেন। কাজলের মা বল্লেন: কতদিন ভাবছি আমি, কিন্তু নতুন বাড়ীতে এসে গোছাতে গোছাতে সময় হয় না। আপনিও দিদি একবার যান না, তাই ভাবলাম এত ভাব ছোটদের মধ্যে আর আমরা কেউ কাউকে চিনি না এ ভালো না—তাই জোর করে চলে এলাম। কাজলের পড়া শেষ হলো বই নিয়ে উপরে উঠছিল, সবসুদ্ধ টেনে এনেছি।

সত্যিই তো ওর হাতে বই খাতা সবই রয়েছে। সুস্মির মা বল্লেন: খুব খুশী হলাম ভাই, কালই আমি যাবো, সত্যি আমারই ভুল হয়ে গেছে। বাড়ীটা বেশ হয়েছে আপনার।

কাজলের মা বল্লেন: আপনার বুঝি এই দুটি ছেলেমেয়ে? এদের কথা কাজল খুব বলে। আমার ভাই এই একটিই মেয়ে—এমন মেয়ে হয়েছে, ছোট থেকে একেবারে ঘোড়ায় চড়া ছেলের মত। আমার মা ওকে ছেলের মতই সাজিয়ে রাখতেন। ওর হাবভাব কাজকর্ম খেলাধুলো সব ছেলের মত, দেখেছেন? বিস্মিত হয়ে সুস্মির মা বল্লেন: কার কথা বলছেন, কাজলের?

এক মুখ হেসে কাজলের মা উত্তর দিলেন: হ্যাঁ আমারই মেয়ে, ঐ একমাত্র সন্তান—কাজলের কথাই বলছি। দেখুন না সব ওর ছেলের মত। সবাই তো ভাবে ঐ প্যান্ট-সার্ট পরা থেকে ও বুঝি আমার ছেলে।

সুস্মি, রঞ্জন ও তাদের মা পরস্পর মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। রঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেছে। মা কথা বলার চেষ্টা করতে লাগলেন—সুস্মি কি করবে ভেবে না পেয়ে কাজলের হাতের একটা বই নিয়ে খুলে দেখতে লাগলো—যার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে: "কুমারী কজ্জলা চক্রবর্তী"।

'লোকশিক্ষা' গল্পর শেষাংশ (২৫৮ পৃষ্ঠার পর)

করতেন, রাজা তাঁর কাছে গোপীনাথকে পাঠালেন, ঘোড়াগুলোর দাম ঠিক করতে। রাজাই হোক আর রাজপুত্রই হোক—দরদস্তুর করার লোভ সামলাতে পারে কে ? ঘোড়াগুলোর যা ন্যায্য দাম হয়, বড়জানা তার চেয়ে অনেক কম দাম বললেন। এমনই কম বললেন যে, গোপীনাথের আপাদমস্তক জ্বলে গেল। গোপীনাথ একে বড় রাজকর্মচারী, তায় ভবানন্দ রায়ের ছেলে রামানন্দের ভাই—ওঁদের সমস্ত পরিবারই রাজার বিশেষ প্রিয়, কাজেই তিনিও বেশ একটু উদ্ধত ছিলেন। তিনিও এক মর্মান্তিক কথা বলে বসলেন। এই রাজপুত্রের স্বভাব ছিল কথা বলার সময় ঘাড় বাঁকিয়ে ওপর দিকে মুখ করে কথা বলতেন, গোপীনাথ ফস্ করে বলে ফেললেন, 'আমার ঘোড়া না হয় ঘাড় বাঁকায় না, উটমুখ করে কথা বলে না, তাই বলে এত অপদার্থও নয় যে এই দামে বেচব !'

মানুষের শারীরিক কোন বিকৃতি নিয়ে ঠাট্টা করলে তার সবচেয়ে রাগ হয়, রাজপুত্রও চটে আগুন হয়ে উঠলেন, তিনি রাজার কাছে গিয়ে একটা কথা সাতখানা করে লাগিয়ে বললেন, 'সহজে ওর কাছ থেকে টাকা আদায় হবে না, টাকাটা দেবার ইচ্ছেই নেই আদৌ, যদি বলেন তো একটু ভয় দেখিয়ে টাকাটা আদায় করার চেষ্টা করি !'

রাজা অতশত জানেন না, বললেন, 'যা ভাল বোঝ তা করো।'

বড়জানা তখন হুকুম করলেন গোপীনাথকে হাত-পা বেঁধে বধ্যভূমে নিয়ে যেতে, সেখানে একটা উঁচু মাচার ওপর চড়িয়ে তার নিচে কয়েকখানা খোলা তলোয়ার পুঁতে দিলেন শূলের মতো, বললেন, 'টাকা যদি না দাও, ওপর থেকে ঐ তলোয়ারের ওপর ফেলে দেওয়া হবে !'

এই যখন ব্যাপার—তখন কেউ কেউ এসে চৈতন্যদেবকে ধরলেন, 'ওরা আপনার সেবক, আপনার ভক্ত—এই বিপদে যদি আপনি না বাঁচান তো কে বাঁচাবে !' চৈতন্যদেব সব শুনে বললেন, 'তা আমি কি করব বলো, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, ভিক্ষা ক'রে খাই—দু'লাখ টাকা শোধ করব কি করে ?' তারা বলল, 'না, রাজা আপনার যেরকম অনুগত আপনি একটু বললেই তিনি ছেড়ে দেবেন।'

চৈতন্যদেব ভীষণ বিরক্ত হলেন এই কথায়, বললেন, 'রাজার প্রাপ্য রাজকোষে জমা না দিয়ে নিজে খরচ করে, আবার বাবুয়ানায় দিন কাটায়, তার হয়ে আমি রাজাকে বলতে পারব না। রাজার দোষ কি, তাঁর প্রাপ্য তিনি চেয়েছেন বই তো নয়। যে অপরের প্রাপ্য আদায় ক'রে খরচ করে—সে তো চোর। আমি তার হয়ে বলতে পারব না।'

একটু পরে আর একজন লোক এসে খবর দিল, 'গোপীনাথের ভাই বাণীনাথকেও রাজার লোক বেঁধে এনেছে—একসঙ্গে শূলে দেবে।

সবাই জানত এদের মধ্যে বাণীনাথই আবার চৈতন্যদেবের বিশেষ প্রিয়, কারণ তিনি খুব বড় ভক্তও। কিন্তু তবু চৈতন্যদেব রাজাকে ওদের মুক্তির সুপারিশ করতে রাজী হলেন না। বললেন, রাজার প্রাপ্য রাজা আদায় করবেন বৈকি! তাছাড়া আমি বৈরাগী, আমাকে একলা শোনাতে এসেছ কেন?' একটু পরে আর একজন খবর দিল, ওদের বাড়ির সকলকে বেঁধে নিয়ে গেছে, সকলকেই বধ করা হবে। চৈতন্যদেব বিশেষ উত্তেজিত ও দুঃখিত হয়েছেন তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল—কিন্তু তবু তিনি একটি কথাও ওদের হয়ে বলতে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি মহাপ্রভুর প্রধান ভক্ত ও শিষ্যরা এসে ওঁর পায়ে আছড়ে পড়লেন। 'আপনি রক্ষা করুন, আপনি ওদের বাঁচান।

চৈতন্যদেব বিষম রেগে উঠলেন এবার, 'তোমরা কি চাও আমি রাজার কাছে গিয়ে আঁচল পেতে ভিক্ষে করি? আর আমি ভিখিরী মানুষ, আমাকে তিনি দু'লাখ টাকা দেবেনই বা কেন?

এই সময় একজন বললেন, গোপীনাথকে আর একদণ্ড মাত্র সময় দেওয়া হয়েছে, তারপরই শূলে ফেলা হবে!'

আবারও সকলে মহাপ্রভুর পায়ে পড়লেন, 'আপনি একটু বলুন, আপনার মুখের কথায় অত-বড় বংশটা রক্ষা পায়!' চৈতন্যদেব মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আমার দ্বারা হবে না কিছু, জগন্নাথকে জানাও তোমরা, রক্ষা করতে হয় তিনিই করবেন।'

মুখে বললেন বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে লাগলেন, একটুও স্বস্তি রইল না। শেষে আর থাকতে না পেরে কাশীমিশ্রকে ডেকে বললেন, আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে পারছি না, তুমি ব্যবস্থা করে দাও আমি এখনই আলালনাথে চলে যাব। আলালনাথ পুরী থেকে ১৬৷১৭ মাইল দূরে। এ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না। যে চোর, যে পাপী সে শাস্তি ভোগ করবে —মাঝখান থেকে তার দুঃখের কথা শুনিয়ে আমাকে এমন করে লোকে দগ্ধায় কেন তা বুঝি না।'

কাশীমিশ্র বড় পুরোহিত, তাঁর বাড়িতেই চৈতন্যদেব থাকতেন। তিনি ওঁর মনের কথা বুঝলেন। তখনকার মতো শান্ত ক'রে—কেউ যাতে আর না এসে ওঁকে বিরক্ত করে সেই ব্যবস্থা ক'রে, নিজেই রাজার খোঁজে গেলেন। রাজা অবশ্য তার আগেই আর একজনের মুখে গোপীনাথের খবর পেয়ে তাঁকে বধ্যভূমি থেকে ফেরত আনিয়ে ঘোড়ার ন্যায্য মূল্য ঠিক করে বাকী টাকার জন্য খত লিখিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন মহাপ্রভুর এই কথা শুনে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, আমি এখনই ওর দু'লাখ টাকা মকুব করে দিচ্ছি। কী আশ্চর্য, এই সামান্য ব্যাপারে মহাপ্রভু দেশান্তরী হবেন?'

কাশীমিশ্র বললেন, 'না টাকাটা আপনি লোকসান দেন তাও উনি চান না, আবার ওর কষ্টও সহ্য করতে পারছেন না, সেইজন্যেই উনি চলে যেতে চাইছেন। উনি বার বারই বলছেন,

যে রাজার রাজস্ব আদায় করে জমা না দেয় সে চোর, সে মহাপাপী, তার চরম শাস্তি হওয়াই উচিত। কিন্তু এধারে ওরা সকলেই ওর ভক্ত প্রিয়পাত্র—ওদের কষ্ট ওর সহ্য হচ্ছে না। প্রভু এই দোটানাতেই বেশী কষ্ট পাচ্ছেন।

প্রতাপরুদ্র তখন হাত জোড় করে বললেন, 'আপনি দয়া করে ওঁকে বুঝিয়ে বলুন, যে ওদের পরিবারের সকলই আমারও প্রিয়পাত্র, সেইজন্যই ও টাকাটা আমি মাপ করলুম, উনি যেন অন্য কিছু না ভাবেন। তাছাড়া গোপীনাথকে বধ করার ইচ্ছা কারুরই ছিল না। বড়জানারও না, শুধু ওকে ভয় দেখানোর জন্যেই ধরে এনেছিল। তাতেও যে মহাপ্রভু ব্যথা পেয়েছেন একথা শুনে আমার লজ্জার অবধি নেই। আমি এখনই এর ব্যবস্থা করছি।'

রাজা প্রতাপরুদ্রদেব তখনই ফিরে গিয়ে গোপীনাথকে ডাকিয়ে ওর টাকার খতটা ছিঁড়ে ফেললেন, তারপর ওকে বললেন, 'ভয় নেই—তুমি যেমন মালজাঠ্যা শাসন করছিলে তেমনি করো গে, তোমার মাইনেও আমি দ্বিগুণ করে দিলুম আজ থেকে—তবে দেখো আর যেন কোনদিন অমন ভাবে রাজস্ব খরচ করে ফেলো না।'

শুধু তাই নয়—বহুমূল্য শিরোপা প্রভৃতি উপহার দিয়ে রাজা সসম্মানে গোপীনাথকে দণ্ড-পাঠে পাঠিয়ে দিলেন।

এ সবই কিন্তু চৈতন্যদেবকে খুশী করার জন্যে, তাঁর ইচ্ছা জানা মাত্রই রাজা এতটা করলেন—আর রাজা যে তাঁকে এতটা খাতির করেন তাও চৈতন্যদেব জানতেন, তবু রাজাকে অন্যায় অনুরোধ করতে রাজী হননি তিনি কোন মতেই।

যুদ্ধযাত্রা

অন্নদাশঙ্কর রায়

দাদু বলছে, "যুদ্ধে যাব"
দাদু কি তা পারে?
দাদু যে, মা, লুডো খেলতে
আমার কাছে হারে!
দাদু বলছে, "যুদ্ধে যাব
লড়াই করতে নয়,
দেখব ওরা কী করছে
আমি যে সঞ্জয়।"
দাদু বলছে, "যুদ্ধে যাব
অসি হাতে নয়,
মসী দিয়ে লিখব আমি
জয় পরাজয়।"
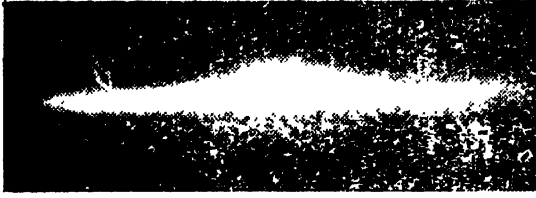
ছায়াপথ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

রাত্রিবেলা কখনও আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছ? মেঘ-হীন আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাবে, লম্বালম্বিভাবে আকাশের এক অংশ জুড়ে আছে একটা আবছা সাদা আলো। যেন লেপে-দেওয়া আলোর রেখা, বেশ চওড়া। আকাশে চাঁদ না থাকলে ওটা বেশ স্পষ্ট দেখায়। আকাশে এই যে আবছা আলোর রেখা, একে বলে ছায়াপথ।

কোটি কোটি নক্ষত্রের সমাবেশে এই ছায়াপথের সৃষ্টি। নক্ষত্ররা পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে আছে বলেই অমন অস্পষ্ট দেখায়; আর মনে হয় ওরা সব ঘেঁষাঘেঁষি, জড়াজড়ি করে আছে। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। পরস্পরের কাছ থেকে বহু দূরে দূরে ওরা চলাফেরা করছে।

লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে ঐ সাদা আলোর পথ আমরা দেখতে পাই। খালি চোখে তাই অস্পষ্ট দেখায়। খুব বড় এবং শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে দেখলে বোঝা যায় ছায়াপথটা কেবল অগণিত নক্ষত্রের সমষ্টি। যেন মহাশূন্যে নক্ষত্রের দ্বীপ। ছায়াপথে কত নক্ষত্র আছে তা তোমরা গুণে শেষ করতে পারবে না।

ছায়াপথের সবগুলো নক্ষত্রই আমাদের সূর্যের মতো প্রকাণ্ড এবং কতকগুলো তার চেয়েও বড়। বিরাট বিরাট সব গরম জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড।

মহাশূন্যে দাঁড়িয়ে তফাৎ থেকে যদি এই ছায়াপথ দেখা সম্ভব হয়, তবে মনে হবে ওটা লম্বা চ্যাপ্টা বান-রুটি। অন্ততঃ বিজ্ঞানীরা তাই বলেন। ছবি দেখ—যেন প্রকাণ্ড একটা ভাজা ডিম। নয় কি?

ছবিতে তীর চিহ্নিত স্থানে রয়েছে আমাদের সূর্য। খেয়াল কর সূর্যটা পথের এক প্রান্তে, কেন্দ্রস্থলে নয়। দু' প্রান্তের চেয়ে মাঝখানটা অনেক বেশি চওড়া। নক্ষত্রগুলির ভিড় বেশি ঐ কেন্দ্রের কাছে।

সাধারণতঃ ঐ মাঝের অংশটার দিকে আমরা তাকাই বলে, ছায়াপথের আবছা ঔজ্জ্বল্য আমাদের চোখে পড়ে। কেন্দ্র থেকে আমাদের দৃষ্টি সরে গেলেই সব কালো অন্ধকার।

ঐ কোটি কোটি নক্ষত্র কেন্দ্রের চারিদিকে অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। এও একটা বিরাট সৌর-জগৎ। তবে এতে গ্রহের পরিবর্তে আছে শতকোটি নক্ষত্র। যেমন নক্ষত্ররা ঘুরপাক খাচ্ছে, তেমনি সূর্যও। একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ২২০ কোটি বৎসর, যদিও প্রতি সেকেণ্ডে ১৫০ মাইল হিসাবে ওরা দৌড়াচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, মহাশূন্যে এই একটা মাত্র ছায়াপথই নয়। সমগ্র আকাশে এমন আরো অনেক আছে। এরা সব এত দূরে দূরে রয়েছে যে, পৃথিবী থেকে দূরবীন দিয়ে না দেখলে নজরে পড়ার কথা নয়। তাও ছোটখাটো দূরবীন হলে চলবে না, খুব শক্তিশালী বড় দূরবীন দিয়ে দেখতে হবে।

সব চেয়ে বড় দূরবীন বসানো হয়েছে আমেরিকার কালিফোর্নিয়ায়, এক পর্বত চূড়ায়।

একটি ছোট পুকুর

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

আমার ঘরের পাশেই ছিল
একটি ছোট পুকুর,
বর্ষাকালে সেই তো হ'ত
সাগর কত সুদূর!
—একটি ছোট পুকুর।
আকাশ নেমে তারই বুকে
গড়ত তেপান্তর,
মেঘের ছায়ায় দেখতে পেতাম
ডিঙা মধুকর;
পক্ষিরাজে রাজার কুমার
হয় কত দেশ পার,
যাদুকরের মায়ায় পড়ে
পথ ভোলে বার বার;
ব্যাঙ্গমা দেয় পথের হদিস,
ঘুমায় মধুমালা
পাতালপুরীর সোনার খাটে,
শিয়রে দীপ জ্বালা।
—একটি ছোট পুকুর।

ছোট্ট পুকুর ভোরের আলোয়
হ'ত রঙিন হাঁস,
দুপুর বেলায় গাছের মতো
ফেলত গভীর শ্বাস;
বিকেল হলে ময়ূর হয়ে
নাচত পেখম মেলে,
সারাটা রাত পরীর মতো
ফিরত শুধু খেলে।
—একটি ছোট পুকুর।
ছোট্ট পুকুর হারিয়ে গেছে,
সেখানে আজ বাড়ি;
তবুও মনের রূপকথাতে
থাকবেই ঠাঁই তারই,
চিরজীবন ধরে কেবল
বলবে ছড়া মধুর,
—একটি ছোট পুকুর

রাখালের ছেলে নরু গরুগুলো চরাতে
বেলাবেলি মাঠে গেল, কী যে ছিল বরাতে !
গরু সব ছেড়ে দিয়ে বাঁওড়ের ওপারে—
নরু ভাবে মনে মনে, ঘুম দেব তোফা রে !
ভাবলো সে একরূপ—হয়ে গেল অন্য !
কোথা হতে ছুটে এল বাঘা এক বন্য ।
নরু সে তো সোজা নয়—তেজিয়ান বীর সে
তাড়াতাড়ি উঠে প'ল অশথের শীর্ষে ।

তারপর—শোন, শোন, অদ্ভুত ঘটনা—
(আজগুবি ভেবে কেউ দেখো যেন চটো না)
মগ্‌ডালে কাক-বাসা পাতা ঘেরা আবছা—
নরু ওঠে ; পা'র ঘায়ে পড়ে গিয়ে বাচ্চা
বাঘটার সমুখেতে সোজা চিৎপাট্টা !
কোথা ছিল পাতি কাক উড়ে এল সাতটা—
ঠোঁটে বটে বিষ নেই কুলোপানা চক্কোর
ব্যাঘ্রের নাকে-চোখে কাকে দেয় ঠোক্কর !

বাঘরায় গর্জায়—বিলকুল একা সে !
জোড়া লাফ দেয় যেই কাক ওঠে আকাশে ।
এত বড় হাঁক-ডাক, মান্‌লো না তা মোটে,
বাঘ হ'ল নাজেহাল বায়সের দাপটে ।
বেগতিক দেখে বাঘা ছুট দিল লম্বা
নরুচাঁদ হেসে খুন ফাটে বুঝি দম বা !

গরু নিয়ে নরু ফেরে—নেমে আসে সন্ধ্যে—
চুপি চুপি বাঘা গিয়ে বলে, "শোন মন দে,
গাছে বসে দেখেছিস যত কিছু আজ তো—
বাড়ী গিয়ে বল্‌বি তো ধরে খাবো আস্ত !"
নরু বলে—"রাম বল !—ছি ছি বাঘা মামা রে,
এই কথা কারে ক'ব ? চেনো না'ক আমারে ।"

পথ-পাশে বসে কাসে হলধর নাপ্‌তে—
কিছুতেই আর নরু পারলো না চাপ্‌তে ।
বলে, "দাদা শোন শোন কাকে-বাঘে যুদ্ধ
গাছে বসে দেখলাম হুদ্দো ও মুদ্দো
শেষকালে বাঘ-বীর দিশেহারা পলাতে
ঝিলটার আড়পার অশথের তলাতে ।"
হায় নরু ! জান্‌তো না বেতবনে বাঘটি
আড়ি পেতে সব শোনে চুপ মেরে ঘাপ্‌টি !

তারপর—ভেবো না হে, একেবারে গল্প—
খালি পেটে বাসি পিঠে—তাও নয় অল্প !
তারে রাখে চুপি সাড়ে হেন কার সাধ্যি ?
পেট ডাকে গড় গড়—হুড়পাড় বাদ্যি !

চমকিয়ে বাঘ বলে, "ওকি, ওকি, ওকি রে ?"
নরু বলে, "ছেলেবেলা কোন এক ফকিরে
এনেছিল কোথা হতে বায়সের অণ্ড,
তারি ক'টা গিলেছিনু, ছিনু অপোগণ্ড ;
পেটে নিয়ে গোটা ডিম—এতকাল কাটলো,
আজ বুঝি সবগুলো এক সাথে ফাটলো !
পেট ফুঁড়ে কা কা করে আসবার চেষ্টা
হায়, হায়, বাঘা-মামা, যাই বুঝি শেষটা !"
বাঘ বলে, "ছাড়িস নি—একটুক সামলে,
ছেড়ে দিবি আমি গিয়ে ঝিল পারে থামলে।"

পরদিন মাঠে গেলে বাঘা এসে সামনে
বলে, "তবে বদনাম রটানোর দাম নে !"
নরু বলে, "বাঘা মামা, মিছামিছি চটছো।"
তাড়া দিয়ে বাঘ বলে, "ওরে ব্যাটা ছুঁচ্ছো
খাটবে না আজ তোর কোন কিছু চালাকি,
—নিজ কানে শুনলুম, তবে আমি কালা কি ?"

নরু ভাবে মনে মনে—করা যায় কি ছুতো
হায়, হায়, রক্ষার পথ নাই কিছু তো !
বলে, "মামা, কিবা কব তুমি সব-জান্তা,
সাথে আছে মার-দেওয়া কিছু পিঠে পান্তা।
সেটা তবে ঝটপট খেয়ে নিই ত্বরিতে
ভরা পেটে বেশ মামা পারা যাবে মরিতে !"
পণটাক্ বাসি পিঠে গেল ধীরে-সুস্থে,
শেষে আরো কিছু'খন গেল মুখ মুছতে।

নরু বলে, "তা কি হয় ? করব কি ? কুড়িটা
এক সাথে ঠুকরিয়ে ফেঁসে দেবে ভুঁড়িটা !"
বাঘ যত বলে, "থাম।" নরু করে বায়না,
বাঘ দেয় চোঁচা ছুট ; কোন দিকে চায় না !
বাঘা হ'ল বিল পার আর নেই চিন্তা—
আহ্লাদে নাচে নরু ধেই ধেই ধিন্তা !!*

* ৩৬ বছর পূর্ব্বের রচনা।
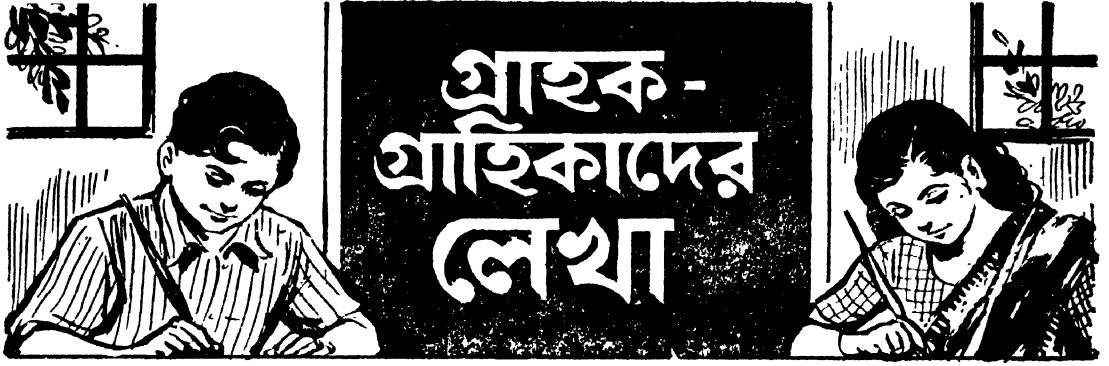
আশুতোষ

১৮৬৪ সালে ২৯শে জুন বাংলার ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় দিন। ঐদিন বাংলার বাঘ আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। মঙ্গল শঙ্খধ্বনি জানাইয়া দেয় এক মহাপুরুষের আবির্ভাব।

তিনি বাংলাদেশে সত্য ও ন্যায়ের যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি অন্যায় সহ্য করিতেন না। বীরের মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেন এবং সর্বদাই তাহার প্রতিকার করিতেন।

তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মায়ের অমত থাকায় তিনি লাট সাহেবের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও বিলাত যান নাই। তাঁহার মাতৃভক্তির অনেক গল্প প্রচলিত আছে। মাতার অনুমতি না লইয়া তিনি হাইকোর্টের জজের পদও গ্রহণ করেন নাই। এই প্রকার মাতৃভক্তির উদাহরণ একমাত্র পণ্ডিত বিদ্যা-সাগরের জীবনেই দেখা যায়।

বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি মৃত্যু পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এত বিখ্যাত হইয়াছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে পণ্ডিত ব্যক্তিদের তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'নোবেল' পুরস্কারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক রমন ও ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনকে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন।

১৯২৪ সালে এই মহাপুরুষ পাটনা শহরে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশে যে প্রকার শোকের আলোড়ন দেখা গিয়াছিল তাহা খুব বেশী দেখা যায়নি।

এই মহাপুরুষের জন্মের পর একশত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার আদর্শ ও প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ভারতের সকল অঞ্চলে আশুতোষ জন্ম-শতবার্ষিকী দিবস পালন করা হইয়াছে।

আমরা যদি তাঁহার আদর্শ আমাদের জীবনে গ্রহণ করি, তবেই তাঁহার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইবে।

শ্রীসত্যশংকর সুর
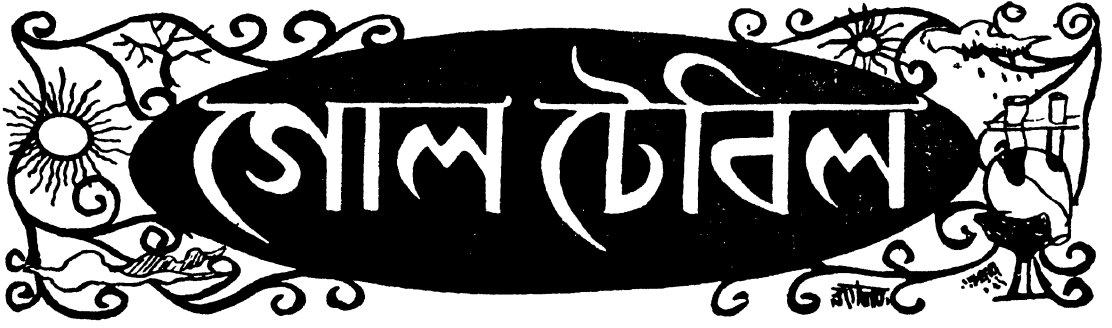
লাল কেল্লা (Red Fort)

দিল্লীতে সম্রাট সাজাহান ১৬৩৯–৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই কেল্লা নির্মাণ করেন। এইটাই সম্রাটের রাজকীয় প্রাসাদ ছিল। এই কেল্লার দেওয়ালগুলি জমকালো লাল বেলেপাথর দিয়ে তৈরী—সেই জন্য এর নাম লাল কেল্লা। এই লাল কেল্লা দিল্লী শহরকে সব বিষয়ে প্রভাবান্বিত করেছে এবং এটা প্রাচীন মুঘল গৌরবের প্রধান চিহ্ন। এই লাল কেল্লার দু'টি বিশেষ দ্বার আছে।

ওয়াম্বাট

এই জন্তুটি একমাত্র অষ্ট্রেলিয়া ও টাসমানিয়াতে দেখা যায়। এরা পেটের নীচের থলিতে নিজেদের বাচ্চা বহন করে (Pouched animal)। সাধারণভাবে জন্তুগুলি বড় আকারের কুকুরের মত দেখতে এবং কুৎসিত। তীক্ষ্ণদন্তী জন্তুর মত এদের ধারাল দাত আছে। এরা বেশ মাটি খুঁড়তে পারে। কথিত আছে, এরা সাধারণতঃ ১০০ ফিট পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে গর্ত করতে পারে।

জেমস্ কুক

বিখ্যাত বৃটীশ নৌবাহিনীর নেতা ও পর্যটক ছিলেন ক্যাপ্টেন কুক। তার জাহাজের নাম ছিল Resolution। তিনি দু'বার এই জাহাজে সমুদ্র-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি ১৭৭২-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্র-পথে অ্যান্টার্টিক প্রদেশ আবিষ্কার করতে যাত্রা করেন এবং New Hebrides ও New Caledonia-ও আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয় যাত্রায় তিনি উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়েছিলেন, সম্ভব হলে আমেরিকার উত্তর দিক ঘুরে একটি সমুদ্রপথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে কয়েকটি আদিবাসীর হাতে জেমস্ কুক প্রাণ হারান।

ক্যাপ্টেন স্কট

ক্যাপ্টেন রবার্ট ফ্যালকন স্কট নামে একজন বিখ্যাত সামুদ্রিক অভিযানকারী। 'টেরানোভা' নামে একটি ছোট জাহাজ নিয়ে ১লা জুন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে অ্যান্টার্টিকে যাত্রা করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্কট Ross দ্বীপে শীত-যাপন করেন এবং পরে সদলবলে সেই বৎসরের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারীতে এখানে এসে তিনি দেখেন, নরওয়েবাসী বিখ্যাত পর্যটক এমণ্ডসেন তাঁর আগেই এসে পৌঁছে গেছেন। এর পরে ফিরতি পথে ক্যাপ্টেন স্কট সদলবলে কেমন করে মৃত্যুমুখে পতিত হন তা একটি বিয়োগান্ত করুণ ঘটনা, যা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

(সমালোচনার জন্য দুখানি বই পাঠাবেন)

আমাদের দেশ (অন্ধ্র)—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী। এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২.৫০

'আমাদের দেশ' নামক ভারত-ভ্রমণ সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অন্ধ্র'। এর আগে এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ 'উড়িষ্যা' প্রকাশিত হয়েছে। নিজেদের দেশকে ভাল ভাবে জানার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দেশের ছেলেমেয়েরা এই বইগুলি থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নানা বিষয় জানতে পারবে। লেখক বড়দের ভ্রমণ-সাহিত্যে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, ছোটদের জন্যে লেখা এই বইগুলিও তাঁর সেই গৌরব আরও প্রসারিত করবে।

ভারী সুন্দর করে গল্পচ্ছলে অন্ধ্রের নানাবিধ বিষয় সহজ ভাষায় এই বইয়ে প্রকাশ করেছেন লেখক। অন্ধ্রের বহু মন্দির-শিল্প ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আছে বইখানিতে। অন্ধ্রে না গিয়েও, এই বই থেকে অন্ধ্র সম্বন্ধে সুন্দর জ্ঞান হবে ছেলেমেয়েদের। প্রকাশক কোন দিক থেকেই কার্পণ্য করেননি বইখানি ছাপতে। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট এবং বিশেষ করে প্রচ্ছদপটটি অত্যন্ত লোভনীয়।

ভাগনে যদি ভাগ্যে থাকে—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী। কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ২.০০

বইয়ের নামকরণেই যেমন শিবরামবাবুকে চেনা যায়, তেমনি বইয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও আভাস পাওয়া যায় বেশ কিছুটা। শিবরামবাবু ছোটদের প্রিয় লেখক। তাঁর প্রতিটি গল্পই ছেলেমেয়েরা উপভোগ করে। এই বইয়ে তাঁর মজাদার দশটি গল্প আছে। প্রত্যেকটি গল্পেতেই আছে হাসির অনাবিল প্রস্রবণ। গল্পগুলি সচিত্র হওয়ায় ছোটদের আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রচ্ছদপটটিও সুন্দর।

খেলার সাথী—স্বপনবুড়ো। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২.৫০

'স্বপনবুড়ো' ছোটদের সাহিত্যে দিকপাল বিশেষ। অসংখ্য গ্রন্থ তিনি লিখেছেন এবং আজও লিখে চলেছেন। শিশু সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর এই বইখানি ছবি, ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতির দিক থেকে একখানি অপূর্ব পূজার উপহার হয়ে উঠেছে। শিল্পী সমর দে'র আঁকা ও নানা রঙে অফসেটে ছাপা ছবিগুলিই এই বইয়ের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হয়ে ছোটদের মধ্যে কাড়াকাড়ি ফেলে দেবে। কাহিনীটিও চমৎকার এবং বেশ বড় টাইপে খুব ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যেই লেখা।

আমেরিকার ইতিহাসের রূপরেখা—ফ্রান্সিস হুইটনী। ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস, ৭ জওহরলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

আমেরিকায় ঔপনিবেশিকদের গোড়ার ইতিহাস যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি যুদ্ধবিগ্রহ ও ঝড়ঝঞ্ঝায় ভরা। সেদিনের সঙ্গে আজকের দিনের তফাত আকাশ-পাতাল। এই সুন্দর ছাপা, অসংখ্য চিত্রে ভরা বইখানির মধ্যে আংশিক ভাবে আমেরিকার ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি আটটি পরিচ্ছেদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে আরম্ভ করে, আধুনিক বিশ্বে আমেরিকার স্থান কোথায়, তার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় বইখানির মধ্যে। বাংলা অনুবাদটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য হয়েছে। কিন্তু অনুবাদকের নাম দেওয়া হয়নি কেন তা বোঝা গেল না।
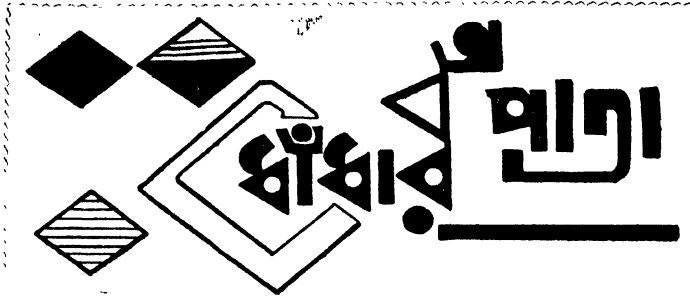
চোখের ধাঁধা

গত শ্রাবণ সংখ্যায় 'চোখের ধাঁধা' সম্পর্কে আমরা দু'টি ছবি ছাপি। অন্যান্য ধাঁধার মত আঁকা ছবিতেও অনেক সময় চোখে ধাঁধার সৃষ্টি করে। এখানকার ছবিগুলি থেকেও তোমরা তার কিছুটা পরিচয় পাবে।

পাশে বাঁদিকের চৌকো-চৌকো ঘর কাটা ছবিটিকে দেখতে দেখতে কখনো মনে হবে, উপরের চারটি-চারটি চৌকো আলাদা, নীচের চার-চারটির সঙ্গে। আবার কখনো মনে হবে, মধ্যের চারটি-চারটি আলাদা এবং নীচের ও উপরের দুটি-দুটি চৌকো আলাদা। তাছাড়া প্রত্যেকটির মধ্যে যে সমান ব্যবধান আছে তাও মনে হবে না।
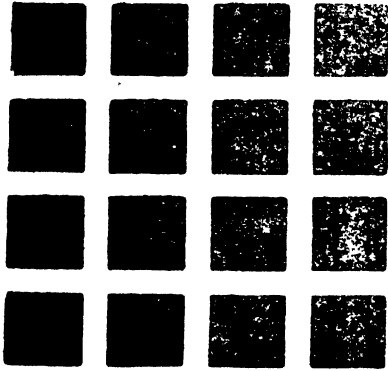
মাঝের এই ছবিটিও বিচিত্র ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। চারটি রেখার মাঝে যে দু'টি ক'রে লাইন আছে, সে দু'টিই সোজা, কিন্তু দেখাচ্ছে দুটি দু'রকম।
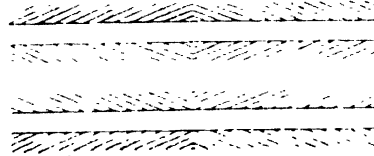
ডাইনের ছবিটি আরও মজার। তিনটি লোক যাচ্ছে একটি রাস্তা ধরে। এদের প্রত্যেকটি লোকই সমান সাইজের, কিন্তু দূরত্বের জন্যে এবং নীচে কাছের ফুটপাথ ও উপরের দূরত্ব দেখাবার লাইনগুলির জন্যে, তিনটি লোককে তিন সাইজের মনে হচ্ছে। এটিও একটি চোখের ধাঁধা।
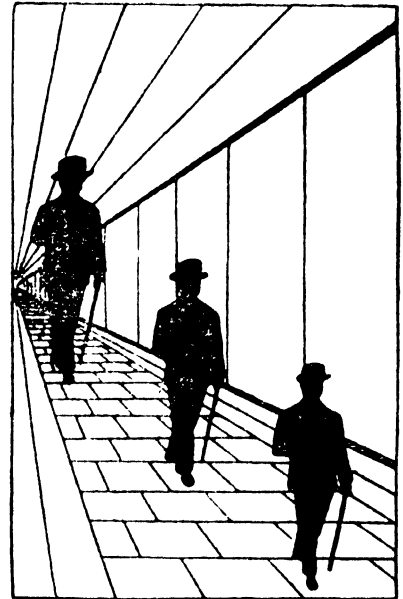
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ঃ ০'৪৫ নয়া পয়সা

পাহাড়ী দুই বন্ধু

ফটো : শ্রীরামকিংকর সিংহ

★ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ★

৪৬শ বর্ষ] কার্তিক ঃ ১৩৭২ [৭ম সংখ্যা

মায়ের শূন্য বুকে

শ্রীসুনীল সরকার

মাগো আর ঘরের কোণে
মন যে আমার রয় না,
বাহির পানে যাই ছুটে যাই
খোকন ধরে বায়না ?

খোলা মাঠ, সবুজ ঘাসে
করিগে ছুটোছুটি,
মাগো তুই বকিস্‌নেকো—
ধরি তোর চরন দু'টি !

ঘরের এই বদ্ধ হাওয়ায়
আমার যে দম ফেটে যায়
পারিনেকো সইতে,
আমায় তুই, দে ছেড়ে মা'
চেয়ে দেখ, সুয্যি মামা
যাচ্ছে বিদায় লইতে !

মিছে তুই ভাবিস নেকো
আমি নই ছোট্ট খোকা,
ভেবেছিস্ হারিয়ে যাবো
ছেলে তোর বড্ড বোকা !

জানি মা জানি মাগো
কেন তুই এমনি করে,
তোর ঐ বুকের মাঝে—
রেখেছিস্, আমায় ধরে !

ভেবেছিস্, দোব ধোঁকা
যেমনি তোর বড় খোকা—
গিয়েছে তোকে ছেড়ে,
আমি মা বলছি তোকে
তোর এই শুন্য বুকে
থাক্‌বো চিরতরে !!

ছড়া

শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইড়িক মিড়িক চিড়িক রে
চামচিকে দেয় হিড়িক রে,
বুকের মাঝে পক্ষী নাচে
ধিড়িক ধিড়িক ধিড়িক রে !

ইড়িক মিড়িক চিড়িক রে
কে কাকে দেয় হিড়িক রে,
চিলে-কোঠার খিড়কি খোলা
খিড়িক খিড়িক খিড়িক রে !

বিহঙ্গ

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

রাত শেষ হয়ে এল।

শীতের সুপ্তিমগ্ন দীর্ঘরাত। ঘরের চালের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বেলে হাঁসের ঝাঁক। কিচিরমিচির শব্দ ভেসে আসছে অস্পষ্ট সংগীতের মত। ঢেউতোলা টিনের চালের ওপর পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্ করছে শিশির বিন্দু। টুপটাপ করে ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ছে তারা ছাঁচতলায়।

নীরু জেগে আছে বিছানায়। বারান্দায় ঢালা বিছানায় শুয়ে আছে ঠাকুরমা, তপু আর শৈল। একধারে ছোট একখানা তক্তাপোষে নীরুর বিছানা। মার কাছে এখন আর সে শোয় না। বড় হয়েছে এখন সে। একলা শুতে আর ভয় করে না তার।

তবু মায়ের কথা বড্ড বেশী মনে পড়ে নীরুর। মনটা আকুলি-বিকুলি করতে থাকে মায়ের কাছে ছুটে যাবার জন্যে। শীতের এই রাত্রিশেষে মার গলা জড়িয়ে বুকের মধ্যে মাথাটি রেখে ঘুমিয়ে পড়তে যে কী আনন্দ!

এই তো মাত্র সেদিনের কথা। পূবের দীঘির পাড়ে বড়দের কপাটি খেলা সুরু হয়েছে। নীরু একলাটি বসেছিল ভাঙ্গা দোলমঞ্চের ওপর। দক্ষিণে হাওয়ায় কেমন একটা অশ্রান্ত অস্থিরতা। পশ্চিম আকাশে গাছপালার আড়ালে সূর্য নেমে যাচ্ছে। দীঘির পূব-পারের দীর্ঘ গাছগুলোর মাথায় স্বর্ণরশ্মি ছড়িয়ে আছে এখনো বিন্দু বিন্দু। পশ্চিম দিগন্তে পাতলা মেঘ-খণ্ডগুলো ঘন গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত। সন্ধ্যার ওই মায়াময় মেঘ-খণ্ডগুলোর দিকে চেয়ে চেয়েই মায়ের জন্য মনটা তার ভারী হয়ে উঠেছিল। মা কেমন আছে কে জানে! বাড়ি গিয়ে যদি মাকে আর সে না দেখতে পায়!

খেলা দেখা, দীঘির পাড়ের খোলা হাওয়া, অফুরন্ত ছুটির আনন্দ সব ফেলে দৌড়ে বাড়ি চলে এসেছিল নীরু। মা তখন কাপড় ধুয়ে পেতলের কলসী কাঁখে জল নিয়ে যাচ্ছিল পুকুর ঘাট থেকে। পেছন থেকে মা মা বলে চিৎকার করে মায়ের আঁচল চোপ ধরেছিল নীরু। বাবা উঠানে বসে বাঁশের বাখারি চেঁছে চেঁছে জড়ো করছিলেন। বেড়া বাঁধা হবে। হাঁ হাঁ করে তেড়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু মায়ের আঁচল ছাড়েনি নীরু। মা পেছন ফিরে স্মিতহাস্যে চেয়েছিলেন তার দিকে। মায়ের সে হাসি-মুখ ভুলতে পারবে না নীরু কোন দিন। রান্না ঘরে ঢুকে কাঁখ থেকে কলসী নামাতে নামাতে মা বলেছিল, আর পারিনে বাপু। ছাড় দিকি। এই দ্যাখো—ওমা তোর হল কি বলত আজ?

কলসী নামাতেই মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নীরু। মা তো হেসে একেবারে কুটোপাটি! —বলেছিল, সবাইকে বলে দেব আমি, দাঁড়াও। অত বড় ছেলে—

সারাটা সন্ধ্যাবেলা মায়ের কাছে বসেছিল নীরু। হাতে হাতে মায়ের কাজ গুছিয়ে দিয়েছিল। আর বলেছিল, মা, সে গল্পটা বল না একবারটি। তার মাথাটা কোলে টেনে নিবিড়

মমতায় মা গল্প বলেছিল সেদিন। রান্না ঘরের দরজা খোলা। জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে সমস্ত উঠানটা। ঝিরঝিরে হাওয়ায় দুলছে উঠানের কোণের আমগাছটার শাখা-পল্লবগুলি। ঝিঁঝি পোকা ডাকছে জঙ্গলে। আশ্চর্য সে রাতে মা আর পাড়ার কথা একবারও বলেনি।

আরও একটা রাতের কথা মনে পড়ে নীরুর। তখন সে আরও ছোট। বাবার অসুখ চলছে। রাতে ঘুমুতে পারেন না। বাবা-মার বিছানা থেকে দূরে মাটিতে বিছানা পেতে শুয়েছিল নীরু। ঘুম আর আসে না। কেমন ভয় ভয় করে। একলা শোওয়া এই তার প্রথম। মাকে ডাকতে ইচ্ছে করে বার বার। কিন্তু পারে না। বাবা যদি ধমক দিয়ে ওঠেন।

শেষ রাতে কখন মা এসে শুয়েছিল তার বিছানায়। বুকে চেপে ধরেছিল তাকে। "বাবা সোনা লক্ষ্মী মানিক আমার"—

মার মিষ্টি মিষ্টি আদরের কথাগুলো আজও যেন স্বপ্নের ঘোরে তার কানে কানে তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। মায়ের নরম বুকে মাথা গুঁজে শুয়ে সমস্ত অভিমান তার ধুয়ে-মুছে গিয়েছিল এক মুহূর্তে। কি গভীর যে সে তৃপ্তি! সে রাতের মত রাত আর তার জীবনে ফিরে আসবে না কোনদিন।

এখন সে বড় হয়েছে। ঘেরা বারান্দার একধারে একটা তক্তপোষে একলা শোয়। তারপর আরো বড় হবে সে। মাকে আর পাবে না যখন তখন। মা দূরে সরে যাবে। তারপর একদিন বা কোন সুদূরে মিলিয়ে যাবে।

সেও চলে যাবে কত নতুন দেশে, কত দূর দূরান্তরে।

আর এক ঝাঁক বেলে হাঁস উড়ে গেল চালের ওপর দিয়ে।

ওদের কলরব মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

ওরা পড়বে গিয়ে পূবের দীঘির কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে। ভোর হবে। বেলা বাড়বে। এক সময় সে-বেলাও ধীরে ধীরে পড়ে আসবে। অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুও মিলিয়ে যাবে দীঘির পাড়ের তালগাছের মাথার ওপর থেকে।

বেলে হাঁসের দল উড়ে যাবে আকাশে ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে। উড়ে যাবে ওরা কোন্ দেশের নদীর চড়ায়, কাশবনে। ঘুমিয়ে পড়বে জ্যোৎস্নার নরম আলোয়, নদীর হিমেল হাওয়ায়। তারপর আবার রাত শেষ হয়ে আসবে।

আবার সুরু হবে ওদের আকাশ-যাত্রা।

মহাদীর্ঘ ওদের পথ। অন্তহীন ওদের উড়ে চলা।

জানোয়ারী কাণ্ড

শ্রীসৌমেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এবারে বলছি—জন্তু-জানোয়ারদের আজব-কীর্তিকলাপের আরেকটি মজার কাহিনী। এ ঘটনাটি ঘটেছিল—আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে···বিগত প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সমসাময়িককালে—জার্মানীর প্রতিবেশী ইউরোপেরই এক সামন্ত-রাজার রাজ্যে। তবে ঘটনাস্থল বিলাত-বিভুঁই হলেও, এ কাহিনীর আসল নায়ক কিন্তু ছিল আমাদের ভারতবর্ষেরই পাকা-সেয়ানা এক জংলী-হাতী···ওদেশের লোকজনেরা আদর করে তার নাম রেখেছিলেন—জাম্বো। জাম্বোর জন্ম ভারতের আসাম-অঞ্চলের এক গহন-ঘন পার্বত্য-জঙ্গলে। কাজেই আমাদের দেশের জংলী-জানোয়ার জাম্বো সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে সুদূর ইউরোপের বিদেশী-রাজ্যে হাজির হলো কিভাবে, সে রহস্য জানবার জন্য তোমাদের মনে হয়তো রীতিমত কৌতূহল জাগছে!··· তাহলে শোনো—তার আসল ইতিহাসটুকু।

যে আমলের কথা বলছি, আসাম-অঞ্চল তখন ছিল রীতিমত দুর্গম-অরণ্যময় পার্বত্য-এলাকা ···জন্তু-জানোয়ার, সাপখোপ, পোকামাকড়ের অবাধ-বিচরণভূমি···জন-বসতিও ছিল নিতান্তই অল্প এবং শহর আর গ্রামাঞ্চলগুলি ছিল এখনকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত-ধরণের··· আজকালকার মতো পাকা-বাঁধানো বাড়ী-ঘর, পথ-ঘাট, কিংবা যান-বাহন চলাচলের সুব্যবস্থারও বিশেষ অভাব ছিল সেখানকার জংলী-পাহাড়ী রাজ্যে। তবে নানান্ বিলাতী-কোম্পানীর ছোট-বড় নানা ধরণের চা-বাগান পত্তনের দৌলতে, এ অঞ্চলে তখন সাহেব-সুবোদের ভিড় জমে থাকতো হামেশাই।···চা-বাগানের সাহেব-সুবোরাও ছিলেন রীতিমত বিলাসী-সৌখিন··· ফুরসত পেলেই তাঁরা জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে জন্তু-জানোয়ার শিকার করতে বেরুতেন। এমনি একদল সাহেব-শিকারী আসামের এক গভীর জঙ্গলে এসে সেবার তাঁবু খাটিয়ে বসলেন···সঙ্গে তাঁদের একরাশ হাতিয়ার—বন্দুক, গুলি, পিস্তল···আরো কত কি সব। জঙ্গলে হাজির হয়েই তাঁরা সোৎসাহে শিকার-অভিযান চালালেন···আজ বুনো বাঘ মারেন, কাল জ্যান্ত সিংহ ধরেন, পরশু প্রকাণ্ড গণ্ডার, তরশু দুরন্ত বন্য-বরাহ, তারপর দিন শিঙওয়ালা হরিণ বেঁধে আনেন···এমনি ভাবে তেড়ে দাপট চালিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরা সারা জঙ্গলে দারুণ এক আতঙ্ক-ত্রাস সৃষ্টি করে তুললেন। জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার সব সারাক্ষণ শিকারীদের ভয়ে কাঁটা! দম্‌কা-বাতাসে গাছের পাতাটি নড়লেই তারা সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে ওঠে—ঐ বুঝি শিকারী এলো বন্দুক বাগিয়ে নিয়ে!

জাম্বো তখন নিতান্তই শিশু···জঙ্গলের হাতীর দলের সর্দারের বাচ্চা···কাজেই কাকেও পরোয়া

করে না সে···যেমন তুরন্ত-জেদী, তেমনি অবাধ্য-চঞ্চল !···বাপ-মা কারো কোনো কথা শোনে না ···যখন যা ইচ্ছা হয় তাই করে বেড়ায়···জাম্বোর দৌরাত্ম্যে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার সবাই তো প্রায় পাগল হবার জো ! যেটি বারণ করা হবে, একরত্তি জাম্বো ঠিক সেই কাজটিই করে বসবে তৎক্ষণাৎ···এমনই বেয়াড়া অবাধ্য আর নাছোড়বান্দা তুরন্ত-দস্যি !···ঝোঁকের মাথায় কখন যে কি বিপদ বাধিয়ে তুলবে, সেই ভয়েই সারাক্ষণ কাঁটা হয়ে থাকতো জাম্বোর বাবা আর মা !

কাজেই জঙ্গলে সেবার শিকারীদের দাপট সুরু হতেই, পাছে কোনো অনাসৃষ্টি-কাণ্ড বাধিয়ে বসে, সেই ভয়ে আকুল হয়ে জাম্বোর বাবা-মা তুজনেই পই-পই করে তুরন্ত-দস্যি জাম্বোকে মানা করেছিল,—ওরে তুষ্টু খোকা···আমাদের ছেড়ে, খবর্দার, দূরে কোথাও একলা যাস্‌নি যেন ! তাহলেই ঐ শিকারীরা তোকে তাক্ করে বন্দুকের গুলি ছুড়বে···নিস্তার পাবি না আর কোনোমতেই !

অবাধ্য-তুরন্ত জাম্বো কিন্তু বাবা মা'র সে কথায় কান দিলো না এতটুকু···তার মন তখন মেতে রয়েছে শিকারীদের আজব-কীর্তিকলাপ দেখবার নেশায় ! কাজেই একদিন তুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর, বাবা-মা কাউকে কিছু না বলেই চুপি চুপি জাম্বো গিয়ে হাজির হলো জঙ্গলের প্রান্তে —সটান্ সেই শিকারীদের তাঁবুর পাশে।

ক'দিন একানাগাড়ে বন-জঙ্গলে টহল দিয়ে ঘোরাঘুরি আর হাড়ভাঙা-পরিশ্রমের পর, শিকারীরা সেদিন নিত্যকার মতো মৃগয়া-অভিযানে না বেরিয়ে, দিব্যি খোশ্-মেজাজে নিজেদের তাঁবুর বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে সবেমাত্র বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করতে সুরু করেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁদের কানে এসে পৌছুলো—তাঁবুর বাইরে তুমুল কলরব···যেন মহা-প্রলয়ের তাণ্ডব-লীলা সুরু হয়েছে।

দিন-তুপুরে জঙ্গলের মাঝে আচম্‌কা এমন হট্টগোল শুনে, ব্যাপার কি ঠাওর করার জন্য তাঁবুর পর্দার বাইরে মুখ বাড়াতেই শিকারীরা দেখেন—তাঁদের শিকার-শিবিরের ঠিক সম্মুখে বুনো ঝোপঝাড় আগাছায় ভরা জঙ্গলী-প্রান্তরে এদিক থেকে ওদিক নিতান্তই সন্ত্রস্ত-উদ্বিগ্ন-অসহায়ভাবে পাগলের মতো দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে দিব্যি-নধর-পুরুষ্টু চেহারার একরত্তি একটি বাচ্চা-হাতী···এবং তার পিছনে তুমুল আক্রোশে কলরোল তুলে সদর্পে তাড়া করে চলেছে শিকারীদেরই একরাশ বেপরোয়া গোঁয়ার বড়-বড় কুকুর।

এ দৃশ্য দেখেই, শিকারীদের আর বুঝতে বাকী রইলো না যে—ব্যাপারটা আসলে কি ঘটেছে ! ···অর্থাৎ, জঙ্গলের জীব জাম্বোকে এমন আচম্‌কা বন থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে এসে শিকারীদের তাঁবুর আশেপাশে সন্দিগ্ধভাবে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখেই, শিকারী-কুকুরের দল শত্রু-সন্দেহে তার পিছনে সগর্জনে প্রবল আক্রোশে ফেউয়ের মতো তাড়া লাগিয়েছে !

বেচারী জাম্বো···নিতান্তই নিরুপায় সে !···এ ধরণের আজব-অভ্যর্থনার জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না···তাছাড়া এমন হাঙ্গামা যে ঘটতে পারে—এ ছিল তার স্বপ্নেরও অতীত !···বাবা-মা'র

কথা অমান্য করে বনের বাইরে দূরে চুপিচুপি একলা পালিয়ে না আসাই উচিত ছিল !···তাহলে আর এমন বিপদ ঘটতো না !···পরিত্রাণের তো আশা নজরে পড়ে না !

জাম্বো পড়লো মহা-ফাঁপরে !···আশপাশে জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের আড়ালে কোথাও যে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবে—সে উপায়টুকু পর্যন্ত নেই·· চারিদিকেই ক্ষিপ্ত-উন্মত্ত শিকারী-কুকুরের ঝাঁক ব্যূহ-রচনা করে, বুনো-জোঁকের মতো তাকে একেবারে ঘিরে রয়েছে···তাদের ফাঁকি দিয়ে পালানো—রীতিমত দুঃসাধ্য···অসম্ভব ব্যাপার !···এমন অসহায় অবস্থায় জাম্বো জীবনে আর কখনো পড়েনি···কাজেই আচমকা এই বিপদে পড়ে তার মগজের বুদ্ধিসুদ্ধিও সব প্রায় লোপ পাবার দাখিল ! ভয়ে-আতঙ্কে হকচকিয়ে গিয়ে সে শুঁড় তুলে তারস্বরে চীৎকার করে জঙ্গলের কিনারায় সাজানো শিকারীদের তাঁবুর সারির আশেপাশে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলো···শিকারী-কুকুরের দলও নাছোরবান্দা—তারাও সগর্জনে অসহায় মাতঙ্গ-শিশু

জাম্বোর পিছনে সমান দাপটে তাড়া করে ছুটলো। দু'পক্ষের এই তুমুল রেশারেশি, হট্টগোল আর হুটোপাটি-দৌরাত্ম্যে, নিস্তব্ধ-নিরালা জঙ্গল-প্রান্তর জুড়ে যেন শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই সুরু হয়ে গেল।

সোরগোল শুনে শিকারীদের দলের লোকজনেরা সবাই, যে যেমন পারলো, বন্দুক-বর্শা-লাঠি-হাতিয়ার জোগাড় করে দুদ্দাড়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে—পুরুষ্টু-নধর সেই বুনো-হাতীর বাচ্চা ক্ষিপ্ত-উন্মত্ত কুকুরের ঝাঁকের মাঝখানে নিতান্তই বেকায়দায় পড়ে প্রায় বেঘোরে প্রাণ হারাবার দাখিল!...এ দৃশ্য দেখেই শিকারীর দল তো আনন্দে আত্মহারা!...কথায় বলে,—মেঘ না চাইতেই জল...এক্ষেত্রেও ঘটেছে ঠিক তাই! জন্তু-জানোয়ারের সন্ধানে সারা জঙ্গল তোলপাড় করে তুলে এ ক'দিন রোজ তারা কত মেহনৎ, কত দুর্ভোগ-ঝামেলাই না সহে আসছে ...আর শেষে কিনা আচম্কা এই দিন-দুপুরে সরাসরি তাদের তাঁবুর জমির সামনেই সশরীরে এসে হাজির এমন জলজ্যান্ত একটি শীকার...এবং বরাতের গুণে, সেটিও হলো দিব্যি ফুটফুটে সুন্দর কচি-নধর এক বুনো হাতীর বাচ্চা! এমন সোনার সুযোগ কেউ কি সহজে ছাড়ে!...কাজেই শিকারীদের দলের ছোট-বড যে যেখানে ছিল, সোৎসাহে ছুটে এসে দড়ি-দড়া-শিকলের ফাঁশ এঁটে নিমেষের মধ্যেই অসহায় জাম্বো বেচারীকে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে তাদের তাঁবুর আঙ্গিনায় একপাশে বন্দী করে রাখলো।

বেচারা জাম্বো!...বাবা-মা'র কথা অগ্রাহ্য করে দল ছেড়ে জঙ্গলের বাইরে একা পালিয়ে আসার ফল, সে হাতে-নাতে পেলো!...মনে তার দারুণ আফ্সোস...ঝোঁকের মাথায় আচম্কা কেন যে এমন কাজ করে বসলো...নিজের বোকামী আর নিছক গোয়ার্তুমীর ফলেই না তার আজ এই হাল...অনর্থক একরাশ কুকুরের খপ্পরে পড়ে অপদস্থ নাজেহাল আর শিকারীদের কবলে বন্দী হয়ে চিরদিনের মতো নিজের স্বাধীনতা খুইয়ে মানুষের গোলামী-করার মর্মান্তিক দুঃখ-যন্ত্রণাভোগ!...এ চিন্তা মনে জাগার সঙ্গে সঙ্গেই বুনো-স্বাধীন জংলী হাতীর বাচ্চা জাম্বো রাগে-অপমানে ফুঁশে উঠলো..বিস্তীর্ণ-অবাধ বিশাল অরণ্যভূমির মুক্ত-স্বাধীন জীব সে...কোথাকার তুচ্ছ একদল শহুরে-শিকারীর দড়ি-দডা-শিকলের বাঁধনে বন্দী হয়ে থাকবার পাত্র নয়! কাজেই মুক্তিলাভের আশায় মরিয়া হয়ে উঠে সে বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার জন্য প্রাণপণে যুঝতে লাগল।

কিন্তু মুক্তি মিললো না কিছুতেই! বাঁধন-ছেঁড়ার জন্য জাম্বো যতই ধ্বস্তাধ্বস্তি করে, সেয়ানা-শিকারীর দল ততই ক'ষে বেঁধে রাখে তাকে, আরো মজবুত-শক্ত দড়ি-দড়া শিকলের ফাঁশ এঁটে। এমনিভাবে অনেকক্ষণ নানান্ কশ্রতী করেও জাম্বো যখন দেখলে যে তার কোনো চেষ্টাই সফল হলো না, তখন সে নিরুপায় হয়ে আকুল-কণ্ঠে কান্না জুড়ে দিলে—যদি তার ডাক শুনে...কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে জঙ্গলের দূর-প্রান্ত থেকে তার বাবা-মা কিংবা দলের অন্য কোনো হাতরা কেউ

সেখানে ছুটে এসে শিকারীদের খপ্পর থেকে তাকে উদ্ধার করে আবার সেই বনের পুরোনো আশ্রয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়! কিন্তু এমনই পোড়া বরাত যে, বেচারী জাম্বোর বাবা-মা কিংবা দলের আপন-জন কারো কোনো চিহ্নমাত্রও নজরে পড়লো না জঙ্গলের আশেপাশে কোথাও···সবাই যেন ভোজবাজীর আজব-মন্তরের ভেল্কী-মায়ায় সহসা সেই বিশাল জঙ্গল থেকে কর্পূরের মতো উবে মিলিয়ে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে কোন এক অজানা-রাজ্যে!

জাম্বোর মন হতাশায় ভারী হয়ে উঠলো···ওদিকে বেলা গড়িয়ে গিয়ে ক্রমশঃ সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এলো সারা জঙ্গল ঘিরে···তবু জাম্বোর আপন-জন কারো কোনো সাড়াশব্দটুকু নেই আশেপাশে কোথাও! জাম্বোর ভাবনা হলো—বনের জন্তু-জানোয়াররা সবাই তাকে ভুলে গেল নাকি!

ভাবনায় চিন্তায় আকুল হয়ে জাম্বো বেচারী তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথাও ভুলে গেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো দেখে শিকারীরা ওদিকে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া বিশ্রাম করার আগে, মজবুত-খোঁটার সঙ্গে দড়ি-দড়া-শিকলের বাঁধনে ক'ষে জড়িয়ে রাখা বন্দী জাম্বোর চারিদিকে বিরাট এক আগুনের ধুনী জ্বালিয়ে, রাতের খোরাক হিসাবে অভুক্ত বুনো-হাতীর বাচ্চার সামনে সাজিয়ে রেখে দিয়ে গেল—অল্প কিছু জংলী ঘাস-পাতা আর এক গামলা জল। জাম্বো তার ছিটেফোঁটাও স্পর্শ করলো না।

ক্রমে বাদুড়ের মতো কালো-পাখা বিস্তার করে রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়ে ঘনিয়ে এলো স্তব্ধ-বিশাল বনভূমির উপর·· ঝল্‌মলে চুম্‌কীর মতো একরাশ নক্ষত্র-ভরা আকাশের নীচে নিরালা-বনের প্রান্তে জলন্ত-আগুনের ধুনীর মাঝখানে একা অসহায়ভাবে চিন্তাকুল হয়ে ঠায় জেগে দাঁড়িয়ে রইলো জাম্বো।···দুঃখে-ক্ষোভে হতাশায় পাথরের মতো ভারী তার মন···ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ক্ষত-বিক্ষত তার দেহ···তবু অধীর-আগ্রহে কানখাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে সে···কখন কোন সুযোগে তার বাবা-মা কিংবা দলের কেউ এসে হাজির হবে সেখানে···কিন্তু প্রহর কেটে যায়··· তবু তাদের কারো দেখা নেই!

রাত আরো গভীর হয়ে এলো···সারা বন নিস্তব্ধ-নিথর···কোথাও কোনো শব্দ কিংবা কারো চেহারার চিহ্নমাত্র নেই···জলন্ত-আগুনের ধুনীর অস্পষ্ট-আভায় শুধু নজরে পড়ে—দূরে জঙ্গলের কিনারা ঘেঁষে সারি দিয়ে সাজানো শিকারীদের একরাশ তাঁবু···সে তাঁবুর অন্দরে শিকারীরা হয়তো এতক্ষণে পরম সুখে-আরামে গাঢ় নিদ্রায় অচেতন!···ঘুম নেই শুধু বেচারী জাম্বোর চোখে!···এমনি উদ্‌গ্রীব-অধীরভাবে একা শিকারীদের তাঁবুর পাশে জলন্ত-আগুনের ধুনীর মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার সময় হঠাৎ দূরে অন্ধকার গভীর জঙ্গলের ভিতর থেকে দম্‌কা-বাতাসে জাম্বোর কানে ভেসে এলো—একদল বুনো হাতীর সুপরিচিত কণ্ঠনাদ···ব্যাকুলভাবে

হাঁক দিয়ে হারিয়ে-যাওয়া তাদেরই কোনো সঙ্গীকে যেন খুজে বেড়াচ্ছে তারা! সে ডাক শুনেই জাম্বোর হতাশ মন আশার উদ্দীপনায় মেতে উঠলো···ভাবলো,—হয়তো তাহলে, এই বন্দীদশা থেকে তার মুক্তি মিলবে এবারে!···ঐ বোধ হয় এতক্ষণে সন্ধান পেয়ে ছুটে এসেছে তার বাবা-মা আর দলের সবাই! জাম্বোও সোৎসাহে সারা নিস্তব্ধ-বন কাঁপিয়ে তুলে সজোর-কণ্ঠে দিলো সে ডাকের জবাব।

কিন্তু বরাত তার নিতান্তই মন্দ···কাজেই জাম্বোর হাঁকডাক শুনে বুনো-হাতীর দল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসার আগেই, তাঁবুর পাহারাদার সজাগ শিকারীরা হানাদার হাতীর দলের হাঙ্গামা থামানোর উদ্দেশ্যে, তাড়াতাড়ি একরাশ মশাল জ্বালিয়ে, ঢাক-ঢোল টিনের ক্যানেস্তা পিটিয়ে মহা সোর-গোল বাধিয়ে তোলে হাতের বন্দুক-হাতিয়ার উঁচিয়ে অন্ধকার দূর-জঙ্গলের পানে তাক্ করে বেপরোয়া-দড়াদ্দাম গুলি ছুড়তে সুরু করলো। নিশুত-রাতে অন্ধকার জঙ্গলের মাঝে আচম্কা শিকারীদের এই তুমুল হট্টগোল, জ্বলন্ত-মশালের রঙিন রোশ্নি, বন্দুকের গুলির দম্কা ঝলক আর বেয়াড়া-কর্কশ কানফাটা আওয়াজ ···সেই সঙ্গে মুহুর্মুহুঃ গুলি-বর্ষণের প্রচণ্ড দাপটে হানাদার বুনো-হাতীর দল হকচকিয়ে গিয়ে জাম্বোকে উদ্ধার করার মতলব সাময়িকভাবে মুলতবী রেখে, অজানা বিপদের ভয়ে চোঁ-চা চম্পট দিয়ে পালালো গভীর জঙ্গলের নিরালা-নিরাপদ আশ্রয়ে।

বেপরোয়া বন্দুকের গুলি ছুড়ে, হৈ-হল্লা করে আর মশাল জ্বেলে ভয় দেখিয়ে তখনকার মতো বুনো-হাতীর দলকে দূরে তাড়িয়ে দিলেও, শিকারীদের মনের ভাবনা কিন্তু ঘুচলো না। তাদের দুশ্চিন্তা হলো,—এখনকার মতো না হয় ফন্দী-ফিকিরের দৌলতে জংলী-হাতীদের উপদ্রবের দাপট থেকে রেহাই পাওয়া গেল কোন মতে···কিন্তু সে আর কতক্ষণ?···খেয়াল হলেই আবার তো তারা সদলে ছুটে এসে হামলা হাঙ্গামা বাধিয়ে চোখের পলকে শিকারী-দের তাঁবুর আস্তানা, সাজসরঞ্জাম···এমন কি, দড়ি-দড়া-শিকলে আর খাঁচায় বন্দী করে রাখা বুনো জন্তু-জানোয়ার-পাখী, সব কিছুই দুরন্ত দাপটে ভেঙে গুড়িয়ে তছনছ-লণ্ডভণ্ড করে দেবে! কাজেই সে বিপদের ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পেতে হলে, অবিলম্বে তল্পী-তল্পা গুটিয়ে এ জঙ্গল ছেড়ে নিরাপদে অন্যত্র কোথাও সটকে পড়া দরকার! তাছাড়া ঝামেলা যা বেধেছে, তাও তো একরত্তি এই জাম্বোকে পাকড়াও করার পর থেকেই···পুঁচকে এই হাতীর বাচ্চাকে উদ্ধার করার জন্য হামেশাই শিকারীদের তাঁবুর আশেপাশে এবারে জংলী-হাতীদের নির্মম উৎপাত-উপদ্রব সুরু হবে! সুতরাং আরো বেশী জন্তু-জানোয়ার শিকারের লোভে এ জঙ্গলে পড়ে থেকে বিপদ ডেকে আনার চেয়ে, যত শীগগির সম্ভব এখান থেকে সরে যাওয়াই ভালো···

না হলে জংলী-হাতীর দলের আক্রোশে পড়ে পৈতৃক প্রাণটুকুও শেষে খুইয়ে বসতে হবে সবাইকে অকারণ এই গোঁয়াতুর্মীর ফলে!

বাকী রাতটুকু ঠায় সজাগ হয়ে বসে এমনি নানান্ চিন্তা-পরামর্শ করে কাটিয়ে দিয়ে, পরের দিন ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই শিকারীরা সোৎসাহে মেতে উঠলো—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জঙ্গলের সীমানা থেকে তাদের তল্পী-তল্পা গুটিয়ে শহরে ফিরে যাবার উদ্যোগ-ব্যবস্থায়। পুরো দু'দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা সবাই মিলে প্রাণপাত পরিশ্রম করে শিকারীরা অবশেষে তাদের সাজসরঞ্জাম, বন্দী জন্তু-জানোয়ারদের খাঁচা…সব কিছুই গুছিয়ে-বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে গাড়ী বোঝাই করতে সুরু করে দিলে…বাকী রইলো শুধু শিকারের তল্পী-তল্পা বোঝাই এই সব গাড়ীগুলিকে একে একে শহরের পথে রওনা করে দেওয়া।

বেচারী জাম্বো!…শিকারীদের এত ব্যস্ততার মাঝে সে একা জংলী-জমির একপাশে সর্বাঙ্গে দড়ি-দড়া-শিকলের ফাঁস এঁটে দাঁড়িয়ে নিরাশ-মনে সারাক্ষণ শুধু তাকিয়ে দেখছিল—তার আবাল্য-স্মৃতিজড়িত পরম-প্রিয় এই গহন-অরণ্য ছেড়ে চিরদিনের মতো অজানা শহরের প্রবাসী হয়ে সুদূর প্রসারিত অচেনা-পথে পাড়ি দেবার বিরাট উদ্যোগ-আয়োজন! জাম্বোর দুই চোখ অশ্রু-সজল…ক্ষোভে-দুঃখে-হতাশায়-অভিমানে পাথরের মতো ভারী তার মন…সারা দুনিয়া আজ তার কাছে একান্তই রুক্ষ…তিক্ত…বিষাক্ত হয়ে উঠেছে!

জঙ্গলের এলাকা ছেড়ে শিকারীদের মালপত্র আর জন্তু-জানোয়ারের খাঁচা-বোঝাই গাড়ী-গুলি পাহাড়ী-পথ মাড়িয়ে সুদূর শহরের পানে যাত্রা সুরু করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জাম্বো বেচারীর মনে-মনে আশা ছিল যে দলের আর কেউ না হোক, অন্ততঃ তার বাবা-মা হয়তো আবার এসে চেষ্টা করবে তাকে শিকারীদের কবল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে!…কিন্তু জাম্বোর সে আশা আর পূর্ণ হলো না শেষ পর্যন্ত · শিকারীদের বেপরোয়া গুলি-বর্ষণের দাপটে ভয় পেয়ে কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, সে রাত্তিরের পর থেকে জাম্বোর বাবা মায়ের চিহ্নমাত্রও চোখে পড়লো না তাঁবুর আশেপাশে ঘন-জংলী ঝোপঝাড়ের কোথাও! …এমন সঙ্গীন বিপদের মাঝেও বাবা-মা কারো দেখা না পেয়ে জাম্বো নিজেকে খুবই অসহায় বোধ করলো…ক্ষোভে-দুঃখে-হতাশায়-অভিমানে বেচারীর মন একেবারে মুশড়ে পড়লো! তার দু'চোখ নামলো অশ্রুর ধারা…বুক ভারী হয়ে উঠলো বেদনার ভারে! কিন্তু তার এই দুরবস্থা…অসহ্য মর্ম-যাতনার কথা জানাবে কাকে?…তেমন দরদী-আপনজন কেউ তার পাশে নেই আজ! এত বড় বিশাল পৃথিবীতে সে আজ নিতান্তই একা…জীবনের বাকী দিনগুলি কোথায় কিভাবে যে কাটবে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই!

কিন্তু এমনিভাবে দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করবার আর বিশেষ সুযোগ মিললো না জাম্বোর,

...মালপত্তর বোঝাইয়ের পালা শেষ হতেই, শিকারীরা আরো মজবুত ধরণের দড়ি-দড়া-শিকলের ফাঁস এঁটে বন্দী-অসহায় জাম্বো বেচারীকে তাদের মাল-গাড়ীতে চাপিয়ে সোজা পাড়ি দিল শহরের পথে। শিকারীদের চলন্ত মাল-গাড়ীতে সওয়ারী হয়ে, আবাল্যের স্মৃতি-বিজড়িত শ্যামল শোভাময় অরণ্যভূমি থেকে চির-বিদায়ের মুহূর্তে অশ্রু-সজল নয়নে ব্যাথাতুর-মনে জাম্বো অপলক-দৃষ্টিতে ঠায় তাকিয়ে রইলো—পিছনে দূর-দূরান্তে ক্রমশঃ অস্পষ্টভাবে মিলিয়ে যাওয়া সেই গভীর জঙ্গল...উচ্ছল পাহাড়ী ঝরণা...উন্মুক্ত প্রান্তরের পানে!

সেবারের মতো শিকার-অভিযানের পালা শেষ করে শহরে পৌঁছেই শিকারীরা জাহাজে চড়ে রওনা হলেন তাঁদের দেশে—সাগর পারে বিলাতে...সঙ্গে তাঁদের বিবিধ বিচিত্র সম্ভার—হাতীর দাঁত, বুনো-মহিষের শিং, বাঘের ছাল, গণ্ডারের চামড়া, হরিণের মাথা, ময়ূরের পালখ, খাঁচায় বন্দী জলজ্যান্ত জংলী-জানোয়ার, হরেক রকমের পাখী আর দুরন্ত হাতীর বাচ্চা জাম্বো! বিলাতের বাজারে চড়া দামে এ সব সওদা বেচে তাঁরা মোটা টাকা মুনাফা লুটবেন—এই ছিল শিকারীদের আশা!

শিকারীদের দৌলতে কালাপানি পার হয়ে বিলাতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই জাম্বোর কদর এমনই বেড়ে উঠলো যে, ওদেশী ছেলে-বুড়ো, পুরুষ-নারী সবাই তার জন্য পাগল। কারণ, বয়সে কাঁচা আর নেহাতই জংলী-জানোয়ার হলেও, জাম্বো আসলে ছিল যেমন চালাক চতুর, তেমনি প্রাণবন্ত-চঞ্চল। বিদেশে-বিভুঁয়ে শিকারী-সাহেবদের এক্তেজারীতে বন্দী থাকার সময়েও সারাক্ষণ হুটোপাটি আর নিজের খেয়াল-খুশী মতো দুরন্তপনা করে বেড়াতো যে, তাকে যাঁরাই দেখতেন, তাঁরাই পছন্দ করতেন...ভালবাসতেন...আদর-যত্ন করতেন...এমন কি অনেকে আবার মোটা টাকা দাম দিয়ে জাম্বোকে কিনতেও চাইতেন। কাজেই দাঁও বুঝে সেয়ানা-ব্যবসাদার শিকারীরাও রীতিমত চড়া-দামে জাম্বোকে শেষ পর্যন্ত বিক্রী করে দিলে জার্মানীর এক নামজাদা সার্কাসওয়ালার কাছে। সেই থেকেই জাম্বো রয়ে গেল এই সার্কাসওয়ালার দলে।

সার্কাসের দলে এসে জাম্বোর দুষ্টুমী-দুরন্তপনা কমলো না এতটুকু...বরং, বুড়ো সার্কাসওয়ালা আর তাঁর দলের লোকজনদের আদর-যত্ন, প্রশ্রয় পেয়ে বাড়লো আরো চতুর্গুণ! সার্কাসওয়ালার হাতে পড়ে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দিনে-দিনে শিক্ষা পেয়ে সে শুধু নানা রকম খেলা দেখানোর কায়দা-কসরতই আয়ত্ত করলো তাই নয়, উপরন্তু, দুষ্টুমী-দুরন্তপনার এত সব আজব-উদ্ভট কারচুপি আর ফন্দী-ফিকির বাধিয়ে তুলতে সুরু করলো হামেশা, যে জাম্বোর-দৌরাত্ম্যের দাপটে সার্কাসের দলের লোকজনের অবস্থা শেষ পর্যন্ত প্রায় ওষ্ঠাগত হবার দাখিল! জাম্বোর সে সব দৌরাত্ম্যের কাহিনী যেমন উদ্ভট, তেমনি মজার...শুনলে তাক্ লেগে যাবে তোমাদের। তবে এবারে সবিস্তারে সে সব কাহিনী বলবার মতো সুযোগ মিলছে না...কাজেই পরে শোনাবো'খন তোমাদের জাম্বোর সেই সব আজব জানোয়ারী কাণ্ডকারখানার কথা।

লক্ষ্মণ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নামটা মনে নেই—ছেলেটিকে মনে আছে। এক-একটা নাম-হারা ছেলে কেমন করে যে মনের মাঝখানটিতে জুড়ে বসে!

কিন্তু নাম ওর একটা দিতে হবে—না হলে গল্পটা তোমাদের মনে ধরবে না। ওর নাম ধরা যাক—লক্ষ্মণ। নামটায় রামায়ণী-গন্ধ আছে বলে আপত্তি করো না—জায়গাটা তো ত্রেতাযুগেই প্রসিদ্ধ ছিল। তখন ওই অংশটিকে বলতো জনস্থান। মধ্য-ভারত আর মহারাষ্ট্রের বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বিস্তৃত ছিল ওই অরণ্যভূমি। হাল আমলে উদ্বাস্তু-বসতির জন্য নামটা সকলের মুখে মুখে ফিরছে। তা যাক সে কথা, দণ্ডকারণ্যের যে অংশে আমরা বেড়াতে এসেছিলাম তার নাম নাসিক, আর যে জায়গাটিতে কয়েক রাত্রি বাস করেছিলাম সেটাও নাসিকের একটি অংশ—পঞ্চবটী। গোদাবরী নদীর এপার-ওপার দুটি শহর।

পঞ্চবটীতে রামচন্দ্র সীতা আর লক্ষ্মণকে নিয়ে বেশ কিছুদিন বাস করেছিলেন। এইখানেই খর দূষণ নামে দুটো ভয়ংকর রাক্ষসকে তাদের বিস্তর অনুচরের সঙ্গে বধ করেছিলেন। রাক্ষসী শূর্পণখার নাক কেটে দিয়েছিলেন লক্ষ্মণ। সেই কাটা নাকের ঘটনা থেকেই জায়গাটার নাম হয়েছে নাসিক। আবার এই পঞ্চবটীতেই রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন। সেইসব ঘটনার জন্য গোদাবরী তীরে এই পঞ্চবটী জায়গাটি তীর্থস্থান হয়েছে। আরও একটা কারণে জায়গাটা বিখ্যাত। এখানে বারো বছর অন্তর শ্রাবণ মাসে একটা মস্তবড় মেলা হয়। কুম্ভমেলা। কুম্ভমেলা না হলেও প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে গোদাবরী নদীতে অনেক লোক স্নান করতে আসে। যেমন প্রয়াগে—মাঘ মাসে হয় মাঘমেলা। এই সময়ে বহু যাত্রী আসে পঞ্চবটীতে। আমরাও এসেছিলাম।

স্নান-ঘাটের নিকটেই দর্শনীয় মন্দিরগুলি রয়েছে। স্নান সেরে বহু যাত্রীই সেদিকে যাচ্ছেন। আমরাও যাচ্ছিলাম—একটি ১৩।১৪ বছরের ছেলে আমাদের সঙ্গ নিলে। বললে, আসুন আমার সঙ্গে—রামজীকে দর্শন করবেন।

আমরা বললাম, আমরা মন্দির চিনে নিতে পারব—তুমি যাও।

সে কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়ল না। ওর সঙ্গেই ঘুরে ঘুরে দু'তিনটি মন্দির দেখলাম। আরও দূরের কয়েকটি মন্দির দেখাবার জন্য ও আগ্রহ প্রকাশ করল। আমরা বললাম—কাল যাব।

তারপর যা দক্ষিণা দাবি করল—তাতে আমাদের রাগ হবারই কথা। মোটেই পরিশ্রম করল না—অথচ মোটা পারিশ্রমিক দাবি করছে! আমরা ঠিক করলাম—কাল থেকে আর পাণ্ডার সাহায্য নেব না। নিজেরাই ঘুরে ফিরে সব দেখে নেব।

পরের দিন গোদাবরীতে স্নান করতে গিয়েও পাণ্ডার পাল্লায় পড়লাম। পাণ্ডা কিছুতেই আমাদের ছাড়বে না। মন্ত্র পড়িয়ে স্নান করাতে না পারলে ওর দক্ষিণা মিলবে না বুঝলাম। কাল পাণ্ডা-ছেলেটি ফাঁকি দিয়ে কিছু আদায় করেছিল—তার জ্বালাটা তখনও জুড়োয় নি। তবু একেও কিছু দিতে হল। জায়গাটা ভাল হলে কি হবে—এদের পাল্লায় পড়ে ভাল লাগছিল না।

আজ বিকেলে কোন মতেই ওদের পাত্তা দেব না ঠিক করে বেরিয়ে পড়লাম। আজ যাব তপোবনে—শহরের এক প্রান্তে—প্রায় মাইলখানেক যেতে হবে। ওদিকে খানিকটা বন আছে—অনেকগুলি মন্দির আছে—মঠ আছে—আশ্রম আছে। ওই দিকে লক্ষ্মণের তপস্যা-কুটীর আছে—সীতা যেখানে অগ্নি-প্রবেশ করেছিলেন—গোদাবরী সংগমে সেই জায়গাটি আছে—আর আছে ছোট ছোট পাহাড়। ভারী মনোরম স্থান।

মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে পথ চলছি—তবু মনে হচ্ছে—ঠিক পথে যাচ্ছি তো? শেষে একটি বারো-তেরো বছরের ছেলেকে সামনে পেয়ে শুধোলাম, ভাই তপোবন কোন্ দিকে? সেখানে কি কি দেখবার জিনিস আছে বলে দাও তো।

ছেলেটি অবাক হয়ে বলল, গাইড নেন নি কেন? বললাম, নিইনি তো। হবে আমাদের গাইড? ও মাথা নেড়ে বলল, না। আমি ইস্কুলে পড়ছি। বললাম, পড়লেই বা। য়ুরোপে শুনেছি ইস্কুল-কলেজের ছেলেরাই গাইডের কাজ করে। কিছু উপার্জনও হয় ওতে।

ছেলেটি মাথা নামিয়ে বলল, আমিও গাইডের কাজ করেছি। আমি পাণ্ডার ছেলে। বাবা এখনও পাণ্ডাগিরি করেন।

বললাম, তবে না বলছ কেন? এস—আজ আমাদের পাণ্ডাগিরি কর।

না। মাথা নাড়ল ছেলেটি। এখন আমি পড়ছি। ওতে পড়ার ক্ষতি হয়। এক সময়ে গাইডের কাজ করেছিলাম বলেই অনেকের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছিল। তাঁদেরই একজন আমাকে পড়বার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মাসে মাসে দশ টাকা করে পাঠান বই খাতা ইস্কুলের মাইনে বলে।

বললাম, তবে আর কি বলব—সঙ্গে যখন যাবেই না—পথটা দেখিয়ে দাও।

আমি দুঃখিত হয়েছি দেখে ছেলেটি খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বলল, আচ্ছা চলুন খানিকটা আপনার সঙ্গে যাই। এখনও এক ঘণ্টা সময় আছে—তারপর মাষ্টার-বাড়ী যাব।

খুশি হয়ে বললাম, চল।

ওর সঙ্গে তপোবনের মধ্যে এলাম। নামে তপোবন—এর মধ্যেও জনবসতি কম নেই। তবে পথগুলি অসমতল কাঁচা, এখানে-ওখানে ঝোপঝাপ্—এক পাশে চাষের জমি—অন্য ধারে ঢালু পাহাড়ের আসন পাতা। মঠ-মন্দির সর্বত্রই সেই বনবাসী রাজপুত্রের স্মৃতিচিহ্ন ভরা। সব মন্দিরেই—রাম লক্ষ্মণ সীতা তিন মূর্তি।

তপোবনের মধ্যে একটা জায়গা সব চেয়ে ভাল লাগল। লক্ষ্মণ-তপস্যার জায়গাটি। যেমন নির্জন তেমনি শান্ত পরিবেশ। তবু একটি বিসদৃশ দৃশ্য দেখে ওকে বললাম, এ কেমন হল? লক্ষ্মণ চৌদ্দ বছর সন্ন্যাসীর মত জীবন নিয়ে বনে ছিলেন,—জটা বল্কল ধারণ, পর্ণ-শয্যায় শয়ন, ঘুমোন নি, স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করেন নি, অথচ এখানে দেখছি দিব্যি শূর্পণখার মুখের পানে চেয়ে তরোয়াল দিয়ে ওর নাক কাটছেন!

ছেলেটি অপ্রতিভ হয়ে বলল, কি জানি আমি ভাল করে রামায়ণ পড়িনি—বাবা-দাদার মুখে শুনেছি—তাই বললাম। এবার ভাল করে পড়ে নেব। না হলে ভারী লজ্জা পাই।

একটু পরে বলল, জানেন বাবু, এই পাণ্ডার কাজটা ভাল নয়। লোকে ভাল চোখে দেখে না।

বললাম, তবু তো তোমার বাবা-দাদারা করছেন।

ছেলেটি বলল, কি করবেন ওঁরা তো ভাল লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি। অন্য কাজ কি বা করবেন। সংসার চলা চাই তো। না হলে খাবেন কি! আজকাল যাত্রীরা এ নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে—হেয় জ্ঞান করে। বলে, লোক ঠকিয়ে উপার্জন করছ তোমরা। তাই তো আমরা লেখাপড়া শিখছি। দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে—এখনও যদি দেশের ইতিহাস না জানতে চেষ্টা করি, সেটা তো লজ্জারই কথা। কত বিদেশী লোক এখানে আসে—আমাদের চেয়ে ভাল

জানে রামায়ণের গল্প। আমরা যা জানি—শুনে হাসে। বলে—কিচ্ছু জান না। লজ্জার কথা নয়?

আমরা ওর কথা শুনে আশ্চর্য হলাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর আত্মমর্যাদা বোধ জেগেছে—লেখাপড়া না জানার জন্য লজ্জা বোধ করছে। আর সেই কারণে নিজেদের বৃত্তিটাকেও ভালভাবে নিতে পারছে না। ও বেশ বুঝেছে এর মধ্যে ফাঁকি আছে। শুধু যাত্রীদের নয়—নিজেদেরও ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে।

তপোবনে বহুক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ালাম। এক সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে কেমন একটা আত্মীয়তা বোধ এসেছিল—তু' পক্ষই ভুলেছিলাম সময়ের হিসাব।

তপোবনের বাইরে এসে হঠাৎ মনে হল—ওর পড়ার ক্ষতি করিয়ে দিলাম তো!

বললাম, ভাই তোমার অনেকখানি সময় নষ্ট করিয়ে দিলাম।

ও হেসে বলল, তাতে কি! বেশ লাগল ঘুরতে। আপনার কাছে কত শিখলাম। দেখবেন এবার রামায়ণ মহাভারত আর ইতিহাসটা ভাল করে পড়ে নেব। কেউ ঠকাতে পারবে না।

খুসিতে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বিদায় নেবার আগে ওকে কিছু দিতে গেলাম—ও কিছুতেই নিতে চাইল না।

বললাম, তোমার পড়ার খরচ বলে এটা নাও।

ও বলল, কিন্তু আপনি ভাববেন আমি পাণ্ডাগিরি করলাম।

ওর সলজ্জ মুখের পানে চেয়ে কালকের সেই পাণ্ডা-ছেলেটির কথা মনে পড়ল। মাত্র পনেরো মিনিট আমাদের সঙ্গে ঘুরেছিল। এর চতুর্গুণ দক্ষিণা দিয়েও তাকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি।

অথচ তু' জনেরই বয়স এক—তু' জনেই পাণ্ডার ছেলে।

ছেলেটির নাম লক্ষ্মণ রাখলাম মনে মনে। বেমানান হলো কি?

জেনে রাখো

১২৭৬ সালে রোমে এক বছরে পর পর চারজন পোপ হন। এড্রিয়ন ভি'র মৃত্যু হলে ইনোসেণ্ট ভি তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন। কিন্তু পাঁচ সপ্তাহ কাটতে-না-কাটতে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভিসিডোমিনাস নির্বাচিত হয়ে মাত্র একদিন জীবিত ছিলেন। তাঁর পর জন্ একবিংশ পোপ হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়ে, সেই বছরেই দেহরক্ষা করেন।

বেজায় গরম

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কা
ডাকে
কাকেতে।
কাঠ - ফাঠা
এই রোদেতে।
তেষ্টায় ছাতিটা,
ফাঠে বুঝি শেষটা।
জল নেই এক তিল,
হাজা - মজা ঐ খাল - বিল।
ছায়ায় বসে ডাল কুকুরে,
ধুঁকছে ক'ষেই ভর দুপুরে।
গাও জ্বালানো গরমটাতে,
পথ - ঘাট্ বেজায় তাতে।
চল্ যাই গাছতলে,
আম, লিচু, জামরুলে,
খাই পেট ভরে
গাছেতে চড়ে।
দেরি হলে
যাওয়া
হবে
না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই সিঁড়ি-ভাঙ্গা কবিতাটির একটি বিশেষত্ব আছে। একুশটি লাইন আছে এই কবিতাটির মধ্যে এবং এক, দুই, তিন করে এগারো লাইন পর্যন্ত পঙ্‌ক্তিগুলিতে এগারোটি শব্দ আছে। তারপর এক, দুই, তিন করে শব্দগুলি আবার কমতে কমতে একে গিয়ে শেষ হয়েছে। এ ধরণের অর্থপূর্ণ সুষম কবিতা রচনা করার কৃতিত্ব আছে। অনেকে একে 'এক-একাদশ ছন্দ' বলে থাকেন। মৌ-সঃ

সংবাদ-বিচিত্রা

টাইপরাইটারের সাহায্যে লেখাপড়া শেখা

মস্তিষ্কে আঘাতের দরুন শিশুদের নানা প্রকার শারীরিক অক্ষমতা দেখা দেয়। এর ফলে স্পর্শশক্তি, বোধশক্তি, চলনশক্তি ও বাক্‌শক্তি হয় নষ্ট হয়, নয় লোপ পায়। এইসব শিশুরা লেখাপড়া শিখতে পারে না ও তার ফলে বড় হয়ে এক অভিশপ্ত জীবনযাপন করে। একমাত্র পশ্চিম জার্মানীতেই মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত পঞ্চাশ হাজার শিশু আছে ও সারা পৃথিবীতে তাদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ।

এদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে পশ্চিম জার্মানীর কোলোন শহরের উপকণ্ঠে একটি স্কুল আছে, যার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় শতখানেক। এদের শিক্ষাদানের জন্যে এই স্কুলের শিক্ষকরা এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তারা এমন একটি যন্ত্র তৈরী করেছেন যাকে বলা চলে, "আলোক লেখনী।"

এই পদ্ধতিতে ফ্ল্যাশলাইট সংযুক্ত একটি টুপি শিশুর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর অক্ষর লেখা একটি বড় কার্ডবোর্ডের চার্টে শিশু আলো ফেলে ফেলে গোটা বর্ণপরিচয় ও সম্পূর্ণ বাক্য তৈরী করতে শিখে নেয়। পরে একদল চিকিৎসক ও কলাকুশলী মিলে এই পদ্ধতির আরও কিছুটা উন্নতি করেছেন। এখন চার্টে লেখা প্রত্যেক অক্ষরের মাঝখানে একটি ছোট ফোটো-সেল রাখা হয়। এর ফলে শিশুদের নিক্ষিপ্ত আলোক সঙ্কেতগুলি বৈদ্যুতিক স্পন্দনে পরিবর্তিত হয়ে সেগুলির সাহায্যে একটি বৈদ্যুতিক টাইপরাইটার নিয়ন্ত্রণ করে। শিশুরা এই কৌশলটি খুব দ্রুত আয়ত্ত করে নিয়েছে ও এখন তারা এই পদ্ধতিতে তাদের আলোক-নিয়ন্ত্রিত টাইপ-রাইটার চালিয়ে সম্পূর্ণ রচনাদি লিখতে পারে। ভবিষ্যতে এই পদ্ধতির আরও উন্নতির সম্ভাবনা আছে। কোলোন স্কুলের এই সাফল্যের সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ও পৃথিবীর নানাদেশ থেকে এসম্বন্ধে খোঁজখবর আসতে শুরু করেছে। এই অভনব টাইপরাইটারের আরও উন্নতিসাধনের জন্য গভর্নমেণ্ট থেকেও উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। শীঘ্রই অল্প দামে এই টাইপ-রাইটার প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা হবে। সাধারণ টাইপরাইটার দিয়ে কাজ চলে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে।

প্লাস্টিকের ছাদে ঢাকা স্টেডিয়াম
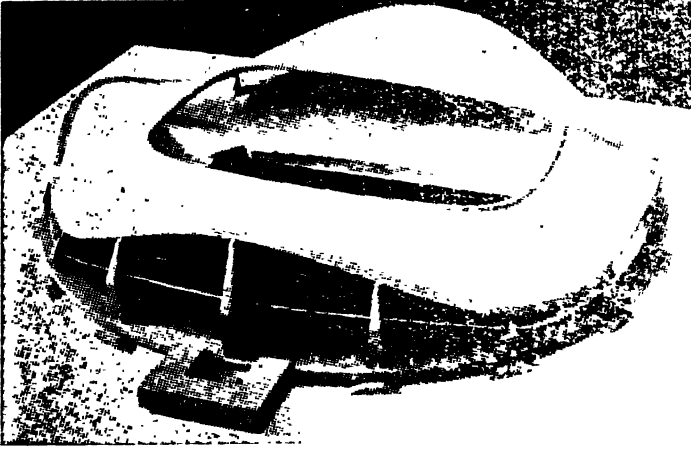
পশ্চিম জার্মানীর কোলোন শহরে ঢাকা স্টেডিয়াম তৈরী হয়ে গেলে খেলোয়াড় ও দর্শকদের জল-কাদায় ভিজে ফুটবল খেলার ও দেখার দুর্ভোগ পোয়াতে হবে না। ঢাকা স্টেডিয়ামে ৭৫০০০ লোক বসে ও দাঁড়িয়ে আরামে খেলা দেখতে পারবে। স্টেডিয়াম ঢাকা হবে প্লাস্টিকের চাদরে। খেলার মাঠ ঢাকা থাকবে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে, আর তার তলায় থাকবে ফ্লাডলাইটের সারি। তবে একদল দর্শক বেশ মনক্ষুণ্ণ হবে। দলীয় খেলার ফলাফলে যাদের মনে "প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি" জেগে ওঠে, যারা আস্তিন গুটিয়ে মাঠের মধ্যে নেবে পড়ে, তাদের নিরাশ করার জন্যে মাঠ ও দর্শকস্থানের মধ্যে ২৫ ফুট চওড়া খাদ থাকবে। মরুর বংশধরদের মধ্যে এমন কোন পবন-নন্দন নিশ্চয়ই নেই, যে 'জয় রাম' বলে সেই খাদ লাফিয়ে মাঠের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়বে।

যমজ খেলোয়াড়ে ভরা ফুটবল টীম

হামবুর্গে আলটোনা ৯৩ নামে একটা ফুটবল ক্লাব আছে যাতে এগারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে চার-জোড়া যমজ খেলে। ফলে বিরোধীপক্ষের খেলোয়াড়রা ও রেফারি পড়ে যায় মহা ফাঁপরে। দু'জোড়া যমজকে একটু লক্ষ্য করলে আলাদা করে চেনা যায়, কিন্তু আর দু'জোড়াকে আলাদা করে

চেনা মুশকিল। এই দল একবারও হারেনি। সম্প্রতি কাগজে কাগজে এদের সুখ্যাতি বেরুলে আরও কয়েক জোড়া যমজ এই দলে নাম লেখাবার জন্যে আবেদন করেছে। এজন্য আলটোনা ৯৩ ক্লাবকে হয়তো দ্বিতীয় একটা ফুটবল টীম গড়ে তুলতে হবে।

সার্জনদের কৃপায় সারসের প্রাণ রক্ষা

এই যে সারস পাখীটি দেখছো এটি শুধু প্লাসটিক সাজারির কল্যাণে বেঁচে গেছে; নইলে না খেতে পেরে মারা যেত। বিশ্বাস করবে কি যে এই পাখীটির ঠোঁট অ্যালুমিনিয়ামের?

বাচ্চা অবস্থায় এই মাদী সারসটি বাসা থেকে পড়ে যায়, কিন্তু উইলহেলম শডেন নামে এক চাষী তাকে তুলে এনে বাড়িতে পালতে থাকে। পাখীটি এতো পোষ মেনেছে যে, ছেড়ে দিলেও উড়ে উড়ে কোথায় চলে গেলেও, ঠিক সে তার বাসায় ফিরে আসে। শীত পড়লে সারসরা গরম দেশে জোড়ায় জোড়ায় চলে যায়, কিন্তু দু'বছর ধরে এই সারসটি কোথাও না গিয়ে হামবুর্গের হাড়-কাঁপানো শীতেই কাটিয়ে দিয়েছে।

এবার ওর ঠোঁটের কাহিনীটা শোন। উইলহেলমের নানা রকম পশুপাখী পোষার শখ আছে। সারসের জালের ঘরের পাশেই থাকে উইলহেলমের একটা পোষা ভোঁদড়। উইলহেলম ভোঁদড়টাকে একদিন একটা মাছ খেতে দিয়েছিল। মাছের লোভে সারসটি জালের ফাঁক দিয়ে ঠোঁট বার করে যেই মাছটা নিতে গেছে, ভোঁদড়টা খপ করে তার ওপরের ঠোঁটটা কামড়ে মটাত করে ভেঙ্গে দিলে। উইলহেলম ডাক্তার ডেকে সারসের ভাঙ্গা ঠোঁট 'সলিন্ট' দিয়ে বেঁধে দিলে বটে, কিন্তু তা আর জোড়া লাগল না। তখন ডাক্তাররা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে একটা ঠোঁট তৈরী করে সারসটার ওপরের ঠোঁটের বাকিটুকুর সঙ্গে বেমালুম জুড়ে দিলেন।

অস্ত্রোপচারের সব কষ্ট সারসটি মুখ বুজে সহ্য করেছে। কিছুদিন হ'ল সে তার অ্যালুমিনিয়ামের ঝক্‌ঝকে ঠোঁট দিয়ে আবার খুটে খুটে খাবার খাচ্ছে। এ বছরের গ্রীষ্মে সে জোড় বেঁধেছে ও ডিম ফুটে তার বাচ্চাও হয়েছে। নকল ঠোঁট দিয়ে বাচ্চাদের খাওয়াতে তার কোন অসুবিধে হয় বলে মনে হয় না।

সারসরা সাধারণতঃ নিজের নিজের জোড়ের সঙ্গে থাকে। দেখা যাক এবারে শীতের আগে সারসটি তার জোড়ের সঙ্গে গরম দেশের দিকে পাড়ি দেয়, না তার জোড়াকেও হামবুর্গে ধরে রাখে। মনে হয় তার জোড় চলে গেলেও বিচ্ছেদ স্বীকার করে সে হামবুর্গেই থেকে যাবে।

দেখেছি তাই বল্‌ছি!

শ্রীঅতীন মজুমদার

বক-বকেনা আজ বক্‌বক্ যা-তা,
ছাতারে তার মাথায় ধরে ছাতা।
বৌ-কথা-কও কয় কথা প্রাণ-খুলে,
বুলবুলি তাই বুলিই গেছে ভুলে।
চোখ গেল ঐ চুপটি ক'রে থাকে,
নইলে কোকিল মারবে যে কিল তাকে।
পায়রা যাবে,—পায়না যাতে বাধা,
কাদা-খোঁচা খুঁচোয় না আর কাদা।
চড়াই দেখি গাছে চড়া-ই ছাড়ে,
সারস নাকি সার-কথা কয় তারে।

হাঁড়ি চাঁচা আন্‌লো হাঁড়ি ফুটো,
কাঠঠোক্‌রা আন্‌লো সে কাঠ-কুটো!
মাছরাঙা ঐ মাছ আন্‌তে চলে,
হাড়গিলে হাড় আন্‌তে তাকে বলে।
শঙ্খচিলের শঙ্খটা, ঐ বাজে,
পানকৌড়ি ঐ বসে' পান সাজে।
ছুটির দিনে আজকে সবার জন্য
চাতক-বাড়ী চায়ের নেমন্তন্ন।
এ সব ব্যাপার মজার না ভাই খুব-ই?
হাস্‌ছো কেন? ভাব্‌ছো কি আজগুবি?

দেখেছি তাই বল্‌ছি—বলে খুকু—
স্বপ্নে দেখা তফাৎ যা এইটুকু!

বুট-রহস্য

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পরনে মোর ধুতি-চাদর, বুটের বাহার তাহার সাথে ;
বলছে লোকে 'আস্ত বাঁদর', —কি যায় আসে কাহার তাতে ?
কি জন্য যে এ সজ্জা মোর জানলে তা' কেউ হাসত নাকি ?
আমার কেবল চেষ্টা এখন হাত-পাগুলো আস্ত রাখি।
শূন্যে চেয়ে পথ চলা মোর স্বভাব জানো আজন্মকাল।
কাদায় পড়ে ভূত সেজেছি, হোঁচট খেয়ে সন্ধ্যা-সকাল।
ঠোঁট কেটেছে, দাঁত ভেঙেছে,—নোতুন কি আর হাসবে লোকে ?
শেষের দিনের সে দৃশ্যটা আজও যেন ভাসছে চোখে।
দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে চলেছি ভাই, গঙ্গাস্নানে ;
কমলালেবুর দু'চার কোয়া চুষছি চেয়ে শূন্য পানে।
বলবে, এ মোর কেমন উপোষ ? ফল খাওয়া তো নয়কো দোষের।
চা-টোস্ট খেয়ে পূজোয় বসেন পিসেমশাই সুজয় ঘোষের।
হোটেলেতে মুরগী খেয়ে অঞ্জলি দেয় হারান, নরেন ;
মাছের ঝোল আর ভাত খেয়ে ঢের পুরুতমশাই উপোষ করেন।
আমি কেবল ভিজিয়ে গলা মন্ত্র বলার উপায় করি।
মায়ের কাছে মাফ চেয়ে নিই মনে মনে দু'পায় পড়ি'।
যাক সে কথা, পথে সেদিন ঘটল হঠাৎ ব্যাপারটা এ ;
ক্ষ্যাপার মতো একটা মানুষ ঘুমোচ্ছিল 'র‍্যাপার'-গায়ে
ফুটপাথে যে—দেখিইনিকো, যেই ঠেকেছে তার গায়ে পা—
খ্যাঁক ক'রে মোর গোড়ালিতে কামড়ে দিলে অমনি ক্ষ্যাপা।
লাফিয়ে উঠি' ধরলে টুঁটি ; চেঁচিয়ে বলি, "বাপরে, গেছি !
গলা ছেড়ে হাসল পাগল, বললে, "পায়ের মাপ দেখেছি।"
ছ'নম্বরী কিন্‌গে জুতো —ঊর্দ্ধমুখো দিনকানাটা।
বুট না পরে সুট করেছিস পেটে আমার ক্যান্‌রে পাঁঠা ?
ফুটপাথেতে কাটছে জীবন, মরলে হ'ত সুখের কথা।
তোর কিকে পেট ফাটল নাকো, বাড়ল কেবল বুকের ব্যথা।"
আমি বলি, "রাগ কোরো না, শুয়েছিলে, দেখিইনিকো।"

পাগল বলে "বেশ করেছ, জোর করে 'কিক্' করতে শিখো।
ছেলেবেলায় খবর পেতুম সাহেবলোকের বুটের গুঁতোয়
কতই কুলির ফাটত পিলে; তেমনি ধারা কোনও ছুতোয়
দেখছি গতি হয় কি না হয়। কতই জনের খাচ্ছি লাথি,
হয় না মরণ।" "আমিও ভাই, গোষ্ঠপালের নইকো নাতি।"
বোঝাই তারে, "মরবে যদি, আগে করো জীবন বীমা।
প্রিমিয়মের দায়টা আমার, মরলে সুখের নেইকো সীমা।"
পাগল শুনে অবাক, বলে, "কি লাভ, বাপু, তোমার তাতে?"
আমি বলি, "বাবা আমার বীমার দালাল, তাঁহার সাথে
চুক্তি র'বে—ওয়ারিশান আমিই হব। মিললে পরে
হাজার পাঁচেক—দেবই তোমার স্বর্গে যাবার ছিল্লে ক'রে।
ডুবতে যদি ভয় করে তো স্নানে নিয়ে ধাক্কা দে'ব।
দশটা টাকা পেলেই ছুরি মারবে বুকে গুণ্ডা 'হেবো'।
পথের বাতির বাল্ব্ ভেঙে নয় রাখব ফেলে অন্ধকারে,
বাস বা লরি এক নিমেষে ফেলবে পিষে একেবারে।"
পাগল কেবল মাথা নাড়ে। "পোটাসিয়ম সায়নাইডে
আপত্তি কি? 'আত্মহত্যা' লিখিয়ে র'ব 'সেফ সাইডে'।"
পাগল কি আর সাধে বলে! কিছুতে তার মত হ'ল না।
"কামড় যদি না চাও খেতে, বুট না প'রে পথ চোলো না।"
দাঁতেতে তার বিস ছিল কি? পা ফুলে ঢোল, শয্যাশায়ী
তু'মাস থেকে বুট ধরেছি; এ ভিন্ন আর উপায় নাহি।
খেলার মাঠে যেতুম নাকো, নেহাৎ গেলে গোল-কিপারী
স্কুলের টিমে নিতুম, এখন হাফ-ব্যাকেতে খেলতে পারি।
পায়ের আমার জোর বেড়েছে, বুট পরাটাও রপ্ত ক'রে
ভাবনা যাবে, কি করব, ভাই, পথের লোকে হাসলে পরে?
কোথায় কখন থাকবে পাগল, ফের কি পায়ে কামড় খাব?
মিললে দেখা এবার তাহার এক 'কিকে' ঠিক পেট ফাটাব।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(৬)

মনে আছে, কথাটা শুনে ভয়ানক দমে গিয়েছিলাম আমি সেদিন। জাহাজের ক্যাপ্টেন দুধওয়ালী-সাহেব সেদিন আর আমাকে ডাকেন নি। এ-জাহাজের চীফ্ ষ্টুয়ার্ড, যার কিনা জাহাজের খাবার দাবার দেখবার কথা, সেই আবার জাহাজটার 'পার্সার', বা টাকাকড়ি রাখবার লোক, জাহাজের কেরানীও বটে। এই মহামান্ত ষ্টুয়ার্ড মহাশয় অর্থাৎ মিষ্টার ডিসুজা, ক্যাপ্টেন-সাহেবের প্রিয়পাত্রও বটে। একটি দিনের মধ্যেই এ-সব খবর আমার জেনে ফেলার কথা নয়, বিশ্বাসই ফুরসুৎ-মতো এসে আমাকে বলে গেছে।

ডিসুজা সারাদিনে দু'বার মাত্র আমাকে ডেকেছিল, দু'খানা মাত্র চিঠি আমাকে টাইপ করতে হয়েছিল সারাদিনে। বেলা পাঁচটায় একটা ঘণ্টা পড়লো। সেই ঘণ্টা শুনে দেখি সবাই খাবার-ঘরের দিকে যাচ্ছে। তখন আমার কেবিনে আমি ছিলাম একেবারে একা। আন্দাজে-আন্দাজে ওদের সঙ্গ ধরে আমিও হাজির হলাম গিয়ে খাবার ঘরে। এ-টুকু আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল যে, আমাকে খেতে হবে অফিসারদের খাবার ঘরে, বিশ্বাসদের ঘরে নয়। আমি গিয়ে পৌঁছতেই দেখি, ঘরটা ভ'রে গেছে। মিষ্টার দুধওয়ালা নেই, তিনি সেদিন বাইরে খেতে গেছেন, কোন-এক বড়োসাহেবের বাড়ীতে সেদিন তাঁর নেমন্তন্ন ছিল। আমাকে দেখে ডিসুজা চোখ টিপে কাছে ডাকলো। গিয়ে বসলাম ওর পাশ। ও বললে—ইয়ু সিট্ হিয়ার এভরি ডে। দিস্ ইজ্ ইয়োর সিট্। (রোজ তুমি এখানে বসে খাবে। এটাই তোর জন্য নির্দিষ্ট আসন)।

ইয়েস্ স্যর।

এ-ধরণের ইংরেজী বললে বুঝতে পারি, কিন্তু 'টক্ লেটার' ধরণের ইংরেজী বললেই আমি কাৎ।

যাই হোক, খাবার দেওয়া শুরু হলো। কয়েকটা পাউরুটির টুক্রো, কিছু ধবধবে সাদা সরু চালের ভাত। আমি একটু অবাকই হলাম, বেলা পাঁচটার সময় আবার ভাত খায় কে?

ষ্টুয়ার্ড বললে,—ইয়ু ইট্ হ্যাম্?

'হ্যাম্' মানে কী, তা' জানা না থাকায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে। আমার ঠিক সামনেই একজন বসেছিলেন, চোখে চশমা, বয়সে চল্লিশের মধ্যে। গায়ের রঙ কালো। আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হাসলেন।

ষ্টুয়ার্ড তখন হিন্দীর আশ্রয় নিয়ে বললে,—শূয়ার। শূয়ার নেহি জান্তা? শূয়ারকা গোস্ত। সারাটা গা সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলো। আর্তকণ্ঠে বলে উঠলাম,—নেহী।

আমার প্লেটের পাশে ততক্ষণে কী-সব পিরিচে করে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। যে বয়টা পরিবেশন করছিল, তাকে ডেকে কী যেন বললে। ইংরেজীতেই বললে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বললে, যে, কিছুই বুঝলাম না।

সে চলে যেতেই ষ্টুয়ার্ড আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করলে,—মুর্-গা?

—নেহি।

—ও জিসাস্!—ডিসুজা বললে,—তোম্ ভেজিটেরিয়ান? (নিরামিষাশী)

—ইয়েস্।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। দুপুরবেলার খাওয়াটা বিশ্বাস আমার ঘরে এনে দিয়েছিল নিজের হাতে। প্রথম দিন বলে। ভাত, তরকারী আর মাছ। বেশ পেট ভ'রেই খেয়েছিলাম তখন, মনে আছে। আমি জাহাজে গিয়ে পৌঁছেছিলাম ওদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর, তাই এই ব্যবস্থা।

যাই হোক, আমি 'ইয়েস্' বলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সামনের সেই চশমা-পরা কালো লোকটি মুখ তুলে তাকালেন আমার দিকে, বললেন,—মাছ খাওনা?

পরিষ্কার বাঙ্‌লা কথা। সব ভুলে প্রায় চীৎকার করে উঠলাম বলা যায়,—আপনি বাঙালী?

দেখি, সারা ঘরখানার সাদা আর লাল মুখগুলো সব আমার দিকে চোখ বড়ো-বড়ো করে তাকিয়ে আছে।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করে খাওয়ায় মন দিলেন, আমার কথার উত্তর দিলেন না। চট্ করে মনে পড়ে গেল বিশ্বাসের কথা,—জাহাজে আর একজন বাঙালী আছেন, রেডিও অফিসার, নাম—ব্যানার্জী, ভয়ানক দেমাক, বাঙলায় কথাই বলতে চায় না।

ততক্ষণে ডিসুজা আমাকে বলে উঠেছে,—নাউ লুক, নো শাউটিং সি?

'শাউটিং' কথাটার মানে জানা ছিল বলে আন্দাজে-আন্দাজে ওর বক্তব্য বুঝলাম, কিন্তু, এ-ধরণের ইংরেজী শুনতে শুনতে যে আমার মাথা-টাথা সব গুলিয়ে যাবে!

ও বলতে চায়, চেঁচিয়ে কথা বোলো না,—এই ত? কিন্তু সেটা ভালো ইংরেজীতে বলা যায় না?

আমি আর কথা বললাম না, মুখ নীচু করে খেতে লাগলাম। মাছ-মাংস-টাংস আমায় দেয়নি, তরকারী, শাক, চাট্‌নী-মতন কী একটা যেন, তাই দিয়ে এক মুঠো ভাত খেলাম,—সবার শেষে দিয়ে গেল পুডিং, সেটা খেয়েই খুব তৃপ্তিলাভ করলাম। পাঁউরুটি ছুঁলাম না, ভাতও প্রায় সব প'ড়ে রইল, বেলা পাঁচটায় এতো কখনো খাওয়া যায়? কিন্তু, এরা সব খায় কী করে? দিব্যি, পাঁউরুটি কিংবা ভাত, আরও চেয়ে চেয়ে খাচ্ছে। আমার পাশে বসে ডিসুজা ত আস্ত একটা মুর্গীর ঠ্যাং-ই সাবাড় ক'রে দিলে!

পাছে আমার সঙ্গে বাঙলায় আবার কথা বলতে হয়, তাই আমার সামনে-বসা মিষ্টার ব্যানার্জী তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে গেলেন। আমি উঠতে পারতাম সবার আগে, কিন্তু অসভ্যতা হবে মনে করে চুপ করে বসে ছিলাম।

কিন্তু দেখলাম, ও-নিয়ম কেউ মান্‌ছিল না। যার যখন শেষ হচ্ছিল, উঠে পড়ছিল। আমি অবাক হচ্ছিলাম ওদের ওই খাওয়ার বহর দেখে। বিকেল বেলা পেট ভর্তি করে এতো-এতো খাবার খায় কী করে মানুষ?

উত্তর পেয়েছিলাম অনেকক্ষণ পরে, বিশ্বাসের কাছ থেকে। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই দেখি ভালো-ভালো প্যাণ্ট-সার্ট টাই পড়ে বেড়াতে বেরিয়ে যাচ্ছে। ডিউটি যাদের শেষ হয়ে গেছে, তারাই যাচ্ছে অবশ্য। ডিসুজা বেরিয়ে গেলেন, একসময় দেখি, বিশ্বাসও চলে যাচ্ছে। কালো রঙের লম্বা প্যাণ্টের ওপরে ফিকে হলদে রঙের সিল্কের হাওয়াই সার্ট। আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এলো, একটু হেসে বললো—কী, শহর দেখতে বেরুবেন না?

—না।

ও চলে গেল। জাহাজটা প্রায় ফাঁকা। ক্যাপ্টেন পর্যন্ত জাহাজে নেই। চীফ্ অফিসার আছে, কোয়াটার মাষ্টার আছে, আরও দু-একজন আছে ইঞ্জিন ডিপার্টমেণ্টের। ঘরে-ঘরে রেডিও বাজ্‌ছে। আমার ঘরের সামনেকার গলিটা নানা রকম স্বরে ভরে গেছে।

ধীরে ধীরে নীচে এলাম। কোয়াটার মাষ্টারের কাছে একটু দাঁড়িয়ে থেকে সিঁড়ি দিয়ে জেটিতে নেমে গেলাম। জাহাজটাতে নতুন রঙ করেছে। নামটা নতুন করে লেখা হচ্ছে, শেষ হরফটা শুধু বাকী। একটা ছোট তক্তার দু' পাশে দড়ি বেঁধে সেটা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে জাহাজের সম্মুখ ভাগে, জেটির দিকে। তাতে ব'সে একটি লোক তন্ময় হয়ে তুলি বুলিয়ে বড়ো হরফ্‌টা ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুল্‌ছে।

সন্ধ্যা হবো-হবো-র মুখে ফিরে এলো বিশ্বাস। আমাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই কাছে এলো। বললাম,—হলো শহর দেখা?

ও বললে,—না, চলে এলাম। আপনি একা রয়েছেন, ভাবতে কেমন বিশ্রী লাগলো।

জানেন, আমি যখন প্রথম আসি, তখন আমারও এমনি খারাপ লেগেছিল।

বললাম,—আমার ভাই একটুও আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। বিলেত-টিলেত যখন যেতে পারবো না, তখন মিছিমিছি জাহাজে থেকে লাভ কী?

ও বললে—চাকরী যখন নিয়েছেন, চট্ করে পালাবেন কী করে? জাহাজ ত ছেড়ে যাচ্ছে কালই।

—কাল!

—হ্যাঁ।

বললাম,—তাহলে, কী হবে?

ও বললে,—কী আর হবে? থেকেই যান আপাততঃ। একটা টিপ্ শেষ করেই 'সিক্' রিপোর্ট দিয়ে পালিয়ে যান কলকাতায়। সেখানে গিয়ে চাকরী দেবেন ছেড়ে। ভালো কথা, বাড়ীতে চিঠি দিয়েছেন?

বাড়ীর কথায় চোখ দুটো আমার ভিজে উঠেছিল। মুখ ফিরিয়ে কোনক্রমে বলেছিলাম,—না।

ও আস্তে আস্তে বললে,—মা ভাববেন না?

বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো মায়ের কথায়, বললাম,—ভাবলে আমি আর কি করবো, বলো? আমার বাবা আমাকে পাঠালেন। আমি জানি, আমি বিলেত যাবো, জার্মানী যাবো, আর এ কী হলো?

বলতে-না-বলতেই টের পেলাম, গলা আমার ধরে গেছে, চোখ ছাপিয়ে জল পড়ছে দু' এক বিন্দু। তাড়াতাড়ি বাহুতে মুখ ঢেকে একটু এগিয়ে গেলাম।

ফাঁকা জেটিটা এখানে। তারপরে কিছুটা সোজা হাঁটলে জেটিতে বাঁধা-পড়া আরেকটি জাহাজের পাশে গিয়ে পড়বো।

কিন্তু, সে-পর্যন্ত যেতে হলো না। বিশ্বাস আমার পাশাপাশি হেঁটে এলো একটা জাহাজ বাঁধা লোহার 'ক্যাপ্‌স্টান' পর্যন্ত। আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। সমুদ্রে ঢেউ নেই, ছলাৎ ছলাৎ করে নদীর মতো ছোট ছোট ঢেউ এসে জেটিতে লাগ্‌ছে। একটা ফেরী ষ্টীমার ফিরে আসছে তীরের দিকে।

বিশ্বাস বললে,—এখানে বসুন না?

বললাম,—ঠিক আছে।

ও-ও তাকালো ষ্টীমারের দিকে। বললে,—এলিফ্যাণ্টা গুহা থেকে ষ্টীমারটা ফিরছে লোকজন নিয়ে।

—এলিফ্যাণ্টা গুহা?

ও বললে নাম করা জায়গা। জানেন না? লোকে কতো দূর-দূর জায়গা থেকে আসে গুহাটা দেখতে। সুন্দর সুন্দর পাথরের মূর্তি আছে।

—তুমি দেখেছো?

বিশ্বাস মুখ নীচু করলে, বললে,—না।

সত্যি কথা বলতে কী, ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনটা একটু হাল্কা হয়েছিল। সন্ধ্যার আকাশ, জলটা কালো হয়ে আসছে, বন্দরের সব আলোগুলো জ্বলে গেছে,—অদ্ভুত লাগছিল চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে।

বললাম,—বসো এখানে। জাহাজের গল্প শুনি তোমার কাছ থেকে।

আমি বসলাম 'ক্যাপ্‌স্‌টান্‌'টার ওপরে। খুব মোটা আর শক্ত লোহা। জাহাজ জেটিতে লাগলে মোটা দড়ি দিয়ে এই 'ক্যাপস্‌টান্‌'টার সঙ্গেই বেঁধে রাখে জাহাজকে। এ জেটিটা শূন্য বলে, 'ক্যাপ্‌স্‌টান্‌'টাও শূন্য।

বিশ্বাস বসলো না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো পাশে। বললাম,—ভাই, আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম।

—কী?

বললাম,—বিকেল পাঁচটায় সবাই দেখি ভাত মাছ-মাংস খেয়ে নিচ্ছে পেট পুরে। রাত্রে আর কি খাবে তাহলে? বাব্বাঃ! জাহাজের মানুষগুলো খুব খেতে পারে, তাই না?

ও আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপরে বললে,—আপনি পেট ভরে খেয়ে নিয়েছিলেন ত?

বললাম,—সে কী? বিকেলে ত লোকে জলখাবার খায়! আমি অতো খাবো কেন?

বিশ্বাস বললে,—সর্বনাশ করেছে! জাহাজের নিয়ম-কানুন জানেন না? ঐ পাঁচটার সময়েই রাতের খাবার দিয়ে দেয়। খাওয়া-দাওয়ার পাট আবার সেই সকালে,—তা-ও জলখাবার,—যাকে বলে 'ব্রেক্‌ফাষ্ট,'—তার আগে আর রান্নাঘর খুলছে না! রাত্রে খিদে পেলে কী করবেন?

আমি ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছি। বললাম,—খিদে যদি পায়—মানে—ইয়ে—

ও হেসে ফেললো। বললো—ঠিক আছে। রাত্রে আটটার সময় বেরোবেন, আপনাকে কাছাকাছি কোনো হোটেল থেকে খাইয়ে আনবো'খন। একটু খরচা হবে, এই যা!

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম খানিকক্ষণ। ও বললে,—আসুন, বরং কাছাকাছি একটু ঘুরে ঘুরে বেড়াই, একেবারে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রাত্রে ফিরবেন জাহাজে।

—ওরা বকবে না?

—কে বকবে? আপনার সাহেব ত ডিসুজা,—সে বেরিয়ে গেছে। তার ফিরতে যার

নাম রাত বারোটা। দেখেন নি সিঁড়ির কাছে কী নোটিশ খড়ি দিয়ে লিখে দেওয়া হয়েছে ব্ল্যাক্‌বোর্ডের ওপর? সবাইকে ফিরে আসতে হবে রাত বারোটার মধ্যে।

বললাম,—চলো, দেখি গিয়ে।

ছু'জনে হেঁটে এলাম জাহাজে। কোয়াটার মাষ্টার যেখানে ডিউটি দিচ্ছে, অর্থাৎ 'গ্যাংওয়ে' সিঁড়িটা যেখানে জাহাজ থেকে জেটিতে নেমে পড়েছে, সেইখানে, জাহাজের গায়ে ঝুল্‌ছে ছোট্ট একটা ব্ল্যাক্‌বোর্ড। তাতে লেখা—

বিশ্বাস বললে,—দেখলেন ত? মিলিয়ে নিন আমার কথা।

বলা বাহুল্য জাহাজে আর উঠলাম না। কাছাকাছিই একটু ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম ছু'জনে। ওর সঙ্গে কথা বল্‌ছি, ঘুরছি-ফিরছি, কিন্তু মনের ভার কিছুতেই যাচ্ছে না। বিলেত টিলেত যেতে পারবো না শুনে মনটা সেই যে দমে গেছে, আর প্রফুল্ল হচ্ছে না কিছুতেই। অভিমান করে বাড়ীতেও চিঠি লিখলাম না। বাবারই ওপর রাগটা হতে লাগলো।

সেদিন ফিরতে রাত হয়েছিল প্রায় ন'টা। একা-একা কেবিনে শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছি, আর মনটা বিরূপ হয়ে উঠছে মা-বাবার প্রতি। আসবার সময় মা বারবার বলে দিয়েছিল, —ওরে গিয়েই চিঠি দিস্।

মনের ইচ্ছাও ছিল তাই। কিন্তু আশাভঙ্গের দরুন সব গেল গুলিয়ে। মন বললে,—ইস্-চিঠি লিখবে না ছাই! আমাকে 'বোকা' বানাবার বেলা মনে ছিল না!

ঘুম ভেঙেছিল পরদিন খুব ভোরেই। ষ্টুয়ার্ডের হাঁকাহাঁকি। চিঠি টাইপ করা। কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে ঘরে বসেই 'জলখাবার' খেয়ে নেওয়া। আর বাইরে চলেছে লস্করদের হাঁকাহাঁকি। এক সময় জাহাজটা জেটি ছেড়ে সমুদ্রে ভাসাল। টাইপ করা ছু'খানি চিঠি নিয়ে ষ্টুয়ার্ডের নির্দেশে ওপরে দিতে গেলাম ক্যাপ্টেনের হাতে। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল ক্যাপ্টেন আর পাইলট সাহেব। বন্দরের সীমানা পর্যন্ত পাইলট চালিয়ে নিয়ে যাবে জাহাজ, তারপরে জাহাজটা ক্যাপ্টেনের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি ফিরে আসবেন তাঁর বোটে করে। জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের পাশাপাশি ভেসে চলেছে ছোট্ট পাইলট-বোটটা।

আমি ক্যাপ্‌টেনকে ইংরেজীতে বললাম চিঠির কথা, উনি কিন্তু উত্তর দিলেন সেই হিন্দীতে, হো গিয়া বেটা কুমার? দো—হামারা হাথ্‌মে।

বিরস মুখে নীচে নেমে এলাম। আমার ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল বিশ্বাস, হাসি মুখে বললে,—গুড মর্ণিং!

—গুড্‌ মর্ণিং।

ও আমাকে বাইরের রেলিং-এ নিয়ে এলো। হু-হু করে হাওয়া আসছে। নীল জলরাশি—

আকাশটা যেন অনেক দূরে জলের ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছে। সাদা ডানাওয়ালা 'সমুদ্র পাখী'রা এধারে-ওধারে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বলে উঠলাম,—ইস্‌, জাহাজটা যদি বিলেত যেতো!

বিশ্বাস হাসলো, বললো,—অতো সব কবিত্ব আমার নেই। আচ্ছা ভাই, জাহাজটা এখন যাচ্ছে কোথায়?

ও বললে,—কোচিন।

—কোচিন? মানে,—ম্যাড্রাস—

ও বাধা দিয়ে বললে,—ঠিক ম্যাড্রাস্‌ নয়, কেরালা। পশ্চিম উপকূল। আরব সাগর।

বললাম,—আরব সাগরটা পেরোতে পারলেই ত,—আফ্রিকা, তাই না?

—হ্যাঁ।

একটু যেন উৎসাহ বোধ করলাম,—তাহলে, অন্ততঃ আফ্রিকা যেতে পারবো, কী বলো? ও ঠোঁট উল্‌টে বললে,—কখনো ত যায়নি এ-জাহাজ। বড় জোর মালদ্বীপ, লাক্ষা দ্বীপ, কিংবা বড়োজোর,—মরিসাস্‌।

—মরিসাস্‌!—আবার একটু উৎসাহিত হয়ে উঠলাম,—মরিসাসের কথা ভূগোলে যেন পড়েছিলাম মনে হচ্ছে! সেখানেও ত মশ্‌লা-টশ্‌লা কী সব পাওয়া যায়, তাই না?

ও বললে,—কে জানে। মরিসাসে একবার মাত্র গিয়েছিল শুনেছিলাম,—তখন আমি চাকরীতেই ঢুকিনি।

আবার দমে গেলাম। মন বললে,—হায়রে, জাহাজটা যদি অন্ততঃ মরিসাসও যেতো! মনের আকুলতা বোধ হয় সমুদ্র-দেবতা শুনেছিলেন। জাহাজ মরিসাসে শেষ পর্যন্ত না গেলেও এমন এক দ্বীপে গিয়েছিল,—যেখানে আমি পেয়েছিলাম অদ্ভুত একটি মানুষের দেখা, যার নাম, 'ক্রৌঞ্চদ্বীপের ফকির'। সে কাহিনীই এবারে বলবো। [ক্রমশঃ]

জেনে রেখো

একবার আফগানিস্থানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জেনারেল সার সাম ব্রাউন (যাঁর নামে মিলিটারী বেল্টের নামকরণ হয়েছিল) তাঁর দলের একজন সৈনিককে সান-ষ্ট্রোক, অর্থাৎ সর্দিগর্মীতে এবং অপর একজনকে ঠাণ্ডার কবলে পড়ে মারা যেতে দেখেন। একই দিনে সেখানে দুপুরে যেমন প্রচণ্ড গরম ছিল, সন্ধ্যায় তেমনি অসহ্য ঠাণ্ডা পড়ে।

শরৎ ঋতু সিংহাসনে

শ্রীসুধাংশু গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও নাটক সব ঋতুকে করেছে সমৃদ্ধ। শরতকালের তো তুলনাই নেই। তাঁর সেই যে—

মাতার কণ্ঠে শেফালি মালা
গন্ধে ভরেছে অবনী
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।

সুন্দর নয় কী! দেবী আনন্দময়ীর আগমনের সাড়া পড়ে গেছে। শেফালির মালা মায়ের কণ্ঠে। গন্ধে সমস্ত পৃথিবী আমোদিত। মেঘ হারিয়ে ফেলেছে জলধারা…আঁচলে বাধা যেন—নবনীর মতো শুভ্র তাঁর দেহ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিজেই "জীবন-স্মৃতি"তে শরৎকাল সম্বন্ধে লিখেছেন: আমি যে সময়কার কথা বলিতেছি সে-সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই, তখন শরৎ ঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা একটি বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ আকাশের মাঝখানে দেখা যায়—সেই শিশির ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনা গলানো রৌদ্রের মধ্যে মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি, সেই শরতের সকাল বেলায়—

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কী জানি পরাণ কী যে চায়।

রবীন্দ্রনাথের মোহনিয়া স্পর্শ রয়েছে নিচের কয়টি পঙ্‌ক্তিতে—

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে-মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে,
বনের-পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় উঠে চঞ্চলি।

তিনি বলছেন: হে শরত তোমার অরুণ আলোর দান সর্বত্র মোহন অঙ্গুলি বিস্তার করে প্রকাশ পেয়েছে। তোমার শিশির-স্নাত কেশপাশে—বনের পথে লুটানো অঞ্চলে প্রভাতের হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আর এক জায়গায় লিখেছেন—

মাণিক গাঁথা ঐ যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জছায়া গুঞ্জবনের সঙ্গীতে
ওড়্না ওড়ায় এ কী নাচের ভঙ্গীতে,
শিউলি বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি ॥

শরতের প্রশস্তিতে কবি শত মুখ। তাইতো তিনি বললেন: তোমার ঐ যে হাতের কাঁকন মাণিক দিয়ে গাঁথা তা শ্যামল ভূমিকে ঝিলিক লাগিয়েছে। বনের কুঞ্জছায়া গুঞ্জরিয়া উঠেছে গানের শব্দে। নাচের ভঙ্গিমায় যেন ওড়না উড়ে চলেছে···তাতে শিউলি বনের বুক আন্দোলিত হয়েছে।

আলোর কমলখানি কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে।
আমার মনের ভাবনাগুলি
বাহির হল পাখা তুলি
ওই কমলের পথে তাদের যেই জুটালে।

কবি-কল্পনার ধারা এবার অন্য দিকে মোড় ঘুরেছে। শরতকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাই তো লিখলেন: শরৎ তোমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বুকে কে আলোর পদ্মকে প্রস্ফুটিত করলে? নীল আকাশের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে? মনের চিন্তারাশি পাখনা মেলে বেরিয়ে পড়লো ঐ কমলের পথে—তুমিই তাদের জুটিয়ে দিলে।

আবার এক নতুন পথে এলেন বিশ্বকবি। তাঁর স্বর্ণ-লেখনীতে উৎসারিত হলো—

শূন্যে হেন কালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দন তিলক ভালে
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগন প্রাঙ্গণে
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিংকিণী কঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা।

শরতের আবির্ভাব কবির হৃদয়ে নীল অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছ। তিনি দেখতে পেলেন: যেন শূন্যে জয়-ভেরি বেজে উঠেছে। কপালে চন্দন-তিলক রঞ্জিত হয়ে সহসা গগন-প্রাঙ্গণে শরৎ যেন হাসছে। বনলক্ষ্মী কাঁকন বাজিয়ে পত্রগুচ্ছ কাঁপিয়ে তুললে। এক বর্ণোজ্জ্বল আলোর কণা দিকে দিকে শরৎলক্ষ্মীর শুভ-আগমন বারতা জানিয়ে দিলে।

শরৎকালের পরম ভক্ত কবি। শিল্পী কল্পনায় শরতকে বিবিধ রূপে, বিচিত্র বর্ণ-সুষমায় তুলে

ধরেছেন তাঁর অনুপম তুলিতে। আর সেই লাবণ্যময় ছবি প্রত্যেকের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠেছে—

আকুল কেশের পরিমলে
শিউলি-বনের উদাস বায়ু প'ড়ে থাক তরুর তলে।
হৃদয়-মাঝে, হৃদয় দুলায়, বাহিরে সে ভুবন ভুলায়,
আজি যে তার চোখের চাওয়া ছড়িয়ে দিল নীল গগনে।

আলুলায়িত কেশের সুবাসে-শিউলি বনের উদাসী হাওয়ায় কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সে যেন নিঝুম হয়ে গাছের তলায় পড়ে রয়েছে। এক না-বলা আনন্দে সমস্ত হৃদয়ের হৃদয় দুলে উঠেছে—বাইরে গোটা জগৎকে রূপের আলোয় ভুলিয়ে রেখেছে। তার চোখের চাহনির দীপ্তি সুনীল আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে।

শরৎ ঋতুর শুভ-জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রাণে যে পরিবর্তন ঘটে, শিউলির গন্ধ, মেঘ আর বকের পাখার অনিন্দ্যরূপ গোটা পৃথিবীর বুকে যে সুখের শিহরণ জাগিয়ে দেয়, তা কবির দুটি চোখেও ভরিয়ে তোলে এক নতুন আলোক-ছটা। তাই বিশ্বকবি মুগ্ধ-হৃদয়ে লিখলেন—

আজি কী তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।

বিদেশী কবিরা তাদের দেশের সমস্ত ঋতুর বন্দনা নানাভাবে করেছেন—আর জনগণ-নন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথের শরৎ ঋতুর প্রশস্তি আমাদের কাব্য-সাহিত্যের এক পরম ঐশ্বর্য।

কবিগুরুর 'শারদোৎসব'-এর সেই যে অমর কবিতা তা চিরকাল সকলের চিত্ত এক নতুন আনন্দের ধারায় ভরিয়ে তুলবে—

কাব্যের ফুল্ল শেফালি গুচ্ছ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি,
কাব্যের মঞ্জরী রাশি যার পায়ে উঠিছে চঞ্চলি,
স্বর্ণ দীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধ হাস্যে সেই রসময়
নির্মল শারদ রূপে কেড়ে নিল সবার হৃদয়।

রাজা বিক্রমাদিত্যের কথা

শ্রীমতী বেলা দে

উজ্জয়িনী ছিল ভারতের একটি প্রাচীন শহর। কোনো একসময় সেখানকার রাজা ছিলেন গন্ধর্বসেন। তাঁর ছয় পুত্র—এঁরই মধ্যম পুত্রের নাম হলো বিক্রমাদিত্য। পিতার মৃত্যুর পর বিক্রমাদিত্য তাঁর বড় ভাই শঙ্কুকে বধ করে নিজে রাজা হলেন। বিক্রমাদিত্যের রাজধানীর নাম ছিল উজ্জয়িনী।

বিক্রমাদিত্য একদিন ছদ্মবেশে রাজধানী থেকে বেরিয়ে পড়ছেন প্রজাদের সুখ-দুঃখের খবর নিতে। কাজেই রাজার ছোটভাই ভর্তৃহরির উপর রাজত্বের ভার দিয়ে গেলেন। ভর্তৃহরির এ সব ভাল লাগল না, তিনি বিবাগী হয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। বিক্রমাদিত্যের রাজধানীতে রাজা নেই দেখে দেবরাজ ইন্দ্র এক যক্ষকে রাজধানীর দরজায় পাহারায় রাখলেন।

এত বড় রাজ্য ভ্রমণ করে ফিরতে বিক্রমাদিত্যের অনেক দিন সময় লাগল। তারপর তিনি যখন কাজ শেষ করে নগর-দ্বারে ফিরে এলেন, তখন যক্ষ না জেনে তাঁকে বাধা দিল—নগর মধ্যে প্রবেশ করতে দিলে না। বিক্রম ভাবলেন, এ আবার কে? আমাকে বাধা দেয়! তিনি যক্ষকে আক্রমণ করলেন। উভয়ে তুমুল যুদ্ধ হলো। শেষে যক্ষ বিক্রমের আঘাতে পড়ে গেল। যক্ষ তখন বুঝতে পারলো, ইনি নিশ্চয়ই রাজা বিক্রম! যক্ষ তখন নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—মহারাজ, আপনি আমাকে বধ করবেন না আমার কথা শুনুন—"আপনি ভোগবতী নগরের রাজা চন্দ্রভানু এবং এক যোগী একই লগ্নে জন্মগ্রহণ করেছেন। যোগী চন্দ্রভানুকে বধ করে একটি শিরীষ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে। সে মতলব করেছে আপনাকেও একদিন বধ করবে, তাহলেই নিজে পৃথিবীর রাজা হয়ে বসবে।" এই কথা শুনে রাজা যক্ষকে ছেড়ে দিলেন। তারপর সিংহাসনে এসে বসলেন।

বিক্রমাদিত্য ছিলেন দানশীল এবং ন্যায়পরায়ণ রাজা। নয়জন পণ্ডিত তাঁর সভা অলংকৃত করতেন। একদিন রাজসভায় বসে আছেন, এমন সময় একজন যোগী এসে তাঁকে একটি শ্রীফল দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন। যক্ষের কাছে যোগীর কথা শোনা অবধি তিনি সর্বদা যোগী থেকে সাবধানে থাকতেন। কাজেই যোগীর দেওয়া শ্রীফল খেলে যদি কিছু অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে সেটি খেলেন না—রেখে দিলেন। যোগী কিন্তু রোজই শ্রীফল দিয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে যান। এমনি করে কিছুদিন যাবার পর, একদিন হঠাৎ রাজার হাত থেকে শ্রীফলটি পড়ে ভেঙ্গে গেল, এবং তার মধ্যে থেকে একটি মহামূল্য রত্ন বার হয়ে পড়ল। রাজা এমন মণি কখনো দেখেন নি। যোগী বললেন, 'রাজন্! প্রতিদিনকার ফলের মধ্যেও এইরূপ

মণি আছে।" সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করবার জন্য রাজা ফলগুলি আনালেন এবং প্রত্যেকটি ভেঙ্গে দেখলেন ঐরূপ অদ্ভুত মণি রয়েছে। রাজা মুগ্ধ হলেন।

যোগীর আশ্রম গোদাবরী তীরে। যোগী রাজাকে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ-চতুর্দশী তিথিতে রাত দুটার সময় আশ্রমে যোগসাধনা দেখতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে গেলেন।

সে কি ভয়ংকর রাত্রি! চারিদিক অন্ধকার! আকাশ মেঘে ঢাকা, তারাটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। এমনি রাত্রে রাজা একাকী যোগীর আশ্রমে এলেন। যোগী রাজাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "দূরে ঐ শিরীষ গাছে একটি মৃতদেহ ঝুলছে এখানে নিয়ে এসো।" নির্ভীক রাজা, সেই মৃতদেহটি নিয়ে যোগীর আশ্রমের দিকে চললেন—এমন সময় মৃতদেহ বলে উঠলো, 'বিক্রম! আমি রাজা চন্দ্রভানুর প্রেতাত্মা! এ দেহ আমারই।—যোগী আমায় মেরে ফেলেছিল এবং আজ আমার শবের উপর বসে যোগ-সাধনা করবে। দেবীর সামনে আজ সে তোমাকেও বলি

দেবে। তোমাকে বলি দেওয়া হলেই সে এই পৃথিবীর রাজা হয়ে বসবে। কাজেই রাত্রে যখন যোগী তোমায় দেবীকে প্রণাম করতে বলবে, তুমি বলো, আমি প্রণাম করতে জানি না। তখন যোগী যেই প্রণাম করতে দেখাতে যাবে তুমি তার মাথা কেটে, আশ্রমে অগ্নিকুণ্ডের উপর যে লোহার কড়ায় তেল ফুটছে, তুমি সেই কড়াইতে আমাদের দু'জনের শবদেহ ফেলে দিও। রাজা প্রেতাত্মার কথা শুনতে শুনতে নির্ভয়ে শবদেহ নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। যোগী বসলেন যোগসাধনায়। তারপর রাজাকে দেবীর সামনে প্রণাম করতে বললেন—রাজা বললেন, কি করে প্রণাম করতে হয় আমি জানি না, আপনি আমায় দেখিয়ে দিন। যোগী যেই রাজাকে প্রণাম করা দেখাতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি খড়্গ দিয়ে তাঁর মাথা কেটে, সেই দুটি শবদেহ গরম তেলের কড়ায় ফেলে দিলেন। দেখতে দেখতে কড়া থেকে তাল এবং বেতাল বেরিয়ে এসে বিক্রমাদিত্যের আনুগত্য স্বীকার করলো। এই তাল-বেতালের ঘাড়ে চড়ে তিনি কত যে অসাধ্যসাধন করেছিলেন তা 'বত্রিশ সিংহাসন' এবং 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থে লেখা আছে। এই রাজা বিক্রমাদিত্যের নামে একটি সন প্রচলিত আছে। তার নাম সংবৎ। বড় হয়ে তোমরা এ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে।

চড়াই

শ্রীশুভ্রা ঘোষ

জানলার পাখীটাকে যেমনি নড়াই—
টুক্ করে উঁকি দেয় ছোট্ট চড়াই।
হাতটা সরিয়ে নেই চমক লেগে
ওপাশে পাখীটা তবে পড়ল ভেগে
অথবা কি মুখ তুলে দাঁড়িয়ে চড়াই
ঠোঁট নেড়ে সাহসের করছে বড়াই?

ওকি ভাবে মনে আমি ভয় পেয়ে গেছি?
কিচিমিচি সুরে তাই করে চেঁচামেচি!
এতবড় জীবটার ভয়ের কারণ—
খুশীতে দেখায় কী যে ধরন-ধারণ!
খড়ের কুটোর সাথে বাঁধায় লড়াই!
ঘুমভাঙা স্বপ্নের আমার চড়াই॥

চিরন্তন প্রবাদের গল্প

শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত

অনেকদিন আগে ছিলেন এক রাজা। এক মস্ত বড় রাজা। রাজা হ'লেই থাকে কিছু রাজসিক খেয়াল, এঁরও তার কিছুমাত্র কমতি ছিল না।

খেয়াল থাকলেই কিছু বে-খেয়ালও এসে হাজির হয়। এঁর বেলাও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একবার তিনি ঠিক করলেন, দেশের যত অলস ব্যক্তি আছে, তাদের রাজকোষ থেকে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবেন। মন্ত্রীর ডাক পড়ল, রাজামাশাই বললেন, "মন্ত্রী, ঢাঁট্‌রা পিটিয়ে দেশবাসীদের জানিয়ে দাও দেশে যে সব অলস লোক রয়েছে, তাদের রাজার খরচায়, রাজার তৈরি 'অলসাবাস'-এ থাকবার ব্যবস্থা করা হবে। যারা থাকতে চায় তারা যেন অবিলম্বে রাজ-কাছারীতে উপস্থিত হয়।

কয়েকদিন যেতেই বেশ কয়েকজন করে লোক আসতে লাগল। রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি ছিল এক মস্ত মাঠ, তার একধারে তৈরি হলো এক চালা ঘর—অলসাবাস। রাজা-রাজড়ার ব্যাপার, থাকবার ব্যবস্থাটা বেশ ভালই হতে লাগল। আরও কিছুদিন, এল আরও নতুন লোক—আবার নতুন চালা উঠ্‌ল। তারপর আরও লোক, উঠল আরও চালা, এল আরও লোক, তারপর আরও, তারপর দলে দলে প্রতিদিন। চালায় চালায় ভরে যাবার যোগাড় হলো মাঠ। সবাই দেখলে, বাঃ, এ তো ভারী মজা, কাজকর্ম করতে হয় না, কোথাও যেতে হয় না, খাও-দাও আর প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোও। বড়জোর অলসাবাসের বাসিন্দাদের সঙ্গে বসে একটু গল্প-সল্প কর। বেঁচে থাক রাজাবাহাদুর আর তাঁর রাজসিক খেয়াল। 'জয়! রাজাবাহাদুরের জয়!!'

অলসের পর অলস লোক আসছে আর চালার পর চালা উঠছে। দেশের কাজকর্ম বন্ধ, দোকান-পাট, চাষ-আবাদ, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সব উঠে যাবার যোগাড়। আবার একদিন রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, "মন্ত্রী, দেশের সবাই কি অলস?" মন্ত্রী বললেন, "তাইতো মনে হচ্ছে মহারাজ।"

"কিন্তু প্রমাণ কি যে এরা শুধুই নিখরচায় খেতে থাকতে পাবার লোভে আসছে না।"

"সে তো ঠিক কথাই মহারাজ, তার তো কোন প্রমাণই নেই।"

"তা'হলে সেটা বোঝা যায় কি করে?"

"আজ্ঞে সেটা ঘরে আগুন দিলেই বোঝা যাবে।"

"ঠিক বলেছো মন্ত্রী, ঘরেই আগুন দেওয়া যাক।"

তারপর একদিন সকাল বেলা ভোর থাকতেই দেখা গেল অলসাবাসের ঘর-দুয়ার সব জ্বলে

উঠেছে আর রাজার রক্ষক আর সৈন্যরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। নিজেরাও কেউ আগুন নেভাচ্ছে না, কাউকে সে চেষ্টা করতেও দিচ্ছে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অলসাবাসের বাসিন্দাদের টনক নড়ে উঠল, দু'-চারজন করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে আরম্ভ করল, তারপর দলে দলে।

আগুন যখন বেশ জ্বলে উঠেছে, তখনও একটা ঘরে শুয়ে ছিল পাশাপাশি দু'জন। তাদের একজন বল্‌লে, "পি—পু," অর্থাৎ কিনা 'পিঠ পুড়ে' যায়। অলস কিনা, বেশী কথাও বলতে পারে না, কথা বলবার পরিশ্রমটুকুও করবার শক্তি নেই।

যাকে বলা হয়েছিল, সে বললে, "ফি—শু," অর্থাৎ ফিরে শো। সেও যে সমানই অলস, তারও তো শক্তি নেই সম্পূর্ণ কথাটুকু বলবার। রাজার লোকজনরা টেনে বার করলে তাদের ঘর থেকে। আর সবাই তো নিজেরাই উঠে পালিয়েছে।

মন্ত্রী বললেন, "রাজামশাই, এরাই হচ্ছে ঠিক অলস, আসল, একেবারে খাঁটি।" সমস্ত শুনে রাজা বললেন, "ঠিক তাই, তুলে দাও মন্ত্রী অলসাবাস। এবার শুধু এদের জন্য নতুন করে ঘর তৈরী কর। এখন থেকে রাজার খরচে ভরণপোষণ পাবে শুধু এরা দু'জন—এদের জীবন-ভোর।"

দুটি খবর

শ্রীনরোত্তম হালদার

(১)

এক যে ছিল মেনি বেড়াল
বাঘামামার মাসী,
হাঁসেরা ডুব দিচ্ছে দেখে
পাচ্ছিল তার হাসি।

মাঘের শীতে বাঘামামা
সোঁদরবনে দিচ্ছে হামা'—
তাই না শুনে মনের দুঃখে
চললো গয়া-কাশী।

(২)

এক যে ছিল ব্যাঙ্—
পুকুর ধারে মাঝে মাঝে
ডাকতো গ্যাঙোর-গ্যাঙ্।
হঠাৎ সেদিন কোন খেয়ালে
ডুব দিল সে গভীর জলে,
কাঁকড়াভায়া কামড় দিয়ে
কাটলো তার এক ঠ্যাং—
যায় না জলে সেদিন থেকে,
লাফায় ড্যাংড্যাং-ড্যাং।
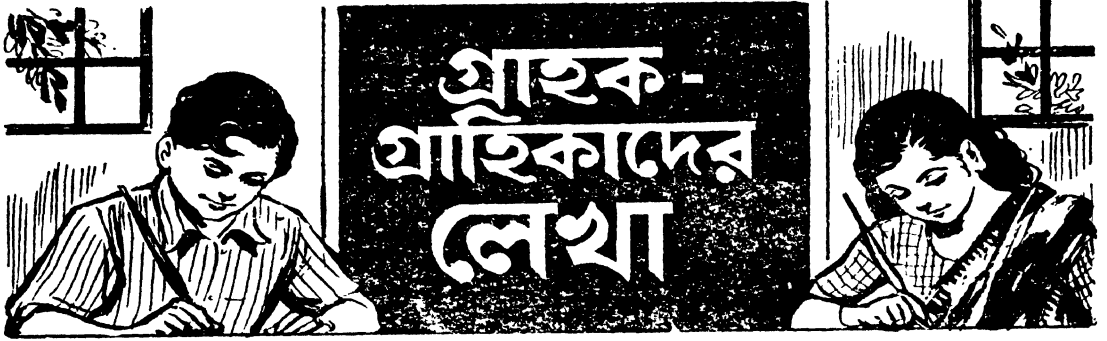
পুনঃপ্রাপ্তি

(সত্য ঘটনা)

বহুদিন পর আজকে 'মৌচাকে' লিখতে বসে মনে পড়ে গেল বেশ কিছুদিন আগে ঘটে-যাওয়া একটি ঘটনার কথা। আজ থেকে দু'বছর আগে যে-বার আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বেশ ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়েছি, সেবারই ঘটেছিল ঘটনাটা। সামনে লম্বা ছুটি। কি ভাবে কাটাব ভেবে পাচ্ছি না। এমন সময় কোলকাতাতে আত্মীয়দের সঙ্গে বেশ ভালভাবে ছুটিটা কাটাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমরা যথাসময়ে নির্দিষ্ট দিনে কোলকাতা অভিমুখে রওনা হলাম। সঙ্গে ছিলেন আমার ঠাকুমা ও পিসেমশাই।

আগেই বলে রাখি, আমাদের উঠবার কথা ছিল এক পিসির বাড়ীতে। যদিও কোলকাতাতে আমার তিন পিসি থাকেন তিন প্রান্তে। আমরা ঠিক করেছিলাম যে, এক-একজনের বাড়ীতে কিছুদিন ধরে থাকব। তারপরে তো প্রত্যেকবারের নিয়মানু-সারেই ট্রেন লেট্ থাকতে নির্দিষ্ট সময়ের বেশ খানিকটা দেরিতেই গিয়ে পৌছলাম। মে মাসের প্রচণ্ড রৌদের ক্ষর তাপে ঘর্মাক্ত হয়ে আমাদের অবস্থাটা হ'ল অবর্ণনীয়।

যাহোক্, প্রথম পিসির বাড়ীতে সাত-আট দিন বেশ হৈ-চৈ করে কাটান গেল। এরপর আর এক পিসি যিনি থাকেন শ্যামবাজারে তাঁর কাছে যাবার পালা। আমাদের ছোট পিসেমশাই পৌছে দেবেন,—এই ঠিক হলো। আমরা যথাসময়ে শ্যামবাজারে পিসির বাড়ীর উদ্দেশ্যে ট্যাক্সিতে করে রওনা হলাম। সঙ্গে ছিল একটা মাঝারি আকারের সুটকেশ্। তার মধ্যে ছিল আমাদের যাবতীয় জিনিসপত্র।

বিকেল পাঁচটা, সাড়ে-পাঁচটার সময় আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পৌছলাম। ট্যাক্সি থেকে নামা মাত্র ছোট পিসেমশাইকে সেই বাড়ীরই কোন এক ভদ্রলোক হাইকোর্ট-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে নানা কথা বলতে ও জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। হ্যাঁ, ছোট পিসেমশাই হাইকোর্টে কাজ করেন আর ঐ ভদ্রলোকটিও। তাই দু'জনে কথা-বার্তা বলতে বলতে এত বেশী মশগুল হয়ে

পড়লেন যে, ট্যাক্সি থেকে সুটকেসটা নামানোর কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। এদিকে আমি ও ঠাকুমা তখন ভেতরে চলে গেছি। হঠাৎ পিসি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এখানে থাকবে বলে এসেছ, কিন্তু কই সঙ্গে কিছু আননি তো?" তখন খোঁজ পড়ল সুটকেশটার। এদিকে ট্যাক্সিটা তখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। আর সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, ছোট পিসেমশাই তখন দূরে চলন্ত ট্যাক্সিটাকে লক্ষ্য করে ছুটছেন। কিন্তু কোথায় ট্যাক্সি? সেটা তখন মোড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে সারা বাড়ীময় হৈ-চৈ পড়ে গেল। সবাই সবাইকে দোষ দিতে লাগলেন। কিন্তু পিসেমশাই, অর্থাৎ যাঁর বাড়ীতে আমরা গিয়েছি, তিনি তিনতলার ওপর থেকে গোলমাল শুনে জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকাতেই ট্যাক্সিটাকে চলে যেতে আর ছোট পিসেমশাইকে ছুটন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়েই উপস্থিতবুদ্ধি বশে ট্যাক্সিটার নাম্বার অস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দূর থেকে দেখে টুকে নিয়েছিলেন।

এর পরে তো আমার অপদস্থ হবার পালা। আমার সমস্ত জামা-কাপড়ই ছিল ঐ সুটকেশে, আর দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সমবয়সী এমন কেউ সেখানে ছিল না, যার জামা-কাপড় আমি পরতে পারি। তখন পড়লাম মহা ঝঞ্ঝাটে। ঠাকুমা যাহোক্ কারোর একটা ধুতি পরতে পারেন। কিন্তু আমাকে সেই ধড়াচুড়ো পরেই রাত কাটাতে হবে। আমার সেই অবস্থা বুঝে সবাই নানাভাবে কৌতুক করার সুযোগ পেল। পিসেমশাই বল্লেন, রাত্রে ওঁর পাঞ্জাবী পরে শুতে; তারপর না হয় সকালে যাহোক্ একটা ব্যবস্থা করা যাবে। ছোটরাও কম গেল না। এই ভাবে আমাকে তাঁদের সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপ নিঃশব্দে হজম করতে হ'ল। ঠাকুমা তো খুব কাহিল হয়ে পড়লেন। তাঁর দুঃখের ও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল সুটকেশটার মধ্যস্থিত গয়না, টাকা ও দামী জামা-কাপড়।

এদিকে সেই ট্যাক্সির আন্দাজ করা নাম্বার ধরে থানাতে খবর দেওয়া হয়েছে এবং ওয়ারলেস্ও করা হয়েছে। ছোট পিসেমশাই তো বাড়ীর বয়োবৃদ্ধদের বকুনি ও প্রচুর তিরস্কার সহ্য করে বাড়ী গেলেন।

রাত তখন ১১টা। আমরা সবাই সুটকেশটার মায়া ছেড়ে শোবার ব্যবস্থা করছি, খানিকক্ষণ বাদে আমার বেশ তন্দ্রা মত এসেছে, এমন সময় নীচের দরজায় নক্ করার শব্দ হ'ল। খুলে দেখা গেল, সেই ঢাকুরিয়ার পিসি ও পিসেমশাই, যাঁদের বাড়ী থেকে আসার সময় এই ঘটনাটা ঘটেছিল, তিনি সপুত্র এসে হাজির। তাঁদের এত রাত্রে আসতে দেখে আমরা খুব অবাক হলাম। সবাই তখন তাঁদের বিকেলের ঘটনাটা আর সুটকেশ হারানোর ব্যাপারটা বলতেই ব্যস্ত। এমন সময় পিসেমশাই সবাইকে আরও অবাক করে দিয়ে বাইরে-রাখা সেই

হারানো স্নুটকেশটাকে ভেতরে নিয়ে এলেন। সবাই আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিতও। আমি ভাবলাম, যাক্…আমার প্রবলেম্‌টাই সব থেকে আগে সল্‌ভড হলো।

সেই রাত্রে পিসির কাছ থেকে জানা গেল যে, আমরা চলে আসার পর রাত্রি প্রায় সাড়ে ৯টার সময় সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারটি পিসির বাড়ীতে স্নুটকেশসহ গিয়ে হাজির হয়। সে ঐ অঞ্চলেরই ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডের ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিল। যখন অন্য লোককে ভাড়া খাটাতে গিয়ে দেখেছে যে স্নুটকেশটা পড়ে আছে, তখন ঐ পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভারের মনে পড়ে গেছে আমাদের কথা। সে তখন সোজা চলে গেছে ঢাকুরিয়ায় পিসির বাড়ীতে। তার পরের ঘটনা তো আর কিছুই বলার নেই। হ্যাঁ…স্নুটকেশটার ভিতরের সমস্ত জিনিসই ঠিক ছিল। পিসেমশাই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে মোটারকম বকৃশিশ দিয়েছিলেন।

সেবার এইভাবে আমরা হারানো স্নুটকেশটা ফিরে পেয়েছিলাম—যেটা পাবার আশা আমরা একেবারেই ত্যাগ করেছিলাম। আমার মনে হয়—যখন কোন নতুন জিনিস পাওয়া যায় তখন যেমন আনন্দ হয়, তার থেকেও বেশী আনন্দ হয় যখন হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া যায়। জানি না সেদিন ট্যাক্সি ড্রাইভার কেবলমাত্র বকৃশিশের লোভে না পুলিশের ভয়েই ফেরত দিয়েছিল স্নুটকেশটা।

কিন্তু একটু ভালভাবে ভেবে দেখলে দেখা যায় যে—না, সেদিন সে তার সচ্চরিত্রেরই পরিচয় দিয়েছিল।

শ্রীমৈত্রী গুপ্ত

পূজোর পরে

শ্রীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজো চলে গেছে, তবু গাছে গাছে 'কুহু' ডাকে,
শিশির তবুও দূর্বা-ফলকে ঝুলে থাকে,
নুয়ে পড়া কাশ নদী বুক দেখে মুখ,
জননী গিয়েছে, তবু আজো অপরূপ !
ফড়িংরা করে এলোমেলো ছুটোছুটি,
উল্লাসে নাচে নবজাত ছাগ দু'টি।
তপন খেলিছে লুকোচুরি কুতূহলে,
মেঘের পরীরা আজো উড়ে পাখা মেলে।
নামহীন কোন ডাকঘর হ'তে আসে চিঠি,
অভিমান ভরে ছলছল করে চোখ দু'টি,
চোখ তুলে দেখি দূরে তুলো-মেঘ এলোমেলো !
মনে পড়ে যায় ;—'জননী সেদিন চলে গেলো !!

মেঠুড়ে

আই. এফ. এ. শীল্ড ফাইন্যাল

বহু তর্ক-বিতর্কের পর আই, এফ, এ'র এক সভায় ঠিক হয় যে, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল অমীমাংসিত শীল্ড ফাইন্যাল ১৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। এই মরসুমে আই, এফ, এ, শীল্ড ফাইন্যালে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের প্রথম দিনের খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। ফাইন্যাল খেলার পুনরনুষ্ঠানের দিন ঠিক হয় ২৪ সেপ্টেম্বর। কয়েকটা কারণে ওই তারিখে খেলা সম্ভব নয় বলে ইস্টবেঙ্গল আই, এফ, এ'র কাছে আবেদন করেন। ইস্টবেঙ্গল একথাও জানান ২৫ সেপ্টেম্বরের পর যে কোনো দিনই তাঁরা খেলতে ইচ্ছুক। ইস্টবেঙ্গলের আবেদনকে কেন্দ্র করে আই, এফ, এ'র যে সভা হয়, তাতেই ঠিক হয় যে, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের শীল্ড ফাইন্যাল খেলা প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্যে চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে ১৬ অক্টোবর মোহনবাগান-ক্যালকাটা ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।

তোমাদের হয়তো মনে আছে গতবারের আই, এফ, এ, শীল্ড ফাইন্যাল প্রথম দিন অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়, কিন্তু খেলার পুনরনুষ্ঠানের ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল হওয়াতে শেষ পর্যন্ত আর ফাইন্যাল খেলা হয়নি।

গত ১৬ তারিখেই এই শীল্ড ফাইন্যাল খেলা আবার অনুষ্ঠিত হয় এবং দুই দলের আপ্রাণ চেষ্টার পর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অসীম মৌলিক খেলা শেষ হবার এক মিনিট পূর্বে এক গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত ক'রে এ-বছর শীল্ড লাভের গৌরব অর্জন করে।

বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্যে লণ্ডনে কর্মব্যস্ততার অন্ত নেই। বিশ্ব কাপের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা আরম্ভ হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। প্রাথমিক পর্যায়ের বেশির ভাগ খেলা শেষের দিকে। ষোলটা দেশকে নিয়ে মূল প্রতিযোগিতা চলবে আগামী জুলাই মাসে লণ্ডনে। ষোলটা দেশকে চারটে গ্রুপে ভাগ করে প্রথমে লীগ প্রথায় এবং পরে নক-আউট প্রথায় মূল প্রতিযোগিতার খেলা পরিচালনা করা হবে। কোন দেশ কোন গ্রুপে স্থান পাবে তার তালিকা তৈরী করা হবে আগামী ৬ জানুয়ারি। ইংলণ্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবারের জুলেস রিমেট কাপ বা বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিচালক। মিডল্যাণ্ড, লণ্ডন এবং ইংলণ্ডের উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমের যে চারটে কেন্দ্রের বিভিন্ন মাঠে খেলাগুলো হবে, সে-সব মাঠকে নতুন সাজে সাজানো হয়েছে। এর ভেতরই চুরাশিটা দেশের কাছ থেকে খেলা দেখার টিকেটের জন্যে চৌত্রিশ হাজার আবেদন পড়েছে। বিশ্ব কাপের খেলার ব্যবস্থার জন্য যে প্রচুর খরচ হবে, তার একটা মোটা অংশ ব্রিটিশ সরকার সাহায্য হিসেবে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে দান করবেন।

অবিরাম সাঁতার

প্রখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষের অবিরাম সাঁতারের রেকর্ড ভাঙবেন বলে দিলীপ দে গোলদীঘির জলে নেবেছিলেন। তিন দিন তিন রাত জলে কাটাবার পর, তিনি জল থেকে ডাঙায় ওঠেন। সাঁতারের মাধ্যমে জলের বুকে তিনি ছিলেন ৭৯ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট। প্রফুল্ল ঘোষ এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে রেঙ্গুনের রয়াল লেকে ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট একটানা সাঁতার কাটার যে নজির রেখেছিলেন, দিলীপ দে তা ম্লান করে দিয়েছেন।

যতদূর জানা যায় অবিরাম সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ডের দাবিদার আমেরিকার সেন্ট লরেন্সের জন ডি সিংম্যান। তিনি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ৮৯ ঘণ্টা ৪২ মিনিট একটানা সাঁতার কেটেছিলেন। তেত্রিশ বছরের সাঁতারু দিলীপ দে ১৯৫৯ সাল থেকে অবিরাম সাঁতারে নতুন কিছু করার জন্যে চেষ্টা আরম্ভ করেন। প্রথম বছর তিনি ৬ ঘণ্টা জলে ছিলেন, ১৯৬০ সালে জলে ছিলেন ২৪ ঘণ্টা, ১৯৬৩ সালে তিনি ৬৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট সাঁতার কেটেছিলেন। এবার ৭৯ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট অবিরাম সাঁতার কাটার পর জল থেকে উঠে আসেন। এখানে তোমাদের একটা কথা জানাই: অবিরাম সাঁতার কোনো সাঁতার সংস্থার অনুমোদিত প্রতিযোগিতা নয়। এর জন্যে কোনো আন্তর্জাতিক বা জাতীয় সংস্থা নেই। ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং ক্লাবের উৎসাহেই সাধারণতঃ অবিরাম সাঁতারের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

পূজোর পর তোমাদের সঙ্গে এই প্রথম দেখা—বিজয়ার অকৃত্রিম ভালবাসা ও শুভ-কামনা জানাচ্ছি। পূজোর আগে দেশের অবস্থা কি রকম অস্বস্তিকর ছিল, পাকিস্তানী আক্রমণের শত্রুতায় প্রতিরোধকল্পে সমস্ত মন-প্রাণ আমাদের নিবিষ্ট ছিল—এইরকম অবস্থায় পূজো এসে পড়লো, তখন শহর অন্ধকারের আবরণে আচ্ছন্ন। পূজো প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার কথা, এমন সময় যুদ্ধবিরতি ঘটলো,—আলো জ্বললো, বাজনা বেজে উঠলো, তোমরা সকলে আনন্দ করতে পারলে। তোমাদের আনন্দে আমরাও খুশী হলাম। পূজো নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেল।

এত সুন্দর ভাবে পূজা কাটবে এ তো আমরা ভাবতেও পারিনি। আশা করি তোমরা সকলেও বেশ ভাল ভাবেই পূজো কাটিয়েছ? ৺বিজয়া আমাদের বিজয়োৎসব হোক এই কথা বলি বার বার।

এবার তোমাদের পরীক্ষা আসন্ন। দেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য তোমাদের কতই বিঘ্ন হয়, কতই হয়েছে, এখন সময় যখন নিকটবর্তী তখন আর অন্য দিকে মন না দিয়ে পরীক্ষার জন্য তৈরী হও। সব ক্ষয়-ক্ষতিকে পিছনে ফেলে, মনস্থির করে পরীক্ষা দাও—সফল হবেই।

বুদ্ধবাণী

আজ সারা পৃথিবী জুড়ে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা আর অশান্ত ভাব। শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে হঠকারিতা আর অশোভন আচরণ দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবী থেকে বুঝি বা শুভ-বুদ্ধি, শুভ-ইচ্ছা চিরতরে বিদায় নিয়েছে। রণ-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে যেন শান্তির ললিত-বাণী আমাদের প্রতি উপহাস করছে। কিন্তু, ভারতবর্ষ শান্তি চায়, যে শান্তির উপাসক। সে চায় তার নিজ ভূমিতে যেমন শান্তি চিরস্থায়ী হোক, তেমনিই তা পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ুক।··· ইতিহাসের সূচনা থেকে ভারতের এই কোমল-শান্ত-উর্বর মাটিতে আবির্ভাব হয়েছেন কত মহাপুরুষ আর মহামানব। তাঁরা বহন করে এনেছেন শান্তির বাণী, ন্যায়ের বাণী, সত্যের

বাণী। আর তা বিতরণ করেছেন দুঃখ-তাপক্লিষ্ট মানুষের মধ্যে—সৃষ্টি করেছেন সজীব প্রাণের নতুন নতুন উন্মেষ। ইতিহাস বলে, ক্ষত্রিয় রাজবংশের একমাত্র সন্তান সকলের আদরের, সকলের স্নেহের সিদ্ধার্থ পরবর্তীকালে শান্তির দূত হয়ে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার উর্ধ্বে উঠে পৃথিবীর সব কিছু জাগতিক কর্ম কোলাহলকে দূরে সরিয়ে দিয়ে এক অমরবাণী বহন করে নিয়ে এলেন সিদ্ধার্থ। বোধিদ্রুমতলে বসে সত্য-সন্ধানী কঠোর সাধনায় মগ্ন হলেন এই রাজপুরুষ—হলেন বুদ্ধদেব। তিনি জগতকে শোনালেন নতুন বাণী—বললেন, "সংসারে যাঁরা বৈরী, তাদের মধ্যে বৈরীহীন হয়ে আমরা সুখে জীবন যাপন করবো। আসক্তিপরায়ণ মানুষের মধ্যে আমরা অনাসক্ত হৃদয়ে জীবনের দুস্তর পথ অতিক্রম করবো। যারা বিদ্বেষভাবাপন্ন তাদের মধ্যে আমরা বিদ্বেষ-বর্জিত হয়ে বিচরণ করবো।

ভারতবাসী বুদ্ধদেবের এই মর্মবাণী জীবনের মর্মবাণী বলেই জানে। তাই সে তার প্রতিবেশী বৈরী রাষ্ট্রের সঙ্গে চেষ্টা করেছে শেষ পর্যন্ত মিত্রভাব বজায় রাখতে।...আজকের এই অস্থির, চঞ্চল পৃথিবীকে আমাদের নতুন করে তাই শোনাতে হবে বুদ্ধের বাণী, উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে—

"কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র
বুদ্ধের শরণ লইলাম।"

তোমাদের সকলের চিঠি—৺বিজয়া-লিপি পেয়ে অনেক আনন্দ পেলাম। স্বীকৃতি জানাচ্ছি প্রত্যভিবাদনের সঙ্গে—

মণিদীপা মিত্র, কোন্নগর ; চৈতালী ও ভাস্কর বসু, কোলকাতা ; কাবেরী, কঙ্কণ, পলি, সুদীপ, ঘাটবন্দর ; দোলা, নিলয় দাসগুপ্ত, বিকানীর ; মধুছন্দা ও নির্মাল্য চট্টোপাধ্যায়, হরিতকী বাগান লেন ; ইন্দ্রনাথ লাহিড়ী, বেহালা ; গোপা ও টিঙ্কু পাল, কোলকাতা ; অরিন্দম ও মিমি, যাদবপুর ; অগ্নি বর্মণ, কোলকাতা ; ইন্দ্রজিৎ ও নূপুর, শান্তিনিকেতন ; রণু, শ্রীরূপা লাহিড়ী, তেজপুর।

শুভেচ্ছায়—

মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০·৪৫ নয়া পয়সা

★ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ★

৪৬শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ ঃ ১৩৭২ [৮ম সংখ্যা

বুলবুলি

শ্রীসুশীল রায়

দূরের থেকে আসছে ভেসে
দুর্গাপুজোর বাজনা—
বুলবুলি, তোর এই বাগানে
বসা তো ঠিক কাজ না।
ধানক্ষেতে তুই উড়বি এখন
ধান খাবি পেট-ভরতি,
জানি নে ঠিক, হয়ত সেসব
বাজার এখন পড়তি।

এই অবেলায় তাই বুঝি তুই
গুমট ক'রে মনটা
জানিয়ে দিতে এলি মনের
চাপা সে উৎকণ্ঠা।
এই বাগানে আছে কেবল
ফলটা এবং ফুলটা
তোকে দেবার মতন কিছুই
নাই, এসবই উলটা।

দূরের থেকে আসছে ভেসে
যুদ্ধজয়ের বাজনা—
অন্য সময় দুঃখ জানাস,
আজ না, দোহাই, আজ না।
ফসল যখন উঠবে ভরে
দেব পুরো খাজনা॥

কে বলতে পারে

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

কে বলতে পারে হয়ে যেতে পারি মামজাদা কেউকেটা,
সিরিয়াস ভাবে বলছি কথাটা,—ঠাট্টার নয় এটা।
জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে রহস্য সন্ধানী
হয়ে যেতে পারি—কে বলতে পারে—বিখ্যাত বিজ্ঞানী।
অথবা মহান শিল্পী হয়েও সম্মান পারি পেতে,
কিছুটা আঁচড় স্পষ্ট থাকবে, অনেকটা আভাসেতে।
হয়তো অচিরে হয়ে যাবো ভাই, মস্ত বৈমানিক—
পড়তে পড়তে ঝড়ের মুখেও সামলাবো টাল ঠিক।
লেখক হয়েও ভরতে তো পারি নানা পুঁথি অবদানে,
কখন সুযোগ কোন্ দিক দিয়ে আসে তা কি কেউ জানে?
হয়তো এমন চোস্ত গদ্য পদ্য করবো খাড়া,
দেশে ও বিদেশে যাকে, কি যে বলে, পড়ে যেতে পারে সাড়া
ছোকরারা হয়ে হন্যে আসবে অটোগ্রাফ-খাতা পেতে—
দিতে হতে পারে তার সাথে কিছু বাণী ফাউ হিসেবেতে।
কোত্থেকে আসে কখন সুযোগ কে পারে বলতে ভাই?
কায়দা-মাফিক নাম-সই-করা মক্সো করছি তাই।

সবুজ ছাতার কাহিনী

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

সবুজ ছাতা বলতে আমি কিন্তু সে ছাতার কথা বলছি না, যা মাথায় দিয়ে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে আমরা নিজেদের আড়াল করি। মাথায় দেবার ছাতা ছাড়া আরও একরকম ছাতা আছে যা পথে-ঘাটে, বাগানে, বাড়ীর পাঁচিলে আমরা হরদম দেখতে পাই—বিশেষ করে বর্ষাকালে। পণ্ডিতরা ওদের নাম দিয়েছেন 'ছত্রাক', আর ইংরেজী করে বললে বলতে হয় 'ফাঙ্গাস'।

এ টুকরো পাঁউরুটি ঘরের কোণায় ফেলে রাখ, দু'দিন বাদেই দেখবে তার গায়ে কালচে সবুজ তুলোর মত কি সব গজিয়েছে! সে পাঁউরুটি আর তখন খাওয়া চলবে না—কারণ তুমিই তখন বলবে, 'ওমা, এ কি করে খাব, এতে যে ছাতা ধরে গেছে!' তেমনি বর্ষার ভিজে দিনে তোমার জুতোজোড়া কয়েক দিন ব্যবহার না করে ফেলে রাখ, দেখবে তারও গায়ে কেমন সবুজ সবুজ গুঁড়ো মত কি জমে আছে। এ গুড়োকেও আমরা বলি ছাতা।

আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমাদের উঠোনে কয়েকটা বাঁশ পড়ে ছিল। একদিন সারা রাত বৃষ্টিতে ভিজবার পর দেখা গেল বাঁশের গায়ে এদিকে-ওদিকে কতকগুলি সাদা সাদা কি গজিয়েছে। ঠিক যেন ডাঁটি লাগানো একটা খেলনার ছাতা কেউ খুলে বসিয়ে দিয়েছে। দিদিমা দেখে বললেন, 'দেখেছিস, রাতারাতি কত ব্যাঙের ছাতা এসে গেছে।'

ব্যাঙের ছাতা শুনে বুজুদের ভারী অবাক লেগেছিল। সে ভেবেছিল, ব্যাঙেরা বুঝি এসে ঐ ছাতা পেতে গেছে, একটু বৃষ্টি শুরু হলেই তার তলায় এসে আশ্রয় নেবে। কিন্তু বৃষ্টি সুরু হবার পরেও অনেকক্ষণ বসে বসে শেষে তাকে হতাশ হয়ে উঠে যেতে হ'ল, কোন ব্যাঙই ওর নীচে এসে বসল না। বসতে যাবে কেন? সত্যি তো ওগুলো ব্যাঙের জন্য তৈরী নয়, ও-ও একরকম ছাতা। পণ্ডিতেরা যাদের নাম দিয়েছেন ছত্রাক বা ফাঙ্গাস।

এই ছাতাগুলি আসলে কি? আসলে এরা সকলেই এক-এক জাতের উদ্ভিদ্, যাদের আমরা খাতির করে বলি গাছপালা। কিন্তু সাধারণ গাছপালার সঙ্গে এদের কোনই মিল নেই। এরা খুব নীচু জাতের উদ্ভিদ্ কিনা! এদের চালচলনও তাই আলাদা। আবার একজাতের ছাতার সঙ্গে অন্য জাতের ছাতারও তফাৎ অনেকখানি। পাঁউরুটির ছাতা, জুতোর ছাতা আর ব্যাঙের ছাতা—এদের প্রত্যেকটিরই হালচাল আলাদা।

এদেরই বিশেষ একটিকে নিয়েই আমাদের আজকের গল্প।

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার একটি ঘটনা। লণ্ডনের সেণ্ট মেরি হাসপাতালে বসে একজন বিজ্ঞানী আপন মনে কাজ করছিলেন। তোমরা হয়তো জান আমাদের যত রকম অসুখবিসুখ

সকলেরই মূলে আছে কোন না কোন জীবাণু। কাজেই অসুখবিসুখের কারণ জানতে হলে আর তার ওষুধবিষুধ বার করতে হলে, ঐ সব জীবাণু নিয়েই আগে গবেষণা করতে হয়। এই সব জীবাণু আবার চেষ্টা করলে পরীক্ষাগারে চাষ করে ইচ্ছেমত তৈরী করেও নেওয়া যেতে পারে। ঐ বিজ্ঞানীটিও তাই করছিলেন। 'স্ট্যাফাইলোকক্কাস' নামে এক জাতের দুরন্ত জীবাণু আছে,—আমাদের অনেক রকম রোগের মূল সেটা। আপাততঃ এই স্ট্যাফাইলোকক্কাসেরই চাষ করছিলেন তিনি একটা প্লেটে। বিজ্ঞানীটির নাম আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং।

খানিক বাদে প্লেটটি তুলে নিলেন তিনি। এতক্ষণে ওর গায়ে যথেষ্ট পরিমাণ স্ট্যাফাইলোকক্কাস জড় হবার কথা। কিন্তু ফ্লেমিং আশ্চয হয়ে দেখলেন, প্লেটের গায়ে কেমন এক রকম সবুজ রঙের ছাতা ধরে গেছে, আর তার আশপাশ থেকে যাবতীয় স্ট্যাফাইলোকক্কাস উধাও হয়েছে।

কি ব্যাপার! ফ্লেমিং-এর কৌতূহল বেড়ে গেল। তিনি প্লেটখানা নিয়ে খুব ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। সত্যি, কোত্থেকে কতকগুলি সবুজ ছাতা এসে প্লেটের ওপর চড়াও হয়েছে, আর, শুধু চড়াওই হয়নি, নিশ্চয়ই তারা স্ট্যাফাইলোককাসের জীবাণুগুলিকে খেয়ে হজম করে ফেলেছে। নইলে অতগুলি জীবাণু, এই মাত্র যাদের চাষ করে ফলানো হ'ল, তারা যাবে কোথায়?

ফ্লেমিং জানতেন জীবাণু-জগতে এমন অনেক জীবাণু আছে যারা পরস্পরের ঘোরতর শত্রু। একটি বাগে পেলেই আর একটি ধ্বংস করে ফেলে। তা হলে এই ছাতার মধ্যে কি এমন কোন জীবাণু আছে যারা নাকি স্ট্যাফাইলোকক্কাসকেও মেরে ফেলতে পারে? যদি সত্যি তাই হয়, তা হলে তো ওরই সাহায্যে পৃথিবীর অনেক মারাত্মক ব্যাধির ওষুধ তৈরী করা যেতে পারে!

একটা বিরাট সম্ভাবনার কথা চকিতে তাঁর মনের কোণে ভেসে উঠল।

কিন্তু কিসের ছাতা ওটা? ওখানে এলই বা কি করে? ফ্লেমিং এইবার সেই দিকে অনুসন্ধান সুরু করলেন।

ব্যাপারটা যে নেহাৎই একটা দৈব-ঘটনা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। অনুসন্ধানে আরও জানা গেল ঐ সবুজ ছাতাগুলি সত্যি এক জাতের নিম্নস্তরের উদ্ভিদ্‌—যাদের আমরা ছত্রাক বা ফাঙ্গাসের দলে ফেলি এবং বিজ্ঞানীদের কাছে, তাদের নামও অজানা নয়। নামটা অবশ্য তোমাদের কাছে একটু খটমট মনে হবে; তবু বলি: "পেনিসিলিয়াম্ নোটাটাম্।"

ফ্লেমিং এইবার এই সবুজ ছাতা—যার নাম পেনিসিলিয়াম্ নোটাটাম্—নিয়ে জোর গবেষণা সুরু করলেন। কি ভাবে ঐ ছাতার চাষ করা যায়, কি করলে বেশী পরিমাণে ঐ ছাতা গজায় এবং কি এমন অদ্ভুত জিনিস আছে ওর মধ্যে যা অমন অঘটন ঘটাতে পারে।

পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলল। শেষে দেখা গেল, বিশেষ ভাবে তৈরী এক রকম ক্বাথের মধ্যে

ঐ ছাতা সব চেয়ে ভাল জন্মায় এবং জন্মাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদের শরীর থেকে একরকম অদ্ভুত জিনিস বেরিয়ে আসে যা নাকি শুধু স্ট্যাফাইলোকক্কাসই নয়, ঐ রকম আরও অনেক মারাত্মক রোগের জীবাণুকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। পেনিসিলিয়াম্ নোটাটাম থেকে তৈরী, —তাই সংক্ষেপে ওর নাম দেওয়া হ'ল "পেনিসিলিন।"

পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং, কিন্তু প্রথম প্রথম ও নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামাল না, বেশ কয়েক বছর কেটে গেল এই ভাবে। কী বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে কেউ সে খবর জানল না।

তারপর সুরু হ'ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সে এক লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। যুদ্ধেরই প্রয়োজনে চিকিৎসা-বিজ্ঞান নিয়ে শুরু হ'ল নতুন করে গবেষণা, নানা রকম নতুন নতুন ওষুধের খোঁজ চলতে লাগল, আর তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য রোগীরও অভাব হ'ল না। লক্ষ লক্ষ রোগী। তার যেন আর শেষ নেই!

এইবার বিজ্ঞানীদের খেয়াল হ'ল—সত্যিই তো, আলেক্জাণ্ডার ফ্লেমিং এর সেই আবিষ্কার নিয়েও তো এবার পরীক্ষা করা যেতে পারে!

পরীক্ষা করে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেল। এতদিন ধরে তাঁরা যে সব ধরণের ওষুধ ব্যবহার করে আসছিলেন, দেখা গেল, পেনিসিলিন তাদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র, অনেক জীবাণু আছে যারা অন্য জীবাণু ধ্বংস করে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও রোগীর শরীরকে আক্রমণ করে বসে। বলা বাহুল্য, এ রকম জীবাণু দিয়ে ওষুধ তৈরী করলে তা রোগীর কোনই উপকারে আসে না। কিন্তু পেনিসিলিন, দেখা গেল, এদিক্ দিয়ে একেবারে নির্দোষ। রোগের জীবাণু ধ্বংস করেই যেন তার আনন্দ, রোগীর পেশী বা দেহকোষের ওপর তার কোন লোভ নেই। আর, রোগীর শরীরে তাকে অতিমাত্রায় প্রয়োগ করলেও কোন বিষক্রিয়া দেখা যায় না। আবার মজা, কতকগুলি জীবাণু আছে যা অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিতে তেমন কাজ করতে পারে না। পেনিসিলিনের সে সব বালাইও নেই।

বুঝতেই পারছ, এমন একটা "ধন্বন্তরী" ওষুধ হঠাৎ হাতে পেয়ে ডাক্তারদের কী সুবিধেটাই না হয়েছে! আজকাল এই পেনিসিলিন আমাদের যেন নিত্যকার সহচর। শরীর একটু খারাপ হ'ল, গলায় খুসখুস সুরু হ'ল, ঘা, ফোড়া বা ঐ রকম কোন রোগ হ'ল—অমনি, কথাটি নেই, ডাক্তার বাবু এসে পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে দেবেন। শুধু ছোটখাট অসুখ নয়—বড় বড় মারাত্মক অসুখ, বিষাক্ত রোগের সংক্রমণ—যাকে আমরা ডাক্তারদের অনুকরণ করে বলি 'ইন্‌ফেক্‌শন্' হওয়া—সবের ক্ষেত্রেই এই পেনিসিলিন না হলে এক দণ্ড চলে না। আর কি অব্যর্থ তার তেজ! রোগের বাছা যেন পালাই পালাই করে পালাবার পথ পায় না। পৃথিবীর কত

কত কোটি কোটি লোক যে এই পেনিসিলিনের কল্যাণে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তার হিসেব দেওয়াও কঠিন।

আজকাল ইন্‌জেক্‌সনের বদলে মুখ দিয়ে পেনিসিলিন বড়ি খাওয়ানো, ঘায়ে পেনিসিলিনের মলম লাগানো, কোথাও কেটে গেলে পেনিসিলিনের গুঁড়ো লাগিয়ে দেওয়া, কাশি হলে পেনি-সিলিন লজেন্স চোষা—ইত্যাদি হরেক রকম পদ্ধতিতে পেনিসিলিন ব্যবহারের রেওয়াজ হয়েছে। তবে ইন্‌জেক্‌সনের মত অত ভাল কাজ আর কোনটাতেই হয় না। তবে পেনিসিলিন একবার প্রয়োগ করলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর তা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, সেজন্য বারে বারে তা প্রয়োগ করতে হয়, এই যা। তবে এদিক দিয়েও এখন অনেক উন্নতি হয়েছে।

প্রথম যখন পেনিসিলিনের আবিষ্কার হয়, তখন এটি তৈরী করতে প্রচুর খরচ পড়ত, তাই দামও ছিল খুব বেশী। কিন্তু এখন নানা রকম নতুন নতুন পদ্ধতিতে বেশ সস্তায়ই জিনিসটি তৈরী হচ্ছে; দামও কমে গেছে যথেষ্ট। আমাদের দেশে আগে পেনিসিলিন তৈরী হ'ত না, বিদেশ থেকে আমদানী করতে হ'ত, এখন এদেশেই যথেষ্ট পেনিসিলিন তৈরী হচ্ছে।

পেনিসিলিনের গল্প শুনে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব মজা লাগছে! কিন্তু ভুল না, আসলে ওর মূলে রয়েছে সেই সবুজ ছাতা!

বীর অভিজিৎ

শ্রীঅশ্রুরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

যেখানে দেখেছ তুমি অশান্তি অন্যায় অবিচার
ইস্পাত-কঠিন-বক্ষে প্রতিবাদ জানায়েছ তার।
প্রদীপ্ত সৈনিক তুমি, ভারতের মহাবীর্য প্রাণ—
আত্মার ত্যাগের মন্ত্রে উদ্দীপিত হাজার জোয়ান!

আমরা জেগেছি বিশ্বে সুসংহত এ বিরাট জাতি—
দেশের সমূহ স্বার্থে কামান গুলিতে বুক পাতি।
ত্যাগ তুমি শিখায়েছ মহাবীর অভিজিৎ ভাই—
শ্রদ্ধায় স্মরণ করে আমাদের প্রণাম পাঠাই।

বিশ্বজয়ী

শ্রীসুধীরকুমার করণ

সেই আশ্চর্য ঘটনাটি নগর ছাড়িয়ে জনপদেও, যেন বাতাসে বাতাসে ভেসে এল। সবাই শুনলো রাজা এক দেবদুর্লভ সন্তান লাভ করেছেন। নাদুস-নুদুস ননীর পুতুল নয়; দেখলেই মনে হবে,—এ ছেলে বিশ্বজিৎ,—এ ছেলে পৃথিবী জয় করতে পারে। যে দেখে সে-ই মুগ্ধ হয়। চেহারা যেন শ্বেতপাথরে কোঁদা একটি শিশুমূর্তি।

সবাই শুনলো, দোলনায় শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে সে যখন খেলা করছিল, তখন মৃত্যুদূতের মত ভয়ংকর দুটো সাপ কোত্থেকে এসে, ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পিষে মারবার চেষ্টা করছিল। মা তখন অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। একজন ধাত্রী এই দৃশ্য দেখে চোখ বড় বড় করে ফেললো; ওর মুখ থেকে আর কথা বেরুল না। শিশুটি বোধ হয় মাকে দেখাবার জন্যই একবার চীৎকার ক'রে উঠে, মাকে জাগিয়ে দিল। মা জেগে দেখেন, তাঁর সাতরাজার ধন মাণিক দু-হাতে দুটো সাপের গলা টিপে ধরেছে আর মৃত্যুযন্ত্রণায় সেই দুটো সাপের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

আতঙ্কে মা নিজেই চিলের মত তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন। দাসদাসী যে যেখানে ছিল, ছুটে এল। খোলা তরোয়াল নিয়ে রাজা ছুটে এলেন। সাপ দুটো তখন শেষ হয়ে গেছে; এলিয়ে পড়ে আছে।

যে শোনে, সে-ই হতবাক্। একি কাণ্ড! একি মানব-শিশু না দেব-শিশু!

এক বুড়ো অন্ধ জ্যোতিষীর কাছে, শিশুর ভবিষ্যৎ জানতে চাইলেন রাজা। জ্যোতিষী বললো, মহারাজ,—এ শিশু অসামান্য; দেবতার বরে বিশ্বজয়ী হবে। মনের আনন্দে রাজা শিশুটিকে লালনপালন করতে লাগলেন।

কালকেতুর মত 'দিনে দিনে বাড়ে' হারকিউলিস।

কিশোর হারকিউলিসকে একবার দেখলে কেউ আর চোখ ফেরাতে পারে না। যেমন গড়ন, তেমনি দীপ্ত চোখ; মাথায় সোনালী কোঁকড়া চুল; সারা দেহে শক্তি আর লাবণ্য ফুটে বেরুচ্ছে।

রাজা ওকে নিজে রথচালনার কৌশল শেখালেন। তেজী, দুর্দম অশ্বকে কি ভাবে বাগ মানানো যায়, তা-ও শেখালেন। দেখতে দেখতে হারকিউলিস সব বিদ্যায় সমান পারদর্শী হয়ে উঠলো। ঘোড়ায় চড়ে যখন উল্কার বেগে ছোটে, তখন কে বলবে যে এই ছেলে সংগীত বিদ্যাতেও অতুলনীয়। সব গুণের মধ্যেও একটু যেন দোষ ছিল তার। ভারী একগুঁয়ে! ওকে সামলে রাখা দায় হয়ে উঠলো প্রায়।

একদিন এক বীভৎস কাণ্ড করলো হারকিউলিস। ও'র গানের শিক্ষক ছিলেন অ্যাপোলো-দেবের পুত্র লিনাস। কি কারণে সে বিরক্ত হয়ে সেই শিক্ষাগুরুকে বীণার আঘাতে নিহত করলো।

রাজাও শেষ পর্যন্ত এই বদ্‌মেজাজী ছেলেকে একটু শায়েস্তা করার জন্য ওকে এক পাহাড়ী-অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন, তাঁর রাখালদের সঙ্গে থাকবার জন্য। কিন্তু শাপে বর হ'ল হারকিউলিসের। পাহাড়ী জলবায়ুতে তাঁর শরীর আরও শক্ত হ'ল ; শালগাছের মত দীর্ঘ হ'ল। দেখতে দেখতে কিশোর হারকিউলিস তরুণ হ'ল। সারা গ্রীস দেশের সেরা বীর হয়ে উঠল। তার তারুণ্যের দীপ্তিতে সূর্যের তেজও বুঝি ম্লান হয়ে যায়। এক ঘুষিতে একটা রণোন্মত্ত বৃষকে হত্যা করা তখন তার পক্ষে কিছুই নয়। আর বর্শার লক্ষ্য তো অব্যর্থ।

এই সময়ে আবার সে এক অশ্ব মানবের কাছে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করে। এই অশ্ব-মানবরা এক অদ্ভুত শ্রেণীর জীব ; ওদের মাথা মানুষের কিন্তু শরীর অশ্বের। ওরা নানাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করতো। এই অশ্ব-মানবের গুহাতে থেকে সে সব্যসাচী হয়ে উঠলো।

নিজের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে সে পাহাড়-বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। রাজপ্রাসাদের বৈভব তার কাছে তুচ্ছ ; বিলাস-শয্যায় তার অরুচি। তার দৃঢ় ধারণা ছিল, শক্তির গরিমা, কর্তব্যবোধের মধ্যেই নিহিত।

এরপর সুরু হ'ল কর্তব্যের সন্ধান।

দেখা গেল যেখানে মানুষের বিপদ, সেইখানেই বিপদভঞ্জন হারকিউলিস। সে তখন, অত্যাচারিতকে অভয়বাণী শোনাচ্ছে ; হিংস্র প্রাণীর উপদ্রব থেকে মানুষকে রক্ষা করছে। নির্যাতন নিপীড়ন দেখলে, সে আর স্থির থাকতে পারে না ; সাহায্যদানের জন্য ছুটে আসে। তার কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে দেবতারাও মুগ্ধ হলেন।

এর মধ্যে হারকিউলিস পূর্ণ যৌবনের অধিকারী হ'ল। বিয়ে ক'রে সংসারী হ'ল।

দেবরাজ জিউসের পত্নী হীরা কোন কারণে ওর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। ওঁর আক্রোসে সে হঠাৎ পাগল হয়ে যায় এবং নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের আগুনে পুড়িয়ে মারে। এরপর তাঁর মানসিক সুস্থতা ফিরে আসে বটে ; কিন্তু শান্তি পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে।

এদিকে হারকিউলিসের পিতা বৃদ্ধ রাজাও প্রাণত্যাগ করেছেন। হারকিউলিসের দুর্দিন তখন। তাঁর এক আত্মীয়ের অধীনস্থ হয়েই তাঁকে দিন কাটাতে হচ্ছে। সেই আত্মীয়ের যা সর্ত, তা পালন ক'রে স্বাধীন হওয়া তাঁর পক্ষেও অসম্ভব। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে, এই অসীম শক্তিধর বীর, শুধু কর্তব্যবোধের জন্য এই দাসত্বের বন্ধনকে মেনে নিল।

এবং, সে প্রস্তুতও হ'ল অসাধ্যসাধনের জন্য।

নেমিয়া অরণ্যের সেই ভয়াবহ সিংহের কথা সবাই জানতো। এমন কি ওকে অনেকে সিংহ

বলে মনে করতো না; সাক্ষাৎ মৃত্যু বলেই মনে করতো। মনে করতো, ওর চামড়া লোহার বর্মের মত শক্ত, তার নখ বিদ্যুৎবাহী, চোখের দৃষ্টিতে কালানল এবং গর্জনের মধ্যে বজ্র।

সেইখানেই যেতে হ'ল হারকিউলিসকে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে। অস্ত্র তার, তীর-ধনুক আর মূলসুদ্ধ ওপড়ানো একটা অলিভ গাছ। গাছটা গদার মত কাজ করে।

নেমিয়া অরণ্যে পৌঁছে সিংহের গুহার দিকে এগিয়ে গেল সে। তাকে দেখেই, সেই মৃত্যুদূত হিংস্র গর্জনে বনভূমি প্রকম্পিত ক'রে ক্রূর দৃষ্টিতে আগুন ছড়াতে লাগলো। হারকিউলিস তীরের পর তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো, কিন্তু সিংহের বর্ম-সম চর্মে প্রতিহত হয়ে ঠিক্‌রে পড়তে লাগলো সে তীর। এরপর সেই অলিভ গাছটাকে তাক করে ছুঁড়ে মারলো সে। কিন্তু কিছুই হ'ল না সিংহের! ক্রোধে ফেটে পড়ে, ভয়াল মৃত্যুর মত ভয়ংকর হয়ে সিংহের মতই সিংহের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো হারকিউলিস। তার হাতের আঙুলগুলো লোহার মত শক্ত হয়ে সিংহের গলা টিপে ধরলো। সংগে সংগেই সিংহটা মরে গেল। হারকিউলিস সেই মৃত সিংহের চামড়া ছাড়িয়ে গায়ে জড়িয়ে নিল; মাথাটাকে মুকুটের মত করে নিজের মাথার ওপর চাপিয়ে, অলিভ গাছের গদা কাঁধে ফেলে সে যখন ফিরে এল, তখন তার সেই ভয়ংকর চেহারার সামনে আসতে সাহসী হ'ল না তার সেই কাপুরুষ আত্মীয়,—যার নাম ইউরিসথিয়াস।

পরে, আবার ইউরিসথিয়াসের আদেশে হারকিউলিসকে যেতে হ'ল এক অদ্ভুত সাপের কাছে। ন'টি মুখ ছিল সেই সাপের। তাকে নিহত করা অসম্ভব ছিল। কেন না একটি মাথা কেটে

ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আর একটি মাথা গজিয়ে উঠতো। হারকিউলিস তার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এক দ্রুতগামী রথে চড়ে, সেই সাপের গুহার কাছে এলো, এক পাহাড়ে। তারপর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাইরে রেখে, গুহার মুখে দাঁড়িয়ে শন্‌শন্‌ শব্দে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো আর সংগে সংগে সেই বীভৎস জীবটা বাইরে বেরিয়ে এল। তার নাসারন্ধ্র দিয়ে অগ্নিস্রাবী বিষ-নিশ্বাস ঝড়ের বেগে নির্গত হচ্ছিল। বহু চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত অসাধ্যসাধন করলো হারকিউলিস। অলিভ গাছের গদাঘাতে নিহত হ'ল সেই ভয়ংকর সাপ।

কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ নেই হারকিউলিসের। সোনার হরিণের খোঁজে ছুটতে হ'ল আর্কেডিয়ান পর্বতে। এক বছর ধরে ঘুরে বেড়ালো সে হরিণটাকে ধরবার জন্য। বনের পর বন, পাহাড়ের পর পাহাড় ছাড়িয়ে শুধু ছোটা। ছুটতে ছুটতে গ্রীস দেশ ছাড়িয়ে থ্রেস রাজ্যে উপস্থিত হ'ল সে এবং শেষ পর্যন্ত সেই দ্রুতগামী হরিণের একটা পা খোঁড়া করে দিল হারকিউলিস, গদা ছুঁড়ে। তারপর সেই বিরাটদেহী হরিণটাকে কাঁধের উপর চড়িয়ে, বুক ফুলিয়ে ফিরে এল সে।

চতুর্থ যাত্রায় এক ভয়ংকর বন্য বরাহকে বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়ে এল।

এতেও নিষ্কৃতি পেল না সে। ভীরু ইউরিসথিয়াস, হারকিউলিসের মুখের দিকে না তাকিয়ে বললো, 'পুরো বারো ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে এলিস রাজ্যের গোয়াল পরিষ্কার করে দিতে হবে।'

ব্যাপারটা শুনতে যত সহজ, কাজটা কিন্তু দুঃসাধ্য। কেন না এলিসের রাজা অগিয়াসের সেই বিরাট গোয়ালে তিরিশ বছর ধরে পাহাড় প্রমাণ আবর্জনা জমে ছিল। বারো বছরেও তা পরিষ্কার করা যাবে না। আত্মশক্তিতে ঘোরতর বিশ্বাসী হারকিউলিসও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো।

তবু অগিয়াসের কাছে গিয়ে বললো, 'তোমার গোয়াল পরিষ্কার করতে চাই।'

অগিয়াস প্রথমে মনে করেছিলেন, লোকটা পাগল। পরে হারকিউলিসের পরিচয় পেয়ে, ঠাট্টার স্বরেই বললেন—'ভালো কথা; যদি পার তো, আমার তিন শ' গোরু তোমার।'

এবারে শক্তির প্রয়োগ নয়, বুদ্ধির প্রয়োগ করতে হ'ল।

এলিসের দু'দিকে দু'টি নদীর জলধারাকে একটি নালা কেটে বইয়ে দিল সে। আর, সেই জলের প্রচণ্ড স্রোতে তিরিশ বছরের আবর্জনা কয়েক ঘণ্টাতেই নিঃশেষ।

এর পর পাখি শিকারের ভার দেওয়া হ'ল ওকে। পাখি তো নয়, আকাশের ডানাওয়ালা বাঘ। শিকার করাই ওদের পেশা। পাখার পালকগুলো তীরের মত। গরুড়ের বংশধর ; ওদের আক্রমণ থেকে সমুদ্রের নৌকো জাহাজও নিষ্কৃতি লাভ করে না। আর্কেডিয়ার এক বিরাট হ্রদে ওরা বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে। হ্রদটা এমনি দুর্গম জায়গায় যে স্থলপথে ওখানে পৌঁছানো যায় না।

হারকিউলিস চিন্তিত হ'ল। সেই সময় একজন দেবী এসে তাকে একজোড়া বিরাট ঝুমকো দিয়ে গেলেন। সেই পাখিগুলোর কর্কশ আওয়াজের চেয়ে কর্কশ তার শব্দ! ভয়ংকর ঝুমঝুমি।

একটা পাহাড়ে উঠে হারকিউলিস সেই ঝুম্‌কো বাজাতে সুরু করলো; এম্‌নি ভয়ংকর তার শব্দ যে পাখির দল ভয় পেয়ে আকাশে উড়তে লাগলো, আর উৎফুল্ল বীর একের পর এক-কে তীরবিদ্ধ করতে লাগলো। মৃত্যু-চীৎকারে গগন বিদীর্ণ ক'রে—পাখিগুলো ঝুপঝুপ করে ভূতলশায়ী হতে লাগলো। কতকগুলো সেই-যে গ্রীস ছাড়া হয়ে গেল, তাদের আর কোনদিন দেখা যায়নি।

এবার ক্রিটের রাজা মিনসের এক ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই। ষাঁড় না বলে, যম বললেও চলে। তার শৃঙ্গাঘাতে পাহাড় গুঁড়িয়ে যায়, খুরের আঘাতে পৃথিবী চৌচির হয়। কিন্তু সেই বৃষকেই আয়ত্তে এনে, তাঁর পিঠে চড়ে, সমুদ্র পেরিয়ে গ্রীসে এসে হাজির হ'ল হারকিউলিস।

অষ্টম যাত্রায় ঘোটকী ধরার পালা।

থ্রেসের এক দেশ-প্রধানের পালিত আস্তাবলে ওদের আস্তানা। সেই দেশপ্রধান যেমন বন্য-প্রকৃতির, তার ঘোড়াগুলোও তেম্‌নি। ঘোড়াগুলো আনন্দের সংগেই নরমাংস ভক্ষণ করতো। হারকিউলিস ঐ প্রধানকে বন্দী করে, তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে, তারই মাংস খাইয়ে দেয় ঘোটকীদের। আর কি আশ্চর্য! সংগে সংগে পালসুদ্ধ ঘোড়া হারকিউলিসের পেছনে পেছনে পোষমানা হয়ে চলতে থাকে; যেন একপাল নিরীহ ছাগল।

একদল থ্রেসবাসী হারকিউলিসকে আক্রমণ করার জন্যে ছুটে এসেছিল অনেকদূর পর্যন্ত, কিন্তু সেই ঘোড়ার দলই ওদের কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

হারকিউলিস গ্রীসে ফিরে যায়।

এই ধরণের আরও অনেক কিছু অসাধ্যসাধন করার পর, নিষ্কৃতি লাভ করেছিল—এই পৌরাণিক বীর। সাহস ও বুদ্ধির এক সমন্বিত প্রতীক রূপে হারকিউলিস আজও আমাদের বিস্ময়।

পৃথিবীতে যত বিচিত্র রঙ ও রূপের ফুল আছে, তার প্রায় নব্বুই ভাগের মধ্যে হয় কোন গন্ধ নেই, নয় তো তার দুর্গন্ধ। বাকী মাত্র দশভাগ ফুল সুগন্ধযুক্ত।

অপূর্ব প্রতিভা

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

পরীক্ষায় চিরকাল প্রথম হোয়ে গেছেন, এমনি ধারা ভারতীয় মনীষীর নাম যদি তোমাদের বলতে বলি, তোমরা অনেকেই তা পারবে না। আমি দু'জন প্রতিভাধরের নাম তোমাদের বলছি। এঁদের একজন হলেন, আমাদের ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ আর একজন হলেন আমাদের ঘরের লোক, আমাদের বাংলার মনীষী সুসন্তান আচার্য হরিনাথ দে মহাশয়। শুনলে তোমরা আশ্চর্য হবে যে, এই প্রতিভাধর ব্যক্তিটির পৃথিবীর ৩৪টি প্রধান প্রধান ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান ছিল। এই সমস্ত ভাষাতে তিনি অনর্গল কথাবার্তা তো বলতে পারতেনই, শুধু তাই নয়, তিনি এইসব ভাষায় কবিতা এবং প্রবন্ধও লিখতে পারতেন—এমনি ছিল তাঁর জ্ঞানপিপিসা, এমনি ছিল তাঁর অসাধারণ মেধা, এমনি ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা!

১৮৭৭ সালের ১২ই আগষ্ট হরিনাথ দে বাংলার এক নিভৃত পল্লীতে জন্মেছিলেন। মাতুলালয় ছিল ২৪ পরগণার আড়িয়াদহে। এই আড়িয়াদহই ছিল তাঁর জন্মস্থান। পিতা ছিলেন বিহারের রায়পুরের উকিল। নাম ছিল তাঁর রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে। আর মাতা ছিলেন কাত্যায়নী দেবী। পিতার দানশীলতার তুলনা ছিল না। তখনকার বিহার প্রদেশে তাই দানশীলতায় তিনি হতে পেরেছিলেন বিহারের 'বিদ্যাসাগর'। আর মাতার মতো বিদুষী মহিলা তখনকার দিনে অন্ততঃ বিরল ছিল। তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী, হিন্দী, আরবী প্রভৃতি ভাষাতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করেছিলেন। মাত্র ৩৪ বৎসর বেঁচেছিলেন হরিনাথ দে। তারই মধ্যে তাঁর অপূর্ব প্রতিভায় সারা পৃথিবী বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯১১ সালের ৩০শে আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

গ্রন্থকীট কাকে বলে জানো? হরিনাথ দে ঠিক তাই ছিলেন। দিনরাতের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি বিদ্যাচর্চা করতেন ১৮ ঘণ্টা। কথাটা শুনলে তোমরা অবশ্যই আশ্চর্যান্বিত হবে। বিভিন্ন ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে তিনি যে বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেছিলেন, তার মূল্য কতো হবে জানো?

তখনকার দিনে তার মূল্য ছিল এক লক্ষ টাকা। এমনিধারা আরো অনেক অনেক পুরস্কার তিনি স্বদেশের এবং বিদেশের পেয়েছিলেন। তাঁর এই অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বহু বিদেশী মনীষী তাকে অভিনন্দন তো জানিয়েছিলেনই, সংগে সংগে তারা হরিনাথ দে'কে তাঁদের দেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অধ্যাপনার জন্যে। এমনিভাবে চীন, জাপান, রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি দেশ হতে তার আমন্ত্রণ এসেছিল। কিন্তু তিনি বিদেশের সমস্ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাকারিকের পদে অধিষ্ঠিত হন।

এই গ্রন্থাগারই ছিল তার সাধনার তীর্থপীঠ। তিনি মনের মতো কাজ পেয়ে, আপনার জ্ঞানের পিপাসা মিটাতে পেরেছিলেন এমনিভাবেই। এবং এইখানে বসেই তিনি বহু গ্রন্থ রচনা

করে বাংলা তথা ভারতীয় মনীষার বিকাশবর্ধনে সমর্থ হয়েছিলেন। তার বিরাট মনীষা ও অসাধারণ প্রতিভার দিকটা কিন্তু ছোটোবেলাতেই প্রতিভাত হয়েছিল। তোমরা এ কথাটা নিশ্চয়ই জানো, প্রভাত দেখে দিনটা কেমন যাবে তা নাকি বুঝতে পারা যায়। আচার্য হরিনাথ দে'র বেলাতে এ কথাটা বিশেষভাবেই খাটে।

সেই কাহিনী তাঁর জীবনের বলেই, এই বিস্ময়কর প্রতিভার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। তখন কতই বা বয়েস হবে হরিনাথ দে'র। বড়জোর তিন কিংবা চার বৎসর। তখন সারাদিন খেলা করে বেড়ায় ছেলে। মা-বাবার এই একটি মাত্র আদরের ধন। আদরের অন্ত নেই বাড়ীতে। একদিন উকিল পিতা ভূতনাথ দে বললেন ছেলের মা কাত্যায়নী দেবীকে : আদরে নাড়ুগোপাল করলেই তো চলবে না ছেলেকে, এবার একটু-আধটু পড়াও।

'আচ্ছা আজই সুরু করবো' তুমি ঠিকই বলেছো বটে!' হরিনাথের মা জবাব দিলেন। বাবা খুশি মনে আপন ওকালতী কাজে আবার লেগে গেলেন। তার সময় কোথা? মা বিদুষী তাঁরই ওপর ভার পড়লো তাই!

মা ডাকলেন ছেলেকে। হরিনাথ কাছে এলো মায়ের। জিজ্ঞাসা করলো : 'কি বলছো মা আমায়—ডেকেছো তুমি?'

'হ্যাঁ হরিনাথ, তোমাকে পড়তে হবে এবার।'

'আমি পড়বো মা।'

মায়ের কথায় রাজি হয়ে গেছে ছেলে। বাবার কিনে দেওয়া প্রথমভাগখানা এসে হাজির হলো মার কাছে। 'মা বই এনেছি—আমাকে একবার পড়িয়ে দাও তুমি, আমি তারপর নিজেই পড়তে পারবো!' মা বিস্মিত হলেন। একবার মাত্র পড়িয়ে দিলে সমস্ত প্রথমভাগখানা পড়তে পারবে হরিনাথ!

'আচ্ছা পড়ো।'

মাতা কাত্যায়নী দেবী পুত্র হরিনাথ দে'কে সমস্ত বইখানা একবার মাত্র পড়িয়ে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, হরিনাথ সমস্ত বইখানা অনর্গল মুখস্থ বলে গেল তার বাবা-মা'র কাছে, সেইদিন সন্ধ্যাবেলা! শুধু তাই না, অ, আ, ক, খ, অক্ষরগুলো বাবার কিনে আনা শিলেটখানায় ঠিক ঠিক না দেখে লিখে তাদের আরো অবাক করে দিল! মা-বাবার মুখে কথা নেই, আনন্দে তারা তখন বাক্যহারা ছেলের এইরকম প্রতিভা দেখে।

'এই ছেলে তোমার দে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে, তা তুমি দেখে নিও!' বলেছিলেন তাঁর মা।

সত্যিই হরিনাথ দে তাঁর বংশের মুখ তো উজ্জ্বল করেছিলেনই, তাছাড়া সারা ভারতের মুখও তিনি যে উজ্জ্বল করে গেছেন তা তোমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।

বাঁচতে মাছের বাতাস চাই

শ্রীঅরূপরতন ভট্টাচার্য

হরিপদ বললে, অসম্ভব।

অসম্ভব! ছোটমামা বললে, কেন?

কেন'র আবার কী! জলের মাছ জলেই বাঁচে এই স্বাভাবিক। বাতাসে মুখ তুলে নিঃশ্বাস না নিতে পারলে জলের মাছ জলে ডুবে মরে তোমার মুখে এমন কথা প্রথম শুনলাম।

ছোটমামা হাসলো।

প্রথম শোন, দ্বিতীয় শোন আর তৃতীয় শোন কিছু যায় আসে না তাতে। যা বলেছি আমি, সে কথা ঠিক।

ঠিক? কখনোই নয়। হরিপদ চোখ রাঙ্গাল। যা-তা কথা বোলো না, ছোটমামা।

না, যা-তা নয়। তবে হ্যাঁ, মাছ মানুষ নয়। সব সময়ে তাকে জলের উপরে দেখবে, তা চলে না। একবার বাতাসে মুখ বের করে নিঃশ্বাস নিয়ে খানিকটা সময় সে সেই বাতাসে শ্বাসের কাজ চালাতে পারে জলের ভিতরে। আর তা ছাড়া, মামা কথাবার্তায় প্রত্যয় আনলে, জলের অক্সিজেন নিয়ে আরও কিছুটা সময় জলের মধ্যে কাটানো চলে।

সত্যি? হরিপদ বিস্মিত হ'ল।

হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু, শুনে রাখো, জলের অক্সিজেন যথেষ্ট নয়। তাই বাতাস টানবার জন্যে মাছকে মাঝে মাঝে জলের উপরে উঠতেই হবে।

মানি না আমি। হরিপদ হঠাৎ প্রতিবাদ করলো। জলের উপরে মুখ না তুলেও জলের মাছ শ্বাসের কাজ চালাতে পারে।

তবে বোসো। তোমাকে ভালো প্রমাণ দিই একটা।

বাড়ীতে কৈ মাছ এসেছিল সেদিন। টাট্‌কা কৈ। রীতিমতো লাফাচ্ছে। মামা তার গোটা দুই সংগ্রহ করলে। শুধু তাই নয়। সেই সংগে এলো জল-ভর্তি কাঁচের জগ একটা। কানায় কানায় ভর্তি।

দুটো কৈ ছেড়ে দিলো মামা জলের মধ্যে। ঘুরে বেড়াতে লাগলো তারা। তারপরে মামা একটা প্লেন কাঁচ নিয়ে জলের উপরে ঢাকা দিয়ে দিলে।

আর ঢাকনা দিতে দিতে মামা মুখ তুললে, তাকালে হরিপদর দিকে, বললে, খেয়াল

রাখো, ঢাকনার নীচে জগের ভিতরে জল ছাড়া বাতাস নেই এতটুকু। বাতাস যাবার পথও বন্ধ।

মাছগুলো দিব্যি জলে খেলে বেড়াতে লাগলো। দু'চার মিনিট এমনি গেল। তারপরে অস্থিরতা, ক্রমশ চাঞ্চল্য। জলের উপরে উঠবার চেষ্টা। কিন্তু না, কোনো উপায় নেই। পথ বন্ধ। জলের গায়ে প্লেন কাঁচ। মাছ উঠে বাতাস নেবে কেমন করে হবে?

মাছগুলো অবসন্ন হয়ে আসছে।

মামা মুচকি হাসছে।

হরিপদর সামনে পরাজয়, মুখে তবু আত্মরক্ষার চেষ্টা।

দেখা যাক্ শেষ পর্যন্ত কী হয়।

কী আর হবে?

সময় এগোতে লাগল। মাছগুলো জলের তলায় নেতিয়ে পড়ছে। একেবারে শেষ অবস্থা। নড়া-চড়া করবার ক্ষমতাও নেই। তারপরে হরিপদ জগের ভিতর থেকে মাছ বের করে আনলো। একদম শেষ, নিষ্প্রাণ, মৃত।

মামা বললে, কী ভাগ্নে, প্রমাণ মিললো?

হরিপদ ঘাড় চুলকোল।

কৈ মাছে না হয় হ'লো। কিন্তু সব মাছের বেলায়ই কী বাতাস নেওয়া দরকার মুখ তুলে?

মামা বললে, হ্যাঁ, মোটামুটি সব মাছের বেলায়ই দরকার। তবে, কোন মাছ বাতাস নিয়ে জলের নীচে অনেকক্ষণ থাকে, কোন মাছ অল্পক্ষণ।

হরিপদ গম্ভীর গলায় বললে, মানলুম।

জর্জ ওয়াশিংটন যখন তাঁর দর্জিকে জামাকাপড় তৈরি করাতে দিতেন, তখন তিনি তাঁর নিজের হাতে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলি ভাল করে লিখে দিতেন। সেই লেখার মধ্যে বোতামের ঘরার ফাঁক কতটুকু এবং কিরকম হবে, সেটুকু লিখতেও তিনি বাদ দিতেন না।

প্রথম সবাক চিত্র

'জাজ সিঙ্গার' ও 'সিঙ্গিং ফুল' নামক সবাক ছবির নায়ক অল জলসন

ত্রিশ বৎসরের চেয়েও আগে একটা রাত্রি সবাক সিনেমা জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সেই রাত্রে নির্বাক চিত্র মুখর হয়ে উঠেছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, নিউইয়র্কের কোন সিনেমা-কক্ষের গৃহে ওয়ারনার ব্রাদার্স সর্বপ্রথম সবাক চিত্র দর্শকের সামনে দেখান। ঐ দিন এই ওয়ারনার ব্রাদার্সরা 'Jazz Singer' নামে ছবিটি দর্শকদের দেখান। এতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন Al Jalson। সেদিন তাঁর কথা ও গান সকল দর্শককে অবাক ও বিস্মিত করে দিয়েছিল। আজ প্রায় ৪০ বৎসর পরে মনে হয়, ছবি যে মুখর হবে তা কেউ ভাবতেই পারতো না সে সময়।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে নির্বাক ছবি এল পর্দার সম্মুখে। তখন দর্শকরা অবাক হয়ে যেত চলন্ত ও নড়ন্ত ছবি দেখে। নির্বাক ছবিকে দর্শকরা সময়ে শিল্পকলা বলে গ্রহণ করল। কথা বলার সময় যখন ঠোঁট নড়ত, তখন সংলাপ পর্দার ওপর ছাপা আখ্যাপত্রে (sub title) ভেসে উঠত। এই নিঃশব্দতাকে ভঙ্গ করার জন্য এবং দর্শকের মধ্যে একটা অনুভূতি জাগাবার জন্যে একটা ঐকতান বাজনা হ'ত এবং তার মধ্যে একজন পিয়ানোবাদকও থাকত। এইরূপ নানা পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাক চিত্র একটা আনন্দ উপভোগের জিনিস ছিল।

কিন্তু ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের এক রাত্রে পর্দার ওপর 'Jazz Singer'-এর সবাক চিত্র প্রতিফলিত ক'রে সমস্ত নির্বাক জিনিসটা ওলটপালট ক'রে দিল। স্তব্ধতা ভেঙে গেল এবং নির্বাক চিত্রের রাজত্ব শেষ হয়ে গেল। একজন ইহুদী গায়ক Al Jolson এই 'Jazz Singer'-এ অদ্ভুত গান করে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' করে দিলেন।

অন্যান্য চিত্র-প্রযোজকেরা ভেবেছিলেন, কয়েক দিনের ক্ষণিক উত্তেজনা, কিন্তু শীঘ্রই আসল ব্যাপার বোঝা গেল। নির্বাক চিত্র বাদ দিয়ে সবাক চিত্র তৈরী করার জন্য হলিউডে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। Al Jolson 'Jazz Singer'-এর পরে 'Singing fool' নামে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য সবাক ছবিতে আমেরিকার সিনেমাগৃহগুলিকে ভাসিয়ে দিলেন। এই সবাক ছবিতে 'Mammy' নামক একটি গানে সমস্ত আমেরিকাকে কাঁদিয়ে দিল।

কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ১৯২৭ সালে যে রাত্রে ওয়ার্ণার ব্রাদার্স সবাক চিত্র পর্দার ওপর ফেললেন, এটা তাদের পক্ষে ফাটকাবাজীর খেলা হয়েছিল।

ভারত ও পাকিস্তান

ভারত আয়তনে পাকিস্তানের চারগুণ। শিল্প-সামর্থ্যে দু' দেশের তফাৎ আরও অনেক বেশী। আমাদের দেশের শ্রমজীবীদের শতকরা ১০ ভাগ কাজ করে বড় বড় কলকারখানায়। জাতীয় আয়ের শতকরা ১৮ থেকে ১৯ ভাগ আসে সেখান থেকে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানে শ্রমজীবীদের শতকরা ৮ ভাগ কাজ করে এবং তার আয় ১০ ভাগ। আমাদের দেশে ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে বড় বড় কারখানায়, পাকিস্তানে মাত্র ৬ লক্ষ। আমাদের কলকারখানা ও শিল্পের পরিধি অনেক ব্যাপক অনেক বেশী আমরা আত্মনির্ভরও। পাকিস্তানে কল বলতে কিছু কাপড়ের কল, আর কিছু চটকল; তারপর টুকিটাকি এটা সেটা। সেখানে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য কোন কারখানা নেই। ইস্পাত তৈরির ব্যবস্থাও নেই বললেই চলে। ওদের তুলনায় ভারত রীতিমত শিল্পে উন্নত দেশ। আমরা পাকিস্তানের তুলনায় ৪০ গুণ বেশী সালফিউরিক অ্যাসিড, ২০ গুণ বেশী রাসায়নিক সার, ১০ থেকে ১৫ গুণ কসটিক সোডা, এবং তার চেয়েও বড় খবর হ'ল আমরা বছরে ৯০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করতে পারি, পাকিস্তান সে তুলনায় এক ছটাকও নয়।

উদ্বিড়াল বা ভোঁদড়-এর (Otter) নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। এর গায়ের চামড়া পুরু, কালো ও গাঢ় বাদামী লোমে আবৃত এবং এর লম্বা ল্যাজ জলে নৌকার হালের মত কাজ করে। নদীর তীরে গর্তের মধ্যে এরা বাস করে। সাধারণতঃ এরা মাছ খায়, কিন্তু শীত এলে ওরা সমস্ত দেশ ঘুরে বেড়ায় গৃহপালিত পাখি ও ডিম ইত্যাদি খাবার সংগ্রহের জন্য।

এই জন্তুরা সাধারণতঃ জোড়ায় জোড়ায় বা ৪।৫টি এক সঙ্গে সপরিবারে ঘুরে বেড়ায়।

সাধারণতঃ লোকেরা বিশ্বাস করে মৌমাছি, বোলতা ইত্যাদি পতঙ্গরা মানুষ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করলে তাকে আর কামড়াতে পারে না। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। এদের হুল শরীরের গর্তের মধ্যে প্রবেশ করে। নিঃশ্বাস বন্ধের জন্যে কিছু আসে যায় না। এদের কামড়ানো বেশ বুঝতে পারা যায়।

চশমা এখন অনেকেই পরে। কিন্তু এ জিনিসটা কবে পৃথিবীতে প্রচলিত হ'ল তা অনেকেই বলতে পারে না। পুরনো ধরণের চশমা ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে আঁকা ছবিতে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু ১৬০০ শতাব্দীর শেষে এর উৎপাদন ও প্রচলন খুব বেশী হয়েছিল।

*
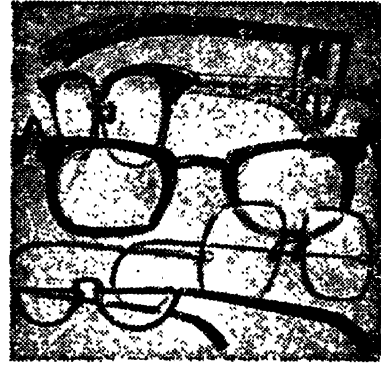
ভেনাস অব মিলো নামে প্রেমের দেবতার একটি পাথরের অপূর্ব সুন্দর মূর্তি ১৮২০ খৃষ্টাব্দে গ্রীস এবং ক্রীটের মধ্যবর্তী দ্বীপে Melos নামক স্থানে একটি ধ্বংসাবশেষের নীচে খুঁড়ে বের করা হয়। যারা এই মূর্তিকে মাটি খুঁড়ে বের করেছিলেন, তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি, যে এই প্রতিমূর্তি নারী-সৌন্দর্যের অপরূপ সৃষ্টি। এটি একজন ফরাসী আবিষ্কার করেন এবং এই অমর প্রতিমূর্তিটি প্যারীর Louvre Museum-এ রক্ষিত হয়েছে।

গড়পড়তা মানুষের মাথার বেড় সাড়ে বাইশ ইঞ্চি। কোন কোন ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ভাবে বড় বা ছোট হয়ে থাকে।

*

শেক্সপীয়র তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে 'দি কমিডি অব এররস্' বইটিতেই কেবলমাত্র একবার আমেরিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

*

১৮৩৩ সালে ইংলণ্ডের টেমস্ নদীতে শেষ একবার স্যালমন মাছ ধরা পড়ে।

*

১৭৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ারে সবচেয়ে বৃহৎ যে উল্কাপাত হয়, তার ওজন ৫৬ পাউণ্ড।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শ্রীকমল চৌধুরী

যোগীন্দ্রনাথ সরকার একটি পরিচিত নাম। বর্তমান বৎসরে তাঁর একশততম জন্মবর্ষ দেশের সর্বত্র পালিত হবে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির জনপ্রিয়তা বর্তমান সময়েও অক্ষুণ্ণ। এখনও তাঁর গ্রন্থগুলি বাঙলার ঘরে ঘরে সমাদৃত।

যোগীন্দ্রনাথ ছবি, গল্প ও ছড়ায় এক আশ্চর্য জগতের দ্বার শিশুদের জন্য মুক্ত করেছিলেন। সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন তিনি নানা বিষয়ের রচনা, নানাভাবে। নীতি কথার গল্প, বিজ্ঞান, জ্ঞানমূলক প্রভৃতি বিষয় চিত্রসহ শিশুদের উপযোগী করে লিখেছিলেন। 'হাসিখুশি'র 'অ য় অজগর আসছে তেড়ে' আজও শিশুমনকে আকৃষ্ট করে। 'হারাধনের দশটি ছেলে'কে কেউ ভুলতে পারে না। তারপর আরও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু এমন আর একখানি গ্রন্থও আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি।

যোগীন্দ্রনাথের লেখা বইয়ের সংখ্যা কম নয়। তিনি বহু গ্রন্থ সম্পাদনাও করেছিলেন। সেকালের বিখ্যাত লেখকদের রচনা এবং নানা জ্ঞানমূলক রচনা সংকলন করে শিশু-সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'জ্ঞানমুকুল' প্রকাশিত হয় ১৮৯০ খৃঃ। গ্রন্থখানির সম্পর্কে 'সাথী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল : "গল্পচ্ছলে সুন্দর সুন্দর চিত্রের সাহায্যে, সকল বিষয় শিক্ষা দিতে পারিলে, শিক্ষা অতিশয় সহজ হয়, এবং তাহার ফলও আশানুরূপ হয়। 'জ্ঞানমুকুল' পুস্তকখানির দ্বারা

সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে আশা করা যায়।...গ্রন্থকার সে বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। সহজ ভাষায় গল্প, নানাবিধ নীতিকথা, বিজ্ঞানের কথা প্রভৃতি পুস্তকে লেখা হইয়াছে এবং বালক-বালিকার মনোরঞ্জনের জন্য অনেকগুলি অতি সুন্দর চিত্রও দেওয়া হইয়াছে। বালক-বালিকারা ইহাতে শিক্ষা ও আমোদ উভয়ই পাইবে।"

৮৯১ খৃঃ যোগীন্দ্রনাথ 'হাসি ও খেলা' গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। যোগীন্দ্রনাথের নিজের লেখার সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রাজকৃষ্ণ রায়, প্রমদাচরণ সেন প্রভৃতির লেখাও সংকলিত হয়েছিল। অসংখ্য চিত্রে বইখানি চিত্রিত।

১৮৯৬ খৃঃ 'রাঙাছবি' প্রকাশিত হয়। তারপর প্রকাশিত হয়েছিল 'হাসিখুশি' (১৮৯৭ খৃঃ), 'খেলার সাথী' (১৮৯৮ খৃঃ), 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯ খৃঃ)। 'শিশুসমাজে রস ভগীরথ' যোগীন্দ্রনাথের রচনায় স্বতন্ত্র কোন শিল্পবৈশিষ্ট্য ছিল না। তা যেমন সহজ সরল তেমনি অনাড়ম্বর। এই স্বাভাবিকতাই লেখককে আজও শিশু-মনোরাজ্যের অন্যতম প্রিয় মানুষ করে রেখেছে। একবার সজনীকান্ত দাস লিখেছিলেন ঃ "সাধারণ গৃহস্থবাড়ীতেও (তখন) পাঠ্যেতর বইয়ের আমদানী ছিল না বলিলেই চলে। শিশু-সাহিত্যের একমাত্র পরিবেশক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়। বাংলাদেশের এইকালের ছেলেমেয়েদের তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহারা বড় হইয়া বিস্মৃতিপরায়ণ না হইলে তাঁহার নামে উচ্চতম স্মৃতিস্তম্ভ বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই নির্মিত হইত।"

যোগীন্দ্রনাথ যেমন বিদেশী ছবি অবলম্বন করেছিলেন তাঁর গল্প ও ছড়ায়, তেমনি শিল্পীদের নির্দেশ দিয়ে নিজের মনোমত ছবিও আঁকিয়ে নিতেন। যোগীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি মজার খবর লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর দৌহিত্রী শ্রীরঞ্জিতা কুণ্ডু। খবরটি হল ঃ

"আমরা যখন দাদামশায়কে দেখেছি, তখন তিনি বৃদ্ধ, অথর্ব, জরাগ্রস্ত। তবে তাঁর মুখেই তাঁর বাল্য ও যৌবনের খাবার ক্ষমতার যে গল্প শুনেছি, তা একাধারে কৌতুকাবহ এবং আজকের যুগের পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্য। শুনেছি জয়নগরের মাঠে-মাঠে এবং পাড়ায় পাড়ায় দৌরাত্ম্য করে বেড়ানর সময় কখনও কখনও একটি বড় কাঁঠাল খেয়ে তিনি অনায়াসেই হজম করতেন। যখন তিনি যুবক এবং যতদূর সম্ভব তাঁদের পরিবার কলকাতাবাসী, তখন পুরো একটি গঙ্গার ইলিশ মাছ ভাজা জলখাবার হিসাবে তিনি খেয়ে ফেলতেন। অবশ্য তাঁদের সে সময়কার আথিক অবস্থা স্মরণ করলে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে এমন প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য কি করে সংগ্রহ হ'ত। যতদূর সম্ভব এই ভোজনপর্বের যুগে তাঁর অগ্রজেরা সকলে উপার্জন করতে আরম্ভ করেছেন এবং তাঁদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হয়েছে। এই সময় একবার নাকি তাঁর বড়বৌদি অর্থাৎ অবিনাশচন্দ্র সরকারের পত্নী রান্নাঘরের মধ্যে বসে রুটি সেঁকছিলেন এবং যুবক যোগীন্দ্রনাথ সেইখানে বসে বৌদির সঙ্গে গল্প করতে করতে ৩০।৩২ খানা হাত রুটি খেয়ে ফেলেন। আমরা যখন তাঁকে দেখেছি তখন তিনি অত্যন্ত মিতাহারী কিন্তু তখনও তিনি লোককে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, নিজে না খেতে জানলে কেউ খাওয়াতেও শেখে না। তেমনই নিজে রসিক না হলে, ধার করা রস পরিবেশন করা সম্ভব না। তাঁর মত রসিক পুরুষ আজকের দিনে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।"

শিকার-ভঙ্গ

শ্রীনন্দীলাল দে

আমলাপুরে আমরা সেদিন হামলা করি মন্দ না,
সঙ্গে ছিল গঙ্গা বিনোদ নন্দ এবং বন্দনা।
পুকুর পাড়ে তুপুর বেলা খেলছি সবে ডাংগুলি
পুলের নীচে ঘাসের শিষে কাণ্ড দেখায় গাঙ্গুলী।
পুকুর পাড়ে পাকুড় গাছে জাল পেতেছে মাকড়সা,
দেখছি যখন আবার তখন নিয়ে এল চাকর চা।
আঠার মত জালের মাঝে হঠাৎ এসে পতঙ্গ,
টাট্‌কা ফাঁদে আট্‌কা পড়ে ছড়ায় ত্রাসে তরঙ্গ।
মাকড় ছিল চুপ্‌টি করে গভীর গুরু-মূর্তিতে,
শিকার ভেবে অমনি ছোটে বেজায় রকম স্ফূর্তিতে।
এমনি করে চালাক মাকড় কটাৎ করে সব ধরে,
হঠাৎ কেমন চালিয়ে দিল উদর-রূপী গহ্বরে!
এবার এল জলের থেকে মস্ত বড় কাঁকড়া যে,
ঠ্যাংগুলো তার করাত কাঠি, বিরাট নেড়ে দাড়টাকে,
শিকার ভেবে তরতরিয়ে মাকড়সা যায় কামড়াতে
সর্বনাশী কাঁকড়া তখন উল্টে ধরে চামড়াতে।
মাকড়সা তো লাফিয়ে উঠে ব্যথায় থাকে কাতরাতে
জালটা ছিঁড়ে বলের মত জলেই থাকে সাঁতরাতে।
ছেড়া জালই বেয়ে এবার জীবন নিয়ে পুণ্যেতে,
একলা শুধু পাতার আড়ে উড়তে থাকে শূন্যেতে।
অলস পোকার কাণ্ড দেখি খেলা ফেলে ডাংগুলি।
ফিরে এলাম, খোসমেজাজে আমরা এবং গাঙ্গুলী।

মেঠুড়ে

জাতীয় জলক্রীড়া

কয়েক দিন আগে নতুন দিল্লীর নর্দার্ণ রেলওয়ের নতুন জলাশয়ে জাতীয় জলক্রীড়ার বাইশতম অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। এই অনুষ্ঠানে এগারটা বিভাগে নতুন রেকর্ড হয়েছে। এই এগারটার ভেতর দশটা রেকর্ড হয়েছে বালক-বালিকা বিভাগ এবং মহিলা বিভাগ মিলিয়ে। তবে মহিলা বিভাগে যে রেকর্ডগুলো হয়েছে, তা যাঁরা করেছেন তাঁদের অধিকাংশই বিদেশিনী। এই বিদেশিনীদের কথা বাদ দিলে সর্বপ্রথম রাজস্থানের রিমা দত্তের কথা মনে আসে। রিমা দত্ত ভারতীয় মহিলা সাঁতারুদের ভেতর আজ ফ্রি স্টাইল ও চিৎ সাঁতারে পয়লা নম্বর সাঁতারু।

জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকায় সেনা দলের প্রতিনিধিরা এবার জাতীয় জলক্রীড়ায় অংশ নেননি। সিনিয়ার বিভাগে নতুন নজীর রেখেছেন রেলওয়ে দলের সাঁতারু অরুণ সাহা। রেল দল সাঁতারের সিনিয়ার চ্যাম্পিয়ানশিপ ও ওয়াটার পোলোতে শীর্ষস্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ভুবনেশ্বর পাঁড়ের নেতৃত্বে রেলদল এবার নিয়ে পরপর পাঁচবার জাতীয় ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতায় জয়ী হ'ল। অরুণ সাহা ছাড়া রেলের আর কোনো প্রতিনিধি জাতীয় রেকর্ড নতুন করে গড়তে না পারলেও, রেলদলের রণজিৎ ব্যানার্জি চিং সাঁতার এবং কান্তি দত্ত ডাইভিংয়ে দ্বি-মুকুট পেয়েছেন। এঁরা ছাড়া সিনিয়ার বিভাগে আর যাঁরা দ্বি-মুকুট পেয়েছেন, তাঁরা হলেন মার্গারেট চার্নবুল ও পশ্চিমবঙ্গের নিমাই দাস। নিমাই দাস একশ মিটার ফ্রি স্টাইলে ব্রোঞ্জ পদকও পেয়েছেন। বলা যেতে পারে, এবারের প্রতিযোগিতায় মেয়েরাই সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মেয়েদের একশ ও দু'শ মিটার ফ্রি স্টাইল ফাইন্যালে প্রথম পাঁচজনই আগের রেকর্ড ভেঙেছেন।

একমাত্র বুক সাঁতার ছাড়া মহিলাদের সাঁতারের সব ক'টা বিভাগে নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে। কিশোররাও পেছিয়ে থাকেনি। একমাত্র চারশ মিটার ফ্রি স্টাইল ছাড়া তাদের বিভাগের সব অনুষ্ঠানে রেকর্ড হয়েছে।

দিল্লী যাবার আগে পশ্চিমবঙ্গের সাঁতারুরা অনুশীলনের বিশেষ সুযোগ না পেলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা জুনিয়ার ও কিশোর-কিশোরী দু'বিভাগেই শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। আরো দু-একজন প্রতিযোগী পাঠালে এবারের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ যে আরো পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারত একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

রুশ অ্যাথলীট দল

বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে রাশিয়ার স্থান অনেক উঁচুতে। সেই রাশিয়ান অ্যাথলীটদের দু'জন মহিলা আর তেরোজন পুরুষ অ্যাথলীট নিয়ে গড়া রাশিয়ার একটি উজবেক অ্যাথলেটিক দল শুভেচ্ছা সফরের জন্যে ২ নভেম্বর ভারতে এসে পৌঁচচ্ছেন। উজবেক দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের চারটে অ্যাথলেটিক টেস্টের ব্যবস্থা হয়েছে। ৪ ও ৫ তারিখে মাদ্রাজে প্রথম টেস্ট, ৮ ও ৯ তারিখে ভিলাইতে দ্বিতীয় টেস্ট, ১২ ও ১৩ তারিখে জলন্ধরে তৃতীয় টেস্ট এবং ১৫ ও ১৬ তারিখে দিল্লীতে চতুর্থ টেস্টের আয়োজন করা হয়েছে। রাশিয়া থেকে যাঁরা ভারত সফরে আসছেন দু'একজন বাদে তাঁরা সবাই প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগী নন। তবু ভারতে তাঁরা যে সুনাম রেখে যাবেন তাতে সন্দেহ নেই। আগামী সংখ্যার "মৌচাক"-এ এ বিষয়ে বিস্তৃত খবর জানাবার ইচ্ছে রইল।

রুশ ফুটবল দল

রাশিয়ার ফুটবল দল আর. এস. এফ. এস. আর. দিল্লীতে একটা ফুটবল ম্যাচ খেলে ১২ নভেম্বর দিল্লী থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছবে। ১৪ নভেম্বর দলটি নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন একাদশের সঙ্গে রবীন্দ্র স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ খেলবে। আগন্তুক দলটি দিল্লীতে ১১ই, কলকাতায় ১৪ই, মাদ্রাজে ২৮ নভেম্বর এবং বোম্বাইয়ে ৫ ডিসেম্বর নিখিল ভারত ফুটবল একাদশের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক দলগুলোর সঙ্গে একটি করে ম্যাচ খেলবে। আগামী সংখ্যায় তোমরা এ সম্পর্কে বিস্তৃত খবর জানতে পারবে।

শেষ পর্যন্ত শান্তির দেশ, অহিংসার দেশ, ভারতবর্ষকেও যুদ্ধ করতে হ'ল—হিংস্র, হীন, হিংসুটে প্রতিবেশী পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে। প্রায় এক মাসের কিছু কম সময় ধরে এই যুদ্ধ হয়ে, গত ২২শে সেপ্টেম্বর তা থেমে যায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ এই যুদ্ধবিরতির আদেশ দিলে আমরা এই প্রস্তাব মেনে নিই। কিন্তু শত্রুপক্ষ পাকিস্তান এ প্রস্তাব মেনে নিলেও, তা সম্পূর্ণভাবে পালন না করে, আজও এখানে-ওখানে কোথাও চোরাগোপ্তা, কোথাও বা প্রকাশ্যে আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

এর আসল কারণ, আমাদের ভারতীয় জওয়ানদের কাছে দারুণভাবে মার খেয়ে, অস্ত্রশস্ত্র ও জমি-জমা খুইয়ে তারা যে অপমানিত বোধ করেছে, সেটা ঢাকবার জন্যেই এইভাবে তারা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব ভঙ্গ করে চলেছে। এতে তারা তাদের দেশের লোকের কাছে এটাই দেখাতে চাইছে যে, যুদ্ধ এখনো থামেনি, অতএব তারাও এখনো হারেনি। কিন্তু যতই তারা মিথ্যা কথা বলুক বা হীন চক্রান্ত করুক, একথা আজ কি পাকিস্তান, কি পাকিস্তানের বাইরে, কারুর কাছেই আর অজানা নেই, যে দুর্ধর্ষ ভারতীয় জোওয়ানদের কাছে পকিস্তান ভীষণভাবে মার খেয়েছে।

সেকেণ্ড লেফটেনান্ট
অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধ যে আমরা চাই না এবং কোন দেশের সঙ্গে অকারণ গায়ে পড়ে যুদ্ধ করা যে ভারতের নীতি বা আদর্শ নয়, তা তোমরা অনেকেই জান। এই শান্তিরক্ষার জন্যে

ফ্লাইট লেফটেনাণ্ট : ভাস্কর গুহরায়

ফ্লাইট লেফ্টেনাণ্ট তপনকুমার চৌধুরী

পাকিস্তানের অনেক শত্রুতা, অত্যাচার ও দুরভিসন্ধি আমরা বহুদিন থেকে সহ্য করেও, প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে তাকে ক্ষমা করে এসেছি। বহুবার যুদ্ধ করার মত বহু প্ররোচনাও আমরা আলাপ-আলোচনার দ্বারা মিটিয়ে ফেলতে চেয়েছি। কিন্তু আমাদের এই ভদ্রতা ও শান্তি কামনাকে তারা দুর্বলতা মনে করে আমাদের উপর বার বার হামলা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের অন্তর্গত দেশ কাশ্মীর নিজেদের অধীনে আনার জন্য সেখানে নানা রকম হীন চক্রান্ত করে, হাজার হাজার হানাদার পাঠিয়ে যখন সুবিধা করতে পারেনি, তখন নির্লজ্জের মত অসংখ্য সৈন্য, ভারী ভারী ট্যাংক, কামান ও বিমান প্রভৃতি নিয়ে আক্রমণ করে বসে ভারতভূমি!

এই অবস্থায় ভারতের যুদ্ধ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। আমাদের প্রবল পরাক্রম বীর সৈনিকরা পাকিস্তানের এই দুরভিসন্ধি ও মারাত্মক স্পর্ধাকে ধ্বংস করে দেবার জন্য এবং দেশের স্বাধীনতা

আমাদের বিজয়ী জওয়ানরা ডেরা-বাবা-নানকে একটি কূপ থেকে পানীয় জল সংগ্রহের চেষ্টা করছেন

রক্ষার জন্যে, নানা দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর উপর। আকাশে বোমারু বিমান নিয়ে, ট্যাংক, কামান, মেসিনগান আর যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে, পাকিস্তানের আক্রমণকে তচনচ

করে, আমাদের সৈন্যরা একটি জায়গা ছাড়া সব জায়গাতেই শত্রুর সমস্ত যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে বিফল করে দেয়। শুধু বিফল করে দেওয়া নয়,—ঘাটির পর ঘাটি দখল করে, তাদের ভারী ভারী প্যাটান ট্যাংককে ঘায়েল করে, প্রচুর সৈন্য বন্দী করে, অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে এগিয়ে যায় পাকিস্তানের মধ্যে। লাহোর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে ইছোগিল খালের ধারে গিয়ে উপস্থিত হয় আমাদের অসম সাহসী বীর যোদ্ধার দল। এখানে পাকিস্তান আত্মরক্ষার জন্য গোলাগুলি বোঝাই কংক্রিটের যে 'পিলবক্স'গুলি তৈরি করেছিল, সেগুলি পর্যন্ত অসাধারণ সাহস দেখিয়ে আমাদের সৈন্যরা ভেঙে চুরমার করে দেয়।

'মহাবীরচক্রে' ভূষিত
মেজর ভাস্কর রায়

ইছোগিল খালের পারে কয়েক শত গজ দূরে দূরে পাকিস্তান এমনি বহু 'পিলবক্স' গড়ে রেখেছিল। ডোগরাই নামক একটি জায়গায় আমাদের জওয়ানরা বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এই 'পিলবক্স'গুলি অকেজো করে দেয়। বুরকি নামক একটি জায়গাতেও পাকিস্তান তাদের 'পিলবক্স' থেকে খুবই অগ্নিবর্ষণ করছিল, আমাদের দু'জন জওয়ান সেখানেও জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে যায় এবং এক পাশের ফাঁক দিয়ে পিলবক্সের মধ্যে হাত বোমা ছুঁড়ে নিজেদের আত্মাহুতি দিয়ে সঙ্গের সৈনিকদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

'মহাবীরচক্রে' ভূষিত জওয়ান
মেজর রঞ্জিৎ সিং দয়াল

যুদ্ধক্ষেত্রে এমনি আমাদের সৈনিকদের বীরত্বের কাহিনী পাকিস্তানকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে, পরাজিত করেছে, ভীত করেছে। মেজর রঞ্জিৎ সিং দয়াল ৮,৫০০ ফিট উপরে হাজী পীর পাস এবং উরি-পুঞ্চ অঞ্চলে শত্রুকে এমনভাবে বিপর্যস্ত ও ঘায়েল করেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান তাদের সৈনিকদের মধ্যে তাঁর মাথার জন্যে ৫০,০০০ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে বলে ঘোষণা করে। শুধু এই বীর দয়ালই নয়, টিথোয়াল রণাঙ্গনে মেজর সংপ্রকাশ
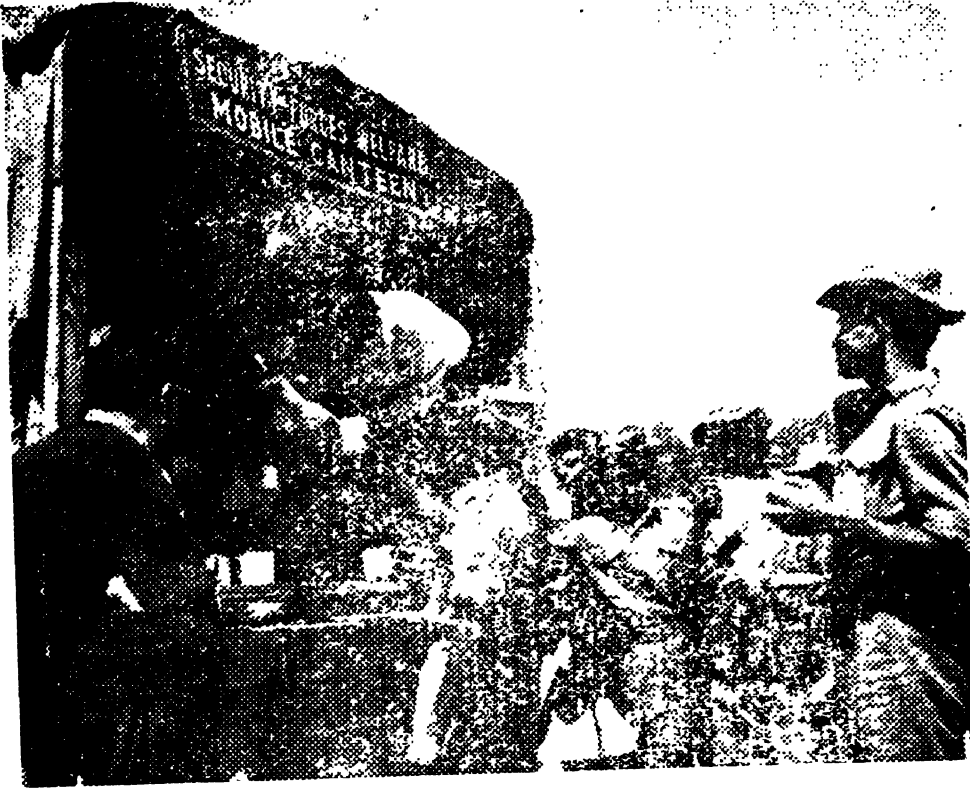
চলন্ত ক্যান্টিনের সাহায্যে যুদ্ধের অগ্রবর্তী অঞ্চলে জওয়ানদের চা প্রভৃতি জলযোগের ব্যবস্থা করানো হচ্ছে

বর্মা এবং অন্যান্য স্থানে স্থলযুদ্ধে ও আকাশযুদ্ধে শিঙ্গার সিং, হাবিলদার আব্দুল হামিদ, মেজর ভূপীন্দর সিং, মেজর ত্যাগী, মেজর শর্মা, মেজর জ্যাকী, মেজর রাতরা, মেজর সোমেশ কাপুর, লেঃ খান্না, লেঃ ভিগম সিং, সেঃ লেঃ বেদী, উইং কঃ গুডম্যান, পি. পি. সিং, স্কোঃ লিঃ জাভার, হাণ্ডা, ফ্লাঃ লেঃ ত্রিলোচন সিং, ডি. এন. রাঠোর, এ. টি. কুক, ফ্লাঃ অঃ ম্যামগেন, এ. আর. গান্ধী, ভি. কে. নেব এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালীদের মধ্যে সেঃ লেঃ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ফ্লাঃ লেঃ ভাস্কর গুহ রায়, মনোজ বসু চৌধুরী, তপনকুমার চৌধুরী, মেজর ভাস্কর রায়, ক্যাপ্টেন প্রবাল রায় স্কোঃ লিঃ এ. কে. ঘোষ, মেজর পি. কে. চৌধুরী প্রভৃতি বহু হত, আহত ও জীবিত এই বীরদের নাম ইতিহাসের পাতায়

ভারতীয় জওয়ানদের হাতে বারকির পুলিস-ষ্টেশন (লাহোর)

স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমাদের সরকার স্বদেশের জন্য তাঁদের এই আত্মদান ও বীরত্বকে 'পরম বীরচক্র', 'বীরচক্র', 'মহাবীরচক্র' প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সম্মানে ভূষিত করেছেন। তাছাড়া এককালীন সাত হাজার, পাঁচ হাজার ও তিন হাজার টাকা পুরস্কারেরও ব্যবস্থা হয়েছে এই অসীম সাহসী সৈনিকদের জন্য।

এই যুদ্ধ প্রধানতঃ কাশ্মীর অঞ্চল এবং পঞ্জাব প্রদেশের উপর দিয়েই গিয়েছে। বাংলা দেশের দু'চারটি জায়গায় শত্রু-বিমান হানা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে তারা বিশেষ কিছুই ক্ষতি করতে পারেনি এবং তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সামরিক বস্তুর উপর। কারণ শত্রুরা জানত, পশ্চিমবঙ্গে নিরীহ জনসাধারণের উপর বোমা ফেললে, তাদের পূর্ব-পাকিস্তান রক্ষা করা মোটেই সম্ভব হবে

হাবিলদার আব্দুল হামিদ, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-নিধন ব্যাপারে অদ্ভুত বীরত্বের জন্য মৃত্যুর পর তাঁকে 'পরম বীরচক্রে' ভূষিত করা হয়

না। একে পূর্ব-পাকিস্তানের লোকেরা এই অন্যায় যুদ্ধ চায় না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি তাদের সহানুভূতিও নেই, তার উপর ভারত যদি তাদের আক্রমণ করব মনে করে, তাহলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ব-পাকিস্তান ধ্বংস করা তাদের পক্ষে মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়।

যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি সব দেশেই হয়ে থাকে। তবু যুদ্ধের মধ্যেও কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালিত হয়। সে নিয়মের প্রধান ও অন্যতম একটি হ'ল—ধর্মস্থান, হাসপাতাল বা 'রেডক্রশ' দেওয়া গাড়ি, যারা আহত সৈনিকদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে যায় শুশ্রূষার জন্য, তাদের উপর কোন অত্যাচার বা গুলিগোলা না ছোঁড়া। সভ্য দেশের অনেকে যুদ্ধ করলেও এ নিয়ম রক্ষা করে থাকে। কিন্তু হিংস্র বর্বরের মত পাকিস্তান কেবলমাত্র যুদ্ধের মধ্যেই নয়, যুদ্ধবিরতির পরও পাঞ্জাবে হাসপাতাল, ধর্মস্থান, চার্চ, মসজিদ, প্রভৃতির উপর মারাত্মক রকমের বোমা ফেলে রোগী, শিশু ও নিরীহ অসহায় জনসাধারণকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। হেরে গিয়ে শেষ প্রতিহিংসা নিয়েছে সে এইভাবে। অথচ আমরা, অর্থাৎ আমাদের বৈমানিকরা ইচ্ছা করলে সারা লাহোরই শুধু নয়, সারা পশ্চিম পাকিস্তান এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে গিয়ে ভুট্টো আয়ুবের বাসস্থানকেও চুরমার করে দিয়ে আসতে পারত।

কিন্তু হিটলারের মত বর্বরের নীতি ভারত গ্রহণ করতে পারে না; সে সত্য ও ন্যায়ের পূজারী। এই নৃশংস নীতির জন্য হিটলারও যেমন একদিন নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি মাটির তলায় বাসগৃহ বানিয়ে, তেমনি পররাজ্যলোভী ভুট্টো-আয়ুবেরও একদিন জীবনের যবনিকাপাত হবে এই হিংস্র নীতির ফলে।

———

যোগাযোগ রক্ষাকারী জনৈক সৈনিক যুদ্ধের অগ্রবর্তী অঞ্চল থেকে
হেডকোয়ার্টারস্-এ পরিস্থিতির খবর দিচ্ছেন

মেজর পি. কে. চৌধুরী

কয়েকজন বীর বাঙালী সৈনিকের স্বতন্ত্র পরিচয়

সেকেণ্ড লেফ্টেনাণ্ট অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

কাশ্মীরের কারগিল ফ্রণ্টে যুদ্ধরত অবস্থায় অভিজিৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র তেইশ বছর। ১৯৪২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় অভিজিতের জন্ম হয়। ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে তিনি সেনাবাহিনীর জরুরী কমিশনে যোগ দেন। তাঁর পিতা লোকসভার সদস্য শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় চীনা আক্রমণের সময় তাঁকে সেনা-বাহিনীতে যোগ দিতে উৎসাহিত করেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বেসর্বা জেনারেল চৌধুরীর নিজস্ব যে রেজিমেণ্ট, অভিজিৎ ছিলেন তারই কমানডিং অফিসারদের অন্যতম।
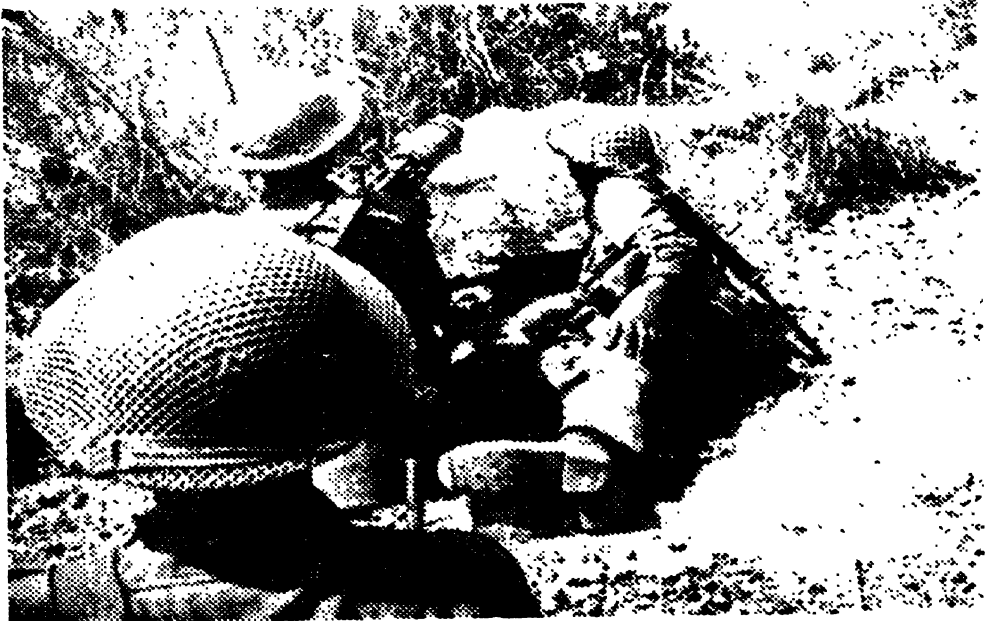
*
শত্রুর মুখোমুখি আমাদের জওয়ানরা
*

*

পাশে : ভারতীয় বিমান-বাহিনীর স্কোঃ লিঃ এম. এস. জাতার (বাঁয়ে), স্কোঃ লিঃ এস. হ্যাণ্ডা (ডাইনে)। উভয়েই 'বীরচক্রে' সম্মানিত।

*

নীচে : পাকিস্তানি বোমায় বিধ্বস্ত পাঞ্জাবের একটি গ্রাম্য বাড়ি
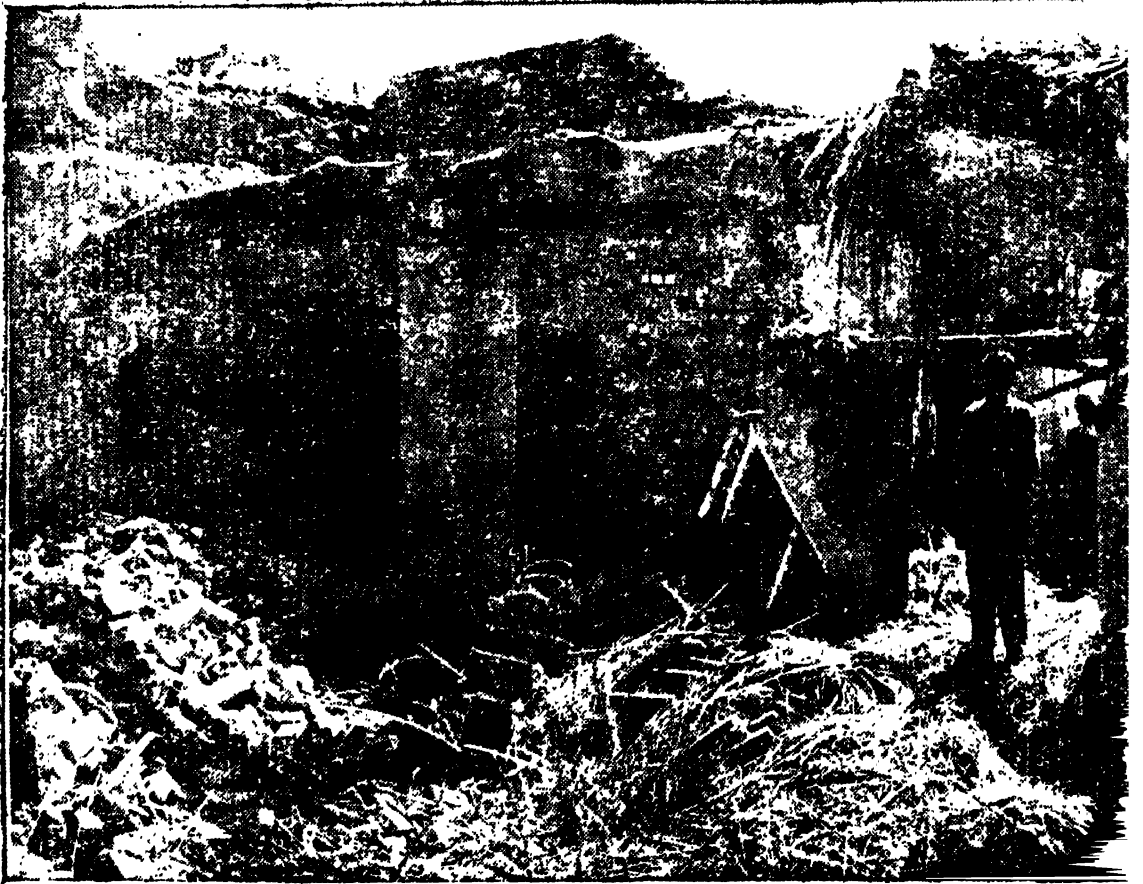
পাশে : ফ্লাঃ অঃ এস, সি. ম্যামগেন (বাঁয়ে) ফ্লাঃ অঃ এ. আর গান্ধী (ডাইনে)। উভয়েই 'বীরচক্রে' সম্মানিত।

(৪৯১ পৃষ্ঠার পর)

তার মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পিতার কাছে এবং কৃষ্ণনগরে মাতা শ্রীমতী প্রীতি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সান্ত্বনা জানিয়ে শোকবাণী পাঠিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী সেই শোকবাণীতে তাঁর পিতাকে জানিয়েছিলেন, 'এ শুধু আপনার একার শোক নয়, সমস্ত দেশের। ভগবান আপনার সহায় হোন।'

মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে তিনি বিবাহ করেছিলেন, তাঁর একটি আট মাসের শিশু ও স্ত্রী বর্তমান।

ফ্লাঃ লেফ্‌টেনাণ্ট তপনকুমার চৌধুরী

লাহোর শিয়ালকোট রণাঙ্গনে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে বৈমানিক বীর তপনকুমার চৌধুরী ১৫ই সেপ্টেম্বর আত্মাহুতি দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন। ছোট থেকেই তপনকুমার ছিলেন অত্যন্ত দুঃসাহসী। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি সেই অপূর্ব সাহস ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেন। তপনকুমার কলিকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের অ্যাডভোকেট শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র। পিতার সঙ্গে, ছেলের মৃত্যুর পর কাগজের এক রিপোর্টার দেখা করলে তিনি বলেন, 'আমি

আমার পুত্রের জন্য অত্যন্ত গর্বিত। সে তার কর্তব্য সম্পন্ন করেছে। দেশ ও জাতির জন্য সে গৌরবময় মৃত্যুবরণ করেছে।'

ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যাকাডেমীতে গ্রাজুয়েট হওয়ার পর ১৯৫৫ সালে তপনকুমার ভারতীয় বিমান-বাহিনীতে যোগ দেন। দশ বৎসর বয়সেই তাঁকে দেরাদুনের রয়েল ইণ্ডিয়ান মিলিটারী কলেজে নেওয়া হয়। ভারতীয় বিমান-বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর তিনি প্রথমে পাইলট অফিসার, ফ্লাইং অফিসার এবং সব শেষে ফ্লাইট লেফ্‌টেনাণ্ট পদে নিযুক্ত হন।

পাকিস্তানের সঙ্গে আকাশযুদ্ধে শত্রুর গুলির আঘাতে তাঁর বিমানটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, তিনি নিরাপদে দেশের মাটিতে নিজের বিমানটি নাবিয়ে, তারপর মৃত্যুবরণ করেন।

বাবাকে লেখা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তপনের শেষ চিঠিতে যুদ্ধের সুন্দর বর্ণনা ও স্বদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসার অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

'বাবা,

আমরা ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে শত্রু-ঘাটির উপর আক্রমণ চালাচ্ছি। প্রত্যেকবার আমরা উঁচু আকাশ দিয়ে চলাচল করছি। আমরা পাকিস্তানি ট্যাংক গুঁড়িয়ে দিয়েছি, একের পর এক শত্রুর সামরিক আস্তানাগুলি ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছি। আমি মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার্থ আমার পবিত্র দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছি।

শত্রু আমার বিমানটির গায়ে একটি আঁচড়ও কাটতে পারেনি। মা কালীর আশীর্বাদ এবং আমার বাবা-মার আশীর্বাদেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য-সাধনের পথে এই আশীর্বাদই বড় কথা। তোমরা আমার জন্যে প্রার্থনা করো, যাতে প্রত্যেকদিন আমি শত্রুদের পঙ্গু করে দিতে পারি।

৫ই সেপ্টেম্বর থেকে একটুও বিশ্রাম নিইনি। সেদিন থেকে আজ হ'ল মোট ১২ দিন। তুমি সবাইকে বলো তারা যেন আমাকে চিঠি দেয়। চিঠিগুলি আমাকে উৎসাহ দেবে। দেশের জন্য, জাতির জন্য আমি আমার কর্তব্য করে যাব। মাকে আলাদা চিঠি দিলাম না। তুমি মাকে বলো, তাঁর তৃতীয় পুত্র সাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছে।

এখন আর সময় নেই। এখন আমাকে আকাশে উঠতে হবে—উদ্দেশ্য শত্রু হনন। সে এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর ব্যাপার! ইতি—তপন।

ফ্লাঃ লেফ্‌টেনাণ্ট ভাস্কর গুহরায়

১৯৬১ সালে তরুণ বাঙালী ভাস্কর গুহরায় ভারতীয় বিমান-বাহিনীতে যোগ দিয়ে, ভারত-ভূমির মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষায় মরণপণ সংকল্পে মাত্র বাইশ বছর বয়সে আকাশ যুদ্ধে অসাধারণ

বীরত্ব দেখিয়ে জীবন বিসর্জন দেন। ১৯৬১ সালে ভারতীয় বিমান-বাহিনীতে যোগ দিলেও, তাঁর অপূর্ব দক্ষতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য তিনি ১৯৬৩ সালের মধ্যেই জেট জঙ্গী বিমানের বৈমানিক হবার গৌরব অর্জন করেন।

মাত্র গত এপ্রিল মাসে তিনি আমেরিকা থেকে বিমান-চালনার বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে স্বদেশে ফেরেন। ভারতীয় বিমান-বাহিনীতে খুব কম অফিসারই এত অল্প বয়সে তাঁর মত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভাস্করের পিতা শ্রীরবি গুহরায় পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলা নিবাসী হলেও, তিনি বহুকাল মালয়ে কাটান এবং মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ভাস্করের বাল্যকাল কাটে।

ক্যাপ্টেন প্রবাল রায়

কলিকাতা রসা রোডের অনেকেই "বাবু"কে চেনেন। ঐ নামেই প্রবাল রায় পাড়ায় পরিচিতি লাভ করেছিলেন। খেলাধূলা, অভিনয় এবং পাড়ার সমস্ত জনহিতকর কাজে প্রবাল ছিল সবার আগে। পিতা শ্রীনীরোদ রায় একটি বীমা কোম্পানীতে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিধবা মায়ের কাছে প্রবালের মৃত্যু সংবাদ আসে। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে সমস্ত পাড়ায় বিষণ্ণতার কালোছায়া নেমে আসে। "বাবু" আর পাড়ায় ফিরে আসবে না, এ কথা কেউই যেন বিশ্বাস করতে চাইছিল না।

স্কোয়াড্রন লীডার এ. কে. ঘোষ

পাকিস্তানী আক্রমণের মোকাবিলা করতে গিয়ে লখনউ প্রবাসী বাঙ্গালী বীর স্কোয়াড্রন লীডার অসিতকুমার ঘোষ (৩২) শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। লখনউর 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকার ১২ অক্টোবর সংখ্যায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

লখনউর বিশিষ্ট ঘোষ পরিবারের সন্তান অসিতকুমার লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ভারতীয় বিমান-বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালের নবেম্বর মাসে তিনি কমিশন পর্যায়ভুক্ত হন। হানটার বিমান শিক্ষানবিশীর প্রথম দলের তিনি ছিলেন অন্যতম। কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি পাইলট ফাইটার নিযুক্ত হন।

একাধিক কৃতিত্বের অধিকারী অসিতকুমার গত চীন আক্রমণের সময়ে নেফা অঞ্চলে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। সেদিন স্বর্গত এয়ার ভাইস-মারশাল শ্রীযশবন্ত সিং অসিতকুমারের প্রশংসা করেছিলেন মুক্তকণ্ঠে।

অসিতকুমারের পিতা পূর্বেই পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুর পরে অসিতকুমার রেখে গেছেন—বিধবা মা, স্ত্রী, ভাই-বোন আর তাঁর এক বছরের একটি পুত্রসন্তান।

ভারতীয় বিমান-বহরের সর্বাধ্যক্ষ এয়ার মার্শাল অর্জুন সিং

উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় জীবনের এই আকস্মিক পরিণতিতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বিমান বাহিনীর প্রধান শ্রীঅর্জুন সিং অসিতকুমারের মা ও স্ত্রীর কাছে সমবেদনা জানিয়েছেন। দুঃখ-পীড়িতা মা ও স্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন : আমাদের ক্ষতি অপূরণীয় সন্দেহ নেই, দুঃখও অপরিসীম, তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, সমগ্র জাতি এই ক্ষতির অংশ ভাগ করে নিয়েছে, দুঃখের অংশও নিয়েছে সমান ভাবে।

মেজর পি. কে. চৌধুরী

মেজর পীযূষকুমার চৌধুরী লাহোর রণাঙ্গনে দেশরক্ষার পবিত্র যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। মেজর পীযূষ দানাপুরের সন্তান। তাঁর পিতা শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এ এলাকার একজন মাননীয় পুরুষ। দানাপুর বলদেও একাডেমীতে দীর্ঘকাল তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। দু'চোখে জল নিয়ে মেজর চৌধুরীর বৃদ্ধ পিতা সংবাদদাতাকে বলেন যে, তিনি বছর তিরিশেক আগে নোয়াখালি থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসেন; তারপর এখানকার প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন। তাঁর স্ত্রী, ছেলের কাছ থেকে শেষ চিঠি পান ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে। তাতে মেজর চৌধুরী লিখেছিলেন, 'যুদ্ধে আমাদের জয় সুনিশ্চিত।' এর তিনদিন পরেই ১৩ সেপ্টেম্বর মেজর চৌধুরী বীরের মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৬ বৎসর।

পাশে : উইং কঃ ডব্লু এম. গুডম্যান (বাঁয়ে), সিং (ডাইনে)। ভারতীয় বিমান-বাহিনীর এই দু'জন অফিসার 'মহাবীরচক্রে' সম্মানিত হন।

*

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন।)

কুলদা-কিশোর গল্প-চতুষ্টয়—কুলদারঞ্জন রায় প্রণীত। এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১০.০০

কুলদারঞ্জন রায় শিশু-সাহিত্যের এক চিরস্মরণীয় পুরুষ। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'সন্দেশ' পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর যে সাহিত্য-কীর্তির সূচনা হয়েছিল, তা ক্রমশঃ শাখা-পল্লবে, ফলে-ফুলে বিস্তৃতি লাভ করে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। তিনি কয়েকখানি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ রচনা করে, অনুবাদ করে, আমাদের শিশু সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

তাঁর বিখ্যাত চারখানি গ্রন্থ একত্রে এই সচিত্র বিরাট গ্রন্থখানির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলি হচ্ছে—'পুরাণের গল্প', 'কথাসরিৎসাগর', 'ছেলেদের বেতাল পঞ্চ-বিংশতি' ও 'রবিন্‌হুড্।' এই বইগুলির প্রত্যেকখানিই শিক্ষা ও আনন্দ উভয় দিক থেকেই ছোটদের উপকারসাধন করবে। প্রকাশক এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করে শিশু-সাহিত্যের একটি স্থায়ী কাজ করলেন। বইখানি আগাগোড়া খ্যাতিমান শিল্পী সমর দে'র তুলিতে যেমন সুচিত্রিত ও সুশোভিত, তেমনি মূল্যবান কাগজে সুমুদ্রিত। কিন্তু গ্রন্থখানির নাম 'গল্প-চতুষ্টয়' না দিয়ে 'গ্রন্থ-চতুষ্টয়' দেওয়াই সম্ভবতঃ যুক্তিযুক্ত ছিল।

দানোর জঙ্গলে—খগেন্দ্রনাথ মিত্র। গ্রন্থমেলা, এ।১২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১.৮০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ছোটদের সাহিত্যে খ্যাতিমান লেখক। অনেক রকম বই তিনি লিখেছেন। এই বইখানির নাম থেকেই বোঝা যায় যে এটি অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বই। এই বইয়ের পরিচয় সম্পর্কে গোড়াতেই তিনি যা লিখেছেন সংক্ষেপে তা থেকে দু চারটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন, "দু'টি কিশোর প্রথমে পরস্পরের অচেনা ছিল। তারা একই সামাজিক স্তরেরও নয়। একজন শহুরে ও মধ্যবিত্ত ঘরের, অপরজন আদিবাসী-পুত্র ও পাহাড়ী-পল্লীবাসী। কিন্তু উভয়েই ছাত্র, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বুদ্ধিমান ও সাহসী। ইতিহাস তাদের মনে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ফলে, তারা বিভিন্ন স্থান থেকে গেছে নিষদ্ধ 'দানোর জঙ্গলে' বসুমতীর অন্তরে এককালের

যে ইতিহাস, লুপ্ত নগরীর যে নিদর্শন ও রহস্য গুপ্ত আছে তা প্রকাশ করতে।” বই-খানি তোমরা পড়লে এবং ছবিগুলি দেখলে, এ পরিচয়ের চেয়ে অনেক বেশী জানতে পেরে খুশি হবে।

নিঝুমপুরীর রূপকথা—সুজিতকুমার নাগ। গ্রন্থমেলা, এ।১২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১·৮০

অনেকগুলি রূপকথার কাহিনী ছোটদের জন্যে লিখেছেন লেখক। রূপকথার কাহিনী লেখা একদিক থেকে যেমন সহজ, অপর দিক থেকে আবার তেমনি শক্ত। কেবলমাত্র পক্ষিরাজ ঘোড়া, তেপান্তরের মাঠ, ময়নামতীর চর হলেই হয় না, লেখার বাঁধন ও ভঙ্গীটিও সেখানে মস্ত বড জিনিস। এ বইটিতে কাহিনীর বাঁধন ততো উচ্চাঙ্গের হয়নি, যার ফলে ঘটনাগুলির বিন্যাস অপরিচ্ছন্ন ও বিচ্ছিন্ন মনে হয়েছে স্থানে স্থানে।

উড়ে চলি দক্ষিণে—এন. কারজিন। সরিৎশেখর মজুমদার কর্তৃক অনূদিত। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৩·৭৫

এই গ্রন্থের মূল লেখক এন. কারজিন সম্বন্ধে প্রথমেই তোমাদের একটু পরিচয় দিই। রাশিয়ার খ্যাতিমান লেখক কারজিন, কেবলমাত্র লেখকই ছিলেন না, চিত্রাঙ্কন বিদ্যাতেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। নিজের লেখা বইয়ে ছবি এঁকে তিনি পাঠকদের মুগ্ধ করতেন। এই গ্রন্থখানিতেও তিনি তাঁর নিজের হাতে বহুবর্ণ চিত্র এঁকেছিলেন। যদিও বাংলা অনুবাদে সে চিত্র ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তা না হলেও, রচনার গুণে লেখার মধ্যেই তিনি যে অনবদ্য চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তা ছোট-বড় সকল শ্রেণীর পাঠককেই অভিভূত করবে।

ভারী মজার এই বই। একটি সারস পাখীর জন্ম থেকে তার আত্মকাহিনী বলা হয়েছে এই বইয়ে এবং এই কাহিনী বলেছে বাচ্চা সারস নিজেই। তাদের বাসস্থান রাশিয়ার উত্তরাংশের এক জলাভূমি। সেখান থেকে শীতের সময় দেশান্তরী হয়ে তারা চলে যায় আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান লেক্ ভিক্টোরিয়ার অঞ্চলে, আবার শীত কমলে ফিরে আসে নিজের দেশে।

সারস সমাজের আশ্চর্য পরিচয়ের সঙ্গে অনেক কিছুই শেখবার আছে জানবার আছে। আদর্শ চরিত্রের সঙ্গে শান্তিতে সমাজ-জীবন যাপনের অনেক কিছুই তোমরা, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এই বই থেকে জ্ঞানলাভ করবে। এমন একখানি শিশু-সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থ আমাদের দেশের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের পড়া উচিত। অনুবাদক সরিৎশেখর মজুমদারকে এই বইয়ের নির্বাচন ও অনবদ্য ভাষান্তর-কার্যের জন্য আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ দিই, আর প্রকাশককে সাধুবাদ দিই বাংলার শিশু-কিশোর সাহিত্যে এরূপ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ উপস্থিত করার জন্য। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ উৎকৃষ্ট।
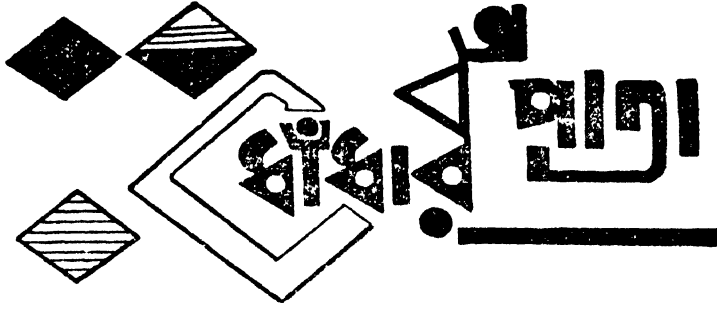
সংখ্যা দিয়ে নানা রকম ধাঁধা সৃষ্টি করা যায়। এগুলিকে অঙ্কের যাদুও বলা চলে। এগুলি দিয়ে তোমরা বন্ধুবান্ধবদের কাছেও মজা দেখাতে পারো। এবারের এই তিনটি অঙ্ক কেমন লাগে প'ড়ে দেখো।

অঙ্কের যাদু

১। আটটি ৮কে এমন ভাবে সাজাও, যাতে সেই সমষ্টির সমবেত সংখ্যা হয় ১,০০০। প্রয়োজন মত তোমরা ঐ আটটি আটকে যেমন ভাবে সম্ভব যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সবই করতে পারো, কিন্তু তার ফল দেখাতে হবে ১,০০০।

২। বন্ধুবান্ধব বা কোন লোককে আশ্চর্য করে দেবার জন্যে এখানে তোমাদের আর একটি মজার অঙ্কের কারসাজি শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে একটি কাগজের টুকরোয় ৮ সংখ্যাটি বাদ দিয়ে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯ পর্যন্ত লিখবে। তারপর তোমার বন্ধু বা যে লোকদের তুমি অঙ্কের এই মজা দেখাতে চাও তাদের বলবে, এই সংখ্যাগুলির মধ্যে একটি মনে করতে। সে একটি সংখ্যা মনে করলে, তাকেই বলবে, যে সংখ্যাটি সে মনে করেছে, সেই সংখ্যার সঙ্গে ৯ গুণ করতে। ৯ গুণ করলে যা হবে, সেটি দিয়ে এই ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯ সংখ্যাকে বলবে গুণ করতে। এবং সেই সময়ে বলে দেবে যে, এবার তার যে গুণফল হবে, সেই গুণফলের শুধু একটি নয়, সব কটি সংখ্যাই হবে তার মনে করা সংখ্যাটি।

তখন সে ঐ গুণফল দেখে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবে।

৩। এবার ৯ এর আর একটি মজার অঙ্কের কথা বলি। একাধিক অঙ্ক বিশিষ্ট কোন একটি সংখ্যা (যেমন ৯৭৩৮) নিয়ে, সেটির ঠিক তলায় ঐ সংখ্যাটি উল্টে রেখে বিয়োগ করবে। এই বিয়োগ করলে যে বিয়োগ ফল হবে, দেখবে তা সকল সময়েই ৯-এর দ্বারা বিভাজ্য, অর্থাৎ ভাগ করলে মিলে যাবে।

(উত্তর আগামীবার বেরুবে)

আমাদের সকল পূজা-পার্বণ এ'বছরের মত শেষ হয়েছে। এখন তোমরা মনোযোগ দিচ্ছ আসন্ন পরীক্ষায়। অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হলেও বিপদের ঝুঁকি আমাদের এখনো কেটে যায়নি—আশা করি প্রতিদিন সংবাদপত্রের মাধ্যমে তোমরা সবই জানতে পারো।

তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বসে তাদের কথাই মনে হয়—সেই তপন, অভিজিৎ, ভাস্কর—যারা আমাদের দেশের ছেলে, শত্রুর সঙ্গে লড়তে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে—এরা আমাদের গৌরব—আজ তাদের নাম সবার মুখে মুখে ফিরছে। তাই তো তোমাদের দিকে তাকিয়ে সেই কথাই মনে হয়—পৃথিবীতে যখন স্বার্থপরতা ও হানাহানির বিষবাষ্প ভরে ওঠে, তখন তোমাদের প্রাণচাঞ্চল্য বহন করে আনে সেই মন্ত্র, যে মন্ত্রে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, তোমাদের মধ্যে মহাজীবনের আবির্ভাব দেখি।

তোমরা আমাদের দেশের তরুণরাই আমাদের দেশের গৌরব। তাই তো তোমাদের দিকে চেয়ে আমরা আশার আলো দেখতে পাই।

আমাদের দেশের প্রত্যেকটি সন্তান, সুসন্তানে পরিণত হোক—এই তো আজকের দিনের কথা।

মহাজীবন থেকে

বাগবাজারে স্কুলের জন্য একটি নতুন বাড়ী ভাড়া করা হয়েছে। নিবেদিতা সে বাড়ী গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত—এমন সময় একদিন স্বামীজী মঠের দু'জন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করে সেখানে এলেন। স্বামীজী ওরকম ভাবে আসবেন এটা খুবই অপ্রত্যাশিত। নিবেদিতা তাঁকে অভ্যর্থনা করে দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। স্কুল সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে স্বামীজী ফিরে যাবার সময় বল্লেন : কাল সকালে বেলুড়ে এসো।

স্বামীজীকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে প্রণাম করে নিবেদিতা বল্লেন : স্কুলের যেদিন দারোদঘাটন হবে সেদিন আপনি আশীর্বাদ করতে আসবেন না ?

স্বামীজী বল্লেন : সব সময়েই তো আশীর্বাদ করছি।

এটাই যে স্বামীজীর শেষ আসা তা নিবেদিতা বুঝতে পারেন নি।

পরের দিন সকালে নিবেদিতা বেলুড় মঠে গেলেন। সেদিন স্বামীজী সন্ন্যাসীদের কাছে নিবেদিতার স্কুল সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। নিবেদিতা চলে আসবার সময় মাথায় হাত রেখে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

স্কুলের কাজে নিবেদিতা বেশীর ভাগ সময় ব্যস্ত থাকেন, নিয়মিত ভাবে বেলুড় যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু একদিন নিবেদিতার মনে হলো আজ মঠে যেতেই হবে। সেদিন তাঁর যাওয়ার কথাও নয়, আগে থেকে কোনও খবরও দেওয়া হয়নি, তবু তাঁর মনে হলো তিনি যাবেনই, যখন তিনি মঠে যান তখন দুপুর বেলা। মঠের সন্ন্যাসীরা সবাই বিশ্রাম নিচ্ছেন। স্বামীজীর ঘরের সামনে জনতার কোন ভিড় নেই। নিবেদিতা খবর পাঠালেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডাক এলো। স্বামীজী সেদিন বেশী কথা বলেন নি। দু'একটি কুশল প্রশ্নের পর আদেশ করলেন নিবেদিতাকে সেদিন সেখানে খেয়ে যেতে। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালেন। খাওয়া হলে তিনি নিজে তাঁর হাতে জল ঢেলে দিলেন। তাঁর এই ব্যবহারে নিবেদিতা খুব অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর এই বিব্রত ভাব লক্ষ্য করে স্বামীজী বল্লেন, আমি তো শুধু তোমার হাতে জল ঢেলে দিয়েছি ; যীশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।

স্বামীজীর সেদিনকার কথাবার্তা হাবভাব একটু অসাধারণ বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু একথা তাঁর একবারও মনে হয়নি যে এই শেষ দেখা।

পরের দিন—তখনও রাতের আঁধার কাটেনি। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। শুনতে পেয়ে নিবেদিতা ছুটে এলেন। দেখলেন মঠ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে লোক এসেছে। চিঠির উপরে তাঁর নাম লেখা। পরিচিত হস্তাক্ষর—সদানন্দের লেখা। সংক্ষিপ্ত চিঠি, তাতে লেখা—নিবেদিতা, সব শেষ ! কাল রাত ন'টায় স্বামীজী দেহরক্ষা করেছেন ! ছোট্ট কথা ক'টি কত বৃহৎ ক্ষতি বহন করে এনেছে। কিন্তু তবুও নিবেদিতা মুষড়ে যাবার মেয়ে নয়। তিনি যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায় তক্ষুনি ছুটে গেলেন বেলুড় মঠে। অসম্ভব লোকের ভিড়—তবু সে জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা বিরাট শূন্যতা অনুভব করলেন। নিবেদিতা সন্ন্যাসিনী। তবুও গুরুর মহাপ্রয়াণে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। স্বামীজীর স্বাস্থ্য অনেকদিন থেকে ভেঙ্গে পড়েছিল, তবু অত শীঘ্র তাঁর দেহান্তর ঘটবে একথা নিবেদিতা বা স্বামীজীর যাঁরা অন্তরঙ্গ তাঁরা ভাবতে পারেন নি। মঠের দিক থেকে এটা একটা মস্ত ক্ষতি, কিন্তু স্বামীজী তো মঠ পরিচালনার সমস্ত

খুঁটিনাটি নির্দেশ রেখে গেছেন। মঠের পরিচালনার ভার যাঁদের উপর তাঁরা দিশেহারা হলেন না। নিবেদিতার জন্য তিনি কোন বিশেষ নির্দেশ রেখে যাননি। স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দিয়ে গেছেন। আর তাতেই তিনি ভারী অসুবিধায় পড়লেন। যদি তিনি সব পথ বলে দিয়ে যেতেন, তাহলে হয়তো তিনি নিজেকে এরকম অসহায় ভাবতেন না। কিন্তু এই ভাবটা বেশীদিন তাঁর মনে রইল না। তিনি যেনে নিজেই তাঁর পথ দেখতে পেলেন। কি কাজ তাঁকে করতে হবে তার নির্দেশ যেন তাঁর নামের মধ্যেই রয়ে গেছে। তাঁর স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই। ভারতবর্ষের সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্য ভাবে মিশে রয়েছেন। মঠের সাধু-সন্ন্যাসীরা তাঁদের নিয়মকানুন মেনে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে কাজ করান, কিন্তু তাঁর কাজ হবে আরো ব্যাপক, আরো গভীর। ভারতের নারীদের সেবা করা তাঁর প্রধান কাজ হলেও একমাত্র কাজ নয়। ভারত-বাসীর রাজনীতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন রয়েছে। পরাধীনতার জ্বালা তিনি নিজের অন্তরে উপলব্ধি করতেন।

ছেলেবেলা থেকেই স্বাধীনতা লাভের প্রতি তাঁর একটা মমত্ববোধ ছিল। পরিণত বয়সেও সেটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি একটা গভীর আকর্ষণে রূপান্তর লাভ করেছিল।

চিঠির উত্তর—

কৃষ্ণা বসু, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—তোমার পাঠানো ধাঁধা আমরা রেখেছি, সময়মত তার ব্যবহার করা হবে। ধাঁধা পাঠাবার সময় ভালো করে দেখে দিও। বেশ বুদ্ধির ধাঁধা যেন হয়।

সোমনাথ ভৌমিক, নদীয়া—তোমার প্রশ্ন আরো পরিষ্কার হওয়া দরকার।

রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা; মৌসুমী ও শ্রাবণী, মিমি ও তোতন, যাদবপুর, কোলকাতা; নূপুর দত্ত, রণেন্দ্রমোহন লাহিড়ী, অনুরাধা শেঠ, কোলকাতা—চিঠি পেয়েছি।

তোমাদের এক বন্ধুর কাছে থেকে সুন্দর একটি চিঠি পেয়েছি, আগামীবার তোমাদের সেটি উপহার দেব।

তোমাদের

মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।
মূল্য : ০·৪৫ পয়সা

॥ সূচীপত্র ॥

৪৬শ বর্ষ — পৌষ
৯ম সংখ্যা — ১৩৭২

চারণভূমি

শিল্পী—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

★ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন

৪৬শ বর্ষ] পৌষ : ১৩৭২ [৯ম সংখ্যা

ডাইনীর ভোজ

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

রাত থম্‌থম্ গা ছম্‌ছম্, বৃষ্টি পড়ে ঝর্ঝরি,
ঝড়-বাদলে ডাইনী বুড়ী রাঁধছে ব্যাঙের চচ্চড়ি।
চুলগুলো তার ঝাঁটার মতো,
ঠ্যাং ছুটো তার ভাঁটার মতো,
চোখ ছুটো তার ডাঁটার মতো—দেখছি খুলে খড়খড়ি !

কখ্‌খনো কেউ খেয়ো নাকো ডাইনী বুড়ীর তরকারি,—
কারণ তবে ওষুধ খাবার হবেই তোমার দরকার-ই।
ভাঙবে বেবাক্ দাঁতের গোড়া,
গায়ে তোমার উঠবে কোঁড়া,
মচ্‌কাবে পা, হবেই খোঁড়া, জাগবে গলার ঘড়ঘড়ি।

কেরোসিনের তৈলে ভেজে পিঁপড়ে-ইঁদুর-আরশোলা—
হাস্‌ছে বুড়ী—সক্‌সকিয়ে উঠছে কেবল তার নোলা।
টিক্‌টিকি আর গুবরে পোকা
চট্‌কে নিয়ে বানায় ধোঁকা ;—
খেলেই খোকা, বন্‌বে বোকা, ভুগবে সারা বচ্ছর-ই !

গাধার সাদা দুধের পায়েস, নিমের ফলের ছক্কা হে,—
এমন খাবার মিলবে কি আর দিল্লী-কাবুল-মক্কাতে ?
ডাইনী বুড়ী খাচ্ছে কী এ
কেন্নো-কেঁচোর-আচার দিয়ে !—
ঘেন্নাতে ভাই, কান্না জাগে এবং বুকের ধড়ফড়ি !

দুমচাঁদ শিকদার

স্মুখরঞ্জন রায়

দুমচাঁদ শিকদার
গায়ে জামা ছিটদার ;
মুখে তার হাসি নেই,
হাতে তার বাঁশী নেই,
গলে তার কাশী নেই,
পায়ে জুতো চিক্‌দার।

বাড়ী বাড়ী শুধু ঘুরে,
যত পায় পেটে পুরে ;
আগে চায় সর দই,
পরে কয় ঘর কই,
বিছানাটা টেনে নিয়ে
শুয়ে পড়ে দিলদার।

(তখন) যত কর ডাকাডাকি
ঠেলাঠেলি হাঁকাহাঁকি
নড়েনাকো সরেনাকো,
একটুও ডরে নাকো,
যত ডাকে দশে মিলে
পুলিশ চৌকিদার ॥

শিকারী-শিকার

শ্রীমতী আভা পাকড়াশী

সে বছরই আমি স্কুল-ফাইন্যাল দিয়েছি। বাড়ীর পুরোনো গাড়ীটা চালিয়ে ঘুরেও বেড়াই। সামনে-পেছনে "এল" লাগানো থাকলেও পাশে কেউই থাকে না, যদিও সেটাই নিয়ম। পরীক্ষার পর তখন সকলের মন বেশ হাল্কা, ফুর্তিতে ভরা। নতুন কিছু একটা করার উৎসাহ জাগছে মনে। কি করা যায়! আচ্ছা চলো শিকারে যাওয়া যাক।

আমরা ক'বন্ধু মিলে প্রোগ্রাম ঠিক করলাম। অবশ্য প্রস্তাবটা দিল আমাদের বিল্টু। তার বাড়ী গোড়ের ওদিকে। সেদিকে একটা বিল-এ প্রচুর পাখী নেমেছে। বিল-এর জল একেবারে পাখীতে থিক্‌থিক্ করছে।

মনোজ বলল, বোধ হয় "মাইগ্রেটিং বার্ড"। সবে পরীক্ষা দিয়েছে তো—সব কিছু টাটকা মনে আছে। বিল্টু তার কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, ধ্যাৎ, ওগুলো সব বেলে হাঁস। হাঁসের ডিমের চেয়ে হাঁস খেতে অনেক ভাল। কিন্তু বন্দুক!—তাও যোগাড় হ'ল। তিনটে বন্দুক। একটা আমার, আমি ছুঁড়তেও জানি। কিন্তু লাইসেন্স নেই। দ্বিতীয়টা মনোজের। তারটা মামার, আব্দার করে চেয়ে এনেছে—নিশানা করে হাতে ধরিয়ে দিলে দেগে দেবে। আর শেষেরটা হল হীরুদার। তার লাইসেন্স আছে। সে আমাদের গার্জেন হয়ে চলেছে। সেই কারণে তার খাবারের ভাগও বেশী চাই। আবার শুধু তাই নয়, পাখীর ভাগও বেশী চাই। মোটা মানুষ হীরুদা তাই তার মোট চাহিদাটাও মোটা।

বিল্টুদের চাকর রহিম, সে ওখানে অপেক্ষা করবে। তাকে অনেকটা লাল কাগজ দেওয়া হয়েছে। লণ্ঠনে লাল কাগজ লাগিয়ে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে, নাহলে এই শীতের ভোরে কুয়াশার মধ্যে আমরা বিল কোথায় তা খুঁজেই পাব না।

রাত্তিরেই সব ব্যবস্থা করে রাখা হল। আমার বাড়ীতেই সবাই জমায়েত হয়েছে। কারণ সেটাই সুবিধে। বাড়ীটাও ফাঁকা। মা বাবা টুটু, মানে আমার ছোট বোনকে নিয়ে পুরী বেড়াতে গেছেন। আমি বাড়ী আগলাচ্ছি, না বাড়ীটা আমায় আগলাচ্ছে সেটা ভেবে দেখার মত। রামখেলাওন দারোয়ান গেটে বসে খইনি টেপে, আমার বন্ধুরা এলে তাদের ওপর সর্দারী করে অথচ ভিখিরীগুলোকে বেমালুম ঢুকিয়ে দেয়। বকলে বলে, আহা গরীব বেচারা!

আর ঠাকুর! তার তো কথাই নেই। ডাল চড়িয়ে ঘুম, ভাত চড়িয়ে ঘুম, সুতরাং মাংস চড়িয়ে ঘুমোবে ও আর বেশী কথা কি!

সে রাত্তিরে তাই সেই ধরা মাংস দিয়ে লুচি খেয়ে আমরা চারজন সব গুছিয়ে রাখলাম। এমন কি, ভোরে যে সার্ট প্যাণ্ট পরে বেরুব তাই পরেই শুয়ে রইলাম। দেরি হলেই যে পাখী

উড়ে যাবে। ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া রইল, "সাড়ে তিনটে"। উঠে মুখ-হাতটা অন্ততঃ ধুতে হবে তো!

শুতে না শুতেই যেন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড সুরু করে দিল অ্যালসেসিয়ান দুটোতে মিলে। বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লাম—বোধ হয় বেড়াল দেখেছে তারা। কিন্তু একি! পাঁচটা যে বাজে অথচ অ্যালার্মটা বাজেনি! তাড়াহুড়ো করে তৈরী হয়ে সকলে মিলে বেরিয়ে পড়লাম।

গাড়ীটা ঠিকই ষ্টার্ট নিল। রাত্তিরেই জল তেল সব দেখে রেখেছি যে। যথেষ্ট পেট্রোল আছে। পুরনো মডেলের হুড খোলা বড় গাড়ী। নিমেষের মধ্যেই লেকের পাশের সেই বুদ্ধ মন্দিরের ধারে পৌঁছে গেলাম। অত ভোরেই গড় গড় করে ড্রাম পিটছে বুদ্ধিষ্টরা। গাড়ীটা একটু ঝ্যাড়ঝ্যাড়ে, কিন্তু ইঞ্জিনের জোর আছে। শেভর্লে তো! এদিকে লেভেল ক্রসিং-এর গেট বন্ধ, এখন উপায়! ওদিকে রোদ্দুর উঠে পড়লেই পাখী উড়ে যাবে। তবে আজ ভোরে কুয়াশা করেছে। গাড়ীর পর্দা ফুঁড়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে। শীত তাড়াবার জন্যে সবাই তেড়ে গান ধরেছে—চলরে চলরে চলরে চল।

বিল্টু হয়েছে আমাদের গাইড। আর আমি ড্রাইভার। কাঁচা রাস্তা। সমানে ধুলো উড়ছে। আর গাড়ীর গায় এত রকম ঝনঝন খনখন শব্দ হচ্ছে যে, হর্ণ বাজাতেই হচ্ছে না।

প্রায় পৌঁছে গেছি। হঠাৎ বিল্টু চেঁচিয়ে উঠল—অ্যাই তিলু! ডাইনে কাটা, বাঁ দিকে একটা জলা! আমিও কাটালাম আর গাড়ীও টাল খেয়ে কাত হয়ে পাঁকে বসে গেল। বিল্টু তাড়াতাড়িতে উল্টো বলেছে; জলা জমিটি ডানদিকেই ছিল। হীরুদা গাল দিয়ে ওঠে—বলে, দূর! দূর! তোরা আবার ম্যাট্রিক দিয়েছিস, ডান-বাঁ জ্ঞান নেই তোদের। মুখে কথা বলছে, কিন্তু হাতে ধরে আছে সেদ্ধ ডিমের ডেকচি। নেমে পড়লাম আমরা। কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে হল। ভাগ্যিস হুড খোলা গাড়ী তাই রক্ষে। কিন্তু অনেক টানাটানি ধাক্কাধাক্কি করে আমরা কিছুতেই গাড়ীটা সোজা করতে পারলাম না। ওদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে। শিকার করবার জন্যে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বললাম—থাকগে গাড়ীটা পড়ে, পরে দেখা যাবে চল আগে শিকারে। এবার "চরণবাবুর জুড়ি" ভরসা। মানে, পায়ে হেঁটেই রওনা দিলাম আমরা। যে যার বন্দুক নিয়েছে হাতে। হীরুদারটা বিল্ট নিয়েছে। তাঁর হাতে খাবারের পোঁটলা। গাড়ীতে রেখে আসবার ভরসা হয়নি।

একটু হাঁটতেই দূরে লাল আলো নজরে পড়ল—বিল্টু চেঁচিয়ে উঠল, ঐ যে, ওদিকে বিল। হীরুদা এক ধমক দিলে—থাম্ তুই, আগে আলোটা কাছে আসুক নাহলে ঐ গাড়ীটার যা হাল হয়েছে আমাদেরও তাই হবে।

তখনো ঘন কুয়াশা রয়েছে। রহিমের কাছে পৌঁছেও গেলাম বিলের ধারে। কিন্তু নৌকো

নেই। অনেক কষ্টে একটা শালতি যোগাড় হল। শালতি অনেকটা ছিপের মত। দু'জনের বেশী ধরবে না, এত ছোট শালতি। তাও আবার মাত্র একটি। আমারই উৎসাহটা বেশী, তাই
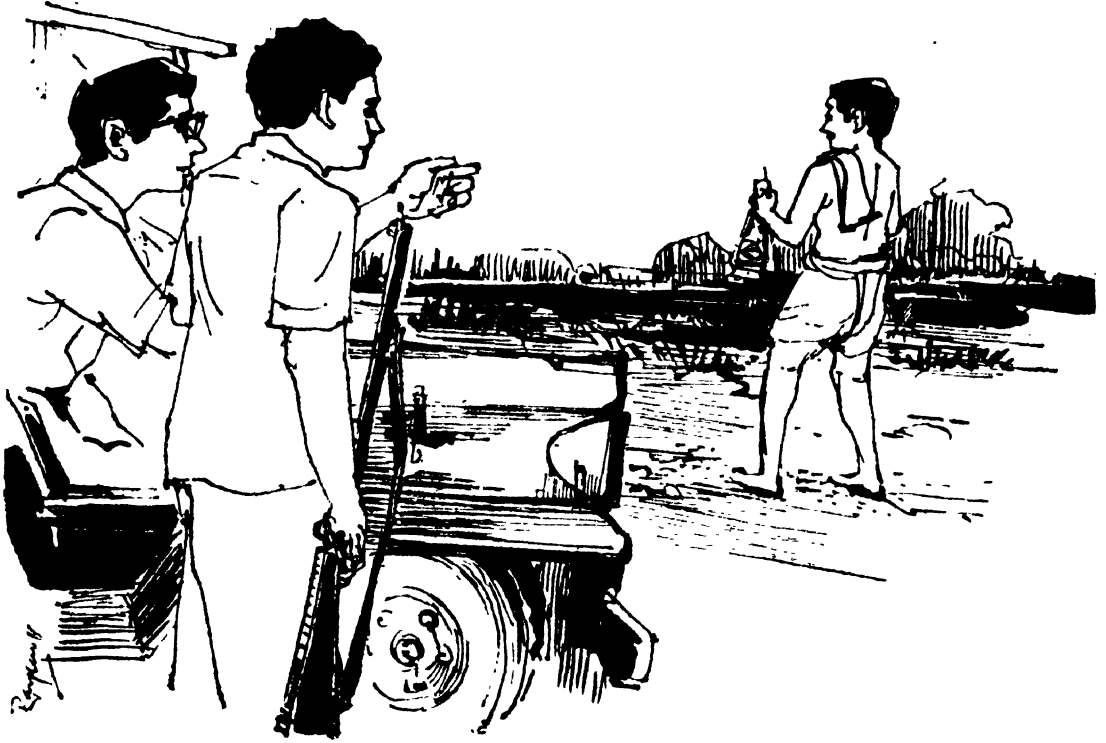
নিরুপায় হয়ে আমিই প্রথমে চড়ে বসলাম। আমার দেখাদেখি মনোজও উঠে এলো। ডাঙায় হীরুদা আর বিন্টু। হীরুদা ডাঙা থেকে বন্দুক ছুঁড়ে জলের দিকে তাড়াবেন, আর আমরা জলে বসে বন্দুক ছুঁড়ে পাখীগুলোকে তাঁর দিকে পাঠাব। চালাও বাবা তোমার শালতি,—শক্ত হয়ে বসলাম আমরা। তখন শালতির মালিক সেই ছোকরা বলে কি!—আমার ডর লাগছে, আব্বাজান, আসলো নাই!

আমরা উদ্বেগের সঙ্গে সকলে মিলে একসঙ্গে বলি,—সেকি! তুমি চালাতে জান না নাকি?

—হঃ হঃ, বাইতে জানি, জানুম না ক্যান, লগি ঠেলুম হেডা আর বড় কথা কি! কিন্তুক হাখনো যে আঁধার কাটে নাই।

বুঝলাম, তার মানে লেগেছে। বললাম—নাও বাপু তবে ঠেল লগি, আর জ্বালিও না। ব্যাস, তার পরই মোল্লার পো—হেঁইও মারি বলে লগি ঠেললো আর শালতিটাও আমাদের-সুদ্ধু নিয়ে হুস্ করে একেবারে জলের তলায় চলে গেল। ঐ ঠাণ্ডায় কাদা-জলে হাবুডুবু খেতে খেতে

কচুরিপানা মাথায় নিয়ে, বন্দুকটা উঁচু করে ধরে কোনরকমে সাঁতরে ওপারে উঠলাম। ভাগ্যিস সাঁতারটা জানা ছিল তাই রক্ষে। কিন্তু টোটাগুলো ভিজে গেছে। আর জামা জুতো তো ভিজে গোবর। এদিকে পাড়ে উঠে দেখি আর এক কাণ্ড! গোটা চারেক লাল পাগড়ী দাঁড়িয়ে—ব্যাপার কি!

বোধহয় ভেবেছে স্বদেশী ডাকাত। কেননা তখনো তো আমরা স্বাধীন হইনি। জিজ্ঞেস করল, ও মোটরগাড়ীটা কার? আমি সেই ভিজে কাপড়ে, ভিজে গলায় জবাব দিলাম—আমার। ওদের পেছনে ছিল এক লালমুখো সার্জেন্ট—সে বলল, লাইসেন্স দেখাইটে পার? চুরি করিয়া আন নাই তার প্রমাণ?

উত্তর দিলাম—'এল' লাইসেন্স আছে। নাম বললাম নিজের। মনে হল যেন একটু ভিজেছে। এবার প্রশ্ন হল,—বন্দুকগুলি কাহার? এর লাইসেন্স আছে? কোনরকমে গোঁজা-মিল দিয়ে ম্যানেজ করল হীরুদা। আমাদের সকলের নাম-ঠিকানা টুকে নিয়ে বিকেল সাড়ে তিনটের সময় থানায় যেতে ব'লে, হাড়ে আরও একটু কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে তো চলে গেল।

তখন কিন্তু সত্যিই আমরা ঠক ঠক করে কাঁপছি। শেষে হীরুদা তাঁর ওভারকোট আর বিল্টু তার র‍্যাপার ধার দিয়ে আমাদের রক্ষে করল। হীরুদার অতবড় কোটের মধ্যে তো আমি ডুবে গেলাম। র‍্যাপার পরল মনোজ। কিন্তু পাখী! একেবারে খালি হাতে ফিরে যাবো! মরীয়া হয়ে দুমদাম গোটাকয়েক ফায়ার করলাম আমরা। একপাশে মাত্র একঝাঁক পাখী ছিল—এলোমেলো ফায়ার-এর চোটে ঝটপট করে সবগুলো উড়ে গেল—একটাও মরল না।

ধুত্তোর! আজ দিনটাই মাটি বলে হীরুদা সেই বিলের ধারেই খবরের কাগজ পেতে ডিমের ডেকচি খুলে বসে পড়ল। সঙ্গে রুটি-মাখন তো আছেই। এবার ফিকে ফিকে ভোর হয়েছে। আশপাশের বাড়ী থেকে দাঁতন হাতে কয়েকজন বন্দুক দাগছে কে, দেখতে বেরিয়েও এসেছেন। আমরাও হীরুদার সঙ্গে হাত লাগাব ভেবে সবে হাত বাড়িয়েছি, এমন সময় হীরুদা,—আরে ছ্যাঃ, করে উঠে বললে—ডিমটা একেবারে কাঁচা। সেটা গেল। আর একটা, সেটাও—আরে ছ্যাঃ! বোঝা গেল ঠাকুর মহাপ্রভু—'তাড়াতাড়ি করি নামাই দেউচি, আর পুড়ি গলা হব নাই'। সবকিছু পুড়িয়ে দিয়ে পাছে বকুনি খায়, তাই পোড়বার ভয়ে কাঁচাই সব নামিয়েছেন তিনি।

এবার গাড়ী তোলা পর্ব। সহজে কি তোলা যায়! লোক ডাকা হল—তারা বলল বাঁশ লাগবে। তলা দিয়ে চাড় দিয়ে তুলতে হবে। বেশ বাবা, বাঁশ আনো। বলল—পাঁচ টাকা ভাড়া লাগবে বাঁশের। বেশ, তাই না হয় দিচ্ছি। বংশ-দণ্ড এলো—রাম রাম বলে গাড়ীও উঠল। আমরা সবে গাড়ীতে উঠতে যাব, এমন সময়ে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কাছা সামলাতে সামলাতে ছুটে এসে এক ভদ্রলোক আমাদের যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিতে লাগলেন—

চালাকি পায়া হ্যায়? অ্যাঁ—কি ভাবা হ্যায়! মগের মুলুক পেয়েছ—আমার গোয়ালের খুঁটির জন্য কালই নতুন বাঁশ কিনেছি, আর সেই বাঁশ চুরি! পুলিশ ডাকেগা!…

—নাও ঠেলা—ভাড়াকে ভাড়াও দিলাম—আবার গালাগালও খেলাম। বুঝলাম, যার বাঁশ নয় সেই আমাদের বাঁশ দিয়েছে; বদলে বোকা বানিয়ে টাকা নিয়েছে। হীরুদা আস্তিন গুটোতেই অবশ্য ভদ্রলোকের সুর নামল।

যাক্, খুব শিকার হয়েছে! এবার ঘরের ছেলে ঘরে চল বলে, হীরুদা পেছনের সিটে ধপাস করে বসে পড়লেন।

বাড়ী গিয়ে দুপুরে নেয়ে-ধুয়ে, খেয়েদেয়ে, টানা একটা ঘুম দেব ভেবেই শুয়েছি। সবে ঘুমটা জমে এসেছে, এমন সময় ঘড়ির অ্যালার্মটা কিড়্ কিড়্ কিড়্ করে বেজে উঠল। ওটাতেও ভুল হয়েছিল দেখছি। কিন্তু থানায় যেতে হবে যে!

মাঝখান থেকে আমরাই পুলিশের শিকার হয়ে গেলাম দেখছি। দেখি এবার বুদ্ধির জোরে পাখীর মত ওড়া যায় কিনা! তবে যদি রেহাই মেলে।

চলে

শ্রীরাধামোহন দত্ত

ট্রামগাড়ী চলে টিং টিং টিং
মিষ্টি আওয়াজ তুলি',
চলে সাইকেল পাশাপাশি তার
ক্রিং ক্রিং বাজে বুলি।
বাঘেরই মত করে যে গর্জন
বাঘ-আঁকা ষ্টেট্ বাস,
দুর্বার বেগে ছুটে চলা-কালে
মনেতে জাগায় ত্রাস।
হুস্ হুস্ রবে ট্যাক্সীরা চলে
লরী করে ঘড়্ ঘড়্,
রিক্সাওয়ালা ঠুং ঠুং রবে
ছুটে চলে গড় গড়্।

নদীর বুকেতে জাহাজ চলে যে
বাঁশী বাজে তার ভোঁ ভোঁ,
আকাশের গায়ে উড়ে চলে প্লেন
শব্দ তুলিয়া গোঁ গোঁ।
ঝ্যাক ঝ্যাক রবে ছুটে চলে ট্রেন
তীব্র গতির বেগে,
ছলাৎ ছলাৎ নৌকা চলার
শব্দ জলেতে জাগে।
অস্থির সবই ধাবমান শুধু
থামিতে জানে না কেহ,
পথিকেরা পথে হাঁটে হন্ হন্
ছাড়িয়া আপন গেহ।

উপন্যাস

কোথা সীমের ফকির

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৭

'কোচিন'-এ জাহাজটার থাকবার কথা ছিল মাত্র দুই দিন। কিন্তু ঘটনাচক্রে থেকে গেল সাত-সাতটা দিন। মালবাহী জাহাজটা থেকে বহু মাল নেমে গেল, বহু নতুন বস্তা আর কাঠের পেটি উঠতে লাগলো। দিনরাত্রি জাহাজের 'ডেরিক'গুলোর ঘর্-ঘর্-ঘর্-ঘর্ শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

জাহাজ থেকে এ-সাতদিন সবাই উৎসাহ-ভরে নেমে গেছে, আমি যেতে পারিনি। এবার আমার মনটা যে একটু নরম হয়নি এমন নয়, হয়ত বিশ্বাসের সঙ্গে একদিন ঘুরতে বেরুতাম, কিন্তু, ক্যাপ্টেনসাহেব আমাকে এত কাগজপত্র টাইপ করতে দিলে যে, সর্বক্ষণ টাইপ করতে করতে হয়রান হয়ে গেলাম, শুধু কি তাই? একদিন ডি-সুজার তল্পীবাহক হয়ে এজেন্টের অফিসেও যেতে হলো একরাশ কাগজপত্র ব্যাগে পুরে। এইটুকু যেতে-আসতেই 'কোচিনহারবার'-এর সঙ্গে যেটুকু পরিচয়!

এখানেও একদিন বিশ্বাস বললে,—চিঠি লেখেন নি বাড়ীতে? বললাম,—না।

ওর মুখখানা একটু বিমর্ষ হয়ে গেল, বললে,—লিখলে ভাল করতেন। প্রথম এসেছেন বিদেশে, মা-বাবার মন না জানি কেমন করছে! ব'লে, ও আর দাঁড়ালো না, চলে গেল।

মনে আছে, সেদিন রাত্রে, সম্ভবতঃ ওর কথা শুনেই, বাবাকে চিঠি লিখতে শুরু করেছিলাম। সে চিঠির কোথাও ছিল অনুযোগ, কোথাও ক্ষোভ, কোথাও বা তীব্র অভিমান। লিখতে-লিখতে চিঠিটা বেশ বড়োই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে যাক, তবুও তো চিঠি! চিঠিতে রাগ-অভিমান যা-ই থাক না কেন, সন্তানের হাতের লেখাটুকুও কাছে পৌঁছলে বাপ-মায়ের মন অনেকটা সান্ত্বনা পেতো!

বলা বাহুল্য, পরদিন সকালে উঠে এ-চিঠিও আমি কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম,—দরকার নেই। কী হবে চিঠি পাঠিয়ে? সত্যিই আমার মনের অবস্থা হয়ে পড়েছিল এইরকম। আশাভঙ্গ ঘটলে মানুষ যে কীরকম হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ তখনকার আমি,—আমার তখনকার মানসিক অবস্থা।

জাহাজ যেমন করে বোম্বের জেটি ছেড়ে সমুদ্রে ভেসে পড়েছিল, এখানেও তেমনি করে সমুদ্রে ভাসলো জাহাজ। পাইলট যখন ফিরে গেল, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। কাজকর্ম-ছুটোছুটির পালা তখনো চলেছে, তবু, তারই মধ্যে একটু সময় করে বিশ্বাস এলো আমার ঘরে, বললে,—শুনেছেন ?

—কী ?

—জাহাজটা কোথায় যাচ্ছে ?

একটু ভেবে নিয়ে বলেছিলাম,—কলম্বোই তো যাওয়ার কথা।

—না—বিশ্বাস বললে,—এই মাত্র চীফ অফিসারের কাছ থেকে শুনে এলাম,—জাহাজ যাচ্ছে মরিসাস্।

—সত্যি !

ও বললে,—কোচিনে এসে নতুন করে মাল-বোঝাই করলো, দেখলেন না ?

—সে কি মরিসাসের জন্য ?

বিশ্বাস বললে,—বারে, সে-কথা তো আপনিই জানবেন আমার থেকে বেশী ! আপনি বসে বসে সব কাগজপত্র টাইপ করলেন না ?

চুপ করে ভাবতে লাগলাম। টাইপ তো করেছি রাশি রাশি কাগজপত্র, তার মধ্যে কোথাও 'মরিসাস্' শব্দটাকে কী টাইপ করেছি ? হতেও পারে, মনটা ভারাক্রান্ত ছিল বলে ও-সব ব্যাপারে ভালো করে মনোযোগ দিতে পারিনি।

বিশ্বাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোধহয় আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করছিল। বললে,—মনে পড়ছে না বুঝি ?

—না।

বিশ্বাস আগ্রহের সঙ্গে বললে,—ক্যাপ্টেন এখন ঘরে আছে, খুস্ মেজাজেই আছে, শিস্ দিয়ে দিয়ে গান গাইছে। যান না একবার—জিজ্ঞাসা করে আসুন না ?

চাকরীর খাতিরে সুযোগ পেলেই যে ক্যাপ্টেনের কাছে ঘুরঘুর করা উচিত, তা' আমি জানি। কিন্তু, আমার তখনকার মানসিক অবস্থার জন্যই সে-উৎসাহ ছিল না। বিশ্বাসের পীড়াপীড়িতেই আস্তে আস্তে উঠে ক্যাপ্টেনের ঘরে গিয়েছিলাম। নমস্কার করে বিনীত ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—Sir, are we going to Mauritus Island. (আমরা কি মরিসাস্ দ্বীপে যাচ্ছি ?)।

মিঃ দুধওয়ালা যথারীতি হিন্দীতেই তার উত্তর দিলেন, আমি বাঙলাতেই লিখছি,—হাঁ বেটা কুমার, মরিসাসের কাছাকাছি যাচ্ছি।

উত্তর শুনে ভিতরে ভিতরে দমে গেলাম। মরিসাস্ নয়, মরিসাসের কাছাকাছি !

কিন্তু, ওঁকে এ-সব বলা যায় না, তাই চুপচাপ নীচে চলে এলাম। বিশ্বাস ঠায় দাঁড়িয়েছিল আমার ঘরটার সামনে। বললাম,—তুমি ভুল শুনেছো, মরিসাস নয়।

—তবে ?

—ওর কাছাকাছি কোনো জায়গা।

—কী জায়গা ? নাম জিজ্ঞাসা করেন নি ?

—না।

ও চুপ করে গেল। আমি এসে ধপ্ করে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

সমস্ত ব্যাপারটা মিলে আবার নিরাশার সৃষ্টি করলো। এমন অবস্থা হলো মনের যে, সম্ভব হলে এক্খুনি জাহাজ থেকে নেমে যাই।

পরদিন বিশ্বাস আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে,—দেখুন, 'মরিসাস' না হলেও তার কাছাকাছি কোনো জায়গা যখন, তখন সেটা নতুন কিছু তো বটেই !

রাগ করে বললাম,—নতুন আবার কী ? তবু যদি আফ্রিকা-টাফ্রিকা হতো। হয়ত নাম-না-জানা দ্বীপ-টিপে গিয়ে দাঁড়াবে, যেখানে দেখবার কিছু নেই, বেড়াবার জায়গা নেই। দুর্-দুর্ !

ও আমার রাগ দেখে হেসে ফেললে। তারপরে বললে,—আমি সবার কাছে গিয়ে ঘুর ঘুর করলাম জানেন ? কেউ কিন্তু দ্বীপের নামটা বলতে পারলো না। মানে, কেউই নামটা জানবার চেষ্টা করেনি। কারুর কোনো আগ্রহই নেই আর কী !

বললাম,—তবেই বোঝো। ঝক্মারী হয়েছে জাহাজে ওঠা !

তখন জাহাজে কাজের তাড়া কম। প্রায় শুয়ে-বসে দিন কাটছে আর কী ! ভীষণ একঘেয়ে লাগছিল ! একটা ঝড়-টড় হলেও বরং দেখে বাঁচতাম ! তা-না, ছোট-ছোট ঢেউ আর উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক। ও-সব দেখে-দেখে চোখ পচে গেল বলা যায়।

রাত্রে শুয়ে-শুয়ে বাড়ীর কথা মনে পড়তো। আর মনে পড়লেই হতো তীব্র অভিমান ! চোখে জল এসে যেতো।

এইভাবে একঘেয়ে কয়েকটা দিন কাটানোর পর হঠাৎ একদিন ভোরবেলায়—

আমি ভেবেছিলাম, বোধহয় ভীষণ কোনো কাণ্ড ঘটে থাকবে। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে 'পোর্ট-হোল' দিয়ে বাইরে দেখবার চেষ্টা করলাম, আমার কেবিন থেকে কিছুই দেখা যায় না ছাই !

ঘরের বাইরে এসেই লক্ষ্য করলাম জাহাজের ষ্টারবোর্ড সাইডের বারান্দার রেলিং ধরে কয়েকজন অফিসার ঝুঁকে পড়ে কী যেন আগ্রহের সঙ্গে দেখছে !

সত্যি কথা বলতে কী, বুকটা ধড়ফড় করছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সবাইকে 'সুপ্রভাত' জানিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

সমুদ্রের ঢেউ তেমনি ছোট-ছোট—তেমনি শান্ত সমুদ্রে রঙের খেলা চলেছে। এর মধ্যে নূতনত্ব কোথায়? জাহাজটির কী তবে কিছু হলো? ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে, না, চরে আটকে গেছে!

নীচে দেখলাম, ক্রু-রাও ভিড় করে দেখছে।

শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে প্রশ্ন করে বসলাম,—আপনারা দেখছেন কী?

ওরা একযোগে বলে উঠলো,—Land! (মাটি)।

তাকালাম ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে। কোথায় মাটির চিহ্ন,—কতকগুলি 'সী গাল্' পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে।

ওরা বললে,—ঐ পাখীগুলি দেখেই বোঝা যায়, কাছাকাছি 'ল্যাণ্ড্' আছে। তাকিয়ে থাকো, একটু পরেই দেখতে পাবে।

'Land' দেখবার জন্য ওদের আগ্রহটা অদ্ভুত লাগলো! ওটা কারুরই দেশ নয়, তবু 'মাটি' তো, তাই 'মাটির মানুষ' জলে জলে বেড়াতে বেড়াতে মাটির তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ওঠে।

আমার তখনো তেমন অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই ওদের এই আকর্ষণের গভীরতাটুকু আমি ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি সেদিন।

বেশ অনুভব করছিলুম, জাহাজের 'স্পীড' কমে গেছে। ধীরে ধীরে জাহাজটা এগিয়ে যেতে লাগলো। প্রথমে একটা বিন্দু মনে হয়েছিল। ওরা 'ল্যাণ্ড' বলে কোলাহল করে উঠলেও, আমি যেন দেখছিলাম, নীল সমুদ্রের কপালে কে যেন ছোট্ট একটা কালো টিপ্ পরিয়েছে? কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই কালো রঙ ধীরে ধীরে সবুজ হয়ে উঠতে লাগলো, আর 'টিপ্'-এর পরিধিও বাড়তে লাগলো। শেষ পর্যন্ত সবুজ বর্ণের নীচে, জলের রেখার ঠিক ওপরে গাঢ় তাম্রবর্ণ ফুটে উঠলো। আর, ঠিক সেই সময় লক্ষ্যে পড়লো, দ্বীপটাকে ঘিরে যেন বিরাজ করছে বিরাট একটা সাদা রঙের চক্র। নীল সমুদ্র, শুভ্র বলয় রেখা, তামার রঙ আর সবুজ,—সব মিলিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে এক আশ্চর্য বর্ণলিপি!

আমি দেখতে-দেখতে নিজেকে বুঝি হারিয়ে ফেলেছিলাম। দ্বীপ তখন কাছে এসে গেছে। বাড়ী-ঘর-জেটি সব দেখা যাচ্ছে, শুধু সেই মেয়েদের হাতের ধবধবে সাদা শাঁখার মতো বলয়-রেখাটি নেই।

তারপরের কথা কী বলবো, জাহাজটা নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে রইলো, ক্যাপ্টেন ডেকে পাঠালো আমাকে, কতোগুলো কাগজ তাড়াতাড়ি টাইপ্ করতে হল।

টাইপ করছি ঘরে বসে। কাজের মধ্যেও ফুরসুৎ করে নিয়ে বিশ্বাস এলো এক সময়। ওকে বললাম,—তুমি দেখেছিলে? ও বললে,—হ্যাঁ। সমুদ্রে এরকম রঙের সমাবেশ আর দেখিনি

কখনো। বললাম,—সমুদ্রে কেমন গোল সাদা বলয়ের মতো একটা-কিছু উঠেছিল, লক্ষ্য করেছিলে?

ও বললে,—নিশ্চয়ই। চীফ ষ্টুয়ার্ড বললে,—ওকে বলে, 'ব্যারিয়ার রীফ্'। জল ওখানে কম, ডুবো পাথর-টাথর আছে, তাই বাঁধের মতো সৃষ্টি হয়েছে, জল ধাক্কা খেয়ে ফুলে উঠেছে। আর জানেনই তো সমুদ্রের জল ফুলে উঠে ভেঙে গেলে ধবধবে সাদা দেখায়। বললাম,—আচ্ছা ভাই, দ্বীপটার নাম কী?

ও বললে,—সে তো আপনি বলবেন। ঐ তো কাগজ-পত্র টাইপ্ করছেন পাইলটের জন্য। পাইলট্ এলো বলে। আমাদের নিয়ে যাবে পোর্টে।

কাগজপত্রের দিকে মন দিলাম। পড়তে পড়তে এসময় আবিষ্কার করলাম যায়গাটার নাম,—পোর্ট ভিক্টোরিয়া।

আর দ্বীপের নাম,—'সিচেলাস্ আর-কি-পেলেগো'।

—আর-কি-পেলেগো মানে কী স্যর? ও জিজ্ঞাসা করলো আমার মুখ থেকে শুনে।

বললাম,—দ্বীপপুঞ্জ।

কিন্তু, এই ভিক্টোরিয়াতেও আমি যার কথা বলতে চাই, তার দেখা পাইনি, দেখা পেয়েছিলাম এখান থেকে আরও দশ-বারো মাইল দূরের আরও একটি ছোট দ্বীপে। সেই দ্বীপের নাম,—'পর্সলিন' দ্বীপ। সেই দ্বীপে কী করে যে গিয়ে পড়েছিলাম, সে এক আশ্চর্য কাহিনী। (ক্রমশঃ)

ছড়া

শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সিল্ক কথাটা বলতে গিয়ে
স্বপ্না বলে সিলিক,
মিল্ক্ কথাটা বলতে গিয়ে
রত্না বলে মিলিক;

শেলফ্ কথাটা বলতে গিয়ে
ঠাকুমা বলে শেল্লো:
সকল কথায় নাক গলিয়ে
করছি আমি হেল্লো।

লণ্ডনের পায়রা

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

বিলাতে গিয়ে যে কয়টি দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে, তার কয়েকটি সম্বন্ধে আমি পূর্বে লিখেছি। এবারে আমি লণ্ডনের পায়রা সম্বন্ধে কিছু বলবো। এতবড় শহরে মাঠে, ঘাটে, পার্কে, পুকুরে

লণ্ডনে পায়রার একটি ঝাঁকের মধ্যে কয়েকজন লোককে দেখা যাচ্ছে। তারা তাদের নিয়ে খেলা করছে, খাবার দিচ্ছে। ছবিটে থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এই পায়রারা মানুষকে মোটেই ভয় পায় না এবং তাদের সঙ্গে খেলা করতেই ভালবাসে।

ও বড় বড় বাড়ির কার্নিশে যে পায়রার ঝাঁক দেখেছি তা অপূর্ব বলতে হবে। বোধহয় পৃথিবীর আর কোন শহরে পায়রার এত সমাবেশ দেখা যায় না।

সুখের বিষয়, লণ্ডনবাসীরা এই পায়রাদের খুবই ভালবাসে। তা না হলে, এত পায়রার সমাবেশ কি এক শহরে হয়? শুনতে পাই, লণ্ডনে আজ ৫০০ বছর ধরে পায়রার বসবাস। সব ধরণের পায়রা একসঙ্গে মিশে এখানে একটা নতুন জাতের পায়রার সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্যে আমরা লণ্ডনে এক ধরণের পায়রাই বেশী দেখতে পাই। শহরে লোক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পায়রাও বেড়ে চলেছে; অতএব লণ্ডনে বেড়াতে বেরুলে সবখানে পায়রার ঝাঁক দেখা যায়। মানুষের

খাবার সংগ্রহের মত হাজার হাজার পায়রার খাবারও যোগাড় হচ্ছে। লণ্ডনের এইসব পায়রা বেশ অদম্য ও বলিষ্ঠ। পায়রার বাচ্চার উড়তে শেখার আগের অবস্থায় বাপ-মাদের অনেক ক্ষতিস্বীকার করতে হয়। জানালার সঙ্কীর্ণ তাকের উপর এবং জানলার চৌকাঠের নীচের দিকে যত্রতত্র অদ্ভুত জায়গায় এরা ডিম পাড়তে বাধ্য হয়। এইসব জায়গা থেকে পড়ে গিয়ে ডিম অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। বিড়ালরাও ডিম খেয়ে ফেলে এবং শুনতে পাওয়া যায়, ইঁদুররাও এই ডিমকে আক্রমণ করে।

তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো, পায়রারা কিরকম করে তাদের বাসা তৈরী করে? তোমরা শুনে অবাক হবে, পায়রারা অদ্ভুত জিনিস দিয়ে ডিম পাড়ার জন্যে অদ্ভুত ধরণের বাসা তৈরী করে। সোজা কথায় বলতে গেলে, যা জিনিস সামনে পায়, তারই ওপরে ডিম পেড়ে এরা চলে যায়। খড়, কাগজ, দু'একটা পালক, ছোট ডাল ও খড়ের আঁটির মধ্যে এরা ডিম পাড়ে। এমন কি শুনতে পাওয়া যায়, কারখানা থেকে তার চুরি করে এনে তার মধ্যেও ডিম পেড়ে বাচ্চাদের মানুষ করে। কিন্তু পাখিরা কোথায় বসে, কোথায় খেলা করে, কোথায় খাওয়াদাওয়া করে এসব বিষয়ে কি তোমাদের কোন ধারণা আছে? গাছে এরা খুব কমই বসে থাকে। বড় বড় বাড়ির আলসেতে—যেমন ন্যাশনাল গ্যালারি, সেণ্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল ইত্যাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়িতে এরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়।

অবশ্য এটা স্বীকার করতেই হবে, ছেলেবুড়ো সবাই, বিদেশীরা এবং লণ্ডনে আগত গাঁয়ের লোকেরাও এই পায়রা দেখে বেশ আনন্দ পায় এবং এদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তা না হলে এত সংখ্যক পায়রা লণ্ডনে জড়ো হয়ে বসবাস করতে পারত না। এইসব পোষমানা পাখি লণ্ডনবাসীদের হাত থেকে ক্রমাগত খাবার খাচ্ছে—এইসব দৃশ্য দেখা একটা মস্ত আকর্ষণ। তা না হলে পায়রা কোন্ দিন শহর থেকে অদৃশ্য হয়ে যেত!

এইসব পাখি নানারকম অনিষ্টসাধন করছে—এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের খাদ্যশস্য এরা প্রতি বৎসর নষ্ট করছে এবং এই পাখিরা তাদের বাসার কাছে নানারকম ময়লা ফেলে দালান কোঠার পাথর পর্যন্ত ক্ষয় করে দিচ্ছে। তার উপর আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে এত নিকটে এদের বসবাস ভালো নয়, কারণ এরা নানা রোগ বহন ক'রে ছড়িয়ে দেয়। কি করে এসব পায়রার সংখ্যা কোমলভাবে বা মনুষ্যোচিতভাবে কমানো যায়, শহরের কর্তৃপক্ষ তা ভেবে পাচ্ছেন না। নানারকম পরিকল্পনা কার্যকরী করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কোনটাই সফল হয়নি। এইসব চালাক পাখিকে নির্মূল করতে শহরের কর্তৃপক্ষদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠছে না।

লণ্ডনে সবচেয়ে বেশি পায়রার সমাবেশ হয় ট্রাফালগার স্কোয়ারে। এখানে লর্ড নেলসনের

স্মৃতিস্বরূপ যে নেলসন কলাম আছে, তার চারিদিকে হাজার হাজার পায়রার সমাবেশ। এই স্তম্ভ লণ্ডনের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। লম্বা স্তম্ভের উপর লর্ড নেলসনের প্রতিমূর্তি সমুদ্র শাসন করছেন। ট্রাফালগর স্কোয়ারের আশেপাশের ছোট ছোট দোকানে পায়রাদের খাবার কিনতে পাওয়া যায়। ট্রাফালগার স্কোয়ারের দর্শনার্থীরা এইসব খাবার কিনে সমস্ত দিন পায়রাদের খেতে দিচ্ছে। এখানে-সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রারা উড়ে বসছে। এই চমৎকার দৃশ্য দেখবার জন্যেই ট্রাফালগারে বৈকালে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ হয়। এইসব পায়রারা এত পোষা যে, তোমার হাতের ওপর এসে বসে খাবার খেয়ে যাবে। এই চমৎকার দৃশ্য সকলেরই দেখতে খুব ভালো লাগে।

তোরাই

শ্রীসরোজ রায়

দেশের যত দামাল ছেলে শোনরে তোদের বলি,
তোরাই হলি বিজ্ঞানী আর তোরাই হলি বলী।
নৌবহরের কর্তা তোরাই, তোরাই দেশের সৈন্য,
তোরাই হলি শ্রমিক দেশের ঘুচাবি সব দৈন্য।
তোরাই শহর তোরাই নগর তোরাই নাগরিক,
তোদের ওপর ন্যস্ত যত কর্ম বাস্তবিক।
তোরাই হবি চপল আবার তোরাই হবি স্থির,
কর্মে হবি নিরলস আর ধর্মে হবি ধীর।
তোরাই হবি বক্তা, ওরে তোরাই হবি শ্রোতা,
তোরাই হবি সংগঠক আর তোরাই হবি হোতা।
তাই বলি শোন, দেশের যত উঠ্‌তি কিশোর প্রাণ,
নিয়ম মেনে ভয়কে ছেড়ে গা'রে জয়ের গান।
কারণ তোরা ইতিকথা তোরাই দেশের মান,
তোরাই হলি জীবনস্রোত নদীর কলতান।

মায়ের খোঁজে

শ্রীরাজীবকৃষ্ণ বিশ্বাস

ও মাঝি ভাই, একটু দাঁড়াও ;
অনেক তুমি ঘুরে বেড়াও,
বলতে পার লুকিয়ে কোথায়
আছে আমার মা ?

কোন্ সে নদীর দিঘল বাঁকে
আম-কাঁঠালের বনের ফাঁকে
যবের ক্ষেতের গণ্ডী ঘেরা
কোন্ সে অচীন গাঁ ?

হেথায় যখন গভীর রাতে
ঘুম চলে যায় আঁখির পাতে
হারিয়ে যাওয়া মায়ের কথা
হঠাৎ পড়ে মনে ;

মায়ের মুখটি হাসি-মাখা
যেন রাতের তারায় আঁকা
আমায় দেখে ঝিক্‌মিকিয়ে
হাসছে ক্ষণে ক্ষণে।

সেথায় কি মা অনেক ভোরে
দীঘির জলে চান্‌টি করে
তেমনি পিঠে চুল এলিয়ে
আসে উঠোন দিয়ে ?

তুপুরবেলা কাজের শেষে
মা কি আমার তেমনি এসে
শোয় কি ভুঁয়ে মাতুর পেতে
মহাভারত নিয়ে ?

বিকেল হলে দাওয়ায় আসি
বাঁধে কি তার চুলের রাশি
লাল সিঁতুরের ছোট্ট ফোঁটা
দেয় কি কপালটিতে ?

সেথায় মা কি তুলসীতলায়
প্রদীপ জ্বলে আঁচল গলায়
মনের ব্যথা জানায় তাঁর
সন্ধ্যে দিতে দিতে ?

গভীর রাতে জড়িয়ে বুকে
দেয় মা চুমা কাহার মুখে
আমার মতন অন্য খোকন
আছে কি সেইখানে ?

মা যে আমার কেন এমন
নিজেরে তার করলো গোপন
আপন মনে ভাবছি বসে
কেউ তা নাহি জানে !

মণ্টু, রাধা, ভোলার মা তো
কভু কোথাও হারায় না তো
তবে কেন হারিয়ে গেল
কেবল আমার মা।

বলো না গো ও মাঝি ভাই
কেমন করে মার কাছে যাই
এখান থেকে দূর কত সে
নাম না-জানা গাঁ ?

চাল-চুলও দুই গেল

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

নাম তার ভাদু, ভাল নাম ভদ্রেশ্বর। ভাদ্রমাসে জন্ম বলে ঐ নাম; আর সে দেশে ভাদ্র মাসে 'ভাদু' পূজা, ভাদু গান হয় বলে—ডাক-নামটা হয় ভাদু। আমাদের স্কুলের খাতায় ভদ্রেশ্বর নামটা লেখা থাকলেও, সকলেই তাকে ভাদু বলেই ডাকে। তার পোশাকী নামটা কেবল রেজিস্টারী বা হাজিরা হাঁকের সময় শোনা যেতো।

ভদ্রেশ্বরের ভাদু নামে ঘোর আপত্তি। ভাদ্র মাসে ভাদু গান গাইতে লোকে আসে গাঁ থেকে, ভাদুর পুতুল তৈরী করে একটা ছেলে মেয়ে-সেজে নাচে। লোকে ভিড় করে দেখে—ভদ্রেশ্বর সেদিক মাড়ায় না। তবুও স্কুলের ছেলেরা তাকে দেখে দূর থেকে শুনিয়ে বন্ধুদের বলতো— "ওরে ভাদুনাচ্ দেখেছিস।" বলেই ভাদুর দিকে তাকায়—ভাদুর অসহ্য তাদের ঐ মিচ্‌কে সয়তানী। ভদ্রেশ্বর চটে—কিন্তু কী করবে ভেবে পায় না। খবরের কাগজে প্রায় দেখে লোকে নাম বদলাচ্ছে, পদবী বদলাচ্ছে—তাই নিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপাচ্ছে।

একদিন স্কুলে গিয়ে শুনি অফিস-ঘরে একটু আগে ভাদুর সঙ্গে কেরানী বাবুর কি-একটা বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। বিষয়টা জানে জীবন গাঙ্গুলী—তুনিয়ার খবর তার পেটে; ইংরেজী বই 'বিশ্বাস কর আর নাই কর' থেকে অদ্ভুত-অদ্ভুত খবর পড়ে এসে আমাদের তাক্ লাগিয়ে দেয়। সে বললে, ভাদু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করে তার নাম বদলে নিয়েছে। আমরা সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলাম—"বলে কী! নাম বদলানো—।" এমন সময়ে ভাদু এসে হাজির। আমরা শুধোই, "ব্যাপার কী ভাদু—সত্যি নাকি?" ভাদু বলে উঠলো, "খবরদার, ভাদু ব'লে ডেকেছ কি—এই দেখো—" বলেই পকেট থেকে কাগজের ঠোঙা বের করে আমাদের গায়ে ছুঁড়ে দিল! কিল্‌বিলিয়ে বের হয়ে এলো একপাল হেলে সাপ…। আমরা আঁৎকে উঠে পালাতে যাই—ভাদু হেঁকে বললে—"খবরদার, ভাদু বলেছ কি এবার জাত্ সাপ ছেড়ে দেব। জান তো ভাদ্রমাসে জন্ম আমার—মনসা পূজার মাস—আর মনসা হচ্ছেন সাপের দেবতা—অতএব হুঁশিয়ার!" আমরা খ্যাপার কাণ্ড দেখে তো অবাক্। সুরেশ কি যেন বলতে যাচ্ছিল—ভাদু আবার হেঁকে বললো, "খবরদার—ভাদু বলেছ কি!"… শুনতে পেলাম পকেটের মধ্যে ব্যাঙ ডাক্‌ছে—বললে, "এই কটকটে ব্যাঙ গায়ে ছেড়ে দেবো।… আজ থেকে আমার নাম বিবস্বান্—অনেক বই ঘেঁটেঘুঁটে এই নামটা পছন্দ করেছি।"

সুরেশ টিপ্পনী কেটে বললে, "হাঁরে নাম তো নিলি—মানে জানিস্?" ভাদু তেড়ে জবাব দিল—"নামের আবার মানে কি? তোর নাম তো সুরেশ—তা হলে দেবতাদের ঈশ্বর—অথবা

বলবো গান গাইতে তুই ওস্তাদ। নামের আবার মানে? কিং কোম্পানির ওষুধ বিক্রী হয়, তারা কি রাজা নাকি? নামের আবার চুল-চেরা মানে চাই?"

এমন সময় ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেল—আমরা যে যার ক্লাসে ঢুকে পড়লাম। নূতন মাষ্টার মশায় এসেছেন—নাম ডাকছেন; সবাই 'প্রেজেণ্ট স্যার', 'প্রেজেণ্ট স্যার' বলে জবাব দিলাম। ভদ্রেশ্বরের নাম ডাকা হলো—ভাদু নিরুত্তর। মাস্টার মশায় অপিস থেকে ব্যাপারটা শুনে এসেছেন—তবুও বললেন, "ভদ্রেশ্বর আজ আসেনি?" আমরা বলে উঠলাম, "ঐ তো কোণে বসে আছে স্যার।" মাস্টার মশায় বললেন, "কি ভদ্রেশ্বর, মৌনব্রত নিলে কবে থেকে? মৌনী বলে তোমার সুনাম তো নেই।"

"না স্যার। আমি ভদ্রেশ্বর নই—নাম পালটিয়ে নিয়েছি—এখন আমি বিবস্বান্।" নূতন হলেও কয়দিনেই ভদ্রেশ্বরের খ্যাপামীর কথা মাস্টার মশায় শুনেছিলেন—তাই তাকে আর ঘাঁটালেন না।

বাংলার ক্লাস। নির্দিষ্ট শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে নূতন মাস্টার মশায় বাংলা ভাষা নিয়ে কথা পাড়লেন। প্রশ্ন করলেন, "চাল নেই, চুলো নেই কথাটার মানে কি?" একজন উত্তর করলো—"স্যার, যে লোক সাদাসিধে, যার কোন সখ নেই—তাকেই বলে চাল নেই লোকটার। আর চুল-ও নেই এমন তো কত লোক—ও পাড়ার গণশা ময়রার বেল-মাথা।" ক্লাসসুদ্ধ ছেলে এই ব্যাখ্যা শুনে হেসে উঠলো। কেবল হাসলো না ভদ্রেশ্বর ওরফে বিবস্বান্। সে বললে, "স্যার বোকারা হাসছে কেন? গোবরা তো ঠিক বলেছে?" জীবন গাঙ্গুলী বলে উঠলো, "স্যার, গোবরার মাথায় গোবর বলেই ওর তো ঐ নাম। আমি বলছি আসল মানে। যার ঘরে চাল বা ছাউনী নেই অথবা রান্না করে খাবার মতো চাল নেই—ও চুলো বা উনুন নেই—অর্থাৎ খুব গরীব লোক। তার সম্বন্ধেই বলা হয় লোকটার 'চাল-চুলো নেই'।" ভদ্রেশ্বর থামবার পাত্র নয়—বললে, "স্যার তা'হলে 'চুলো-চুলী' মানে উনুন—চুলো মানেও যা, চুলী মানেও তাই।" মাস্টার মশায় মৃদু হেসে বললেন, "আচ্ছা ও মীমাংসা পরে হবে। আর একটা শব্দের মানে বলো—'গুলবদন'। চাল-চুলো, চুলো-চুলি শব্দ খাঁটি বাংলা; আর গুলবদন শব্দের আধখানা ফার্সি, আর আধখানা আরবী।"

ভদ্রেশ্বর ওরফে বিবস্বান বলে উঠলো, "আমি জানি। বাবা তামাক খান—কলকের মধ্যে পোড়া তামাককে 'গুল' বলে; পিসী গুল্ গুঁড়ো করে মিশি তৈরী করে দাঁতে ঘষে। 'বদন' মানে মুখ; 'গুলবদন' মানে—মুখে মিশি দেওয়া।" মাস্টার মশায় হাসবেন কি রাগ করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, এমন সময়ে গোবরা বলে উঠলো, "স্যার, যে লোকটার বদনে বা মুখে বাজে কথা লেগেই আছে—তাকে বলে 'গুলমারা'।" মাস্টার মশায় বললেন, "তা নয়; গুলবদন মানে 'কোমলাঙ্গ'।"

ভদ্রেশ্বর ছাড়বার পাত্র নয় ; সে শুধোয়, "স্যার গুলজার মানে কী? আমাদের দেশে গুলজার শেখ নামে একটা লোক আছে—সে খুব গল্পে, গুলজার করে মাতিয়ে রাখে—সে কী গুল-ই ছাড়তে পারে! গোবরা কোথায় লাগে! লোকটা গুলজার করে কী আনন্দ পায়?"

•

পূজার ছুটির পর ভাতুর সঙ্গে দেখা। এ ভাতুও নয়, ভদ্রেশ্বরও নয়—এ কী পরিবর্তন! ভাতু প্যান্টালুন পরেছে—আজকালকার ফ্যাশানের চোঙা-কাট্। স্বচ্ছ প্ল্যাস্টিকের বেল্ট বেঁধেছে পেটের নিচে—কোমরে নয়। গায়ে শার্ট—শার্টে নানা ছবি ছাপা—সাইকেল করে মেম যাচ্ছে, পেরামবুলেটর ঠেলছে আয়া, ঘোড়া ছুটছে, মোটর ছুটছে—গায়ের উপর শহরের রাজপথ চলেছে! আমরা এরকম জামার কাপড় কখনো দেখিনি—একটা জায়গায় খবরের কাগজের খানিকটা লেখা ছাপা রয়েছে!

ভাতু বলে ডাকতে গিয়ে সামলে নিয়ে ডাকলাম, "বিবস্বান্, এ জামা কোথায় পেলি? আমাদের এখানকার দোকানে তো দেখিনি।" ভাতু গম্ভীর ভাবে বললো—"দেখবি কোথা থেকে? এবার পূজার সময়ে কলকাতায় গিয়েছিলাম—মামার বাড়ি। তারা খুব বড়লোক। মামাতো ভাই-বোন অনেক ক'টা। মামাতো ভাই আমার থেকে বড়ো, কলেজে পড়ে; নাম তার টম্।"...আমি বলি, "সাহেব নাকি তারা?" ভাতু বলে, "সাহেব কি করে হবে? নাম তার তমোনাশ। তার থেকে হয়েছে টমাস, টম্। আমার যেমন ভদ্রেশ্বর থেকে ভাতু, আর তোর যেমন গোবর্ধন থেকে গোবরা।" আমি বলি, "তা' হোক, তবু এগুলো বাংলা শব্দ তো!—টমাস, টম্ তো বাংলা নয়।" ভাতু বলে, "ওদের বাড়ির সবাই প্যান্ট পরে, মেয়েরা ফ্রক—অবশ্য মামীমা সাড়ী পরেন ; তবে মামা সব সময়েই সাহেবী পোশাক পরে ঘোরেন—তিনি কোন্ এক সাহেব কোম্পানীর খুব বড় চাকুরে কিনা! মামাতো বোনগুলোকে ফ্রক পরতে দেখে, আমার বিশ্রী লাগতো। কালো-কালো ঠ্যাংগুলো হাঁটু পর্যন্ত খালি! আমি যেদিন সেখানে গেলাম—আমাকে দেখে তো তারা কী মুখ-টেপাটেপি করলো। তমোনাশ দাদা বা টমাস আমাকে বললো, "তোমার চাল নেই, চুলও নেই—কলকাতায় এসেছ—এ ছুটোর কাল্চার করো এই একমাস—গেঁয়ো শহরে যখন ফিরে যাবে—তোমায় দেখে সবার তাক লাগ্‌বে।" আমি থতমত খেয়ে বললাম, "চাল-এর কথা বলছ ; মা বলেছিলেন, চাল তিন কে. জি. নিয়ে যেতে। আমি মাকে বললাম, মামার বাড়ি যাচ্ছি—চাল-চিঁড়ে বেঁধে যেতে হবে নাকি? আমার কথা শুনে ভাই-বোনদের সে কী হাসাহাসি! তমোনাশ বললে, দূর পাগল—চাল আনতে হবে কেন। চাল্ হচ্ছে ফ্যাশান আর চুলের কথা হ'ল—আজকালকার ছেলেদের ফ্যাসান লম্বা চুল রাখা। দেখবে এখানে সবই।"

ভাদু গল্প করে চলেছে—"সন্ধ্যার পর কী হৈহুল্লোড় হতো তাদের বসবার ঘরে। কত রকমের সাজ আর চেহারা! একদলের লম্বা চুল—মাথা যেন কাকের বাসা—কারও মুখে গোঁপ চাঁচা—দাড়ি সযত্নে রেখেছে কেউ; থুতনীর নিচে ছাগল-দাড়ি! একদিন দেখি গ্রামোফোন খুলে একটা বিলিতী সুর—সার্কাসে যেমন শুনি—তেমনি একটা বাজনার সুরে তাল দিয়ে সে কী নাচ্—দেহের কত রকম ভঙ্গী, তা তোমাদের কী আর বলবো! আর গ্রামোফোন থামেই না, প্রায় আধঘণ্টা চললো নানা রকমের বাজনা। পরে টমাস দাদা বল্লে, 'এগুলো লং প্লেয়িং রেকর্ড।' আমাদের গ্রামোফোনে হাতে দম দিই—আর সেটা দেখি বিজলীর জোরে চলে—দেওয়ালে প্লাগ্ লাগিয়ে দিল!"

—"আমি হকচকিয়ে একপাশে বসে আছি। তমোনাশকে তার এক বন্ধু মুখে ছাগল-দাড়ি, মাথায় লম্বা চুল কাকের বাসা ইংরেজীতে বলছে, হ্যালো টম্ এই জঙ্গলীকে কোথা থেকে আমদানী করলে? তমোনাশ দাদা তার বন্ধুকে একপাশে ডেকে কি যেন বললো। ছাগল-সুর ভেবেছিল যে, আমি তার ঐটুকু ইংরেজী বুঝতে পারিনি।"

আমি ভাদুকে বললাম, "বিবস্বান্, তোমার নাম তো বদলেছিলে—তোমার এই পোশাক বদলালো কি করে?"

ভাদু বললে, "মামীমা, একদিন আমাকে পার্ক ষ্ট্রীটের এক সাহেবী দোকানে নিয়ে গেলেন, তারপর এইসব কিনে পরিয়ে বাড়ি নিয়ে এলেন। সকলকে ডেকে বললেন, এতদিনে ভাদুর ভদ্রেশ্বর নাম সার্থক হলো—দেখতো কেমন 'ভদ্র' দেখাচ্ছে।"

ভাদু আরো বললে, "জানো ভাই গোবরা, মামাতো ভাই-বোনরা সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে—দাদা দিদি কেউ বলে না।"

আমি শুধোই, "হাঁরে, চাল তো নিস্‌নি—খেলি কি?"

—"তা বেশ জুটতো। সেবকটি খুব চতুর—কোথা থেকে কী-ভাবে সব আনতো, তা মামীমাও জানতেন না। চাল-এর সমস্যা থেকে আমার চুলের সমস্যা দেখা দিল বেশি করে।"

—' কেন তোর চুল কী অপরাধ করলো? একমাসে তো দেখছি চুল-ও বেশ যাত্রাদলের কেষ্ট ঠাকুরের মতো হয়েছে।"

"—হ্যাঁ ভাই, চুলও ওদের মতো রাখতে হলো। বলে, এলো-মেলো চুল রাখা আজকালকার হাল আমলের চাল্ বা ফ্যাশান। টমাস্ দাদা বলেছিল একদিন, 'ভাদু পোশাকটা ভদ্র হয়েছে—এবার চুলের গাড়োয়ানী ছাঁট বদলা—চুল কাটিস্‌নে। চাল, আর চুল-ও ঠিক আধুনিক হওয়া চাই।"

গেঁয়ো শহরে সবাই ভাদুর পোশাক তার চাল দেখে, তার চুল-ও দেখে। সবাই অবাক্। স্কুলেও সে প্যাণ্ট-শার্ট পোশাক পরে যায়—তবে কেউ তাকে তা নিয়ে ঠাট্টা করে না; সকলেই ফিস্‌ফিস্ করে তাকে শুধোয়, "ভাই কি করে চাল্ চুল-ও ঠিক করা যায়?"

ভাদু বলে, "ভয় নেই—কালে চাল-ও হবে, চুল-ও হবে।"

বিদ্যুতের সাহায্যে পাহাড় ফাটানো

আমরা ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটাবার কথা জানি—তাতে পাহাড়ের গায়ে ছিদ্র ক'রে তার ভিতরে ডিনামাইট ভ'রে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে পাহাড় ফাটাবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে তারের মাধ্যমে পাহাড়ের অভ্যন্তরে উচ্চশক্তি বিদ্যুৎ শক্তি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে পাহাড়ের এক অংশ দ্রুত উত্তপ্ত ও সম্প্রসারিত হয়ে পাহাড়ের শীতল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে টুকরা টুকরা হ'য়ে ভেঙ্গে যায়। এই ব্যবস্থা নিরাপদও খুব।

একটি মজার গল্প

শ্রীমতী অর্পণা চক্রবর্তী

অনেক দিন আগে এক গ্রামে এক তাঁতী আর এক কুমোর বাস করতো। তাঁতী বসে বসে তাঁত বুনতো, আর কুমোর গড়তো নানা রকমের মাটির জিনিস। তাঁতীর ছিল একটা পোষা বাঁদর আর কুমোরের ছিল একটা পোষা ছাগল। তাঁতী আর কুমোরের মধ্যে যেমন ভাব ছিল, বাঁদর আর ছাগলের মধ্যেও ঠিক সেই রকমই ভাব ছিল।

একদিন তাঁতী আর কুমোর যাবে হাটে। ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তাঁতী সকাল বেলা উঠেই রদ্দুরে দিয়েছিল তার সুতো, আর কুমোর রদ্দুরে দিয়েছিল তার সরা, কলসী, হাঁড়ি। হাটে যাওয়ার সময়ে তারা দু'জনে বাঁদর আর ছাগলকে বলে গেল, যদি বৃষ্টি আসে তা'হলে তারা যেন সুতো আর হাঁড়ি, সরা ঘরে তুলে রাখে।

বিকেলের দিকে আকাশ অন্ধকার করে এলো বৃষ্টি। বাঁদর তাড়াতাড়ি সুতো সব এক সঙ্গে করে জট পাকিয়ে ঘরে নিয়ে এসে রাখলো। ছাগলও শিঙে করে হাঁড়ি সরা সব ঘরে টেনে নিয়ে এলো। কিন্তু কোন হাঁড়ি সরাই আর আস্ত রইলো না।

সন্ধ্যের পর তাঁতী আর কুমোর ঘরে এসে সুতো আর হাঁড়ি-কলসীর অবস্থা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। তারা দু'জনে বাঁদর আর ছাগলকে মারতে মারতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে।

বাঁদর আর ছাগল মনের দুঃখে এক বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। ক্ষিদেতে তাদের অবস্থা কাহিল; এদিকে মার খেয়ে গায়ে হয়েছে ভীষণ ব্যথা। সামনে একটা জাম গাছ দেখতে পেয়ে বাঁদর এক লাফে গাছে উঠে বসলো আর মহানন্দে জাম খেতে সুরু করলো।

ছাগল এদিকে কোন কিছু খাবার না পেয়ে সামনে একটা ভাঙা বাড়ি দেখে তার মধ্যে ঢুকে দেখে—লাল, নীল, সবুজ, হলদে নানা রকমের খাবার পড়ে আছে। ক্ষিদের জ্বালায় ছাগল সেই সবই খেতে শুরু করলো। আসলে ঐ বাড়িটা ছিল একদল ডাকাতের আস্তানা। ঐ ঘরে তারা জমিয়ে রাখতো, নানা মণি মুক্তো, পাথর। ছাগল ক্ষিদের জ্বালায় যতটা পেটে ধরলো খেয়ে ফেললো।

এদিকে সকাল বেলা বাঁদর আর ছাগল সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গেল। তারা আবার যে যার বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে রওনা হলো।

তাদের ফিরে আসতে দেখে, তাঁতী আর কুমোরেরও খুব আনন্দ হলো। ছাগল আর বাঁদরকে তারা যে-যার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল।

পরদিন সকালবেলা কুমোর ছাগল বার করবে বলে ঘরে ঢুকে দেখে, অন্ধকারে ঘরের মধ্যে কি যেন সব জল্‌জল্‌ করছে। একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখে যে, ছাগলের পায়খানার সঙ্গে যে জিনিসগুলো বার হয়েছে, সেগুলো শুধু চুনী, পান্না, পাথর ইত্যাদি। আনন্দে কুমোর ছাগলকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকে। তারপর এক দৌড়ে কুমোর তাঁতীর বাড়ি উপস্থিত হল।

এত ভোরে কুমোরকে দেখে তাঁতী অবাক হয়ে গেল। তখন কুমোর তাঁতীকে বললে, 'দেখ ভাই, ছাগলকে তাড়িয়ে দিয়ে ভালোই করেছিলাম, আমার ছাগল আমাকে কি এনে দিয়েছে দেখ!' এই বলে সে সেই দুর্লভ জিনিসগুলো তাকে দেখালো। ঐ সব দেখে তাঁতীর মুখ দিয়ে আর কথা বার হয় না। পরক্ষণে সে দৌড়লো তার বাঁদর কি নিয়ে এসেছে দেখার জন্যে।

কিন্তু ঘরে ঢুকে রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে উঠলো। সে দেখলো ঘরের চতুর্দিকে কেবলমাত্র জামের বীচি ছড়ানো রয়েছে।

তখন তাঁতী রাগে একটা লাঠি দিয়ে মারতে মারতে বাঁদরকে তাড়িয়ে দিলে।

এদিকে ছাগলের দৌলতে ঐ কুমোর হয়ে উঠলো এক বিরাট বড়লোক। ছাগলের যত্ন তখন দেখে কে?

বিদ্যুতের ক্রিয়াকলাপ

অমরদা'

ইলেকট্রিসিটি কথাটা আজকাল খুব চলতি—ইলেকট্রিক বাতি, ইলেকট্রিক পাখা, ইলেকট্রিক উনুন, এমন আরো কত কি! এটা ইলেকট্রিসিটির যুগ। কল-কারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, রেল, ট্রাম—সর্বত্রই ইলেকট্রিসিটির কারবার। বাড়ি-ঘরে, রাস্তা-ঘাটে, স্কুল-কলেজে—ইলেকট্রিসিটি নেই কোথায়? বাস্তবিক ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুতের আবিষ্কার হওয়াতে লোকের অভাবনীয় সুবিধা হয়েছে, অনেক কঠিন কাজ সহজ হয়েছে।

বিদ্যুৎ জিনিসটা কী, কোথায় এর উৎপত্তি তা বিজ্ঞানীরা বলবেন। এখানে আমি শুধু তোমার-আমার ঘরের ইলেট্রিক বাতির সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলছি।

বৈদ্যুতিক বাতি আমাদের নিত্যকার জীবনযাত্রার একটা প্রধান অঙ্গ। অন্ধকার হলেই তুমি ঘরে সুইচ্ টিপে দাও, আর মুহূর্তে সব কিছু আলোয় ঝলমল করতে থাকে। কত সুন্দর আর কত আরামদায়ক। আমরা এতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, ওর অভাবে অবস্থাটা কী দাঁড়াত ভাবতে পারিনে। অথচ ইলেকট্রিক বাতি আবিষ্কৃত হয়েছে বেশি দিনের কথা নয়; মাত্র ৮০ বছর আগেকার কথা। মহা উপকারী আবিষ্কার।

আচ্ছা, ভেবে দেখেছ কখনো কি-করে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলে ওঠে? ওটার ভিতরকার কারুকার্যটাই বা কী?

পরিষ্কার স্বচ্ছ একটা বাতি হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখ। ওর ভিতরে অতি সূক্ষ্ম তারের একটা কুণ্ডলী বা কয়েল আছে, ইংরেজীতে যাকে বলে ফিলামেণ্ট। ঐ জিনিসটা টাংষ্টেন নামক একপ্রকার ধাতুর তৈরী। ওর ভিতরে বিদ্যুৎ যাওয়া মাত্র ফিলামেণ্ট জ্বলে ওঠে আর তীব্র গরমে সাদা হয়ে যায় এবং তখনই আলো ছড়িয়ে পড়ে চারধারে। ঐ ফিলামেণ্ট একটা ধাতু-নির্মিত নলের সঙ্গে লাগানো থাকে, বাতিটার ঠিক মাঝখানটায়।

ফিলামেণ্টে যে কুণ্ডলী দেখছ তা তৈরী করা তেমন শক্ত কাজ নয়। চাই খুব সূক্ষ্ম তার। একটা পেন্সিলের এক প্রান্তে ঐ রকম তার বেশ করে জড়াও এবং তারপর পেন্সিলটা টেনে বের করে ফেল, দেখবে কুণ্ডলী পাকিয়ে গেছে। আকারে কিছু বড় হবে বটে, কিন্তু গড়ন এক। প্রথম যুগে ইলেকট্রিক বাতির ফিলামেণ্ট তৈরী হত বাঁশের কুঁচি দিয়ে। বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগলে ওটা টকটকে লাল দেখাত। আজকের ব্যবস্থা কতই না উন্নত!

ইলেকট্রিক বাতির ভিতরের সমস্ত বায়ু আগে পাম্প করে বের করে ফেলা হয়। তারপর ওর ভিতরে পোরা হয় নাইট্রোজেন ও আরগণ গ্যাস। ঐ গ্যাসের জোরেই ফিলামেণ্ট অমন উজ্জ্বল আলো দেয়।

সাধারণতঃ দেখবে ইলেকট্রিক বাতি নীচের দিকে মুখ করে আছে, অথচ পড়ে যাচ্ছে না। কী-করে বাতি ফিট্ হয় জানো? এক হাতে বাতিটা ধর, অন্য হাতে হোল্ডার। এখন, বাতির পিন-লাগানো দিকটা হোল্ডারের মুখে লাগিয়ে উপর দিকে একটু চাপ দাও এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্য মোচড় দাও; বস্, দেখবে আটকে গেছে হাত সরিয়ে নিলেও ওটা পড়বে না। এবার সুইচ টিপে দাও, আলো জ্বলে উঠবে।

মনে রাখবে, বিদ্যুৎ বড় ভয়াবহ, বিপজ্জনক। অতএব সুইচ বন্ধ না করে কখনো বাতি ফিট করবে না।

কতক বাতির কাচ পরিষ্কার স্বচ্ছ; কতক আবার ঘোলাটে সাদা। ঐ শেষোক্ত বাতির আলোতে চোখ ঝলসায় না, অনেকে তাই সেগুলো ব্যবহার করে থাকে। আবার তাদের আকারও নানা রকম। টর্চের বাতি ছোট, এতটুকু; ওগুলি ছোট ছোট এক বা একাধিক ব্যাটারীতে জ্বলে কিনা তাই। ওদিকে মোটরগাড়ির বাতি বড়, তার ব্যাটারিও বড়।

আর এক ধরণের বাতি আছে, টাংষ্টেন বাতি থেকে আলাদা। ফ্লুরোসেণ্ট বাতির কথা বলছি। তোমাদের অনেকের বাড়িতেই তা আছে। এই বাতি থেকে যে আলো ফুটে বের হয় তা আরো বেশি উজ্জ্বল, বেশি সুন্দর। এর প্রধান উপাদান লম্বা কাচের টিউব বা নল। ওর ভিতর দিকে বিশেষ এক রকমের সাদা পাউডার বেশ করে মাখানো থাকে। সুইচ টিপে দেওয়া মাত্র টিউবের মধ্যেকার গ্যাস ঐ পাউডারের প্রলেপটাকে খুব উজ্জ্বল করে তোলে। এই উজ্জ্বলতাকে বলা হয় ফ্লুরোসেন্স বা প্রতিপ্রভা; তা থেকেই নাম হয়েছে ফ্লুরোসেণ্ট বাতি। আজকাল এই বাতির খুব চল।

বড় বড় শহরের রাস্তায় যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা সে আবার অন্য ধরণের। ওকে বলে সোডিয়ম বাতি। ঐ বাতি থেকে বের হয় হলদে আলো। এতে সোডিয়ম নামক এক প্রকার গ্যাসের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করে, এবং আলোটা উজ্জ্বল হলদে দেখায়।

আবার দেখ, রাস্তার মোড়ে মোড়ে রংবেরং-এর নিওন আলোয় বিজ্ঞাপনের বাহার!

তবেই দেখ, এই যুগে বৈদ্যুতিক বাতি নানাভাবে আমাদের অশেষ উপকার করেছে।

সজারুর কাঁটা

অনেকের ধারণা—রাগলে বা ভয় পেলে সজারুরা তাদের শরীরের কাঁটাগুলো খাড়া ক'রে তোলে এবং শত্রুর দিকে ছুঁড়ে দেয়। আসলে কিন্তু তারা কাঁটা ছুঁড়ে মারে না। তাদের দেহের কাঁটাগুলো খুব আলগা, সামান্য স্পর্শেই সেগুলো খাড়া হ'য়ে ওঠে—তখন দেখলেই মনে হয় যেন ছুড়ে মারবার জন্যেই কাঁটাগুলোকে তারা খাড়া ক'রেছে।

সৈনিক হতে হলে

ভারতীয় যুবকদের দক্ষ সৈনিক হবার সব গুণাবলীই আছে। দেশপ্রেম প্রধানতঃ তাদের সৈনিকবৃত্তি গ্রহণে আগ্রহী করে। তাছাড়া যারা সাহসিক অভিযান, দেশপ্রীতি, খেলাধূলা এবং বাইরের জীবনকে বেশী পছন্দ করে, তাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার সহজ উপায় হচ্ছে সৈনিক বৃত্তি। বস্তুতঃ, সৈনিক জীবন নিষ্ঠার সঙ্গে কর্মযজ্ঞে আত্মাহুতি, বিশ্বস্ততা, নিখুঁত শৃঙ্খলাবোধ এবং অনাগতকে সম্মুখীন হবার সদা প্রস্তুতি দাবী করে। অবিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা গ্রহণ প্রত্যেক সৈনিককে শরীর ও মনের দিক দিয়ে সবল করে রাখে। সেই সঙ্গে চলে বিজ্ঞান, আধুনিক প্রয়োগবিদ্যা, সর্বাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা। এই শিক্ষা ক্রমান্বয়ে জটিল হয়ে উঠছে।

আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র কোন যন্ত্রমানব দিয়ে পরিচালনা করা অসম্ভব। এজন্য চাই ইস্পাত-কঠিন দেহ ও মন, অনুসন্ধিৎসা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং দ্রুত চিন্তা করবার শক্তি।

আবার জওয়ানদের মধ্যে থাকা চাই কর্মোদ্যোগ, নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং কর্তব্যনিষ্ঠা। এদের অনেককেই উপযুক্ত নেতৃত্ব গ্রহণ করে দল পরিচালনা করতে হয়। এর জন্যে গোষ্ঠীবোধ এবং সৌভ্রাত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রথম পরীক্ষা

সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হবার পরে শিক্ষার্থীরা রেজিমেণ্টাল সেণ্টার কিংবা বিদ্যালয়ে প্রথম সৈনিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়। কিভাবে পোশাক পরতে হয়, অস্ত্র কিভাবে ধরতে হয় ও ব্যবহার করা হয়, কিভাবে চলতে হয় এবং অভিনন্দন জানাতে হয়—এ সবই প্রথম পাঠ। সেই সঙ্গে চলে যুদ্ধকৌশল শিক্ষা। কিভাবে নিজেকে ও ইউনিটকে রক্ষা করতে হবে এবং শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে এ সবই শিক্ষার অংশ।

শিক্ষণকালে শিক্ষার্থীর ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো হয় এবং তারা প্রতিরক্ষার মূল বিষয়ও কৌশলের সঙ্গে পরিচিত হয়। শরীর ও মনকে শক্ত করে প্রকৃত যুদ্ধাবস্থায় কিভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হবে তা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিখতে হয়। দড়ি বেয়ে ওঠা-নামা, বক্সিং, সাঁতার দেওয়া এবং কুচকাওয়াজ শরীরকে শক্ত করে। অস্ত্রসহ এবং অস্ত্রছাড়া কুচকাওয়াজ তাদের শৃঙ্খলাবোধকে তীক্ষ্ণ করে। অস্ত্রচালনা এমনভাবে শেখানো হয় যে, ক্রমে সেটা যেন শরীরের এক অঙ্গ হয়ে ওঠে।

সামরিক শিক্ষা অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। অনেক সময় এটা খুবই কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য মনে হয়। বিশেষ করে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে এটা খুবই প্রকট হয়। কারণ অত্যুচ্চ হিমালয়ে রক্ত-জমানো ঠাণ্ডা, প্রচণ্ড বাতাসের বেগ, অপরিচিত বনাঞ্চল এবং অপরিচিত পরিবেশ সৈনিক জীবনকে কষ্টসাধ্য করে তোলে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ বিশেষ। তবে সুখের বিষয় জওয়ানরা এই চ্যালেঞ্জ বেশ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করছে এবং নিজেদের বেশ মানিয়ে নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

পুনার সামরিক ক্যাডেট কলেজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হয়। ম্যাট্রিক কিংবা সমমানের যোগ্যতার প্রার্থীরা এতে যোগ দিতে পারে। নির্বাচিত হয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করলে এদের অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এইভাবে সুরু হয় সামরিক জীবন।

আলাস্কা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
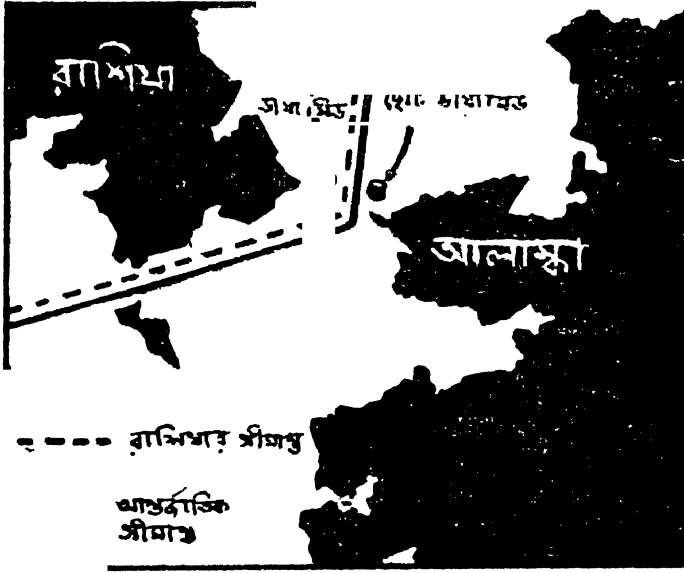
আলাস্কা—এই নামটি তোমাদের কারও কারও শোনা মনে হলেও দেশটির খবর কেউই রাখো না বোধ হয়। রাখবার কথাও নয় অবশ্য—সেখান থেকে না আসে কোন ক্রিকেট টীম, না ফুটবল। একেবারে উত্তর মেরুর কোলের কাছে সারা বছর শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে আলাস্কা—তার কথা কি অতো চট করে মনে পড়ে?

কিন্তু একবার যদি একটু জানতে চেষ্টা করো তবে দেখবে কি অদ্ভুত আর আশ্চর্য ব্যাপার আছে দেশটার মধ্যে।

আলাস্কার আয়তন বা লোকজনের খবর নেবার আগে সেটা ঠিক কোথায় একটু বুঝবার চেষ্টা করো।

পৃথিবীর একখানা মানচিত্র খুলে উত্তর মেরুর ওপর চোখ রাখো। গ্রীনল্যাণ্ড থেকে সরে এসে পশ্চিম দিকে বেরিং প্রণালী বরাবর। যেখানে সোভিয়েট রাশিয়া একেবারে ঝুঁকে পড়েছে আমেরিকার ওপর। ঠিক সেইখানে একটি ছোট্ট দ্বীপ পাবে, নাম 'ছোট ডয়ামিড'। ওখান থেকে তিন মাইল পশ্চিম দিকে তাকালেই দেখতে পাবে আরো একটি ছোট দ্বীপ, নাম 'বড় ডায়ামিড'। দ্বীপ দুটো এতো ছোট যে মানচিত্রে তাদের খুঁজে পাওয়া শক্ত। কিন্তু এই ছোট ডায়ামিডই আলাস্কার একেবারে পশ্চিম প্রান্ত—অর্থাৎ, আমেরিকার শেষ সীমা। আর, বড় ডায়ামিড হল রাশিয়ার রাজনৈতিক সীমার ভেতরে। শুধু তাই নয়, এশিয়া এবং আমেরিকার যে ভৌগলিক সীমারেখা—তাও গিয়েছে এই দুটি দ্বীপের মধ্যে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কি জান? ছাট ডায়ামিডে যখন রবিবার বড় ডায়ামিডে তখন সোমবার। ভারী মজা, তাই না? আসলে সময়ের সীমারেখা—ইণ্টার ন্যাশনাল ডেট লাইনও গিয়েছে দুটি দ্বীপের মধ্যে দিয়ে। এই সব দিক দিয়ে দেখতে গেলেই আলাস্কা পৃথিবীর একটা বেশ নাম করবার মত দেশ।

মোটামুটি আলাস্কার সীমারেখা নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পেরেছো—এর দক্ষিণ উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তরে মেরুসাগর। আলাস্কা এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হলেও প্রায় শ'খানেক বছর
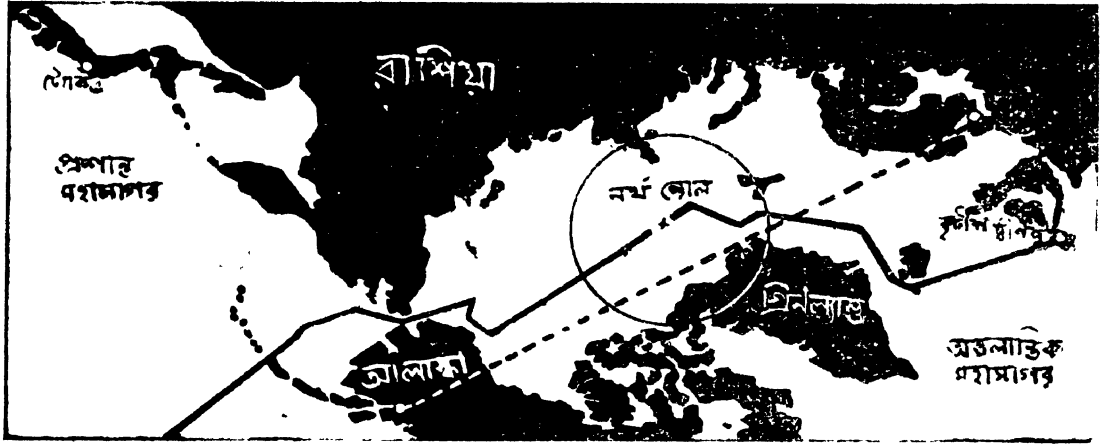
আগে এটি রাশিয়ার অধিকারে ছিল। রাশিয়ার কাছ থেকে আমেরিকা মাত্র বাহাত্তর লক্ষ ডলারে গোটা দেশটা কিনে নেয়। এর মোট আয়তন পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার বর্গ মাইল। তাহলেই ভেবে দেখো, কি সস্তায় বাজীমাৎ করেছিল আমেরিকা। এখন আলাস্কা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উনপঞ্চাশতম রাষ্ট্র।

উত্তর মেরুর একেবারে কাছাকাছি হওয়ায় আলাস্কায় যে প্রায় সারা বছরই প্রচণ্ড শীত সেকথা নিশ্চয়ই তোমাদের বলে দিতে হবে না! মেরু অঞ্চলে যে এস্কিমোদের কথা তোমরা শুনেছ—আলাস্কায় সেই ধরণের এস্কিমোর সংখ্যাই বেশী। তারা বরফের ঘরে থাকে। পশু শিকারই তাদের প্রধান উপজীবিকা। তাই বলে তাদের মধ্যে যে চিত্রকর বা গাইয়ে নেই—এমন কথা মনে কোর না কিন্তু।

এখন অবশ্য অনেক আমেরিকান সপরিবারে আলাস্কায় গিয়ে বাস করছেন। ফলে তা দিন দিন উন্নত হয়ে উঠছে!

॥ ছড়া ॥

শ্রীসরল দে

বেল পাকলে কাকের কি ?
কাকের ভারি বয়েই গেছে—
বিরাম আছে ডাকের কি ?
বলতে পারি, বেলতলাতে
টেকোমামার টাকের কি ॥

কাক ডাকলে নাকের কি ?
নাকের ভারি বয়েই গেছে—
বিরাম আছে ডাকের কি ?
বলতে পারি, নাক ডাকলে
নষ্ট হলো আখেরটি ॥

সংবাদ-বিচিত্র

জলক্রীড়ার 'উইম্বলডন'

জুনের ১৯ থেকে ২৭ তিরাশিতম "কিয়েল সপ্তাহ" প্রতিপালিত হল। এই উপলক্ষ্যে কিয়েল বন্দর জার্মানীর উত্তরের রাজ্যগুলি ও সাধারণতঃ উত্তর য়ুরোপের দেশগুলির খেলাধূলা, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও সামাজিক মেলা-মেশার মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ছোট-বড় চারহাজার নৌকো নিয়ে কিয়েলকে মাঝিমাল্লাদের মক্কা বলা চলে। পৃথিবীর নানা প্রতিযোগিতায় কিংবা ওলিম্পিকে যারাই নৌকো-চালনায় নাম করেছে, "কিয়েল সপ্তাহে" বাইচ খেলায় বাজি জিততে তারা একবার এখানে আসবেই। কেন না, তাদের কাছে কিয়েল হল টেনিস খেলোয়াড়দের কাছে উইম্বলডনের মত। ছবিতে তিনকোণা জলপথে এই প্রথমবার নতুন একটি বাইচ প্রতিযোগিতার কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। শুধু খেলাধুলো নয়, এই উপলক্ষ্যে কিয়েলে বহু শিল্পী ও বিজ্ঞানীরা আসেন ও নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এ বছর এসেছিল হেলসিঙ্কি থেকে ফিনিশ স্টেট অপেরা ও বের্লিনের জার্মান অপেরা।

শব্দের চেয়ে দ্রুতগতি গাড়ি

ডাঙায়, জলে, আকাশে যানবাহনের গতি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, কিন্তু মানুষ তাতেও সন্তুষ্ট নয়, সে চায় আরও গতি। তার সেই নেশা মেটাতে এমন একটি মোটরগাড়ি হয়তো তৈরী হবে, যার গতি হবে ঘণ্টায় ৬০০ মাইলের বেশি, এমন কি শব্দের চেয়েও দ্রুতগতি হতে পারে। এর ইঞ্জিনের ক্ষমতা ৪০০০ অশ্ব-শক্তি। যে লোক এই গাড়ি চালাবে তাও ঠিক হয়ে গেছে। এর

অ্যালুমিনিয়াম বেল্ট টায়ারগুলি দেখতে ইংরিজি 'টি' অক্ষরের মত। কাগজে-কলমে এই গাড়ির মডেল তৈরী হয়ে গেছে, নামকরণ পর্যন্ত হয়েছে "রেড শার্ক" অর্থাৎ লাল হাঙর। মডেল নির্মাতার নাম লিওপোল্ড স্মিট পশ্চিম জার্মানীর স্টুটগার্টের একজন ইঞ্জিনীয়ার। ইতিমধ্যেই রেড শার্কের জন্যে পেটেন্টের আবেদন করা হয়েছে, অভাব খালি টাকার। কারণ, একটা এরকম গাড়ি তৈরী করতে খরচ লাগবে পাঁচ লক্ষ মার্ক।

মুষ্টিযোদ্ধা ম্যাক্স শ্মেলিং

মানুষ হয়তো ভুলেই গেছে এককালের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা ম্যাক্স শ্মেলিংকে, যার ডানহাতের ঘুষির এক মারে ১৯৩৬ সালের ১৮ই জুন নিউইয়র্কের ইয়ান্‌কি স্টেডিয়ামে "ব্রাউন বম্বার" জো লুই একেবারে ধরাশায়ী হয়েছিল।

সেপ্টেম্বারের ২৮শে সেই ম্যাক্স শ্মেলিংয়ের বয়স হবে ষাট। হামবুর্গের কাছে হোলেনস্টেটে সে থাকে এবং এখন সে কোকাকোলা কোম্পানীর অংশীদার। সতের বছর হয়ে গেল ম্যাক্স বক্সিং ছেড়ে দিয়েছে।

ম্যাক্স শ্মেলিং মার্কিন মুল্লুকে যায় ১৯২৮ সালে। তখন সে মাত্র ৫০ মার্কের জন্যে মুষ্টিযুদ্ধে নামত। তার দু'বছর বাদে জ্যাক শার্ককে হারিয়ে, ম্যাক্স বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান হয়। এ সময়ে চিত্রতারকা অ্যানি ওনড্রার সঙ্গে তার দেখা হয় এবং এর তিনবছর পরে ওদের বিয়ে হয়। গরিবের ছেলে হলেও বক্সিং থেকে ম্যাক্স লক্ষপতি হয়ে যায়। সেই পয়সাকড়ি উড়িয়ে না দিয়ে এখনকার পূর্ব জার্মানীতে ম্যাক্স অনেক জমিজেরাত কিনেছিল, কিন্তু যুদ্ধের সময় তাকে তার সমস্ত ভূসম্পত্তি খোয়াতে হয়। ফলে অবস্থা এমনি খারাপ হয় যে, বের্লিন ও হামবুর্গে তার যে বাড়ি ছিল তাও বিক্রি করে দিতে হয়। ১৯৪৬ সালে বে-আইনী বাড়ি তোলার জন্যে তাকে তিন মাস হামবুর্গে জেল খাটতেও হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে হামবুর্গের কাছে হোলেনস্টেটে ম্যাক্স ছোটখাট ব্যবসা শুরু করে, কিন্তু ১৯৫৭ সালে মার্কিন বন্ধুদের সাহায্যে ম্যাক্স কোকাকোলা কোম্পনীর অংশীদার হয়ে যায়।

খেলোয়াড়-জীবনে ম্যাক্সের কোন বদনাম নেই। ক্রীড়াক্ষেত্রের জুরিদের মতে এমন পুরোপুরি ভদ্র খেলোয়াড আর হয় না।

ক্যাপ্টেন বিলবোকে সেলাম

আজ তোমাদের ক্যাপ্টেন বিলবোর গল্প শোনাব। তেমরা নিশ্চয়ই জানো ক্যাপ্টেন বিলবো কে? না জানলে, "এক আবেগপ্রবণ বিদ্রোহী" নামে তাঁর আত্মজীবনীখানা পড়লেই ক্যাপ্টেন বিলবো সম্বন্ধে সবকিছু জানতে পারবে। বইখানার ভূমিকা লিখেছেন যিনি, তিনি যে-সে লোক নয়, বিখ্যাত হেনরী মিলার। বলেছেন, "ক্যাপ্টেনকে আমি প্রণাম করি। তাঁর বুকের পাটা যেন শক্তি না হারায়।" আরও কে কে তাঁর সম্পর্কে লিখেছে জানো?—বার্নার্ডশ, সিগমুণ্ট ফ্রয়েট ও চেস্টারটন।

ক্যাপ্টেন বিলবোর আসল নাম—হিউগো বারুথ। বের্লিনের এক ধনী পরিবারের ছেলে সে। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজে চাকরি নেয়। তারপর চল্লিশ বছর ধরে সে কেবল ঘুরে বেড়িয়েছে। কখনও জাহাজের ছোকরা চাকর, কখনও বাসন মাজার চাকরি,

আবার কখনও-বা ভবঘুরে, সাংবাদিক, মঞ্চ-ডিজাইনার, এমনকি দুর্ধর্ষ ডাকাত 'আল কাপোনের' দেহরক্ষী হয়ে পর্যন্ত। আট বছর আগে দেশে ফেরা পর্যন্ত বিদেশেই সে বেশি পরিচিত ছিল।

ক্যাপ্টেন বিলবোর বয়স এখন ষাট। যাযাবরের জীবন ছেড়ে সে এখন পশ্চিম বের্লিনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।

ফার-শোভিত ছাতা

পশ্চিম জার্মানী ছাতা ব্যবসায়ী-কেন্দ্র ১৯৫৫-৫১ সালের জন্য একটি অদ্ভুত সৌখিন ছাতা আবিষ্কার করেছে। আসল অথবা নকল নানাধরণের লোমের কোটের সঙ্গে এই ছাতাগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। ছাতাগুলো কেবলমাত্র আকর্ষণীয়ই নয়, এতে নতুনত্বও আছে বটে। এই ছাতার আবিষ্কারকেরা এ সিজিনের জন্য 'সাইক্লাথ' রংটাকেই পছন্দ করেছে। এই রংটি একটি বেগুনি রং-এর সঙ্গে নানা রং-এর সংমিশ্রণে তৈরী। এই অভিনব সৌখিন ছাতা কিশোরী, তরুণী, বৃদ্ধা নির্বিশেষে সবাইকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। মিউনিখে ছাতাগুলো খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কারণ বহু দেশ ভ্রমণকারীদের এই বিশেষ ধরণের ছাতা কিনতে আগ্রহান্বিত হতে দেখা যাচ্ছে।

এক গোরিলা-শিশু জন্মগ্রহণে জার্মানীর চিড়িয়াখানায় আলোড়ন

আট সপ্তাহ পূর্বে জার্মানীর চিড়িয়াখানায় একটি গোরিলা-শিশুর জন্ম হয়েছে। এমন ঘটনা খুবই বিরল; কারণ জার্মানীর চিড়িয়াখানায় এর পূর্বে আর কোন গোরিলা-শিশুর জন্ম হয়নি। এ বাচ্চাটির বাবা ও মা এ চিড়িয়াখানার বহুদিনকার বাসিন্দা। কিন্তু মা গোরিলাটি (মাকুলা) চিরদিন মানুষের সাহচর্যে বড় হওয়ায়, বাঁদরের ছানা দেখবার সুযোগ কোনদিন পায়নি যার জন্য নিজের সন্তানের প্রতি যত্ন নিতে সে রীতিমত ভীত হয়ে পড়ে। তাই গোরিলার বাচ্চাটিকে (ম্যাক্স) 'মানব মায়ের' যত্ন নিতে হচ্ছে। তাকে রীতিমত মানব শিশুর মতই যত্ন দেওয়া হচ্ছে। বাচ্চাটির ক্রমবর্ধমান ওজন দেখে তার 'মানব মা' ও চিড়িয়াখানার পরিচালক খুব খুশি। তাদের ধারণা ম্যাক্স একদিন খুব শক্তিশালী গোরিলা হয়ে উঠবে।

মেঠুড়ে

একটি লড়াইয়ের কাহিনী

এবারের ক্লে বনাম পাটার্সনের লড়াইয়ে টেকনিক্যাল নক-আউটে ক্লে বিজয়ী বলে সাব্যস্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বচ্যাম্পিয়ান ক্লে-র ছিল একচ্ছত্র প্রাধান্য। শেষ শক্তি নিঃশেষ করে মরীয়া হয়ে লড়েছেন প্যাটার্সন, কিন্তু ক্লে দ্বিগুণ শক্তিশালী ঘুষির আঘাত হেনেছেন প্যাটার্সনকে। ধীরে ধীরে ক্লান্ত, আহত প্যাটার্সন নিজেকে হারিয়ে ফেলে পরাজয় বরণ করে নিয়েছেন।

ক্লে-প্যাটার্সন মুষ্টিযুদ্ধের শুরুতে প্যাটার্সনই আক্রমণের ঢেউ তুলেছিলেন। প্রথম রাউণ্ডে ক্লে তাঁর স্বভাবসুলভ পদ্ধতিতে প্যাটার্সনের কাছ থেকে দূরে দূরে ছিলেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডের শুরুতেই ক্লে আক্রমণ শুরু করেন এবং ক্লে-র একটা আঘাতে প্যাটার্সন পা হড়কে পড়ে যান। চতুর্থ রাউণ্ডে ক্লে প্যাটার্সনকে প্রায় কোণঠাসা করে দেন। এর পর প্যাটার্সন তাঁর শক্তি হারালে দশম রাউণ্ড পর্যন্ত ক্লে-ই জয়ী থাকেন। দ্বাদশ বা শেষ রাউণ্ডে প্যাটার্সনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে অক্ষম বুঝে রেফারী ক্লে-কেই নক-আউটে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন। লড়াইয়ের শেষে প্যাটার্সন বলেন যে, চতুর্থ রাউণ্ডে কিডনীতে আঘাতের জন্যে তাঁর পক্ষে আক্রমণ চালানো অসম্ভব ছিল। ক্লে সারা লড়াইয়ে প্যাটার্সনকে লক্ষ্য করে বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু প্যাটার্সন সারাক্ষণ খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে শান্তভাবে একমনে লড়েছেন।

রাশিয়ান ফুটবল দল

রাশিয়ান ফুটবল দল ভারতে এসে এর ভেতর যে কটা খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন, সে কটা খেলাতেই তাঁরা বিজয়ী হয়ে ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। দিল্লির প্রথম খেলায় রাশিয়ান

।াভিয়েত ফুট এবং ভারতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়বৃন্দ।

দল ভারতের বাছাই দলকে ২—১ গোলে হারি
দ্বিতীয় খেলায় ২—০ গোলে জয়ী হন। কলকা
পারেন নি যাকে প্রকৃত গোলের সুযোগ বলা যা
ও নায়িম এবং হাফব্যাক প্রশান্ত সিংহ এবং ফ্র
অধিনায়ক ও রাইট ব্যাক্ গ্রেনভি সারসনেভে
তবু চুণী গোস্বামী দু' একবার ব্যর্থ চেষ্টার পর
তাতে একমাত্র স্যুটিং দুর্বলতা ছাড়া রাশিয়ান

ন। কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ভারতের বিরুদ্ধে রাশিয়ান দল
রাশিয়ান দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়রা এমন একটা সুযোগ সৃষ্টি করতে
তবে ভারতীয় দলের অধিনায়ক এবং স্টপার জারনেল সিং, ব্যাক অরুণ ঘোষ
।ময়ে সময়ে আক্রমণ প্রতিরোধে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। রাশিয়ান দলের
কে ফাঁকি দিয়ে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের পক্ষে আক্রমণ করা ছিল প্রায় অসম্ভব।
সুযোগেই বল মারতে চেষ্টা করেছিলেন। এই দ্বিতীয় খেলায় আমরা যা দেখেছি
।য়াড়দের সবই ছিল প্রশংসার।

গৌহাটিতে আসাম দলের বিরুদ্ধে রাশিয়ান দল ৭—গোলে, পাটনায় বিহার একাদশের বিরুদ্ধে ৩—১ গোলে এবং খড়্গপুরে ভারতীয় রেলদলের বিপক্ষে ৫—০ গোলে জিতেছে।

রাশিয়ার যে ফুটবল দলটি ভারত সফরে এসেছে এদের ভিতর শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড় বেশী নেই। ষোলটা ক্লাব থেকে উঠতি খেলোয়াড় বাছাই করে দলটি গড়া। অথচ এদের সঙ্গে আমাদের জাতীয় দলের খেলায় যে কতোটা তফাৎ তা তোমাদের মধ্যে যারা রবীন্দ্র সরোবরে এই দু-দলের ভেতর খেলা দেখেছো তাদেরই চোখে ধরা পড়েছে।

ডেভিস কাপ

বার্সিলোনার ক্লে কোর্টে ডেভিস কাপের আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যালে স্পেনের কাছে ভারতের ৩–২ খেলায় পরাজয় মোটেই অপ্রত্যাশিত ফলাফল নয়। কারণ, যে অবস্থার ভেতর ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে, তাতে ভারত এতো ভালো খেলতে পারবে এটা আশা করা যায়নি। ক্লে কোর্টে স্পেনের ম্যানুয়েল সন্তানাকে হারাবার মতন খেলোয়াড় বর্তমান পৃথিবীতে নেই। সান্তানের ডাবলসের দোসর জোস লুই আরিলা ক্লে কোর্টে সিদ্ধহস্ত। আজ পর্যন্ত কোনো ডাবলস জুটিই এই কোর্টে ওদের হারাতে পারেন নি। তবু পাঁচটা খেলার ভেতর ভারত দুটো খেলায় জিতেছে। ভারত ডাবলসের খেলায় যে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তা অনেকদিন মনে রাখবার মতন। বিশেষ করে জয়দীপ মুখার্জীর খেলা স্পেনের দর্শকদের কাছে প্রচুর প্রশংসা পায়।

প্রথম দিনের দুটো সিঙ্গলসের খেলায় দু' দেশের অবস্থা সমান থাকে, দু' দেশই জেতে একটা করে খেলায়। প্রথম খেলায় ভারত চ্যাম্পিয়ন রামনাথন কৃষ্ণন ৬-২, ৬-০ ও ৬-১ গোলে স্পেনের জুয়ান গিসবার্টকে হারিয়ে দেন। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা ভারতের জয়দীপ মুখার্জীকে ৬-০, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় দিন ডাবলসের খেলায় সান্তানা ও জোস লুই আরিলা ভারতের জয়দীপ ও প্রেমজিৎলালকে ৮-৬, ৬-২ ও ১০-৮ গেমে হারিয়ে দিলে স্পেন ২-১ খেলার জয়ে এগিয়ে থাকে। যদিও সান্তানা ও মারিলার কাছে জয়দীপ প্রেমজীৎকে স্ট্রেট সেটে হার স্বীকার করতে হয়েছে, তবু প্রথম ও তৃতীয় সেটে ভারতীয় দুই খেলোয়াড় যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা ফলাফল দেখলেই বোঝা যায়। তৃতীয় দিন দু' দেশের দুই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কৃষ্ণন ও সান্তানার খেলা দেখবার জন্যে রয়াল কোর্ট দর্শকের চাপে উপচে পড়ে। কৃষ্ণন গিমবার্টের বিরুদ্ধে যে প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, সান্তানার সঙ্গে খেলায় তার কোনো পরিচয়ই দিতে পারেন নি! সান্তানা ৬-৩, ৬-৩ ও ৬-৩ গেমের স্ট্রেট সেটে কৃষ্ণনকে হারিয়ে দিয়ে তার সেট না হারাবার রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখেন। এই খেলায় জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্পেন চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলার অধিকার লাভ করেছে।

এশিয়ান ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপ

প্রথম এশিয়ার ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপের খেলাগুলো ক'দিন আগে লখনৌতে হয়ে গেছে। এশিয়ার আটটি দেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী আটটি দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মালয়েশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে ব্যাডমিণ্টনে এশিয়ার এক নম্বর দেশ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয়। তাইল্যাণ্ড এবং ভারত যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। ডেভিস কাপের খেলার প্রথায় চারটে সিঙ্গলস এবং একটা ডাবলসের খেলায় প্রতি দেশকে এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। এর মধ্যে মালয়েশিয়া সেমি-ফাইন্যালে ভারতকে ৩ ২ খেলায় এবং ফাইন্যালে তাইল্যাণ্ডকে ৪-১ খেলায় হারিয়ে দেয়। আটটা দেশের প্রতি-যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে ভারতের উদীয়মান খেলোয়াড় দীনেশ খান্নার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতন ঘটনা।

ভারতে চেক ফুটবল টীম

রাশিয়ান ফুটবল টীম ভারতে কয়েকটি ম্যাচ খেলে যাবার পর, সম্প্রতি আবার চেকো-স্লোভাকিয়ার একটি ফুটবল টীম অষ্ট্রেলিয়া যাবার পথে, ভারতে আসবে এবং কলকাতায় দুটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে বলে স্থির হয়েছে। এই খেলার জন্য আগামী ৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারী স্থির থাকলেও, হয়ত ঐ তারিখ দুটিতে ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় খ্যাতিমান খেলোয়াড়রা ঠিক যোগ দিতে পারবেন না বলে, তারিখ দুটি পরিবর্তিত হতে পারে।

আই. এফ. এ'র কর্তৃপক্ষ ঐ তারিখ দুটি পরিবর্তনের জন্য চেকোস্লোভাকিয়ার দলকে এই কথা জানিয়েছেন যে আগামী ৫ই জানুয়ারী ডুরাণ্ড খেলা শেষ হওয়ার পর, তাঁরা কলকাতায় ৮ই বা ৯ই তারিখ দুটিতে যদি খেলার সম্মতি দেন তা হলে খুব ভাল হয়।

এখন তাঁদের সুবিধা অসুবিধার উপর এই তারিখ নির্দিষ্ট হবে বলেই মনে হয়।

অ্যানড্রোক্ল্‌স্‌ এণ্ড দি লায়ন

Androcles নামে একজন দরিদ্র ক্রীতদাস একজন অত্যাচারী রোমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পালিয়ে যায় এবং বনে গিয়ে একটি সিংহের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। সেই সময় এই সিংহটির থাবায় প্রকাণ্ড একটা কাঁটা ফুটেছিল। Androcles-সেই কাঁটাটি থাবা থেকে তুলে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর হাত থেকে সিংহকে বাঁচিয়ে দেয়। এই জন্তু ও ক্রীতদাস বন্ধুভাবে বনের মধ্যে তিন বৎসর বাস করছিল। এমন সময় একদিন পুনরায় Androcles-কে ধরে পলাতক ক্রীতদাস-রূপে রোমে আনা হয়। এবং তখনকার প্রথানুসারে তাকে বন্য জন্তুদের দ্বারা হত্যা করবার জন্যে ক্রীড়াভূমিতে আনা হয়। এই সময় একটি ক্ষুধিত সিংহ তার উপর লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখে যে, এই ব্যক্তি তার পূর্ব-পরিচিত বনের বন্ধু। ক্রীতদাসকে চিনতে পেরে সে বন্ধুর হাত চাটতে এবং আদর করতে থাকে। এই অদ্ভুত ব্যবহার দেখে Androcles-কে মুক্তি দেওয়া হয় এবং ঐ বিশ্বাসী দুই বন্ধু শহরে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকে। সেই জন্য 'Androcles and the Lion' এই প্রসিদ্ধ গল্পটি কয়েকশত বৎসর ধরে পৃথিবীতে চলে আসছে।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নাম আমরা সকলেই জানি। স্কটল্যাণ্ড দেশের রাজারা প্রাচীন ইংরাজ রাজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে লণ্ডনের Charing cross-এর কাছে একটা প্রাসাদে এসে উঠত। সেই প্রাসাদটি ও তার চারিদিকের জমিকে স্কটল্যাণ্ড বলা হ'ত। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাজা হেন্‌রী এইট্‌থ হোয়াইট হলে নিজের প্রাসাদের সঙ্গে এই জমি ও প্রাসাদকে দখলীভুক্ত করে নেন ; সেই থেকে এই জমি ও প্রাসাদকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বলা হয়। এখানে সমস্ত ইংলণ্ডের গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপিত আছে।

গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিস

বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিস ৪১২-৩২৩ খ্রীষ্টপূর্ব বৎসরে গ্রীসে বাস করতেন। কথিত আছে, এই দার্শনিক বালতি বা গামলার মধ্যে বসবাস করতেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, মানুষের সর্বসাকুল্যে বাস করার জন্য খুব সামান্য জায়গারই দরকার। তিনি ছেঁড়া কম্বল রেখে, দাড়ি রেখে এবং গামলা কাঁধে ক'রে গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে ঘুরে বেড়াতেন। এতে বেশ বোঝা যায় যে, ভালোভাবে এমনকি সাধারণভাবেও জীবনযাপন তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট তাঁকে দেখে উৎসুক হয়ে বললেন, তাঁকে যে-কোনরূপে সাহায্য করতে তিরি সম্মত আছেন। এর উত্তরে ডায়োজিনিস কেবলমাত্র বলেছিলেন—আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তুমি আলোর গতি রুদ্ধ করেছ, তুমি এখান থেকে সরে যাও। ডায়োজিনিস সম্পর্কে আরও একটা গল্প প্রচলিত আছে যা তোমাদের জানা দরকার। তিনি এথেন্স শহরে দিনের বেলায় হাতে জ্বালানো লণ্ঠন নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন এবং বলতেন, আমি একজনমাত্র সাধু ব্যক্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

জ্ঞানের কথা

আত্মমর্যাদা হারাইয়ো না, লোকে তোমাকে শ্রদ্ধা করিবে ; উদার হও, হৃদয়-জয়ের যোগ্যতা লাভ করিবে ; সত্যনিষ্ঠ হও, লোকে তোমায় বিশ্বাস করিবে ; প্রযত্নবান হও, মহৎ সিদ্ধি তুমিই লাভ করিবে ; পরের উপকার কর, তোমার কথা লোকে ঋষিবাক্যের মতন আনন্দের সহিত পালন করিবে।

* *

যে নির্বোধ অথচ অন্যের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে, দরিদ্র অথচ প্রভুত্ব ফলাইতে চায়, বর্তমান রাজ্যে বাস করে অথচ অতীত যুগের পৌরাণিক আচারের অনুষ্ঠান করিতে যায়, তাহার দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

* *

প্রকৃত সদ্ব্যক্তি বাহিরের সঙ্গে নিজেকে সহজেই মিলাইয়া লইতে পারেন ; তিনি অবস্থার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না। আরামের মধ্যে তিনি আমীর, অভাবের মধ্যে তিনি ফকির, বর্বরের দেশে তিনি সহৃদয়, বিপদের দিনে তিনি বীর।

—কংফুশিয়ো
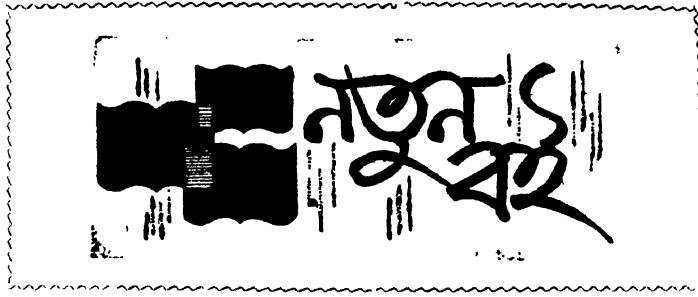
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

ভারত আমার—অমরনাথ রায়। বিদ্যা-ভারতী, ৮-সি ট্যামার লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩'০০

'ভারত আমার' সংক্ষেপে ভারতকে জানার পক্ষে ছোটদের একটি আশ্চর্যসুন্দর বই। বইটির মধ্যে চিত্রসহ ভারতের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় সুন্দরভাবে সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে। এরূপ একখানি বই হাতের কাছে সবারই থাকা উচিত। স্কুলে এমন একখানি বই পাঠ্য হলে, ছেলেমেয়েরা ভারত সম্পর্কে এ বই থেকে অনেক কিছু জ্ঞানলাভ করবে। শ্রীযুক্ত রায়ের ভাষা যেমন সরল ও পরিচ্ছন্ন, বলার ভঙ্গীটিও তেমনি হৃদয়গ্রাহী। ইউনেস্কো কর্তৃক আয়োজিত জনপ্রিয় সাহিত্য রচনার জন্য এই বইখানির লেখক অমরনাথবাবু এক হাজার একশত টাকা পুরস্কার লাভ করেছেন। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের এবং প্রচ্ছদপটটি চিত্তাকর্ষক।

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি—শিবরাম চক্রবর্তী। গ্রন্থমেলা, এ।১২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১'৮০

বইয়ের নাকরণেও শিবরামবাবুর রসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন মজাদার নাম 'ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি', তেমনি এর সব ক'টি গল্পও মজাদার। 'হাতীর সঙ্গে হাতাহাতি' এই বইয়ের আর একটি হাসির গল্প। সবসুদ্ধ সচিত্র সাতটি গল্প আছে এই বইয়ে এবং সাতটিতেই সাত মজা—যা পড়ে তোমরা সককেই লুটোপুটি খাবে।

হাসির টেক্কা—নগেন্দ্রকুমার মিত্র-মজুমদার। দ্বারকানাথ সাহিত্য সংসদ, ২৮।৪এ, বিডন রো, কলিকাতা-৬। মূল্য ১'৫০

দু'রঙে ছাপা 'হাসির টেক্কা' ছোটদের সবরকম হাসির কবিতার উপর যেন টেক্কা মেরেছে।

সুকুমার রায় ও সুনির্মল বসুর পর যে ক'জন ছোটদের হাসির কবিতা লিখে নাম করেছেন, নগেন্দ্রকুমার তাঁদেরই একজন। ছোটরা তাঁর এই কবিতাগুলি পড়ে খুবই খুশি হবে এবং তার সঙ্গে আরও খুশি হবে রেবতী-ভূষণ ও শতদল ভট্টাচার্যের রেখায় ফুটিয়ে তোলা মজাদার ছবিগুলি দেখে।

হিতোপদেশের গল্প—সুখলতা রাও। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ১·৫০

বিষ্ণুশর্মার লেখা 'হিতোপদেশের গল্প' বিশ্ববিশ্রুত। পৃথিবীর হেন ভাষা নেই, যে ভাষায় জীবজন্তুদের নিয়ে লেখা এই গল্পগুলি অনুদিত না হয়েছে। রাজা সুদর্শনের ছেলেদের এই নীতিকথার গল্পগুলি শুনিয়েছিলেন বিষ্ণুশর্মা। এ-সকল গল্প চিরকালের ছোটদের জন্যে লেখা; যারাই পড়বে তারাই উপকৃত হবে। লেখিকা সুখলতা রাও দীর্ঘদিন ধরে ছোটদের জন্যে নানা রকমের লেখা লিখে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁর হাতে এই গল্পগুলি সহজ মাধুর্যে ছোটদের মনোহরণ করবে। এই সঙ্গে ছবি আছে বিখ্যাত শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর। অফসেটে ছাপা এই রঙীন ছবিগুলিও এই বইয়ের আকর্ষণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

———

চুহুলিকা—কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়। রূপা এণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·০০

'চুহুলিকা' ভারী অদ্ভুত নাম। এ নাম অভিধানে তোমরা কেউ পাবে না। দাদু-দিদিমা ও নাতনীর মধুর সম্পর্কের মধ্যে গড়ে উঠেছে এই নাম। এই শব্দের অর্থ ও বইয়ের নামের কাহিনী গ্রন্থকার কল্যাণবাবুর 'ভূমিকা' থেকে তুলে দিচ্ছি। এ থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে বইয়ের নামের অর্থ—"একরত্তি মেয়ে—সে জন্মেছিল পশ্চিমে, যে দেশে ছোট্ট ইঁদুরকে বলে, 'চুহিয়া'। দিদিমা তাই আদর করে নাম দিলেন, 'চুহু'। দাদামশায়ের পছন্দ হ'ল না, তিনি কবিত্ব করে সেটা করলেন 'চুহুলিকা'।"

এই চুহুলিকার দাদুই হ'ল এই ছড়া ও গল্পের বইয়ের কথক, আর শ্রোতা হ'ল নাতনী চুহুলিকা। দাদুর অনেক গুণ। দাদু ছবি আঁকে, ছড়া ও গল্প লেখে। প্রেরণা যোগায় অবশ্য চুহুলিকা। কিন্তু তাহলেও, দাদুর গল্প বলার অভিনব টেকনিক্ ও মজার ছড়া তৈরির মুনশীয়ানা এবং মিলের কারসাজি তারিফ করার মত। এ বই পড়ে ও এর ছবি দেখে অনেক দাদুর হিংসে হবে, আর অনেক নাতি-নাতনীর মুখ খুশিতে ভরে যাবে। আমরা চুহুলিকার দাদুকে দেশজোড়া অসংখ্য নাতি-নাতনীর জন্যে এমন আরো অনেক বই লিখতে অনুরোধ করি। প্রকাশক রূপা কোম্পানী বইখানি ছোটদের জন্যে খুব সুন্দর করে ছেপেছেন।
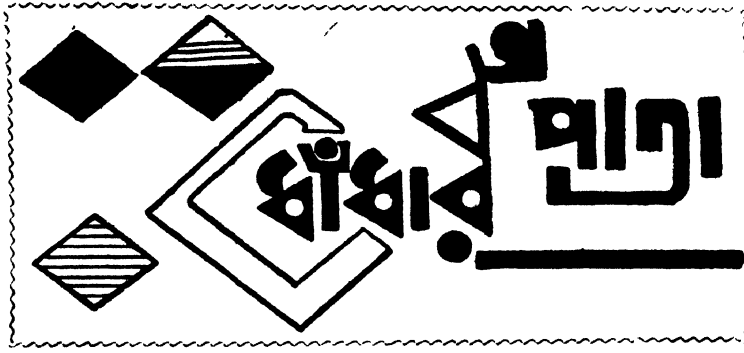
১। দ্বিজ বটে কিন্তু যজ্ঞসূত্র নাহি গলে,
নহি' ব্যোমযান, ফিরি গগন মণ্ডলে।
ভালবেসে নর মোরে রাখে কারাগারে,
শত্রুকে শুনাই নাম, 'হরে কৃষ্ণ হরে।'
শ্রীসুমিতা ভট্টাচার্য (কাশী)

২। তিন অক্ষরে নাম মোর জীবকণ্ঠে বাসা,
প্রথম ত্যজিলে আমি হই কর্মনাশা।
দ্বিতীয় ত্যজিলে পাই স্নেহ-ভালবাসা
তৃতীয় ত্যজিলে হয় আধার সে খাসা।
শ্রীঅরুণ সান্যাল (কলিকাতা)

৩। শিকারীর প্রিয় বটে গুণাক্ষরে নাম,
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে হয় তার ধাম।
দেহ মধ্যে কাটি 'দেখ নিজ দেহ' পরে
মাথাকেটে তারে হের গৃহের উপরে।
পদ তার কেটে নিলে কার যে হইবে
ভাবিয়া পায়না কেহ তারে কিবা কবে?
শ্রীজয়দেব চট্টোপাধ্যায় (রাঁচি)

৪। বিবি এল ধার করতে আর নিল না,
কি যেন কি হ'ল বিবি ভেঙে বল না।
শ্রীকরুণা বসু (রাণাঘাট)

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

গতমাসের 'অঙ্কের যাদু'র উত্তর

১। $\frac{৮৮৮৮ - ৮৮৮}{৮} = ১০০০$

৮
৮
৮
৮৮
৮৮৮
১০০০,

২। ধরো, তোমার বন্ধু ৭ সংখ্যাটি মনে করেছে। তাহলে ৭ × ৯ হ'ল ৬৩। এখন এই ৬৩ দিয়ে ১২৩৪৫৬৭৯ কে গুণ করলে কি দাঁড়ায় দেখ।

১২৩৪৫৬৭৯
৬৩
৩৭০৩৭০৩৭
৭৪০৭৪০৭৪
৭৭৭৭৭৭৭৭৭

৩। তিন-এর প্রশ্নটির উত্তর নিজে-নিজেই মিলিয়ে দেখতে পারবে।

ইংরেজী বছর শেষ হয়ে গেল। এবার আসছে ১৯৬৬--নানা বিপর্যয় ও ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে দিয়ে গেলেও—আমরা মানসিক শক্তি ও স্থৈর্যে অবিচল আছি। আশা করি—শত্রুতা-হানাহানি ও হিংসাত্মক কাজের বিরুদ্ধে আমরা এইভাবে শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়ে, প্রতিরক্ষার কাজে সহায়তা করতে পারবো। ইংরেজী নববর্ষে আমাদের কাজকর্ম লেখাপড়া হিসাবনিকাশ সবেরই সুরু—তাই আজ নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে—দেশের ও পৃথিবীর মঙ্গলকামনার প্রার্থনা রইল।

ভালমন্দ সদসৎ-এর সংমিশ্রণে মানুষ গড়ে ওঠে। সকলের মধ্যেই এই দুই-এর সংমিশ্রণ। তোমাদের কাছে কত মহাজীবনের গল্প শোনাই। এইসব মহাজীবনী থেকে কত মণিমুক্তা সংগ্রহ করি আমরা—কেমন করে একটা দুর্দান্ত দস্যুর চরিত্র বদলে গেল, আবার যার প্রতি আমাদের আস্থা বিশ্বাস—হঠাৎ একদিন দেখলাম তার রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। মহাজীবন-এর গল্প তোমরা কতই শুনলে—শুনছোও—এর মধ্যে কি তার পরিচয় পাও না?

আজ শোনো—মহাজীবন থেকে গল্প।

দিল্লীর বাদশাহের দাপটে প্রায় গোটা ভারতবর্ষ থরহরিকম্পমান। শুধু আর্যাবর্তই নয়, বিন্ধ্য পেরিয়ে বাদশাহী সাম্রাজ্যের সীমানা দক্ষিণে পাণ্ড্যরাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করেছে। তবু বাদশাহদের নিশ্চিন্ত বোধ করার উপায় নেই। তাদের মধ্যে দু'চারজন বাংলা মুলুক জয় করেছেন, তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলোর তালিকা খুঁজলে বাংলার নামও পাওয়া যাবে। কিন্তু তবু তাদের স্বস্তি নেই বাংলা মুলুক নিয়ে। নামেই শুধু বাদশাহী প্রদেশ, আসলে বাংলাদেশ প্রায় স্বাধীন। সুলতানদের মধ্যে নেহাৎ দু'একজন ছাড়া কেউই বাংলাদেশকে বাগে আনতে পারিন নি। নদী নালা খাল বিল অসংখ্য সংখ্যায় ছড়িয়ে আছে বাংলার বুক বেয়ে, বাদশাহী ফৌজের পক্ষে অনেক এলাকায় প্রবেশ করাই দুঃসাধ্য, কোনরকমে একবার ঢুকতে পারলেও নিরাপদে ফিরে আসা প্রার অসম্ভবের সামিল। তাছাড়া এখানকার অনেক অঞ্চলের

জলবায়ুও স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। আরামে বিলাসে লালিত আমীর-ওমরাহদের অনেকের পক্ষেই বাংলাদেশ অতি মারাত্মক জায়গা। দিল্লীর বেহস্ত ছেড়ে বাংলার দোজহকে আসতে তারা গররাজী। তাছাড়া রাজধানী দিল্লী থেকে বাংলা মুলুকের দূরত্ব তো বড় কম নয়! সেইজন্য বাংলা সুলতানী আমলে নামে বাদশাহী প্রদেশ বলে গণ্য হলেও আসলে বেশীর ভাগ সময়ই ছিল কার্যতর স্বাধীন। আবার এক এক সময়ে বাংলাদেশ শুধু কাজে নয় নামেও স্বাধীন রাজ্যরূপে গণ্য হবার দাবী দিল্লীর দরবার থেকে মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিল—এমনি নজীরেরও অভাব নেই।

মহম্মদ বীন তুঘলুগের রাজত্বকাল। তাঁর সময়ে দিল্লীর শাসন—ভারতের যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, অশোকের পর তা আর কোনও রাজা কী হিন্দু কী মুসলমান—কারো আমলেই হয়নি। কিন্তু এই অতি বৃহৎ সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বেশী দিন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কয়েক বছর যেতে না যেতেই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে উড়লো বিদ্রোহের পতাকা। বাদশাহ প্রাণপ্রণে চেষ্টা করেও সেই বিদ্রোহের আগুন নিভাতে পারলেন না। তার রাজত্বকাল উত্তীর্ণ হবার আগেই ভারতের বুকে পূবে, পশ্চিমে, দক্ষিণে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো কতকগুলো স্বাধীন রাজ্য। এই স্বাধীন রাজ্যগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

সে যুগে বাংলাদেশে ছু'টি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। একটি রাজ্যের রাজধানী সোনার গাঁ, আর একটির নাম লক্ষণাবতী। এই লক্ষণাবতীর প্রথম স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন আলি শাহ। তারপর রাজত্ব করলেন ইলিয়াস শাহ। ইলিয়াসের পর মসনদে অভিষিক্ত হলেন সিকন্দর। সিকন্দর বেশীদিন নিরুপদ্রবে রাজত্ব ভোগ করিতে পারেন নি। শেষ বয়সে বিদ্রোহী-পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজমশাহের হাতে তাঁর পরাজয় এবং মৃত্যু ঘটলো। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে লক্ষণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন গিয়াসউদ্দিন আজমশাহ।

পিতৃহত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত নাম গিয়াসউদ্দিন আজমশাহ। কিন্তু রাজা হবার পর তাঁর চরিত্রে দেখা গেল অভূতপূর্ব পরিবর্তন। প্রজারা যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, রাজ্যের সর্বত্র যাতে ন্যায়বিচার রক্ষিত হয়, সেই দিকে তাঁর সদা সতর্ক দৃষ্টি। যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া চলে না—তাই মাঝে মাঝেযুদ্ধ তাঁকে করতে হয়েছে বই কি, কিন্তু যখনই গুরুতর রাজকার্য কিংবা যুদ্ধবিগ্রহ থেকে অবসর পেতেন—সেই মুহূর্তগুলোকে তিনি ভরিয়ে তুলতেন সাহিত্যচর্চা করে, কাব্যরচনা করে। ফার্সী কবি হাফিজের ছিলেন তিনি পরম অনুগত ভক্ত। তাঁর সঙ্গে চলতো নিয়মিত পত্র বিনিময়। চীনের সম্রাটের সঙ্গেও চলেছিল দূত-বিনিময়। তাঁরই আগ্রহে আর পৃষ্ঠ-পোষকতায় ভিক্ষু মহারত্ন ধর্মরাজ বৌদ্ধ সংস্কৃতির দৌত্য গ্রহণ করে গিয়েছিলেন সুদূর চীনদেশে—দুর্গম দুস্তর পথ অতিক্রম করে। এই খেয়ালী সুলতানের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে একটি কাহিনী তৎকালীন যুগের ঐতিহাসিকদের রচনায় স্থানলাভ করেছে।

সুলতান একদিন আপন খেয়ালে ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করেছিলেন। রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে রাজধানীর উপকণ্ঠে উন্মুক্ত প্রান্তরে চলছিল তাঁর তীর ছোঁড়ার খেলা। হঠাৎ একটি তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লাগলো গিয়ে একটি তরুণের মাথায়। গরীব বিধবা মায়ের ছেলে। তীরের ফলাটি তার মাথার অনেকখানি ভেদ করে গিয়ে থামলো। ঝিলিক দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্তস্রোত— কিছুক্ষণের মধ্যেই বালকটি লুটিয়ে পড়লো মৃত্যুর শীতল কোলে।

পরদিন প্রবীণ কাজীর বিচার সভায় কাতারে কাতারে চলেছে লোক। আজ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং সুলতান। অভিযোগকারিণী পুত্রশোকাতুরা বিধবা মা। কাজী অভিযোগ শুনলেন। বাদশাহের তীরেই বালকটির মৃত্যু ঘটেছে এ সকর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই। তবে কাজী বুঝতে পারলেন যে, এই মৃত্যু নেহাৎই আকস্মিক দুর্ঘটনা। ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। তাই অভিযুক্ত বাদশাহকে তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। বাদশাহ প্রতিবাদ জানালেন না—মাথা পেতে নিলেন কাজীর বিচার। নির্ধারিত পরিমাণ অর্থদণ্ড দিয়ে তিনি বিচারসভা ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। বিচারকও তখন তার আসন ত্যাগ করেছেন। বাদশাহ এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে—অভিনন্দন জানালেন প্রবীণ কাজীকে। বাদশাহ বলে তিনি ন্যায়ের দণ্ডকে শিথিল করেন নি এই জন্য। কিন্তু সেই সঙ্গে বাদশাহ আরো বল্লেন : শোনো কাজী, তুমি যদি আজ আমার খাতিরে ন্যায়দণ্ড উচ্চারণ করতে ইতস্ততঃ করতে, তাহলে আমি তোমার শিরচ্ছেদ করতে একটুও দ্বিধা করতাম না।

কুর্নিশ করে কাজী জানালেন : "হুজুর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, কিন্তু বিচারাসনে আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ সেই আসনের অমর্যাদা করতে কেউ যদি দুঃসাহস করে, তবে আমার হাতে তার রেহাই নেই। দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করার সময় আমিও এই সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলাম, যে আপনি যদি অর্থদণ্ড দিতে অস্বীকৃত হতেন, তাহলে আমার আদেশে এই চাবুক আপনার পৃষ্ঠদেশকে আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করতো না।"

কাজীকে আলিঙ্গন করে বাদশাহ জানালেন তার সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

তোমাদের সকলের চিঠি পেয়েছি। সকলের জন্য ভালবাসা রইল।

ইতি—তোমাদের

মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০'৪৫ পয়সা

পরলোকে প্রধানমন্ত্রী

(জন্মঃ ২রা অক্টোবর, ১৯০৪ মৃত্যুঃ ১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৬)

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৪৬শ বর্ষ] মাঘ : ১৩৭২ [১০ম সংখ্যা

খোকার চিঠি

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

লিখছে চিঠি খোকন।
বাবার ইজিচেয়ারটিতে ব'সে
ধরে মায়ের ঝর্ণা-কলম ক'সে
লিখছে চিঠি একান্ত-মন।
লিখছে চিঠি খোকন।

লিখছে চিঠি কাকে ?
নিয়ে মায়ের ঝর্ণা-কলম বসে বাবার ইজি-
চেয়ারটিতে দাদার খাতায় লিখছে হিজিবিজি
কত যে কী খোকন।
লিখছে বুঝি মাকে ?

মা শুধালেন, কাকে খোকন
তখন থেকে লিখছো তুমি অমন—
লিখছো বলো কাকে ?

বলল খোকন—লিখছি আমাকেই।
জবাব শুনে মা বুঝি তার
অবাক হয়েই থাকেন !

'কী লিখছো, বলো একটিবার,
বলো শুনি খোকন ?
বলবে নাকি মাকে ?'

চিঠি তো মা, লিখছি আমি এখন—
এখনো তো পাইনি চিঠি আমার
আজ সকালের ডাকে ॥

খুকুর কান্না

শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়দার পেন নিয়ে খুকু লেখে খত্
মনের ভাষায় ছাপ হিজিবিজি গৎ।
তাই দেখে দাদা বকে, বোন ধমকায় :
'ভাঙবি কলমখানা সন্দেহ নাই,
ফেলছ নিতুই দেখি যা পাও তাই।

ফের যদি দেখি তবে ভেঙে দেবো হাড়।'
খুকুমণি ভ্যাবাচ্যাকা থাকে নিঃসাড়।
ভাবে তার দোষ কোথা মাকে চিঠি দিলে—
মারধোর বকাঝকা করে সবে মিলে ;

আসতে লিখবো মা-কে কতদিন পর,
মা'মণি তো এলে দেবে সবারে আদর।
তবু এরা বোঝেনাকো কি করে বোঝাই,
খুকুমণি ফুলে ফুলে কেঁদে চলে তাই।

ব্রোঞ্জের বরাহ

ধীরেন্দ্রলাল ধর

ছবির মত শহর ফ্লোরেন্স। সেখানে বাজারের সামনে পথের চৌমাথায় একটি দস্তার মূর্তি আছে। একটা বন্য-বরাহের মূর্তি। অনেক দিনের পুরানো মূর্তি, ঝক্‌ঝকে শাদা থেকে এখন সবুজ হয়ে এসেছে। কিন্তু তার দাঁত দুটি এখনও শাদা ঝক্‌ঝকে আছে। কারণ যে আসে সেই ওই দাঁত দুটি ধরে। এই বরাহের মুখ থেকে জল বেরোয়, আসলে এটি একটি রাস্তার কল। বরাহের দাঁত দুটি ধরে পথিকেরা ঝুঁকে পড়ে কলের জল পান করে। শহরের সবাই এখানে বাজার করতে আসে, চৌমাথার এই বরাহ মূর্তি সবাইকারই চেনা।

চৌমাথার কাছেই রাজবাড়ী। রাজবাড়ীর সামনে গোলাপবাগ। শীতের দিনে বাগান ফুলে ফুলে লাল হয়ে আছে। একটি ছেলে সেই বাগানের একপাশে বসে ফুলগুলির পানে তাকিয়ে হাসছিল। ছেলেটির পরনের জামাকাপড় ছেঁড়া, ময়লা, সারাদিন বেচারার কিছু খাওয়াও জোটেনি।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। শীতের হাওয়া বইতে সুরু করলো। বাগানের মালী এসে ছেলেটিকে বের করে দিয়ে ফটক বন্ধ করে দিল। ছেলেটি ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো নদীর ধারে। এক-আকাশ তারার ছায়া চিক্‌চিক্ করছে জলে। ছেলেটি তাকিয়ে রইল সেই দিকে অনেকক্ষণ। তারপর ফিরে এলো পথের চৌমাথায়। বন্য-বরাহের দাঁত দুটি দু-হাতে ধরে সে ঝুঁকে পড়লো জল পান করতে। আকণ্ঠ জল খেয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। পথ তখন বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। পথে কোন লোককে দেখা গেল না। ছেলেটি বরাহের পানে তাকিয়ে রইল চুপ করে। তারপর কোন এক সময় তার পিঠের উপর চড়ে বসলো। দু-হাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরলো। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লো।

রাত গভীর হলো। বরাহ-মূর্তি যেন জেগে উঠলো। ধীরে ধীরে বললো—খোকা, আমাকে চেপে ধরো, আমি এবার দৌড়বো।

ব্রোঞ্জের বরাহ এক লাফে দৌড়াতে সুরু করলো। বরাবর বরাহ এসে ঢুকলো রাজবাড়ীর মধ্যে। বড় বড় সব ব্রোঞ্জের মূর্তি। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা ব্রোঞ্জের ঘোড়া তাকে দেখে ঘাড় বেঁকিয়ে ডেকে উঠলো। বরাহ বললো—চল, এবার দোতলায় যাই।

দোতলায় ছবি-ঘর। দেয়ালের গায় বড় বড় সব ছবি টাঙানো। মাঝে মাঝে পাথরের মূর্তি। একপাশে একটি ভেনাস-দেবীর মূর্তি, মস্ত নামকরা ভাস্কর মেডিচি এটি খোদাই করেছেন।

দেবী তাকিয়ে আছেন তাদের পানে, পায়ের কাছে উড়ছে পরী। তার পাশে আরেক মূর্তি। একটি লোক পাথরের উপর একখানি তালোয়ারে শান দিচ্ছে। তারপর একসঙ্গে তলোয়ার-ধারী অসি-যোদ্ধার একটি দল। এই বুঝি তাদের খেলা সুরু হলো। সবাই যেন জীবন্ত।

ঘরের পর ঘর তারা পার হয়ে যায়। বরাহ এক-একখানি ছবির সামনে এসে দাঁড়ায়। রাতের অন্ধকারেও ছবিগুলি দেখতে ছেলেটির কোন কষ্ট হয় না। এসব ছবি সে দিনের আলোয় অনেকবার দেখেছে। ওই যে যীশুর ছবি, ছোট দুটি ছেলে যীশুর পানে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তারা স্বর্গে যাবে।

সব কিছু দেখে শেষ করে বরাহ বললো—চলো, এবার তোমায় নিয়ে যাই, আরেক জায়গায়। ভালো ছেলে আমার পিঠে চড়লে আমি রাতের বেলা দিব্যি দৌড়াতে পারি। নইলে আমাকে পুতুল হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ওই চৌমাথার মোড়ে।

বরাহ এক দৌড়ে এসে দাঁড়ালো এক গির্জার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে গির্জার ফটক খুলে গেল। আলো এসে পড়লো চারিপাশে। সামনের প্রাঙ্গণে গ্যালিলিওর সমাধি। আকাশের অনেক খবর তিনি জানতেন। বলেছিলেন, পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারিপাশে, কেউ সে কথা মানেনি, তাকে পাগল বলে জেলখানায় বন্ধ করে রেখেছিল। তারই সামনে মাইকেল এ্যানজেলোর কবর। জগৎ-জোড়া নাম ছিল এই শিল্পীর। তিনটি মূর্তি তাঁর কবরের উপর—ভাস্কর, পটুয়া ও স্থপতি। তারপরেই দান্তে। মহাকবি দান্তে। মাথায় লরেল পাতার মুকুট। সামনে গির্জার উপাসনা-ঘর থেকে ধূপের গন্ধ ভেসে আসছে। জানালার লাল নীল কাঁচে আলো পড়ে চুনী-পান্নার মতো ঝল্‌মল করছে। বাজনার একটা মিষ্টি সুর ভেসে আসছে। বরাহ থমকে দাঁড়ালো সেখানে। তারপরেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস তাকে চমকে দিল; সে দৌড় দিল সেখান থেকে।

ছেলেটিও চমকে জেগে উঠলো। চোখ মেলে দেখে, সকাল হয়ে গেছে। সেই পুরানো চৌমাথার মোড়ে ব্রোঞ্জের বরাহ দাঁড়িয়ে আছে। সে বসে আছে তার পিঠের উপর।

এক লাফে নেমে পড়ে সে ছুটলো বাড়ীর দিকে। মা তাকে পাঠিয়েছিল পথে কিছু ভিক্ষে করতে। কিন্তু কাল ভিক্ষা করে সে তো একটা পয়সাও পায়নি।

বস্তির এক সরু গলি। তারই মাঝে পর পর ভাঙাচোরা বাড়ী। একটি বাড়ীর এক ভাঙা দরজা খোলাই ছিল, ছেলেটি ঢুকে পড়লো; বরাবর সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল দোতলায়। ভাঙাচোরা বারান্দা, মাঝে মাঝে ছেঁড়া চটের পর্দা ঝুলানো আছে। সমস্ত বারান্দাটা জলে সপ্‌সপ্‌ করছে। উঠানের কুয়াতলা থেকে এক-একজন বালতি করে জল নিয়ে যাচ্ছে, জল চলকে পড়ছে বারান্দায়। ছেড়া জামা গায় কারখানার মজুর গোছের দুটি লোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ছেলেটিকে

ধাক্কা দিয়ে। ছেলেটি এসে দাঁড়ালো একটি ঘরের সামনে। এক রমণী ঘরের ভিতর ছিল, ছেলেটিকে দেখেই বললো—কত পয়সা এনেছিস্ ?

—এক পয়সাও না। কেউ দিলে না।—ছেলেটি বললো।

ঘরের ভিতর একখানি সরায় কাঠকয়লা জ্বলছিল, ঘরখানা গরম রাখার জন্য। রমণী সেই আগুনে হাত সেঁকতে সেঁকতে বললো—পয়সা দেয়নি ? মিছে কথা। পয়সা কি করেছিস সত্যি করে বল্ ?

—সত্যি বলছি মা, পয়সা কেউ দেয়নি।

ছেলেটি আগুনের ধারে বসতে গেল, মা এক লাথি মেরে তাকে ফেলে দিল, বললো—যা, দূর হয়ে যা। কেন এলি মরতে ?

ছেলেটি কেঁদে ফেললো।

মা চীৎকার করে উঠলো—যা যা, বেরো, দূর—দূর।

পাশের ঘর থেকে আরেক রমণী এলো, বললো—কি হলো, সক্কাল বেলাই ছেলেটাকে ঠেঙাতে সুরু করলি ?

—বেশ করছি, আমার ছেলেকে আমি মারছি, তোর কি ?

—আহাঃ, ছেলেমানুষ।

—আর দরদে দরকার নেই, ওকে আমি আজ খুন করে ফেলবো।

মা আবার ছেলেকে লাথি মারতে গেল। পাশের ঘরের মহিলাটি বাধা দিতে গেল, পা লেগে আগুনের সরাটি উল্টে গিয়ে ঘরময় আগুন ছড়িয়ে পড়লো। ছেলেটি ঘর থেকে দৌড় দিল।

ছেলেটি বরাবর এলো আবার সেই চৌমাথায়। সেই বড় গির্জাটির সামনে। পাশের কবরখানায় ঢুকে একটি কবরের পাশে বসে সে কাঁদতে লাগলো।

বেলা বাড়ে। কত মানুষ গির্জায় এলো, চলে গেল, ছেলেটির দিকে ভাল করে কেউ তাকালো না।

শেষে এক বুড়ো তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। বললো—কি রে খোকা, এখানে বসে কাঁদছিস কেন ?

—এমনি।

—থাকিস কোথায় ?

—ওদিকের বস্তিতে।

—কাল সারাদিন তুই রাজবাড়ীর বাগানে বসেছিলি না ?

কথায় কথায় বুড়ো ছেলেটার সব কথাই জেনে নেয়। বলে—কিছু খাবি তো চল্ আমার বাড়ী।

বুড়ো তাকে বাড়ী নিয়ে যায়। বাড়ীতে বুড়ো আর বুড়ী, আর একটা পোষা কুকুর। তারা দস্তানা (হাত-মোজা) তৈরী করে বাজারে বেচে। বুড়ো-বুড়ী ছেলেটিকে যত্ন করে খেতে দিল, বললো—তুই থাক্ এখানে। মোজা তৈরী করতে শেখ, পরে দু' পয়সা রোজগার করতে পারবি।

ছেলেটি সেখানেই রয়ে গেল। বুড়ী তাকে মোজা সেলাই করতে শেখায়। অবকাশ পেলেই বুড়ীর কুকুরটাকে নিয়ে সে খেলা করে। বুড়ীর বড় সখের জাপানী কুকুর। এক গা লোম। ছোট্ট এতটুকু।

দিন যায়। পাশের বাড়ীতে থাকে এক পটুয়া। বসে বসে সে ছবি আঁকে। একদিন সকালে আঁকবার জন্য সে বেরুচ্ছে, সঙ্গে ইজেল, রঙের বাক্স, কাগজ—কত কি! বললো—খোকা, এগুলো নিয়ে একটু চল না, আমার সঙ্গে।

বুড়ী বললো—যাও।

ছেলেটি রঙের বাক্সটি নিয়ে চললো।

পটুয়া বরাবর এলো রাজবাড়ীতে। দোতলায় উঠে সেই ছবি-ঘর। যীশুর একখানি ছবির সামনে পটুয়া সব কিছু রাখলো, বললো—তুই এবার যা।

ছেলেটি বললো—আমি ছবি আঁকা দেখবো।

আমি এখনি আঁকবো না, আগে সব সাজিয়ে গুছিয়ে বসি। তুই বাড়ী যা।

ছেলেটি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বাড়ী ফিরে এলো, কিন্তু সারাদিন ঘরে তার মন বসে না, কেবলই ছবি-ঘরের ছবিগুলোর কথা মনে পড়ে। বিকাল বেলা কাউকে কিছু না বলেই সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। চৌমাথার বন্য-বরাহ মূর্তিটার সামনে এসে দাঁড়ায়, তার দাঁত দুটি ধরে বলে, সেদিন তুমি আমাকে ছবি-ঘর দেখিয়েছিলে, আজ রাতে আবার সেখানে যাবো, বুঝলে?

বরাহ কোন জবাব দেয় না।

হঠাৎ পায়ের কাছে নরম কি লাগে। আ রে, এ যে বিলু। তুই এখানে এলি কখন?

বিলু বুড়ীর পোষা জাপানী কুকুর। বুড়ী তাকে কখনও পথে বেরুতে দেয় না।

ছেলেটি তাড়াতাড়ি বিলুকে কোলে নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

সামনেই দু'জন পাহারাওয়ালা। একজন তাকে ধরে ফেললো, বললো কুকুর নিয়ে ছুটছ কোথায়? কার কুকুর? চুরি করেছ বুঝি?

—আমাদের কুকুর।

—তোমাদের কুকুর? বেশ বাড়ীতে গিয়ে বল গে, তোমার বাবা থানায় এসে কুকুর নিয়ে যাবে।

পাহারাওয়ালা কুকুর নিয়ে চলে গেল।

বাড়ী এসেই সে বুড়ীকে বললো, বিলুকে পুলিশে থানায় নিয়ে গেছে।

বুড়ী চমকে উঠলো, বললো—এ তাহলে তোরই কাজ, বিলু তো পথে বেরোয় না।

বুড়ো থানায় ছুটলো কুকুর আনতে। বুড়ী ছেলেটিকে বকাবকি সুরু করলো। পটুয়া ছবি আঁকা শেষ করে বাড়ী ফিরছিল, সেও শুনলো সব কথা।

সেই থেকে পটুয়ার সঙ্গে ছেলেটির ভাব হয়ে গেল। বললো—আমি তোকে শিখিয়ে দোব ছবি আঁকতে।

ছেলেটিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে কাগজ পেনসিল দিয়ে পটুয়া বলে—কি ছবি আঁকাবে বলো?

—ওই চৌমাথার কলের জলের বন্য-বরাহটিকে আগে আঁকবো।

—বেশ।

পটুয়া তার হাত ধরে ছবি আঁকতে সুরু করে দেয়। দেখতে দেখতে কাগজের উপর অবিকল সেই বরাহমূর্তি ফুটে ওঠে। ছেলেটি বলে—তবে যে তুমি দেখে দেখে আঁকো?

—অনেকবার দেখা থাকলে মন থেকেও আঁকা যায়।

কাগজ পেনসিল নিয়ে ছেলেটি ঘরে থাকে, বিলুকে সামনে বসিয়ে কাগজে দাগ কাটে। বিলুর একখানা ছবি সে আঁকবে।

ছবি এঁকে সে পটুয়াকে দেখায়, বলে—আমার তো হয় না?

পটুয়া হেসে বলে—একদিনে কি হবে? আঁকতে আঁকতে হবে।

বিলুটা বড় ছটফট করে। ওকে ঠিকমত দাঁড় করিয়ে রাখলে ঠিকমত আঁকা যায়। বিলুর গলা, পা, লেজ সে দড়ি দিয়ে বাঁধে, যাতে সে নড়তে-চড়তে না পারে। তারপর বসে ছবি আঁকতে।

এক সময় পাশের ঘর থেকে বুড়ী এসে পড়ে। ব্যাপার দেখে সে আগুন হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি বিলুকে কোলে তুলে নিয়ে দড়িগুলো কেটে দেয়, বলে—হতভাগা ছেলে, কুকুরটাকে মারবার ফন্দী করেছিস্। বেরো আমার বাড়ী থেকে, দূর হয়ে যা—

বুড়ী ছেলেটিকে লাথি মেরে বাড়ী থেকে বের করে দিলে।

পটুয়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলো সব কিছু।

দিন যায়। কতদিন পরে শহরে এক ছবির প্রদর্শনী হয়। দু'খানি ছবি সকলের নজরে পড়ে। পাশাপাশি। এক কুকুরকে সামনে রেখে আট দশ বছরের একটি ছেলে ছবি আঁকছে। সবাই বলছে, এই ছেলেটিই নাকি পরে খুব নামকরা শিল্পী হয়েছিল।
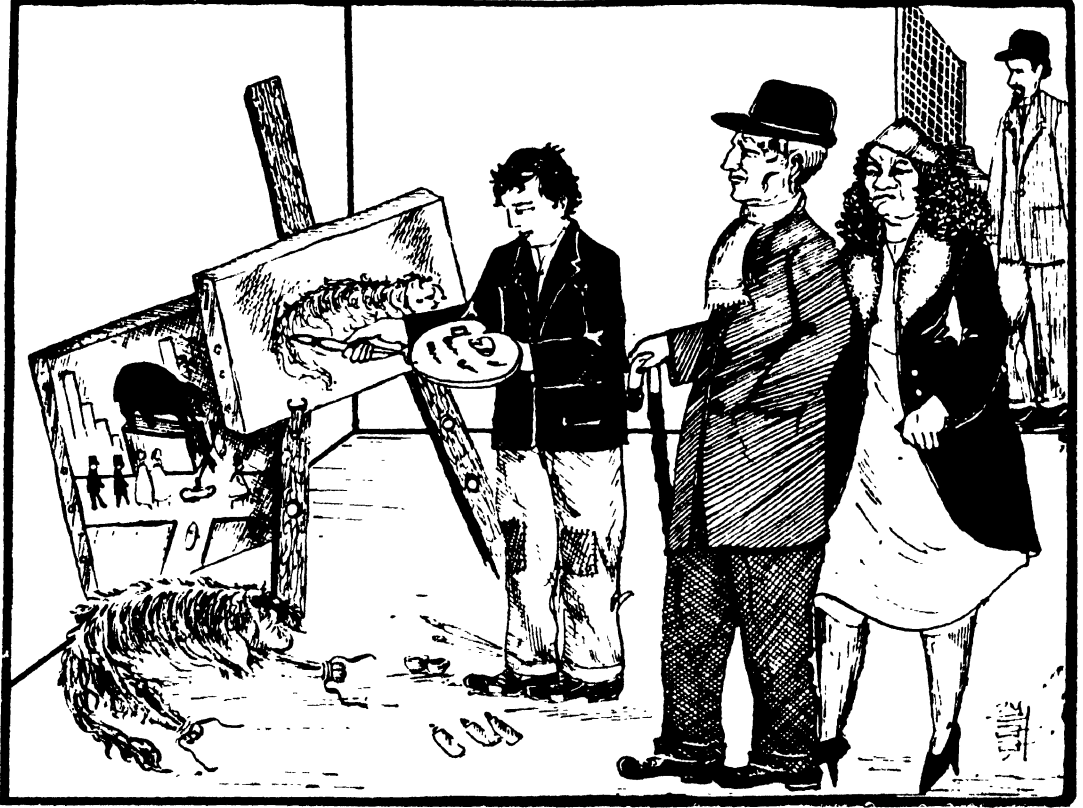
পাশের ছবিখানিতে সেই ছেলেটিই পথের চৌমাথায় বন্য-বরাহ মূর্তিটার গলা জড়িয়ে ধরে পথের উপর পড়ে আছে। প্রভাতী রোদ এসে পড়েছে তার মুখের উপর। ছবির নীচে লেখা আছে—শিল্পীর মৃত্যু।*

* হ্যান্‌স্ এণ্ডারসেন।

পুত্রের ভরণপোষণ করার জন্য পুত্রের প্রতি জননীর অধিক প্রীতি ও স্নেহ জন্মে, এদিকে আবার পিতারই পুত্রের উপর সম্পূর্ণ অধিকার। কারণ পিতার মধ্যে সকল দেবতাই অধিষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু এদিকে আবার জননীতে দেবতা ও মনুষ্য উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং পিতা কেবল পারলৌকিক শুভদাতা, কিন্তু মাতা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শুভ প্রদান করিয়া থাকেন।

মহাভারত—শান্তিপর্ব

রহস্যময় গ্রহ মঙ্গল

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

মঙ্গলগ্রহে কি কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী বাস করে? মঙ্গলের খালগুলো কি সত্যিই খাল? ওগুলো কি মঙ্গল মানুষের হাতে গড়া না প্রকৃতির সৃষ্টি?

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ মানুষের মনে এই প্রশ্নগুলো বার বার উঁকি দিয়েছে, কিন্তু বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির পরও এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি।

প্রথম প্রশ্নটা নিয়েই আলোচনা করা যাক।

মধ্যযুগের বিজ্ঞানী গিওর্ডানো ব্রুনো-ই সর্বপ্রথম বললেন যে, এই বিপুল মহাবিশ্বে আমাদের পৃথিবীর মতোই প্রাণীবহুল বহু "পৃথিবী" আছে।

সত্যভাষণে বিপদ আছে। তাই ১৬০০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রোমে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারাকে কেউ ধ্বংস করতে পারেনি, তাঁর এই দুঃসাহসিক মতবাদ যুগে যুগে বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে।

বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে যতো তর্ক-বিতর্কই হোক না, যে ধরনের জীবনের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার উদ্ভব, স্থিতি আর বিকাশের জন্য মোটামুটি যে ক'টি প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রয়োজন, সে বিষয়ে সব বিজ্ঞানীই একমত।

প্রথমতঃ চাই এমন তাপ যা +১০০° সেন্টিগ্রেড আর—১০০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

জীবকোষের পুষ্টি আর বিকাশের জন্য চাই কার্বন।

জীবকোষের দহনের জন্য চাই অক্সিজেন।

আর চাই জল ও বিষাক্ত গ্যাসমুক্ত আবহাওয়া।

যে কোনো গ্রহেই এক সঙ্গে এতগুলি চাহিদা পূরণ হওয়া নিশ্চয়ই কঠিন, কিন্তু কোটি কোটি তারকা ও তাদের গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে গড়া বিপুল মহাবিশ্বে বহু শত আলোক বর্ষ দূরে থাকা কিছু গ্রহ বা তারায় যে এই কটি অবস্থার উদ্ভব হয়নি এ কথা জোর করে বলা যায় না। হয়তো মহাকাশ বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এমন একদিন আসবে, যে দিন পৃথিবীর মানুষ তার সন্ধান পাবে।

এবার আমাদের জানা চেনা সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহে এই অবস্থাগুলি বর্তমান কিনা তা বিচার করে দেখা যাক।

শনি, বৃহস্পতি, ইউরেনাস ও নেপচুনের মতো বিশালকায় গ্রহদের হিসেবের বাইরেই রাখছি। কারণ এই গ্রহগুলো চির-তুষারে ঢাকা, এদের বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত গ্যাসে ভরা। সৌরজগতের শেষ সীমায় আছে প্লুটো,—সূর্য থেকে চার আলোক ঘণ্টা দূরে। চিরন্তন রাত্রির দেশ এই প্লুটোতে জীবনের আবির্ভাব কখনোই হবে না। সূর্যের সব চেয়ে কাছের গ্রহ বুধে আবহাওয়া নেই বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তবে এ মতবাদ তর্কাতীত নয়। বুধের একটা পিঠ সব সময়েই সূর্যের দিকে ফেরানো বলে, সে পিঠে প্রচণ্ড উত্তাপ আর চির অন্ধকার; অন্য পিঠে আছে মহাজাগতিক শৈত্য।

বাকী থাকে পৃথিবী, শুক্র আর মঙ্গলগ্রহ। শুক্র আর মঙ্গলগ্রহে জীবন বিকাশের অনুকূল পরিবেশ আছে বলে বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন।

শুক্রগ্রহের আবহাওয়া যে কি কি উপাদানে গঠিত তা সঠিক জানা যায়নি, কারণ এই গ্রহের চারপাশে আছে চিরন্তন মেঘমালার ঘন বেষ্টনী। নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে, শুক্রগ্রহের বয়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরে, বিষাক্ত গ্যাসের অস্তিত্বের কথা জানা গেছে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড-এর পরিমাণও খুব বেশী বলে মানুষ বা অনুরূপ প্রাণীর জীবন ধারণের পক্ষে প্রতিকূল হলেও, নিম্নস্তরের উদ্ভিদের বিকাশের পক্ষে অনুকূল।

বাকী থাকে পৃথিবীর অন্যতম প্রতিবেশী মঙ্গলগ্রহ।

মঙ্গলের আয়তন পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক। সূর্য থেকে পৃথিবী যতো দূরে, সূর্য থেকে মঙ্গল প্রায় তার দেড়গুণ দূরে আছে। নিজের চারদিকে একবার পাক খেতে মঙ্গলের লাগে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট। মঙ্গলের অক্ষদণ্ড তার আয়নবৃত্তের তলের সঙ্গে পৃথিবীর অনুরূপ কোণ রচনা করেছে বলে মঙ্গলেও বিভিন্ন ঋতুর সঞ্চার হয়। পৃথিবীর মতোই মঙ্গলেও আবহমণ্ডল আছে এবং সেখানে কোনো বিষাক্ত গ্যাস নেই। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে, মঙ্গলেরও প্রায় তাই আছে, কিন্তু অক্সিজেন আছে পৃথিবীর অক্সিজেনের শতকরা একভাগ মাত্র। মঙ্গলের আবহাওয়া তীব্র ও কঠোর।

পৃথিবী ও মঙ্গলের জন্মলগ্ন একই সূত্রে বাঁধা, তাই জ্বলন্ত আগুনে গোলা থেকে ঠাণ্ডা হতে হতে পৃথিবী যে সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে, মঙ্গলের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে।

মহাকাশে সঞ্চরণশীল গ্রহগুলো যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, তখন অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের যৌগিক মিলনে বিশাল জলরাশীর সৃষ্টি হয়েছিল, জন্ম হয়েছিল মহাসাগরগুলির, কিন্তু পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপের ফলে সেই জল থেকে বিপুল পরিমাণে বাষ্প হতে থাকে, সেই বাষ্প মেঘ হয়ে

অবিরাম বর্ষণ নিয়ে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতো। অন্য গ্রহেও তাই ঘটেছিল বলে মনে হয়। পৃথিবীর কার্বনিফেরাস যুগে মহাসাগরে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হয়, কাজেই অনুরূপ অবস্থায় মঙ্গলেও তা হওয়া বিচিত্র নয়।

এই যুগ পর্যন্ত মঙ্গল পৃথিবীর সঙ্গে বেশ তাল রেখে চলছিল, কিন্তু এর পরবর্তীকালে তাদের পথ হয়ে গেল আলাদা। দুর্ভেদ্য মেঘমালা কেটে গেলেও, পৃথিবী তার অধিকতর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে তার বায়ুমণ্ডল ও জলীয় বাষ্পকে মহাশূন্যে বিলীন হতে দিল না, কিন্তু মঙ্গলের আকর্ষণী শক্তি কম বলে, দুর্ভেদ্য মেঘাবরণ অপসৃত হলে, হালকা গ্যাসগুলো মঙ্গলের মায়া কাটিয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল—মহাসাগরের জলও বাষ্প হয়ে মহাজনের পন্থা অনুসরণ করল। এই ভাবে মঙ্গলে অক্সিজেন কমে গেল এবং সে একটি প্রায় জলশূন্য গ্রহে পরিণত হ'ল।

মঙ্গলগ্রহে কতগুলি সুবিস্তৃত কালো কলঙ্ক-রেখা দেখা যায়। আগে এগুলোকে সমুদ্র বলে অনুমান করা হ'ত, কিন্তু ওপরের ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোনো এক সময়ে মঙ্গলে সমুদ্রের অস্তিত্ব থাকলেও আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। তবে মঙ্গলগ্রহের উভয় মেরুতে পর্যায়ক্রমে যে সাদা পদার্থ জমতে দেখা যায়, আলোকরশ্মির প্রতিফলনসূত্রে তাকে পার্থিব তুষারের সমগোত্রিয় বলেই মনে হয়। এমন কি, বিভিন্ন ঋতুতে সূর্যের কাছে আসা বা তার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে এই তুষারের সাদা টুপির আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তুষারের এই পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মঙ্গলের বাতাবরণে এখনও যে সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে, তাই শীতঋতুতে মেরুঅঞ্চলে তুষার হয়ে জমে যায়। এই তুষার প্রায় চার ইঞ্চি পুরু। গ্রীষ্মঋতুতে এই তুষার যখন গলে যায়, তখন সেই তুষার-গলা জল পর্যায়ক্রমে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়।

প্রখ্যাত সোভিয়েৎ বৈজ্ঞানিক তিখভ্ ফিলটারের সাহায্যে বিভিন্ন ঋতুতে মঙ্গলের অনেকগুলি ফটোগ্রাফ তোলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, মঙ্গলগ্রহের যে সব অঞ্চলকে আগে সমুদ্র বলে মনে হ'ত, সেই অঞ্চলগুলো বিভিন্ন ঋতুতে বর্ণ পরিবর্তন করে থাকে। বসন্তকালে এর রং হয় সবুজাভ নীল, গ্রীষ্মকালে তা পরিবর্তিত হয় হাল্কা বাদামীতে, শীতকালে তার রং হয় গাঢ় পিঙ্গল। তিনি মঙ্গলের এই বর্ণ পরিবর্তনের সঙ্গে পৃথিবীর সাইবেরিয়া অঞ্চলের সাদৃশ্য দেখতে পেলেন। মঙ্গলের অন্যান্য ভূভাগের রং সারা বছর ধরেই লালচে বাদামী থাকে, তার সঙ্গে পৃথিবীর মরুভূমি অঞ্চলের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

বিভিন্ন ঋতুতে মঙ্গলের এই বর্ণ পরিবর্তনের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আছে, কারণ তা মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

এই সব ব্যাপার বিশ্লেষণ করে তিখভ্ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, পৃথিবী ও মঙ্গলে একই ধরনের বিবর্তন দেখা দিয়েছে যার ফলে মঙ্গলেও বুদ্ধিমান ও মননশীল প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে।

এবার মঙ্গলের খালের কথায় আসা যাক। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী শিয়াপেরেলী সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, মঙ্গলের সমগ্র ভূভাগ লম্বা লম্বা সরু সরল রেখায় ভরা। তিনি অনুমান করেন যে, সেখানে নিশ্চয়ই মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী বাস করে, এবং জলসেচের জন্য সেখানকার ইঞ্জিনীয়াররা খালগুলি কেটেছেন।

কিন্তু তাঁর এ মতবাদ পরবর্তীকালে গ্রাহ্য হয়নি।

মঙ্গলে প্রাণী আছে কিনা এ বিষয়ে আজীবন তথ্য সংগ্রহ করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী লাউএল। তিনি আরিজোনা মরুভূমিতে এক মানমন্দির স্থাপন করে মঙ্গলগ্রহে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তিনি কিন্তু মোটামুটিভাবে শিয়াপেরেলীর মতবাদ সমর্থন করেন।

লাউএল মঙ্গলগ্রহে দু'ধরনের খাল আছে লক্ষ্য করলেন। কতগুলি খাল দক্ষিণ মেরু থেকে উত্তর দিকে প্রসারিত, আর কতগুলি খাল উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত। লাউএল আরও লক্ষ্য করলেন যে, দুই শ্রেণীর খাল একই সঙ্গে একই সময়ে দেখা যায় না। যে ঋতুতে উত্তর মেরুতে বরফ গলে, তখন দৃশ্যমান হয়ে ওঠে দক্ষিণ মুখি খাল, সে সময়ে উত্তর মুখি খাল থাকে অদৃশ্য। পরবর্তীকালে আবার এর উল্টো ব্যাপারটাই চোখে পড়ে।

এসব ব্যাপার থেকে লাউএল এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, জলসেচের জন্য মঙ্গল-মানুষ-ইঞ্জিনীয়াররাই এই খালগুলো সৃষ্টি করেছেন, এবং ওই দুই মেরু অঞ্চলে বিশাল বিশাল পাম্পিং স্টেশন আছে। ঐ সব শক্তিশালী পাম্পের সাহায্যে মেরু প্রদেশের বরফ-গলা জল গোটা মঙ্গলের ভূভাগে ছড়িয়ে পড়ে। লাউএল অনুমান করলেন যে, ওই পাম্পিং স্টেশন নায়েগ্রা জলপ্রপাতের চেয়ে ৪০০০ গুণ বেশী শক্তিশালী। তুষার গলার সময়ে খাল দিয়ে যখন জল প্রবাহিত হতে থাকে, তখন তা মাত্র ৫২ দিনে মঙ্গলের ৪২৫০ কিলোমিটার ভূমি অতিক্রম করে।

লাউএল-এর মতে উত্তর বা দক্ষিণ বাহিনী খালগুলো যেখানে পূব-পশ্চিম বাহিনী খালগুলোকে অতিক্রম করেছে, সেই সব সঙ্গমস্থলে মঙ্গল-মানুষেরা শহর ও বন্দর তৈরী করেছে।

১৯২৪ সালে মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পড়েছিল, তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ত্রেমিলার মঙ্গলের খালের প্রায় এক হাজার ফটো তোলেন ও খালগুলোর অস্তিত্বের অভ্রান্ত প্রমাণ পান। এই সময়ে একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলেন তিনি। বিভিন্ন ঋতুতে মঙ্গলের বিশেষ বিশেষ স্থানে উদ্ভিদপূর্ণ বনাঞ্চলের যে ধরনের বর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে, খালগুলিতেও অবিকল সেই ধরনের বর্ণ পরিবর্তন হয়ে থাকে।

খালগুলি চওড়ায় প্রায় ১০০ থেকে ৬০০ কিলোমিটার। এই বিপুল আয়তন লক্ষ্য করে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, খালগুলি আসলে খাল নয়, উত্তর ও দক্ষিণের বনাঞ্চলেরই সম্প্রসারণ মাত্র। বরফ-গলা জল খাল দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে, ভূগর্ভে প্রোথিত বিপুল পাইপ লাইনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়, এবং সেই জলধারাতেই পুষ্ট হয়ে ওঠে এই সব উদ্ভিদ। এই সব পাইপ লাইনের গায়ে, নিয়মিত দূরত্বে, বড় বড় কুয়ার মতো ফুটো আছে, সেই কুয়া দিয়ে জল উঠে আসে ওপরে। মঙ্গলে বৃষ্টিপাত নেই বললেই হয়, সেই জন্যই মঙ্গল-মানুষের এই অভিনব ব্যবস্থা।

এই ব্যাখ্যা বাস্তবসম্মত। কারণ মঙ্গলে বায়ুর চাপ খুবই কম বলে বাষ্পাবস্থা খুব দ্রুত হবার কথা, তার ফলে নদী বা খালের মতো অনাবৃত জলাশয়ের জল অনতিবিলম্বে শুকিয়ে যাবারই কথা। মঙ্গলের বুদ্ধিমান প্রাণী তাই গোটা মঙ্গলের ভূভাগ জুড়ে পাইপ লাইন বসিয়েছেন জল সেচের জন্য।

অবশ্য সব বৈজ্ঞানিকই যে এই উক্তির সঙ্গে ককমত হয়েছেন তা নয়, তবু মহাশূন্যে আমরা যে একেবারে নিঃসঙ্গ নই—এ কথা ভাবতে ভালোই লাগে।

শালিকটা

শ্রীশৈলশেখর মিত্র

শালিক, শালিক, শালিকটা ;
　　পথ হারানো তেপান্তরের
পথ দেখানোর মালিকটা।
ডেকেছিলুম শুনলেনাকো
　　শালিক, শালিক, শালিকটা।

আলো-ছায়ার বনে বনে
খেলছিলে বেশ আপন মনে—
করছিলে এই মনটা চুরি
　　চোরা ইন্দ্রজালিকটা।
ধরতে গেলুম পালিয়ে গেলে
　　শালিক, শালিক, শালিকটা।

চমকে চাওয়া জোছ্‌না-ধারায়
দীপালীতে তারায় তারায়
তোমারি নাম লুকিয়ে লেখে
　　স্বপনপুরীর অলীকটা।
তোমায় আমি ভালবাসি
　　শালিক, শালিক, শালিকটা।

যে ফুল না ফুটিতে

শ্রীবিমল দত্ত

আমরা তখন অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছি। আমাদের শ্রেণীতে এসে ভর্তি হ'ল একটি ফুটফুটে হাসিখুসি ছেলে, নাম চিত্তরঞ্জন। স্বভাবটি তার এমন দিল্‌খোলা আর অমায়িক যে প্রথম দর্শনেই সে আমার চিত্ত জয় করে নিলে। কিছুক্ষণ বাদে সে অন্য ছেলেদের এড়িয়ে আমার কাছে এসে বস্‌ল এবং আমাদের কোন্ বিষয়ে কি পড়া হয়েছে একে একে জেনে নিল।

আমরা এই স্কুলে পড়ছি শিশু-শ্রেণী থেকে। সে এসে ভর্তি হ'ল অষ্টম শ্রেণীতে; কিন্তু অবলীলায় সে আমাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলে। দেখলুম, সে আমাদের মত মিন্‌মিনে পড়ুয়া ছেলে নয়, বেশ ভালো খেলোয়াড় এবং শক্তসামর্থ্য ও সাহসী। হাতের লেখা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—শারীরিক পরিচ্ছন্নতার দিকেও তার খুব নজর। নখগুলো সুন্দর করে কাটা—হাতে-পায়ে এক তিল ময়লা নেই, জামা-কাপড় ধব্‌ধবে। তবে সে বাবুও নয়।

পড়াশুনা, দুষ্টুমি, খেলাধূলা সে সমান উৎসাহে করতে লাগল। আর মিশতে লাগল সকল শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে; কি উঁচু ক্লাসের, কি নীচু ক্লাসের। আমার সঙ্গে বিশেষ ভাব হবার কারণ সেও আমার মত লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখত। তাছাড়া আমরা আবার থাকতাম একই পাড়ায়। বাপ-মার একমাত্র পুত্রসন্তান বলে তার খুব আদর ছিল বাড়ীতে। তার মায়ের সঙ্গেও একদিন সে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে, "দেখো মা, এই ছেলেটির মা নেই।"

তাঁর মা বললেন, "ওমা সেকী কথা রে? এই তো আমি রয়েছি তোদের দুজনের মা।" বলে তিনি তাঁর আঁচল দিয়ে আমার মুখটা মুছিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি ভারি রোগা তো! এত রোগা কেন?"

চিত্ত অমনি বলে উঠল, "ওরা, মা, ভাল ছেলে। রাতদিন বই মুখে বসে থাকে—খেলে না, বেড়ায় না তো মোটা হবে কি করে?"

মা বললেন, "নিয়ে যা না তোদের ব্যায়াম সমিতিতে। ও তো এই পাড়ায় থাকে। দাঁড়াও বাবা, তোমাদের খাবার নিয়ে আসি।" মা ব্যস্ত হয়ে খাবার আনতে গেলেন।

আমি লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলাম। কিন্তু সে মাতৃস্নেহের জোয়ারে আমার লজ্জা কোথায় ভেসে গেল তখনি। তখন আমের সময়, মা দু'থালা লুচি আর আম ছাড়ানো এনে দিলেন।

চিত্ত মাকে বললে, "তুমি যাও মা, তুমি থাকলে ও খেতে পারবে না লজ্জায়—"

মা বললেন, "আচ্ছা! যাচ্ছি যাচ্ছি—"

এমনি করে তুটি কিশোর এক নিটুট বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেলুম। রোজ সকালে ব্যায়ামাগারে প্রথম দেখা হ'ত, তারপর স্কুলে তুটিতে পাশাপাশি বসে থাকতুম। চিত্ত খেলত আমিও খেলার মাঠে গিয়ে তার খেলা দেখতুম—সন্ধ্যায় হাত ধরাধরি করে বাড়ী ফিরতুম।

এক একদিন চিত্ত চলে যেত মামার বাড়ী, সেদিন আমার যে কি তুর্দিন তা কি বলবো, পৃথিবী শূন্য মনে হ'ত। একা একা ছাদে বেড়াতুম আর চিত্তর জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে যেত।

চিত্ত গল্প করতো তাদের দেশ ধব্‌ধবির। সে দেশটা আবার আমাদের দেশের দিকে। কাজেই বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠত।

এমনি করতে করতে এল দোল। সকাল থেকে কলকাতার গলিতে রং আর আবীরের ছড়াছড়ি। চিত্ত তু' তু'বার আমাদের বাড়ীতে রং খেলে গেল—আমাকে একেবারে রংবেরঙের ভূত বানিয়ে তবে সে ছাড়ল। তার সঙ্গে তারই পাড়ার কয়েকটি কচিকচি ছেলে।

এই দিন সন্ধ্যায় চিত্তর হ'ল জ্বর। আমি পরদিন দেখতে গেলুম। জ্বরে অচৈতন্য। ওর মা বসে পাখা দিয়ে বাতাস করছেন। বললেন, "এসো বাবা, ছেলের তো জ্ঞান নেই। কাল্ রাত্রে বলছিল বিকারের ঝোঁকে তোমার নাম। দেখ তো ওর সঙ্গে কথা বলে, যদি জ্ঞান হয়।"

আমি পাশে গিয়ে তার উত্তপ্ত হাতটা হাতের মধ্যে নিলাম—আগুনের মত গরম। হাতটায় একটু চাপ দিয়ে বললাম, "চিত্ত, এই চিতু—"

"আঁ", বলে সে একবার রাঙা রাঙা চোখতুটো মেল্ল, "তারপর বললে, "তুই স্কুলে যাস্‌নি ?"

আমি বললাম, "আজ তো রবিবার—তাছাড়া এখন তো সন্ধ্যা—তোর কি কষ্ট হচ্ছে ?"

চিত্ত বললে, "রং মাখাতে গেছিলুম গণ্‌শাকে—সে দে ছুট্—আমিও ৪৪০ গজ দৌড়ের মত ছুটে তাকে ধরতে গেলাম—পড়ে গেলাম খোয়ার উপর; ডান হাঁটুতে লেগেছে—ছাখ্‌ না ফুলে গেছে।"

আমি ও মা দেখলাম, একটু মুনছাল উঠেছে এবং ফুলো-ফুলো। মা ডাক্তারকে খবর দিলেন—চুন-হলুদ গরম করে দেওয়া হ'ল। এদিকে জ্বরও ছাড়ে না। অধিকাংশ সময় চিত্ত বেহুঁশ হয়ে থাকে। আমি গেলে কথা কয়। বলে হাঁটুর মধ্যে বড় যাতনা।

১৫ দিনের পর জ্বর ছাড়ল। হাঁটুর যন্ত্রণা ভীষণ—লাঠি ধরে চিত্ত দাঁড়াতে গেল, কিন্তু হাঁটু সোজা হয় না।

তাকে য়্যাম্বুলেন্স করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে এক্সরে করা হ'ল। ডাক্তার বললেন, "হাঁটুর মালাইচাকী ভেঙে গেছে—অপারেশন করে হাড় সেট্ করতে হবে।"

চিত্তর আত্মীয় স্বজনরা এলো। তার বাবা তো ছেলের জন্যে পাগল। অপারেশন করায় তাঁর একেবারে মত নেই। চিত্তর কিন্তু ভারী স্ফূর্তি! মা যখন থাকে না আমাকে বলে, "এই, আমার একটা পা যদি কেটে দেয় আর আমি যদি বগলে ক্রাচ্ দিয়ে হাঁটি, তুই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবি না?" তার হাসি যেন মুখে ম্লান হয়ে গেল, চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করে উঠল—বললে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে—"ডায়মণ্ড স্পোর্টিং-এর সেণ্টার ফরোয়ার্ড গেল—ক্লাবটা কাণা হয়ে গেল।"

আমি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললুম, "ছিঃ! ও সব কি আবোল-তাবোল্ ভাবছিস্—পা অমনি কেটে দিলেই হ'ল!" আমার চোখেও জল এসে গেল।

চিত্ত খানিক চুপ করে রইল। তারপর বিষণ্ন স্বরে বললে, "জানিস কাল রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেছি আমি খোঁড়া হয়ে গেছি—উরু থেকে নীচের পাটা কেটে দিয়েছে। আমি বড় রাস্তার মোড়ে ক্রাচ্ বগলে ভিক্ষে করছি—তুই আমাকে দেখে ছুট্টে পালিয়ে গেলি—কেউ আমাকে একটা পয়সা দিলে না। বাবা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন আমি কত করে বাবাকে ডাকলুম। বাবা একবার ফিরেও তাকালেন না!"

কি এক অমঙ্গলের ইঙ্গিতে মনটা দমে গেল। চিত্তকে অনেক কষ্টে প্রবোধ দিলাম।

এদিকে তখনকার সেরা হোমিওপ্যাথ একজন সাহেব ডাক্তার চিত্তকে দেখতে লাগলেন। তার পায়ের নীচেটা ক্রমশঃ সরু হয়ে যেতে লাগল। হাঁটুর নীচে একটা মুখ হয়ে পুঁজ বেরুতে লাগল। ডাক্তার বললে, "এখান থেকে ছোট ছোট ভাঙা হাড়ের কুচো বেরিয়ে ঘা শুখিয়ে যাবে।"

তাইই হ'ল, কিন্তু হাটু থেকে পায়ের পাতা ক্রমশঃ সরু হয়ে অসাড় হয়ে যেতে লাগল। ডাক্তারের পরামর্শে চিত্তকে নিয়ে ওর বাবা-মা ডিহরী অন্ শোনে বায়ু পরিবর্তনে গেলেন। যাবার দিন চিত্ত আমার গলা জড়িয়ে বলল, "যাবি আমার সঙ্গে?"

মনটা নেচে উঠল। কিন্তু কয়েকমাস আগে আমার বাবা মারা গেছেন। বাড়ীর অবস্থা সঙ্গীন—যাবার কোন উপায় ছিল না। চিত্ত আমাকে তার রোগশয্যার পাশে মাটিতে আসন পেতে বসিয়ে লুচি মাংস খাওয়ালো। মাকে বলে বলে আমাকে ভরপেট খাইয়ে তার কী তৃপ্তি। তারপর বললে, আমি ডিহরী থেকে তোকে চিঠি লিখব। তুই তা জমিয়ে রাখবি। পরে আমরা 'ডিহরীর চিঠি' বলে একটা বই ছাপাবো, যেমন 'পুরীর চিঠি'। সেদিন চিত্তকে ছেড়ে আসতে যা কষ্ট হয়েছিল।

ডিহরীর চিঠি রীতিমত আসতে লাগল। চিত্ত এখন ভাল আছে। ঠেলা গাড়ীতে করে তাকে নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে যায়। নদীর সম্বন্ধে সে অনেক কবিতা লিখে আমাকে পাঠাতে

লাগল। তার ডান পা-টা হাঁটু থেকে কেটে বাদ দিতেই হবে। সেটা এখন সম্পূর্ণ বোঝার মত—ইত্যাদি ইত্যাদি।

একদিন চিঠি এল অমুক তারিখে অমুক ঠিকানায় এসে দেখা করিস—তার পরদিন ক্যাম্বেলে তার পা কেটে বাদ দেওয়া হবে।

চিত্ত আমাকে তার রোগশয্যার পাশে মাটিতে আসন পেতে বসিয়ে লুচি মাংস খাওয়ালো।
তারপর বললে, আমি ডিহরী থেকে চিঠি লিখব।

দেখা করতে গেলাম। চিত্তর মন কিন্তু এবার একেবারে দমেনি। এতদিন সে পায়ের মায়া মনে মনে কটিয়ে ফেলেছে। আমার সঙ্গে কথা কইল ডিহরীর চিঠিগুলোর—দেখালো একটা মোটা খাতা-ভরা কবিতা—কী সুন্দর সাবলীল কবিতাগুলো। আমাকে স্বীকার করতে হ'ল যে ওরকম কবিতা আমি হাজার চেষ্টা করলেও লিখতে পারবো না—সে পড়তে লাগল—

লাফিয়ে চলো শিশুর মত
গড়িয়ে পড়ো মায়ের কোলে
কী কথা কও আপন মনে
জলধারার তরল বোলে
ঢেউ-শিশু সব নদীর বুকে
প্রাণের সাড়া জাগাও খালি
নদীর ধারে একলা বসে
পায়ের তলায় অনড় বালি।

পরের দিন দুপুরে অপারেশন হবে। সারা দিনটা মনমরা হয়েই রইলাম। সন্ধ্যায় ফোন করলাম চিত্তর মাকে। বাড়ীতে কেউ নেই। পুরানো চাকর বিশুদা ফোনে বললে, "দাদাবাবুর জ্ঞান হয়নি অপারেশনের পর। বোধহয় তাঁকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না।" মনটা বসে গেল।

সত্যিই ফিরে পাওয়া গেল না চিত্তকে। তাদের বাড়ীতে আর যেতেও পারিনি। তার মা হয়ত পাগল হয়ে গেছেন, বাবার মুখে কথা নেই। ভাবতেও পারি না তাদের কথা।

তারপর বহু বছর হয়ে গেছে। চিত্তকে ভুলতে পারিনি। কতদিন তাকে স্বপ্নে দেখেছি—কত কথা কয়ে গেছে। বেদনায় প্রাণ মথিত হয়েছে। কিন্তু কি করব—বিধাতার উপর কোন অভিযোগ নেই।

একদিন প্রায় দশ বছর বাদে ট্রেনে দেখলুম চিত্তর বাবাকে। আমার দিকে তাকিয়ে কেমন উদাস হয়ে গেলেন। তাঁর কাছে উঠে গেলুম। বললুম, "আপনি চিত্তর বাবা?"

চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। তাঁর চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

জিজ্ঞাসা করলুম, "মা, কেমন আছেন?"

"তিনি সব যন্ত্রণার পারে চলে গেছেন—একবছর বাদেই।"

আর একটিও কথা বলতে পারলুম না। কেবল মনের মধ্যে একটা কবিতার পঙ্‌ক্তি জেগে উঠল।

"যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে অবনীতে—
যে নদী মরু পথে হারালো ধারা।
জানি হে জানি তাহা হয়নি হারা।"

সংবাদ-বিচিত্রা

ওপর দিক থেকে নীচের দিকে বাড়ী নির্মাণ

পশ্চিম জার্মানীর স্থপতি বিশেষজ্ঞরা অফিস বাড়ীগুলো ওপরের দিক থেকে নীচের দিকে তৈরী করার পেছনে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এ বিষয়ে প্রথম প্রয়াস হামবুর্গের ১৩ তলা ফিনল্যান্ড হাউস।

এটা আগামী বছরের শেষের দিকে সম্পূর্ণ হবে আশা করা যায়। ছাদের সঙ্গে লিফট আছে। এই লিফটের সাহায্যে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হচ্ছে। ওপরতলা থেকে কাজ শুরু হচ্ছে এবং যত নীচের দিকে কাজ অগ্রসর হবে, ততো শ্রমিকদের অস্থায়ী ভারা নীচের দিকে নামবে।

ওপরের দিকে কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ফিনিশ ফার্ম, ইনফরমেশন ব্যুরো ও ফিন্ এয়ারলাইন্স প্রভৃতি এখানে স্থানান্তরিত হবে। সর্বোচ্চ তলায় একটা রেস্তঁরা থাকবে, সেখান থেকে হামবুর্গের আলস্টার লেকের অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করা যাবে। জার্মানীর অন্যান্য শহরে এ ধরণের আরও সৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে।

পুলিসী কুকুরদের গলায় আলোর নিশানা

অপরাধীদের ধরার জন্যে সব দেশেই পুলিস আজকাল কুকুর পোষে। অপরাধী ধরার খোঁজে এসব কুকুরদের যখন লেলিয়ে দেওয়া হয়, তখন এসব কুকুর কে কোথায় ছুটে যায় দেখার জন্যে তাদের পেছনে এক একজন লোক ছুটতে হয়। তাই এসব কুকুরদের যাতে সহজেই চেনা যায় সেজন্যে পশ্চিম জার্মানীর একজন পুলিসের বড়কর্তা জলে-নেভে এরকম একটি বাতি উদ্‌ভাবন করেছেন, যেটি কুকুরের গলায় লাগিয়ে দিলে রাত্রে তাদের চিনতে অসুবিধে হবে না।

হাইডেলবের্গে ছাত্রদের রেডিও স্টেশন

হাইডেলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঠিক করেছে যে তারা এবার নিজেরাই একটি বেতার স্টেশন পরিচালনা করবে। ইতিমধ্যেই তারা লাইসেন্সের জন্যে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছে। এই স্টেশন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন সম্বন্ধে খবরাখবর দেওয়া ছাড়াও পাঠ্যবিষয়ক লেকচার প্রচার করা হবে। এতে হলের মধ্যে ভিড় করে ছাত্রদের লেকচার শোনার কষ্টভোগ করতে হবে না। পশ্চিম জার্মানীর অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৩৮৬তে প্রতিষ্ঠিত) ছাত্ররা প্রমাণ করতে চায় যে, তারা প্রাচীনকে আঁকড়ে না ধরে নতুন কিছু করতে চায়। এই পরীক্ষায় এরা সফল হলে, পশ্চিম জার্মানীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে এদের অনুসরণ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বাচ্চাদের দমকল বিভাগ

বাচ্চারা যখন খেলাচ্ছলে বড়দের কাজকর্ম অনুকরণ করে, তখন তাদের সে উৎসাহ ও ব্যগ্রতা দেখার মত! পশ্চিম জার্মানীর উত্তর সাগরের ফ্যইর-দ্বীপে গত আশি বছরেরও বেশি ছোটদের একটি দমকল বিভাগ আছে। সত্যিকারের প্রয়োজনের সময় এরা যে কাজ দেখিয়েছে, তা এতোকাল মানুষকে বিস্মিত করেছে। অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে এরা আগুন নেভাবার কায়দা-কৌশল শেখে। প্রতিবছর এই বালখিল্য দমকল বিভাগের নেতা নির্বাচনের সময় দমকল বিভাগের একটি নৃত্যানুষ্ঠান হয়। এবছরও হয়েছে। এই নির্বাচনে প্রাচীন প্রথা অনুসৃত হয়, অর্থাৎ "বিভাগীয় কর্তৃত্ব" গ্রহণের পূর্বে নতুন নেতাকে দলের অন্যান্য সভ্যদের হাতে উত্তমমধ্যম প্রহার সহ্য করতে হয়। নেতা হবার যোগ্যতা অর্জনে এর চেয়ে কঠিন পরীক্ষা আর কি হতে পারে?

পৃথিবীর মধ্যে চারপেয়ে ক্ষুদ্রতম পোস্টাপিস

হ্যানোভার—পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্র পোস্টাপিস হ'ল একটি চারপেয়ে ঘোড়া বা টাট্টুঘোড়া যার দশম বার্ষিকী চলছে এখন। ব্রাউনলাগে একটি ছোট্ট শহর। এখানের প্রস্রবণের জল বেশ স্বাস্থ্যকর, তাই অনেকে এখানে বেড়াতে আসেন। এখানের এক পার্কে এই ঘোড়া পোস্টাপিস। ঘোড়াটা মাঠে চরে বেড়ায় আর তার পিঠে—বাঁধা ডাকবাক্‌সে সবাই চিঠি ফেলে। এই ঘোড়া পোস্টাপিসকে সরকারী মান দেবার জন্যে সরকার থেকে বিশেষ ডাকটিকিট বার করা হয়েছে। ছোটদের কাছে এই ঘোড়াটার আকর্ষণ অন্য দিকে; তারা এর পিঠে চেপে বেশ দু' চার চক্কর ঘুরে নেয়।

উল্টো কথা একি ?

শ্রীঅতীন মজুমদার

রুমিকে মা হেঁসেল-ঘরে বলেন ডেকে,—শোন্
লক্ষ্মীসোনা, এই এখানে থাক্‌তো কিছুক্ষণ,
রাখতে নজর কড়াতে দুধ, থালাতে মাছ আছে,
বেড়াল খাবে যাস্‌নে কোথাও,—দেখিস্ বসে কাছে।
যাচ্ছি আমি ছাদের-'পরে বৃষ্টি এলো ব'লে,
জামা-কাপড় আমের আচার ভিজবে তা না হ'লে।
নাড়িয়ে মাথা রইল রুমি বসে হেঁসেল-ঘরে,
মা চল্লেন জামা-কাপড় তুল্‌তে ছাদের 'পরে।

একটু পরেই ফিরে তো মা'র চক্ষু ছানাবড়া,
একটিও মাছ নেইক থালায়, শূন্য দুধের কড়া!

মা বল্লেন বেজায় রেগে রুমির দিকে চেয়ে,—
একি—? কোথায় দুধ—মাছ কই?—বেড়াল গেছে খেয়ে!
ব'সে ব'সে কচ্ছিলি কি বোকা হতচ্ছাড়া,
বেড়াল এসে সব খেয়েছে! দিস্‌নি কেন তাড়া?

তাড়া দিতে বল্‌লে কখন?—রেগেই বলে রুমি,—
বেড়াল খাবে দেখিস্ ব'সে,—এই বলেছ তুমি।
বেড়াল এল, সবই খেলো,—আমিও বসে দেখি,
খেয়ে চলে গেল এখন উল্টো কথা একি?

প্রথম ফুল

শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য

এক যে ছিল কাঠুরে ও তার বউ। তাদের ছিল দুই মেয়ে। কাঠুরে বন থেকে কাঠ কেটে যা উপায় ক'রে আনত, তা দিয়ে তাদের কোন মতে সংসার চলতো। একদিন কাঠুরের মেয়েরা বললো, "বাবা, আজ আমরা খেজুর খেতে তোমার সঙ্গে বনে যাবো।" কাঠুরে রাজী হ'ল, বললো —"তা'হলে শীগ্‌গির তুম্বাতে* খুদের জাউ ভ'রে নে। অনেক দূরের পথ, সকাল সকাল বেরুতে হবে।"

কাঠুরে ও তার মেয়েরা সকাল সকাল বনের পথে বেরিয়ে পড়লো। ক'দিন হ'ল এদিককার বনে একটা মানুষখেকো বাঘ এসেছে। বাঘটা লোকের সাড়া পেলে পথের পাশে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তারপর পিছনের লোককে থাবা মেরে নিয়ে পালায়। তাই কাঠুরে চললো আগে আগে, আর মাঝে ছোট মেয়েকে রেখে সকলের পেছনে রইলো বড় মেয়ে। এই ভাবে জঙ্গলের সরু পথ বেয়ে তারা হন হন ক'রে এগিয়ে চললো। কারো মুখে কোন শব্দ নেই।

ক্রমে তারা গভীর জঙ্গলে এসে পড়লো। সেখানে একটা গাছের তলা পরিষ্কার ক'রে তারা তুম্বা দুটো রাখলো। তারপর কাঠুরে গেল কাঠ কাটতে। আর মেয়েরা মনের আনন্দে গাছ থেকে খেজুর পেড়ে খেতে লাগলো। তেষ্টা পেলে সেই গাছ তলায় ফিরে এসে জাউ খেয়ে তেষ্টা মেটায়। এইভাবে সব জাউটুকুই তারা দু'জনে শেষ ক'রে ফেললো। তারপর আরও দূর বনে খেজুর খেতে চলে গেল। মনে তাদের আনন্দ আর ধরে না।

এদিকে বেলা বাড়ে। কাঠুরে তার কাঠের বোঝা বেঁধে নিয়ে গাছতলায় ফিরে এল। এসে দেখে মেয়েরা সেখানে নেই। তাকে যে এখুনি ফিরতে হবে। বাজারে কাঠ বেচে যা পয়সা পাবে তাই দিয়ে চাল ও নুন কিনে তাকে সন্ধ্যের আগেই ঘরে ফিরতে হবে। জাউটুকু সবই তো মেয়েরা খেয়ে ফেলেছে। তার জন্যে একটুকুও রাখেনি।

খিদেয়-তেষ্টায় মেয়েদের ওপর তার রাগও হতে লাগলো। আবার ভয়ও হ'ল—বাঘে নিয়ে গেল না তো? আবার ভাবে, তাকে খুঁজে না পেয়ে মেয়েরা হয়তো বা ঘরেই ফিরে গেছে।

কাঠুরে এদিকে-ওদিকে মেয়েদের খোঁজে। কয়েকবার চেঁচিয়ে ডাকে। কিন্তু কোন সাড়া নেই। সে একটুক্ষণ কি ভাবলো। তারপর কাঠের বোঝাটা কাঁধে ফেলে কুড়ুলটা নিয়ে শহরের পথ ধরলো। ক্রমে সে ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

* তুম্বা—লাউয়ের পাত্র।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েরা ফিরে আসে। এসে তাদের বাবাকে খোঁজে। কিন্তু কাঠুরেকে কোথাও খুঁজে পায় না। তাদের তখন খুব ভয় করতে লাগলো। এদিকে তেষ্টাও পেয়েছে ভীষণ। তারা কিছুক্ষণ ছুটোছুটি, ডাকাডাকি করলো। কিন্তু তাদের বাবাকে কোথাও পেল না। তখন দুজনে ব'সে ব'সে কাঁদতে লাগলো। এমনিতেই তাদের বেজায় তেষ্টা পেয়েছিল। তারপর কেঁদে কেঁদে গলা আরও শুকিয়ে গেল। তখন কি আর করে। তারা জলের খোঁজে বনের পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলো।

হাঁটতে হাঁটতে তারা এক পুকুর ধারে এসে পৌছল। পুকুরে জল টলটল করছে। তাই দেখে তারা ছুট্টে গেল জল খেতে। কিন্তু যেই আঁজলা পুরে জল খেতে যাবে, অমনি পুকুরের সব জল গেল শুকিয়ে।

তখন বড় বোন ছোট বোনকে বলল, "তোর ক'ড়ে আঙুলে যে আংটিটা আছে, ওটা যদি পুকুরে ফেলে দিতে পারিস, তা'হলে আবার জল উঠবে। কিন্তু পরে আংটির জন্যে কান্নাকাটি করতে পারবি না, তা আগের থেকে বলে রাখছি।"

ছোট বোন তাতেই রাজী। সে আংটিটা আঙুল থেকে খুলে তখুনি পুকুরে ফেলে দিল। আর যেই না ফেলে দেওয়া, অমনি জল উঠে পুকুরটা আবার ভরে গেল।

তখন তারা পেট পুরে জল খেল। তারপর পুকুরপাড়ে একটা বটগাছের তলায় বিশ্রাম করতে লাগলো।

এদিকে হাতের দিকে তাকালেই ছোট বোনের আংটির জন্যে কান্না পায়। সে আর চুপ করে থাকতে পারল না। কেঁদে উঠল, "দিদি, আমার আংটি কই। শীগ্‌গির আমার আংটি এনে দে।"

বড় বোন ক্ষোভের সুরে বললো, "তোকে তো আগেই বলেছি, তুই আংটির জন্যে পরে কান্নাকাটি করতে পারবি না। এখন আমি কি করবো? আচ্ছা দাঁড়া, তোর আংটি এনে দিচ্ছি।"

এই বলে বড় বোন পুকুরে ডুব দিল। একটু পরে ভেসে উঠে আংটিটা ছোট বোনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার তলিয়ে গেল। আর উঠলো না।

ছোট বোন অনেকক্ষণ দিদির অপেক্ষায় সেদিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু দিদি আর উঠলো না। তখন সেই গাছতলায় ব'সে সে কাঁদতে লাগলো।

সেই পুকুরের পাশেই ছিল সে দেশের রাজার বাগান-বাড়ী। বিকেল হলে বাগান-বাড়ীর মালী পুকুরে জল নিতে এল। এসে দেখে গাছতলায় বসে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে কাঁদছে।

সে ছুটে রাজাকে খবর দিল। বললো, "এক পরমা সুন্দরী মেয়ে পুকুর পাড়ে বসে কাঁদছে। তার সঙ্গে আপনার বিয়ে হ'লে বেশ হবে।" রাজা বললেন, "বেশ, তাকে নিয়ে এসো।"

মালী ছুটে গিয়ে সেই ছোট বোনকে বললো, "কেঁদো না, চলো আমাদের রাজার কাছে। তিনি তোমাকে বিয়ে করবেন।" পরে তাই হ'ল। ধুমধাম ক'রে কাঠুরের ছোট মেয়ের সঙ্গে সে দেশের রাজার বিয়ে হয়ে গেল।

সেই রাজার আরও এক রাণী ছিল। তার কোন ছেলেপুলে হয়নি। সেই আগের রাণীকে রাজা বাগান-বাড়ী দেখাশোনা করবার জন্যে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। আর নোতুন রাণীকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে সবাই জানতে পারলো, নোতুন রাণীর এবার ছেলেপুলে হবে। খবরটা পেয়ে দেশের লোক সবাই খুশী। পুরোনো রাণীই কেবল হিংসায় জ্বলতে লাগলো। সে ভাবলো, নোতুন রাণীর যদি ছেলেপুলে হয়, তা'হলে রাজা তাকেই বেশী ভালবাসবে। পুরোনো রাণীকে কোনদিনই তা'হলে ঘরে নেবে না।

তাই নোতুন রাণীর ছেলে হলে সে লুকিয়ে আঁতুড় ঘরে ঢুকলো। ঢুকে ছোট রাণীর সামনে একটা বেড়াল ছানা রেখে, তার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে পুকুরে ফেলে দিয়ে এল। সবাই জানলো, নোতুন রাণী বেড়াল ছানা প্রসব করেছে।

রাজা নোতুন রাণীর ওপর খুব রেগে গেলেন। আর তাকে বাগান-বাড়ী দেখা-শোনার কাজে পাঠিয়ে দিয়ে পুরোনো রাণীকে নিয়ে আগের মতো ঘরকন্না করতে লাগলেন।

পরদিন সেই পুকুরে একটা সুন্দর পদ্মফুল ফুটে উঠলো। বাগান-বাড়ীর মালী পুকুরে জল আনতে গিয়ে সেই অপূর্ব পদ্মফুল দেখতে পেল।

সে ছুটে রাজাকে খবর দিল। বললো, "আপনার পুকুরে একটা চমৎকার পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। সেটা আপনার মুকুটে লাগালে বেশ মানাবে।" রাজা বললেন, "বেশ, ফুলটা নিয়ে এস।"

মালী পুকুরে নেমে যেই ফুলটা নিতে যাবে, অমনি কাঠুরের বড় মেয়ে জলের ভেতর থেকে বলে উঠলো, "ফুল ধরা দিস্‌নে।" অমনি ফুলটা ভেসে ভেসে পুকুরের ওপারে চলে গেল।

রাজার মালী যতবার চেষ্টা করে ধরতে, ফুল ততবারই সরে সরে যায়। কোনমতে ফুলের নাগাল না পেয়ে মালী রাজাকে গিয়ে খবর দিল।

রাজা মশাই ব্যাপার শুনে নিজেই এলেন পুকুরের ধারে ফুল তুলতে। এবারও কাঠুরের মেয়ে জলের ভেতর থেকে বারণ করে দিল। অমনি ফুল দূরে সরে গেল। রাজা মশাই কিছুতেই ফুলের নাগাল পেলেন না। তিনি তখন ডেকে পাঠালেন পুরোনো রাণীকে। পুরোনো রাণীও ফুলটাকে ছুঁতে পারলে না। কাঠুরের বড় মেয়ে মানা করে দিল। তখন ডাক পড়লো নোতুন রাণীর।

নোতুন রাণী এসে গোড়ালী জলে দাঁড়াতেই জলের ভেতর থেকে কাঠুরের বড় মেয়ে বলে

উঠলো, "কোলে ওঠ্, কোলে ওঠ্, এই তোর মা।" অমনি ফুল ভেসে এসে নোতুন রাণীর পায়ে লাগলো।

নোতুন রাণী ফুলটা তুলে নিয়ে দেখে, তার ভেতরে শুয়ে রয়েছে তার ছেলে।

তখন সে রাজাকে বললো, "এই তো আমার ছেলে। এ জন্মালে পুরোনো রাণী একে চুরি করে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল, আর আমার কোলের কাছে একটা বেড়াল ছানা রেখে দিয়েছিল।"

তখন রাজা বড় রাণীকে সাত টুকরো করে কেটে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এলেন। আর ছোট রাণীকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করতে লাগলেন।*

* আদিবাসীদের গল্প।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ভিক্টোরিয়া বন্দরটা একটু অদ্ভুত ধরণের। জাহাজ জেটীর কাছে ভিড়লো বটে, কিন্তু তাকে ঠিক জেটী বলে না। জেটীর মতো খানিকটা জায়গা বাঁধানো। জাহাজের গ্যাংওয়ে দিয়ে নেমে সেই বাঁধানো জায়গাটায় এলাম। সেখান থেকে রাস্তাটা সোজা শহরের দিকে চলে গেছে, রাস্তার দু'পাশে—সমুদ্রের পিছিয়ে আসা স্থির জল।

প্রথম দিন আমার কাজ ছিল খুব। কাগজপত্র টাইপ করতে করতে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা বেরুবো-বেরুবো করছি, এমন সময় বিশ্বাস এসে বললে,—শুনেছেন? ইন্‌জিন্ খারাপ হয়েছে। মেরামতি করতে হবে। ইন্‌জিনিয়াররা হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছে।

—তাই নাকি!

বিশ্বাস বললে,—আসুন না? দেখবেন।

বললাম,—না ভাই, ও ইন্‌জিন-রুমে ঢুকতে আমার ভালো লাগে না। ওখানে গেলে খালাসীরা এমন করে আমার চোখের দিকে তাকায়, যেন মনে হয়, আমি পৃথিবীর মানুষ নই, অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছি।

বিশ্বাস আমার কথায় হেসে ফেললো। বললে,—শুধু আপনি নয়, ওরা ছাড়া অন্য যে-কেউ ঢুকলেই ওরা অমন করে তাকায়। ওরা যখন ইন্‌জিন-রুমে কাজ করতে নামে, তখন ওরা নিজেরাই বদলে যায়। মনে হয়, বাইরের জগতের কোনো খবরই ওরা রাখে না, ঐ ইন্‌জিন আর বয়লারই ওদের পৃথিবী।

ওর দিকে তাকিয়ে বললাম,—তাহলে তোমারও এটা মনে হয়েছে?

বিশ্বাস বললে,—হয়েছে বই কী। তবে কাউকে বলি না। কারণ, আমি তো জাহাজের সব থেকে ছোট কাজ করি, প্যান্ট্রি-বয়।

বলেই আর দাঁড়ালো না, তাড়াতাড়ি সরে গেল আমার কাছ থেকে।

অবাক হয়ে ওর প্রস্থান-পথের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ কী মনে হতে ওপরের দিকে তাকালাম মুখ ঘুরিয়ে। দেখলাম, দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ক্যাপ্টেন-সাহেব মিঃ দুধওয়ালা।

শুরু হলো যথারীতি 'গুড্‌মর্ণিং'-এর পালা। সেটা শেষ হতেই উনি বললেন—কুমার, জাহাজ আর নড়বে না এখান থেকে—দিন পনেরোর মধ্যে। আমার গোটা কয়েক আর চিঠি টাইপ্‌ করার আছে, সেটা করে দিয়ে শুধু খাও-দাও আর ঘুমোও।

বললাম,—এখন করে দেবো স্যার ?

মিঃ দুধওয়ালা হেসে উঠলেন, বললেন,—আরে না-না, পরে করে দিও, এখন শহর দেখতে যাচ্ছো, তা-ই যাও।

অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও নড়ছি না দেখে ক্যাপ্টেন বোধ হয় একটু অবাকই হলেন, বললেন,—কী ব্যাপার ? কিছু বলবে নাকি ?

—আজ্ঞে না, বলে, অগত্যা গুটিগুটি শহরের দিকেই পা বাড়ালাম। আসলে, আমি চাইছিলাম, ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে কাজ দিক। নেহাৎ মাটিতে পা দেবার ইচ্ছা হলো তাই, আসলে এ-শহর বা এ-শহরের লোকজন কাউকেই আমার ভালো লাগেনি।

প্রথম দিন কাগজপত্র নিয়ে শিপিং-অফিসে যখন গেলাম, প্রকৃতপক্ষে তখনই শহর দেখা হয়ে গেছে।

ছোট্ট শহর, রাস্তা বলতে ঐ একটাই রাস্তা, তার পাশে অফিস, তার পাশে হোটেল, তার পাশে দোকান-ঘর। রাস্তার শেষের দিকে একটা ছোট্ট পার্ক মতো আছে, তাতে বিরাট দুটো কচ্ছপ এক দিকের একটা বিরাট খাঁচায় শোভা পাচ্ছে। তার উল্‌টো দিকে আরেকটা খাঁচা, অপেক্ষাকৃত ছোট, তাতে রয়েছে দুটো সিঁদুরে লাল-ঠোঁট সারস পাখী। সত্যি বলতে কী, এ-সব আমার প্রথম দিকেই দেখা হয়ে গেছে। রাস্তার পাশের বাড়ীগুলি পাকা, কোনো-কোনোটা দোতলা, কিন্তু ছাদ পাকা নয়, লাল টালির।

লোকজন মন্দ নয়, কালো চেহারার নিগ্রোও আছে, আবার আধা-সাহেব তামাটে চেহারার লোকও আছে। লম্বা প্যাণ্টের ওপরে শুধু একটা গেঞ্জি, মাথায় খড়ের টুপি, মুখে শিষ তুলে মন্দগতিতে হেঁটে আসছে,—এ চেহারাই চোখে পড়ে বেশি।

আমার খুব খারাপ লেগেছিল। যেখানে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম লণ্ডন, কিংবা বার্লিনের,—সেখানে এই অখ্যাত অজ্ঞাত দ্বীপের ছোট্ট শহর দেখে আমার মন ভরবে কেন ?

তার ওপরে জাহাজ পনেরো দিন থাকবে শুনে মনটা আরও দমে গিয়েছিল। কিন্তু কী আর

করা যায়, ঘরে বন্দী হয়ে থাকা যায়ই বা কতক্ষণ? অগত্যা জাহাজটার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাস্তাটা দিয়ে সোজা শহর-মুখো চলতে লাগলাম।

আগেই বলেছি, রাস্তাটার দু'ধারে থৈ থৈ করছে জলে, একেবারে নিস্তরঙ্গ, শান্ত, যেন বিরাট পুকুর বা ঝিল। আসলে নোনা জল, সমুদ্রের 'ব্যাক্ ওয়াটার'; বন্দরের ভিতরে ঢুকে স্রোতহীন হয়ে পড়েছে।

পাখী-টাখী উড়ছিল, খড়ের টুপি-পরা একটা লোক ডোঙায় চড়ে জাল ফেলছিল,—কিন্তু সে-সব দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ তখন আমার মার কথা, কেন কে জানে, মনে পড়ছিল। মনে মনেই বলছিলাম, বেশ হয়েছে—আমার জন্য ভাবো এখন আকাশ-পাতাল—আমি একখানাও চিঠি দেবো না।

এইসব প্রশ্নোত্তর করতে করতে নিজের মনে চলেছি, হঠাৎ কানে একটা ডাক ভেসে এলো,—কুমার?

চম্‌কে গেলাম। দাঁড়িয়ে পড়ে তাকালাম এদিক-ওদিক। দেখি, একটু দূরে জলের ওপরে একটা ছোট্ট মোটর বোট্ থেকে ডাকছে আমাদের চীফ্ ষ্টুয়ার্ড।

'চীফ ষ্টুয়ার্ড' আমার সাক্ষাৎ ওপরওয়ালা, তাই 'গুড মর্ণিং' জানিয়ে এগিয়ে যেতে হলো। মোটর বোট্‌টার কোনো শব্দ হচ্ছে না, একটা কালো মতন আধা-নিগ্রো লোক লগি ঠেলে ঠেলে ওটাকে রাস্তার ধারে আন্‌বার চেষ্টা করছে।

প্রায় কাছে এসেছে বোটটা, চীফ ষ্টুয়ার্ড দিলে এক লাফ। ভেবেছিল এক লাফে তীরে এসে পড়বে, কিন্তু পারলো না, ভারী শরীর নিয়ে জলের ওপর পড়লো। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে টেনে তুললাম। বোটের কালো লোকটা হাসলো না কিছু না, তাড়াতাড়ি বোটটা ভিড়িয়ে একটা বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে আমাদের কাছে এলো।

কুতকুতে ছোট-ছোট চোখ, নীচের ঠোঁটটা পুরু, মাথার চুল শক্ত আর কোঁকড়ানো, ঠোঁটে একটা চুক্‌চুক্ শব্দ করে কী সব কথা বললে আমি বুঝতে পারলাম না।

চীফের অবশ্য লাগেনি, প্যান্টটা হাঁটু পর্যন্ত ভিজে গেছে এই যা। নিজের অবস্থা দেখে নিজেই খানিক হেসে নিলো।

হাসির ছোঁয়াচে আমার ঠোঁটেও হাসি এলো, কিন্তু ঐ লোকটা একটুও হাসলো না, মুখ গম্ভীর করে তখনো 'চুক্ চুক্' করে চলেছে।

চীফ্ হাসি থামিয়ে ওকে বললে,—তু মরো, অল্ রাইত?

কাল, কেমন? ঠিক আছে তো?

লোকটা অদ্ভুতভাবে বলে উঠলো,—অল্ রাইত—অল্ রাইত।

চীফ আমার দিকে ফিরে বললে,—কুমার, কাল আমরা একটা দ্বীপে বেড়াতে যাবো। পার্সলীন দ্বীপ। তুমি যাবে?

কী যে বলবো বুঝতে পারলাম না। আমার এদের সঙ্গে মিশতেই ভালো লাগে না। এদের সঙ্গে দ্বীপে বেড়ানো কি ভালো হবে?

বললাম,—ক্যাপ্টেন সাহেব কি আমাকে ছাড়বেন?

চীফ বললে,—সে-ভার আমার। সকালে যাবো, বিকেলে ফিরবো, এর মধ্যে এতো ভাববার কী আছে? ক্যাপ্টেন খুব অনুমতি দেবে?

আমার যাওয়ার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। অথচ একেবারে 'না' বললে পাছে চটে যায়, তাই ঘুরিয়ে বললাম,—ঐটুকু ছোট্ট বোটে করে সমুদ্রে যাব? আমায় ভীষণ ভয় করবে।

চীফ্ হো-হো করে হেসে উঠলো, বললে—সমুদ্র একেবারে একটা পুকুরের মতো শান্ত এখন। ভয়-ডর আবার কী? বেশী দূরে নয়, দশ-বারো মাইল মাত্র। শহরের ও-প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে দ্বীপটাকে দেখা যায়। যেন একটা বিরাট কচ্ছপ সমুদ্রের বুকের ওপর ভেসে আছে।

আমরা কথাবার্তা বলছি এমন সময় অসহিষ্ণুকর সেই আধা-নিগ্রো লোকটা আবার যেন তার ভাষায় কী বলে উঠলো। এতক্ষণে মনে হলো তার ভাষা একটু বুঝতে পারছি। আসলে লোকটা ইংরেজীই বলছে, কিন্তু এমন উচ্চারণে বলছে, যে, ওটা যে ইংরেজী, তা' চট করে বোঝবারই উপায় নেই।

বললে,—মি গো—প্রিস্ত কাম্। (আমি যাই। 'প্রিস্ট্' অর্থাৎ পাদ্রী বা পুরোহিত আসবে।)

চীফ্ বললে,—অল রাইত। উই গো টু। মিত দ্য প্রিস্ত। (ঠিক আছে। তোমার 'প্রিস্ট্' বা পুরোহিত-এর কাছে আমরাই যাই চলো।)

লোকটা খুসীর হাসি হাসলো, বললে,—ইয়াঃ—কাম। (আচ্ছা, এসো এসো।)

আমার কিন্তু যাবার ইচ্ছা ছিল না, আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে চললো চীফ্ ষ্টুয়ার্ড।

বললে—কাল 'প্রিস্ত' এক দ্বীপে যাবে, সেই দ্বীপে নাকি মানুষ থাকে না। থাকে শুধু—পাখী। পথে আমাদের নামিয়ে দিয়ে যাবে ঐ পার্সলীন দ্বীপে।

—পাখী?

—হ্যাঁ—ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী আসে এই সময়। হয়ত এসে গেছে। তারা উড়ে যাবার আগে 'প্রিস্ত' মশাই তাদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে চান।

আমি অবাক হয়ে চীফের মুখের দিকে তাকালাম।

চীফ বললে,—অদ্ভুত মানুষ এই প্রিসৃত। তুমি আলাপ করে খুব খুসী হবে। তোমার কথা আমি তাকে বলেছি।

—কেন, আমার কথা বললে কেন?

—তুমি যে বাঙালী?

বললাম,—আমি বাঙালী, তা, কি?

চীফ বললে,—'প্রিসৃত'-ও বাঙালী।

প্রচণ্ড চমকে কেঁপে উঠলাম, তারপরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম বলা যায়,—বাঙালী!

—হ্যাঁ। এইবার যাবে তো?

কী-এক অদ্ভুত আনন্দে যে অধীর হয়ে উঠলাম, তা আর লিখে জানাতে পারবো কতটুকু? বললাম,—বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে আসবো? ও-ও বাঙালী। তাছাড়া, রেডিও অফিসার। সে-ও বাঙালী। চীফ্ বললে,—রেডিও-অফিসারের কথা ছেড়ে দাও, ও ভীষণ ঘরকুণো লোক। তবে হ্যাঁ, ক্যাপ্টেনকে বলে তোমার 'বিশ্বাস'কেও কাল নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো।

বললাম, কাল না, এখন। এখন ওকে নিয়ে আসবো সঙ্গে করে?

চীফ্ বললে, এখন ওর ডিউটি, ছুটি পাবে না। তারপরেই প্রায় ধম্‌কে উঠলো, তুমি চলো দেখি? বিশ্বাস আর বিশ্বাস—দুনিয়ায় বিশ্বাস ছাড়া যেন আর কেউ নেই। আধা-নিগ্রো লোকটা আমাদের কথা না বুঝেও মুখে সেই 'চুক্-চুক্' আওয়াজ করে উঠলো।

বলা বাহুল্য, আমরা আর দেরি করলাম না। সোজা চলতে লাগলাম তিনজনে। বেশীদূর যেতে হলো না, একটু দূর এগিয়েই একটা দোকান ঘরের পাশ দিয়ে, একটা গলির মধ্যে ঢুকলাম। সেই গলির ভিতরে আরেকটা গলি। সিঁড়ির ধাপ আছে পাথরের, পা টেনে পা টেনে ওপরে উঠতে হয়। পথটা এতো সরু যে, একজন-একজন করে সামনে-পিছনে চলতে হয়। ওপর থেকে কেউ যদি নামে তো, তাকে পথ দেবার জন্য দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াতে হয়। এইভাবে কিছু দূর যাবার পর ডান দিকে একটা বাড়ীর দরজা দিয়ে আমরা বাড়ীর উঠোনে পড়লাম। উঠোনে কী একটা গাছ, খুব বড়ো নয়, কিন্তু গুঁড়িটা বিরাট, ছোট ছোট ডাল আর ছোট ছোট পাতা। নীচেটা সান-বাঁধানো, বেদী করা। তার ওপরে বসে আছেন একটি মানুষ, কালো একটা আল্‌খাল্লা গায়ে। মুখে কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি, পাকার ভাগটাই বেশী, মাথার চুলও লম্বা—জট্-পাকানো। হাতে একটা কালো জপের মালা,—আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

মুখের রঙ তামাটে, খাড়া নাক, কপালে চোখের পাশের চামড়া কুঁচকে গিয়ে কালো-কালো দেখাচ্ছে। ঠোঁটের হাসিটি কিন্তু ভারী সুন্দর মনে হলো, আমাদের দেখে একটু হাসলেন।

চীফ্ এগিয়ে গিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললে, **Bengalee** (অর্থাৎ এ ছেলেটা বাঙালী)।

চোখ দুটি তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কিন্তু তখ্‌খুনি কিছু বলতে পারলেন না।

বললাম আমি। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলাম, আপনি বাঙালী? বলা বাহুল্য, বাঙলা ভাষাতেই বলেছিলাম। কিন্তু, মুখখানা তাঁর বিমর্ষ হয়ে গেল। বললেন,—**I am a Bengalee, but can't speak in my mother tongue.** (আমি বাঙালী, কিন্তু মাতৃভাষায় কথা বলতে পারি না)।

(ক্রমশঃ)

বিকট চিকিৎসা

শ্রীপরিচয় গুপ্ত

এ্যালোপ্যাথি, হোমোপ্যাথি,
কবিরাজী টোট্‌কা
কোনটাই মানে নাক' ডাক্তার ভোট্‌কা।
অসুখের মূল যত ওই পোড়া বিজ্ঞান
গেলো ওষুধ আর হও, ঘন অজ্ঞান।
তারচেয়ে প্রকৃতির হাতে সব সঁপে দাও
বেপরোয়া হয়ে তুমি ভরপুর খেয়ে যাও।
সেই সাথে হাস-খেল খেটে যাও আপ্রাণ
হবে নাক' মাথা ব্যথা কিংবা শিরেতে টান।
বিশ্বাসে ভর করে ভোট্‌কার কাটে দিন
সত্তরে পা দিয়েও হয়নিকো মোটে ক্ষীণ।

আম পেড়ে খেতে গিয়ে পড়ে যায়
ভোট্‌কা
খচ্ করে লেগে গেল বুকে এক খট্‌কা।
দিনরাত খচ্‌খচ্ সারে নাক' কিছুতে
সারাবেই ভোট্‌কা লেগে থাকে পিছুতে।
প্রতিদিন দুমদাম ঘুষি মেরে বুকেতে
সূচনা চিকিৎসার, বছরের শুরুতে।
সারাটি বছর ধরে ওই ঘুষি চলল
খচ্‌খচ্ থামলও ভোট্‌কাও মরল।
জামা খুলে ভোট্‌কার দেখা গেল বুকেতে
হাড়গুলো ভেঙে চুর, তবু হাসি মুখেতে!

লক্ষ্মী জোলার মাঠে

(ছোটদের লেখা)

শ্রীতপনকুমার বসু

বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হবার দু'দিন পরে দীপক এসে আমাকে বলল, "রেজাল্ট বেরুতে এখনও সপ্তাহ দুই তো বাকি, চল না, আমার সঙ্গে আমাদের দেশ থেকে ঘুরে আসবি।"

"কোথায় তোদের দেশ? কি আছে সেখানে?"

"তাও জানিস না? ঐ বনগাঁয়ের কাছে রসুলপুর গ্রাম, আর তাছাড়া তুই তো কোনদিন শহরের বাইরে পা বাড়াস নি; এক কাজে দু'কাজ হয়ে যাবে।—কি রে, যাবি তো বল্?"

"তুই যেমন করে বলছিস, আমার তো এখুনি চলে যেতে ইচ্ছে করছে। দেখি বাড়ীতে বলে, যদি অনুমতি পাই, তবেই।"...

বাড়ীতে একথা বলতে কেউ বিশেষ আপত্তি করলেন না।

তাই দিন ঠিক হয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে আমরা শিয়ালদা থেকে ট্রেনে উঠলাম। ওদের বাড়ী পৌছতে বেশ রাত হ'ল। ওদের বাড়ী পৌছতে একজন বুড়ো মুসলমান এসে হ্যারিকেনের আলো দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। অনেকক্ষণ না খেয়ে আছি, তাছাড়া ট্রেন-যাত্রার ফলে দু'জনেই খুব ক্লান্ত; কাজেই আর দেরি না করে হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নিলাম।

শুতে যাবার আগে আমি আর দীপক দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে গল্প করছিলাম। সেই বুড়ো লোকটি দীপকের কাছে এসে বসল, বলল, "কেমন আছ দাদাবাবু? তোমাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে তো?"

"হ্যাঁ, তাই তো এখানে এলাম। এখন ক'দিন ছুটি, হাতে কোন পড়াশুনা নেই। এখানে এলাম একটু আনন্দ করতে।"

লোকটি দীপককে জিজ্ঞেস করল, "তোমার সঙ্গে এ দাদাবাবুটি কে?" দীপক বলল, "ও আমার বন্ধু, তপন। ও কোন দিন গ্রাম দেখেনি, তাই আমার সঙ্গে আমাদের গাঁয়ে বেড়াতে এসেছে।"

দীপকের মা লোকটিকে ডাক দিতে সে চলে গেল। সে চলে যাওয়ার পর দীপক আমাকে বলল, "ওর নাম রহিম জোলা, ও আমাদের এখানে কাজ করে। ওর বাবা ছিল চাষী, নাম লক্ষ্মী জোলা। রহিম যখন ছোট তখন ওর বাবা মারা যায়, মা গলায় দড়ি দিয়ে মরে। তখন ও নিরাশ্রয়, বয়স মাত্র ১৪ বছর। তখন থেকে আমার ঠাকুরদা ওকে আমাদের বাড়ীতে এনে রাখেন। সামান্য টুকিটাকি কাজ আর বাগান দেখাশুনা করবার জন্যে সেই থেকে ও আমাদের বাড়ীতেই আছে।

কোন মাইনে পত্তর নেয় না। খালি ওর ইচ্ছে অনুযায়ী ওর বাবার ভিটেমাটির খাজনা আমাদের দিয়ে দিতে হয়।—আচ্ছা, বাকি সব পরে শুনিস্। এখন শুবি চ' তো, রাত অনেক হলো।"

"আঃ বল্ না, ভারী চমৎকার লাগছে শুনতে।"

"আরে একি দু'মিনিটের কথা! আর তাছাড়া এসব আমার চেয়ে রহিমদাই ভাল করে বলতে পারবে। এখন চল্, শুয়ে পড়া যাক।"

কাজেই আমরা আর দেরি না করে শুয়ে পড়লুম। পরের দিন সন্ধ্যে বেলায় আমি আর দীপক দাওয়ায় গিয়ে বসলাম। আমি বললাম, "তোর রহিম বুড়োকে ডাক না, ওর কাছে পুরো গল্পটা শুনব।" দীপক বলল, "তুই বোস্, আমি ডেকে আনছি।" এই বলে দীপক চলে গেল রহিমকে ডাকতে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দু'জনে ফিরে এল।

"কিগো দাদাবাবুরা এখন আবার ডাকলে কেন এই বুড়োকে।"

"তোমার গল্প শুনবো।"

"আমার?"

"হ্যাঁ, তোমার জীবনের কথা।"

রহিম একটু চুপ করে রইল। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, "বেশ বলছি।"

ঘন ঘন বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে শুরু করল সে। বললে, "এই ঘটনাটা ঘটেছিল ১৩০৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে।" একদিন সকালে আমার বাবা পান্তভাত খেয়ে চাষ করতে চলে গেল। যাবার সময় মাকে বলে গেল, দুপুরের দিকে জল আর ভাত নিয়ে যেতে। সকাল গড়িয়ে দুপুর হ'ল। মা এদিকে কাজকর্ম করতে করতে বাবার জন্যে ভাত নিয়ে যেতে ভুলে গেল। ভরা-দুপুরে মা খেতে বসতে গেল, তখন মনে পড়ল বাবার কথা। খেতে না বসে তখুনি মা বাবার জন্যে একটা বড় বাটিতে ভাত ও তরকারি আর একটা ছোট মাটির কলসীতে জল নিয়ে বাবার উদ্দেশে রওনা হ'ল। এদিকে আমার বাবা তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে মার জন্যে অপেক্ষা করছিল। দূর থেকে মাকে দেখে বাবা তাড়াতাড়ি জল খাবার জন্য ছুট দিল।

বাবাকে ছুটে আসতে দেখে মা থমকে দাঁড়াল। ভাবলে, বাবা নিশ্চয়ই তাকে মারবার জন্যে ছুটে আসছে। এই ভেবে আমার মাও উল্টো মুখো ছুট দিলে। ছোটবার সময় মা'র হাত থেকে জলের কলসী পড়ে ভেঙ্গে গেল।

বাবা ছুটতে ছুটতে এসে যেখানে ভাঙা কলসীটার জল পড়েছিল, সেই জায়গাটা চাটতে লাগল এবং সেই যে শুলো আর উঠল না! রহিম বলল, আমি তখন পাঠশালায় ছিলাম। পাঠশালা

থেকে এসে এসব শুনলাম। সেইদিনই বাবাকে গোর দেওয়া হ'ল। কিন্তু সেইদিনই গভীর রাত্রে হঠাৎ কিসের শব্দে যেন আমার ঘুম ভেঙে গেল। উপরের দিকে চেয়ে দেখি আমার মা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। এই দেখে আমি চীৎকার করতে লাগলাম।

প্রতিবেশীরা এসে আমার মাকে দড়ি কেটে নামাল, তখন মা শেষ হয়ে গেছে!"

"তারপর এই দাদাবাবুর ঠাকুরদা আমায় ওনাদের বাড়ীতে এনে রেখেছেন। সেই থেকে আমি ওনাদের বাড়ীতেই আছি।"...

যখন তার দিকে চাইলাম, দেখি তার চোখ জলে ভরে গিয়েছে।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা রহিমদা, তোমার বাবার ভিটে-মাটি আমাকে দেখাতে পার?"

সে বলল, "কাল সকালে আমার সঙ্গে যেও, তখন দেখাব।"

পরের দিন সকালে আমি, দীপক আর রহিম বুড়ো দেখতে বের হলাম তার বাবার ভিটে। হাঁটতে হাঁটতে খানিক দূরে আমি একটা মাটির ঢিবি দেখতে পেলাম।

আমি রহিম বুড়োকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওটা কি রহিমদা?"

সে যেন গর্বের সঙ্গে বলে উঠল, "ওই তো আমার বাবার ভিটে-মাটি।"

সেখানে যখন উপস্থিত হলাম, তখন সেখানে মাটির ঢিবি আর আশপাশে জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না।"

সস্তার মজা

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

পোস্তায় পাওয়া যায় পোস্তর দানা,
সস্তাতে মিলবে যে আছে তাই জানা।

হাঁদুরাম তাড়াতাড়ি
চড়ে তাই ট্রামগাড়ি
চলে গেল খুশীতে সে হয়ে আটখানা।

দর কষে সস্তার
মণ আর বস্তার,
অবশেষে পোস্ত সে কেনে এক আনা।

গুপ্ত রাজ্য সিকিম

সন্ধানী
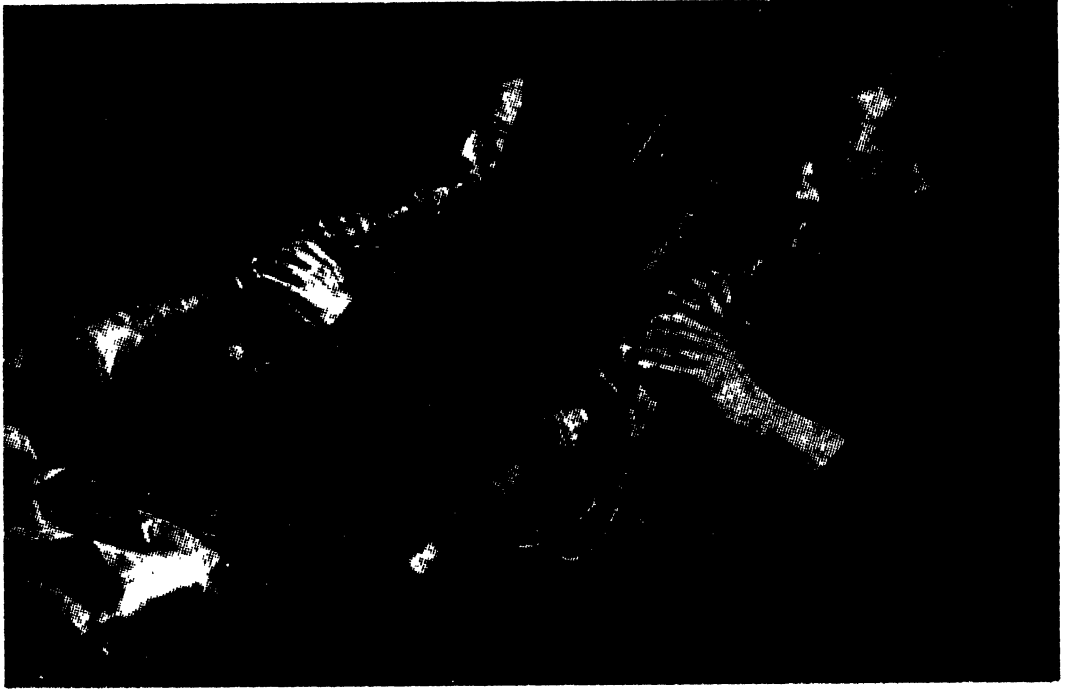
তিব্বতীরা সিকিমকে 'ধানের গোপন উপত্যকা' বলে থাকে। নিজের দেশের লোকেরা সিকিমকে 'ডনজঙ্গ' বা 'দুর্গ' বলে। বহির্জগৎ অবশ্য এই দেশকে সিকিম বলেই জানে। এই দেশ পূর্ব হিমালয়ের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এর চারদিকে চারটি বৃহত্তর দেশ ঘিরে আছে। যথা, দক্ষিণে ভারত, উত্তরে তিব্বত, পূর্বে ভূটান এবং পশ্চিমে নেপাল-এর মধ্যে এর অবস্থিতি। ভারতবর্ষের কালিম্পং হতে সিকিম মাত্র ৪০ মাইল দূরে। সম্প্রতি আমরা এই দেশে নানা রকম রাজনৈতিক গণ্ডগোলের খবর পাচ্ছি; অর্থাৎ চীনেরা এই দেশ দখল করার জন্য নানারকম ফন্দিফিকির করছে। পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চ পাহাড় কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে এই দেশ অবস্থিত। আধুনিক কালে নানারকম রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়লেও, এই দেশ নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য বিখ্যাত। প্রার্থনার জন্য উচ্চ পতাকা, দলবদ্ধ অশ্বতরের যাত্রী, বৌদ্ধ মন্দির যেখানে লামারা দেবতার ভবিষ্যৎবাণী প্রশ্ন ক'রে জানতে পারে (Oracles), এবং প্রেতাদির নৃত্যানুষ্ঠান, অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য, ৪০০ রকম পরগাছা, অসংখ্য উচ্চ পর্বতজাত ফুলের মত ফুল এবং সর্বত্র মিষ্ট কমলা ও আপেল। সিকিমবাসীর ভাষা,পোশাক ও আচার-ব্যবহার অনেকটা তিব্বতীদের মত। প্রকৃতপক্ষে এখানকার শাসকশ্রেণী তিব্বতী বংশোদ্ভূত। এখানকার সরকারী ধর্ম বৌদ্ধ মহাযান। দুই বৎসর পূর্বে সিকিমের যুবরাজ তণ্ডুপ নামগিয়াল আমেরিকার হোপ কুকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। রাজার মৃত্যুর পর তাঁরাই রাজা-রাণী হয়েছেন। রাণী হয়েও হোপ কুক তিনি তাঁর ধর্ম ত্যাগ করেন নি। ———

জাতীয় সঙ্গীতের কথা

তোমরা অনেকেই ফরাসী বিপ্লবের বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত Marseillaise হয়ত শুনে থাকবে। এই বিপ্লবের গানটি লিখেছিলেন Joseph Rouget De Lisle নামে একজন ফরাসী যুবক।
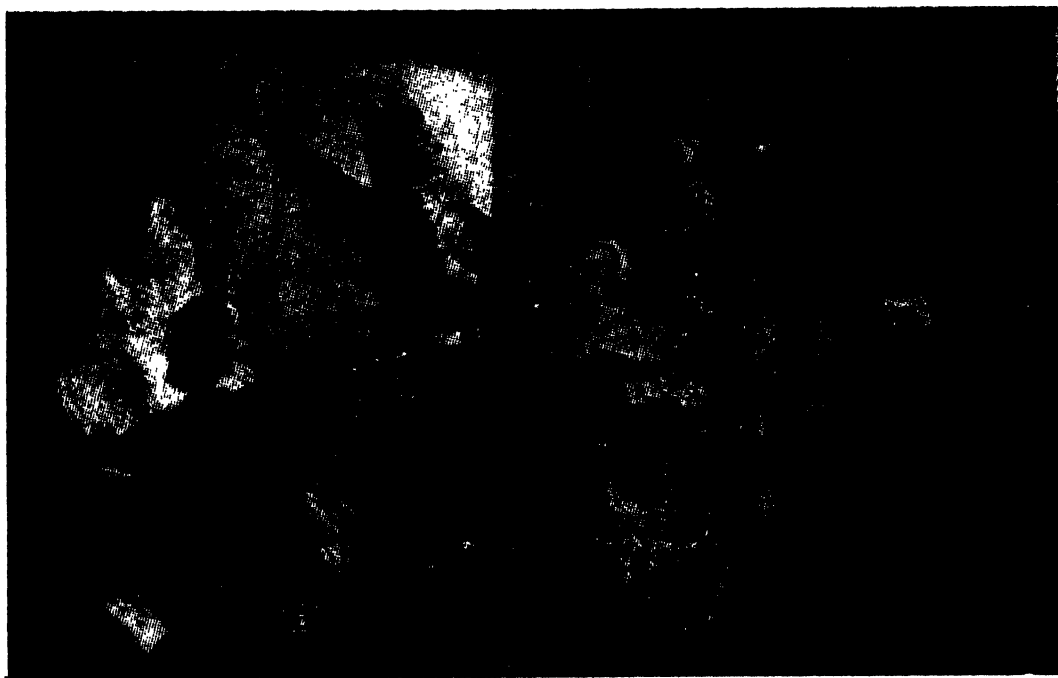
আশ্চর্যের কথা এই যে, এটি বিপ্লবের সঙ্গীত হলেও, সঙ্গীতকার De Lisle ছিলেন একজন রাজবংশ-জাত যুবক। এই গান শুনে যুবকের মা ছেলেকে লিখেছিলেন, এটি দস্যুর সঙ্গীত। তুমি এটা লিখেছ ব'লে আমি লজ্জিত।

রাজবংশজাত এই যুবক De Lisle দেশের দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্য দেখেছিলেন, এবং এসবই তাঁকে এই গান লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ২৩শে এপ্রিল ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এই ফরাসী যুবক ষ্ট্রাসবুর্গের মেয়রের বাড়িতে থাকতেন। সেই সময়ে সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয় যে, ফরাসী সৈন্যদের একটি উদ্দীপনাপূর্ণ জাতীয় সঙ্গীতের আবশ্যকতা আছে।

সমস্ত রাত্রি ধরে ভাবতে ভাবতে De Lisle-র মাথার মধ্যে এই জাতীয় সঙ্গীতের কথাগুলি এসে যায়। ভোরবেলা উঠে তিনি সেই কথাগুলি কাগজে লিখে গান করতে থাকেন।

তোমরা বুঝতেই পারছ এই সঙ্গীতের কথা ও সুর মানুষের রক্তকে জাগিয়ে দিয়েছিল।

এই তরুণ তখন ভাবতেই পারেন নি যে, তাঁর এই সঙ্গীতের প্রেরণা মানুষের কল্পনাকে এইরূপভাবে আচ্ছন্ন করতে পারবে। প্রথমে এই উদ্দীপনাপূর্ণ জাতীয় সঙ্গীতের নাম ছিল 'chant de guerre'। পরে 'La Marseillaise' নাম গৃহীত হয়, কারণ বিপ্লবী সৈনিকেরা মার্সাই নগরী থেকে গিয়ে প্যারিসে প্রবেশ করে।

পরে, বিপ্লব চলাকালীন De Lisle-কে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা হয়। কয়েক হপ্তাহ ধ'রে অন্ধকার কারাগারে তাঁকে অর্ধভুক্ত অবস্থায় রাখা হয়। এই সময় কদাচিৎ দিনের আলো তাঁর চোখে এসে পড়ত। কারাগারে তাঁর শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় পাচ্ছিল এবং সেখান থেকে মুক্তির কোন আশাও কোনদিন তিনি করেন নি। তিনি স্থির জানতেন যে, গিলোটিনেই তাঁর গলা কেটে ফেলা হবে।

এই সময় এক রাত্রে জেলের অধ্যক্ষ তাঁকে এসে চুপি চুপি বললেন, 'তুমি দেশের লোকের বন্ধু', এবং তার জন্যে খাবার ও কাপড়চোপড় এনে দিলেন। পরে তিনি বন্দীকে পার্শ্ববর্তী দরজা দেখিয়ে পালিয়ে যেতে বললেন এবং সেই সঙ্গে আরও বললেন, কিছু খাবার ও ফ্লাস্ক তোমার সঙ্গে দিলাম। De Lisle নিরাপত্তার জন্য পাহাড়ে পালিয়ে গেলেন, কারণ তিনি জানতেন তাঁকে যে ধরে দিতে পারবে সে অর্থলাভ করবে। তাই তিনি দিবাভাগে লুকিয়ে থেকে রাত্রে নিশ্চিন্তে অগ্রসর হতে লাগলেন। এই সময় এক-একদিন পথে তিনি তাঁর রচিত গান Marseillaise শুনতে পেতেন।

এই গানটি তাঁর কাছে প্রেতের মত ছিল। যেখানেই এটি গাওয়া হ'ত, তাঁর মনে হ'ত মৃত্যুর দূত যেন তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি মাথাই এইজন্য গিলোটিনে কাটা পড়েছিল।

মৃতপ্রায় ও উপবাসী অবস্থায় তিনি অনেকদিন বেঁচে ছিলেন।

বিপ্লবীদের পরাজয় ঘটলে এই সঙ্গীত নিষিদ্ধ হয়। তবে দেশে গানটি পরে পুনঃপ্রচলিত হয়। এমন কি নেপোলিয়ান রাজপরিবারভুক্ত হলেও, এই গান অত্যন্ত ভালবাসতেন। এই গানটিকে সমাদর করে তিনি বলেছিলেন, দেশে ইহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। আজকের দিনে ফরাসী দেশের এই লেখকের স্মৃতিরক্ষার জন্য নানাস্থানে স্তম্ভ তৈরী হয়েছে এবং ফরাসী দেশ ছাড়াও

অন্য দেশেও এই গান শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত ব'লে পরিচিত হয়েছে। গানের কোনো কোনো কথার আধুনিক কালে পরিবর্তন হয়েছে।

গানটি প্রাচীনকালে এইরূপ ছিল—

Ye sons of France, awake to glory !
Hark ! hark ! what myriads bid you rise—
Your children, wives, and grandsires hoary,
Behold their tears and hear their cries !
Shall hateful tyrants, wischief breeding,
With hireling hosts, a ruffian band,
Affright and desolate the land,
While peace and liberty lie bleeding ?
To arms, to arms, ye brave !
Th' avenging sword unsheathe !
March on ! March on, All hearts resolved
On victory or death.

ওয়ান—টু—থ্রি

শ্রীমতী লীলারাণী চ্যাটার্জী

ক্লাস—ওয়ান
সাবাস জোয়ান।
ক্লাস—টু
চীনেম্যান চু।
ক্লাস—থ্রি
আমি এখন ফ্রি।
ক্লাস—ফোর
দেমাক বড় তোর।
ক্লাস—ফাইভ
দে ডাইভ।
ক্লাস—সিক্স
লাগাও ভিক্স।

ক্লাস – সেভেন
চল যাই হেভেন।
ক্লাস—এইট
চালাও ক'ষে ফাইট ?
ক্লাস—নাইন
হবে তোর ফাইন।
ক্লাস—টেন
মারো জোরে 'কেন'।
ক্লাস—ইলেভেন
দাঁড়ি টেনে দেন।
হায়ার সেকেণ্ডারি
তোমায় প্রণাম করি।

॥ চক্রবৎ পরিবর্তন্তে ॥

শ্রীশুভঙ্কর ঘোষ

কান্না কেন দুঃখ দেখে, রুক্ষ কেন মন !
দুঃখ সনে যুদ্ধ তরে হও গো সচেতন।
দুঃখে যদি না বরিলে
কষ্ট যদি না করিলে
কেমন ক'রে পাবে বলো অতুল সুখের ধন ;
কান্না কেন দুঃখ দেখে, রুক্ষ কেন মন !

কষ্ট যদি না করো ভাই কেষ্ট কভু মিলবে না,
নিরাশাতে ডুব দিলে তাই আশার প্রদীপ জ্বলবে না।
ব্যর্থ যদি হও কোনোবার
মনটি যদি না হয় আঁধার
সাফল্য যে তোমার কাছে আসতে তখন ভুলবে না ;
কষ্ট যদি না করো ভাই কেষ্ট কভু মিলবে না।

বীর যদি হও জয়ের মালা পেতে হয় না দেরী
দিগ্‌বিদিকে উঠবে বেজে দিগ্বিজয়ের ভেরী।
দুখের তুফান সইলে যদি
স্থির থাকিলে নিরবধি
মনের মাঝে শান্তিভবন উঠবে তবে গড়ি
ক্লেশের চাবুক পথের ধুলোয় থাকবে তখন পড়ি।

জীবন-নদে ঢেউ তোলে ভাই দুঃখ-সুখের স্মৃতি
জোয়ার-ভাঁটা যেমন খেলে নদীর বুকে নিতি।
একের পরে অন্য আসে
জীবন নদে নিত্য ভাসে,
চক্রসম ঘুরছে তারা গাইছে আপন গীতি
জীবন-নদে ঢেউ তোলে ভাই দুঃখ-সুখের স্মৃতি।

শপথ করো—'সারা জীবন ভয় কভু না পাবো
দুঃখ নামক পাজী-র সাথে লড়াই ক'রে যাবো।

জয়তু সুভাষ
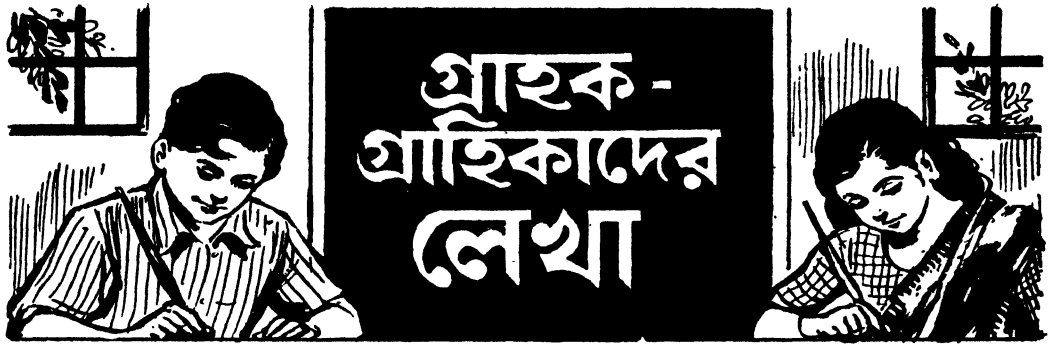
আজ থেকে ৬৯ বছর আগের কথা। ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী ভারতের এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিন ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা, বাংলামায়ের স্নেহের দুলাল সুভাষচন্দ্র কটকে জন্মগ্রহণ করেন।

ঐ শিশুটিই পরবর্তী জীবনে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বোত্তম যোদ্ধা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। অন্যায়কে তিনি কোন দিনিই প্রশ্রয় দেননি। অন্যায় দেখলে তিনি সর্বদা দৃঢ় হস্তে তার প্রতিকার করতেন। তিনি বুঝেছিলেন স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। তাই তিনি দেশকে বৃটীশ কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য সব কিছুই ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।

দিনের পর দিন বৃটীশ কারাগারে আবদ্ধ থেকে, বহু প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করেও, তিনি স্বীয় সংকল্পে ছিলেন অটুট। অবশেষে নিজগৃহে নজরবন্দী থাকবার পর, ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে সহস্র প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে স্বদেশ থেকে অন্তর্ধান হন। নানা জায়গা ঘুরে বহু কষ্টে তিনি বার্লিন পৌছন। সেখানে ভারতীয় জনসাধারণ তাঁকে অমন্ত্রণ করলে তিনি বলেছিলেন, "আপনারা সংবাদপত্রে পড়েছেন যে আমি ভারত ত্যাগ করে চলে এসেছি। আর আমি এখানে এসেছি বিদেশ থেকে ভারতকে স্বাধীন করার সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। আপনারা আমার এই সংকল্প-সাধনে নিশ্চিয় সহায়তা করবেন।" এই বক্তব্য থেকে বোঝা যাবে যে, ভারতকে স্বাধীন করার জন্য তাঁর কি অসাধারণ আগ্রহ ছিল।

অনেকে বলেন, বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়; অনেকে আবার এ কথা বিশ্বাস করেন না। আজ ভারত স্বাধীন। নেতাজীর একদিনের সহকর্মীরাই আজ ভারতের শাসন-ভার পরিচালনা করছেন। স্বাধীন-ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছেন, নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ সত্য।

সুভাষচন্দ্র তাঁর অসাধারণ কীর্তির জন্য অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁর বীরত্ব, আদর্শনিষ্ঠা ও স্বদেশানুরাগ শুধু বাংলার নয়, শুধু ভারতের নয়, সারা জগতের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করবে—অনুপ্রাণিত করবে স্বাধীনতা-প্রিয় জনসাধারণকে।

নেতাজী আজ জীবিত কি মৃত জানি না। তবে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁকে আমাদের সহস্র প্রণাম!

তাঁর আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হয়েছে। তিনি যা চেয়েছিলেন—দিল্লীর লালকেল্লায় 'আজাদ হিন্দ বাহিনীর' হেড কোয়ার্টার হবে, আর ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড়িবে তার শীর্ষদেশে—

তা আজ হয়েছে। কবিগুরুর একটি কবিতার অংশ তুলে দিয়ে, আমার প্রবন্ধ শেষ করলাম—

"নবজীবনের সংকট পথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবেনা থামি।
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নবনব,
দুর্গম মাঝে পথ করি দিবে,
জীবনের ব্রত তব।
যত আগে যাব দ্বিধা সন্দেহ
ঘুচে যাবে পাছে পাছে,
পায়ে পায়ে তব ধ্বনিয়া উঠিবে
মহাবাণী আছে আছে।

শ্রীসত্যশংকর সুর

রাজা ও ভজা

এক যে ছিল রাজা
খেত পাঁপর ভাজা।
না পেলে সে পাঁপর
ছিঁড়তো বসে কাপড়।

রাজার চাকর ভজা
খেত কেবল গাঁজা।
খেয়ে বেশী একদিন,
মাথা ঘুরে প'ড়ে মরে
রাত্রে দেখে দিন!

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

স্কেচ
শিল্পী : শ্রীইন্দ্রাণী সেনগুপ্তা (বয়স : ৮ বৎসর)

রাঁচীতে

মহালয়ার আগের দিন স্কুলে পূজার ছুটি হইল। বাসায় সারাদিন ধরিয়া চলিল জিনিস-পত্রের বাঁধা-ছাদা। সন্ধ্যাটি আসিতেই বাবা, মা, দিদি, দাদা, আমি ট্যাক্সি করিয়া হাওড়ায় আসিয়া রাঁচী এক্সপ্রেসে চাপিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর কামরাখানিতে সেদিন কী ভিড়! গাড়ী যখন ছাড়ে, তখন মনে হইল মুড়ির টিনে ঝাঁকি দিয়া মুড়ি বোঝাই করা হইয়াছে। আমরা আগে-ভাগে কোণার দিকে জায়গা লইয়াছিলাম তাই তত কষ্ট হইল না।

পথ চলার এক বিচিত্র মোহ আছে। আমাদের গাড়ী রাত ৮টা ৩০ মিনিটে হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়িল। রেলগাড়ী তাহার হৃদয়ের সোঁ সোঁ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, দুমদাম শব্দ করিতে করিতে চলিতে লাগিল।

রাঁচী শহরে পৌছিলাম পরের দিন শনিবার বেলা নয়টায়। বলা বাহুল্য, বাবার এক বন্ধু থাকেন রাঁচীতে। তিনি চাকুরী করেন বলিয়া সেখানে একলাই থাকেন। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র সব দেশে, অর্থাৎ দিল্লীতে থাকেন। তাঁহাকে (বাবার বন্ধুকে) আমরা আগেই খবর দিয়াছিলাম। তাই তিনি আমাদের জন্য একটি ঘর ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা সেই ঘরেই গিয়া উঠিলাম।

তাহার পরের দিন অর্থাৎ রবিবার আমরা তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সারিয়া, বাবার বন্ধু কাকুর সঙ্গে ট্যাক্সি করিয়া ছুটিলাম হুড্রো জলপ্রপাত দেখিতে। হুড্রোর নিকট পৌছুতে আমাদের এক ঘণ্টা সময় লাগিল। গাড়ী হইতে নামিয়া পাতালে নামিলাম। পাতালই বটে; কেবলই নামিতেছি—আঁকাবাঁকা সরু পাহাড়ের রাস্তা। পা আর চলে না; মন তবু দৌড়ায়। নামিয়া দেখি, সে এক রাজ্য! বড় বড় পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ছোট-বড় গাছ, বেশ ছায়ায় বসা যায়। এখানে, সত্যই প্রকৃতি মানুষকে পাগল করে। যেন দশ তলা বাড়ীর ছাদ হইতে প্রচণ্ড বিক্রমে জলের ধারা পড়িতেছে। অর্ধ-পথে পড়িয়া খাড়া পাহাড়ের গায়ে বাধা খাইয়া জলের সে কী দুর্গতি! তুলা ধুনিবার সময় তুলার যে অবস্থা, এ সেই। ইহা দেখিলে চোখ ফিরানো যায় না। আঃ, প্রকৃতি তোমার মোহন মূরতি পৃথিবীর বড় একটা জলপ্রপাত দেখিয়া জীবন ও চক্ষু ধন্য করিলাম।

তাহার পর আমরা উপরে উঠিয়া গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। পরদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ছুটিলাম কাঁকে, পাগলা হাসপাতাল দেখিতে। আমরা কিন্তু রান্না, খাওয়া-দাওয়ার সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। বেলা প্রায় ২টার সময় পাগলা-হাসপাতালে পৌছিলাম। প্রথমে পুরুষদের বিভাগে গেলাম। যাইয়া দেখি, কেহ বাগানে ঘুরিতেছে, কেহ বারান্দায় দাঁড়িয়া রহিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রতি সপ্তাহের শনি-রবিবার এই সকল লোকদের সিনেমা থিয়েটার দেখানো হয়ে থাকে

সেখান হইতে মেয়েদের বিভাগে গেলাম। এইখানে অবাঙ্গালীদের সংখ্যাই বেশী। মায়ের সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা আলাপ করিল, কিন্তু সে নাকি পাগল। একটু পরে তাহা বুঝিলাম—বিড়্ বিড়্ করিয়া সে কী বলিতে লাগিল। আমি আর দেখিতে পারিলাম না। মার চোখে দেখিলাম জল। আহা! মানুষের এ কী দুর্ভাগ্য! মাথার কল বিগড়াইলে আর কিছুই থাকে না। শুনিলাম —কতক কতক রোগী এখান হইতে ভাল হইয়া বাড়ী ফেরে। তারপরে সেখান হইতে আমরা যখন বাসায় ফিরিলাম—তখন রাত ৮টা। বেশ লাগিল রাঁচীর শহরের চারিদিকে বেড়াইতে। প্রাণের লক্ষণ চারিদিকেই ছড়ানো। তার পরের দিন রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে রাঁচী স্টেশন থেকে গাড়ীতে চড়িয়া আমরা সোজা হাওড়ায় ফিরিলাম। রাঁচীর দুই বিস্ময়—হুড্রোর জলপ্রপাত, আর পাগলা গারদ—সারা রাস্তায় চোখের সম্মুখে সে দৃশ্য ভাসিতে লাগিল।

শ্রীখুকু ব্যানার্জী

—

উপরের ছবিতে হরিখুড়ো, হরিরাম, নরহরি, ভজহরি, রামহরি, ও হরিহর নামে ছ'জন লোক আছে প্রায় একরকম দেখতে। কিন্তু এই ছ'জনের মধ্যে দু'জন হুবাহু একরকম। সেই দু'জনকে এই ছবির মধ্যে থেকে তোমরা বার করতে পার কিনা দেখ।

মেঠুড়ে

এশীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা

এবার উঠতি ভারতীয় জয়দীপ মুখার্জি এশীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস্ ফাইন্যালে জিতেছেন। প্রখ্যাত রমানাথন কৃষ্ণানকে তিনি সরাসারি তিন সেটে হারিয়ে তাঁর সাফল্যকে স্মরণীয় করে তোলেন। ভারতীয় টেনিসে কৃষ্ণানের স্বীকৃতি ছিল পয়লা নম্বর হিসেবে এবং জয়দীপের দু নম্বর। তবুও দ্বিতীয় জনের হাতে প্রথম জনকে গত ২রা জানুআরি শোচনীয়ভাবে হারতে হয়েছে। গত বারো বছর কৃষ্ণান স্বদেশের মাটিতে আর কোনো ভারতীয়ের কাছে হারেন নি এবং তিনিই ছিলেন গত তিন বছরের এশীয় চ্যাম্পিয়ন। ২রা জানুআরি উডবার্ণ পার্কে ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবের লনে জয়দীপ বনাম কৃষ্ণানের সিঙ্গলস খেলার মীমাংসা হয় এক ঘণ্টা এগারো মিনিটে। জয়দীপ ও কৃষ্ণানের আগে ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র দিলীপ বসুই এশীয় টেনিসে চ্যাম্পিয়ন আখ্যা পেয়েছিলেন।
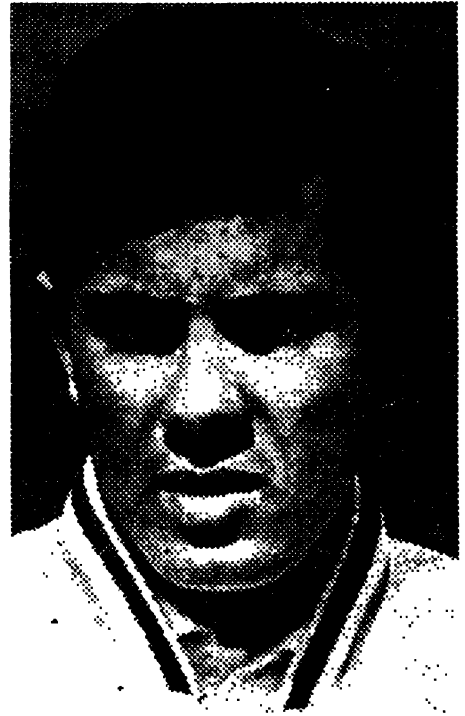
জয়দীপ মুখার্জি

এই দিনের খেলায় জয়দীপ মুখার্জি সব দিকে উন্নততর ক্রীড়াশৈলীর পরিচয় দিয়ে প্রথ থেকে খেলার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর ক্ষিপ্রগতি, মারের ভঙ্গিমা ও চাতুর্য এব প্রতিদ্বন্দ্বীর চাল আগে থেকে অনুমান করার ক্ষমতাই তাঁর সাফল্যের মূল কারণ। কৃষ্ণান তাঁ স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেন নি। ফলে জয়দীপ কৃষ্ণানের কাছে অনেকগুলো পয়েন্ট আদা করে শেষ পর্যন্ত এশীয় লন টেনিস চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেন।

সুব্রত মুখার্জি কাপের খেলা

দিল্লীতে সর্ব-ভারতীয় স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা, সুব্রত মুখার্জি কাপের ফাইন্যাল খেলায় এবা জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। গুর্খা মিলিটারী স্কুল এবং হাজারীবাগের কে, এ, বি, স্কুল ফাইন্যা তিনটে করে গোল করায় অতিরিক্ত সময়ের খেলা হয়। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের খেলায় অ কোনো গোল না হাওয়ায় শেষ পর্যন্ত দু' দলকেই যুগ্ম-বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। গুর্খা মিলিটা স্কুল টসে জিতে প্রথম ছ-মাস কাপটি তাদের অধিকারে রাখার সম্মান পায়। প্রধানম স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রী খেলার শেষে গুর্খা মিলিটারী স্কুলের অধিনায়কের হাতে সুব্রত মুখা কাপটি তুলে দেন। তোমরা জানো কিনা জানি না, যে-সব ছাত্র-খেলোয়াড়ের বয়েস সতে বছর বা সতেরো বছরের কম, একমাত্র তারাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে।

নেহরু মেমোরিয়াল হকি প্রতিযোগিতা

সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল এবং নেহরু স্মৃতি হকি দুটো প্রতিযোগিতাই সরকারী সাহায্যপু সুব্রত কাপের পরিচালক ডুরাণ্ড ফুটবল কমিটি আর নেহরু স্মৃতি হকির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকা সাক্ষাৎ যোগাযোগ।

নেহরু হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে মীরাটের শিখ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার ১-০ গোলে বোম্ব একাদশকে হারিয়ে দেবার পর রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন বিজয়ী দলের হাতে নেহরু স্মৃতি কাপ তুলে দে

আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি রিও-ডি-জেনারিওতে সোভিয়েট রাশিয়া ও ব্রেজিলের আন্তর্জাতিক ফুটবল ে ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর ১৯৬৬-র বিশ্ব-কাপের জন্যে ব্রেজিলের বাইশ খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৫৮ এবং ১৯৬২ সালের বিশ্ব-কাপ বিজয়ী ব্রে পরপর তিন বছর জুলেস রিমেট কাপ পাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। বিশ্ব-কা পরিচালক আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা। প্রাক্তন সভাপতি জুলেস রিমেট ছিলেন ফ্রা অধিবাসী। তাঁরই স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রতি তিন বছর অন্তর বিশ্ব-ফুটবল প্রতিযো হয় এবং বিজয়ী দল তাঁর নামাঙ্কিত কাপটি পায়।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মূল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবার তিন বছর আগে ব্রেজিলের ফুটবল কর্মকর্তারা চেশায়ারের লীম হোটেল নিজেদের জন্যে বুক করে রেখেছেন এবং ১৯৬৩ থেকেই এখানে ব্রেজিলের ফুটবল কর্মকর্তারা আশা-যাওয়া করছেন। এক দিকে যেমনি টেকনিক, ট্যাকটিকস, দৈহিক এবং মানসিক ক্ষমতায় খেলোয়াড়দের বিশ্বজয়ী হবার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হচ্ছে, অন্য দিকে তেমনি তাদের কোনো কিছুতে অসুবিধে না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

একটা খবর এসেছে, এবার ব্রেজিল যদি বিশ্ব-কাপ পায়, তবে তার পরিপূরক হিসেবে 'জুলেস রিমেট কাপের' বদলে ইংলণ্ডের প্রাক্তন এবং পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের নামে বিশ্ব-কাপের প্রবর্তন করা হবে এবং সেটা ব্রেজিলই দান করবে।
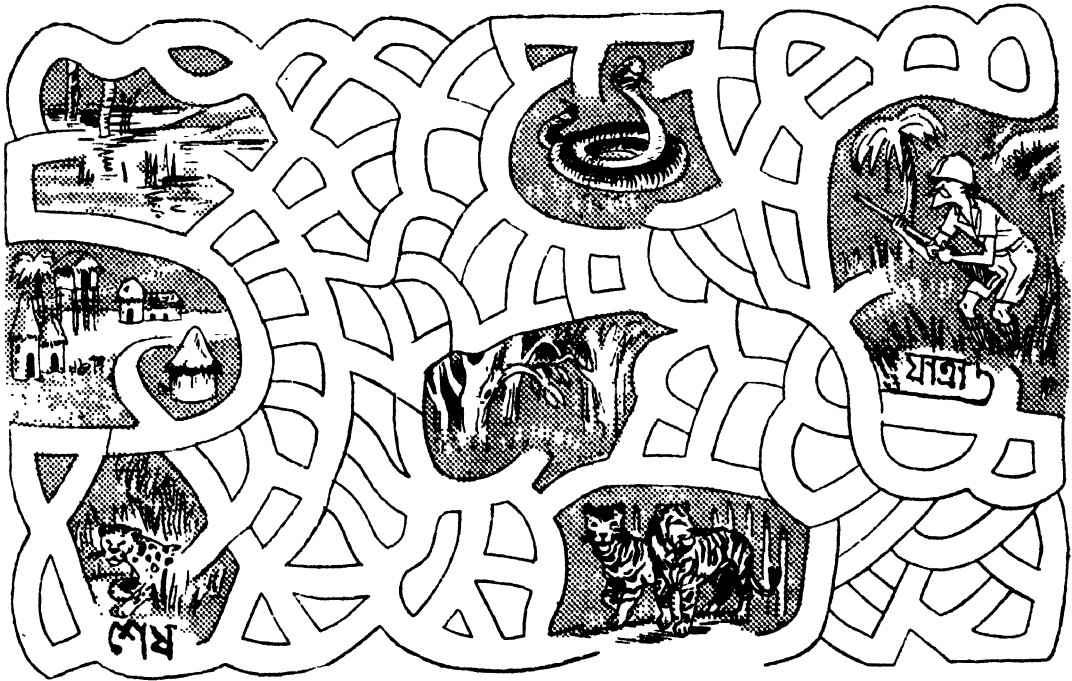
বুড়ো মিঃ গোমেসের ভীষণ শিকারের সখ। তিনি সুন্দরবনের জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিলেন। কিন্তু শাপ-বাঘে ভরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পথ হারিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে 'শেষ' লেখা জায়গাটিতে এসে পড়েন এক বাঘের মুখে এবং সে বাঘটিকে তিনি হত্যা করেন। এখন কোন্ রাস্তা দিয়ে, কি ভাবে, তিনি 'যাত্রা' থেকে 'শেষ' লেখা জায়গাটিতে এসেছিলেন, সেই পথটি তোমরা বার করতে পার কিনা চেষ্টা করে দেখ।

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

রণ্টুর ডাইরী—শ্রীসলিল সরকার। শ্রীমুরারী-মোহন শীল কর্তৃক রামচরণ শেঠ রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। পরিবেশক—শরৎ বুক হাউস, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১·৮০

ছোট্ট রণ্টুর জীবনের আটটি বিভিন্ন কাহিনী সুন্দর সহজ ভাষায় এমনভাবে লেখক বর্ণনা করছেন যে, সবগুলির মধ্যেই রণ্টু যেন আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ভেসে ওঠে। লেখক ছোটদের সাহিত্যে খ্যাতিমান না হলেও, ছোটদের মনটিকে তিনি যে ভালভাবেই বোঝেন তা এই বইখানি পড়লেই জানা যায়। ছোটরা রণ্টুর 'প্রাইজ', 'জন্মদিন', 'দুর্ঘটনা', 'রেনি ডে', 'নালিশ', 'পঞ্চুমামার গল্প', 'শিউরে ওঠে গা' ও শেষ গল্প 'রণ্টুর ডাইরী' প্রভৃতি প্রত্যেকটি কাহিনী পড়েই আনন্দ পাবে এবং রণ্টুকে সহজে ভুলতে পারবে না। প্রচ্ছদপটটি মনোরম।

—

বিন্নি ধানের খই—শ্রীসতীকুমার নাগ। সরস্বতী বুক ডিপো, ২২বি, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৫০

'বিন্নি ধানের খই' ছোটদের ও পরিণত বয়স্ক নব-শিক্ষার্থীদের উপযোগী একখানি সুন্দর বই। আমাদের সমাজে যে সকল লোকাচার ও পূজা-পার্বণ প্রচলিত, গ্রামে-ঘরে যে সকল ব্রত, গান, ছড়া, কবিগান প্রভৃতি হয়ে থাকে, সেই সকল বিষয় আলাদা আলাদা করে কয়েকটি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে লেখক সহজভাবে বলেছেন এই বইটির মধ্যে। এ থেকে তোমরা বাংলা পুঁথি, ভাদু উৎসব, ঘণ্টাকর্ণ পূজা, মাণিকপীর প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে। অনেকগুলি সুন্দর ছোট ও বড় লোকচিত্রের ঢঙে আঁকা ছবি আছে বইখানির মধ্যে। ছবিগুলি এঁকেছেন সুনন্দা দেবী।

—

বিচিত্রা—শ্রীননীলাল দে। শ্রীঅমিয়বালা দে কর্তৃক বাণীপুর, পোঃ বাইগাছি, হাবড়া হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—ষ্টুডেণ্টস্ বুক সাপ্লাই, ১৫, কলেজ স্কোয়ার। মূল্য ১·০০

একটি শব্দকে বহু ভাবে প্রকাশ ক'রে, ব্যাকরণের রীতিতে যাকে অনুপ্রাস, যমক বলে, সেই ভাবে বর্ণানুক্রমিক 'অ' থেকে 'হ' পর্যন্ত নানা ধরনের ছোটদের উপযোগী মধুর উপভোগ্য অনেকগুলি ছড়া ও কবিতা আছে এই বইখানির মধ্যে। কতকগুলির সঙ্গে ছবি থাকায় ছোটরা পড়ার সঙ্গে ছবিগুলি দেখে আনন্দ পাবে।

—

তোমাদের সঙ্গে কথা বলে লেখাটি শেষ করেছি, এমন সময় নিদারুণ খবর এলো—ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী আকস্মিক পরলোক গমন করেছেন।

দেশের জনগণ স্তম্ভিত হয়ে শুনলো এই সংবাদ—যেন অবিশ্বাস্য সংবাদ। পূর্বরাত্রি পর্যন্ত তাসখণ্ডে তাঁরা যে ঐতিহাসিক সনদ স্বাক্ষর করলেন—তার পূর্ণ বিবরণ জানার জন্য যখন জনসাধারণ উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করছে, তখনই সংবাদ এলো তিনি আর নেই। স্বাক্ষর করার কিছুক্ষণ পরে ফোনে কথা বলেছেন দিল্লীর বাড়িতে—আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল!

মাত্র ১৮ মাস তিনি প্রধানমন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করেছিলেন। অত্যন্ত অনাড়ম্বর এবং শান্ত অথচ তেজস্বী ছিলেন শাস্ত্রীজী। তাঁর মন্ত্রিত্বের কালটি সবচেয়ে দুঃসময়ে ছিল। পণ্ডিত নেহেরুর পরলোকগমনে এবং এই আঠারো মাস ভারতবর্ষ অত্যন্ত দুর্যোগের মধ্যে কাটিয়েছে—সেই সময় তিনি বিপদে ধীর, অবিচল এবং প্রয়োজনবোধে অস্ত্রধারণ, এই যুক্তি গ্রহণ না করলে—এতবড় দুঃসময় ও অশান্তির ঢেউকে সংযত করতে পারতেন না।

সব বিঘ্ন বিপদ তুচ্ছ করে এক দিকে দেখালেন প্রসন্ন সূর্যোদয়—অপর দিকে আমরা হারালাম তাঁকে।

ভারতের নদী, জল, মাটি, বাতাস—সকলে শাস্ত্রীজীকে গ্রহণ করলো। আমরা নিঃসহায় হয়ে গেলাম। আমাদের সকলকে, বিশেষতঃ ছাত্র-সমাজকে এখন অত্যন্ত শান্ত ও সংযত হয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে অগ্রসর হতে হবে। তিনি ছিলেন শান্তির পূজারী। সকলকে মিত্রতায় আবদ্ধ করে মহাযাত্রায় চলে গেলেন—এখন তাঁর সেই পথ ধরেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। দেশের ছাত্র-সমাজকে একথা মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে দুঃখ-শোকের দুর্বহ

বেদনার বাণী আসছে শ্রীমতী শাস্ত্রী ও তাঁর পরিবারের জন্য—আমরা দেশের অগণিত জনসাধারণও পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণ করি সেই শান্তির দূতকে এবং সহানুভূতি জানাই শাস্ত্রী-পরিবারকে। আর বলি—

মৃত্যু নয়; ধ্বংস নয়
শুধু বিচ্ছেদের ভয়
শুধু সমাপন।

শাস্ত্রীজী অমর হয়ে থাকুন ভারতের জনসাধারণের অন্তস্তলে।

মহাজীবন থেকে—

আমাদের শাস্ত্রে বলে চেষ্টা করলে অসাধ্যসাধন করতে পারে মানুষ। আজকের দিনে একথার সত্যতা তো প্রতিনিয়তই প্রমাণিত হচ্ছে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে আজ মানুষের অবাধ গতি। মহাকাশও আজ মানুষের আয়ত্তের বাইরে নয়। কিন্তু এ তো হলো সঙ্ঘবদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফল। বহু মানুষের বহুদিনের শ্রম, জ্ঞানচর্চা আর রাষ্ট্রের অকুণ্ঠ সমর্থন—এই সব মিলে আজ বিশ্ব ও মহাবিশ্বের রহস্যভাণ্ডারের চাবিকাঠি তুলে দিয়েছে বিজ্ঞানীদের হাতে। এই সাফল্যের মূলে রয়েছে সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র-পরিচালিত সঙ্ঘবদ্ধ অনলস প্রয়াস। যারা এই প্রয়াসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত, তারা সকলেই এর কৃতিত্বের অংশীদার।

কিন্তু সাধারণ তোমার-আমার মতো মানুষের কথা ধরা যাক। সঙ্ঘবদ্ধ কোন প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার সুযোগ পেলো না যারা, কিংবা রাষ্ট্র তার সর্বাত্মক সাহায্য নিয়ে যাদের সঙ্গে সহযোগিতায় এগিয়ে এলো না, তাদের সংখ্যাই তো ষোলোর মধ্যে পনেরো আনা—আমরা তোমরা আর একশোর মধ্যে নিরানব্বুই জনই এই দলে। কিন্তু আমাদের জন্যই তো প্রত্যয়শীল শাস্ত্রবাক্য—চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই।

সেকালের প্রামাণ্য পুঁথিপত্রে উল্লেখ রয়েছে শ্রুতিধর আর স্মৃতিধরের কথা। একবার যা পড়বেন অথবা একবারমাত্র যা কান দিয়ে শুনবেন, তা চিরকালের জন্য তাঁদের স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে থাকবে। পরীক্ষাচ্ছলে কেউ যদি তাঁদের জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তাঁরা নির্ভুল ভাবে বলে দেবেন চোখ দিয়ে যা পড়েছেন সেই কথার পর কথা, লাইনের পর লাইন, কিংবা কান দিয়ে যা শুনেছেন, সেই শোনা কথার প্রতিটি খুঁটিনাটি কথা। এরাই হলেন শ্রুতিধর আর স্মৃতিধর। নমস্য ব্যক্তি তাঁরা, কিন্তু তাঁদের দেখা কদাচিৎ মেলে—যাঁরা দেখেছেন এই রকম প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁদের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়।

কিন্তু কচিৎ-কদাচিৎ দেখা পাওয়া যায় বলেই তো ভরসা হয় যে, মানুষের মধ্যে এমনি প্রতিভার

বিকাশ অসাধারণ হলেও অসম্ভব নয়। এমনি এক অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী জগদ্‌বরেণ্য মহাপুরুষের কথা বলছি।

কিছুদিন হলো বেলুড় মঠে Encyclopaedia Britannica একসেট এসেছে। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বাঁধানো বই, গায়ে সোনার জলে নাম লেখা—দেখলেই হাতে নিতে ইচ্ছা হয়। একটি দুটি খণ্ড নয়—পর পর চব্বিশটি খণ্ডে পরিকল্পিত এই বিরাট গ্রন্থে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দেওয়া হয়েছে। মঠের যে ঘরখানিতে বইপত্র রাখা হতো সেই ঘরে বইগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বামীজি—স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর পাশে তাঁর পরম অনুগত শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। শরৎচন্দ্রের লোভাতুর দৃষ্টি বইগুলোর দিকে আকৃষ্ট হলো। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মুখে-চোখে ভেসে উঠলো একটু অসহায় ভাব—স্বামীজিকে লক্ষ্য করে শিষ্য বললেন : এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট।

স্বামীজির মুখে দেখা গেল সকৌতুক হাসির ছটা। বললেন : কি বলছিস ? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, সব বলে দেবো। শিষ্য তো অবাক—এই তো সবে মাত্র কয়েক দিন বইগুলো এসেছে, তাছাড়া স্বামীজির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে। ক'দিন থেকে তাঁর পীড়ার প্রকোপ বেড়ে গেছে—তার উপর আবার অসুস্থ দেহ—অথচ স্বামীজি বলছেন—যা খুশী জিজ্ঞাসা করতে। অবাক হয়ে শিষ্য প্রশ্ন করলো : আপনি কি এরই মধ্যে এইসব বইগুলো পড়েছেন ?

স্বামীজি বললেন : না পড়লে কী অমনি বলছি ?

এবার গুরু-শিষ্যের পার্ট কিছুক্ষণের জন্য পাল্টে গেল। শিষ্য পরীক্ষক, প্রশ্নকর্তা। গুরু প্রশ্নের উত্তরদাতা। একের পর এক বই খুলে কঠিন কঠিন বিষয় বেছে নিয়ে শিষ্য ছুঁড়তে লাগলেন প্রশ্নবাণ। আশ্চর্য ব্যাপার। স্বামীজি সেইসব প্রশ্নের যা;যা উত্তর দিলেন, তার সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে বই-এর লিখিত বিষয়বস্তুর। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে স্বামীজি যে ভাষায় প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিলেন তা একেবারে হুবহু বই-এর ভাষা। পর পর দশখানি বই থেকেই প্রশ্ন করলেন শিষ্য। গুরু অবলীলাক্রমে সেইসব প্রশ্নের জবাব দিলেন—বইতে যেমনটি লেখা রয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে। পরীক্ষাপর্বের শেষে শিষ্য তো ব্যাপার দেখে হতবাক—তবু কোনরকমে বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে বললেন দু'টি মাত্র কথা—এ মানুষের শক্তি নয়!

কিন্তু এইখানেই তো শিষ্য ভুল করলেন। এই শক্তির পিছনে নেই ম্যাজিক। এর সবটাই লজিক। সেই কথাটি বুঝিয়ে দিলেন স্বামীজি—"দেখলি, একমাত্র ব্রহ্মচর্য পালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে গেল।"

অঙ্কের হিসাবে জীবনের পরিমাপ নিতান্ত স্বল্প—তাছাড়া শুষ্ক জ্ঞানচর্চার রাজ্যে বিচরণ করার মোহমুক্ত পুরুষ পেয়েছেন পরমপুরুষের চরম প্রসাদ—উপলব্ধি করেছেন বেদান্তের মূল সত্য—উপলব্ধ সত্যটিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি দেশ-দেশান্তরে। ভারতবর্ষের সীমা পেরিয়ে ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণীকে তিনি বহন করে নিয়ে গেছেন সমুদ্রপারের বিদেশে। ঘূর্ণিবাত্যার মত প্রচণ্ডবেগে আর শক্তি নিয়ে তিনি অবিরাম ঘুরেছেন পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে। একটি মুহূর্তও তাঁর নিজস্ব মুহূর্ত নয়। সংগঠনের কাজে, সত্যধর্ম প্রচারের ব্রতে উৎসর্গীত করেছেন তাঁর সমস্ত দেহ মন, সমগ্র সত্তা জীবন। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে অসময়ে তাঁর কর্মভারাক্রান্ত দেহে ঘটেছে ব্যাধির প্রকোপ—তবু কর্মচক্রকে তিনি প্রতিনিয়ত করে চলেছেন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর। কিন্তু এ সত্বেও তাঁকে কর্মযোগী বললে তাঁর সমস্তটুকু পরিচয় দেওয়া হবে না। তাঁর মধ্যে ঘটেছিল জ্ঞান ও কর্মের বিস্ময়কর সমন্বয়। তাই তো জ্ঞানরাজ্যের পথ তাঁকে সব সময়ই দিতো হাতছানি। অবসর-বঞ্চিত জীবন—কর্মশক্তির প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, দেশ-দেশান্তরে প্রসারিত তাঁর কর্মচক্রের পরিধি, নিজের হাতে গড়ে তোলা মিশনের সংগঠন সংক্রান্ত সমস্যা,—তবু তারই মধ্যে জীবনের অবসরের ক্ষণমুহূর্তগুলোকে তিনি ভরিয়ে তুলতেন জ্ঞানরাজ্যের ভাণ্ডার থেকে আহৃত রত্নখণ্ডের সাহায্যে। ব্রহ্মবরিষ্ঠ এই মহাপুরুষ—জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ডের প্রতি অবলম্বন করেননি নিস্পৃহ ঔদাসিন্য, জ্ঞান-সাধনায় মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে পরিচয়লাভে ছিলেন তিনি আগ্রহশীল—তাই Encyclopaedia Britannica-র—জ্ঞান আহরণ করার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁর নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা—আর সেই আকাঙ্ক্ষাটি পরিতৃপ্ত করার যে উপায় তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, সেই উপায়টি মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য নয়—এই কথাটিই তিনি প্রমাণিত করে গেলেন নিজের আচরণ দিয়ে।

একক মানুষের চেষ্টার ক্ষেত্রেও সাফল্যের পথ দুরতিক্রম্য হলেও অনতিক্রম্য নয়।

তোমাদের চিঠি পেয়েছি।

সকলের জন্য শুভকামনা রইল।

তোমাদের

মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য ০'৪৫ প

✽ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ✽
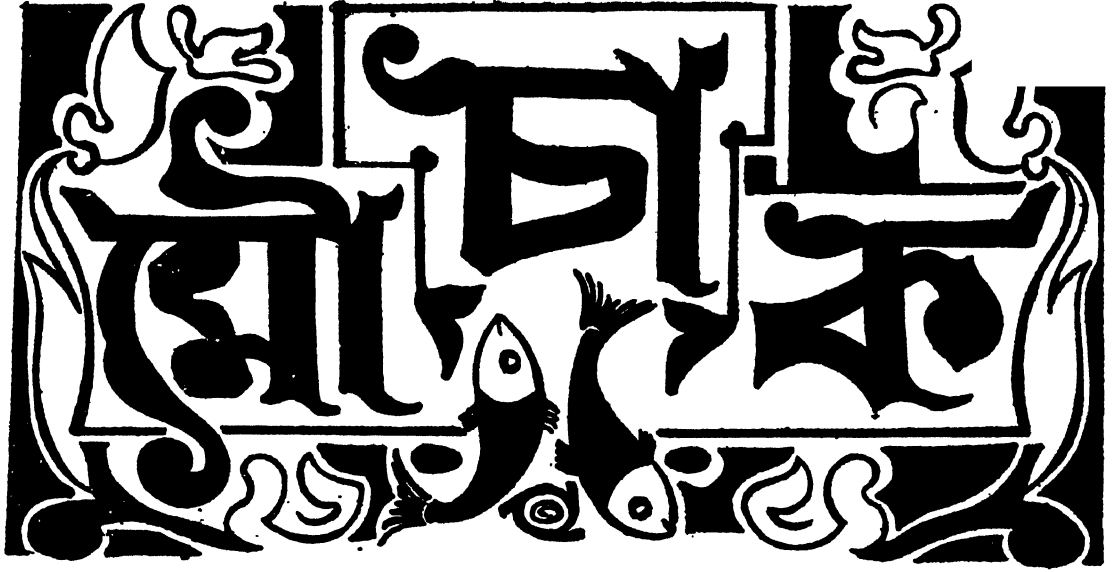
৪৬শ বর্ষ] ফাল্গুন : ১৩৭২ [১১শ সংখ্যা

লালবাহাদুর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আদ্যিকালের দিল্লী শহর
ঢের দেখেছে বাদশা, শাহানশাহ্
রাজা উজির তাজ মুকুটের ঘটা
একটি ছোট্ট মানুষ এসে
মসনদে যেই বসল দীনের মত
দিগ্বিদিকে ছড়ায় জ্যোতির ছটা।

যত রাঙা পাথর ছিল
ইতিহাসের ক্লান্তিভারে জমাট,
উঠল জেগে জীবন পেয়ে অন্য।
শান্ত মানুষ, সহজ মানুষ,
এই ভারতের সত্যি প্রাণের মানুষ
রাজধানী তার করল বারেক ধন্য।

———

বিধুর ভারত

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১

(আজ) বুঝেছি হায় সকাল থেকেই
বাতাস কেন ধীর
(কেন) ভারত-মাতার আঁখির দু'-কূল
উপচে পড়ে নীর !
আকাশ কেন ঝাপ্‌সা হলো
হঠাৎ কুয়াশায় !
হৃদয় কেন হঠাৎ এমন
কাঁপলো হতাশায় !

২

অস্ত গেছে ওই ওপারে
দীপ্ত ভারত-সূর্য
বাজিয়ে তাহার দুন্দুভি আর
সংগ্রামী জয়তূর্য ।
দিনের আলো নিবিয়ে হঠাৎ
জাগলো যেন রাত্রি
স্তব্ধ হলো বিস্ময়ে তাই
রিক্ত অভিযাত্রী ।

৩

মিলবে কোথায় আবার অমন
তুল্য কর্ণধার !
কোন্‌ সে আলোর রশ্মিছটায়
টুটবে অন্ধকার !
বাজবে আবার বিজয়-তূরী
কার সে কীর্তি-গুণে !
ধন্য হবে বিশ্বজগৎ
বীরত্ব কার শুনে !

৪

শাস্ত্রী তুমি শাস্ত্রে মোদের
দীক্ষা দিলে আজ
হাত মিলিয়ে লাগবো সবাই
করতে দেশের কাজ ।
করছি তোমার আরব্ধ কাজ
পূর্ণ করার পণ
থাকবো সজাগ লুপ্ত না হয়
মাহেন্দ্র এই ক্ষণ ।

আমাদের শাস্ত্রীজী

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমতী ললিতা দেবীসহ শাস্ত্রীজী

'ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ'—পাঁচালীর সুরে গাওয়া এক কলি গান এলো কানে। পৌষের কনকনে ঠাণ্ডায়, হিমেল হাওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল—রাত পোহালো বুঝি—পাখী সব করে রব। ভরা ভোরের মৃদু কাকলীতে তখনও ভরে ওঠেনি দিগন্ত—আকাশের পূবকোণে জবা-ফুলের মত টক্‌টকে লাল চেলি পরা সূর্যদেব তখনও গরহাজির, সাত ঘোড়ার তেজী রথে চেপে আলোর ঝাঁপি হাতে এসে বসেননি তিনি। শুধু ধোঁয়াশায় ভরতি দিকচক্রবালে একটু সাদার রেখা আস্তে আস্তে ফুটছে—কনকোজ্জ্বল বরণী নামছেন—দেবী উষা—একটা নতুন দিনের আহ্বান নিয়ে। শহর জাগচে, গ্রাম জাগচে, আশায়-আকাঙ্ক্ষায়, লোভে-লাভে, শোকে-কান্নায়, মানুষ জাগচে। হ্যাঁ, কান্না, সত্যিকারের কান্না, লোক-দেখানো হাহুতাশ নয়—রেডিয়োতে খবর এসেছে যে আগের দিন রাত্রে তাসখন্দে শাস্ত্রীজীর মৃত্যু হয়েছে। কে একজন দৌড়ে এসে যখন খবরটা দিলে, তখন বিশ্বাস হলো না—এই তো কয়েকঘণ্টা আগে চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর কসিগিনের ভোজসভায় স্বকর্ণে হাততালি পর্যন্ত শুনেছি রেডিয়ো মারফৎ—তবে? অবশ্য মানুষের জীবন পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মত—এই আছে, এই নেই, হয়তো খবরটা সত্যি নয়। না, সত্যিই, সাধারণ গেরস্ত ঘরের একটি মানুষ অসাধারণ হয়েই মিলিয়ে গেল অব্যক্তের ক্ষীরোদসাগরে। প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা গেলো খ'সে।

তুলসীদাসের দোঁহায় আছে—তুলসী, তুমি যখন জন্মেছিলে, তখন তুমি কেঁদেছিলে, সবাই হেসেছিল, এখন এমন কাজ করো, যখন তুমি যাবে, তখন জগৎ যেন কাঁদে আর তুমি হাসতে হাসতে চলে যেতে পারো। শাস্ত্রীজীর জীবন সেই উত্তরাধিকারের ইতিহাস, ভারতবর্ষের একজন খাঁটি মানুষের দিনপঞ্জী। ছোট্ট মানুষ, গাঁয়ের লোক, স্বল্পবাক্, নম্রস্বভাব—যাঁর ছিল না আচারবাদী উগ্রতা, আদর্শবাদী দাম্ভিকতা, সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করাই যাঁর নিয়ম, অথচ নিজের বিচারের উপরও আস্থাশীল,—ঘরে আদর্শ গৃহিণী, বৃদ্ধা মাতা, আত্মীয়স্বজন নিয়ে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের হিন্দু-পরিবার—এই হলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। কবি বলেছিলেন—

গান্ধী মহারাজের শিষ্য, কেউ বা ধনী কেউ বা নিঃস্ব—তিনি শেষেরটাই বেছে নিয়েছিলেন। গান্ধীজী ছিলেন দীপসত্ত ভারতবর্ষের একটি ভাবৈকরসমূর্তি—অনেক প্রাণপ্রদীপ জ্বলে উঠেছিল সেদিন সেই আহিতাগ্নি থেকে। শাস্ত্রীজী অবশ্য নেহেরুর মত আভিজাত্য বা ব্যক্তিত্ব নিয়ে আসেননি, লিংকন বা লেনিনের মত যুগনায়কও তিনি নন, তবু সাধারণ মানুষ নিজের নিষ্ঠায় ত্যাগে, চেষ্টায় কীভাবে অসাধারণ হতে পারে তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯০৪ সালের ২রা অক্টোবর তাঁর আবির্ভাব দিবস। ঐ দিনটিকে আমরা মনে রেখেছি জাতির জনকের জন্মদিন বলে। উত্তর প্রদেশের রাগনগরে ব্যাসকাশীর সীমানার মধ্যেই একটি সামান্য স্কুল-শিক্ষকের একটি ছেলে জন্মেছিল ঐদিন—মুঘলসরাই-এর রেলওয়ে কলোনীর একজন দীন কর্মচারী। ছেলেটি হেলাফেলায় মানুষ হলো, ধূলোয় বালিতে গড়াগড়ি দিলে, পাঠশালায় হাতেখড়ি হলো তার, তারপর কাশীর হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালয়ে সে ভর্তি হলো—এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা—মেসোমশাই-এর বাড়ীতে থেকে পড়ে, দরকার হলে নদী পেরুতেও পারে সাঁতার দিয়ে। বয়স কতোই বা—ষোলো, ডাক এলো—ছেড়ে দিলে পড়া, ঝাঁপিয়ে পড়লো অসহযোগ আন্দোলনে। ফলে, ইংরাজী কোন স্কুলে আর তার স্থান হলো না—ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। কাশী-বিদ্যাপীঠ তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ঢুকলো সেখানে সে, স্নাতক হয়ে বেরুলো তেইশ বছর বয়সে, শাস্ত্রী উপাধি নিয়ে—পুরো নাম তখন হলো—লালবাহাদুর শাস্ত্রী। যদি তাঁর গুরু কেউ থাকে তো নাম করা যেতে পারে দার্শনিক প্রধান ভগবান দাসের। হিন্দী-ভাষায় লাল বলতে বোঝায় প্রিয়জনকে, বাহাদুর হলেন তিনি যিনি কর্মিষ্ঠ চালাক-চতুর, আর শাস্ত্রী মানেই হলো যিনি শাস্ত্রচর্চা করেছেন অর্থাৎ অধীতবিদ্যাতে নিপুণ। লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাই শুধু নাম নয়, নামী, নামের মর্যাদা রক্ষা করেছেন সর্বতোভাবে। আসলে তিনি কায়স্থ শ্রীবাস্তব, বাস্তবকে শ্রীমণ্ডিতই করেছেন। অবশ্য লেখাপড়ার চর্চা রেখেছেন সারাজীবন—বই লিখেছেন, মাদামকুরীর জীবনী ইত্যাদি।

কাশ্মীরের ছেলে এলেন প্রয়াগে, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে। চোখের স্বপ্ন রূপ নিচ্ছে আদর্শে

হলেন সার্ভেণ্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্য—আয়ের যা কিছু উদ্‌বৃত্ত হবে দিতে হবে সোসাইটির হাতে, তাঁরা অবশ্য দেখবেন ভরণপোষণের অভাব না হয়। সারাজীবন এই নীতি পালন করে এসেছেন যিনি, নিজের ব্যক্তিগত বা পরিবারগত দুঃখদৈন্যকে তুচ্ছ করে, জীবন-মৃত্যুর ওঠাপড়াকে তুচ্ছ করে, তাঁকে ভালো না বেসে থাকা যায়। তিনি রেখে গেছেন ধনদৌলত জহরৎ ইমারত নয়, কিছু দেনা আর তার সঙ্গে একটু প্রশান্ত মৃদু ব্যক্তিত্ব, বজ্রাদপি সুকঠিন, কিন্তু তরুর মত সহিষ্ণু, আদর্শে অনুরাগ, সনাতন সত্য ভারতবর্ষের একটু পরশ, একটু ছোঁওয়া। ১৯৩১ সালে আবার লাগলো নিরুপদ্রব প্রতিরোধ, আন্দোলনে যোগ দিলেন তিনি, গেলেন জেলে।

১৯৩৭ সালে উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিত্বে তাঁর হাতেখড়ি হোল দেশের সরকার চালাবার। ১৯৪০ সালে করলেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ, ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কারাবরণ, ১৯৪৬ সালে পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, ১৯৫১ সালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তিনি, ১৯৫২ সালে রেলমন্ত্রী। কিন্তু **power corrupts** অর্থাৎ ক্ষমতার মোহ নষ্ট করে দেয় মানুষকে—এই উক্তি খাটলো না শাস্ত্রীজী সম্পর্কে। এক কথায় পদত্যাগ করলেন তিনি একটি রেল দুর্ঘটনার নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য। ১৯৫৮ সালে পুনরাগমনায় চ, শিল্পমন্ত্রী হয়ে ১৯৬২-৬৩ সালে নিলেন স্বরাষ্ট্রদপ্তরের ভার। কিন্তু কামরাজ পরিকল্পনায় পদত্যাগ করতেও দেরী হলোনা তাঁর। ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের পর আবার ডাক পড়লো মন্ত্রীসভায়, অসুস্থ শ্রীনেহেরুকে সাহায্য করার জন্য—এলেন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী হিসাবে। জওহরলাল বলতেন—ওঁর চেয়ে ভালো সহকর্মী মেলা ভার। তারপর নেহেরুজীর লোকান্তরের পর হলেন সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান মন্ত্রী, ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধার। এই উঁচুতে উঠেও গাঁয়ের মানুষ তুদীনাথ এই লোকটি ভুলতে পারেননি যে তিনি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, কিষাণদের প্রতীক, জোওয়ানদের ভাই। ১৯৫৪ সালের কুম্ভমেলায় এসেছেন লালবাহাদুর, মাকে নিয়ে। তখন তিনি রেলমন্ত্রী। মাকে স্টেশনে বসিয়ে রেখে তিনি গেছেন সঙ্গমের কাছে জনস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করতে। ঘটলো দুর্ঘটনা, ফিরতে হলো দেরী। মাতা রামদুলারী অস্থির হয়ে উঠেছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়—আসেন না তাঁর ছেলে, তাঁর লালু। জিজ্ঞেস করেন লোকেদের, বলেন আমার ছেলের খবর জানো? কে তোমার ছেলে—সে রেলের কী একটা বড় কাজ করে। হাসেন রেলের সম্ভ্রান্ত কর্মচারীরা—এই দেহাতী গ্রাম্য মহিলার ছেলে বড় কাজ করে—কী কাজ তাও জানে না তার মা—এই ভিড়ের দিনে, জনকোলাহলের মাঝখানে কোথায় তাঁর ছেলে—তা ছাড়া যা ডামাডোলের বাজার, লক্ষ লক্ষ মায়ের ছেলেরা এদিকে ওদিকে ধাক্কা খাচ্ছে কে কার খবর রাখে—তা নাম কী তোমার ছেলের—লালবাহাদুর—কতো লালবাহাদুর আছে। এমন সময় মা'র খোঁজে এসে পড়লেন স্বয়ং শাস্ত্রীজী। কে, কে—আরে এই তো আমার লালু। মাকেও জানতে দেন নি যে কতো দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি অধিষ্ঠিত। এই

প্রাগম্যাটিক বাস্তবধর্মই তাঁকে জননায়ক করেছিল, তত্ত্বের ফর্মুলা নয়। লোকে বলে তিনি হচ্ছেন মাটির প্রদীপ, হয়তো তাই—গ্যাসের উজ্জ্বল দীপবর্তিকা তিনি নন্, প্রখর বিজলীবাতিও নন, কিন্তু অনির্বাণ।

তাঁর কর্মজীবনের এই অনতিদীর্ঘ পরিক্রমায় কত সমস্যা এসেছে—কচ্ছ সমস্যা, নেপালে দৌত্য, ব্রহ্মদেশের সঙ্গে আলোচনা, কেরল কামরূপের সংঘর্ষের সত্য মীমাংসার চেষ্টা, ভাষা সম্পর্কিত বিরোধ, কাশ্মীর ও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিচালন, আন্তর্জাতিক ঘন ঘন পটপরিবর্তন। এই তো সেদিন গেলেন রাশিয়ায় ক্যানাডায়, কিন্তু গেলেন না যুক্তরাষ্ট্রে, কেননা ভারতের মর্যাদা রক্ষা যদি না হয়। সাধ করে গ্যালব্রেথ সাহেব বলেছিলেন—"There is more iron in his soul than appears on the surface. He listens to every point of view, he makes up his mind firmly and his decisions slick. He is the kind of man who is trusted."

তাঁর সত্তায় আছে বেশ লৌহকঠিন অনমনীয়তা, যা হঠাৎ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তিনি প্রতিটি মত শোনেন, কিন্তু মন স্থির করেন নিজে, এবং তাঁর বিচার থেকে বিচ্যুত হ'ন না। তিনি সেই ধরণের মানুষ যাকে বিশ্বাস করা যায়।

রূপকথার রাজপুত্তুর জলে ডুবেছিল—স্বয়ং মৃত্যু-দেবতা তার মাথায় মুকুট পরিয়ে টেনে নিয়েছিল—শাস্ত্রীজীর মৃত্যুও প্রায় সেই ধরণের—মৃত্যুহীন প্রাণকে মরণের কাছে দান করে গেলেন। প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ, রুধিল না সমুদ্র-পর্বত। যাত্রা হলো সুরু—গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বিনেভিঃ যত্র ন পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।

এই সেদিন বাংলাদেশ তাঁকে কাছে পেয়েছিল গড়ের মাঠে নেতাজীর মূর্তি-উন্মোচন উৎসবে আর শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতীর আচার্যরূপে। অভিভাষণে গতবারে তিনি বলেছিলেন—শান্তিনিকেতনে এসে মনে হচ্ছে আমি যেন আর একবার গুরুদেবের পদপ্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়েছি। এবার স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার একজন বিশিষ্ট রিপোর্টার লিখলেন—উত্তরায়ণের তোরণদ্বারে সবাই বসে আছি আমরা, শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন, উপাচার্য শ্রীযুক্ত দাশ প্রভৃতি। আচার্যের অভিভাষণ-পত্রের কপি আমরা পাইনি তখনও। কি বলবেন তিনি? এক ঘণ্টা পরেই সমাবর্তন উৎসব—অনেকে বললেন, তিনি আসছেন সেই ব্রহ্মদেশ থেকে, লেখবার সময়ই পাননি তাড়াতাড়িতে। বীরভূমের সেই রাঙামাটির প্রান্তরে, মিঠে রোদের শীত-লাঞ্ছিত সকালবেলায় শাস্ত্রীজী এলেন, অন্য সকলকে এড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর স্টেনোকে ডেকে বক্তৃতাটা টুকে নিতে বললেন, তারপর কিছুই যেন হয়নি এমনিভাবে আস্তে আস্তে প্রাতরাশ-কক্ষে ঢুকলেন সকলের সঙ্গে, তারপর সেখান থেকে সোজা আম্রকুঞ্জের সভায়। বক্তৃতাটা অনেকেই শুনেছেন বা পড়েছেন।

একটি অংশ তুলে দিচ্ছি—"আমরা এই আম্রকুঞ্জ থেকে যখন বিদায় নেব, প্রত্যেকেই আমরা এখান থেকে নিয়ে যাব এক মূল্যবান সম্পদ, সেই সম্পদ হ'ল শান্তি ও শুভকামনার জন্য ঐকান্তিক অনুগ্রহ এবং শাশ্বতের মঙ্গলময় স্পর্শ। এই ঐতিহ্য বহন করেই জীবনের সমস্ত অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হব আমরা অকুতোভয়ে।" আরো তিনি বললেন—"শান্তিনিকেতন হতে যে শান্তির দীপ্তি বিকীরিত হচ্ছে, তার আভা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক। আগামী বছরগুলিতে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস পেয়ে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বোঝাপড়া এবং শুভেচ্ছার মনোভাব গভীরতর হোক্। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব যদি বজায় রাখতে হয়, তবে মানুষে মানুষে সংঘাতের অবসান্ হোক্।"

এই মনোভাব নিয়ে, এই শান্তির জন্যই তিনি চললেন তাসখন্দে। তাসখন্দ তো তাসের দেশ নয়, যে সেখানে কৃষ্টি (কথাটা শুনতে মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়) বিপন্ন, প্রগতি স্তব্ধ, অগ্রগতি অব্যাহত, তবু সারা বিশ্ব জুড়ে মেঘমালার নিত্য নূতন সৃষ্টি। শান্তি, শান্তি, শান্তি—এবং এর জন্যই রবার্ট ফ্রস্টের ভাষায় And miles to go and miles to go before I sleep. ঘুমিয়ে পড়ার আগে এই শান্তির জন্যই যেতে হলো অনেক দূর। কাপড় পরে যাবেন না, শাস্ত্রীজী—বড্ড শীত—হাসলেন ঐ ছোট্ট মানুষটি। দিন ১৭-১৮ ঘণ্টা করে খাটুনি—জীবনীশক্তি হ্রাস হয়ে এলো—চরম মুহূর্তে সে করলে আঘাত—আঘাত নয় আত্মদান। সেদিন রাত্রে শুধু একটু হালকা পুডিং খেয়ে শুয়েছিলেন শাস্ত্রীজী। হিন্দুস্থান টাইমসের শ্রীকিশোর পরেখ লিখছেন—

"রাত সাড়ে দশটা। যে-ভিলাতে তিনি থাকতেন সখানে গিয়ে কামরায় টোকা দিলাম। শাস্ত্রীজী আমাকে ভিতরে আসতে বললেন। বিখ্যাত তাসখন্দ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর উপলক্ষে আয়োজিত সান্ধ্য-ভোজসভায় তিনি আহার প্রায় কিছুই গ্রহণ করেন নি, ঘরে বসে তাই হালকা পুডিং খাচ্ছিলেন।" আহার শেষ করে শাস্ত্রীজী দৈনন্দিন অভ্যাস মত করিডরে পদচারণা সুরু করলেন—সেই অবস্থায় গৃহীত ছবিই তাঁর মরদেহের শেষ ছবি।

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। তাঁকে "ভারতরত্ন" উপাধি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি, কিন্তু নিজের গুণেই যিনি রত্ন বিশেষ তাঁকে মর্যাদা দেবে কে, সম্মানই যে সম্মানিত হবে। জানিনা কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তিনি ধরায় এসেছিলেন। মনে পড়ছে জওহরলালের মহাপ্রয়াণে সোভিয়েত ল্যাটভিয়ার কবি মিরজা কেম্পে লিখেছিলেন—

"আমি ছিলাম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—এখন হয়েছি চিতাভস্ম
শুধু আকাশে আমি উঠবোনা, উড়বোনা পাখা মেলে
ছড়িয়ে দাও ঐ ছাই ভারতের প্রতিটি ধূলিতে, নগরে ঘরে
প্রান্তরে, গঙ্গায় যমুনায় হিমালয়ে, নদীতে নদীতে

সেইখানে কানে কানে বলবো আমি সেই মৃৎকণাকে
মাগো, তুমি কি পাচ্ছ আমার পরশ, আমার ঘন অনুভব
মৃন্ময়ী তুমি কি হলে চিন্ময়ী
আমি যে দিয়েছি নিজেকে বুক ভরে উজাড় করে
প্রতিটি দেশের মানুষ বলুক—এই সেই লোক যে শান্তির জন্য মুক্তির জন্য
প্রেমের জন্য সংঘবদ্ধ হতে বলেছে
তার ভস্মরাশির উপরে চেতনায় ধ্যানে
আমরা যেন গড়ে তুলতে পারি নতুন স্বপ্ন, নতুন পৃথিবী
নতুন দিন এই হানাহানির দিনে।"

রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি—

"কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম
কাহার চরিত্র ঘেরি স্থকঠিন ধর্মের নিয়ম
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র মহাদৈন্যে কে হয়নি নত
সম্পদে কে থাকে ভয়ে বিপদে কে একান্ত নির্ভীক
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কি দিয়েছে তাহার অধিক।"

ধলো পুষি

শ্রীবরেণ রায়

ধলো পুষি বেজায় খুশি
ইলিশ ভাজা পেয়ে
হাত বুলিয়ে এ-পিঠ ও-পিঠ
দেখেই শুধু চেয়ে।

কখনো বা ফেল্‌ছে ছুঁড়ে
হাঁস-মুরগীর কাছে
কখনো বা দৌড়ে গিয়ে
উঠ্‌ছে ডালিম গাছে।

কাণ্ড দেখে কাকাতুয়া
বল্‌ছে কখন খাবি?
পুষি বলে খাওয়ার পরে
মজা কি আর পাবি?

জলে আগুন নেভে

শ্রীঅরূপরতন ভট্টাচার্য

ঘণ্টা বাজিয়ে দমকল চলে গেল।

আগুন, আগুন—আগুন লেগেছে নিশ্চয়। পাঁউরুটি চিবোতে-চিবোতেই হরিপদ চমকে উঠলো। ঘণ্টার রেশ কানে আসছে। টিং টিং নয়, টং টং নয়। আশঙ্কায়, উত্তেজনায় ভরা সে এক বিচিত্র অনুভূতির শব্দ। মনটা কেমন করে উঠলো। হরিপদ দৌড়ে এসে জানালায় দাঁড়ালো।

ছোটমামা তখন ফিজিক্সের বইয়ের মধ্যে নিবিষ্ট ছিল। হরিপদর ঔৎসুক্য দেখে চোখ তুললো।

কী ব্যাপার ?

কী আর ব্যাপার। দমকল গেলো। ঘণ্টা শুনতে পেলে না ? আগুন কোথাও লেগেছে নিশ্চয়।

আগুন লেগেছে ! তা হবে। কিন্তু দমকল গিয়ে কী করবে ? মামা বোকা সাজলো।

আশ্চর্য ! কলেজে পড়া বিজ্ঞানের ছাত্র মামা, তবু কেন এ জাতীয় প্রশ্ন। হরিপদ অবাক হ'লো।

সে কী ! জল দেবে। জলে আগুন নেভে। কাজেই আগুনও নিভবে। হরিপদ বুঝিয়ে বললে। অগুন নেভানোই দমকলের কাজ।

আসল প্রশ্নে এলো এবার মামা। সে বুঝলাম. কিন্তু জলে কেন আগুন নিভবে ?

হরিপদ চটে উঠলো, অত-সত জানিনা, জলে আগুন নিভবে এইটাই স্বাভাবিক।

মামা রাগলো না, শুধু মুচকি হাসলো, স্বাভাবিক বলে বিজ্ঞানে কিছু নেই। প্রত্যেকটি কাজের পিছনে কারণ আছে, যুক্তি আছে, সঙ্গতি আছে। জলে যে আগুন নেভায়, তার পিছনেও বক্তব্য আছে।

হরিপদ জিগেস করলো, কী বক্তব্য ?

মামা বললে, তুমিই বলবার চেষ্টা করো। আগুন জলে পড়লে কী হয় ?

হরিপদ আমতা আমতা করতে লাগলো।

মামা বোঝালো, কেটলিতে জল গরম হ'লে ফোটে, অর্থাৎ বাস্প হয়। তেমনি আগুনে জল পড়লে, তাও গরম হয়। তখন সে বাষ্পে রূপান্তরিত। ঠিক কিনা ?

হরিপদ ঘাড় নাড়লো, তা ঠিক।

মামা আরও বললো, তা ছাড়া জল গরম হয়ে বাষ্প হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের উত্তাপ অনেকটা কমে আসে। আর এ কথা মানো নিশ্চয়, যে, আগুন নেভাতে গেলে উত্তাপ কমিয়ে আনার বিশেষ দরকার।

না মেনে উপায় কী ? হরিপদ স্বীকৃতি জানালো।

মামা খুশি হ'লো।

কিন্তু একমাত্র কম উত্তাপই যে আগুন নিভিয়ে আনে, তা নয়, মামা বললো। জল আর আগুন মিলে যে বাষ্পের উদ্ভব, আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে তার অবদানই সবচেয়ে বেশী।

কী রকম? হরিপদ জানতে চাইলো।

মনে করো, কোনো বাড়ীতে আগুন লেগেছে। আগুনে জল ঢালা হচ্ছে। যতটা পরিমাণ জল ঢালা হয়, বাষ্প হয়ে সেটা আকারে শত শত গুণ বেড়ে যায়। মজা সেখানেই। এক বালতি জল বাষ্প হয়ে আকারে একশো বালতির মতো। বাষ্পের এই বড় আকারটাই সবচেয়ে ভালভাবে আর সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কাজ করে।

কী ভাবে করে?

আগুনের চতুর্দিকের এই বাষ্প জলন্ত বস্তুটাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ঘিরে রাখে। ফলে নতুন বাতাস এসে আগুনের সঙ্গে মিশতে পারে না। আর, এটুকু তোমার জানা উচিত যে বাতাস না পেলে আগুন কিছুতেই জলতে পারে না। কাজেই তখন অগুন ক্রমে ক্রমে নিভে আসে।

হরিপদ অবাক হলো। জলে আগুন নেভার পিছনে যে এত কারণ তা আমি জানবো কী করে?

এলোমেলো

শ্রীচিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

যদি যাও কোণাকুণি
পেয়ে যাবে ভানকুনি।
হাঁটি হাঁটি পায় পায়
নৈহাটি যাওয়া যায়।
কাবুলীর কাছে ধার!
কেহ নাহি পায় পার।
বাঙ্গালীর জাতি বড়
গালি দিতে অতি দড়।

নাম তার লন্‌ডন—
লোকে সেথা দেয় ডন!
রুশদের রাশিয়া
চাঁদে নামে হাসিয়া।
ভূগোলের মত ভাই
গোলহীন কিছু নাই।
পেরু সে তো দূর দেশ,
পেরুতে গে' জান্ শেষ!

কাঁচা গাব পাকা গাব

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

(১)

একদিন আগেকার কথা। বোকন তা ভোলেনি। 'তোমায় চিনি গো চিনি' বলে একটা চীনে জোঁক তাকে ধরেছিল। আর লোভী ছেলের চেটেপুটে চিনি খাবার মত তার রক্ত টেনে খেয়েছিল। এখনও তা ভেবে বোকনের শরীর চিন্‌চিন্‌ করে।

ভাগ্যিস চুনের জল ছিটিয়ে আপদটাকে সে বিদায় করেছিল। কিন্তু সেটা কতখানি রক্ত খেয়েছে সে তা অনুমান করতে পারেনি। এক মণ না দু' মণ কে জানে? আজ দাওয়ায় একটা কাক দেখে হঠাৎ সে চমকে উঠল। কালোয় কালোয় ধূল পরিমাণ। চীনে জোঁক কালো, কাকটাও কালো। কি জানি তার শরীরের ভালো রক্ত খেয়ে ছোট্ট জোঁকটা কাকের মত তাগড়া হয়ে উঠেছে কিনা?

এ কথা ভেবে বোকন হাতের মোয়াটা খেতে ভুলে গেল।

কাকটা ঘাড় কাৎ করে শব্দ করল, কা-কা। বোকনচন্দ্র স্পষ্ট শুনতে পেল, সে বলছে, "বোকন, আমায় এট্টুখানি দাও না। আমি তোমার কত উপকার করেছি। সেদিনের চীনে জোঁকটা মেরে ফেলেছি। আমি যে তোমার কাক-সখা গো।"

"অ্যা, মেরে ফেলেছ! মিতার কাজ করেছ তুমি। নাও ধর।" বোকন মোয়াটা তাকে ধা-ক'রে ছুঁড়ে দেয়। কাকটার তো আর হাত নেই, সে ঠোঁট ফাঁক করে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মত তা লুফে নেয়। তারপর পা দিয়ে আটকে কায়দা করে খায়।

খেয়েদেয়ে মোলায়েম গলায় কা-কা শব্দ করে। অর্থাৎ, "এ কালে তো উপকার স্বীকার করার পাঠ বদলে গেছে। কিন্তু তোমার স্বভাব দেখে ভারী সুখী হলেম। এসো আমার সঙ্গে। তোমাকে এমন মিষ্টি ফল খাওয়াব যাতে তোমার জোঁকে খাওয়া রক্ত যুৎসই মত পূরণ হয়ে যায়। ঈস্‌, কি রোগাই না তুমি হয়েছ বোকন। দেখে কষ্ট হয়।"

এমন সহানুভূতির কথা শুনে বোকনচন্দর গলে যায়। তায় অমন মিঠে ফল খাওয়াবার আশ্বাস। সে তাকে বিশ্বাস করে তার পিছু নেয়।

কাক মাথার ওপর উড়ে পথ দেখায়, আর বোকন ছুটে চলে। যেতে যেতে তারা পৌঁছে পেছনের জঙ্গলে, মস্ত বড় গাব গাছের তলায়।

তার ডালে বসে কাক 'কা-কা, কবকা' শব্দ করে। অর্থাৎ, "চেয়ে দেখ বোকন, কেমন পাকা পাকা, লাল লাল গাব। একেবারে অমৃত ফল। পেট ভরে গাব খাও, শরীর পুরুষ্টু হবে, বুদ্ধি গাবিয়ে উঠবে। গাব থেকেই তো গৌরব, গর্ব, গেরোম্বারি!"

কথাটা বোকনের কানের ছেঁদা দিয়ে মনে গিয়ে পৌছল। গাবের ওপর তার বরাবরের লোভ। স্বাদে ভাল, পদে ভাল। কাঁচাকালে খুঁচিয়ে, আহাহা—সে আঠায় ঘুড়ি জোড়, আর পাকলে, ওহোহো—দাঁতে কেটে মুখে পোর।

কিন্তু দত্যির মত মস্ত বড় গাব গাছ। সেখানে নাকি সত্যি সত্যি ভূত প্রেত থাকে। তাই বোকন কখনো সেখানে একলা আসে না। আজ মিতে কাককে দোকলা পেয়ে এসেছে। পাকা গাবের বাহার দেখে সে ভাবল, ভালই করেছে। কালো বলে কাককে ঠেলে দিলে ঠকে যেত।

(২)

ডালে বসে কাক ক'পাক নাচল। ঠোঁট দিয়ে বোঁটা ছিঁড়ে ক'টা গাব বোকনের মাথায় ফেলল। তা সত্যিকার মিতালি না ঠাট্টা ঠিক বোঝা গেল না। কারণ কোঁচড়ের বদলে গাবগুলো তার তালুতে পড়ে চেপটে গেল। সে গাট্টাই খেল, গোটা গাব জুটল না। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কাকটা ঠোঁট দিয়ে পাকা গাব খেয়ে নেচে নেচে আওড়াল—

"গাব খাব না খাব কি ?
এমন মিষ্টি পাব নি।"

কাক নাচছিল গাছের ডালে মহা সুখে, আর বোকন তলায় কাত্‌রাচ্ছিল দুঃখে। একটা গাবও সে খেতে পারেনি।

হঠাৎ কাকটার নাচ বন্ধ হ'ল। একটা গাবের বীচি পিছলে তার গলায় আটকে চোখ ওল্টানোর হাল হ'ল। শোনা গেল তার কাত্‌রানি,

"আর গাব খাবো না,
গাব গাছে যাবো না।"

টেনে টেনে কান্না। বোকন বলল, "কি হ'ল হে কাক ? রাক্কোসের মত বেবাক গাব একা কেন খেতে গেলে। মিতাকে ভাগ দিলে না। দুঃখ তো পেতেই হবে।"

কিন্তু কাকের ছট্‌ফটানীতে বীচি গলা বেয়ে গলে গেল। অমনি শুরু হ'ল তার উল্টো সুর—

"গাব খাব না খাব কি ?
আট্‌কে গেলে চট্‌কে দি।"

বোকন চোখ বড় করে বলল, "আচ্ছা ত্যাঁদোড় তো। দোক্‌লা এসে এক্‌লা খাও। তাই তোমার রং কষ্টি কালো।" রং নিয়ে ঠাট্টা করায় কাকটা বেজায় চটে গেল। ঘাড় বাঁকিয়ে, ঠোঁট ফাঁক করে বিতিকিচ্ছে শব্দ করল, "আহাহা, খুবছুরত প্রভুরে আমার! পুরুত ঠাকুরের মত কাকের কুষ্ঠীকাটা স্থুরু করেছ! ফুরুত্ করে উড়ে এসে খাবার মুরোদ নেই কেন?"

সে ক'টা গাবের বীচি তার গায়ে ছুঁড়ে ফেলে উড়ে গেল।...

ততক্ষণ একটা মেয়ে কাক সেখানে বসেছিল। বোকন তা টের পায়নি। ঠাট্টা গায়ে না মেখে কাকুতি করে বলল। "কাক, কাকগো,—পাকা গাব খেতে আমার ভারী লোভ হচ্ছে। উড়তে শিখিনি কি করব?"

ওপর থেকে ভিন্ন গলায় উত্তর শোনা গেল, "কাক কাক কোরো না। আমি কাকী।"

বোকন বলল, "বাঃ রে, তুমি আমার কাকার স্ত্রী নাকি যে কাকী হবে?"

উত্তর হ'ল, "দুর্ দুর্, তা কেন হব, কোন্ দুঃখে হতে যাব? আমি মেয়ে কাক, তাই কাকী। মামা থেকে মামী, পিসা থেকে পিসী হয়। একটা ঈকার দিলে পুরুষ মেয়ে হয়ে যায়, তাও জান না। কাক হ'ল গিয়ে বেটা ছেলে, আর কাকী হ'ল মেয়েছেলে। এতে কোনও ফাঁকি নেই।" বলে সে ঠাট্টায় ভেঙ্গে পড়ল।

এ যেন দস্তুর মত গাট্টা মারা!

তবু বোকন মাথা চুল্‌কে খুং খুং করে প্রশ্ন করল, "তা হলে বাবা ঈকার দিয়ে 'বাবী' না হয়ে 'মা' হয় কেন গা?"

কাকী বলে, "তুমি কিস্‌স্যু জাননা, আস্ত গবেট। মায়ের বেলা অন্নি হয়। বাবী বলে ডাক বিছ্‌ছিরি শোনায়, আর মা কেমন মিঠে,—আহাহা!"

বাস্তবিক বোকনের এ সামান্য জ্ঞান নেই! আজ সে পদে পদে নাজেহাল হচ্ছিল। কিছুতেই রেহাই পাচ্ছিল না যেন। তাকে আরও জব্দ করার জন্য কাকী একটা নিচু ডালে এসে তার মুখোমুখি বসল। লাজলজ্জার বালাই না রেখে, তাম নাকের নথ নেড়ে বলল, "আমার দিকে চেয়ে দেখ দেখি।"

নথ পরা মেয়ে কাকের চোখে চোখে চাইতে বোকনের ভারী লজ্জা করল। সে আড়চোখে চেয়ে দেখল, তার ঠোঁটের বড়সড় নথে গুচ্ছের রঙিন পাথর!

কাকী বলল, "নাকই বল আর ঠোটই বল, আমাদের ঐ এক ঠাট। তাতে বোঁচা-চোখার মিছে ভাট নিয়ে ঝগড়াঝাটি হয় না। আমরা কপটতার ধার ধারি না, সব বেটে নি।"

বোকন প্রশ্ন করে, "তা হলে একা নথ পরে কেউকেটা সেজেছ কেন গা?"

'তারা স্থির করল, আমাকে নথ পরিয়ে দাগী বানিয়ে দেবে।'

কাকী পাখসাট মেরে বলল, "ঝাটা মার নথের মুখে। তা কি সখ করে পরেছি? জাপটে ধরে পরিয়েছে তোমাদের কটা গুঁয়োটে লোক। সাজাবার জন্য নয়,—সাজা দিতে! রাজার মত রোজ রোজ তারা মাছ ভাজা, খাজা গজা আরও কত কি মজা করে খায়। আমরা তার খোঁজে হেঁসেলে উঁকি দিলে বলে কিনা, ছ্যাঁচড়া কাক এসেছে ধর ধর। আমরা যা পারি ঠোটে করে সরে পড়ি। কিন্তু এই ধরাধরি সরা-সরির লুকোচুরি ক'দিন ঠেকান যায়? একদিন হাতেনাতে আটক পড়লেম। তখন ফাঁদে ফেলে ওদের নানা ছাঁদের যুক্তি-সলা হ'ল। মুক্তির পথ রইল না। কেউ বলল, অনেক দেশে চোরের নাক, কান, হাত পা কেটে দেয়। শলা ঢুকিয়ে চোখ কানা করে। কিন্তু ভাগ্যিস এ দেশের লোকের জ্ঞানগম্য আছে, খামোখা হিংসে করে না। তারা স্থির করল, আমাকে নথ পরিয়ে দাগী বানিয়ে দেবে। তাতে ভয় ও লজ্জায় আর কখনো গেরস্ত বাড়ী লাগতে আসবে না।...ওরা তাই করল। কিন্তু এও কি ভাল কাজ হ'ল? ধর আমি যদি বেটাছেলে হতেম!

দস্তুর মত শক্ত প্রশ্ন।—বোকন চিন্তা করে বলল, "তাই তো!"

(৩)

কাকী নথ ঘুরিয়ে বলল, "শোন, শোন হে বোকন,—এ কত বড় জুলুম। মেয়েদের সম্মান আছে তো। তার গায়ে হাত দিয়ে তা হানী করলে তক্ষুণি ভগবানের অভিসম্পাত নেবে আসে।

তা ছাড়া আর এক কথা আছে। ওরা তো জানে না, কে কাক, আর কে কাকী। আন্দাজে নথ পরাল। কিন্তু আমি যদি সত্যি কাক হতেম, কি ফাঁকির পাল্লায় পড়ে যেতাম ভাব দেখি। কাকীরা মাখামাখি করতে আসত, আর কাক হয়ে কাকী সেজেছি বলে পুলিস কি সাজা দিতে বাকি রাখত? পিটিয়ে পালিশ করে দিত।"

খুব সত্যি কথা। বোকন বলল, "যথার্থ যথার্থ!···ওরা কি নথের দামও নগদ আদায় করেছে?"

কাকী মাথা কাত্ করে শব্দ করল, ক্কা ক্কা। অর্থাৎ, "তা অবশ্যি করেনি। যে সব বিধবা মেয়েরা হবিষ্যি ধরে নথ পরা ছেড়েছে, তাদের কারু থেকে চেয়ে একটা নথ আমার ঠোঁটে জুড়ে দিয়েছে। শুনেছি পেতলের নথটা আট বছর আগে মেলা থেকে দু' গণ্ডা পয়সায় কিনেছিল। বছরে এক পয়সা দাম ধরে তা শোধবোধ হয়েছে।"

বোকন হিসেব করে বলে, "আট বছরে আট পয়সা সুদও আছে তো। তা নেয়নি?"

কাকী বলল, "হিসেব শুনে খুসী হলেম বোকন। খুব মাথা খাটিয়েছ তো—নাও।"

আধ-খাওয়া একটা পচা গাব তলায় ফেলে সে উড়ে গেল।···

সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার ঝাপ্টা এল, আর টুপ্টাপ্ ক'টা গাব পড়ল।

বোকনের মনে হ'ল, সির্সির্ শব্দে কে যেন তার নাম ধরে ডাকল।

বোকন অবাক হ'ল। বলল, "কাক আর কাকী তো ফাঁকি দিয়ে গেল! তুমি আবার কে বাকি রইলে গা?"

উত্তর শোনা গেল, "উহু আমি তেমন মেকি নই। আমি খোদ গাবগাছ বলছি।"

বোকন বলল, "ওহো বুঝেছি। পায়ে গোদ বলে উড়ে যেতে পারনি বুঝি?"

গাব গাছ মাথা নেড়ে বলে, "উহু। থির হয়ে থাকা আমাদের স্বভাব—ফর্ফর্ করে ঘুরে নিজের মতলব হাসিল করা নয়। পরের উপকারে আমরা নিজের সব কিছু দান করি। তুমি ছেলেমানুষ। আমার তলায় এসে খেতে পেলে না,—আহা। নাও ধরো।"

ক'টা পাকা ফল তার কোলে পড়ল। তা খেয়ে খুসীতে বোকন টলমল হ'ল। বলল, "বাঃ রে, তুমি তো বড় ভাল। তুমি চল্তে পার না, অথচ কথা বলতে পার। তোমার প্রাণ আছে?"

গাবগাছ বলে, "নইলে কথা কইছি কি করে বোকন? বীজ থেকে আমরা জন্মাই। বীচি, শেকড়, গাছ, ডালপালা, পাতা, মুকুল, ফল হয়। কিন্তু হেঁটে চলি না, অচল। তাই তোমরা আমাদের অচল-পয়সার সামিল করে রেখেছ। প্রাণ থাকতেও আমরা যেন প্রাণী নই—বিভেদ করে নাম দিয়েছ উদ্ভিদ। অদ্ভুত বিচার।" সে সা-সা শব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

বোকন জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি খেয়ে বড় হও গো ? এত গুড় কোথায় পাও ? পাকা-ফল খেতে বেশ মিষ্টি লাগল তো।"

গাব গাছ বলল, "মাটির রস খেয়ে। তোমরা যেমন মায়ের দুধ খাও তেম্নি আমরা খাই মাটির। তাই তো তার নাম মা'টি। তার মায়া-মমতার শেষ নেই বোকন। বুক থেকে যে কতরকম রস দেয়। তাতেই জন্মায় নানা বর্ণগন্ধের ফুল, নানা স্বাদের ফল, নানা ধাঁচের লতাপাতা। সৃষ্টি বাঁচাতে ভগবান কতরকম ফল করেছেন,—আলো, তাপ, জল বাতাস। আঁচল পেতে তা নিয়ে পুষ্ট হয়, অপরকে তুষ্ট করে। সে সব জেনে নিও, নইলে বেকুব হয়ে থাক্‌বে! কাঁচা গাব, পাকা গাব আওড়াতে যেয়ে বল্‌বে কাঁচা বাপ, পাকা বাপ !···

(৪)

বোকন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "তা কেমন গা ?" গাব গাছ বলে, "শোন বলি : ছোট ছেলেরা কাঁচা গাবের কস দিয়ে ঘুড়ি জোড়ে, পাকা গাবের রস দিয়ে মুখ ভরে। তারপর রঙ্গ করে আওড়ায়—কাঁচা গাব, পাকা গাব। পাল্লা দিতে তা দাঁড়ায় কাঁচা বাপ, পাকা বাপ। পরখ করে দেখ।"

বোকন তা করে, আর শব্দের এই কারসাজিতে হেসে গলে পড়ে।

গাব গাছ গম্ভীর হয়ে বলে, "হাসি পায় বটে, কিন্তু হাসির কথা নয় বোকন। আসলে কাঁচা বাপ পাকা বাপ হয় না, পাকা বাপই হয়ে পড়ে কাঁচা বাপ ! ভেঙ্গে বলি শোন। বাপই তো ধাপে ধাপে সংসার গড়ে আর গড়িয়ে নেয়। কিন্তু হিসেবের ছক কাটতে ভুলচুক করলে সব ভেস্তে যায়। সবার মঙ্গলের জন্য ভগবান গাছপালা, বনজঙ্গল, নদী-নালা বানিয়েছেন। গাছপালা বনজঙ্গল নানা ফল-ফলারি, শাকশব্জি দেয়, আকাশের মেঘ থেকে বৃষ্টি নাবায়। তাতে নদী-নালা ভরে,—দেশ উর্বরা হয়, সৃষ্টি বজায় থাকে। কিন্তু অনেক পাকা বাপ কাঁচা বুদ্ধিতে অনর্থক গাছপালা কেটে উজোড় করে, পুকুর নালা বুজিয়ে দেয়। তাতে ফসল কমে যায়, দেখা দেয় হাহাকার।"

বোকন এত কথা বোঝে না। গাব গাছ আরও বুঝিয়ে বলে, "আমার কথাই ধর বোকন। এ বয়স অবধি তোমাদের সেবা করলেম। আমার কাঁচা ফলের কসে তোমরা ঘুড়ি, ঝুড়ি, নৌকো আরও কত কি জোড়, পাকা ফল উজোড় করে খাও—শুক্নো ডালপালা দিয়ে জ্বালানী বানাও। তারপর উপকারের শোধ দিতে একদিন গুড়ি কেটে তক্তা গড়বে। ভাওতা দিয়ে বলা হবে, ওরে বাপরে, গাব গাছে পেত্নী থাকে। কেটে নিশ্চিন্দি!···দেখলে নেমকহারামী !"

বোকন দেখবে কি ! কথা শুনে তার পীলে চম্‌কে উঠল। তার মনে পড়ল অনেক গাছের এমন বদনাম আছে।…

কখন একটা ভূতুম পাখী উড়ে এসে গাব গাছের নিচু ডালে বসেছিল। সে বিতিকিচ্ছে ড্যাবড্যাবে চোখে বোকনের দিকে চাইল। তারপর তার ভয় উস্কে দিয়ে বিদকুটে গলায় শব্দ করল, 'ভূত-ভূতুম !'

কে জানে ওটা এক ধরনের ভূত কিনা। হয়ত ওর ইষ্টি কুটুমদের ডেকে বলছে, "বোকনচন্দর এসেছে রে। আয় ওর ঘাড় মটকে দি।"

এইবেলা না সটকালে বাঁচোয়া নেই। কোঁচড়ে যে কটা গাব কুড়িয়েছিল, তা সামলে বোকন দে ছুট। ছুটে ছুটে বাড়ী পৌছে সে হাঁপ ছাড়ল।

তারপর দম ধরে, পাকা গাব খেতে খেতে তার স্তুতি আওড়াল, "কাঁচা গাব পাকা গাব।"

শুরুতে আস্তে, তারপর রেল গাড়ীর মত গড়গড়িয়ে। আর তা শোনাল, 'কাঁচা বাপ, পাকা বাপ।'…

শুনে ঠাকুর মা এসে বললেন, "বাপকে অমন করে ডাকতে নেই বোকন। তাতে পাপ হয়।"

বোকন জানাল, "তা নয় ঠাকুম্মা, আমি কাঁচা গাব, পাকা গাব বলেছি। কিন্তু অ্যায়সা ম্যাজিক হয় ! তুমি বলে দেখ।"

আদুরে নাতির আবদার এড়াতে না পেরে ঠাকুরমা বলেন, কাঁচা গাব, পাকা গাব।"

বোকন বলে, "উহু হু, গরুর গাড়ীর মত আস্তে নয়, মোটর গাড়ীর মত তড়বড়িয়ে।"

কি আর করা ? ঠাকুর মা ফোকলা মুখে তা করেন, আর তা শোনায়, "কাঁচা বাপ, পাকা বাপ !"

বোকন খিল খিল করে হেসে হাততালি দিয়ে বলে, "দুয়ো।"

ঠাকুরমা ও নাতি দু'জনে পাল্লা দিয়ে বলে, আর হেসে লুটোপুটি খায়। তারা টের পায় না তখন—নথঅলা সেই কাকী ফাঁক খুঁজে হেঁসেলে ঠোঁট গলাচ্ছিল !…

শাস্ত্রীজী-স্মরণে

সত্যবান

তুমি পরিচয় দিয়ে গেলে আজো বিশ্বে মানুষ আছে।
নব-বিস্ময়ে দীক্ষা পেলাম শাস্ত্রী তোমারি কাছে ॥

দৈব-বিধানে ধ্বসে গেল যবে মহাভারতের চূড়া।
সবে আতঙ্কে ভেবেছিল সবি হয়ে যাবে গুঁড়া গুঁড়া ॥
জনতার থেকে মুখ তুলে তুমি দাঁড়ালে উচ্চ শিরে।
তখনো ভাবিনি—অকূলের তরী পৌঁছায়ে দিবে তীরে ॥

দেখিতে দেখিতে ছেয়ে এলো মেঘ সঘন বজ্রপাতে।
জীবনে জীবনে কাঁপন জাগিল মরণের শঙ্কাতে ॥
তোমার কণ্ঠে বাজিল গভীর উদাত্ত ধীর বাণী।
তখনো জানিনি—শান্তি জাগাবে আপনার প্রাণ দানি ॥

হায় ইতিহাস করেছে মোদের চরম অবিশ্বাসী।
তাই বাহিরের ক্ষুদ্রতা হেরে নিতি যাই মোরা হাসি ॥
ক্ষুদ্রের মাঝে কি মহৎ জাগে তুমি তা দেখায়ে গেলে।
অবিশ্বাসীরা তাই চেয়ে আছে অবাক চক্ষু মেলে ॥

গৃহহীণ প্রাণ তুমি এ জগতে বিদেশে মৃত্যু তব।
স্বদেশে বিদেশে গৃহে গৃহে তাই পূজা পাও অভিনব ॥

শাস্ত্রীজী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

গরীবের দেশ এই ভারতবর্ষ। এখানকার মানুষ বড় সৎ, বড় শান্ত, সেইজন্য যত দুঃখের বোঝা বুঝি এই মানুষগুলির উপরেই পড়ে।

এই দুঃখীর দেশে এক অতি সাধারণ পল্লীতে এক অতি সাধারণ পরিবার। বারাণসীর গঙ্গার পূর্বপারে রামনগরের অন্তর্গত এক পল্লীতে শ্রীবাস্তবদের বাড়ী। বাড়ীতে দুই বোন, এক ভাই। বাবা সামান্ত মাস্টারি করেন ইস্কুলে। সামান্য বেতন তাতেই চলে যায়।

অবস্থা একটু ভালর দিকে গেল, বাবা এলাহাবাদের রাজস্ব আপিসের কেরানী হলেন, মাইনে বাড়লো। কিন্তু ছেলেমেয়েদের বরাতে সেটুকু সইল না। বাবা অকালেই মারা গেলেন।

ছোট ছেলেটির বয়স তখন পুরো দেড় বছরও নয়। চলবে কি করে? মা পুত্র-কন্যার হাত ধরে এসে উঠলেন পিতৃগৃহে।

পিতামহ হাজারীলাল ও মেসোমশাই রঘুনাথপ্রসাদ ওই ছোট্ট ছেলেটিকে মানুষ করার দায়িত্ব নিলেন। লালবাহাদুর মামার বাড়ীতে মানুষ হতে লাগলেন।

দিন যায়, লাল বড় হলো, হাতে-খড়ি হলো, গাঁয়ের পাঠশালায় পড়াশুনা সুরু হলো।

তারপর হাইস্কুল, তারপর বিদ্যাপীঠ।

প্রতিদিন এই ইস্কুল যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। রীতিমত কয়েকমাইল পথ হাঁটতে হতো। অনেক ছেলেই যেতো সাইকেলে। তখনকার দিনে চল্লিশ টাকা দিলেই একটা সাইকেল কেনা যেতো, কিন্তু সে টাকা লালের কোথা? তাকে হাঁটতে হতো প্রতিদিন ছ'মাইল, আবার বৃষ্টি-বাদলের দিনে ঘুর-পথে আট মাইলও হতো কোন দিন।

কাশী বিদ্যাপীঠে পড়ার সময় গঙ্গা পার হতে হতো। মাত্র দুটি পয়সা দিলেই গঙ্গার ওপারে পৌঁছে দেয় খেয়া। মাঝে মাঝে এমন দিন আসে যেদিন আসার পথে দুটো পয়সা থাকে না। লাল সেদিন ধুতি-কামিজ পোঁটলা বেঁধে মাথায় নিয়ে সাঁতরে গঙ্গা পার হয়ে থাকে।

তবু জামা-কাপড় ভেজে। মা দেখে বলেন—জামা-কাপড় ভিজে যে ?

—সাঁতরে পার হয়ে এলাম যে!

লাল হাসে। মায়ের চোখ দুটি চক্‌চক করে ওঠে, ভাবেন, এতো কষ্ট করে ছেলে লেখাপড়া শিখছে, বাবা বিশ্বনাথ, তুমি এই চেষ্টাকে সার্থক করো!

লাল 'শাস্ত্রী' হলেন। এবার একটা কাজকর্ম জুটলেই সংসারের অবস্থা কিছুটা ফিরবে, কিন্তু অবস্থা ঘুরে যায় অন্য দিকে। ছেলেটি জনগণের কল্যাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দারিদ্র্য থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে, তার ভিত্ তৈরী হবে স্বাধীনতা থেকে, সেই স্বাধীনতার আন্দোলন জাগিয়েছেন গান্ধীজী, লালবাহাদুর সেই আন্দোলনের মাঝে হারিয়ে গেলেন।

একটার পর একটা আন্দোলনের ঢেউ আসছে সারা দেশে। সেই ঢেউয়ের উপর ভেসে উঠছে এক একটি মানুষ, লালবাহাদুরও ভেসে উঠলেন আইন-অমান্য আন্দোলনে।

১৯৩২ সালে বৃটীশ সরকার ঘোষণা করলেন—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বেআইনী। কোন মিটিং করা চলবে না।

এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি ভবনের চারিপাশে পুলিশ পাহারা। আজ ২৬শে জানুয়ারী, পুলিশ কোন মানুষকে আজ ওই ভবনের কাছে যেতে দিচ্ছে না। কিন্তু কংগ্রেসীরা ঠিক করেছে ওখানে তারা পতাকা তুলবেই।

কিন্তু তুলবে কি করে ?

একখানি গাড়ী এসে থামলো মিউনিসিপ্যালিটি ভবনের সামনে, গাড়ী থেকে নামলো এক মুসলমান মহিলা, সর্বাঙ্গ বোরখা ঢাকা। মহিলা নেমেই ব্যস্তভাবে পুলিশ পাহারা পার হয়ে ফটকের মধ্যে ঢুকে গেল। পাহারাদাররা দেখলো—সাধারণ এক মহিলা, হয়তো কোন বিশেষ কাজে যাচ্ছে তারা গ্রাহ্য করলো না। মহিলা মিউনিসিপ্যাল ভবনের মধ্যে অদৃশ্য হলো।

বোরখা-পরা মহিলা বরাবর উঠে গেল মিউনিসিপ্যাল ভবনের ছাদে। বোরখা খুলে ফেললো হাতে ছিল তেরঙা নিশান, তরতর করে তুলে দিল ডাণ্ডার মাথায়, পাহারাদাররা বিস্মিত হলো প্রতীক্ষমান পথের জনতা উল্লসিত দৃষ্টিতে তাকালো উড়ন্ত নিশানের পানে।

এবার ছাদের উপর থেকে সেই মানুষটি সাড়া তুললো স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ, বন্দেমাতরম্!

নীচের জনতা সাড়া তুললো বন্দেমাতরম্!

মানুষটি নেমে এলো, তৎক্ষণাৎ পুলিশ তাকে ধরলো, সবাই তাকে চিনলো, তিনি লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

শাস্ত্রীজী কংগ্রেস করেন। গরীবের ছেলে টাকা-পয়সার তেমন সংস্থান নেই। বাড়ীতে এক মেয়ের অসুখ। কিন্তু চিকিৎসা করাবেন সে টাকা কোথায়? মেয়েটির ভালমত চিকিৎসা তো দূরের কথা, বিনা চিকিৎসায় মেয়েটি মারা গেল।

দরিদ্র দেশের শোষিত পরাধীন মানুষের কল্যাণ যিনি কামনা করেন তাঁকে তো আঘাত সইতেই হবে।

বার বার জেলে যেতে হয়। অর্থাভাবে সংসার প্রায় অচল।

স্ত্রী ললিতা দেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

ডাক্তার বললেন, দুধ না খেলে তো শরীর সারবে না।

কিন্তু মাত্র চল্লিশটি টাকা দিয়ে যাকে সমস্ত সংসারটি চালাতে হয়, তিনি দুধ খাবার পয়সা পাবেন কোথা?

লাল বাহাদুর তখন জেলে, ললিতা দেবী গেলেন দেখা করতে। লালবাহাদুর বললেন, দুধ তোমায় খেতেই হবে।

—পয়সা কোথায়?

—এক গেলাস দুধ খেতে তোমার আর এতো কি পয়সা লাগে?

শেষ অবধি এক গেলাস দুধ খাবার কথা স্বীকার করে নিয়েই ললিতা দেবী সেদিন রেহাই পেলেন।

কিন্তু কথার সঙ্গে মিলিয়ে কাজ করা মুস্কিল হয়ে পড়লো। তবু সত্য তো রক্ষা করতে হবে। ললিতা দেবী অনেক ভেবে-চিন্তে একটা খেলাঘরের পুতুলের গেলাস যোগাড় করলেন। সেই গেলাসের এক গেলাস করে দুধ তিনি খেতে লাগলেন প্রতিদিন।

পরে লালবাহাদুর যখন জিজ্ঞাসা করলেন দুধ খাচ্ছ?

—হ্যাঁ, রোজ এক গেলাস করে খাই।

পরে লালবাহাদুর জেল থেকে বেরিয়ে যখন সেই পুতুলের গেলাস দেখেছিলেন, তখন কি ভেবেছিলেন কে জানে।

১৯৩৭ সালে দেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে। লালবাহাদুরও তখন উত্তর প্রদেশে মন্ত্রী হন।

তারপর ১৯৪৭ সালে দেশে যখন স্বাধীন কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন লালবাহাদুর কেন্দ্রেও মন্ত্রী হন।

এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় কয়েক বছর আগে এক বিপর্যয় দেখা দেয়, সরকারী অব্যবস্থার ফলে

কয়েক শত লোক মারা যায়। লালবাহাদুর তখন রেলমন্ত্রী। বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়েই তিনি ছুটে যাচ্ছেন এলাহাবাদে। মা রামদুলারী। খবর পেয়েছেন ছেলে আসছে।

স্টেশন প্ল্যাটফর্মে মা ঘুরছেন, যাকে দেখছেন তাকেই জিজ্ঞাসা করছেন, লালকে দেখেছ, লাল এসেছে ?

সবাই ব্যস্ত, কে কার কথা শোনে ?

বৃদ্ধা গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন রেলকর্মচারীদের—লাল কি এসেছে, জান ?

—কে লাল ?

—রেলে চাকরি করে।

—কি চাকরি করে ?

—তা তো জানি না, তোমাদেরই মতো কোন চাকরি।

—রেলে কত লোকই তো চাকরি করে, কে কাকে চেনে। আপনি একপাশে অপেক্ষা করুন সে এলে খুঁজে নেবেন।

রামদুলারী অপেক্ষা করতে থাকেন।

কোন একসময় প্ল্যাটফর্মের উপর লালবাহাদুরকে দেখা যায়, মা ছুটে যান, বলেন—তোর জন্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ ধরে।

—আমার দেরী হয়ে গেল মা, বলে লালবাহাদুর সঙ্গের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন—আমার মা।

রামদুলারী বলেন তুই কি চাকরি করিস্ রে ? কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ তো বলতে পারলে না।

—সামান্য চাকরি করি মা।

—কি বল না, লোককে বলতে হবে তো !

এক কর্মকর্তা এগিয়ে এসে বলেন—উনি আমাদের সবার বড়, উনি সারা হিন্দুস্থানের রেলের কর্তা !

মা ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে থাকেন অবাক হয়ে, বিশ্বাস করতে মন চায় না, তাঁর অতটুকু ছেলে লাল সারা হিন্দুস্থানের রেলগাড়ী চালাচ্ছে।

চারিপাশের মানুষ সাড়া তোলে—জয়, শাস্ত্রীজীকি জয় !

অতি সাধারণ খদ্দরের একটি বুকবন্ধ কোট, একখানি খদ্দরের ধুতি আর মাথায় একটি গান্ধী টুপি-পরা মানুষটি এই জয়ধ্বনিতে বিব্রত বোধ করেন।

আত্মপ্রশংসায় লালবাহাদুর চিরদিন বিব্রত বোধ করতেন।

কংগ্রেসের তখনকার সভাপতি, পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন গান্ধীজীর জন্মতিথিতে এক সভার মাঝে বলে বসলেন, আজ আমাদের লালবাহাদুর শাস্ত্রীরও জন্মদিন।

সভাশেষে শাস্ত্রীজী বললেন, আপনি এভাবে আমাকে বিব্রত অবস্থায় ফেললেন কেন?

ট্যাণ্ডন বিস্মিত হলেন, বললেন, কেন?

—এ ধরণের আত্মপ্রাচারে সঙ্কোচ হয়।

শাস্ত্রীজী সাধারণ ভাবে চলাফেরা করতেই পছন্দ করতেন। সাধারণ ভাবেই তিনি থাকতেন। কোথাও কোন আড়ম্বর নেই।

দিল্লীতে প্রচণ্ড শীত শাস্ত্রীজীর পায়ে এক জোড়া মোজা নেই।

একজন অন্তরঙ্গ বললেন, এই শীতে এক জোড়া মোজা পরেন না কেন?

জুতোটা পুরানো, মোজা পরে পরলে বড় হয়ে যাবে, তখন মোজা ছাড়া আর পরা যাবে না।

—আরেক জোড়া জুতো কিনবেন।

—এই জোড়াই যখন চলছে চলুক না।

অন্তরঙ্গের এটি কৃপণতা বলে মনে হলো। তিনি নিজেই এক জোড়া নতুন জুতো কিনে আনলেন। শাস্ত্রীজী ক্ষুব্ধ হলেন, বললেন এ কি? আমার জুতো তো রয়েছে।

একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর একজোড়ার বেশী জুতো নেই, এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

ঘরে কার্পেট পেতে দেওয়া হলো। কনকনে মেঝে থেকে তবু ঠাণ্ডা লাগবে না।

শাস্ত্রীজী কার্পেট গুটিয়ে রেখে দিলেন। বললেন, কার্পেটে পা দিয়ে চলতে মায়া হয়, দামী জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে, আমি সাধারণ গাঁয়ের মানুষ মেঝের উপর দিয়ে চলাফেরা করতেই আমি অভ্যস্ত।

পণ্ডিতজী যাবেন কাশ্মীরে, বললেন, শাস্ত্রী তুমিও চল।

—চলুন।

—একটি গরম ওভারকোট চাই, ওই জামা চাদরে চলবে না।

—আমার নেই, এতেই কোনমতে চালিয়ে নোব।

—একটা কিনে নাও।

—টাকা কোথায়?

পণ্ডিতজী তখন নিজের একটা ওভারকোট শাস্ত্রীকে দিলেন।

দীর্ঘকায় পণ্ডিতজীর ওভারকোট খর্বকায় শাস্ত্রীর গায় ঝল্‌ঝল্‌ করে, যে দেখে সেই বিস্মিত হয়, কিন্তু শাস্ত্রীজীর এজন্য কোন সঙ্কোচ নেই, গরীব দেশের গরীব ছেলে তিনি, মন্ত্রী হলেন তো কি হয়েছে।

এই সরল সহজ মানুষটি আবার সময় কালে খুব কঠিন ছিলেন।

কানপুরে ভারত বনাম কমনওয়েল্‌থ দলের ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। ছাত্রদের বিশৃঙ্খলতা দমন করার জন্য মাঠে পুলিশ মোতায়েন হয়েছে। লালবাহাদুর তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, তাকে পেয়ে ছাত্ররা অভিযোগ করলো খেলার মাঠে পুলিশ রাখা চলবে না।

লালবাহাদুর বললেন, তোমরা শান্ত থাকলে পুলিশ রাখবো না।

ছাত্ররা শান্ত রইল, শেষে বললো—কাল থেকে মাঠে আর লালপাগড়ী পরা পুলিশ আমরা দেখতে চাই না।

শাস্ত্রীজী বললেন বেশ, কাল থেকে মাঠে আর লালপাগড়ী থাকবে না।

কিন্তু পরদিন দেখা গেল মাঠে আবার ঠিক তেমনি পুলিশ আছে।

লালবাহাদুর ছিলেন, ছাত্রেরা তাঁকে ধরলো আপনি কাল কথা দিয়েছিলেন লালপাগড়ী থাকবে না, আজ আবার পুলিশ কেন ?

শাস্ত্রীজী হেসে বললেন, কথা আমি রেখেছি, লালপাগড়ী থাকবে না বলেছিলাম আজ কোথাও লালপাগড়ী দেখছ ?

সেদিন মাঠে সমস্ত পুলিশের মাথায় খাঁকির পাগড়ী ছিল।

ছাত্রেরা এবার হেসে ফেললো, তর্ক সেখানেই শেষ হয়ে গেল।

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী এসেছেন রামনগরে।

রাখীবন্ধনের দিন। প্রতি বছর ব্রাহ্মণ এসে রাখী বেঁধে দিয়ে যান, আজ আর আসেন নি। শাস্ত্রী বললেন—চাচাজী, পাগলা ঠাকুর রাখী পরাতে এলো না ?

বৃদ্ধ কাকা খবর নিলেন, পাগলা ঠাকুর আসেন নি কেন।· খবর পেয়েই ঠাকুর এসে উপস্থিত। শাস্ত্রীজী হেসে বললেন—কি ঠাকুর আমাকে ভুলেই গেছ ?

ঠাকুর বললেন—আপনার বাড়ীতে পুলিশ পাহারা দেখে আসতে সাহস পাইনি।

—তার মানে, প্রধান মন্ত্রী হয়ে আমি আলাদা মানুষ হয়ে গেছি—দূরে সরে গেছি ? দাও রাখী দাও!

এত বড় হয়েও মানুষ এমন থাকে, পাগলা ঠাকুর তো ভাবতে পারেনি।

চরিত্রের এই দৃঢ়তা দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, যখন লণ্ডনের বৈঠকে একটা বুঝাপড়া করে আসার

পর পাকিস্থান কাশ্মীর আক্রমণ সুরু করলো। শাস্ত্রী তখন বললেন, আর আপোষের দরকার নেই, অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রের প্রতিরোধ কর।

ভারতীয় বাহিনী যখন লাহোরের দিকে অগ্রসর হলো, সারা জগৎ তখন চম্‌কে উঠলো, এই ছোটখাটো শান্ত মানুষটিকে যত সহজ লোক বলে মনে হয়েছিল, শাসক হিসাবে ততো দুর্বল তো তিনি নন।
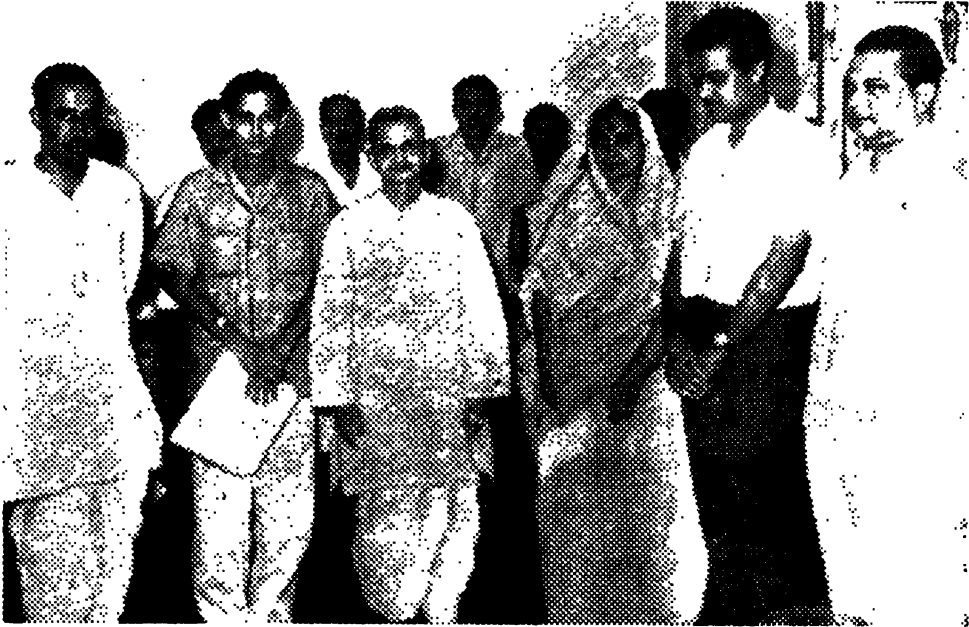
শ্রীমতী ললিতা দেবী ও প্রিয়জনসহ শাস্ত্রীজী

প্রধান মন্ত্রী হবার পরে ৮৫ বছরের বৃদ্ধা মা, শুধু একটি কথা বলেছিলেন—এমন কোন কাজ করো না যা গরীবের দুঃখের কারণ হতে পারে।

মায়ের এই কথাটাই ছিল শাস্ত্রীজীর মনের কথা। সেইজন্য তাঁর মৃত্যুর পরে দেখা গেল, তাঁর কোন জীবন বীমা নেই, নিজের জন্য একখানা ছোটগাড়ী কিনেছিলেন কিস্তিবন্দীতে, তার সব টাকাও তখনও দেওয়া হয়নি।

দিনে ষোলো-সতেরো ঘণ্টা তিনি কাজ করতেন, তাসখণ্ডে শান্তিবৈঠকে যখন তিনি চলে গেলেন, তখন প্রধান মন্ত্রীর টেবিলে কোন কাগজপত্র পড়ে ছিল না। ছোটখাটো অফিসারদের

টেবিলেই ফাইল জমে থাকে কত। প্রধান মন্ত্রীর টেবিলে আরো বেশী জমার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু যিনি কাজ করতে এসেছেন তিনি তো কাজ ফেলে রাখতে পারেন না।

আহার ও আচরণে শাস্ত্রীজী ছিলেন সংযত। ভোজসভায় গিয়ে অনেক সময় তিনি ফলের সরবৎ ছাড়া আর কিছুই পান করতেন না।

শরীর ভালো ছিল না। তবু তাসখণ্ডের আলাপ-আলোচনায় তাঁকে অত্যধিক পরিশ্রম করতে হয়। ইতিপূর্বে দু'বার হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল, তাসখণ্ডে যাবার সময় ডাক্তার সেজন্য সঙ্গেই ছিল। কিন্তু ডাক্তার থাকতেন পাশের ঘরে। শেষ রাত্রে হৃদযন্ত্রের বেদনা যখন দেখা দিল, তখন তাঁকে উঠে গিয়ে পাশের ঘরে ডাক্তার ডাকতে হলো, সেই চলাফেরাটাই তাঁর পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর হয়েছিল তা চিকিৎসকরাই বলতে পারেন। নিজের ঘরে ফিরে আসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। হৃদযন্ত্র দুর্বল হলে কখন আক্রমণ হবে জানা থাকে না। তবু একটা কথা মনে ওঠে, শেষ দিন যখন শাস্ত্রীজী অত পরিশ্রম করেন, তখন তাঁর শুতে যাবার আগে সঙ্গী ডাক্তার কি তাঁকে ভাল করে একবার পরীক্ষা করেছিলেন ?

পরদিন তুষারপাতের মধ্যেও তাসখণ্ডের হাজার হাজার নাগরিক শাস্ত্রীজীর মরদেহকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য রাজপথে সমবেত হয়েছিল। শবাধার বহে নিয়ে ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ চলেছিলেন, দুটি রাষ্ট্রের দুই নায়ক, রুশিয়ার কোসিগিন ও পাকিস্তানের আয়ুব খাঁ। তাতে একটা সত্য নতুন করে ধরা পড়লো—রাজনীতির কুটিল বিতর্কের উপরেও মানুষের মনুষ্যত্ববোধ।

আরেক জন ভারতসন্তানকে আমরা এইভাবে বর্হিবিশ্বে হারিয়েছি, তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র, জনতার মাঝে তিনি হারিয়ে গেছেন।

মৃত্যুসংবাদ যখন ৮৫ বছরের বৃদ্ধা রামদুলারী দেবী শুনলেন, তিনি বললেন—না না, আমার লাল তো মরতে পারে না, সে মরেনি। সে যে সুস্থ দেহে হাসিমুখে বিদায় নিয়েছে।

ঠিক এই কথাই কয়েক বছর আগে আরেক মায়ের মুখে শোনা গিয়েছিল, যোগমায়া দেবী বলেছিলেন—আমার শ্যামা মরতে পারে না, সে মরেনি, সে যে সুস্থ দেহে হাসিমুখে বিদায় নিয়েছিল।

একবার গঙ্গা নাইতে গিয়ে রামদুলারী দেবীর কোল থেকে ছেলে হারিয়ে যায়। শাস্ত্রীজীর বয়স তখন মাত্র কয়েক মাস। ভীড়ের মধ্যে কোথায় গেল ছেলে ?

এক রাখাল ফিরছিল ভীড়ের ভিতর দিয়ে, কাঁধে ছিল ঝুড়ি, বাড়ী এসে ঝুড়ি নামিয়ে দেখে ঝুড়ির মধ্যে ফুটফুটে এক শিশু। রাখালের ছেলেমেয়ে ছিল না, রাখাল-বৌ শিশুকে কোলে তুলে নিলে, বললে—ভগবান দিয়েছেন।

ওদিকে দু-একদিনের মধ্যেই পুলিশ খবর পেল। মা ছুটে গিয়ে নিয়ে এলেন তাঁর ছেলেকে। রাখাল-বৌ দু'দিনের-পাওয়া ছেলের জন্য কান্নায় ভেঙে পড়লো।

সেবার রামদুলারী বিবি ছেলেকে ফিরে পেয়েছিলেন, এবার আর সে ছেলে ফিরবে না।

শৈশবে রাখালের ঘরে পালিত হওয়ার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কিছুটা মিল আসে কি ?

গরীবের ছেলে ভারতের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। নিরুপদ্রবে যখন তিনি সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির কাজে জনকল্যাণের পথে অগ্রসর হবেন, তখন বিধাতা তাঁকে ডেকে নিলেন। তেতাল্লিশ কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিধাতা পরিহাস করলেন। গান্ধারী একদিন শ্রীকৃষ্ণকে সামনে পেয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের এই নিষ্ঠুর বিধাতাকে আমরা তো সামনে পাই না, তবু বিধাতার এই নিষ্ঠুর পরিহাসের জবাব আমরা দিতে পারি, যদি শাস্ত্রীজীর কর্মধারাকে আমরা পূর্ণতা দিয়ে সফল করে তুলতে পারি। তা কি আমরা করবো না ?

ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী ও আত্মীয়-পরিজনসহ সস্ত্রীক লালবাহাদুর

অমূল্য জীবন বিসর্জন

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস

শ্রীবেঙ্কটরাম আম্বালে

অদ্ভুদ এই জগৎ-সংসার। এখানে কত মানুষ আসে, কত মানুষ যায়, শুধু কিছুক্ষণের জন্য হাসি-কান্নার অভিনয়তেই শেষ হয়ে যায় তার পুরো একটা জীবন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই যারা কিছুটা পরোপকার বা কিছু দেশের জন্য করে যেতে পারে, তারা মরেও এই সংসারে অমর হয়ে থাকে। তাদেরই আমরা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের মধ্যে গণ্য করি। কিন্তু এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁরা পরোপকারে আত্মবিসর্জন করেও এই নাম পান না। হয়তো তাঁরা কি করেছেন না করেছেন এ খবরও কেউ রাখে না। এমনি একজন বীরের নাম শুনেছিলাম, যিনি নাকি নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে একটা শহরকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি হলেন জেসাস গারসিয়া। আর আমি যে বীরের কাহিনী এখানে বলবো, তিনি হলেন চিরদুঃখিনী ভারতমাতার এক দুর্ভাগা সন্তান! তাঁর মত ছেলে হারিয়ে ভারতমাতা যে শুধু কেঁদেছেন তা নয়, তাঁর মৃত্যুতে ভারত হারিয়েছে এক অমূল্য সম্পদ। ইনি হলেন মহীশূর নিবাসী শ্রীবেঙ্কটরাম আম্বালে। শ্রীবেঙ্কট যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সেই পরিবার একদিকে যেমন সাহিত্যের জন্য খ্যাত, অন্যদিকে তেমনি দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্যও সুখ্যাত।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর, তিনি দশ বছর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়তেই লেকচারার ছিলেন। শ্রীবেঙ্কট বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তার পূর্ব-পুরুষের প্রিয় বিষয় সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের চর্চাও করতেন।

এগিয়ে এল ১৯৬২ সাল।

শ্রীবেঙ্কট লাভ করলেন ফুল ব্রাইট বৃত্তি। রওনা হলেন আমেরিকার লুইসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে। সেখানে গিয়ে নিজের প্রতিভাবলে পরের বছরই অধিকার করে নিলেন লুইসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদ।

তারপর ১৯৬৫ সালে "ডক্টরেট ডিগ্রি" পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৫ সালের জুন মাসে তাঁর এই ডিগ্রি লাভের কথা ছিলো। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা তাঁকে আর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করতে দিলেন না! স্ত্রী ও দুটি সন্তানকে ফেলে রেখে, সমস্ত দেশবাসীকে কাঁদিয়ে, ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে শ্রীবেঙ্কটকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমেরিকার প্লিট্ নদীর স্রোত।

এপ্রিলের শেষের এক বিকাল। শ্রীবেঙ্কট স্ত্রী পুত্র নিয়ে বেড়াতে রওনা হলেন বেটন রুজ থেকে বারো মাইল দূরে আমিটে নদীর ম্যাগনোলিয়া তীরভূমিতে। স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে বসে গল্প করছিলেন শ্রীবেঙ্কট। এমন সময়ে প্লিট নদীর জলে শুনতে পেলেন কিসের এক শব্দ। ফিরে দেখেন, একটি ছেলে জলে পড়ে ডুবে যাচ্ছে। শ্রীবেঙ্কট সাঁতার জানতেন না, তবুও ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্লিট নদীর উত্তাল তরঙ্গের মাঝে। ছেলেটিকে ঠেলে দিলেন অন্যান্য উদ্ধারকারীদের দিকে, কিন্তু তিনি নিজে ভেসে গেলেন প্লিট নদীর স্রোতে।

আট বছরের একটি মূক্-বধির ছেলের জীবনের পরিবর্তে নষ্ট হয়ে গেলো এক অমূল্য জীবন। অন্যান্য উদ্ধারকারীরা অবশ্য চেষ্টা করেছিলো শ্রীবেঙ্কটকে বাঁচাতে, কিন্তু সকলেই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলো। কেউ তাঁর সন্ধান পেলো না। অথচ আশ্চর্য এই যে, ঘটনার মিনিট পনেরো পরেই মাত্র পঁচিশ গজ দূরে ভাটিতে ভেসে উঠল শ্রীবেঙ্কটের মৃতদেহ।

১৯৩০ সালের ৭ই জুন যে তারকা একদিন ভারতের আকাশে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল নবীন আশা নিয়ে, সেই তারকা চিরতরে নিভে গেলো ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে।

সত্যই শ্রীবেঙ্কট ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করে দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে। আজ তিনি এ-জগতে নেই—তবু জেগে আছে তার অপূর্ব আত্মদানের কাহিনী। তিনি নিজে প্রাণ দিয়ে দীক্ষিত করলেন সমস্ত বিশ্বকে পরোপকারের জন্য।

একদিন

শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম

টুম্পা কথাটা বলতেই আনন্দে লাফিয়ে উঠলো শংকর।

'কিন্তু সাবধান, আমি যে সব জেনে গেছি, সে কথা কিন্তু কেউকে বলবি না।'

'না না। তমি নিশ্চিন্ত থাকো। কিচ্ছুতেই আমি বলবো না কেউকে।'

'ব্যস্—তাহলেই হবে।' শংকর এক সেকেণ্ড কী যেনো ভেবে নেয়। তারপর বলে, 'তুই ও ঘরে যা এখন। বিকেলে তোকে চকোলেট খাওয়াবো।'

টুম্পা চলে যেতেই শংকর এক লাফে বিছানা থেকে নামলো। তারপর গম্ভীরভাবে আড়মেড়ো ভাঙতে ভাঙতে কলতলায়। কেউ যেনো বুঝতে না পারে এতোক্ষণ তার সঙ্গে টুম্পার কথা হয়েছে। মামা আবার পুলিসে কাজ করেন। তাই দোষীকে ধরতে মামার একটু দেরিও লাগবে না।

কলঘর থেকে বেরুতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলো শংকর। কাছেই মামা দাঁতে ব্রাশ ঘষছিলেন, একছুটে এসে ধরে ফেললেন শংকরকে।

'একটু সাবধানে চলাফেরা কোরো।' মামা বললেন, 'এখুনি তো পড়ে যাচ্ছিলে।'

টুম্পার কথাটা যে সত্যি শংকর তা অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারছে। না হলে সেদিন গাছ থেকে পড়ে যাবার কথা শুনে মামা বলেছিলেন, 'গাছ থেকে পড়েছে ভালোই হয়েছে, শক্ত হচ্ছে হাড়।' একবার জিজ্ঞেসও করেননি ব্যথা পেয়েছে কিনা। সেই মামা একটুখানি হোঁচট খেতেই এসে ধরে ফেলেছেন। এ তো টুম্পার কথাটাকেই সত্যি বলে প্রমাণ করায়।

আনন্দে শংকরের সত্যি সত্যি নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে। আজকে খুব মজা করা যাবে। কিন্তু বাইরে কিচ্ছু প্রকাশ করলো না শংকর।

ঘরে ঢুকতেই মামীমা বললেন, 'তোমার খাবারটা খেয়ে নাও শংকর।'

শংকর খাবারটা হাতে নিয়ে খেতে খেতে বললো : 'আজকে পায়েস খেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে।'

'পায়েস খেতে ইচ্ছে করছে?' অবাক হয়ে মামীমা শুধালেন।

'হ্যাঁ।'

'বেশ তো—তোমার মামাকে বলি তাহলে দুধের যোগাড় করতে।' বলেই মামীমা উঠে যাচ্ছিলেন। শংকর মাথা চুলকে বললো, 'বুঝলেন মামীমা, অনেক দিন কোথাও নেমতন্ন যাইনি—তাই মনে হচ্ছে পায়েসের পর রসগোল্লা হলে খুব মজা হতো।'

'আচ্ছা আচ্ছা—সব আনা যাবে।' মামা কখন যে ঘরে ঢুকে সব শুনছেন বুঝতেই পারেনি কেউ।

'না না সব আনতেই হবে এমন কথা নেই মামাবাবু। মজা হতো বলছিলাম তাই।'

'থাক্, তোমাকে আর কথা বলতে হবে না।' বলে মামা ভেতর ঘরে চলে গেলেন।

টুম্পা এককোণায় দাঁড়িয়েছিলো। শংকরের চোখে চেয়ে হাসলো টুম্পা। শংকর যে তার কাছ থেকে সকালবেলায় অমন খবরটা পেয়ে দুষ্টুমি শুরু করেছে তা বুঝতে বাকী নেই টুম্পার।

ভেতর ঘর থেকে জামাটা গায়ে দিয়ে বেরুলেন মামা। মামীমাকে শুধালেন: 'কতোটুকু দুধ আনতে হবে?'

'সের চারেক দুধ আনলেই চলবে।'

'বেশ ওই জগটা দাও।' মামা জগটা দেখিয়ে দিলেন।

মামীমা মামার হাতে জগ দিতে মামা বেরিয়ে গেলেন।

আঃ, শংকরের কী যে আনন্দ হচ্ছে। পায়েস তো হবেই সেই সঙ্গে রসগোল্লাও। ভাগ্যে টুম্পা সকালবেলা কথাটা বলেছিলো। টুম্পা অবশ্য আরো অনেক কথা বলেছে—দেখা যাক্ সবটা হয় কিনা!

জলখাবার শেষ করে শংকর আস্তে আস্তে বললো, 'আপনি কিন্তু মামীমা চমৎকার ক্ষীরপুলি তৈরী করেন।'

'খেতে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি?' অবাক চোখে শুধালেন মামীমা।

'না, মানে···ঐ দুধের কথা বললেন কিনা।'

'লজ্জা কিসের, বলেই ফেলো খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।' মামীমা বললেন, 'কিন্তু আগে বলা উচিৎ ছিলো। দুধ আরো বেশী করে আনতে হতো।'

'ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু আপনার যে কষ্ট হবে।' শংকরের মুখখানাকে একটু আড়াল করে বলে। আনন্দ যেনো উথলে উঠছে মনের মধ্যে।

'থাক। তোমাকে আর ভাবতে হবে না সে কথা। খেতে চেয়েছো হঠাৎ—না তৈরী করে কি পারি।'

বলতে বলতে মামা ফিরে এলেন।

'এ কী, এর মধ্যেই—' মামীমা অবাক গলায় শুধালেন মামাকে।

'যাইনি এখনও। আমি বাড়ী না ফেরা পর্যন্ত শংকর যেনো কোথাও না বেরোয়। এ কথা বলবার জন্যেই ফিরে এসেছি।'

'ওঃ, তা ভালোই হলো। আরো দু'সের দুধ আনতে হবে।' মামীমা বললেন।

'আরো দু'সের দুধ কেনো?'

'ক্ষীরপুলি তৈরী করবো। শংকর খেতে চেয়েছে।'

মামার চোখ গোলাকার হয়ে গেছে। অর্থাৎ ভীষণভাবে অবাক হয়ে গেছেন মামা। হতেই হবে, শংকর মনে মনে ভাবলো। অবাক না হয়ে উপায় আছে।

'যা বললাম, বাড়ী থেকে আমি না আসা পর্যন্ত কিন্তু বেরিয়ো না।' মামা বললেন।

'আচ্ছা।' শংকর বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নাড়লো।

মামা ফের বেরিয়ে যান।

শংকর পড়ার ঘরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই মামীমা বলেন, 'বাইরে যাবে না কিন্তু।'

'না-না—মামার কথা না শুনে পারি। কিছুতেই আমি বাইরে যাবো না।'

পড়ার ঘরে এসে ঢুকতেই টুম্পা হাসে। চোখ-মুখ হাসিতে ফেটে পড়ছে টুম্পার। কিন্তু জোরে হাসছে না।

'বাব্বাঃ, তুমি যা দুষ্টু।' টুম্পা বলে খুব আস্তে।

'বা রে, কখন দুষ্টুমি করলাম। কেবল খেতে চেয়েছি।'

'থাক্। তখন কথাটা না বললে খেতে চাইতে?'

শংকর এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে খুব আস্তে বলে, 'ভাগ্যে বলেছিলি, না হলে খাওয়া হতো না—কেবল ঘরেই বসে থাকতে হতো।'

'আমারও লাভ হলো মাঝখান থেকে।' টুম্পা হাসতে হাসতে বলে।

'তবে? মিছিমিছি আমাকে দুষ্টু বলছিস।'

'বলবো না। সব জেনে-শুনে তুমি এমন ভাবে খেতে চাইছো যে কারো ধরবার উপায় নেই তুমি সব জানো।' বলেই টুম্পা ছুটে চলে যায়।

ভালোই হলো। মামীমা হঠাৎ টুম্পার সঙ্গে অমন ফিস ফিস করে কথা বলতে দেখলে সন্দেহ করতে পারেন।

শংকর এবার বেশ জোরে জোরে পড়তে শুরু করে। রান্নঘর থেকে যেনো ঠিক ঠিক শুনতে পান মামীমা।

কিন্তু পড়া কি আর এগুচ্ছে। মনের মধ্যে দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলে বেড়াচ্ছে ভীষণ ভাবে। কি করে একটা ব্যাগাটেলের কথা বলা যায়। বললে ঠিক ঠিক আসবে। কিন্তু সুযোগ পাওয়াই যে মুশকিল।

অবশ্য এখনও সারাটা দিন রয়েছে। তার মধ্যে একবার না একবার সুযোগ মিলবেই। সুতরাং নিশ্চিন্তে কিছুক্ষণ চেঁচিয়ে পড়া যাক। শংকর চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করলো।

সাড়ে ন'টার সময় মামা দুধ আর রসগোল্লা নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। শংকর তখন পড়া ছেড়ে উঠে স্নানের জন্য তেল মাখতে শুরু করেছে।

'আজকে স্কুলে গিয়ে কাজ নেই শংকর।' মামা বললেন।

'তেল মেখে ফেলেছি যে।' শংকর যেনো মুশকিলে পড়ে যায়।

'তাতে কি হলো? তাড়াতাড়ি স্নানটা হয়ে যাবে।'

'সব পড়া-টড়া তৈরী করেছি যে।'

'তোমার মামীমা আজ পিঠে-পায়েস তৈরী করবেন; আর তুমি টুম্পা দু'জনেই যদি ইস্কুলে চলে যাও তবে কেমন হবে বলোতো?'

'আজকে ইস্কুলে একটু ব্যাগাটেল খেলতাম।' আজকে খেলার ক্লাস আছে। আজ না হলে আবার সেই সাতদিন পরে।' শংকর করুণ করে মুখটা।

'বেশ তো একটু পরেই তোমার ব্যাগাটেল আমি কিনে এনে দিচ্ছি, তাহলে হবে তো।' অবাক চোখে বলেন মামা।

মাথা নীচু করে শংকর। আঃ, কী আনন্দ যে হচ্ছে।

'কী, হবে?' ফের শুধালেন মামা।

'হ্যাঁ।' লজ্জা লজ্জা গলায় বললো শংকর।

'আজকে ঐ ব্যাগাটেল খেলবে টুম্পার সঙ্গে। বাড়ি থেকে এক পাও বেরুবে না।'

'আচ্ছা।' ঘাড় কাত করলো শংকর। এতো বাধ্য বোধ হয় অনেক দিন পরে হলো। অবশ্য ইস্কুল না যেতে বললে এমন বাধ্য সে দৈনিক হতে পারে, একটুও আপত্তি থাকে না।

মামা দুধ আর মিষ্টি রেখে বেরুলেন।

শংকর বেশ আরাম করে স্নান করলো। আজকে মামাই নিষেধ করলেন ইস্কুল যেতে। সুতরাং আজকে যে খুশীর সীমা থাকবে না সে তো জানা কথাই।

স্নান সেরে জামা পরতে পরতে মামা এলেন। হাতে তার ব্যাগাটেল।

'নাও।—টুম্পা কই—টুম্পা?'

'এই যে বাবা, আমি পড়ছিলুম।' টুম্পা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

'আজকে তুমিও ইস্কুল যাবে না। সারাদিন শংকরের সঙ্গে খেলবে।'

বাবার কাছে টুম্পাও কোনোদিন এমন কথা শোনেনি। কাজেই টুম্পা খুশীতে লাফ দিলো একটা। ব্যাপারটা যে কী তা বুঝতে আর এতোটুকু বাকী নেই টুম্পার।

আঃ, আজকে সত্যিই একটা মজার দিন। পায়েস, পিঠে, মিষ্টি—নতুন ব্যাগাটেল আর সারাদিন খেলা। এর চেয়ে ভালো দিন কি আর আসে? শংকরকে তক্ষুনি সব কথা বলে ভালোই হয়েছিলো। না হলে আজ কেবল ইস্কুলই যাওয়া হতো না দু'জনার। পায়েস, পিঠে, ব্যাগাটেল কিচ্ছু হতো না, টুম্পা মনে মনে ভাবলো।

অফিসে যাবার আগে মামা আরও ভালো করে বলে গেলেন এক পাও বাইরে না যাবার জন্য। শংকর ঘাড় নেড়ে বলেছে যে সে এক পাও বাইরে বেরুবে না, কিছুতেই না।

মামা চলে যেতেই দু'জনে ব্যাগাটেল নিয়ে বাইরের ঘরে এলো। টুম্পা বললো, 'বুঝেছো শংকরদা, তখন কথাটা তোমাকে বলেছিলাম বলেই এগুলো পেলে।'

'ভাগ্যে আমাকে নিয়ে ভোরবেলা মামা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে আমি পায়েস, পিঠে, মিষ্টি আর ব্যাগাটেল চেয়ে না পেয়ে রাগ করে বেরিয়ে ডবল ডেকারে চাপা পড়েছি। না হলে কিছু হতো না।'

'আর আমি যদি সে কথা মাকে বলবার সময় না শুনতাম?' টুম্পা হাসতে থাকলো জোরে জোরে। শংকরও যোগ দিলো সেই হাসির সঙ্গে!

বীণাপাণি

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

এলেন এবে বীণাপাণি—
বাজিয়ে দিয়ে বীণাখানি,
শিশুর দল দেখে মাকে—
আনন্দে হয় আটখানা,
করলো মাকে বন্দনা।
তাই বুঝি স্বর্গলোক
ছেড়ে এলেন মর্ত্যলোক
শিশুর মুখে হাসি দিতে
নিজেই এলেন বেদমাতা—
ভাঙতে শিশুর অজ্ঞানতা ॥

বেদের মন্ত্র দিচ্ছে ধ্বনি,
কাঁসি বাজায় খুকুমণি,
আরতির ঐ নৃত্য দেখে
আহ্লাদে হয় আটখানা
করলো মাকে অর্চনা।
যেও না মা বীণাপাণি,
থেকে যাও একটুখানি,
তোমার এই আগমনে মা,
পাচ্ছে লোকে সান্ত্বনা,
করো না মা বঞ্চনা ॥

আরও চাই সেই লালবাহাদুর

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

গরীবের ঘরে জনম হলেও জীবন বৃথা না যায়।
দারিদ্র্য মহাকীর্তির পথে নয় যে অন্তরায়।
দুঃখের সাথে সংগ্রাম ক'রে
বজ্র-কঠোর চরিত্র গ'ড়ে
সকল দিকেতে বিজয়-কেতন উড়াতে যে বাধা নাই—
নিজের জীবনে লালবাহাদুর দেখিয়ে গেলেন তাই।

আমেরিকা ইংলণ্ডেতে গিয়ে নাই হ'লো পড়া লেখা।
পোশাকে আচারে বিদেশিয়ানাটা নাই যদি হয় শেখা।
লেখা-পড়া শিখে এই দেশেতেই
স্বাদেশিকতাকে অটুট রেখেই
উচ্চতম সে বিশ্ব-সভায় বরণীয় হওয়া যায়।
প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর দেখিয়ে দেছেন তায়।

হোক না গঠন ছোটোখাটো আর কোমল তৃণের মতো;
শক্তি সাহস পৌরুষ তাতে থাকতে যে পারে কতো!
করুণা-স্নিগ্ধ প্রীতি-ভরা মন
অনমনীয় যে হ'লে প্রয়োজন।
শান্তির তরে মহাযুদ্ধেও বিমুখ নহে যে জন—
রাষ্ট্রনায়ক লালবাহাদুর তারই নিদর্শন।

নানাদিকে বাধা আসুক যত না দুরন্ত দুর্দম,
অভাবের কষা হানুক আঘাত নিষ্ঠুর নির্মম,

কর্মের পথে অনলস থেকে
সত্যে নিষ্ঠা অবিচল রেখে
দেশের দশের সেবায় সফল হ'তে বিপত্তি নাই—
মানবতাব্রতী লালবাহাদুর দেখিয়ে গেছেন তাই।

বিবেকানন্দ সম দৃঢ়চেতা, শিবাজীর মতো ত্যাগী,
বিদ্যাসাগর আশুতোষ সম জাতীয়তা অনুরাগী,
তাঁদেরই সমান মাতৃভক্ত,
দীনের শরণ, দেশানুরক্ত,
দুর্যোগে ধীর, বিপদেতে বীর, চির উন্নত শির।
আরও চাই সেই লালবাহাদুর ভারতের, পৃথিবীর।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে লালবাহাদুর

জানোয়ারী কাণ্ড

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশের পাহাড়ী-জঙ্গলের বাসিন্দা দুরন্ত-বেপরোয়া বুনো-হাতীর বাচ্চা জাম্বো বরাতক্রমে কিভাবে সাগর পাড়ি দিয়ে সুদূর ইউরোপের জার্মান রাজ্যে পৌঁছে সেখানকার নামজাদা সার্কাসের দলে ভিড়ে তার আজব-কীর্তিকলাপের দৌলতে অচিরেই অসামান্য পশার-প্রতিপত্তি আর খ্যাতিলাভ করেছিল, সে কাহিনী তোমাদের আগেই বলেছি। এবারে শোনো—বিদেশী সার্কাসের দলে থাকবার সময় সেয়ানা-দুষ্টু জাম্বো সেখানে নিজের খেয়াল-খুশী মতো নিত্য নানা ধরণের যে সব আজব-উদ্ভট দৌরাত্ম্য-দুরন্তপনা আর জানোয়ারী-কাণ্ড বাধিয়ে বসতো, তারই দুয়েকটি মজার ঘটনার কথা।

বয়সে কাঁচা আর জংলী-জানোয়ার হলেও, জাম্বো আসলে ছিল—যেমন চালাক-চতুর, তেমনি দুরন্ত-চঞ্চল। কাজেই সার্কাসওয়ালার আদর-যত্নে আর দলের খেলোয়াড়দের নিপুণ শিক্ষাদানের গুণে, জাম্বো শুধু যে নানা রকম খেলা দেখানোর কসরৎ-কেরামতীতেই রীতিমত ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল তাই নয়, দুষ্টুমী-দুরন্তপনার উদ্ভট ফন্দী-ফিকির আর জুলুমবাজীর চোটে সার্কাসের লোকজনদের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত করে তুলেছিল। জাম্বোর দৌরাত্ম্যের দাপটে প্রাণান্ত হবার উপক্রম হলেও, বুড়ো-সার্কাসওয়ালা কিন্তু নিতান্তই মোটা টাকা রোজগারের খাতিরে এ সব বেয়াড়া জুলুম-আবদার মুখ বুজে সহে আসছিলেন বরাবর। কারণ, দুরন্ত চতুর জংলী-হাতীর বাচ্চা জাম্বোর কসরৎ-কেরামতীর আজব খেলা দেখবার আগ্রহে দর্শকের দল এমনই পাগল, যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সারাক্ষণই রাজ্যের যত ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সবাই এসে সোৎসাহে রীতিমত ভিড় জমিয়ে তুলতেন সার্কাসের তাঁবুর ভিতরে-বাইরে, আনাচে-কানাচে সর্বত্র। অর্থাৎ, যেমন করেই হোক—জাম্বোর দর্শন তাঁদের পাওয়া চাই ই…তা সে চড়া-দামে টিকিট কিনে খেলার আসরে বসেই হোক, কিংবা নিছক বিনা-পয়সায় সার্কাসের তাঁবুর ফাঁকে-ফোকরে লুকিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরে কোনোমতে এক ঝলক দৃষ্টি দিয়েই হোক—যে যেমন উপায়ে পারে! দর্শক-মহলে এমন অপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তোলার ফলে, শুধু জার্মানীতেই নয়—আশপাশের আরো নানান অঞ্চলেও জাম্বোর আজব-কেরামতীর রীতিমত সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো অচিরেই · ইউরোপের লোকজন সবাই কৌতুহলে অধীর হয়ে উঠলো—সাগর-পারে সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আমদানী-করে-আনা অদ্ভুত এই জংলী-হাতীর বাচ্চার কসরতী-খেলা দেখার নেশায়। এমন কি, শেষ পর্যন্ত জাম্বোর এই অসামান্য কীর্তিকলাপের অভিনব কাহিনী শুনে পরম-কৌতুহলভরে ইউরোপেরই নামজাদা এক রাজ্যের সম্রাট স্বয়ং চিঠি লিখে

জার্মানীর সেই সার্কাসের দলটিকে সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর রাজধানীতে—ভারতের জংলী-হাতীর বাচ্চার বিচিত্র আজব কেরামতী দেখবার জন্ম।

সম্রাটের আমন্ত্রণ-লিপি পেয়ে সার্কাসওয়ালা তো মহা খুশী !...এমন খাতির...এতখানি ইজ্জৎ... রাজা-রাজড়াও এভাবে সাদরে ডেকে পাঠাচ্ছেন !...এ তো রীতিমত সৌভাগ্যের কথা !...

সঙ্গে সঙ্গে জাম্বোরও কদর বেড়ে গেল অনেকখানি !...তার জন্যই তো এমন আচমকা বরাত খুললো সার্কাসের দলের...পশার-প্রতিপত্তি-সম্মান—সবই সম্ভব হলো একরত্তি ঐ জংলী-জানোয়ার জাম্বোর দৌলতেই ! কাজেই পয়মন্ত-জীব ঠাউরে সার্কাসের দলের লোকজন সবাই জাম্বোকে রীতিমত তোয়াজ-আদর করতে সুরু করে দিলে। তাছাড়া সম্ভ রাজা-রাজড়ার সামনে খেলার আসরে কেরামতী দেখাতে হবে, তাই সার্কাসওয়ালাও সোৎসাহে মোটা-মাইনের নামজাদা-ওস্তাদ খেলোয়াড় মোতায়েন করে জাম্বোকে সযত্নে আরো নানা রকমের নতুন-নতুন কসরতী-কায়সাজির কায়দা শেখাতে লাগলেন।

সার্কাসের মালিক থেকে সুরু করে জন্তু-জানোয়ারদের তদ্বিরদার-সহিস পর্যন্ত দলের সবাইকার কাছ থেকে হঠাৎ এতখানি তোয়াজ-আদর আর আস্কারা পেয়ে সেয়ানা-দুরন্ত জাম্বোর কিন্তু মাথা গেল বিগড়ে। সে বেশ ভালোই বুঝতে পারলো, যে তাকে না হলে সার্কাসের দলের খেলার আসর মোটেই জমবে না। কাজেই তার নিজের খেয়াল-খুশী মতো দাঁও আদায়ের পক্ষে—এই হলো মস্ত সুযোগ। অর্থাৎ সুবিধা বুঝে এখন সে যা চাইবে...যত কিছু বেয়াড়া আবদার আর দুষ্টুমী-দুরন্তপনা করবে, সার্কাসের দলের সবাই নিতান্তই দায়ে পড়ে সে সব জুলুম-উপদ্রব বিনা-প্রতিবাদে মেনে নেবে ওজর-আপত্তি জানাবারও এতটুকু উপায় থাকবে না কারো ! · এমন কি, আকাশের চাঁদ চেয়ে বসলেও, সার্কাসের দলের লোকজনেরা হয়তো সে দুর্লভ বস্তুটিকেও শেষ পর্যন্ত যোগাড় করে করে এনে দেবে জাম্বোর জিম্মায়—রাজা-রাজড়ার আসরে তার আজব কেরামতীর খেলা দেখিয়ে পশার-প্রতিপত্তি জমিয়ে তোলার খাতিরে !

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে জাম্বোর মাথায় হঠাৎ জাগলো—দুষ্টুমীর এক নতুন ফন্দী। ফন্দী জাগার সঙ্গে সঙ্গেই তার দৌরাত্ম্য আর খামখেয়ালীপনা যেন আরো শতগুণ বেড়ে উঠলো। অর্থাৎ, নিজের মর্জি মাফিক সে যখন যে বেয়াড়া আবদার করে বসবে, সেটি তখনি না মিটলেই...ব্যস্ ! জাম্বোর মেজাজ গেল বিগড়ে...সহজে আর টলানো যাবে না তাকে কোনোমতেই—এমনই নাছোড়বান্দা জেদ !...জাম্বোর এই একরোখা জেদের দাপটে সার্কাসের দলের লোকজনের তো প্রায় প্রাণান্ত হবার দাখিল ! তাঁদের নাজেহাল অবস্থা দেখে, জাম্বোর মনে করুণা হওয়া তো দূরের কথা...বরং সে যেন আরো বেশী মজা পেয়ে গেল। দৌরাত্ম্যের দাপট তার দিন দিন ক্রমেই আরো

বেয়াড়া হয়ে উঠলো…নিত্যই উদ্ভট আজব একটা-না-একটা নতুন বায়না আবদারে লেগেই থাকে… আজ এটা চাই, কাল সেটা চাই—না হলেই জাম্বো রীতিমত বেঁকে বসে…কারো সাধ্য থাকে না তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোনোমতে বশ করতে পারে—এমনি দুরন্ত তার জেদ! কাজেই জাম্বোকে যথারীতি তালিম দিয়ে আরো পাঁচটা নতুন খেলার কসরতী শিখিয়ে, কায়দা-দুরস্ত করে তুলতে গিয়ে সার্কাসের দলের লোকেরা পড়লেন মহা ফ্যাসাদে!

জাম্বো ও তার সার্কাসের মনিব

ওদিকে দিন ক্রমেই ঘনিয়ে আসে…ডিন্-রাজ্যের রাজধানীতে গণ্যমান্য-দর্শকদের আসরে, খোদ সম্রাটের সামনে, সার্কাসের খেলা দেখানোর ব্যবস্থা-আয়োজন সবই পাকাপাকি…কাজেই কোনোমতে গোঁজামিল দিয়ে বাজে যা-তা কসরৎ-কেরামতী দেখিয়ে তাঁদের ফাঁকি দেওয়া চলবে না—বিশেষতঃ, জাম্বোর আজব-কারসাজি দেখবার জন্যই যখন সকলের এতখানি আগ্রহ-উৎসাহ কৌতূহল। সুতরাং জাম্বোর বাহাদুরী দেখানোই হলো—আসল কাজ।…সে কাজ সুষ্ঠুভাবে হাসিল করতে হলে—

জাম্বোর প্রত্যেকটি খেলা রীতিমত ভালো সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়া চাই, নাহলে পশার-প্রতিপত্তি যশ অর্থ—কিছুই মিলবে না সার্কাসের দলের ভাগ্যে।...এমন স্বর্ণ-সুযোগ হাতের মুঠোয় পেয়েও, ফসকে যাবে শেষ পর্যন্ত।...অথচ, সুযোগ বুঝে জাম্বো হতভাগা কিনা ঠিক এই সঙ্গীন মুহূর্তে নিতান্তই অবুঝ-গোঁয়ারের মতো এমন বেয়াড়াপনা সুরু করে দিয়েছে।...দলের লোকজনের কারো কোনো কথা শুনবে না...কেবলই দুষ্টুমী আর শয়তানীর ফন্দী-ফিকির।...না দেবে রিহার্শাল...না শিখবে খেলার নতুন কায়দা-কসরৎ...না মানবে ওস্তাদ-খেলোয়াড়ের উপদেশ...সারাক্ষণ শুধু নিজের খেয়াল-খুশী মতো যত সব বেয়াড়া আবদার আর উদ্ভট জুলুমের উপদ্রব চালিয়ে সার্কাসওয়ালা থেকে সহিস—সবাইকেই অতিষ্ঠ করে তুলেছে। মহা বিভ্রাট!...

জাম্বোর বেয়াড়াপনার দাপটে সার্কাসওয়ালা তো ভাবনায়-চিন্তায় দিশেহারা হয়ে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।...তাই তো...এখন উপায়?...এত উদ্যোগ-আয়োজন...ধুমধাম...সাজসজ্জা-আড়ম্বর বিজ্ঞাপন...খরচপত্র... চেষ্টা-মেহনৎ... মান-ইজ্জৎ... পশার-প্রতিপত্তি... উজ্জ্বল-ভবিষ্যৎ...জাম্বোর জানোয়ারীর জন্য সব কিছু হারিয়ে, শেষে কি মুখে চুন-কালি মেখে, দেশ ছেড়ে পালাতে হবে দলবল ফেলে রেখে!...সার্কাসের দলের লোকজনেরও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই...জাম্বোর দৌরাত্ম্যে তাঁদের রুজী-রোজগারের রাস্তাও বুঝি এবার বন্ধ হয়ে যায়! জাম্বোর কিন্তু এতটুকু ভ্রূক্ষেপমাত্রও নেই...সে তার খেয়াল-খুশী মতো দুষ্টুমী আর দুরন্তপনাতেই মশগুল।...কিছুতেই আর তাকে বাগে আনা যায় না।

(ক্রমশঃ)

ফাগুন এলো

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়

উত্তরে ঐ থামলো হাওয়া শীতের খেলা শেষ—
ঝিরিঝিরি দখিন হাওয়া লাগছে আহা বেশ।
সবুজ ঘন বনানীকে পরিয়ে ফুল-সাজ,
গুন্‌গুনিয়ে ফুলের বনে ফাগুন এলো আজ।
ফাগুন এলো আগুন-রাঙা পলাশ বনে বনে
ফাগুন এলো ছন্দেভ-রা সবুজ মনে মনে।

কলির বুকে জমলো মধু অলির বুকে গান,
বাতাস জুড়ে, বেড়ায় ঘুরে কুহুর কলতান।
ফুলের বনে ফুল ফুটেছে তাই তো সমীরণ—
মিষ্টিমধুর গন্ধ নিয়ে জানায় নিমন্ত্রণ।
স্বপ্ন দেখি, লগ্ন সে কি এমনি করেই আসে—
এমনি করেই নাচে কি মন অজানা উল্লাসে?

চারিধারেই রঙের মেলা যেদিক পানে চাই—
সবের মাঝে নিজেকে আজ হারিয়ে ফেলি তাই।

প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর

শ্রীসতীকুমার নাগ

সেদিনকার কথা!

ভোর না হতেই সবার ঘুম ভেঙে গেল। ছোট-বড়, ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ী সবাইর আনন্দ। আজকের এ দিনটি সবচেয়ে তাদের স্মরণীয়।

রামনগর ছোট্ট একটি গ্রাম। সারা গ্রাম আনন্দে মুখর। পথ-ঘাট সাজানো হয়েছে লতাপাতা দিয়ে। সবাই সাজগোজে তৈরী হয়ে নিল। কেউ এসে দাঁড়াল খড়ের চালার নীচে, কেউ বা ঘরের দাওয়ায় সারি বেঁধে দাঁড়াল; আবার কেউ বা দাঁড়াল বাড়ির ছাতে। ছোট বেলাকার বন্ধুরা এসে দাঁড়াল সামনের সারিতে স্বাগত জানাতে।

সহসা কলরব ভেসে উঠল—"ঐ যে, আসছে গাড়ি।" তাই ত, গাঁয়ের মেঠো পথে ধূলো ছড়িয়ে গাড়িখানা এগিয়ে আসছে এ-দিকে। মেয়েরা উলুধ্বনি দিল; গাঁয়ের বধূরা তার সংগে শাঁখ বাজাল আর ব্যাণ্ড পার্টি বেজে উঠল—শুভ স্বাগত-সংগীতের সংগে। পুরোনো মহল্লার পথ পেরিয়ে তাঁর গাড়ি এসে থামল রাস্তার শেষ মাথায়।

তাঁর আগমনে রামনগরবাসী আনন্দে উৎফুল্ল। আনন্দে তারা আত্মহারা হয়ে উঠে, তাঁর গাড়ি ঘিরে দাঁড়াল। হাসিমুখে তিনি গাড়ি থেকে নামলেন, আর জনতার সংগে মিলে এক হয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, আমাদেরই ভারতের প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। প্রধান মন্ত্রী হবার পর তিনি এই প্রথম এলেন নিজের গ্রাম দেখতে।

দু'শ বছর আগেকার ভিটে। শাস্ত্রীজীর প্রপিতামহের পিতা ঐ বাড়িটি তৈরী করেছিলেন। গ্রামের মাটির ঘর। ঘরের দেয়ালের কোন গৌরব নেই। মোগলসরাই শহরে তিনি জন্মেছিলেন ১৯০৪ সালে।

শাস্ত্রীজীর পিতা সেখানকার বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিলেন। খু-উ-ব ছোট বেলায় তাঁর পিতা মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর তিনি এই রামনগর গ্রামে এলেন। এই গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়েই তাঁর প্রথম হাতেখড়ি শুরু হয়। পরে তিনি কাশী বিদ্যাপীঠে পড়ে শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে যাঁরা পণ্ডিত, তাঁরাই শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত হয়ে থাকেন।

* * * *

আজ রামনগর গ্রামে এসে তাঁর মনে পড়ে পূর্বপুরুষদের কথা আর শৈশবের কত অতীত স্মৃতিই না ঐ বাড়িতে জড়িয়ে আছে তাঁর। আনন্দে ও বেদনায় তাঁর চোখ দু'টি সজল হয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে চলেন বাড়ির দিকে। পথের দু'ধার থেকে ফুল ছড়িয়ে দেয় ছোট বড় সবাই।

তারপর...

শাস্ত্রীজী বাড়ির আপন প্রিয়জনদের সংগে মিলিত হন। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন কাকা কালীপ্রসাদ। কাকা কালীপ্রসাদ-ই এগিয়ে এসে লালবাহাদুরকে অভিনন্দন জানালেন। নতজানু হয়ে শাস্ত্রীজী কাকার পায়ের ধূলো নিলেন। কাকা তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

তারপর...

তিনি এক এক করে প্রত্যেকটি ঘর দেখলেন ঘুরে-ফিরে—এ ঘরটিতে বসে পড়তেন, ঐ ঘরে তিনি ঘুমাতেন; ঐ দিককার আটচালার নীচে খেলতেন।

তারপর তিনি বসলেন বাড়ির প্রাঙ্গণের মাঝখানে। বাড়ির লোকেরা ছাড়াও তাঁর প্রিয় বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে বসলেন। তিনি সবার সঙ্গে সত্তর মিনিট ধরে আলাপ-আলোচনা করলেন। বাড়ির বাইরের জনতা তখনও দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছিল তাঁদের প্রিয় নেতা, প্রিয় প্রধান মন্ত্রীকে আরেকবার দেখবে বলে। বিদায় বেলায় তাদের রামনগরের ছেলে লালবাহাদুর, তাদের প্রিয় নেতা শাস্ত্রীজী, তাদের ভারতের প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীকে বিদায় দিতে পারছিল না। অশ্রুসজল চোখে তাদের বিদায় নিতে হ'ল ভারতের প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রীজীর কাছ থেকে। সেদিন রামনগরের প্রত্যেকেই আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল এই কথা ভেবে যে, তাদেরই একজন আজ এই বিশাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর এ দেশে কে যোগ্য প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসতে পারবেন এ নিয়ে আমাদের কত সমস্যাই না ছিল!

শ্রী শাস্ত্রীজী ভারতের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হলেন। তখন আমাদের ভারত এক মহা দুর্যোগ ও সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছিল। এই ঘনঘোর দুর্যোগের মাঝখান দিয়ে ভারতের জনতাকে পথ দেখালেন শাস্ত্রীজী। নির্ভীক, দৃঢ়সংকল্প, নিরলস কর্মী, শাস্ত্রীজীর নির্দেশে পাক-ভারত সংঘর্ষে আমরা জয়লাভ করলুম।

এ থেকেই প্রমাণিত হয়েছে, নেহরুজীর পরবর্তী যোগ্যতম ছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রীজী।

তাঁর উদাত্ত, নির্ভীককণ্ঠে এ বাণীই ঘোষিত হয়েছে—ভারত চায় শান্তি। ভারত চায় সবাই শান্তিতে সুখে বসবাস করুক। ভারতের মাটিকে কেউ যদি বলপূর্বক অধিকার করতে চায়, ভারত তবে তা সর্বশক্তি দিয়ে রুখবে। ভারতের নীতি আক্রমণাত্মক নয়; তার নীতি অহিংসা, অনাক্রামক।"

শাস্ত্রীজীর ঐকান্তিক আগ্রহেই মস্কোর তাসখন্দ চুক্তি সম্ভব হয়েছিল। পাকিস্তান আর ভারত দু'টি রাষ্ট্র পরস্পর বন্ধুত্ব ভাবে বসবাস করবে; কারও কোন এলাকায় সৈন্য-সামন্ত মোতায়েন থাকবে না। অপরের রাজ্যের কোন কিছু অধিকার করার জন্য লড়াই নিষিদ্ধ। এর জন্য বাইরের কোন সাহায্যও কেউ নেবে না।—এ ধরণের অনেক কথা তাসখন্দ চুক্তিতে লেখা রয়েছে। চুক্তি সম্পাদিত হ'ল বিগত ১০ই জানুয়ারী, ৬৬ সালে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী চুক্তিপত্রে সই করলেন: পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানও সই করলেন তাতে। সোভিয়েট মন্ত্রী মিঃ কোসিগিনের উদ্যোগেই এই তাসখন্দ চুক্তির ব্যবস্থা হয়েছিল।

তারপর…

১০ই জানুয়ারী…রাত ১০টা, কি ১০টা বেজে কয়েক মিনিট হবে…ফোন করলেন শাস্ত্রীজী তাসখন্দ থেকে বাড়িতে…হ্যাঁ, আমি কাবুল হয়ে আসছি, দু' এক দিনের মধ্যে।—

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নন্দাজীর কাছেও ফোন করলেন—হ্যাঁ, আর দু'টো দিন…কাবুল হয়ে আসবো…।

ভারতের সকলে আনন্দিত হয়েছে তাসখন্দ চুক্তিতে। এত বড় বিরাট সমস্যার সমাধান ভারতের তথা বিশ্বের কেউ পারত কিনা সন্দেহ!

শান্তির দূত ছিলেন শাস্ত্রীজী। তাই এই বিরাট সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর তাসখন্দ চুক্তিকে সারা বিশ্বের লোক অভিনন্দিত করেছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রীজী আসবেন—ভারতে দু'এক দিনের মধ্যে। সবাই অধীর হয়ে আছে তাঁকে সাদর অভিনন্দন জানাতে—তাঁকে সম্ভাষণ জানাবার পরিকল্পনা চলছে।

সেদিনই মাঝ রাতে…সহসা সংবাদ এল ভারতের রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের কাছে রাত ১'৩২ মিনিটে… শাস্ত্রীজী হঠাৎ হৃত রোগে মারা গেলেন—! সংবাদ পাঠিয়েছেন রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী কোসিগিন স্বয়ং।

তারপরের যেটুকু আছে, তা বলে শেষ করছি:

সুদূর তুষার-ভূমি তাসখন্দ। সেখান থেকে বিমানে শাস্ত্রীজীর মরদেহ এল দিল্লীর পালাম বন্দরে। সেই সংগে এলেন আলাদা বিমানে রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী কোসিগিন।

সারা ভারতের শহরে ও পল্লীতে ছড়িয়ে গেল ভারতের প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর সংবাদ। —কেউ একথা বিশ্বাস করতে চায় না। শাস্ত্রীজীর মরদেহ ভস্মে পরিণত হ'ল, কিন্তু তাঁর কীর্তি রইল এ মরজগতে অবিনশ্বর হয়ে।

মেঠুড়ে

ডেভিস কাপ

ডেভিস কাপ দেশগত প্রতিযোগিতা। আঞ্চলিক ভিত্তিতে পরিচালিত বিশ্বব্যাপী খেলায় যারা বিজয়ী হয় তাদেরই ডেভিস কাপ লাভের জন্যে খেলতে হয় আগের বারের বিজয়ীর দেশে গিয়ে।

টেনিসে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বশ্রেষ্ঠ। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ষোলো বারের প্রতিযোগিতার মধ্যে ডেভিস কাপ অস্ট্রেলিয়া পেয়েছে তেরো বার। শুধু ডেভিস কাপ কেন, পৃথিবীর প্রধান প্রধান টেনিস প্রতিযোগিতাতেও অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের জয় জয়কার। উইম্বলডনে গত দশ বারের ভেতর আট বার অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা জয়ের সম্মান লাভ করেছেন। ডেভিস কাপের খেলায় যার কাছে কেউ এ পর্যন্ত কোনো সেট লাভ করতে পারেন নি, সেই এমারসন এবার ডেভিস কাপের খেলায় প্রথম হার স্বীকার করেন। সিঙ্গলসে ফ্রেড স্টোলে জুয়ান গিসবার্টকে পরাজিত করেন। অস্ট্রেলিয়া ৪—১ খেলায় জিতে আবার ডেভিস কাপ নিজেদের দখলে রাখে।

•

ডুরাণ্ড কাপ

ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিসকে ২—০ গোলে হারিয়ে পরপর তিন বছর ডুরাণ্ড কাপ জয়ের কৃতিত্ব মোহনবাগান ক্লাবের ইতিহাসে আরেক স্মরণীয় ঘটনা। মোহনবাগান-ই প্রথম ভারতীয় দল যে দল পরপর তিন বছর ভারতের সবচেয়ে পুরনো ফুটবল প্রতিযোগিতায় জয়ের সম্মান অর্জন করল। ডুরাণ্ড কাপের খেলায় এ বছর মোহনবাগান দিল্লীর ইয়ং স্টারসকে ২—০ গোলে,

গোর্খা ব্রিগেডকে ১—১ ও ৩—১ গোলে, ব্যাঙ্গালোরের চীফ ইন্সপেক্টরেট অব ইলেকট্রনিক্স দলকে ১—০ ও ১—০ গোলে এবং সেমি ফাইন্যালে অন্ধ্র পুলিসকে ১—১ ও ২—১ গোলে হারিয়ে

ফাইন্যালে ওঠে। অপর দিক থেকে পাঞ্জাব পুলিস সর্বপ্রথম ফাইন্যালে ওঠে, একে একে দিল্লীর ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল দলকে ৮—০ গোলে, বি. এন. রেল দলকে ২—১ গোলে, হায়দরাবাদের সেণ্ট্রাল পুলিস লাইন্সকে ১—০ গোলে, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১—০ গোলে এবং সেমি-ফাইন্যালে দিল্লি গ্যারিসনকে ২—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে।

এবার মোহনবাগানের ডুরাণ্ড কাপ জয়ের মূলে একজন খেলোয়াড়ের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতন, তাঁর নাম দীপু দাস। গোর্খা ব্রিগেডের সঙ্গে ১—১ গোলের ড্র খেলায় দীপু দাসের গোল করার কৃতিত্ব। দ্বিতীয় দিন গোর্খাদের বিরুদ্ধে ৩—১ গোলে জয়ের প্রায় সবটুকু কৃতিত্বও তাঁর—তিনটে গোল করে তিনি হ্যাটট্রিকের অধিকারী হন। কোয়ার্টার ফাইন্যালে দীপুর গোলেই চীফ ইন্সপেক্টরেট অব ইলেকট্রনিক্স দলের পরাজয়। ফাইন্যালে পাঞ্জাব পুলিসের বিরুদ্ধে দীপু দাসের গোলই জয়ের পথে অনেকখানি সাহায্য করেছে।

জাতীয় অ্যাথলেটিকস

ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের অ্যাথলেটিকসে ষোলটা বিষয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতির পরিচয়। ষোলটা বিভাগের ভেতর বালক বিভাগে আটটা, বালিকা বিভাগে দুটো এবং সাধারণ পুরুষ ও মহিলা বিভাগে ছ-টা রেকর্ড হয়েছে। মহিলাদের ভেতর দিল্লির কমলেশ চ্যাটওয়াল ও পাঞ্জাবের সন্দেশ সোন্ধী, বালিকা বিভাগে মহীশূরের মেরী ফিলিপস, পুরুষ বিভাগে পাঞ্জাবের সরদারা সিং এবং মহীশূরের রঙ্গনাথন দুটো করে স্বর্ণপদকের অধিকারী হলেও, দুটো স্বর্ণপদকের অধিকারী পাঞ্জাবের পারভিন কুমারের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী। কারণ পারভিন কুমার দুটো স্বর্ণপদকের সঙ্গে দুটো জাতীয় রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। পারভিন রেকর্ড করেছেন ডিসকাস ছোঁড়া ও হাতুড়ি ছোঁড়ায়।

জাতীয় অ্যাথলেটিকসে প্রতি বছর সার্ভিস দলেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য দেখা যায়। সার্ভিস দল এবার আলাদা অংশে গ্রহণ করেনি। সার্ভিসের বেশীর ভাগ অ্যাথলীট পাঞ্জাবের হয়ে প্রতিযোগিতা করেছেন। পাঞ্জাব এবার একুশটা স্বর্ণপদক পেয়েছে। পরের স্থান মহীশূরের—দশটা। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ও বিহার প্রত্যেকে দুটো করে স্বর্ণপদক পেয়েছে।

রোভার্স কাপ

রোভার্স কাপের ফাইন্যালে মোহনবাগানকে ১—০ গোলে হারিয়ে বোম্বাইয়ের মফৎলাল স্পোর্টস ক্লাব এবার রোভার্স কাপ পেয়েছে। প্রতিপক্ষের চেয়ে অনেক ভালো খেলেও মোহনবাগান ফাইন্যালে জিততে পারেনি। বিজয়ী দলের রাইট আউট এস. মেননের যে সটে গোলটা হয় তা মোহনবাগানের গোলরক্ষক কে. সরকার লাফিয়ে উঠে হাতে পেলেও বল তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে গোল পোস্টে লাগে এবং গোল-পোস্ট বেয়ে মাটিতে পড়ে গোলে ঢোকে।

গতবারের রানার্স মোহনবাগান এবার নিয়ে সাতবার রোভার্স ফাইন্যাল খেলল, কিন্তু কাপ পেয়েছে মাত্র একবার। ১৯৫৮ সালে এক ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাব ছাড়া বোম্বাইয়ের কোনো বে-সামরিক ফুটবল দল আজ পর্যন্ত রোভার্স কাপ পায়নি। তাই মফৎলাল স্পোর্টস ক্লাবের পক্ষে এবার রোভার্স কাপে জয়ী হওয়া সত্যই কৃতিত্বের-ও প্রশংসার।

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

বোম্বাইতে আয়োজিত জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় নন্দু নাটেকার আবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। মহিলাদের ফাইন্যালে মীনা শাহ তাঁর চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এবারের প্রতিযোগিতায় উল্লেখ করবার মতন ঘটনা সেমি-ফাইন্যালে পশ্চিমবঙ্গের দীপু ঘোষের

কাছে দীনেশ খান্নার পরাজয়। সদ্য এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন এবং নেহরু মেমোরিয়াল ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দীনেশ খান্নাকে দীপু ঘোষের কাছে ১৫—২ ও ১৭—১৬ পয়েণ্টে হার স্বীকার করতে হয়। প্রথম সেটে দীনেশ খান্না দীপু ঘোষের বিরুদ্ধে এক রকম দাঁড়াতেই পারেন নি। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য দুই প্রতিযোগীর ভেতর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। সেমি-ফাইন্যালে দীনেশ খান্নাকে হারাবার পর অনেকেই আশা করছিলেন দীপু ঘোষ হবেন ভারতের নতুন চ্যাম্পিয়ন, কিন্তু ফাইন্যালে নন্দু নাটেকারের কাছে দীপু ১৫—৭ ও ১৫—৫ পয়েণ্টে যখন হারলেন তখন সকলের সব আশা নিরাশা হয়।

দুটো প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ

স্লোভান ব্রাতিস্লাভা নামে চেকোস্লোভাকিয়ার একটা ফুটবল দল কিছুদিন আগে কলিকাতার রবীন্দ্র সরোবরের আয়োজিত দুটো প্রদর্শনী খেলায় বিজ্ঞানসম্মত ও পরিচ্ছন্ন ফুটবলের ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়ে গেছে। প্রদর্শনী খেলায় প্রথম দিনে চেক দল আই. এফ. এ-র বাছাই দলকে ৫—১ গোলে এবং দ্বিতীয় দিন মোহনবাগান ক্লাবকে ৫—০ গোলে হারিয়ে দেয়। ফলাফল থেকেই বোঝা যায় চেক দলের খেলার মান কতো উন্নত। স্লোভান ব্রাতিস্লাভা নামে যে ফুটবল দলটি খেলতে আসে, তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন। স্টপার পপলুহার এবং গোলকিপার স্রইফ বিশ্ব কাপে খেলেছেন। রাইট ব্যাক আরবান খেলেছেন অলিম্পিক দলে।

টেবল টেনিস ঃ ভারত বনাম চেকোস্লোভাকিয়া

চেকোস্লোভাকিয়ায় টেবল টেনিস খেলা খুবই জনপ্রিয়। ইউরোপের টেবল টেনিস ক্রমপর্যায়ে চেকোস্লোভাকিয়ার স্থান তৃতীয়, বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে পঞ্চম। তাই ইডেন গার্ডেনের ইনডোর স্টেডিয়ামে ভারত বনাম চেকোস্লোভাকিয়ার চতুর্থ টেবল টেনিস টেস্ট কলকাতার টেবল টেনিস অনুরাগীদের কাছে একটা বিশেষ আকর্ষণের ছিল। বোম্বাই, হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজের টেস্টে ভারতের পরাজয়ের পর অনেকে আশা করেছিলেন কলকাতার টেস্টে চেক দলকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। বোম্বাইতে ৫—২ খেলায় এবং হায়দরাবাদের ৫—০ খেলায় চেক দল জিতলেও মাদ্রাজে দু' দেশ চারটে করে খেলায় জয়ী হবার পর জয়-পরাজয়ের মীমাংসাসূচক নবম খেলায় চেক দল জয়ের সম্মান অর্জন করে। কিন্তু কলকাতায় ভারতের কোনো খেলায় জয় তো দূরের কথা ,পাঁচটা খেলায় এগারোটা গেমের ভেতর মাত্র একটা গেম লাভ করে ভারত। বাকি দশটা গেমই জেতে চেক খেলোয়াড়রা।

শাস্ত্রীজী
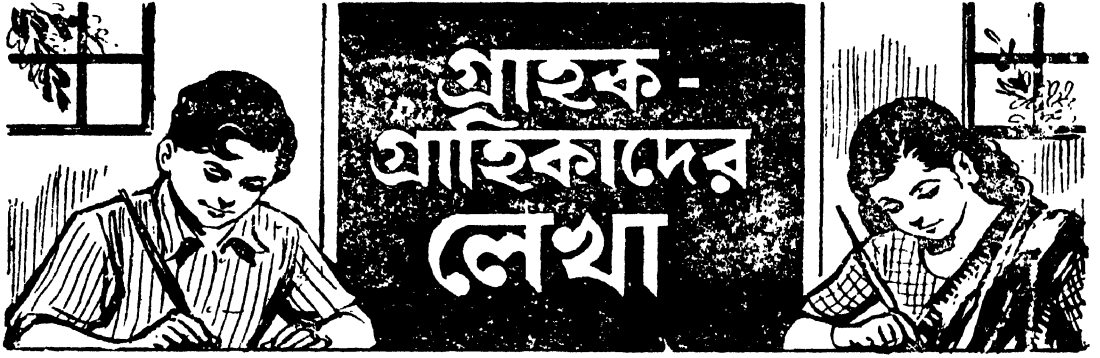
তোমার স্বল্প মধুর হাসি
নয়নের আভা ভাল যে বাসি
পরানে আসন পেতেছ আসি
প্রাণ-প্রিয় শাস্ত্রীজী।
তোমার মৃত্যু আলোকের রথে
আনিল শান্তি বিজয়ের পথে
আমরা সকলে হয়ে এক মতে
প্রণমি তোমারে আজি॥

শ্রীমেঘসুন্দর ঘোষ

সাহসী বালক

মেলায় কি ভিড়! 'আহা, ঐ লাল চীনা-মাটির পুতুলটা বোধ হয় বিক্রী হয়ে গেল!' একটি ছেলে কথা ব'লে তার সঙ্গীর হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বক্তা ছেলেটির সাজ-পোশাকে ছিল আভিজাত্যের ছাপ।

যাই হোক—চীনামাটির পুতুলটা অবশেষে সেই কিনে বেশ খুশী মনেই বাড়ী ফিরছিলো। হঠাৎ ছেলেটি বিস্ময়-নেত্রে দেখলো যে, তার সঙ্গীটি একটা ঘোড়ার গাড়ীর সামনে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ ছেলেটি তার অত শখের পুতুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই বিপদের হাত থেকে তার সঙ্গীকে বাঁচাবার জন্য ছুটে গেল এবং ঘোড়ার সামনে থেকে তার সঙ্গীকে টেনে আনলো।

কে এই ছেলেটি বলতে পারো? ইনি হলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যাঁকে আজ আমরা বিবেকানন্দ নামে জানি। তিনি শুধু মানব-দরদী সাধকই ছিলেন না, তাঁর সাহসও ছিল অপরিসীম।

শ্রীললিতা বসু

দানবীর

ফুট পাথ। এক জ্যোতিষী হাত দেখছেন। যার তিনি হাত দেখছিলেন, সে একটি ছেলে। ছেলেটির হাত দেখে জ্যোতিষী বললেন, 'তুমি খুব ধনবান হবে।'

এই কথা শোনার পর ছেলেটি জ্যোতিষীকে বললে, 'বেশ, আগে ধনবান হই, তারপর আপনার দক্ষিণা দেব।'

কয়েক বছর পরের ঘটনা।

ঐ ছেলেটি তখন ব্যারিষ্টার হয়েছেন এবং প্রচুর টাকা রোজগার করছেন। সত্যিকার বড়লোকই হয়েছেন তিনি তখন।

সেই সময় একদিন তাঁর বাড়িতে এক ব্রাহ্মণ এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। ব্রাহ্মণ কাতরভাবে বললেন, তাঁর মেয়ের বিবাহ তাই তিনি কিছু সাহায্য চান।

ব্যারিষ্টার ভদ্রলোকের তখন কোর্টে বেরুবার সময়। তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন। তারপর তাঁকে কোর্টে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং কোর্টের শেষে ঐ ব্রাহ্মণের হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে বললেন, আজ বাড়ি থেকে বের হবার সময় প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলাম যে, আজকে যা পাব তা আপনাকেই দেব। সেই প্রতিজ্ঞা পালন করলুম।

এই ব্যারিষ্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। তিনি ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং পরলোক গমন করেন ১৯২৫ সালের ১৬ই জুলাই। আর ঐ ব্রাহ্মণ যিনি তাঁর কন্যাদায়ের জন্য ব্যারিষ্টারের কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিলেন, তিনি সেই জ্যোতিষী।

শ্রীঅভিপ্রিয় বসু

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

দশচক্র—গোলকেন্দু ঘোষ। শ্রীশেখর ঘোষ, ৮।৩৫, সি. আই. টি. বিল্ডিংস, কলিকাতা ১০ হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান : জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ১'৫০

বিষ্ণুশর্মার নাম বিশ্ববিদিত এবং তাঁর ছোটদের জন্য রচিত উপদেশাত্মক কাহিনীগুলিও সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের পক্ষে হিতকর। গ্রন্থকার ঐ কাহিনীগুলির ভিতর 'পঞ্চতন্ত্র' থেকে 'দুই বন্ধু', 'তিন ধূর্ত' ও 'বন্ধুভেদ' নামক তিনটি কাহিনীর সুন্দর নাট্যরূপ দিয়েছেন। এগুলির মধ্যে চরিত্র অল্প থাকায় এবং কোন স্ত্রী-চরিত্র না থাকায়, ছোটদের পক্ষে অভিনয় করাও সহজ হবে। মূল লেখকের লেখার গুণে এবং নাট্যকারের ঘটনা-বিন্যাস ও কথাবার্তার অপূর্ব কৌশলে নাটক তিনটির প্রত্যেকটিই যাঁরা পড়বেন আর যাঁরা অভিনয় দেখবেন, তাঁদের প্রত্যেককেই খুব আনন্দ দেবে।

সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে আনন্দের সংবাদ হলো এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হলেন এই দেশেরই একজন মহিলা। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে প্রধান মন্ত্রীর পদে মহিলার নির্বাচন এই প্রথম। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই নির্বাচনে আমরা যেমন খুশী হয়েছি—তেমনি খুশী হয়েছে পৃথিবীর সব দেশ।

ভারতবর্ষকে সুন্দর করে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন গান্ধীজী দেখেছিলেন—স্বর্গত নেতা জওহরলাল তার সার্থক রূপায়ণে ব্রতী হয়েছিলেন। একাদিক্রমে সতের বছর ধরে তিনি কঠোর সাধনার মধ্যে দিয়ে, বিপুল বাধা-বিপত্তির মধ্যে সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য অনলস পরিশ্রম করেছেন। তাঁর অবর্তমানে লালবাহাদুর শাস্ত্রী সে দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে এসেছিলেন। আঠারো মাসের অল্প পরিসরে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, পূর্বসূরীদের স্বপ্ন সার্থক করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তার শেষ কীর্তি তাসখন্দ ঘোষণা।

পূর্বসূরীদের সাধনা, প্রচেষ্টা ও কৃতিত্বের সকল কিছু দায়-দায়িত্ব শ্রীমতী গান্ধীর ওপর এসে পড়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রীতিডোর দৃঢ় করার দায়িত্ব যেমন তাঁর ওপর পড়েছে, তেমনিই দেশের ভিতরে অনেক সমস্যাই সমাধান তাঁকে করতে হবে। তাঁর প্রচেষ্টায় আমাদের আন্তরিক সহযোগিতা করতে হবে। আমরা আশাকরি জওহরলাল নেহরুর সুযোগ্যা কন্যারূপে, দেশের সার্থক মহীয়সী নারীরূপে, তিনি আমাদের কল্যাণের পথে, শুভকর্মপথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

এই সঙ্গে তাঁর দীর্ঘজীবনের প্রার্থনাও এক হয়ে রইল।

মহাজীবন থেকে—

ভারতের উত্তরে তিব্বত। চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা দেশ। সারা বছর জুড়ে দুরন্ত শীত

আর শীতকালে গাছপালা মাটি ঘরবাড়ী সব বরফে ঢাকা। যেন বরফের দেশ। কখনও কদাচিৎ দেখা যায় এই বরফে ঢাকা পাহাড়ী পথ বেয়ে নেমে আসছে আলখাল্লা পরা তিব্বতী বণিকরা। ছোট ঘোড়ার পিঠে লোকের মাথায় মোট-ঘাট। এই সব নিয়ে নীচের দিকে তিব্বতের দক্ষিণে নেপাল রাজ্য পর্যন্ত তাদের নেমে আসতে দেখা যেতো—কখনও কখনও নেপাল পার হয়ে ভারতবর্ষের উত্তরের রাজ্যগুলোতেও তারা আসতো। এদের দেশে রাজাও ছিলেন আর পাত্র-মিত্র সেপাই শান্ত্রী লোকজন সবই ছিল।

কখনও রাজাদের সখ হতো ভারতবর্ষ থেকে লোকজন তাঁদের দেশে বেড়াতে যাবে। ভারতবর্ষের লোকজনদের সভ্যতা, ধর্ম ও রাজনীতির কথা তারা শুনেছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না।

হাজার বছর আগে তিব্বতের রাজার ইচ্ছা হয়েছিল, ভারতবর্ষ থেকে আমন্ত্রণ করবেন জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতকে। তখন ভারতবর্ষে নামকরা বিদ্যাপীঠ ছিল বিক্রমশীল মহাবিহার। এই বিহারের অধ্যক্ষ পরম পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ভারতবর্ষ জুড়ে তাঁর খ্যাতি। অনেক ধনরত্ন স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দূত পাঠালেন তিব্বত-রাজ শ্রীজ্ঞানকে আনতে।

ধন-দৌলতের লোভে দীপঙ্করকে আনা যাবে না এ ভুল রাজা বুঝলেন, যখন দূত ফিরে এলো।

এ রাজার মৃত্যুর পর নতুন রাজাও চেষ্টা করলেন—এবার শুধু অনুরোধ-পত্র এলো—ধন-দৌলত নয়।

তিব্বতীয় দূত তিনবছর অপেক্ষা করে থাকার পর দীপঙ্কর তিব্বত যাত্রা করলেন।

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন দীপঙ্কর। জন্মেছিলেন গৌড়ের রাজবংশে। পুঁথিপত্র থেকে জানা যায়, যে রাজপ্রাসাদে তিনি জন্মেছিলেন তার আসল নাম সুবর্ণধ্বজ। বাবা কল্যাণশ্রী, মা পদ্মপ্রভা। ছেলেবেলার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ।

একুশ বছর বয়সে তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর মনে সুখ ছিল না—আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে থাকতো। কৃষ্ণগিরি বিহারের অধ্যক্ষ রাহুল গুপ্তের কাছে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিলেন উনত্রিশ বছর বয়সে ও দন্তপুরী বিহারে যোগ দিয়ে কয়েক বছর অধ্যয়নের পর 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' উপাধি পেয়েছিলেন। সে সময় সুবর্ণদ্বীপে মহাচার্য চন্দ্রকীর্তি নামে একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত বাস করতেন—এঁর মত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এশিয়ায় কেউ ছিলেন না। দীপঙ্করের ইচ্ছা ছিল এঁর কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করবেন—কিন্তু সুবর্ণদ্বীপ তো বহু-বহু দূরের পথ—বাধা বিঘ্ন অনেক—। কিন্তু সেই ইচ্ছাও তাঁর পূর্ণ হলো।

একদল বণিকের সঙ্গে তাঁর যাত্রার সুযোগ ঘটলো। তারপর দীর্ঘ বারো বছর—অধ্যয়ন

করে—সিংহল হয়ে সমুদ্র পথে মগধে ফিরে এলেন। দেশের রাজা প্রথম মহীপালের অনুরোধে বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ হলেন।

তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে তিনি যাত্রা করলেন। তিব্বতের দূরত্ব আর পথঘাটের দুর্গমতা কোনটাই তাঁকে বাধা দিতে পারলো না। বয়স তখন ষাট। এই রকম পরিণত বয়সে ঘরের বাইরে যাওয়া যেখানে সাহস হয় না—দীপঙ্কর তখন কর্তব্যের আহ্বানে সব বাধা তুচ্ছ করে চললেন। দুর্গম পথের চড়াই-উতরাই ভেঙ্গে দিনের পর দিন যাত্রা চলেছিল। মানসসরোবর, তারপর রাজধানী লাসায়। তিব্বতী লামারা তাঁকে এক সভায় সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন—এক বৃদ্ধ লামা উঠে দাঁড়িয়ে ইচ্ছা করেই তাঁকে সম্মান দেখান নি। পরে তাঁর অনুতাপের সীমা ছিল না।

দীপঙ্কর যেদিন লাসায় পৌছলেন, সেদিন লাসার রাজপ্রাসাদের দু'ধারে কাতারে কাতারে লোক—ছেলে বুড়ো যোয়ান কেউ বাদ নেই। সকলে ভিড় করেছে তিব্বতের এই মহামান্য অতিথিকে দেখবার জন্য। মহামান্য অতিথি অনেকই এসেছেন, কিন্তু তাঁদের অভ্যর্থনায় এত লোক কখনও হয়নি।

সেদিন সেই জনতার মধ্যে এক অসাধারণ ঘটনা ঘটলো। ছোট একটি মেয়ে ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়েছিল। দীপঙ্কর যখন তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন—তখন সে তার একমাত্র অলঙ্কার গলার হারটি খুলে তাঁর দিকে নিক্ষেপ করলো। মেয়েটি একমুহূর্ত আগেও ভাবেনি যে সে এমনি একটা করবে। তার কাছে যে বস্তুটি সব চেয়ে প্রিয় ও সবচেয়ে মূল্যবান সে সেই জিনিসটিই তাঁকে নিবেদন করলো।

বাড়ী ফিরলে বাবা মা দেখলেন মেয়ের গলার হার নেই—ওটিই গরীবের একমাত্র সম্বল। ভর্ৎসনায় জর্জরিত হয়ে মেয়েটি নদীর জলে ঝাঁপ দিল। সারা রাজধানীতে এই সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে গেল। দীপঙ্কর শশব্যস্তে ছুটে এলেন—মা বাবাকে সান্ত্বনা দিলেন। মেয়েটির শেষ কাজ নিজের হাতে করলেন।

কোথাকার একজন বিদেশী তার জন্যে ছোট্ট মেয়েটির মনে যে ব্যাকুলতা, তার কথা দীপঙ্কর নিশ্চয় কোনোদিন ভুলতে পারেন নি।

তোমাদের চিঠি পেলাম—

সংঘমিত্রা কর, কোলকাতা; শম্পা পাল, কোলকাতা; সুভদ্রা বসু, ধানবাদ; ললিতা ও গীতিকা চক্রবর্তী, রাণী লাহিড়ী, শ্রীরামপুর; বনলতা ও অমরজিৎ, জয়পুর; কৌস্তুভ, মৌসুমী ও শ্রাবণী, কথাকলি, কৌশিক, কোলকাতা; শ্রীরূপা ও রণেন লাহিড়ী, হাওড়া।

শুভেচ্ছাসহ—তোমাদের **'মধুদি'**

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ০'৪৫

✽ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ✽

৪৬শ বর্ষ] চৈত্র ঃ ১৩৭২ [১২শ সংখ্যা

এ. বি. সি. ডি'র ছড়া

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

একজিবিশান দেখতে যাবো, টিকেট দেবে কে ?
বিলেত ফেরত বুদ্ধুবাবু ছ'বার দেখেছে।
সিনেমাতে নামবে নরু বায়না ধরেছে
ডিমের খোলায় ব্যাং ভরে ওর গলায় বেঁধে দে।
ইন্দুমাসী ইস্ কি ভীষণ আছাড় খেয়েছে,
এফ-আর-সি-এস্, এম্-বি-বি-এস্ সবাই ভেবেছে।

জিতেন বুড়ো পাড়ার খুড়ো বেজায় খেপেছে
এইচ-এম্-ভি'র ইংরেজী গান বাজিয়ে চলেছে।
আই-ঝুমঝুম, বাই-ঝুমঝুম কি গান জমেছে,
জেলির শিশি আলমারীতে নাচতে লেগেছে।
কেষ্ট নাচে, কানাই নাচে, নাচে কোলের ছাঁ'—
এল্‌কি নাচের ভেল্‌কি দেখায় এলোকেশীর মা।

এম্‌নি করে পথটা কেন হেলে পড়েছে ?
এন্-সি-সি'র ঐ খোকা-খুকু প্যারেড করেছে।
ওদিক পানে যাসনে বাপু পড়বি নালাতে,
পিসেমশাই পিসীর খোঁজে গেছেন টালাতে।
'কিউ' করেছে হাজার মানুষ মোহনবাগানে
আরবি ঘোড়া জোড়া জোড়া নাচছে সেখানে।

এস্‌কিমো'রা শানাই বাজায় হাটিম-টিমের রে'—
টিঙটিঙে ঐ গঙ্গা-ফড়িং পাগড়ি বেঁধেছে।
ইউরোপের টিম এসেছে খেলবে কুলু'তে
ভিরমি খেয়ে বল পড়েছে হনলুলুতে।
ডাব্‌লু নামে ঐ ছেলেটা হাবলু ঘোষের কে ?
এক্স্‌রে করে মাথায় ছুটো পেরেক পেয়েছে।

ওয়াই-এম্-সি'য়ের একৃজিবিশান কাণ্ড দেখে থ'—
জেড্‌ডা থেকে উট এসেছে, উঠে পালাই চ'।

মধু ডাকাতের বন্ধু

শ্রীমহাশ্বেতা দেবী

অনেক, অনেক দিন আগেকার কথা। কোম্পানীর রাজত্ব, তা এ দেশে একশো বছর হ'ল পত্তন হয়েছে। কবেকার কথা, তা বোঝাতে গেলে এই বললেই চলবে—রানীগঞ্জে রেললাইন পাতা হবে এই নিয়ে বেজায় জল্পনা-কল্পনা চলছে। বিদ্যাসাগর মশায় তখনো দিব্যি শক্তসমর্থ মানুষ। যা যা কর্তব্যকাজ বলে মনে করেন, তাই করবার জন্যে তাল তলার চটি ফটফটিয়ে কি সায়েব কি বাঙালী দেশশুদ্ধ লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়াচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ তখনো জন্মান নি। তখনকার কলকাতা, এক একটা মানুষ যেমন একচোখো থাকে, একদিক ভিন্ন দু'দিকে দেখতে পায়না, তাদের মতই বেড়ে চলেছে উত্তরের দিকে, কেল্লার দিকে, ধর্মঠাকুরের তলা বল বা ধর্মতলা বল, সে সব দিকেও বটে।

ভবানীপুর, ইটিলী, অনেক, অনেক দূরের গড়িয়া, ও পাশের বুঁদঘাট, এ সব জায়গারও বেশ বাড়বাড়ন্ত। তবে সব যেন ছাড়া ছাড়া, দূরে দূরে। মাঝেমাঝেই জলা বিল, হোগলা বন, নারকেল গাছ আর নানাজাতের গাছ-গাছালীর বন। কালীঘাট থেকে ইটিলী যেতে হলে চাল-চিড়ে না হোক চারটি মুড়ি-মুড়কী গামছায় বেধে রওনা হতে হয়। এইসব জায়গায় যে একদিন ইটপাথরের বাড়ীর জঙ্গল বসে যাবে, আর এক পেল্লায়, রাক্ষুসে শহর তৈরী হবে তা কেউ জানেনা পর্যন্ত।

শহর যে বাড়ছে, ঘরবাড়ী যে তৈরী হচ্ছে তা ত' দেখা যাচ্ছে। তাই বলে, একদিন এ শহরটা একেবারে প্রতিটি ছোট-বড় জনপদ, যা যেখানে আছে, সবগুলোর নাম ধুয়ে মুছে দিয়ে এক 'কলকাতা' নামটাকেই এতবড় করে তুলবে, কালীঘাটের বিশমাইল দক্ষিণের জায়গার নাম অবধি কলকাতার মধ্যে ঢুকে যাবে তা কেউ জানে না।

ভবানীপুরের লোকেরা বঁড়শের লোকদের বলে, 'তোমরা দেখছি ভারী গ্রামে থাক হে।' বঁড়শের লোকরা ঠাকুরপুকুরের লোককে বলে, 'দিব্যি গ্রাম গ্রাম জায়গাটা।' অথচ, কেউ যদি বলে একদিন এ সব জায়গার নামও 'কলকাতা' হবে, তা হলে সবাই ঠাওরাবে লোকটা মহা খ্যাপাটে।

এমনি সময়ে, ঠিক এমনি সময়ে, একদিন কালীঘাটের কাছাকাছি এক কাণ্ড ঘটল।

কালীঘাটের মন্দিরে বছর ভোর দলে দলে যাত্রী আসে। সেইজন্যে মন্দির ঘিরে বেশ হোগলার ঘর, শণের ঘর, ইটের বাড়ীতে একটা ছোটখাট জনপদ গড়ে উঠেছে। সেখানে যাত্রীরা এসে থাকে, রাঁধেবাড়ে, খায়। দোকান আছে কয়েকটা, বাজারও আছে ছোটখাটো। এদিককার তামাম মানুষের বিশ্বাস মড়া এনে কালীঘাটের কাছ বরাবর শ্মশানে পোড়ালে সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত।

তীর্থের যাত্রীরা আসে, শ্মশান যাত্রীরা আসে, কালীঘাটের পথে লোক চলাচলের আর বিরাম নেই।

আর কারা আসে জান? মাঝে মাঝে সায়েবরা আসে। হ্যাঁ, রীতিমত জুতো জামা আঁটা ধপধপে বিলিতী সায়েব।

মন্দিরের বাইরে পালকী রেখেই তারা পুজো পাঠিয়ে দেয়। ভেতরে যেতে পারুক বা না-ই পারুক, পুজো পাঠিয়ে মা কালীকে খুশী রাখতে মানা নেই। আর, এ কথা কে না জানে বল এখনো কালীমন্দিরে, এখানে-সেখানে লুকিয়ে নরবলি হয়। হ্যাঁ, শুনলে পরে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু এ কথা তো আর মিথ্যে নয় যে সত্যি ঘটনা অনেক সময়েই গল্পের চেয়ে অনেক ভয়ংকর হয়। তাই, মনে মনে যাদের কোন কাজ গুছোবার দরকার থাকে, তারা কালীকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে লুকিয়ে নরবলি দিয়ে পুজো দিয়ে যায়। সকাল বেলা দেখা যায় মন্দিরে রক্ত গঙ্গা, আর সোনার জবাফুল, পুজোর সাত-সতেরো জিনিস সাজানো রয়েছে।

এমন একটা কাণ্ড ঘটলে শহরে সায়েবরা তোলপাড় করে ছাড়ে। তবু কি আর সব সময়ে ধরতে পারে অপরাধীকে? মনে ত' হয় না। একদিকে এই কলকাতাতেই লেখাপড়া, কাজকর্মে বাঙালীরা খুব এগিয়ে চলছে, আরেক দিকে এইসব কাণ্ড। যাকে বলে পিদীমের নিচে অন্ধকার, এই আর কি।

তা, এই কালীঘাটের কাছাকাছি সেদিন বামুনদের ছেলে নকুল একটা কাণ্ড করে বসল।

বাড়ী থেকে সেদিন অনেক দূরে চলে এসেছিল নকুল। ঢাকুরেতে তাদের বাড়ী। কোথায় তাদের বাড়ী আর কোথায় কালীঘাটের মন্দির। মাঝামাঝি জায়গায় শুধু কতকগুলো জলা আর বেণাঘাসের বন। বেণাঘাস বড় সুগন্ধি। তার শেকড় থেকে খসখস তৈরী হয়। খসখসের টাটী গরমকালে টাঙিয়ে দিয়ে জল ছিটিয়ে দিলে ঘরের বাতাস ঠাণ্ডা হয়। সায়েব বল, ধনী লোকরা বল, সবাই খসখসের টাটী ব্যবহার করে। এ বেণাঘাসের জঙ্গল থেকে তাই যারা পাটী বোনে সেই জোলাদের খুব লাভ হয়।

সেখানেই চলে এসেছিল নকুল। পাঠশালায় যায় না নকুল, পড়াশোনায় তার মন নেই। তা ছাড়া, অনেক দিন থেকেই তার ইচ্ছে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে মুনীশ্বরের মত ভালুক নাচ দেখিয়ে বেড়াবে। বাড়ীর এক ছেলে হওয়ার দরুণ তার আদরটা মা-ঠাকুমার কাছে যতটা, বাবার কাছে ততটা নয়। কেন না, বাবা তাকে দেখলেই পড়তে বসান। তাঁর মুখে এক কথা, নকুল বাড়ীর একমাত্র ছেলে। তাই তাকে অনেক, অনেক দায়িত্ব নিতে হবে। পঞ্চাশটা শিষ্য-বাড়ী সামলানো, বাড়ীর ঠাকুর-দেবতার পুজো, কাজটা তো কম নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তত তাড়াতাড়ি নকুলের মাথায় খানিকটা বিদ্যেবুদ্ধি, অঙ্ক, ব্যাকরণ, চাণক্য শ্লোক ঠুসে দিতে না পারলে উপায় নেই।

নকুলের বাবার নাম কালীপদ। কালী ঠাকুরের নামে ঢাকুরিয়া, কসবা, তাবৎ অঞ্চলের সবাই কাঁপে। যেমন মেজাজের ছিরি, তেমনি বাজখাঁই গলা। শুধু বড় বড় বাড়ীতে পুরুতগিরি করে তিনি বিস্তর টাকা জমিয়েছেন। মহারানীর ছাপমারা মোহরই নাকি আছে এক পুঁটুলী। নকুলের উপর তিনি বারোমাসই রেগে থাকেন, আর মাঝে মাঝে ঢাকুরে গ্রামকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে বলেন 'যা আছে সব গঙ্গার জলে ঢেলে ফেলে দেব। লেখাপড়া যে না করে তাকে আমি কিচ্ছু দেব না।'

এ হেন বাবা আজ টের পেয়েছেন নকুল দশদিন পাঠশালার দরজা মাড়ায় না। টের পেয়ে কিচ্ছু না বলে একগাছা বেত খুঁজতে গিয়েছেন। খবর পেয়েই নকুল হাওয়া। একেবারে কালীঘাটের দিকে রওনা হ'ল সে। কালীঘাটের গলিতে মুনীশ্বর থাকে। তার চেলা হয়ে দেশ-বিদেশে পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কালীঘাটের গলিতে নকুল মুনীশ্বরের দেখা পেলে না। মুনীশ্বরকে কেউ চেনে না। ভালুক নাচায় এমন কোন মানুষকে কেউ দেখেনি। নকুলের মনে হ'ল মুনীশ্বর বলেছিল তাকে সবাই চেনে। অথচ একজন থ্যাকখেঁকে বড়ো তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে মিছেমিছি বলতে লাগলেন, 'মুনীশ্বর' অ্যাঁ? মুনীশ্বর?'

'আজ্ঞে।'

'কেন, সে বেটার খোঁজ কেন?'

'আজ্ঞে……'

'বলি, বয়স কত? কোথায় থাকা হয়? বাবা কি করে? বাড়ী ছেড়ে পালানো হয়েছে, তাই না?'

শুনেই নকুল আর একবার হাওয়া। সর্বনেশে বুড়োর হাত থেকে পালিয়ে সে একেবারে বাড়ীর দিকে ছুট লাগাল। সন্ধ্যের আগে বাড়ী ফিরতেই হবে। সন্ধ্যে হলে এখানে বাঘ বেরোয় তা সবাই জানে। বাড়ী ফিরে গোয়ালঘরে লুকিয়ে থাকলেই হবে। খড়ের গাদায় লুকিয়ে থাকলে বাবা টের পাবেন না।

হনহনিয়ে পথ চলতে চলতে সে দেখতে পেল একটা আশ্চর্য কাণ্ড। একটা আমগাছের নিচে একটা লোক পড়ে ঘুমোচ্ছে। আর তার মাথার কাছে দিব্যি বিঁড়ে পাকিয়ে শুয়ে আছে একটি জাত-গোখরো। দেখে তো নকুলের চক্ষু চড়কগাছ। হাতে একগাছা লাঠি ছাড়া কিছুই নেই নকুলের। এরচেয়ে বড় বড সাপও অবিশ্যি সে মেরেছে। কিন্তু লোকটা যদি ঘুমের মধ্যে হাতটাত নাড়ায়? সাত-পাঁচ ভেবে নকুল লাঠিটা ঠুক ঠুক করে ঠুকতে লাগল। সাপটা অনেকক্ষণ বাদে, যেন খানিকটা বিরক্ত হয়ে সরে গেল। কোথায় গেল কে জানে। মাঠে বড় বড় ইঁদুর থাকে, বোধহয় তারই

'এমন জায়গায় এসে কেউ ঘুমোয় ?'

সন্ধানে গেল। সাপটাকে চলতে দেখে তবে নকুল বুঝল এ সাপ মারা তার সাধ্যে কুলোত না। যেমন মোটা, তেমনি লম্বা।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তড়াক করে উঠে বসল। বলল, 'প্রাণটা বাঁচিয়ে দিলে স্যাঙাৎ।'

লোকটার চেহারা বড় ভয়ানক। যেমন কালো, তেমনি জোয়ান।

'তুমি ওরকম ঘুমোচ্ছিলে কেন ? মারা পড়তে যে !'

'আরে, তুমিই তো বাঁচিয়ে দিলে !'

'এমন জায়গায় এসে কেউ ঘুমোয় ?'

'প্রাণের দায়ে ভাই।'

'কেন, তোমার বাবা বুঝি আমার বাবার মতই রাগী ?'

লোকটা গলা তুলে হাসল। তারপর বলল, 'বাপের মারের ভয়ে পালাচ্ছ ?'
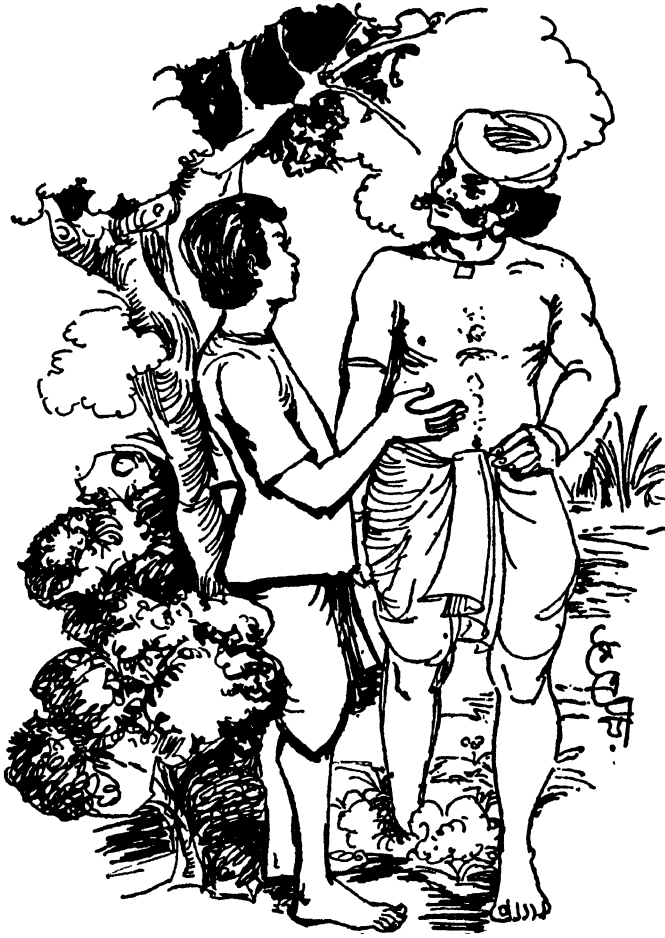
নকুল কিছু বলল না।

'বাড়ী কোথায় ?'

'ঢাকুরে।'

'বটে ? তা চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

নকুল যেন একটু আশ্বস্ত হ'ল। হাজার হলেও এতটা পথ যেতে হবে। তা ছাড়া আকাশটা যেন কেমন ঘোলাটে হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে আসছে।

'ইদিকে আসা হয়েছিল কেন ?'

নকুল চোখকান বুজে কথাটা বলে ফেলল। শুনে লোকটা হাসল কিনা বোঝা গেল না। শুধু, অন্যদের মত সে একটা বড়-বড় ভাব করল না। এমন কি বেশ গম্ভীর গলায় বললে, 'তা আর এমন মন্দ কি হ'ত ? ভালুক নাচ করানোটা কি একটা যেমন-তেমন কাজ ? এই দেখ না, আমিই ত' একসময়ে ঠিক করেছিলাম লেখাপড়া আর নয়, আমি জেলেডিঙির চাকর হব। জেলেদের ভাতটাত রেঁধে দেব।'

'শুনে কি তোমার বাবাও লাঠি খুঁজতে গিয়েছিল ?'

'বাবা নয়, পিসে।'

'তা এখন কি করা হয় ?' নকুল ভেবে দেখল বড়দের মতই গুছিয়ে গুছিয়ে যখন কথাবার্তা হচ্ছে তখন এসব প্রশ্ন করলে মানাবে ভাল।

'মায়ের চরণতলে পড়ে আছি হে।' লোকটা আবার মুখ ফিরিয়ে বললে। তারপর বললে, 'ঐ যে ঢাকুরের গোয়ালাদের বাড়ীর চালাগুলো দেখা যাচ্ছে, শিবমন্দিরের চুড়ো। যাও, চলে যাও।'

নকুলের পিঠে চাপড় মেরে বললে, 'বাবার নামটা বললে না, সময় পেলে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতাম। যাকগে, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, সময় হলে প্রতিদান দেব খ'ন।'

'কি করে চিনবে ?'

'সে ঠিক চিনে নেব।' বলে লোকটা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললে, 'হাত পা-য়ে কাটা-ছেঁড়া দেখলাম, ওটি ভাল। তোমার লক্ষণ বড় ভাল হে বন্ধু, ঐ কাটার দাগ তোমায় বাঁচালে। নইলে এসব জায়গা ভাল নয়। কখন তোমায় ছ্যা ড্যা ড্যাং করে বলি দিয়ে দিত।'

'কে ?'

'তারাও মায়ের সেবক হে!' লোকটা লাফিয়ে একটা ডোবার পাড়ে গেল। তারপর বেণাঘাসের জঙ্গল দিয়ে যেন মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে গান শোনা গেল, 'কালী মন লয়ে চলে যাই নির্ভয়ে হে!'

নকুলের মনে হ'ল বেশ গান। বেশ গান, বেশ জীবন, মাঠে-ঘাটে পড়ে থাকা, আপন মনে ঘুরে বেড়ানো। তার বুক ঠেলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠল আর পড়ল। যতই কষ্ট হোক, নকুলের ত অন্য উপায় নেই। কালীঠাকুরের এক ছেলে হয়ে তার ওপর যে অনেক, অনেক দায়িত্ব।

বাড়ীতে ফিরতে সে অবশ্য আর মারধোর খায়নি। বোঝা গেল অনেকক্ষণ ধরে সবাই তাকে গরুখোজা করে বেড়িয়েছে। মা আর ঠাকুমা কেঁদে-কেটে সারা হয়েছেন। এমন কি নকুল বাড়ীতে

ঢুকতে গোলার পায়রাগুলো অবধি বক-বকম করে উড়ে উড়ে কত মনের চিন্তা জানাতে লাগল। লাল গোরুটা মিছেমিছি তাকে চেটে দিলে।

শুধু বাড়ীর মাখন চাকরটা, যে গোয়ালের কাজকর্ম করে আর খড়ের মাচায় বসে সিঁথি ফিরিয়ে যাত্রার গান গায়, সে বললে, 'ব্বাপো রে ব্বাপো! কালো এঁড়েটা য্যাখন পেলিয়ে যাদবপুর গিয়ে উট্‌ছেলি, তাঁকে খুঁজে ছিলাম আর তোমায় খুঁজলাম! কি ছেলে বাছা! এঁড়ের চেয়েও বজ্জাত যে!'

বাবা, অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর কখনো এমন করলে বাড়ী থেকে বের করে দোব। এখন গিয়ে খেয়েদেয়ে সকলকে উদ্ধার কর। কালে কালে ছেলেগুলো হ'ল কি, অ্যাঁ? একটু বকলেই দেশত্যাগী হবে?'

পাড়ার চাটুজ্জে মশায় বললেন, 'আহা, বুঝতে পারছ না কেন? উদিকে রামমোহন রায় ত' লেখাপড়ার ধুয়ো তুলে দিয়ে পটল তুললে। সেই থেকেই বিলিতী লেখাপড়া, যাকে বলে ঘামাচির মত, বেড়ে চলেছে ত' চলেছেই। সেইজন্যেই হাওয়া খারাপ হচ্ছে হে, আমাদের ঢাকুরে, যাদবপুর পাড়াগাঁয়ে অবধি তার ধাক্কা এসে লাগছে। আজ তোমার ছেলে দেশত্যাগী হচ্ছে, সেদিন আমার ভাগ্নে শুনলাম, দুপুরবেলা মাছ ধরতে দেওয়া হয়নি বলে ভাত খায়নি। বোঝ, একবার ব্যাপারখানা বোঝ!'

যা হোক, সেখানেই কথাবার্তার ইতি পড়ল।

আর, তার কয়েক দিন বাদে, নকুলদের বাড়ী ডাকাত পড়ল।

মাঝরাতে হঠাৎ ঢাকুরের চারদিক থেকে শেয়ালের ডাক শুনেই সবাই চমকে উঠল। এমন ভাবে শেয়ালের ডাক ডেকে আর কেউ আসে না, এক মধু ডাকাত আসে। মধু ডাকাত বামুনের ছেলে। কেমন করে, কে জানে, ডাকাত হয়েছে। কলকাতার সায়েব পুলিশ-কর্তা অবধি মধুর নামে থরহরি কাঁপেন। লোকটা নাকি নরবলি দিয়ে-টিয়ে মা কালীকে বেজায় হাত করে ফেলেছে। কোন লোক একটু টাকাপয়সা করেছে খবর পেলেই সে গিয়ে লাফিয়ে পড়বে সেখানে।

সেই মধু ডাকাত নকুলদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত। চল্লিশ-পঞ্চাশজন লম্বা কালো জোয়ান, তাদের এক হাতে মশাল, আর এক হাতে বর্শা, মুখে 'কালী কালী' ধ্বনি করে তারা অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল।

নকুলদের বাড়ীর সবাই ঘুমে অচেতন। পাড়া-প্রতিবেশী জাগল বটে, কিন্তু মধু ডাকাতের সামনে আসতে সাহস পেলে না। নকুলদের বাড়ীর সবাই যখন জাগল তখন তারা আর কে কি করবে? বামুন পণ্ডিতের বাড়ী, লাঠি সোঁটা, বর্শা বল্লম ত' থাকবার কথা নয়।

মধু ডাকাত বললে, 'অনেক, অনেক সোনাদানা জমিয়েছ ঠাকুর, যা আছে সব দাও।'

কালী ঠাকুর শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন, 'সব নে। তবে ঠাকুর-দেবতা, বাড়ীর লোকজন কারো গায়ে হাত দিসনে।'

'আর কারো গায়ে হাত দেব না ঠাকুর, তবে এই ছেলেটিকে চাই!' নকুল বোধ হয় ঠাকুমার কোলের মাঝখানে মুখ লুকিয়ে ছিল। তাকেই ধরে এনেছে এরা।'

'বলির জন্যে উৎকৃষ্ট বালক হে! এমন বলি পেলে মা দু'হাত ঢেলে দেবে!' বলে মোটা লোকটা যার কাঁচা পাকা চুল, সে হা হা করে হেসে উঠল।

'নকুল!' বাবা, মা, ঠাকুমা, সকলের আর্তনাদ ডুবে গেল আর একটা গর্জনে।

'ওকে ছেড়ে দে!'

মধু ডাকাত ঢাকুরিয়া গ্রামখানা কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। নকুলকে টপ করে তুলে নিল নিজের কাছে। বলল, 'স্যাঙাৎ, শেষ পর্যন্ত তোমায় আমায় এমন করেই দেখা হ'ল? ছ্যা ছ্যা, ভারী লজ্জা দিলে ত'?'

ভুল নেই, আর ভুল নেই। এ নকুলের সেই পথে পাওয়া বন্ধু। এখন নকুল বুঝতে পারল কি তার নাম।

'তুমি, তুমি ডাকাত?'

'হ্যাঁ গো!'

মধু তার সবগুলো দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'পিসে আমায় জেলেডিঙি ধরে ভাসতে দেয়নি বন্ধু, নোনাগাঙের দেশে যেতে দেয়নি। শেষ অবধি ডাকাত হলাম। তোমার বাবা যদি তেমায় যা চাও তা করতে না দেয়, তা হলে হয়তো তুমিও একদিন ডাকাত হবে।'

'আমাকে নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে? আমি লেখাপড়া করতে চাই না, ভালুক নাচাতে চাই না, শুধু তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

ঘরের সবাই অবাক। ডাকাতরা মন্ত্রপড়া সাপের মত মাথা নুইয়ে সর্দারের কথা শুনছে। নকুলের বাবার বুকের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে, ছেলেটা বলে কি?

'বামুনের ছেলে হয়ে ··'

তাঁর কথাটা থামিয়ে দিয়ে মধু গম্ভীর গলায় বললে, 'বামুনের ছেলে তাতে কি? তোমার এ ছেলে কাদার পুতুল নয়, একটা জ্যান্ত মানুষ, বুঝলে ঠাকুর? এমন ছেলেকে তোমার ঐ অং বং মন্তর গুলো না পড়িয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়ে দাও, মানুষ হয়ে যাবে। তিনি মানুষ বড় দড় হে, এমনি শক্ত ছেলেই চায়!'

নকুলকে বললে, 'সঙ্গে নিয়ে যেতাম বন্ধু, কিন্তু কি জান? এখন এ সায়েবদের জন্যে আর ডাকাতি করে সুখ নেই। হয়ত' ধরে নিয়ে গারদে পুরে দেবে। আমি যে বাঁধা-বাঁধিতে থাকতে পারি না, আমার চলতে-ফিরতে, বুঝলে স্যাঙাৎ, অনেক জায়গা, এই ভুবনখানা দরকার। আজ চলি।'

কালী ঠাকুরকে বলল, 'এ ছেলেটার জন্যে আজ বেঁচে গেলে ঠাকুর। ওর গায়ে আর কখনো হাত তুল না যেন। মনে রেখ, ও আমার বন্ধু।'

মধু একটু হাসল। সে হাসি দেখে নকুলের বুক থেকে যেন একটা কান্না উঠে এল।

দূরে কোথায় ভোরের আজান শোনা যাচ্ছে। মধুসর্দার তার দল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

টাট্টু ঘোড়া

শ্রীমতা শান্তি বসু

টাট্টু ঘোড়া, টাট্টু ঘোড়া
পা দু'খানি, হ'ল খোঁড়া
কে মেরেছে, ল্যাং,
ঘুটঘুট্টি, আঁধার রাতে
গেসিলি বুঝি, হাঁড়ি খেতে
তুই, হ্যাং হ্যাং।
তাড়া খেয়ে, পেটের জ্বালায়
ধরলি শেষে, এঁদো ডোবায়
মস্ত কোলা, ব্যাঙ্;

ঘুড়ী তোর, বাঁধলো সাবাস
দেশে দেশে, ছাড়লো সুবাস
ছুটে এল, চ্যাঙ্।
ভোরের আলো, দেখা দিতে
সবাই মিলে, হাড়-হাবাতে
করলে, দেশ ছাড়া;
হলদে মুলো, হিংসুটে
পরের দ্রব্যে, লোভ বটে
পালা, লক্ষ্মীছাড়া।

ভাল্লুকের কথা

শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার পাল

বেশ অনেক বছর আগের ঘটনা।

আজও মনে পড়ে সেই রাত্রির কথা। সে এক করুণ দৃশ্য অথচ ভয়াবহ পরিস্থিতি। আমরা তিন বন্ধু একদিকে, অন্য দিকে তিন ভাল্লুক।

তাদের একটা মৃত। হ্যাঁ, সদ্য মৃত। আমাদেরই একজনের ভারী রাইফেলের গুলিতে সবে মাত্র তার জীবন শেষ হয়েছে। কি মর্মান্তিক সে দৃশ্য! কি হৃদয়বিদারক তাদের কান্নার রোল! হ্যাঁ, আজও শিকারের বিভিন্ন অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলির কথা চিন্তায় বা আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে, ও ঘটনাকে মনের কোণ থেকে মুছে ফেলতে পারি না। হয়তো মুছে যাবেও না কোনদিন।

বোধহয় সেটা জানুয়ারী মাস। শীত তখন প্রচণ্ড। কলকাতার শহরে যারা শীতটা কাটায়, তারা জঙ্গলের শীতের তীব্রতার পরিমাপ কল্পনাই করতে পারে না।

কোডার্মার এক জঙ্গলে ঘটনা।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে খাওয়া সেরে ঠিক হোল, জীপে চ'ড়ে সারারাত বনপথে শিকারের সন্ধানে ঘোরা হবে। যথা সময়ে, তিন বন্ধু রাইফেল বন্দুক নিয়ে অনিশ্চিত শিকারের সন্ধানে বেরুন হোল। আধ-ঘণ্টাটাক হুড্ খোলা গাড়ীতে ঘোরার পর সমস্ত মুখ এবং হাতের আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে এলো। বন্দুক এবং রাইফেলের নলগুলো পর্যন্ত এতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, যে হাতে ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব। পায়জামা, গরম প্যাণ্ট, গরম গেঞ্জী, সার্ট, পুলওভার, জার্কিন, মাফ্লার এবং ব্যালাক্লাভা পরে প্রায় সর্বাঙ্গ মুড়ে রাখা সত্ত্বেও ঠাণ্ডায় মাঝে মাঝে এতো কাঁপুনি আরম্ভ হোল, যে ঐ ঠাণ্ডা সহ্য করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে পড়ল। তখন আর কি করা, দুটো কম্বল সঙ্গে আনা হয়েছিল, তাই বাধ্য হয়ে ভাগাভাগি ক'রে মুড়ে গায়ে দিলাম আমরা চারজন ড্রাইভার সমেত।

ঘণ্টা দুয়েক ঘোরার মাঝে একটা স্ত্রী-সম্বর হরিণ ও তার বাচ্চা চোখে পড়ল। তবুও শিকার পাওয়ার নেশায় ঘুরছি এবং স্পট্-লাইট সমানভাবে কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে ফেলা হচ্ছে। দূরে কয়েকটা চিত্রল বা **spotted deer** চোখে পড়ল। ওদের মধ্যে একটা বড় শিংওলা ছিল বটে, কিন্তু একশো গজের মধ্যে যাবার আগেই ওরা অরণ্যের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাত প্রায় একটা। ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছে। ঘুমকে যেন আর কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না, এমনি অবস্থা। ঘ্যাঁচ কোরে ব্রেক ক'ষে জীপ থামল। স্পট্-লাইট ডান দিকে ফেলা ছিল। কই, কিছু তো নেই সে দিকে? ড্রাইভার ইঙ্গিতে দেখাল সামনে হেড-লাইটের আলোয় কালো মত কি একটা জানোয়ার প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ দূরে রাস্তার ধারে পিছন কোরে দাঁড়িয়ে

আছে। বুঝতে পারলুম না ওটা কি জানোয়ার। তাই ড্রাইভারকে এগুতে ইশারায় জানালুম এবং হেড লাইট নিভিয়ে স্পট্-লাইট ফেললুম ওর ওপর। প্রায় কুড়ি গজ দূরে এসে গাড়ী থামান হোল। ওদিকে জানোয়ারটা গাড়ীর ইঞ্জিনের শব্দে বা স্পট্-লাইটে এতটুকু বিচলিত হোল না এবং ক্রমাগত সামনের পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে গর্তের মধ্যে মুখ ঢোকাতে লাগল। এতক্ষণে বুঝলাম যে ওটা একটা ভাল্লুক, উঁই ঢিবি এক মনে খুঁড়ে যাচ্ছে এবং পরমানন্দে উঁই খাচ্ছে।

আস্তে একবার শিস দিলাম। ভাল্লুকটার যেন এতক্ষণে চমক ভাঙল। ঘুরে দাঁড়াল আমাদের দিকে এবং কালবিলম্ব না করে কয়েক পা দৌড়ে এসে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। এই রকম অপ্রত্যাশিত আক্রমণ আমরা কল্পনা করতে পারিনি। প্রায় তক্ষ্ণাৎ জীপের সামনে সীটে বসা বন্ধুবর রাইফেল তুলে নিমেষে গুলি করল ভাল্লুকটার বুক লক্ষ্য করে। গুলি খেয়ে ভাল্লুকটার গতি পরিবর্তন হ'ল এবং বিকট আর্তনাদ করে কয়েক গজ দূরে রাস্তার ধারে ধপাস্ করে পড়ে গেল।

ঠিক হ'ল খানিক অপেক্ষা করে ওটাকে গাড়ীতে তুলে নেব। স্পট্-লাইট নিভিয়ে সেইমাত্র হেড-লাইট জ্বেলেছে, এমন সময় কি একটা জানোয়ার সশব্দে জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে আসতে লাগল। খানিক পরেই একটা ভাল্লুক হাঁউ হাঁউ করে উল্টো দিক থেকে এসে পড়ল রাস্তার ওপর, প্রায় যেখানে প্রথমটা মাটি খুঁড়ছিল। আমরাও আসন্ন বিপদের জন্য তৈরী হয়ে রইলুম। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করেই এ ভাল্লুকটা আমাদের দিকে তাকাল এবং এগিয়ে এসে মরা ভাল্লুকটাকে দেখতে পেয়ে ওটার ওপর ঝুঁকে পড়ে শুঁকতে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই কি মনে করে পুনরায় সে রাস্তা পার হয়ে দৌড়ে চলে গেল বনের মধ্যে।

ড্রাইভার কি ভেবে গাড়ী আস্তে আস্তে ব্যাক্ করতে লাগল এবং কয়েক গজ যেতে না যেতেই অদ্ভুত এক নাকি স্বর শুনতে পেলাম আমরা। পর মুহূর্তে এক জোড়া ভাল্লুক হেড্-লাইটের আলোয় রাস্তা পার হয়ে মরা ভাল্লুকটার কাছে গেল। তাদের মধ্যে একটা, সেটা প্রথমটা কি শেষেরটা চিনতে পারিনি, বিকট আর্তনাদ করে উঠল। তারপরই তার করুণ স্বর শুনে বুঝলাম ও কাঁদছে। হয়তো মরা ভাল্লুকটা ওর সন্তান, সাথী বা অন্য কিছু। তৃতীয়টাও একটু-আধটু বিকৃত স্বরে আওয়াজ করছিল। অনেকটা কাতরধ্বনীর মত। ইতিমধ্যে আমরা প্রায় তিরিশ গজের ব্যবধানে বন্দুক রাইফেল হাতে তৈরী হয়ে রয়েছি যে-কোন বিপদের মুকাবিলা করতে।

ওকি! ভাল্লুক দুটো মরা ভাল্লুকটাকে তুলে নিচ্ছে যে। আমি স্পট্-লাইট জ্বালতেই আমার পাশের বন্ধু বন্দুক তুলে গুলি চালাতে গিয়েছিল, তাকে বাধা দিলুম এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। ইতিমধ্যে ভাল্লুক দুটো মরা ভাল্লুকটার রক্তাক্ত দেহকে সামনের দু'পায়ের সাহায্যে তুলে নিয়ে

বনের মধ্যে এগুতে লাগল। আমরা আশ্চর্য হলুম এ দৃশ্য দেখে। জীপ গাড়ীকে তখন আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল এবং অকুস্থলে পৌঁছে ভাল্লুকগুলোর চলে যাওয়ার পথে স্পটের তীব্র আলো ফেলা হ'ল। কিন্তু, কই! কিছুই নজরে এলো না। অনেক খোঁজাখুঁজি বৃথাই হ'ল।

এতো কথা লিখতে যত সময় লাগল, তার অনেক অল্প সময়ে এই অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। ব্যর্থমনোরথ হলেও যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সে রাত্রে আমরা অর্জন করেছিলাম তা খুবই বিরল ঘটনা। বাধ্য হয়ে এবং অযথা শীতে আর কষ্ট না করে বন-বাংলোয় ফেরার পথ ধরলুম। আর পিছনে পড়ে রইল এক চাপ ভাল্লুকের রক্ত এবং সেই দুই নির্ভীক দরদী সঙ্গীর আন্তরিক স্নেহপূর্ণ ব্যাথাতুর হৃদয়-বিদারক দৃশ্য।

খোকনের স্বপ্ন

শ্রীরমা ধর

খোকন ভাবে আরও বড় হোলে
নাবিক হোয়ে অনেক দূরে যাবেই যাবে চলে।
কারোর কথা শুন্‌বে না সে!—
মা যদি যান কেঁদেই ভেসে,
বাবা যদি হেসে বলেন—খোকা:
আজও তুই থাকৃবি হয়ে আগের মত বোকা?
দাদা যদি অঙ্ক ছেড়ে
গাঁট্টা দিতে আসে মাথার 'পরে,
বলবে তবে—
চুপ কর তো সবে।
দেখছো নাকি ঐ যে সাগর দূরে—
ডাক্‌ছে আমায় পাগ্‌লা হাওয়ার সুরে।
ঐ ডাকেতে আজকে আমায় দিতেই হবে সাড়া,
দাও গো বিদায়—মাগো, তুমি মছো আঁখির ধারা।

কাঠবেড়ালের বিদেশ-যাত্রা

॥ শ্রীবিমল দত্ত ॥

বনের মধ্যে থাকতো একটা কাঠবেড়াল।

নরম তুলোর মত গা—গায়ে শ্রীরামচন্দ্রের আঙুলের ছাই ছাই ডোরা ডোরা দাগ—কান দুটো খাড়া, লেজটা ঠিক ৯ কারের মত কিংবা ঐরাবতের শুঁড়ের মত। আর চোখ দুটোতে দুটো কাচের মার্বেল বসানো—চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছে।

চিরি চিরি—চিচি—চিরি চিরি ডাক ছেড়ে একবার সুপুরী গাছে ওঠে আবার সুড়ৎ করে নেমে আসে।

গ্রীষ্মকাল কেটে যেতেই কাঠবেড়াল শুরু করলো বাসা বাঁধতে। বাসায় জমা করলো বাদাম আর কড়াই। শীতকালে বসে তোফা খাবে কিনা!

ঠিক এই সময়ে দলে দলে পাখীরা আসতে লাগ্‌ল বনের মধ্যে। তাদের লেজের আর পালকের কি বাহার! কারু মাথায় ঝুঁটি। তাদের গলায় কত রকমের গানের সুর। একবার যখন তাদের ঐকতান শুরু হতো সমস্ত বনের মধ্যে আনন্দের জোয়ার খেলে যেত।

তারা রাতদিন কি সব বলত আর তর্কাতর্কি করতো। ছাতার, শালিখ, চড়াই এরা

এস্তার বকে চলতো—কোকিল হঠাৎ বলে উঠতো, কুহু কুহু। আর বউ কথা কও চেঁচিয়ে উঠতো, বউ কথা কও, কেউবা চেঁচাতো গৃহস্থের খোকা হোক্।···

কাঠবেড়ালটা এসব শুনতো আর ভাবতো এত চেল্লাচেল্লি করে কেন এরা ?

একদিন সে সব আবিষ্কার করে ফেললে। পাখীরা তাকে ডেকে বললে—"শুন্ছ কাঠবেড়াল গিন্নী, এবার ভীষণ শীত পড়বে। তাতে এত বরফ পড়বে যে পাখী আর ছোটছোট প্রাণীদের রক্ষা থাকবে না। তাই আমরা সব পরামর্শ করছি যে অন্য কোন দেশে উড়ে যাবো।" কাঠবেড়ালীর ছোট্ট মুখখানা কালো হয়ে গেল ভয়ে।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "কিক্ চিকি চিক ? কোন্ দেশে গো ?"

একটা মাথায়-ঝুঁটি বুলবুলি শিস্ দিয়ে দিয়ে গেয়ে উঠল—

সেই দেশে গো সেই দেশে
বসন্ত বিরাজে যেথা
ফুলরাণী বেশে।

শালিখ বলে উঠল—কচিৎ কাট্ কাট্ কাট্, কিম্বা কিচোড়

গাছের পাতা যে দেশেতে
গাছেই থাকে ভরা,
শীতে পাতা যায় না ঝরে
সে দেশ যাবো ত্বরা।

মনুয়ারা বললে—　　কাঁকনি দানা, ঘাসের দানা
মাঠে মাঠে ভরা
সে দেশ যাবো ত্বরা।

কোকিল পঞ্চম সুরে গেয়ে উঠলো—

ফুল যেখানে লাখে লাখে
ফোটে তারার মতো
ফুলের মধু খেয়ে সেথায়
ফুর্তি হবে কতো !

সব পাখী এক সঙ্গে বলে উঠল—

হাওয়ার পরে ছড়িয়ে ডানা
যাবো সবাই কিসের মানা ?

টিয়ারা বললে—নীল পাহাড়ের ওপারে দক্ষিণের দেশ।

বাবুইরা বললে—কোন্ কোন্ পাখী যাবে?

দোয়েলরা বললে—অনেকে ইতিমধ্যেই চলে গেছে। সব্বাই যাবে, সব্বাই—সক্কলে যাবে, সক্কলে।

কাঠবেড়ালীরও সে দেশে যেতে ইচ্ছে হ'ল। সে জিজ্ঞাসা করলে, সে দেশে কত দিনে পৌছনো যাবে?

বাবুই বলে, কত আর সপ্তাহখানেক।

ক্রমশঃ গাছের পাতা ঝরতে লাগ্‌ল টুপ্ টাপ্…

রাত্রে শিশির পড়তে লাগ্‌ল টুপ্ টুপ্…

ক্রমশঃ শীত আসতে লাগল রাত ভরিয়ে। বিরাট বরফের বলের মত।

কাঠবেড়ালী দেখতে লাগল এক এক দল পাখী চলেছে সেই দক্ষিণের দেশে—নীল পাহাড়ের ওধারে।

—দুই—

দেখে দেখে কাঠবেড়ালী মন স্থির করে ফেললে। গরম দেশে তাকে যেতেই হবে। চির বসন্তের দেশ—ঐ ত' নীল পাহাড়ের ওধারে।

সূর্য যেই পূব-আকাশে আলতা বুলিয়ে দিলে আর অমনি কাঠবেড়ালী চললো দক্ষিণ মুখো নীল পাহাড়ের দিকে। চলেছে ত' চলেছে—বেলা দুপুর হ'ল তখনো সে চলেছে। তারপর বেলা গড়িয়ে হ'ল বিকেল, আকাশ থেকে ছায়া নাম্‌ল, সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়লো ক্লান্ত হয়ে। কাঠবেড়াল দেখলো যে এখনও সেই নীল পাহাড় যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। বোকা কাঠবেড়াল ভাবল যে সে রাত্রে ঐ পাহাড়ের চুড়োয় গিয়ে উঠবে। কিন্তু তাই কি পারে? সে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো।

কাঠবেড়ালী রাত্রে ভাবলে, "আমি কি বোকা? পাখীদের ডানা আছে, ওরা উড়ে যেতে পারে। আমি কি হেঁটে অত দূর যেতে পারি? আমার ডানা নেই। আমি কখনো সে দেশে পৌছতে পারবো না।

ভোর হতে না হতেই এক বিরাট পাখী কাঠবেড়ালকে ছোঁ মেরে আকাশে উড়লো। পাখীটা নিশ্চয়ই কাঠবেড়ালটাকে খাবে। ভয়ে কাঠবেড়ালের প্রাণ এতটুকু হয়ে গেল। সে আপনার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলো: কেন সে পাখীদের মতলবে ভুলেছিল? কেন সে পাখীদের মত অন্য দেশে যেতে চেয়েছিল? সুপুরী গাছের ওপর তার ছোট্ট বাসাটার জন্যে তার মন খারাপ হয়ে গেল।

আকাশ অন্ধকার করে বিরাট ডানা মেলে আরেকটা পাখী সেই প্রথম পাখীটাকে তাড়া করলো। তারপর আকাশে তাদের যুদ্ধ শুরু হ'ল। প্রথম পাখীটা কাঠবেড়ালটাকে ছেড়ে দিল তার নখের মধ্যে থেকে।

কাঠবেড়াল বাতাসের মধ্যে দিয়ে শোঁ শোঁ করে নীচে পড়তে লাগলো। সে ভাবলে পাহাড়ের উপর পড়েই বোধ হয় তার হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাবে! কিন্তু সে পড়লো একটা ঝাঁকড়া-মাথা গাছের ডালপালার মধ্যে। অনেকক্ষণ সে ডালের উপর চুপ করে বসে রইল। তারপর গুটিগুটি নেমে এল মাটিতে। নেমে এসে দেখে পাশেই তার সেই চিরকালের চেনা সুপুরীগাছ।

সে আনন্দে চিরিচিরি চিরি করে আওয়াজ করতে করতে উঠে গেল তার বাসায়।

তারপর আপন মনেই বলে উঠল—

"এদেশ-ওদেশ-বিদেশ যারা
ঘোরে ঘুরুক, ভাই!
আমার স্বদেশ, আমার বাসা
এর বেশী না চাই।"

॥ খোকার হাসি ॥

শ্রীসুনীল সরকার

নীল আকাশে বেড়ায় ভেসে
শুভ্র মেঘের দল,
রোদের কণা ছড়ায় সোনা
উজল ধরাতল।

শান্ত শীতল মেঘের দল
জমছে সারি সারি,
এপার হতে ও পারেতে
দিচ্ছে ওরা পাড়ি।

মেঘের ফাঁকে লুকিয়ে থেকে
সুয্যি মামা বলে,
আমার আলো মিলিয়ে গেলো
খোকার হাসির তলে।

সর্দি-কাশি

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

শীত পড়ল আর শুরু হ'ল সর্দি-কাশি। হেঁইচ্চো হেঁইচ্চো, খক্ খক্।

আমাদের সকলেরই ঠাণ্ডা লাগে, সর্দি-কাশি হয়। হঠাৎ শরীর ম্যাজ ম্যাজ করা, নাক দিয়ে অনবরত জল পড়া, জ্বর জ্বর ভাব। কিন্তু এটা সব সময়ে সীরিয়স হয়ে দাঁড়ায় না, সাধারণতঃ দু'চার দিনের মধ্যেই ওটা সেরে যায়। তবে কেউ বা বেশ অসুস্থও হয়ে পড়ে।

আর কেবল যে একবারই ঠাণ্ডা লাগে তা নয়? কেউ কেউ ত' বছরে ৭।৮ বার সর্দিতে ভুগে থাকে।

এবং সর্দি যত সামান্যই হোক কাজকর্মের পক্ষে বড় ক্ষতিকর। পড়াশোনা, স্কুল-কলেজ, অফিস-কারখানায় যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। যেমন কাজের ক্ষতি, তেমনি টাকা-পয়সার দিক দিয়ে।

আচ্ছা, ডাক্তাররা ত' কত কঠিন কঠিন রোগ সারাতে পারে অথবা যাতে আদৌ রোগ না হয় সেই ব্যবস্থাও করতে পারে। কিন্তু এই সাধারণ সর্দি বা ঠাণ্ডা লাগা রোগটা তারা সহজে সারাতে পারে না কেন? কিংবা যাতে কখনো ঠাণ্ডা না লাগে সেই ব্যবস্থাটাই বা করতে পারছে না কেন?

আসল কথা কি জানো? সাধারণ সর্দি বা ঠাণ্ডা লাগার মূলে আছে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ, যাকে বলা হয় ভাইরাস। এই ভাইরাস এত সূক্ষ্ম, এত ক্ষুদ্র যে এক বিশেষ ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তা দেখাই যায় না।

সর্দি রোগের ভাইরাস আবার নানান জাতের। মুস্কিল সেখানে। এই রোগ দূর করা সহজ হচ্ছে না। ওদিকে অনেক কঠিন কঠিন রোগের ভাইরাস মাত্র একটা, তাই তার প্রতিষেধক ঔষধ বের করা সহজ হয়েছে।

আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই বাতাসে সাধারণ সর্দির ভাইরাস ছড়ায়। ফলে, রোগটাও ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্য করে দেখবে, হাঁচি-কাশির সঙ্গে কত সূক্ষ্ম জলকণা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সকলেরই উচিত হাঁচি-কাশি দেবার সময়ে রুমাল ব্যবহার করা কিংবা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

সাধারণতঃ আমরা মনে করি শীত বা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সর্দি-কাশি বেশি হয়ে থাকে। আবার অনেকের ধারণা জল-বৃষ্টিতে ভেজা কিংবা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগানো সর্দি রোগের কারণ।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু তা মনে করেন না। তাঁরা দুই দল লোকের শরীরে সর্দির জীবাণু ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন—এক দলকে ভেজা জামা-কাপড় পরতে দিয়েছেন, অন্য দলকে শুকনো জামা-কাপড়—দেখা গেল শেষোক্ত দলই বেশি ভুগল ঠাণ্ডায়। আশ্চর্য নয় কি?

ঠাণ্ডা লাগার একটা প্রধান কারণ সম্ভবতঃ আবহাওয়ার পরিবর্তন।

এই রোগে পেনিসিলিন জাতীয় বিস্ময়কর ঔষধ করা হয় না। কেননা, ওটা ব্যাকটেরিয়া নাশক; আর ঠাণ্ডা লাগার হেতু হ'ল ভাইরাস। যাই হোক, মাথা খাটিয়ে অন্য উপায় বের করতে হবে বিজ্ঞানীদের।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ রোগীর দেহ থেকে ভাইরাস নিয়ে সুস্থ লোকের নাকের কাছে ধরলেই তারও ঠাণ্ডা লেগে যায়।

কিন্তু আশ্চর্য, সর্দি রোগের ঐ ভাইরাসগুলো রোদের তাপে মরে যায়।

রোগীর ব্যবহৃত রুমাল রোদে শুকিয়ে যে কোন সুস্থ লোক অনায়াসে সেটা ব্যবহার করতে পারে, তার কিচ্ছু হবে না।

ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরা ঠাণ্ডা লাগার প্রতিষেধক ঔষধ বের করার জন্যে ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করছেন। যেমন, বিলতের কোল্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁদের একটু অসুবিধা ঘটছে। ল্যাবরেটরিতে সাধারণতঃ ইঁদুর বা গিনিপিগের উপর গবেষণা চালান হয়ে থাকে। কিন্তু মুস্কিল যে, ঐ জীবগুলোর ত' ঠাণ্ডা লাগে না, সর্দিও হয় না? তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে মানুষের উপরে, যারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছে। অবশ্য শিম্পাঞ্জীর উপরেও গবেষণা চালান যেতে পারে, কিন্তু তাতে অনেক খরচ।

টিকা নিয়ে কোন কোন রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ইনজেকসনেও ফল হয়। যেমন বসন্ত, কলেরা, ডিপথেরীয় ইত্যাদি। এই ধরণের একটা ব্যবস্থাই করতে হবে বিজ্ঞানীদের। বসন্তের টিকা কিংবা ডিপথোরীয়া, হুপিং কফের ইনজেকসনের মতো ঠাণ্ডা লাগা বারক একটা ইনজেকসন আবিষ্কার করা প্রয়োজন।

তোমার যদি একবার হাম হয়ে থাকে, তবে ঐ রোগ আর কখনো তোমার না হওয়ারই সম্ভাবনা। তার কারণ, একবার হয়ে যাওয়াতে তোমার শরীরে ঐ রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জন্মেছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঠাণ্ডা লাগার কারণ যেমন নানাবিধ, তেমনি ভাইরাসও হয় নানা জাতের। এক ধরণের ঠাণ্ডা হয়ত তুমি এড়িয়ে যেতে পার, কিন্তু আর এক ধরণের ভাইরাস তোমাকে কাবু করে ফেলবে।

বাস্তবিক, ব্যাপারটা একটু জটিল। তবে, চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্রমশঃ এত উন্নতি হচ্ছে যে, আশা করা যায়, শীঘ্রই এমন একটা ওষুধ বা টিকার আবিষ্কার হবে, যার দৌলতে ঠাণ্ডা লাগা রোগটা বেমালুম লোপ পেয়ে যাবে।

যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন বরং সুকুমার রায়ের বাৎলানো ওষুধটা তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারো—

"চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পার
শুঁকলে পরে সর্দি-কাশি থাকবে না আর কারো।"

বঙ্কা

শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

নগেন নগেন ডাক,
হেঁকে যায় বঙ্কা
পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে
জাগে যেন শঙ্কা।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠে-নামে
এ-বাড়ি সে-বাড়ি থামে
ভয়েতে দেয়াল ঘামে
হাঁক দিলে বঙ্কা,
শিশুরা ধড়াস-বুকে
ভাবে কি আশঙ্কা!

হুদ্‌দাড় হুম হুম
আওয়াজের খুব ধুম
চোখে ভাব ঘুম ঘুম
বঙ্কা যে পালোয়ান,
পরে চোগা-চাপকান
ইস্ত্রিতে টান টান,
ঘরে কাঁপে বিবিজান
হাতে লাঠি আলিজান;

দৌড়য় ছোটে হাঁটে
হন্ হন্ গট্‌গট্,
জান্‌লায় জান্‌লায়
টোকা মারে খট খট,
উঁকি-ঝুঁকি মুখ মেলে
কপাটের ফাটটা
হাঁকে, শিশু ঘুমিয়েছ,
রাত ঠিক আট-টা।

মড়াও পালায়

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

হঠাৎ সেদিন তারিণীদার সঙ্গে ফের দেখা হয়ে গেল। ক' বছর আগে অবশ্য তারিণীশংকরের সংগে ঘন ঘন দেখা হতো, তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাক্যসুধা পান করতাম, পৃথিবীতে কত অসম্ভব, আপাত-অবাস্তব ব্যাপার যে ঘটছে—তার খবর পেতাম।

সরকারী কলেজে মাষ্টারি করি বলে বাংলাদেশের নানা জায়গায় বদলি হয়ে ফের কোলকাতায় এসেছি—তা প্রায় পাঁচ বছর পরে। এর মধ্যে তারিণীদার সঙ্গে দেখা হয়নি, এমন কি তাঁর কথা একটি বারের জন্যে মনেও পড়েনি। অথচ এই তারিণীদাই আমাদের বলতে গেলে জগৎকে চিনিয়েছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছেন। অন্ততঃ তাঁর পৃথিবী-পরিক্রমাপ্রসঙ্গে তিনি যেসব আজগুবি বিষয় এবং ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, সেসব জমকালো কাহিনী শুনে খুসী হয়েছি।

সেই তারিণীদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা—এবং এতদিন পরে। টানতে টানতে তিনি নিয়ে গেলেন আমাদের সেই পুরানো আড্ডাস্থলে !

সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠলো। তারা নাকি ঠিক সেই সময় তারিণীদার নাম করছিল।

তারিণীদা জিজ্ঞাসা করলেন—কেন ? হঠাৎ আমাকে স্মরণ কেন ?

বহুদিন আপনার দেখা নেই, ভাবলাম কোথাও কিছু একটা করছেন, সেই গল্প শোনবার প্রত্যাশায় রোজই আপনার নাম একবার করে ক্লাবঘরে ওঠে।—বংকিম বললে।

অরিন্দম জানাল—ঠিক তা নয়, আজকের কাগজে বেরিয়েছে না, উত্তর দমদমে নিকুঞ্জ চৌধুরীর বাগানে মরা মানুষের কি একটা রহস্য—সেই প্রসঙ্গে আপনার কথা উঠলো।

মানে আপনি থাকলে নিশ্চয়ই এর একটা সুরাহা করতেন, কিংবা এরকম অন্য কোন ঘটনার নজির দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাতে পারতেন।—শম্ভু ফুট কাটলে।

ব্যাপারটা কি খুলেই বল না—তারিণীদা জানতে চাইলেন।

অরিন্দম বললে—কাগজে লিখছে যে, দমদমের চৌধুরী বাগানে মরা মানুষ খাট ছেড়ে কোথায় সরে পড়েছে। শবদাহ করার জন্যে একদল লোক একটা মড়া নিয়ে যাচ্ছিল। চৌধুরী বাগানের তেঁতুল গাছটার কাছে নাকি মড়া একবার নামাতে হয়। এরাও মড়াসুদ্ধ খাটটা নামিয়ে একটু বিশ্রাম করছিল, এই ফাঁকে সকলের চোখ এড়িয়ে মড়া উধাও !

তারিণীদা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন—ও রকম হয়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

বোকার মত বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে অরিন্দম জিজ্ঞাসা করলে—আশ্চর্যের কিছু নেই, মানে ?

মড়া পাওয়া যায় না কিংবা মড়া পালাচ্ছে—এ ত' আজকাল সভ্য জগতে আখ্‌ছার হচ্ছে। আমাদের ভারতবর্ষে ব্যাপারটা সবে ঘটতে সুরু করেছে কিনা, তাই তোমাদের কেমন যেন রহস্যময় ঠেকছে !—নির্বিকার কণ্ঠে তারিণীদা জবাব দিলেন।

শম্ভু বললে—আপনি বিশ্বাস করেন—মড়া পালায় ?

বিশ্বাস করি মানে ? দৃঢ়ভাবে তারিণীদা পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

না, মানে—শম্ভু আমতা-আমতা করতে লাগলো, নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারলো না।

অরিন্দম বললে—দাদা, খোলসা করে বলুন, আমাদের আর দ্বিধায় রাখবেন না। মড়া পালানোর ব্যাপার কি ?

তারিণীদা বলতে সুরু করলেন—তোমাদের এ ব্যাপারটা কি—তা আমি জানি না, তবে অন্য দু' একটি ক্ষেত্রে মড়া পালানোর ব্যাপারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে।

কি রকম, কি রকম ? বলে ক্লাবঘরে প্রায় সোরগোল পড়ে গেল।

তারিণীদা বললেন—চুপ করে বসো। আমি তোমাদের কাছে আমার জীবনের একটি কাহিনী বলি শোন।

তারিণীদার জীবনে ঘটা এমন বহু কাহিনীই আমরা শুনেছি। কেউ সেগুলি বিশ্বাস করে, কেউ ভাবে গুল। কিন্তু শুনতে বেশ লাগে। আমরা সবাই চুপ করে বসলাম।

তারিণীদা সুরু করলেন ঃ

বেশীদিনকার কথা নয়, বছর দশ-বারো আগে—যখন আমি মেট্টুপালায়ামে ছিলাম, ঘটনাটা ঘটে তখন। মেট্টুপালায়াম কোথায় তা বুঝি জানো না? মাদ্রাজ আর কেরল রাজ্যের ধারে, নীলগিরি পাহাড়ে চাপবার একদিককার পথ যে গ্রাম থেকে সুরু হয়েছে—সেই গ্রাম হলো মেট্টুপালায়াম, তার ওপর উটকামণ্ড যেতে গেলে ওখান থেকে ছোট রেল। উটকামণ্ডের পথে ওই ছোট রেলে চড়ে ঘণ্টা দুয়েক গেলে জন্স্ ডেল (John's dale) বলে একটা স্টেশন পাওয়া যাবে, ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম, সেই স্টেশনে নেমে এক মাইলটাক গেলে 'নাগধারা' হ্রদ আছে—যেখান থেকে 'পাণ্ডুবরী' নদী বের হয়েছে। সেখানে বিরাট ধূর্জটি মন্দির। মাদ্রাজীদের মহান্ তীর্থক্ষেত্র, হিন্দু-জাতির কৈলাস মানসসরোবরের মতই বিখ্যাত। মাদ্রাজীদের তীরুপতি ও পাণ্ডুবরী তীর্থ না ঘুরলে জীবন সার্থক হয় না, পুনর্জন্ম এড়াতে পারে না।

বাংলাদেশের তারাপীঠ কিংবা বক্রেশ্বরের মতো পাণ্ডুবরী নদীর উৎস মুখে নাগধারা হ্রদের পাশে ধূর্জটি মন্দিরের সামনের চত্বরে এক বিরাট শ্মশান। সেই শ্মশান খুব বিখ্যাত ; দক্ষিণ ভারতের যে কোন জায়গায় যদি মানুষ মরে—তবে তার আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছা হয় তাকে নাগধারা শ্মশানে সৎকার করে।

বুঝতেই পারছো—মড়া নিয়ে গল্প, তাই শ্মশানের কথা এসে পড়ছে, এবং এই শ্মশানটা যে কি ভীষণ বিখ্যাত আর মাহাত্মাপূর্ণ তা যে কোন দাক্ষিণাত্যবাসীকে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝবে।

মেট্টুপালায়ামে আমি এক বুড়োর বাড়ীতে সামনের একটা ঘর নিয়ে ভাড়া থাকতাম। বুড়ো খুব ধনী ছিল ; জন্স ডেল স্টেশনের পাশে যে বড় রেষ্টুরেণ্টটা আছে—সেটা ওরই ছোট ভায়রাভায়ের। তারা মাঝে-সাঝে এসে বুড়োকে দেখাশুনো করতো। পাহাড়ের অত ওপরে বাস করলে বুড়োর শরীর টেঁকে না বলে সে মেট্টুপালায়ামে থাকতো।

বুড়োর অগাধ পয়সা থাকলে কি হবে,—সে সাত কিপ্টের এক কিপ্টে। সকালে দুটো ঢোসা আর রাত্রে দুটো সাদা ওয়াড়া (বড়া) খেয়ে দিন কাটাতো।

রোববার বা ছুটির দিন হলে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আমার সঙ্গে এসে আলাপ জমাতো। ইদানীং বুড়োর কেমন ধারা মতিভ্রম ঘটেছিল, রাতদিনই সে বলতো—ইফ্ আই ডাই, বার্ণ মি ইন্

নাগ্‌ডারা। যদি আমি মারা যাই, আমাকে নাগধারা শ্মশানে পুড়িয়ো। জন্স ডেলের ছোট ভায়রাকেও সে এই রকম অনুরোধ করতো।

প্রথম প্রথম মনে করতুম বুড়োর নির্ঘাত ভীমরতি ধরেছে। কিন্তু ক্রমেই তার পাগলামি বেড়ে গেল। সে উকিল আর রেজিষ্টারকে মোটা ফী দিয়ে ডাকিয়ে এনে উইল পর্যন্ত করে গেল—তার সমস্ত সম্পত্তি পাবে সেই লোক, যে তাকে তার মৃত্যুর পর নাগধারা শ্মশানে পোড়ানোর ব্যবস্থা করবে।

আশ্চর্য ধরণের উইল। এমন কি সেই উইলে আমার নামও লেখা হয়েছিল, আমি যদি এই ব্যবস্থা করি—আমিও স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি পাবো। আমি বিদেশী, আমি ওর কাছে থাকি—স্থতরাং ওর প্রথম অনুরোধটা আমার প্রতি—সে নির্দেশও বুড়ো রেজিষ্টারের কাছে করে গেল।

এর পর, ওর ছোট ভায়রা যখন এল ওকে দেখতে—আমি ব্যাপারটা খুলে বললাম। ছোট ভায়রা নাগধারা শ্মশানের মাহাত্ম্য এবং ঐ শ্মশানের চিতায় তাদের বংশের সকলে শুয়েছে—সেই কাহিনী বর্ণনা করে আমার সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্যে গুডলাক জানিয়ে চলে গেল। বলে গেল, বুড়ো আর বেশী দিন নেই।

সত্যি, এরপর বুড়ো আর বেশী দিন ছিল না।

তখন শীতকাল, আর মেট্টুপালায়ামে শীতও পড়ে বটে! তাছাড়া নিশ্চয়ই জানো যে মাদ্রাজে তুটো মনস্থন, ফিরতি বর্ষাটা হয় ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে। এক বর্ষণ মুখর শীতের রাত্রে—বুড়ো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। সন্ধ্যে থেকেই বুড়োর শরীরটা খারাপ ছিল, আমাকে কাছে ডেকে ভাঙা ইংরেজীতে জন্স ডেলে তার মৃতদেহ পৌঁছে দেবার শেষ প্রার্থনা জানালে—নাগধারা শ্মশানে যেন তার সৎকার হয়—অনুরোধ করলে।

রাত্রি তখনো শেষ হয়নি, বুড়ো এই জগতের মায়া কাটালে। আমি এখন কি করি? লোকজন ডেকে বুড়োকে যদি নাগধারা শ্মশানে সৎকারের জন্যে ব্যবস্থা করি—তা হলে গোটা তুয়েক দিন কেটে যাবে, কারণ এখানে কোনো লরীর ব্যবস্থা নেই, অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে সালেমে গিয়ে আমাকে সব ব্যবস্থা করতে হবে।

তাছাড়া নীরোগ অবস্থায় বার্ধক্যের অবসানে বুড়োর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে—তারই বা প্রমাণ কি! বুড়ো উকিলকে ডেকে উইল করিয়েছে বটে, কিন্তু কখনো কোনো ডাক্তারকে ডেকে ওষুধ খায়নি। এক্ষেত্রে আমি যদি লোকজন ডাকতে যাই, খুনের দায়ে না ফেঁসে যাই—আর আমার পক্ষে যখন উইলে ওর সম্পত্তি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাত-পাঁচ ভেবে অবশেষে আমি ঠিক করলাম—সকালের ট্রেনে বুড়োকে নিয়ে আমি জন্স ডেলে যাবো,—সেখান থেকে ওর ছোট ভায়রাকে সঙ্গে নিয়ে নাগধারা শ্মশানে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো।

একে শীতকাল, তার ওপর গতরাতে ছিল মুষলধারে বৃষ্টি ; ঝড়েরও কি উন্মত্ত দাপাদাপি গেছে, বঙ্গোপসাগরে বোধহয় বায়ুর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে, নইলে এ রকম সাইক্লোনিক আবহাওয়া হবে কেন ?

গরমকালে কি পুজোর সময় উটকামণ্ডে দুটো করে ট্রেন যাওয়া-আসা করে, কিন্তু শীতকালে মাত্র একটি গাড়ী ; অতি প্রত্যুষে মেট্টুপালায়াম থেকে যায়, আর সন্ধ্যেবেলা সেটাই ফিরে আসে। বুড়োকে বেশ করে গরমের স্যুট্ পরিয়ে, মাফলারে মুখ মাথা ঢেকে, শুধু চোখ দুটো বের করে কোলে করে নিয়ে পথে বেরিয়ে সাইকেল রিক্সায় গেলাম মেট্টুপালায়াম স্টেশনে। উটকামণ্ড যাবার গাড়ী তৈরী রয়েছে, কিন্তু লোকজন নেই, একে এ সময় বেশী লোক হয় না, তার ওপর শীতের এই দুর্যোগ ! গোটা ট্রেনটা ভীষণ রকম ফাঁকা। আমি দেখে-শুনে একটা খালি কম্পার্টমেণ্টে উঠে বসলাম, কোলে করে বুড়োকে সেখানে তুলে এনে জানলার ধারে কোণ দেখে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলাম। শুধু দুটো চোখ ছাড়া সর্বাঙ্গ গরম কাপড়ে যথাসম্ভব ঢেকে দিলাম, আর বেঞ্চের এপাশে একটা ছোট কাপড়ের পুঁটুলি এবং সুটকেশ দিয়ে এমন করে দিলাম যাতে গাড়ীর হ্যাঁচ্‌কাটানে মড়া না পড়ে যায় !

সব ব্যবস্থা করে দৌড়ে জন্স ডেলের দুটো টিকিট কেটে গাড়ীতে বসতে না বসতেই গাড়ী দিলে ছেড়ে। তোমরা যারা ও লাইনে গেছ—নিশ্চয়ই দেখেছো—পথের দু'ধারে কি অপরূপ সৌন্দর্য। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ছোট বেঁটে একটা সাপের মতো ঘুরে ঘুরে ট্রেনটা ওপরে উঠছে ! জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, মেঘে ভার হয়ে রয়েছে আকাশ, কেমন যেন থমথমে ভাব, এক্ষুণি হয়তো বৃষ্টি নামতে পারে ! আর কি ঠাণ্ডা, ভেতরের হাড় পর্যন্ত হিম হয়ে যায়।

আমি বুড়োর দিকে তাকালাম,—মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে আছে, ট্রেনের ঝাঁকানিতে তার মাথাটা নড়ছে। একা এভাবে এই মড়া নিয়ে ট্রেনে যাওয়া জীবনে আমার এই প্রথম ! আমাদের কম্পার্টমেণ্টে আর কেউ নেই—এই যা বাঁচোয়া।

উটকামণ্ডে আজকাল ধনীরাই বেড়াতে যায় বলে, রেল কোম্পানী ওখানকার ওই ছোট ট্রেনটি বেশ বিলাসী ধরণের ধিকি ধিকি চলে বটে, কিন্তু সঙ্গে থাকে রেষ্টুরেন্ট-কার ; আবার করিডরওয়ালা গাড়ী, এক কম্পার্টমেণ্ট থেকে অন্য কম্পার্টমেণ্টে যাওয়া যায়—অবশ্য রেষ্টুরেন্ট-কারে যাবার জন্যেই এই ব্যবস্থা !

পাণ্ডুভরম্ স্টেশনে এসে গাড়ী থামলো। এই স্টেশন থেকে বেশ কিছু লোক ওঠে, কেননা এখান থেকে বহুদূরে যাওয়ার মোটরের রাস্তাগুলি সুরু হয়েছে। আমি আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করলাম আমাদের এখানে কেউ ওঠে কিনা। স্টেশনে ভিড়ই নেই, ইতস্তত: দু' একজন এখানে-সেখানে উঠে পড়লো—ঠিক গাড়ী ছাড়ার সময় আমাদের কম্পার্টমেণ্টে এসে উঠলো একটি যুবক। বেশ শক্তসমর্থ, গরমের স্যুট্ পরা, হাতে একখানা ডিটেকটিভ মাসিক—কভারের ওপর নিহত এক ব্যক্তির ছবি।

যুবকটি উঠে সোজা বুড়োর ঠিক সামনা-সামনি বেঞ্চে বসে পড়লো। একবার আমার দিকে, আর একবার বুড়োর দিকে তাকিয়ে ডিটেকটিভ মাসিক পত্র পড়তে লাগলো। যুবকটির চোখ দুটি ঈষৎ রাঙা, এই সকালেই মদ গিলেছে।

আমার কি রকম যেন অস্বস্তি হতে লাগলো!

গাড়ীটা ক্রমেই চড়াই-এ উঠছিল, যতটা জোরে চলছিল—তারচেয়ে ঢের বেশী শব্দ হচ্ছিল। পাহাড়ে ওঠার সময়ে ইঞ্জিনের ঘজ ঘজ ঘজ ঘজ শব্দ আমার খুবই ভালো লাগে, কিন্তু আজ ইঞ্জিনের এই আওয়াজও কেমন বিস্বাদ ঠেকতে লাগলো!

যুবকটি আর একবার আমার দিকে এবং তারপরে বুড়োর দিকে তাকালো। তারপর হঠাৎ সে বুড়োর দিকে আবার তাকিয়ে বলে উঠলো—গুড মর্ণিং। কণ্ঠস্বরেও একটু যেন মাতলামির টান রয়েছে, তবে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

বুড়ো নীরব। আমাকে বলা হয়েছে ভেবে আমি জবাব দিলাম—গুড মর্ণিং।

যুবকটি আমার দিকে চেয়ে বললে—কি সাংঘাতিক শীত পড়েছে!

আমি বললাম—সাংঘাতিক!

আচ্ছা বলুন ত', এই শীতে বক্সিং কি জমে? আমাকে সিংহল যেতে হচ্ছে বক্সিং লড়তে, ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করতে?

আপনি বক্সার?

মানে? আমি ইয়োরোপেও চাম্পিয়নশীপ লাভ করেছি—কাগজে ছবি দেখেন নি আমার?

ইংরেজীতেই আলাপ হচ্ছিল, বুঝলাম যুবকটি বক্সার, পৃথিবী জোড়া নামের লোভে সে এদেশ-সেদেশ বক্সিং লড়ে বেড়াচ্ছে!

যুবকটি যখন আছে—তখন এই ফাঁকে একবার রেষ্টুরেণ্ট-কারে গিয়ে চা খেয়ে আসি। সকাল থেকে পেটে এক চামচও গরম জল পড়েনি! যেই ভাবা—তক্ষুণি উঠে গেলাম করিডর দিয়ে। বাইরে অরণ্য, বৃষ্টিতে গাছের পাতার ধূলো ধুয়ে গেছে—ঝকঝকে সবুজ গাছপালা, কালো মেঘে ঢাকা আকাশ, বিসর্পিল আঁকা-বাঁকা রেলের পথ—ক্রমেই উঁচুতে উঠে গেছে!

রেষ্টুরেণ্ট-কারে এসে দেখি—সবে কেটলি চাপানো হয়েছে স্টোভে। খদ্দেরের ভিড় নেই, তাই তাগাদাও নেই; দেরি হবে ভেবে আমি চলে আসছিলাম, কিন্তু জোর অনুরোধ করে আমাকে সেখানে বসালে। চা খেয়েই যান—যাবেন ত' জঙ্গল ডেলে—দু'ঘণ্টার পথ।

ইতিমধ্যে আডিভিভরম্ স্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়ালো। দু'চারজন যে ওঠা-নামা না করলো—তা নয়, বেশ বেলা হয়েছে, সাড়ে ছটা-সাতটা হবে। শীতে হি হি করে কাঁপছে সবাই! আর

একটা ছোট স্টেশনে গাড়ী আসার আগেই আমি ফিরে এলাম আমার কম্পার্টমেণ্টে; এসে যা দেখলাম—তাতে আমার বুক শুকিয়ে গেল!

ডিটেকটিভ মাসিক পত্রিকাটায় মুখ গুঁজে সেই বক্সার যুবকটি ঠিক বসে আছে, কিন্তু বুড়ো নেই! যে সীটে বুড়োকে বসিয়ে রেখেছিলাম,—সেখানে সে নেই! আশ্চর্য!

বুক শুকিয়ে গেল বটে, কিন্তু মুখ শুকোলে ত' চলবে না! আমি একটু বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যালো মিষ্টার, ওই কোণে বসে, আমাদের সঙ্গে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন না?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওই কোণে ছিলেন—তাই না? তিনি কি আপনার কেউ হন নাকি?—বেশ পরিষ্কার ভাবেই যুবকটি কথা বললে; আগে যেমন তার কণ্ঠে মাতলামির ছোঁয়া ছিল, এখন বেশ পরিষ্কার কণ্ঠেই সে কথা বললে। নেশা তার কেটে গেছে।

না, আমার কোনো আত্মীয় নয়—মানে, দেখতে পাচ্ছিনা কিনা—

যুবকটি বললে—সিংহলে যাবার জন্যে কাল বেরিয়েছি উটি মানে উটকামণ্ড থেকে, পাণ্ডুভরম্ স্টেশনে এসে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে আমার স্যুটকেশটা ফেলে এসেছি উটিতে, তাই ফের চলেছি আবার। বক্সিং লড়বার সমস্ত সরঞ্জাম তাতে আছে।

আমার মনের অবস্থা তখন যে কি রকম—তা ভাষায় বলা যায় না। বক্সিং চাম্পিয়নের ফিরিস্তি শুনতে কি ইচ্ছা করে? আমি আবার বুড়োর কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

যুবকটি বললে—বুড়ো? ওই কোণে হেলান দিয়ে বসা সেই বুড়ো? আডিভিভরম্ স্টেশনে নেমে গেলেন। এখানে এই আডিভিভরমেও একজন বিখ্যাত বক্সার থাকে—একবার বাঙ্গালোরে হেভিওয়েটে চাম্পিয়নশিপ গেম হয়! শুনেছি এখানকার কোন্ এক স্কুলে ছেলেদের বক্সিং শেখায়। আজকাল তবু আমাদের ছেলেরা বক্সিং শিখছে—আগে ত' বক্সিং শেখার কোনো ছাত্র মিলতো না। বক্সিং-এর প্রথম কথা কি জানেন—সাহস, যদি মনে-প্রাণে অফুরন্ত সাহস না থাকে, তবে এ লাইনে এসে কোনো লাভ নেই!

বুড়ো লোকটি নামবার সময় কিছু বলে গেলেন নাকি?

কি আবার বলবেন? ও-হ্যাঁ, বললেন—তোমাদের গুড্ লাক্ কামনা করি, তোমার এবং তোমার যে বন্ধু চা খেতে গেল—তার, অর্থাৎ আপনার; সৌভাগ্য কামনা করে তিনি নেমে গেলেন।

নেমে গেলেন? আমায় যেন মাথাটা ঘুরে গেল, তাজ্জব বনে গেলাম। বুড়ো নেমে গেল! মড়া নেমে গেল! মরা মানুষ ট্রেন থেকে জলজ্যান্ত লোকের মতো নেমে গেল!

যুবকটি জিজ্ঞাসা করলে—কি ভাবছেন?

ঐ বুড়োর কথা! কেমন যেন মড়ার মতো যাচ্ছিল আমাদের সঙ্গে—

মড়ার মতো? কি বলছেন আপনি? যুবকটি একটু উত্তেজনার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে।

আমারও ত' তাই মনে হয়েছিল। ট্রেনে উঠে আমি ওর সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করেছিলাম —কিন্তু পারেনি, চুপ করে ওই কোণায় বসেছিল। ভেবেছিলাম, ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আছে—কথা আর বলবে কি?

এক্‌জ্যাক্টলি সো—ঠিক তাই, আমিও তাই ভেবেছিলাম। যুবকটি বলে ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে একবার তাকালে।

এই পর্যন্ত বলে তারিণীদা থামলেন, চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন—আজ চলি।

চলি মানে? তারপর কি হলো বলুন।

তারপর আর কি, মড়া পালানোর কথা শুনতে চেয়েছিলে না—তাই আমার এক-টুকরো' অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের শোনালুম।

শম্ভু বললে—সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

আমি বললাম—তা হোক, কিন্তু শুনতে বেশ।

তারিণীদা বললেন—বিশ্বাস্য করে নাও না কেন—আর একটুখানি জুড়ে।

কি রকম?

তারিণীদা ফের সুরু করলেন—আমি প্রথমে ভাবলুম—বুড়ো হয়তো মরেনি, শীতের গুঁতোয় প্রায়-মরা হয়েছিল। আমিই ভুল করেছিলুম। কিন্তু বর্মার যুবকটি শেষকালে যে কথা বললে— তাতে আমার বিস্ময় আরো বাড়লো।

কি বললে, কি বললে—করে আমরা সবাই তারিণীদাকে চেপে ধরলাম।

কথায় কথায় বেরিয়ে গেল বর্মার যুবকটা ভীষণ রাগী। বর্মার মাত্রেই নাকি অল্পবিস্তর বদ্‌রাগী হয়। আমি যখন চা খেতে রেষ্টুরেণ্ট-কারে গিয়েছিলাম—তখন যুবকটি বুড়োর সঙ্গে গল্প জমাবার জন্যে দু'চারটে প্রশ্ন করলো, কিন্তু বুড়ো তার কোনো জবাব দেয়নি। যুবকটা গেল রেগে;—ভীষণ রেগে সে উঠে গিয়ে বুড়োকে বিরাশি সিক্কার একটা ঘুষি মারতেই বুড়ো গেল ঘুরে পড়ে। যুবকটি তখন তাকে তুলতে গিয়ে দেখে যে ঘুষি খেয়ে বুড়োটা গেছে মরে। তখন "মোদকয়ম্‌" নদের পোলের ওপর দিয়ে ট্রেনটা যাচ্ছিল; যুবক তখন বুড়োকে জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলে। আর নিজের দোষ ঢাকতে আমার কাছে বানিয়ে দুটো মিথ্যে কথা বলে দিলে!—এখন বিশ্বাস হলো ত'?— বলে তারিণীদা উঠে বেরিয়ে গেলেন।

হাবুলের সমাজ সেবা

শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়

হাবুল বলল, বুঝলি কেবু, বাঙালী জাতটার যে কিস্‌সু হচ্ছে না, তার কারণ কি জানিস?

আমি বললাম: না তো?

হাবুল বলল: তা তো জানবিই না। জাতীয় সমস্যার কথা ভাববি কেন? তোরা সব নিজেদের নিয়েই আছিস। দেশের কথা একবারও ভাবছিস না। তুই একা কেন, আমরা সবাই নিজেদের কথা ভাবছি। জাতটার যে উন্নতি হচ্ছে না স্রেফ এই স্বার্থপরতার জন্য। নইলে দেখ, এই যে টিফিন পিরিয়ডে লুকিয়ে লুকিয়ে তুই একা একা আলুকাবলি খাচ্ছিস, আমাকে দিচ্ছিস নে, এটা কি স্বার্থপরতা নয়?

আমি কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম: সত্যি বলছি হাবুল, আমার কাছে আর পয়সা নেই। আর এই আলুকাবলিটা খেতে এত বিচ্ছিরি না!

হাবুল বলল: যেটুকু আছে ওটুকুই দে কেবু। সত্যি এই বিচ্ছিরি জিনিসটা তুই একা একা খাবি আর আমি তোর বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব?

এই বলে হাবুল আমাকে কোন কথা বলার অবসর না দিয়ে আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে শালপাতার ঠোঙাটা কেড়ে নিয়ে চেটেপুটে সব খেয়ে নিল।

আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। হাবুল কনুই দিয়ে মুখটা মুছে বলল: আঃ, বেড়ে করেছে মাইরি! হ্যাঁ, তবে যা বলছিলাম। বুঝলি কেবু, মানুষের উপকার—যাকে বলে সমাজ সেবা, তা না করলে আমাদের মনুষ্যজন্মের কোন মানে হয় না। দেখ না, কবিগুরু বলেছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

আমি বললাম: এটা কবিগুরুর কথা নয় হাবুল, এটা হ'ল স্বামী বিবেকানন্দের কথা।

হাবুল বলল: আঃ, তুই বড় কথায় কথায় খুঁত ধরিস কেবু। আরে মহাপুরুষেরা সবাই এক। ওঁদের মধ্যে কি আর আমাদের মত এত ভেদজ্ঞান আছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম শোন। আজ থেকে আমি আর তুই সমাজ সেবার ব্রত নেব। মানে মানুষের উপকার করব।

বললাম: কি করে উপকার করব? আমাদের তো আর টাকা নেই।

হাবুল বলল: টাকার দরকার নেই। আমাদের সদিচ্ছাটা হ'ল সবচেয়ে বড় কথা। কি করে নিখরচায় মানুষের উপকার করতে হবে সেটা আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেবে বার করে ফেলছি।

টিফিন শেষ হয়ে গেল। পরের আওয়ারে আমাদের স্বাস্থ্য ক্লাস। গোপালবাবু আমাদের স্বাস্থ্য পড়ান। তিনি ক্লাসে পড়াতে পড়াতে বললেন : ঝোঁপ-ঝাড় থাকলে সেখানে মশা হয়। পানাপুকুর মানেই মশার ডিপো। আর মশা মানেই ম্যালেরিয়া। অতএব ম্যালেরিয়া নির্মূল করতে হলে এসব ঝোঁপ-ঝাড় কেটে সাফ করতে হবে।

আমি হাবুলের পাশেই বসি। শুধু আমি কেন আমার বড়দা ও মেজদাও হাবুলের পাশে বসে এসেছে। হাবুল প্রত্যেক ক্লাসে অন্ততঃ বার দুয়েক করে থাকে। আমার মনে হচ্ছে আমার ছোট ভাই ঘাগুও বছর দুয়েকের মধ্যে হাবুলকে ধরে ফেলবে।

হাবুল আমাকে ক্লাসের মধ্যেই ফিসফিস করে বলল : কেবু, পেয়েছি।

বললাম : কী?

হাবুল বলল : মশা।

আমি বললাম : কোথায় মশা?

হাবুল বিরক্ত হয়ে বলল : তোর মাথায়! আরে মশা থেকে একটা প্ল্যান পেয়েছি!

গোপালবাবু পড়াতে পড়াতে চোখ তুলে বললেন : হাবুল, দাঁড়াও। কেবু, তুমিও দাঁড়াও। আমি কি পড়াচ্ছি?

হাবুল বলল : মশা।

ক্লাসসুদ্ধ ছেলে হো হো করে হেসে উঠল। আমি বুঝতে পারলাম না, এমন খ্যাক খ্যাক করে হাসার কি মানে।

গোপালবাবু বললেন : আমি পড়াচ্ছি ব্যাঙ। মশা কখন শেষ হয়ে গেছে। তোমরা এতক্ষণ তামাশা করছিলে। কান ধরে দাঁড়িয়ে থাক।

আমি আর হাবুল কান ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। হাবুলের দিকে কটমট করে চাইতে দেখি সে বেহায়ার মত মিটিমিটি হাসছে।

ছুটির পর বাড়ি যাবার পথে হাবুল বলল : ভাই কেবু, তুই কিছু মনে করিস নে। মানুষের উপকার করতে গেলে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। এ তো কিছুই না। শোন, যে প্ল্যানটার কথা তখন বলছিলাম, আমি ঠিক করেছি আমাদের এই গোবরডাঙ্গা গ্রাম থেকে মশা দূর করব। আর মশার উৎপত্তিস্থল হ'ল ঝোঁপ-ঝাড়। যেমন গঙ্গার উৎপত্তি বিন্ধ্য পর্বত।

আমি বললাম : বিন্ধ্য পর্বত নয়—হিমালয়।

হাবুল বলল : ওই একই। গান আছে না, বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা।—কাল ছুটি আছে। সকালবেলা একটা দা হাতে করে আমার বাড়ি আসবি।

পরদিন সকালে একটা দা নিয়ে হাবুলের বাড়িতে গিয়ে দেখি, আমাদের ক্লাসের বোঁচকা ও ক্ষুদিরাম বলে দুটো ছেলেও দা হাতে করে হাজির হয়েছে। একটু পরে হাবুলও একটা দা হাতে করে বেরিয়ে এল। এসে বলল: এই যে, তোমরা সব এসে গেছ। শোন, কোথা থেকে কাজ আরম্ভ করা যায় বলতো?

বোঁচকা বলল: সবচেয়ে বেশি মশা যদি কোথাও থাকে, তাহলে আমাদের বাগানে। আমার মনে হয় এ গ্রামের সমস্ত মশাদের ওটাই হ'ল কলোনী।

ক্ষুদিরাম এই কথা শুনে রেগে গিয়ে বলল: হাবুল, ওর কথা শুনো না। আমাদের বাড়ির পিছনটা তো দেখেছ। আসশেওড়া আর বনতুলসীর ঝোঁপে ভর্তি। শুধু মশা নয়—ও যেরকম জঙ্গল তাতে বুনো শুওর পর্যন্ত থাকা আশ্চয্যি নয়। আমি বলি কি, এটাই আগে সাফ করা হোক।

বোঁচকা বলল: আমাদের অভিযান মশার বিরুদ্ধে, বুনো শুওরের বিরুদ্ধে নয়।

ক্ষুদিরাম বলল: কিন্তু আমি বলতে চাই, বুনো শুওর কি মশার চেয়ে বড় শত্রু নয়? ধর আমাকে যদি একটা মশা কামড়ায় আমার কিছুই হবে না, কিন্তু যদি বুনো শুওরে ধরে তাহলে আমি কি আর বেঁচে থাকব। একেবারে গয়া চলে যাব। বন্ধু হয়ে তুই তাই চাস বোঁচকা?

হাবুল এইবার বলল: সদস্যগণ, তোমরা নিজেদের মধ্যে এভাবে বিবাদ কোর না। আমি হচ্ছি প্রেসিডেণ্ট আমি যা বলব তাই হবে।

আমি বললাম: তুই আবার কিসের প্রেসিডেণ্ট?

হাবুল বলল: এই আমাদের নবগঠিত মানুষের উপকার করা সমিতির, আমি প্রেসিডেণ্ট। কেবু সেকরেটারি। আমি কেবুর নাম প্রস্তাব করছি। কেবু তুই আমার নাম প্রস্তাব কর।

আমি বললাম: আমি হাবুলের নাম প্রস্তাব করছি।

বোঁচকা বলল: ভাল ভাল পোস্টগুলো তোমরা নিয়ে নিলে। আমরা কি শুধু শুধু তোমাদের মুখ দেখব?

আমি বললাম: তাই তো। হাবুল, এদের দু'জনকে প্রধান অতিথি আর বিশিষ্ট অতিথি করে দিলে কেমন হয়?

হাবুল বলল: ধেৎ। এটা কি মিটিঙ যে প্রধান অতিথি হবে? আচ্ছা তোমরা দু'জন ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে গেলে।

মনে হ'ল বোঁচকা ও ক্ষুদিরাম বেশ খুশী হয়েছে।

হাবুল বলল: আমার কর্মী ভাইয়েরা, আজ তোমরা যে দলে দলে এখানে জমায়েৎ হয়েছ তাতেই আমি আনন্দিত। শোন, আজ আমাদের মশক-বিরোধী অভিযান সুরু। কোথা থেকে

আমরা কাজ আরম্ভ করব তা নিয়ে তোমরা বিবাদ না করে আমার ওপর ছেড়ে দাও। এখন আমি যেখানে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি সেখানে চল।

হাবুলকে আমরা তিনজন অনুসরণ করলাম। অনেক দূর হাঁটতে হাঁটতে আমরা একবারে গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে পৌছলাম। সেখানে এক কসাড় জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে একটা বাড়ি। এই বাড়ির মালিককে আমি চিনি। তাঁর নাম ধীরেনবাবু। কলকাতায় থাকেন। শনিবারে শনিবারে বাড়ি আসেন।

হাবুল বলল: এখান থেকেই আমাদের কাজ সুরু হবে। গ্রামে ঢোকবার পথেই মশাদের বাধা দিতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে আমরা গ্রামের দিকে এগুবো। কেবু, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, সুরু কর।

আমরা ঝপাঝপ সেই আসশেওড়ার ঝোঁপে কোপ লাগাতে লাগলাম। গাছ নয়ত যেন পাথর। কিছুতেই কাটতে চায় না। দশ-বারোটা কোপ মারতে মারতে তবে একটা গাছ পড়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ ক্ষুদিরাম চিৎকার করে উঠল: ওরে বাবারে গিছি গিছি!

বোঁচকা হাতের দা ফেলে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল: বাঘ বাঘ! এই বলে চোঁ-চাঁ দৌড়।

হাবুল সামনেই ছিল। প্রথমটা সে একটু ভড়কে গিয়েছিল। তারপর বলল: কী ব্যাপার? কী ব্যাপার?

ক্ষুদিরাম তখন সারা গা হাত পা চুলকোচ্ছে। আর চেঁচাচ্ছে, 'ওরে বাবা জ্বলে মলুম। জ্বলে মলুম।

—আমি তখন বুঝলাম বাঘ নয়। ব্যাপারটা অন্য কিছু।

বললাম: কী হয়েছে রে বোঁচকা?

বোঁচকা বলল: জল-বিছুটি।

এরপর ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে গেল। ঝোঁপের ভিতর ছিল এক জল-বিছুটির ঝাড়। জঙ্গল কাটতে কাটতে বোঁচকার গায়ে কখন বিছুটি লেগে গেছে। যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে উঠেছে। তার মুখে আমবাতের মত বড় বড় দাগ।

হাবুল গম্ভীর হয়ে ক্ষুদিরামের উদ্দেশ্যে বলল: কাপুরুষ।

ক্ষুদিরামের তুই নাম ডুবোলি।

ক্ষুদিরাম কাঁচুমাচু হয়ে ততক্ষণে ফিরে এসেছে।

হাবুল বলল: বন্ধুগণ, দেশের কাজ করা যে কত কঠিন এতেই তার কিছুটা প্রমাণ পেলে। তোমরা নিরুৎসাহ না হয়ে এগিয়ে যাও। এই কেবু, একটা গিরগিটির বাচ্চা খুঁজে পাস কিনা দেখতো।

আমি বললাম : গিরগিটির বাচ্চা কি হবে হাবুল ?

হাবুল বলল : থেঁতো করে ক্ষুদিরামের মুখে ঘষে দেব। তাহলে জল-বিছুটির জ্বলুনি সেরে যাবে।

জল-বিছুটির জ্বালায় ক্ষুদিরাম চিৎকার করছে।

ক্ষুদিরাম চিঁ চিঁ করে বলল : আমার জল-বিছুটির জ্বলুনি সেরে গিয়েছে। আর গিরগিটির বাচ্চায় কাজ নেই।

হাবুল বলল : তাহলে কাজ সুরু করে দাও। আবার কাজ সুরু হ'ল। হাবুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারক করতে লাগল। আমাদের তিনজনের গা দিয়ে ঘাম বেরুতে লাগল। হাতে কালসিটে পড়ে গেল। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। আমি প্রথমে চোখে সরষের ফুল দেখতে লাগলুম। তারপর সরষের ফুলগুলো গাঁদা ফুল হয়ে গেল।

বেলা বারোটার সময় হাবুল বলল : আজ এই পর্যন্ত থাক। আবার আসছে রবিবার। ততক্ষণে ধীরেনবাবুর বাগানের প্রায় তিনভাগের দু' ভাগ ঝোঁপ সাফ হয়ে গেছে।

কোনরকমে অবসন্ন অবস্থায় বাড়ি ফিরলাম। হাবুল অবশ্য আমাদের খুব উৎসাহ দিল—ঘাবড়াও মাৎ। মনে রেখ তোমরা দেশের কাজ করছ।

তিনদিন গায়ের ব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লাম। পিসীমা বললেন : একবার সেই ড্যাকরা হাবুলটাকে দেখলে হয়। ওর সমাজ সেবা বার করছি।

তিনদিন পরে বিছানা ছেড়ে উঠে কি মনে ভেবে হাবুলের বাড়ি গেলাম। দেখি ওদের বাড়ির সামনে তেঁতুল তলায় দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে হাবুল কার সঙ্গে কথা বলছে।

ভাল করে চিনতে পারলাম। ভদ্রলোকের নাম ধীরেনবাবু। যাঁর বাগানে আমরা ঝোঁপ সাফ করতে গিয়েছিলাম।

ওরা কেউ আমায় দেখতে পায়নি। দেখি ধীরেনবাবু হাবুলকে বলছেন : আমি কলকাতা থেকে ফিরে তোমাদের কাজ দেখেছি হাবুল। বেশ—ভালই হয়েছে। ওখানে এবার কলাইয়ের চাষ করব ভাবছি। তুমি যা বলেছিলে তাই তোমাদের দিলুম। এই নাও পাঁচ টাকা। তবে আসছে রবিবারে জন লাগিয়ে বাকীটা করে দেবে কিন্তু।

হাবুল বলল : ঠিক আছে। কিন্তু জনের দাম একটু বেড়ে গেছে। আমি তিনজনকে লাগিয়ে ছিলাম ওরা দু'টাকা করে নিয়েছে। আর একটা টাকা দিতে হবে কিন্তু।

ধীরেনবাবু বললেন : ঠিক আছে দেব।

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বোকার মত ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আঁধার

শ্রীসমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

আঁধার আমার প্রিয় চাহিনা আলোক
আলোকে ঝলসি আঁখি হারাব গোলোক।
অনুভূতি মোর মনে জাগে জীবনের
দারিদ্র্যে আঁধারে আর সেবায় পরের॥

মেঘনাদ সাহা

শ্রীমিলন চৌধুরী

ঢাকা জেলার শেওড়াতলী গ্রামে মেঘনাদের জন্ম ৬ই অক্টোবর ১৮৯৩ সালে। বাবার নাম জগন্নাথ সাহা, মার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। মেঘনাদ প্রথমে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে পড়তেন। অবসর সময় দোকানে বাবাকে সাহায্য করতেন। প্রাইমারি স্কুলে পড়া শেষ হলে তিনি ভর্তি হলেন শিমুলিয়া গ্রামে মিডল স্কুলে। শিমুলিয়ার মিডল স্কুল থেকে মেঘনাদ পাস করলেন, বৃত্তি পেয়ে, ঢাকা জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে। সেখানে তিনি অনন্তকুমার দাস নামে এক ডাক্তারের বাড়িতে থাকতেন, তাঁর ঋণ মেঘনাদ চিরদিন মনে রেখেছিলেন। তারপর মেঘনাদ ১৯০৫ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়ে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলোনে যোগ দেওয়ার জন্য বহু ছাত্রের সঙ্গে তিনি বিতাড়িত হন। তারপর তিনি ভর্তি হন কিশরীলাল জুবিলি স্কুলে। কিছুদিনের মধ্যে ঢাকার ব্যাপটিষ্ট মিশনে বাইবেল ক্লাসে ভর্তি হন। বাইবেলের পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে একশ টাকা পুরস্কার আর ঝকঝকে বাঁধানে বাইবেল উপহার পান। ১৯০৯ সালে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে মেঘনাদ প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় নম্বর পেলেন সবচেয়ে বেশী, তাছাড়া অঙ্কেও প্রথম। তিনি শিক্ষক এবং গুরুজনদের খুব ভক্তি করিতেন। তিনি যখন শিক্ষক হয়েছিলেন তখন তাঁর ছাত্ররা তাঁকে খুব ভালবাসত। এণ্ট্রেন্স পাস করে মেঘনাদ ঢাকা কলেজে ভর্তি হলেন। আই, এস-সি পরীক্ষায় গণিত আর কেমিস্ট্রিতেও প্রথম হলেন, স্থান পেলেন তৃতীয়। ১৯১১ সালে অঙ্কে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নিখিল সেন, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখুজ্যে এরা মেঘনাদের সহপাঠী ছিলেন। জগদীশ বোস এদের ফিজিক্স পড়াতেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পড়াতেন কেমিষ্ট্রি, অঙ্ক পড়াতেন ডি, এন, মল্লিক। বি, এস-সি ও এম, এস-সি পরীক্ষাতে মেঘনাদ প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পান, প্রথম স্থান অধিকার করেন সত্যেন বোস। এম, এস-সি পাস করার পরের বছর অর্থাৎ ১৯১৬ সালে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মেঘনাদকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের লেকচারার করে দেন। তারপর তিনি ফিজিক্স-এর লেকচারার হন। এই সময় আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিওরী নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ বোসও গবেষণায় যোগ দেন। এইসব তথ্য ছাপা হতো বিলেত ও আমেরিকার বিজ্ঞানের সেরা পত্রিকায়। পঁচিশ বছরের ঐ বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রগুলি একে একে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব পড়ে ফেললেন মেঘনাদ সাহা এবং প্রমাণ করলেন—সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে আর চাপে কী করে সূর্যের মধ্যে ক্যালসিয়াম, লোহা ও অন্যান্য উপাদানের পরমাণুগুলি আয়নিত হয় আর তার জন্য সূর্যালোকে

বর্ণালী কী ভাবে প্রভাবিত হয়। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা ধন্য ধন্য করতে লাগল। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও গুরুপ্রসন্ন ঘোষ পরিভ্রমণ বৃত্তি নিয়ে ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডক্টর মেঘনাদ সাহ বিলেত যান। বিলেত এবং জার্মানীতে নূতন নূতন যন্ত্রে রিসার্চ করে, নূতন নূতন অনেক তথ্য সংগ্রহ করে দেশে ফিরে আসেন। বিলেতের রয়্যল সোসাইটি তাঁকে ঐ সোসাইটির সদস্য করে নেয়। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি ১৯২৩ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি তাপ-আয়ননের গবেষণা চালাতে লাগলেন। গবেষণার ফলাফল মনমতো হলো। এলাহাবাদ ছেড়ে ১৯৩৮ সালে ডাঃ মেঘনাদ সাহা কলকাতা ফিরে এলেন। গবেষণার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তখন তিনি আনবিক বোমা সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন। এর পর তিনি বহুবার ইউরোপ এবং আমিরিকা ভ্রমণ করেছেন এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। নদী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল অসাধারণ। জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হলেও গরীব দেশবাসীর কথাও তিনি কোন সময় ভুলেন নি। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি যে কোনও দুর্যোগের সময় তিনি দুর্গতদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। দেশ-বিভাগের পর তিনি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের সুবিধার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা করা সম্বন্ধেও তার ঘোর আপত্তি ছিল। এর বিরুদ্ধে তিনি প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। অকাল মৃত্যুর জন্য তিনি অনেক কাজই শেষ করে যেতে পারেন নি।

তিনি পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন। কিন্তু তা হলেও সরকার তাঁর সুচিন্তিত অভিমত মেনে নিতেন। ১৯৩৫ সালে ডাঃ সাহা সায়েন্স এণ্ড কালচার নামে একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করতে শুরু করেন। যুদ্ধে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, চিকিৎসা শাস্ত্রে ফিজিক্স-এর প্রয়োগ, বন্য ও দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞান শিক্ষা, ভূবিদ্যা বা জিওফিজিক্স, ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের সমস্যা, আনবিক বোমা, আনবিক শক্তির কল্যাণকর প্রয়োগ, দিনপঞ্জিকার সংশোধন, রবীন্দ্রনাথ, কাঁচ শিল্প, ইস্পাত শিল্প, মহাভারত উপাখ্যানের তাত্বিক নদীবিজ্ঞান ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেষণ অব সায়েন্স গবেষণাগারটি তার অক্ষয় কীর্তি। ডাঃ সাহার পঞ্জিকা পরিকল্পনা ইউনেস্কোতে যথেষ্ট আদর পেয়েছে। শিক্ষব্রত, জাতীয় পরিকল্পনা, বিজ্ঞানমন্দির গঠন ও পরিচালনার মধ্য দিয়ে মেঘনাদ সাহা যেভাবে দেশকে সেবা করেছেন তার তুলনা হয় না। ১৯৫৬ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারী পার্লামেণ্ট অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য দিল্লী পৌছলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে জরুরী আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে পায়ে হেঁটে চলছেন, হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল, কিন্তু তখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে। দেশ তথা পৃথিবী হারালো তার একজন সুসন্তান।*

---

* এই প্রবন্ধের জন্য কমলেশ রায়ের 'মেঘনাদ সাহা' গ্রন্থের কাছে ঋণী।

রোমের বেফানা মেলা

শ্রীঅরুণচন্দ্র ভটাচার্য

জানুয়ারী মাসের ৫ তারিখ রোমবাসীদের বিরাট আনন্দের দিন। আমাদের দেশে এই জাতীয় উৎসব নাই। তবে ইহার আনন্দ-মুখরতার সহিত আমাদের রথের মেলার তুলনা করা যাইতে পারে। এই দিন রোম শহরে যীশুখ্রীষ্টের জন্য উপহার আনয়নকারী তিন রাজার উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

এই মেলা ইটালী দেশের রোম নগরীস্থ পিয়াজো নাভোদার উন্মুক্ত চত্বরে উদ্‌যাপিত হয়।

জানুয়ারী মাসের পাঁচ তারিখ এই স্থান উৎসব-মুখর হইয়া উঠে। চারিদিকে আলোকের মেলা বসিয়া যায়। বালক-বালিকাদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। চারিদিকে দোকানে দোকানে তাহাদের প্রীতিকর জিনিসে ভরিয়া যায়।

বালক-বালিকারা চত্বরে প্রবেশ করিলে ঝাটা ও ঝুড়ি বহনকারী স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্ট ঢাক অথবা বাঁশী উপহার দেওয়া হয়। রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র বালক-বালিকা তাহাদের মা, বাবা, কাকা, কাকীমা, ঠাকুরদা ঠাকুরমার সঙ্গে আসিয়া চত্বরে ভিড় করে।

তাহারা তাহাদের নিজেদের মধ্যে সৌজন্য সম্ভাষণ বিনিময় করিয়া এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করিতে থাকে। কেহ বা মিষ্টি কেনে, কেহ বা খেলনার দোকানের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। সমবেত প্রতিটি মানুষই বেফানা বাঁশীর সাহায্যে গগনবিদারী আওয়াজ তুলিয়া আকর্ষণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। বহুসংখ্যক বালক-বালিকা যখন এভাবে বাশী বাঁজাইতে থাকে, তখন আওয়াজের প্রচণ্ডতায় বধিরতার আশঙ্কা দেখা দেয়। ঢাকী ও গায়ক-গায়িকারও এই উৎসব আপন আপন শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিতে উন্মুখ হইয়া উঠে। ফলে শব্দ প্রচণ্ডতর হইয়া উঠে।

বেফানা উৎসবের নামকরণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। শোনা যায় ১৯০০ বছর আগে 'বেফানা' নামে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সদর রাস্তার পাশে এক বাড়ীতে বাস করতেন।

জানুয়ারীর ৫ তারিখে বেফানা তার সাংসারিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় তিনজন অদ্ভুত লোক তার গৃহে উপস্থিত হ'ল। তাঁরা উজ্জ্বল পোশাকে সুসজ্জিত ছিলেন এবং অন্যের দুর্বোধ্য ভাষায় কথাবার্তা বলছিলেন। ওদের একজনের নাম ছিল 'গ্যামপার'। বেফানা এটা বুঝতে পারলেন।

লম্বা চুল ও শাদা দাড়িওয়ালা অন্য আর একজনের নাম 'ম্যালকিয়র' এটাও বেফানা বুঝলেন। কটা রঙ বিশিষ্ট এবং কাল দাড়িশোভিত তৃতীয় ব্যক্তি নিজেকে 'বালথামার' নামে পরিচয় দিয়েছিল।

লোকগুলি একটি উজ্জ্বল তারকার অনুসরণে বেথেলহেলমের পথে চলিতেছিল। তাহারা বেফানাকে তাহাদের সাথে যাইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু বেফানা তাহার ঝাঁটা নাড়াইয়া অস্বীকৃতি জানাইয়া বলিয়াছিল—"আপনারা কি দেখিতে পাইতেছেন না, আমি ঘর ঝাঁট দিতেছি।"

গ্যামপার উত্তর দিয়াছিল, "ওটা এখনকার মত বাদ থাকুক না কেন, আমাদের সঙ্গে চল—শিশু যীশুখ্রীষ্টকে দেখিতে পাইবে।"

ম্যালকিয়র বলিল, "আমরা তাহার জন্য উপহার লইয়া যাইতেছি।"

বালথামার জানাইল, "নিশ্চয়ই আমাদের কিছু উপহার লইয়া যাইতে হইবে।"

কিন্তু বেফানা ঝাঁটা নাড়িয়া তাহাদের সঙ্গে যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "ঝাঁট দেওয়া শেষ হইলে আমাকে কাষ্ঠ-আহরণে যাইতে হইবে।" ঐ তিনটি লোক চলিয়া গেল। কিছু সময় পরে একটি রাখালবালক আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেটি বলিল, "চল, আমরা বেথেলহেলমে যাইয়া শিশু যীশুকে দেখিয়া আসি। সেখানে আমরা মা মেরী ও পুণ্যাত্মা যোশেফকেও দেখিতে পাইব।"

বেফানা এবারও অসম্মতি প্রকাশ করিয়া জানাইল, "আমাকে এখন রাত্রির খাওয়া তৈরী করতে হবে। খুব সম্ভব, আমি সকালবেলায় যাব।"

রাত্রি গভীর হইলে বেফানা তাহার জানালা দিয়া উঁকি দিল। সে দেখিতে পাইল আকাশ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে অগণ্য দেবদূতের ভিড়। তখন সে বুঝিতে পারিল যে, বেথেলহেলমে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটিয়াছে।

সে তখনই রওনা হইল। আশেপাশে যে কয়খানা খেলনা পাইল সে তাহার ঝুড়িতে তুলিয়া লইল। ইহার পর বাঁশী বাজাইল এবং দরজা বন্ধ করিয়া চলিতে শুরু করিল। শীগগিরই সে বুঝিতে পারিল যে, সে অন্ধকারে সঠিক রাস্তা দিয়া চলিতে পারিবে না। এমন কি, সকাল বেলাতেও কেউ তাহাকে বেথেলহেলমের রাস্তার নির্দেশ দিতে পারিল না। উঁচু-নীচু রাস্তা পার হইয়া, বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে ক্ষেতের উপর দিয়া চলিতে-চলিতে সে সরবে চিৎকার করিতে লাগিল, "আমি নিশ্চিতই শিশু যীশুকে খুঁজিয়া বাহির করিব।" কিন্তু সে কিছুতেই তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। লোকশ্রুতি, 'সেই দিন হইতে সে পৃথিবীর সর্বত্র প্রভু যীশুকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।'

শোনা যায়, বেফানা তাহার ঝাঁটা ও পুতুলের ঝুড়ি হাতে লইয়া এ-বাড়ী সে-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে—'শিশু যীশু কি এখানে আছে?' শিশুদের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে সে তাদের জন্যে খেলনা ও মিষ্টি রেখে যায়। সেগুলি সে হয় বালিশের উপর, অথবা শিশুটির পকেটে, অথবা মোজার ভিতরে রাখে। যদি ছেলেটি দুষ্ট হয়, তবে তার জন্য মাত্র এক টুকরো কাঠকয়লা রাখিয়া যায়।

সুতরাং বছরের এই দিনে শুধু রোমেই নয়, ইটালীর সর্বত্র সর্ববয়সের লোক বেফানার সম্মানার্থে বিপুল আনন্দধ্বনি তুলিয়া থাকে।

শ্রীসত্যশংকর সুর

আমরা প্রতিমিনিটে কত শব্দ বলতে বা চিন্তা করতে পারি? প্রশ্নটা অদ্ভুত হলেও বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা বলেন—একজন মানুষের চিন্তাধারার গতি হচ্ছে, প্রতি-মিনিটে গড়ে অন্ততঃ ৫০০ শব্দ এবং বলবার গতি হচ্ছে, গড়ে প্রতিমিনিটে প্রায় ১০০ শব্দ।

* * *

চাল আমাদের প্রধান খাদ্য-শস্য। চাল উৎপাদনের পরিমাণ কম হলে একটা সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই চালের সঙ্কট দূর করবার জন্য অনেকে বিকল্প খাদ্য-শস্যের কথা বলেছেন। রবার্ট আই. কৌফম্যান নামে একজন আমেরিকান এই সঙ্কট দূর করবার জন্য এক অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে চালের মত খাদ্য-শস্য তৈরী করা যায় এবং সেগুলি দেখতে হয় ঠিক চালের দানার মত। সে সব শস্যকণায় কলে-ছাটা চালের তুলনায় ৮ থেকে ১০ গুণ বেশী ভিটামিন থাকে। ১৯৫৭ সাল থেকে ফিলিপাইনে এই যন্ত্র ২৪ ঘণ্টা চালিয়ে যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য উৎপাদন করা হয়েছে—তাতে দৈনিক ৬০,০০০ লোককে সাধারণ চালের চেয়ে শতকরা ৭৫ ভাগ কম খরচায় খাওয়ান যেতে পারে।

* * *

মানুষের মাথায় কত চুল আছে? একি অদ্ভুত প্রশ্ন! মানুষের চুলের সংখ্যা গুণে বের করা কি সম্ভব? প্রশ্নটা খুব অদ্ভুত মনে হলেও, বিজ্ঞানীরা কিন্তু এর উত্তর দিয়েছেন। তাঁরা হিসাব করে দেখেছেন যে, লাল বর্ণের চুলওয়ালা স্ত্রী বা পুরুষের মাথায় গড়ে ৯০,০০০ চুল আছে, শ্যাম বর্ণের চুলওয়ালা স্ত্রী বা পুরুষের মাথায় গড়ে প্রায় ১০৫,০০০ চুল আছে, এবং পিঙ্গল বর্ণের চুল ওয়ালাদের মাথায় ১৪০,০০০ চুল।

* * *

পৃথিবীতে নানা রকমের মূল্যবান মণির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এগুলি মানুষ নানা কাজে

ব্যবহার করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যাবতীয় মণির মধ্যে পান্না নামক মণিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান এবং নিখুঁত। ভাল রঙের মণির মূল্য প্রতি ক্যারেট ২৮০০ ডলারেরও বেশী হয়ে থাকে।

* * *

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে—ক্যালিফোর্নিয়ায় এক জাতের দেবদারু গাছ (Bristlecone Pine) পৃথিবীর সজীব পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন। Methuselahs নামে পরিচিত একটি গাছের বয়স ৪৬০০ বৎসর। পূর্বে ধারণা ছিল যে, California Sequoias নামক গাছই সবাচয়ে প্রাচীন। এখন সে ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

* * *

আমাদের চোখের পাতা প্রায় সব সময়েই মিট্‌মিট্‌ করে, অর্থাৎ একবার বোঁজে আবার খোলে। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী গড়ে মানুষদের চোখের পাতা প্রতি ৩ সেকেণ্ডে একবার মিট্‌মিট্‌ করে। চোখের পাতা মিট্‌মিট্‌ করবার ব্যাপারটাও মানুষের ইচ্ছাধীন নয় এবং এটা এক সেকেণ্ডের দশভাগের চারভাগের সময়ের মধ্যে ঘটে যায়।*

* পুরাতন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা হইতে গৃহীত।

মহাপ্রাণ শাস্ত্রীজী

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার

সরল সহজ মানবতা গুণে
উদাত্ত মহাপ্রাণ,
দেশ ও জাতির আদর্শ প্রতীক
বরণীয় সুমহান্।
লালবাহাদুর—বাহাদুর তুমি
চির নির্ভীক বীর,
ধর্মে কর্মে শিক্ষার গুণে
চির উন্নত ধীর।
আঠারো মাসের স্বল্প কাজের
স্বল্প এ পরিসরে,
প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রিত্বের
জ্বলন্ত স্বাক্ষরে—

তাসখন্দের পুণ্য-ভূমিতে
রেখে গেলে পরিচয়,
সারা জগতের ইতিহাস নব
একান্ত বিস্ময় !
অহিংসা প্রেম ভারত-মন্ত্রে
তোমার শান্তি-বাণী,
পাকিস্তানেরে নিয়ে এলো কাছে
সখ্য মিলনে টানি।
তোমার প্রচেষ্টা—অমোঘ কর্ম
সাফল্যের সঞ্চয়,
এ মর দেহকে দিল অমরতা
যশ খ্যাতি অক্ষয় !

মেঠুড়ে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্কুল গেমস

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্কুল গেমসের তিন দিনের অনুষ্ঠান ক'দিন আগে শেষ হয়েছে। জেলাভিত্তিক প্রথায় পরিচালিত এই স্কুল গেমসে বাঙ্গালার নটা জেলা এবং কলকাতার তিনটে আঞ্চলিক দল— মোট বারোটা দলের প্রায় চার শ' ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেছিল। অ্যাথলেটিক স্পোর্টস ছাড়া ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন ও কপাটি ছিল প্রতিযোগিতার বিষয়।

ইউনিভার্সিটি মাঠে তিন দিনের অ্যাথলেটিকসে আটটা বিষয়ে নতুন রেকর্ড হয়েছে। ছাত্রীরা পাঁচটা বিষয়ে এবং ছাত্ররা তিনটে বিষয়ে নতুন রেকর্ড করেছে। মুর্শিদাবাদের সোফিয়া খাতুন ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে, চব্বিশ পরগণার ইন্দ্রাণী মুখার্জি বর্শা ছোঁড়া, বর্ধমানের নন্দিতা পাল উঁচু লাফ ও নমিতা ভৌমিক ডিসকাস ছোঁড়া এবং দক্ষিণ কলকাতার গোপাল কর হপ স্টেপ ও জাম্প ও বর্ধমানের স্বপন গাঙ্গুলি লংজাম্প-এ নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

একটি উল্লেখযোগ্য স্পোর্ট্‌স

সম্প্রতি নরেন্দ্রপুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মেলা উপলক্ষে আয়োজিত ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলো ও সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনী একটা উল্লেখ করার মতন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে আশপাশের গাঁয়ের সতেরোটা ইস্কুলের প্রায় এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী যোগ দিয়েছিল। আশ্রম থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে মাষ্টার-মশায় পাঠিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলো ও সমষ্টি ব্যায়ামের রেওয়াজ করানো হয়। সবচেয়ে যা ভালো এবং সুন্দর তা হ'ল ওই অঞ্চলের অন্ধ ছেলে-মেয়েদের ব্যায়াম ও খেলাধুলো। অন্ধ ছেলেদের সমষ্টি ব্যায়াম ও খেলাধুলোর রিদমিক অ্যাকশন অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুন্দর ছন্দ সকলকে অবাক করে। আশ্রমের গুরুজী জানান : অন্ধ ছেলে-মেয়েদের সামনে রেখে ব্যায়াম ও খেলাধুলো করানোর উদ্দেশ্য অন্য ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলোর অনুপ্রেরণা দেওয়া'

ইংলণ্ডের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার ৩য় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের অধিনায়ক মাইক স্মিথ এক হাতে এই ক্যাচটি ধরলে, অষ্ট্রেলিয়ার সিনকক তাঁর ২য় ইনিংসে ২৭ রানের মাথায় আউট হয়ে যান। এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় সিডনী শহরে।

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

সাত সমুদ্দুর—ইন্দিরা দেবী সম্পাদিত। জয়ন্তী চক্রবর্তী কর্তৃক ৪০-বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২'৫০

প্রতি বছরের মত এবছরও পূজার পূর্বে খ্যাতনামা লেখিকা (তোমাদের 'মধুদি') ইন্দিরা দেবী সম্পাদিত সচিত্র 'সাত সমুদ্দুর' নানা ধরনের গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

উচ্চাঙ্গের এই পূজা-বার্ষিকীটিতে এবার লিখেছেন—নরেন্দ্র দেব, গোপাল ভৌমিক, মনোজিৎ বসু, স্বপনবুড়ো, বেলা দে, পুষ্প বসু, বেণু গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাকর মাঝি, সতীদেবী মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল সিংহ, জয়দেব রায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, মনোতোষ রায়, অমরনাথ রায়, ননীগোপাল চক্রবর্তী, মিনতি গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী প্রভৃতি লেখক-লেখিকারা।

গ্রন্থখানির প্রচ্ছদপটটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং ভিতরের ছাপা, কাগজ ও সাজগোজও উৎকৃষ্ট, সুরুচির পরিচায়ক।

—

স্লোভাকিয়ার পাহাড়ে পাহাড়ে—মিতেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়। এভারেস্ট বুক হাউস, এ-১২-এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫'৫০

আশ্চর্যসুন্দর ভ্রমণ-কাহিনী 'স্লোভাকিয়ার পাহাড়ে পাহাড়ে'। আরও আশ্চর্য এই জন্যে যে, লেখক মিতেন্দ্রলালই সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে কনিষ্ঠতম গ্রন্থকার। মা, দিদি ও বাবার সঙ্গে সে চেকোস্লোভাকিয়ায় যায় এবং সেখান থেকে স্লোভাকিয়ার বিভিন্ন স্থানে বেড়িয়ে, সেখানকার জীবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তোলে এই বইটির পাতায় পাতায়।

নবীন সাহিত্যিকের এই মনোরম ভ্রমণ-কাহিনী পড়তে পড়তে তোমরা সকলেই যেমন অভিভূত হয়ে যাবে, তেমনি ঐ দেশের মানুষজন, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নানা ঘটনা ছবির মত ভেসে উঠবে তোমাদের চোখের সামনে।

লেখকের চিত্রসহ বইখানির মধ্যে আরও অনেকগুলি ছবি আছে। এই ভ্রমণ-কাহিনীর ছবিগুলিও যেমন মনোরম, তেমনি এর রঙিন প্রচ্ছদপটটিও আকর্ষণীয়।

আমরা এই নবীন লেখককে সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাগত জানাই এবং তাঁর এই রচনার জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি।

—
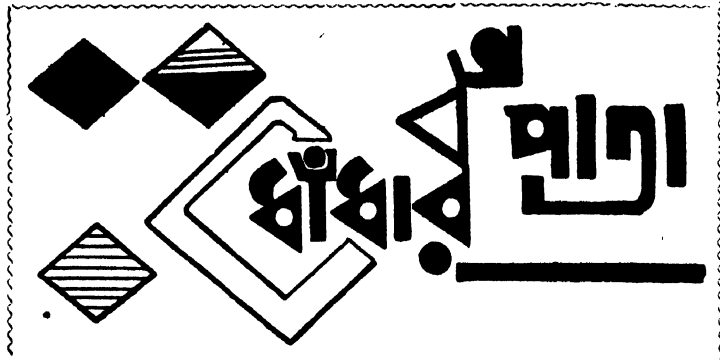
(এই পাতার জন্য গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পঠাক-পাঠিকারা ধাঁধা পাঠাতে পারেন।)

১। এমন কি বর্ণ যাহা করিলে হরণ
মুখরুচি খাদ্য এক করে উৎপাদন ?

শ্রীমাধব মণ্ডল (কলিকাতা)

—

২। রাখিলে কি বস্তু বল চৌকির উপরে
ঢালিবে সংগীত সুধা শ্রবণ বিবরে।

শ্রীসুধা সেন (চন্দননগর)

—

৩। একজন 'জুয়েলার' এবং একজন 'জেলার'-এ কি তফাত বলতে পার ?

শ্রীপল্লব সেন (হাওড়া)

—

৪। কালো এমন কোন জিনিসের নাম করতে পার, যা সমস্ত পৃথিবীকে আলো দেয় ?

শ্রীরাসমণি ঘোষ (দুমকা)

৫। এমন একটি জিনিসের নাম করো, যেটি ব্যবহার করার আগেই ভেঙে ফেলা হয়।

কুমারী রেণুকা সান্যাল (পুরুলিয়া)

—

৬। ডানা আছে ওড়ে না
খায় পাথর মাটি,
ঘোড়ার মত চাটি মারে
লম্বা ছ' ফুট খাঁটি।
এমন কি পক্ষী আছে
নাম বলো তার,
বানিয়ে তোমায় দেব
লজেন্সের হার।

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (পাটনা)

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর

১। তোতাপাখী   ২। পিপাসা   ৩। শিকার   ৪। বিবিধ।

নিত্য-নতুন হাঙ্গামা আর অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলি। চারিপাশে কেবল দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশ—এসময় তোমাদের কাছে যে কথা বলবো তাহলো, তোমরা বা ছাত্রসমাজ অনেক ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবে—এমন কিছু করা ঠিক হবে না যা দেশের ও দশের ক্ষতি-সাধন করে।

তোমরা যারা পরীক্ষার্থী ছিলে তাদেরও অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এইসব বিপরীত ঘটনার সম্মুখীন হলেও তোমাদের পড়াশুনা বা পরীক্ষার জন্য মনোবল যেন অটুট থাকে—এই কথাই আজ বার বার তোমাদের বলছি।

মহাজীবন থেকে—

তেরশো বছর হবে যখনকার কথা বলছি—মুর্শিদাবাদ জেলায় কর্ণসুবর্ণ বা কানসোনা নামে একটি গ্রাম। এককালে এ অঞ্চল গৌড় বাংলার রাজধানী ছিল। এইখানে রাজত্ব করতেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা মহারাজ শশাঙ্ক।

ইনি যে রাজার ছেলে হিসেবে রাজা হয়েছিলেন তা নয়। প্রথম জীবনে ইনি অন্য এক রাজার অধীনে সামন্ত ছিলেন, তারপর নিজের চেষ্টায় ও বীরত্বে শেষ পর্যন্ত তিনি স্বাধীন রাজা হয়েছিলেন। গৌড় রাজ্য নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। রাজ্য বাড়াবার জন্য অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছিলেন—তাঁর রাজ্য উৎকল সীমান্ত এবং সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এতেও তিনি তৃপ্ত হননি—কারণ তিনি চেয়েছিলেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট হতে। তখনকার দিনে কান্যকুব্জ অথবা কনৌজ ছিল শক্তিশালী রাজ্য। তাই তিনি বুঝেছিলেন যে, কনৌজ অধিকার না করলে আর্যাবর্তে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। এসময় কনৌজে রাজত্ব করতেন গ্রহবর্মা।

এর সঙ্গে মালবরাজ দেবগুপ্তের বিরোধ চলছিল—শশাঙ্ক এই দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। এদিকে গ্রহবর্মাও থানেশ্বর রাজাদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। এই ভাবে কনৌজের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম বাধালো।—থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধন পরাজিত হলেন, গ্রহবর্মার মৃত্যু হলো। কনৌজের অধিকার নিয়ে শশাঙ্ক আর দেবগুপ্ত দু'জনে ভাগ করে নেবেন ভাবছিলেন, কিন্তু থানেশ্বরের প্রজারা রাজ্যবর্ধনের ছোট ভাই হর্ষবর্ধনকে রাজা করলেন। কাজেই শশাঙ্ক কনৌজ জয়ের আশা ছেড়ে গৌড়ে ফিরে এলেন।

কিন্তু হর্ষবর্ধন বা কামরূপের রাজা বার বার চেষ্টা করেও শশাঙ্ককে দমন করতে পারেন নি।

শশাঙ্ক অনেক রাজ্য জয় করেছিলেন তাই নয়, ধর্ম-কর্মেও তার মন ছিল। তিনি ভগবান শিবের উপাসনা করতেন। সেই সময় বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ কমে আসছিল। বৌদ্ধদের সঙ্গে শিবের উপাসকদের প্রায়ই সংঘর্ষ বাধতো। সেই যুগে লেখা দু' একটি পুঁথি থেকে জানা গেছে শশাঙ্ক নাকি বৌদ্ধদের পছন্দ করতেন না।

বৌদ্ধদের বুদ্ধগয়ায় বোধিগাছের তলায় গৌতম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এইখানে প্রতি বছর ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে এবং ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও বহু নরনারী মিলিত হতেন। এই গাছটির অনেক ক্ষতি করেছিলেন তিনি এবং বুদ্ধমূর্তি সরিয়ে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বৌদ্ধগ্রন্থে জানা যায় যে, তাদের ধর্মে আঘাত দেবার জন্য শশাঙ্ক শেষ বয়সে দুরন্ত ব্যাধিতে কষ্ট পেয়েছিলেন। বহু রকমের চিকিৎসা করেও এই ব্যাধির হাত থেকে তিনি মুক্তি পাননি। অনেক যাগযজ্ঞও করেছিলেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। কিন্তু বৌদ্ধদের এসব কথা অনেকে সত্যি বলে মনে করেন না। শশাঙ্ক যখন গৌড়ের রাজা, তখন চীনা-পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ বাংলাদেশে এসেছিলেন। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের কাছাকাছি একটি বৌদ্ধবিহার দেখতে পেয়েছিলেন। এখানে অনেক বৌদ্ধ-ভিক্ষু থাকতেন।

শশাঙ্ক বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন সে কথা মানতেই হবে। নিজের প্রতিভাবলে তিনি বাংলা দেশের স্বাধীন রাজা হয়েছিলেন। শুধু স্বাধীন রাজাই নন, বাংলা দেশের বাইরের বহু রাজ্যও তিনি জয় করেছিলেন। আর্যাবর্তে যাঁরা সবচেয়ে পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, শশাঙ্ক তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করেছিলেন। দীর্ঘকাল চেষ্টা করেও হর্ষবর্ধন তাঁকে পরাজিত করতে পারেন নি।

শশাঙ্ক যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন স্বাধীন সার্বভৌম হয়ে বেঁচে ছিলেন।

শশাঙ্কর আগে বাংলা দেশের কোনো রাজাই আর্যাবর্তের ইতিহাসে এতখানি গৌরব অর্জন করতে পারেন নি ॥

চিঠির উত্তর—

অশোককুমার মিত্র, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা : তোমার আনকগুলি প্রশ্ন—প্রথম : যাদু সম্রাট পি. সি, সরকারের পুরো নাম কি ?

উত্তর : প্রতুলচন্দ্র সরকার।

দ্বিতীয় : ১৯৬৪ সালে কোন বই রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে।

উত্তর : ১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক প্রাপ্ত চিত্র—'চারুলতা'।

তৃতীয় প্রশ্ন : পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ কি ?

উত্তর : পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিষাক্ত সাপ Anstratian Tiger Snake. এছাড়া ভারতীয় গোখুরা সাপও (Indian Cobra) অন্যতম সর্বাপেক্ষা বিষাক্ত সাপ হিসাবে গণ্য।

চিত্তরঞ্জন মাইতি, হলুদিয়া :

তুমি যে উদ্ধৃতি দিয়েছ তা পাঠক-পাঠিকাদের দিচ্ছি, ইচ্ছা করলে উত্তর দেবে।

"পূর্বাভাষ আগেই পেয়েছিলাম। তবুও প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে গেলাম, তাঁর মিঠেকড়া কথাগুলোতে বোঝা গেল যে, তিনি ছাড়পত্র দেবেন না। বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম, সেইজন্য কয়েক রাত ঘুম নেই।"

চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞাসা করেছে, এর মধ্যে কোন কাব্যের বই-এর নাম আছে কি ? যদি থাকে কি এবং ক'টা ?

অনির্বাণ, মৌসুমী, অনীতা, কোলকাতা ; **হীরক, কৌশিক, কথাকলি,** কোলকাতা ; **রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়,** কোলকাতা ; **শ্রীরূপা লাহিড়ী,** আসাম ; **টুবলু লাহিড়ী,** বেহালা ; **রুমঝুম গোস্বামী** ও **লিখন গোস্বামী,** বালি।—সকলের চিঠি পেয়েছি।

তোমাদের—**মধুদি'**

মৌচাকের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি

এই সংখ্যার সঙ্গে মৌচাকের ৪৬ বছর শেষ হ'ল।

আগামী বাংলা বছরের বৈশাখ (১৩৭৩) থেকে মৌচাকের নতুন বছর আরম্ভ হবে এবং সে পড়বে ৪৭ বছরে। ছেলেমেয়েদের একটি মাসিক পত্রিকার জীবনে একটানা ৪৭ বছর চলা কম গৌরবের কথা নয়। এর জন্যে আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকা ও সহানুভূতিশীল অভিভাবকদের কাছেও আমরা ঋণী। তাঁদের সহযোগিতা ব্যতীত এই সুদীর্ঘ দিন ছবি, ছাপা, কাগজ ও লেখার উচ্চ মান বজায় রেখে, ছোটদের শিক্ষা ও আনন্দের খোরাক যোগানো সম্ভব ছিল না। আমরা আশা করি, এতদিন তাঁরা মৌচাকের প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়ে এসেছেন, এই নতুন বছরেও তা থেকে আমরা বঞ্চিত হব না।

বর্তমানে কাগজ, ছাপা, ছবি ও ব্লক প্রভৃতির দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি পেলেও, আমরা সাধারণ মানুষের অবস্থার কথা বিবেচনা করে, মৌচাকের দাম না-বাড়িয়ে পূর্বের মতই রেখে দিলাম।

এখন আমাদের অনুরোধ, এই চৈত্র-সংখ্যার সঙ্গে যাদের বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক চাঁদা শেষ হবে, তারা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মনিঅর্ডারে বার্ষিক চাঁদা ৫.০০ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ২.৫০ পাঠিয়ে দেবে। যারা এই টাকা পাঠাবে না, অথবা গ্রাহক-গ্রাহিকা থাকার অনিচ্ছা জানিয়ে চিঠি দেবে না, তাদের আমরা ভিঃ পিঃ ডাকযোগে বৈশাখ মাসের কাগজ পাঠাব এবং তাতে বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক চাঁদা ছাড়া ডাকখরচ হিসাবে সামান্য কিছু অতিরিক্ত পড়বে। আশা করি তোমরা সকলেই সেই ভিঃ পিঃ গ্রহণ করে আবার নতুন বছরের জন্য গ্রাহক-গ্রাহিকা থেকে আমাদের আনন্দবর্ধন করবে।

বার্ষিক চাঁদা ৫.০০	মৌচাক কার্যালয়	বছরের যে-কোন মাস
ষাণ্মাসিক ঐ ২.৫০	১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২	থেকে গ্রাহক হওয়া যায়

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য ০.৪৫ প